নীহাররঞ্জন রায়

বাঙালীর ইতিহাস

আদিপর্ব

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

ইংরেজী

Brahmanical Gods in Burma
Sanskrit Buddhism in Burma
Theravada Buddhism in Burma
Art in Burma
Maurya and Post-Maurya Art
Dutch Activities in the East
An Artist in Life
Sikh Gurus and Sikh Society
Nationalism in India
An Approach to Indian Art
Idea and Image in Indian Art
Mughal Court Painting

বাংলা

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা

বাঙালীর ইতিহাস

আদিপর্ব

সংক্ষেপিত সংস্করণ

নীহাররঞ্জন রায়

জ্যোৎস্না সিংহ রায়
কর্তৃক সংক্ষেপিত
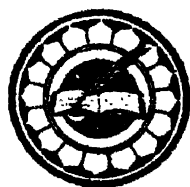
লেখক-সমবায়-সমিতি
কলিকাতা-১২

মূল গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৫৬
পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৫৯

সংক্ষেপিত সংস্করণের বর্তমান পুনর্মুদ্রণ
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
ও
লেখক সমবায়-সমিতির উদ্যোগে
সরকার প্রদত্ত সুলভ মূল্যের
কাগজে মুদ্রিত

প্রকাশক
শ্রীজ্যোৎস্না সিংহ রায়
লেখক-সমবায়-সমিতি
ই-৯২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীতপন গাঙ্গুলী
স্পিড-ও-লিথ্ অফসেট কোং
১২, বেলিয়াঘাটা রোড
কলিকাতা ১৫

পরিচয়-পত্র

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা আমাদের অবশ্য-পঠিতব্য প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথনির্দেশ করিবে।

নীহাররঞ্জন বিনয়ের সঙ্গে বলিয়াছেন, '...আমি কোনও নূতন শিলালিপি বা তাম্রপট্টের সন্ধান পাই নাই, কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই। ...যে-সমস্ত তথ্য ও উপাদান পণ্ডিতমহলে অল্পবিস্তর পরিচিত ও আলোচিত প্রায় তাহা হইতেই আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি।...আমি শুধু প্রাচীন বাংলার ও প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস একটি নূতন কার্যকারণ-সম্বন্ধগত যুক্তিপরম্পরায় একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র।...এই যুক্তি ও দৃষ্টি অনুসরণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের...সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়।... নূতন নূতন উপাদান প্রায়শ আবিষ্কৃত হইতেছে।...আমি শুধু কাঠামো রচনার প্রয়াস করিয়াছি—ভবিষ্যৎ বাঙালী ঐতিহাসিকেরা ইহাতে রক্তমাংস যোজনা করিবেন, এই আশা ও বিশ্বাসে।...

মনীষার যে সমৃদ্ধি এই গ্রন্থে পরিস্ফুট, সেই সমৃদ্ধি যাঁহার আছে তিনি বিনয়ী হইবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তবু, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত আরও নূতন তথ্য প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত না হইবে, যতদিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ গবেষণার ফল আরও ব্যাপক ও গভীর ভাবে বাঙালীর প্রাচীন জীবনের ইতিহাস আলোকিত না করিবে, ততদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থের অতি উচ্চ আসন আর কেহ অধিকার করিতে পারিবে না, ইহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইতিহাসের যে বিরাট দৃশ্য এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত এবং যে মহামূল্যবান্ বিভাগটি এই গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা বুঝিতে হইলে এবং তাহাতে বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ এবং নীহাররঞ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্যগুলি বারবার আলোচনা করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। এই গ্রন্থ আমাদের দেশের ইতিহাস-আলোচনায় নূতন পথ রচনা ও নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। পরবর্তী গবেষকরা ইহাকে ভিত্তিরূপে লইয়া কাজ আরম্ভ না করিলে আমাদের নিজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিস্তার সম্ভব হইবে না।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া, ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্যপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস-বিষয়েই শুধু নয়, সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থ ইহার আগে কেহই লেখেন নাই। শুধু ইহার আকারে নহে, শাখাপল্লবে নহে, বিষয়-নির্বাচনে নহে,—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি নীহাররঞ্জনের অটুট নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, অসংখ্য ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গির সজীব বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, উচ্চস্তরের বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা, এবং সর্বোপরি

সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি এই গ্রন্থকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের জগতে অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গ্রন্থকার অনেক নূতন শব্দ চয়ন করিতে, নূতন পদাংশ ও বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; দুরূহ ভাব ও অনভ্যস্ত ভঙ্গি ও চিন্তা আত্মস্থ করিয়া অর্থ ও ব্যঞ্জনাময় ভাষায় সেগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। তথ্যবহুল মননশীল গ্রন্থ বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় খুব বেশি রচিত হয় নাই; এমতাবস্থায় এই কাজটি যেমন কঠিন তেমনি নূতন। অথচ, নীহাররঞ্জনের ভাষার বেগ ও উদ্দীপনা দেখিয়া মনে হয়, এ কাজ যেন তিনি খুব সহজেই করিয়াছেন। বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাত্মতা না হইলে এই সাফল্য সম্ভব নয়। কোথাও কোথাও তাঁহার বিবরণ ও মন্তব্যের ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে এই ধরনের সার্থক প্রয়াস আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

ইংরাজি ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইলে নীহাররঞ্জন ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হইতেন; গ্রন্থের প্রচার বেশি হইত, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুদূরব্যাপী হইত। কিন্তু তিনি যে তাহা করেন নাই ইহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগেরই প্রমাণ।

বিষয়-গৌরবেও এই গ্রন্থ অনন্যপূর্ব। এই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছে বাংলার ইতিহাস নহে, বাঙালীর ইতিহাস; অর্থাৎ, ইহা বাংলা দেশের রাজা, রাজকর্মচারী, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন-বিস্তার প্রভৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্যে লিখিত নহে, কারণ, সেরূপ "এহ বাহ্য" ইতিহাস তো আগে অনেক লেখা হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙালীর লোক-ইতিহাস; ইহাতে বাঙালীর জনসাধারণের, বাঙালী জাতির সমগ্র জীবন-ধারার যথার্থ পরিচয় দিবার জন্য আদ্যন্ত চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং, বলা যাইতে পারে, এই ঐতিহাসিক কাব্যটির "নায়ক" রাজবংশ নহে, ধনীসমাজ নহে, পণ্ডিতবর্গ নহে, জাতীয় চিন্তার শিক্ষিত নেতাদের সমাজ নহে—যাহাদের বলা হয় জনসাধারণ, যাহারা উচ্চ বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ও স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরে, যাহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক তাহারাই এই ইতিকথার "নায়ক"—যদিও নীহাররঞ্জন প্রথমোক্ত শ্রেণী ও সমাজের লোকদের কথাও ভুলেন নাই, তাহাদের ইতিহাসও বাদ দেন নাই। এই নিম্নতর কিন্তু বৃহত্তম সামাজিক স্তরকে প্রধান আলোচ্য বিষয় করাই এই গ্রন্থের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য ও অনন্যপূর্বত্ব। অথচ, এইরূপ সামাজিক ইতিহাসই বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত-সমাজে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা হয়।

সত্য বটে, ইহার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত (ইংরাজি ভাষায়) বাংলার ইতিহাসে* প্রথম খণ্ডে, এবং খুব সংক্ষিপ্তাকারে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন রচিত "প্রাচীন বাঙালী" (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ পুস্তিকামালা, ১২ নং) বাংলা পুস্তিকা... রূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আভাস পাওয়া গিয়াছিল। গ্রন্থের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে আংশিক আলোচনার স্থান মাত্র ছিল, তাহাদের পরিকল্পনাও ছিল অন্য প্রকৃতির।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের বিরাট গ্রন্থের সমস্তটারই বিষয়বস্তু হইতেছে বাংলার লোকদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, ধর্মকর্ম, সংস্কৃতি, ধনসম্পদ প্রভৃতি। অর্থাৎ, বাঙালী জাতি কি করিয়া ক্রমে ক্রমে আজিকার বাঙালীতে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা। বাংলার লোকেরা একেবারে আদিতে কেমন ছিল, কখন কোথা হইতে কে আসিল, এই ভূখণ্ডের নদনদী-পাহাড়-প্রান্তর-বন-খাল-বিল কালক্রমে কিরূপে পরিবর্তিত হইল, ভৌগোলিক প্রভাব এই প্রদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে কোথায় কি কি কাজ করিয়াছে, বাঙালীর দেহে কোন্ কোন জাতির রক্ত কি পরিমাণে মিশিয়াছে, অতীত যুগের ভূমিসংস্থা, কৃষি-পদ্ধতি, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, অশন-বসন, ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, এক কথায় প্রাচীন বাঙালী জীবনের সকল দিক হাজার বৎসর ধরিয়া কালের স্রোতের আঘাতে আঘাতে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইল—এই সব তলাইয়া বুঝিবার এবং যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, এবং আমার সংশয় নাই, নীহাররঞ্জনের চেষ্টা অসামান্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক গবেষণার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই শুধু বুঝিতে পারিবেন, এই সুকঠিন কার্যে কি অসীম ধৈর্য, কি অক্লান্ত শ্রমশীলতা, কি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, কি মার্জিত অথচ সূক্ষ্ম বোধ ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে এই ধরনের গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত দুরূহ সাধনা, এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ আরও দুরূহ। নীহাররঞ্জন তাঁহার সাধনায় অপূর্ব সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

নীহাররঞ্জনের সুবৃহৎ গ্রন্থে কোথাও আমাদের প্রচলিত 'অমুক জাতির ইতিহাস'-শ্রেণীর বইগুলির 'গুলিখুরী' মত ও প্রবাদে অন্ধ বিশ্বাস নাই। আমার পরিচিত জনৈক বাঙালী লেখক তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভাদুড়ী বংশ চম্বল নদীর দক্ষিণে (আগ্রা ও গোয়ালিয়রের মাঝামাঝি) 'ভাদাওর' প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের আদি পুরুষ সেখানে সামন্ত ছিলেন! তিনি যদি দিল্লীর বাদশাহদের ইতিহাস পড়িতেন, তবে অতি সহজেই জানিতে পারিতেন যে, 'ভাদাওরীয়া' একটি ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশ, ব্রাহ্মণ নহে; তাঁহাদের অনেকে বাদশাহদের মনসবদার ছিলেন।

এইরূপ জ্ঞানহীন বিচারবুদ্ধিহীন আলোচনার কোন চিহ্নই এই গ্রন্থে নাই। সর্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে নীহাররঞ্জন পণ্ডিত-সুলভ অহংকারে কোথাও নিজ মত গায়ের জোরে প্রচারের চেষ্টা করেন নাই; সর্বত্রই তিনি পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করিয়া, নূতন যুক্তি দিয়া, সমস্ত প্রমাণপঞ্জী বিচার করিয়া, তাহার পর নিজের সিদ্ধান্ত পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরের ও নিজের উপাদানের নাম, পাঠনির্দেশ সজ্[illegible] [illegible] পাঠক যাহাতে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে এবং নিজের স্বাধীন মত [illegible] পারে, সে কাজে তিনি সাহায্যের ত্রুটি করেন নাই। ইহার পরও [illegible] শেষে তিনি লিখিয়াছেন, '...আমার কোনও কথাই শেষ কথা নয়।... [illegible] কাঠামো রচনার প্রয়াস সত্যে পৌঁছিবার নিম্নতর স্তর: এই স্তর যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে সত্যে পৌঁছিতে কিছুমাত্র সহায়তা করে, তবেই আমার

দেশের এবং আমার জাতির এই ইতিহাস-রচনা সার্থক।' ইহাই তো যথার্থ ঐতিহাসিকের, যথার্থ জ্ঞানীর উক্তি।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার সুবিস্তৃত বিষয়সূচী এবং গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় না পড়িলে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না; সে-সম্বন্ধে পরিচয়-পত্রে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের দু'একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আবশ্যক।

এই গ্রন্থ আমাদের একটি নূতন জিনিস দিতেছে। বাংলা দেশের যে 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রী' অর্থাৎ জড় ঘটনাগুলি আমরা পূর্বসূরীদের গবেষণার ফলে প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে আজ জানিতে পারিয়াছি সেই ঘটনাগুলির মূল কারণ কি কি, কোন্ কোন্ শক্তির প্রভাবে আমাদের জনসমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বর্তমানের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং সেই সেই শক্তিগুলি কি প্রণালীতে কোন্ কোন্ সুযোগে কাজ করিয়াছে, গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় নীহাররঞ্জন সর্বত্র তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ইংরাজিতে যাহাকে বলে 'the why and how of the people's evolution', তাহাই গ্রন্থকার বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্র, দৈনন্দিন জীবন, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্মকর্ম যখনই যাহার আলোচনা তিনি করিয়াছেন, প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে কাহার কি সম্বন্ধ তাহার বিচার ও আলোচনাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তাহাই এই গ্রন্থের সুগভীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই বাঙালী জাতির অভিব্যক্তির সর্বাঙ্গ চিত্রটি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে নীহাররঞ্জন যে-ভাবে আমাদের প্রাচীন জীবনপ্রবাহের সমগ্র ধারাটিকে, 'বাঙালী জীবনের মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে' ধরিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথ্যের ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া এমনভাবে এত বড় ও সার্থক চেষ্টা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই। ঐতিহাসিকের কর্তব্য-জ্ঞানের ও সামাজিক অনুভূতির এমন পরিচয় আমাদের দেশে ইতিহাস-চর্চায় বিরল, অথবা নাই বলিলেই চলে।

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য, দেশের ও দেশের জনসাধারণের প্রতি নীহাররঞ্জনের গভীর অনুরাগ। তথ্যবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ভিতরেও সেই অনুরাগ ধরা না পড়িয়া যায় নাই। আর, সেই অনুরাগ হৃদয়ে না থাকিলে গ্রন্থকার হয়ত এই বিরাট গ্রন্থ-রচনার অনুপ্রেরণাই পাইতেন না।

তথ্যবিবৃতি বা আলোচনায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতি কোথাও নাই এমন কথা আমি বলিতে পারি না, গ্রন্থকারও সেই দাবি করেন নাই এবং কেহই তাহা করিবেন না। ছিদ্রান্বেষী হইলে তেমন ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু কিছু ধরা পড়িবে, বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই ধরনের দৃষ্টি লইয়া এ-গ্রন্থ যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হইবেন: তাঁহাদের কাছে এই গ্রন্থের অপূর্বত্ব ও গভীর মহিমা ধরা পড়িবে না। সেই মহিমাই বিচারের বস্তু, ছিদ্রগুলি নয়।

এই বিরাট অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থখানি বড় আকারে প্রায় নয়শত পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। এখানি আদিপর্ব মাত্র, অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় পর্যন্ত পৌঁছিয়া এই খণ্ডের গ্রন্থকার থামিয়াছেন। মুসলিম

ও ইংরাজ যুগে এই ধরনের বাঙালীর ইতিহাস রচনা এখনও বাকি আছে। একজন লোকের জীবনে, অথবা একজন পণ্ডিতের একক শ্রমে কি তাহা এই আদিপর্বের মত সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করা সম্ভব হইবে? নীহাররঞ্জন অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করি, ভগবান তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দান করুন যাহার বলে তিনি বাকি দুই যুগের ইতিহাসও এমনই সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার কীর্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

যদি কেহ এই গ্রন্থের অন্ধকার অংশগুলি পড়িয়া অসন্তুষ্ট হন তবে তিনি Coulton-প্রণীত *Social Life in Medieval England* (1916) গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখুন। পেঙ্গুইন-সিরিজে নব-প্রকাশিত *Britain under the Romans* বইখানাও পড়িয়া দেখুন। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ দেশে ঐ প্রাচীন যুগেও কত অধিক পরিমাণে এবং কত বিচিত্র ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে; তাহার তুলনায় বাংলা দেশের হিন্দুযুগের নিদর্শন অত্যন্ত স্বল্প। এরূপ উপাদানবৃক্ষহীন ঐতিহাসিক মরুভূমিতে নীহাররঞ্জন যে ফসল ফলাইয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্য ও সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে আমার দুইটি মন্তব্য গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়কেই জানাইতেছি। প্রথমত, সরল বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনধিক ২৫০ পৃষ্ঠায় একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ অবিলম্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত, এবং মূল্যেও তাহা সহজলভ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে সঙ্গে অনধিক ৩৫০ পৃষ্ঠায় ইহার একটি ইংরাজি সারাংশও প্রকাশিত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঐতিহাসিকেরা নিজ নিজ জাতির ইতিহাস রচনার একটি আদর্শ লাভ করিবে, যাহা এদেশের সাহিত্য ও ইতিহাস-চর্চায় একেবারেই নাই।

২০ আশ্বিন, ১৩৫৬ যদুনাথ সরকার

সূচীপত্র

নিবেদন

দশ বৎসর আগে, বাংলা ১৩৪৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমাকে অধরচন্দ্র-বক্তৃতামালায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে-কোনও একটি পর্ব বা দিক সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। সেই আহ্বানের উত্তরে 'বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো' একটি রচনা করিয়া পরিষৎ-মন্দিরে তাহা পাঠ করি, পর পর তিনটি বিশেষ অধিবেশনে। এই তিন অধিবেশনেই সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়, এবং তিন দিনই বক্তৃতার শেষে সভাপতির মন্তব্যে তিনি আমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করেন, এবং কাঠামোটিকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে রূপান্তরিত করিতে বলেন। সেই বক্তৃতা তিনটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পর সহৃদয় সতীর্থরাও অনেকে প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ এবং আচার্য যদুনাথের কথারই প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু, তখন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড রচনা ও সম্পাদনাধীন; কাজেই কাঠামোটিকে রক্ত-মাংসে ভরিয়া পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার কথা তখনও ভাবি নাই। স্বভাবতই মনে হইয়াছিল, সে-প্রয়োজন তো ঐ-গ্রন্থেই মিটিবে।

কিছুদিন পরই, বোধ হয় বাংলা ১৩৪৯ সালে, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করিল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায়। এ-গ্রন্থ বাংলার ও বাঙালীর মনীষার গৌরব, সন্দেহ নাই; তবু মনে হইল, আমার কাঠামোটি অবলম্বন করিয়া আদিপর্বের বাঙালীর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার প্রয়োজন বোধ হয় থাকিয়াই গেল। আমার এই ধারণা কতটা সত্য বা মিথ্যা তাহার বিচার এখন পাঠকদের হাতে। কিন্তু, আচার্য যদুনাথ ইতিমধ্যে একাধিকবার আমার কর্তব্য পালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং সে-কর্তব্য পালনের সুযোগও করিয়া দিলেন তদানীন্তন বাংলার রাজসরকার। রাজরোষে আমি বন্দী হইলাম। জেলখানায় সেই নির্বাধ অবসরে আমার মূল কাঠামোর দশটি সুদীর্ঘ অধ্যায় রচনা যখন শেষ হইল তখন একদিন হঠাৎ মুক্তি পাইলাম। ইহার কিছুকাল পরই 'বুক এম্পোরিয়মে'র তদানীন্তন কর্মকর্তা, বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে পাণ্ডুলিপি ঢুকিল প্রেসে; ভাবিলাম, ছাপার কাজ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর বাকি পাঁচটি অধ্যায়ের রচনাও অগ্রসর হইবে। তাহাই ধীরে ধীরে হইতেছিল; কিন্তু হঠাৎ একদিন ধূমায়িত সাম্প্রদায়িক বিরোধ অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া কলিকাতার জীবন বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এক বৎসরেরও অধিককাল একটি অক্ষরও ছাপা হইল না। আজ তাহার দুই বৎসর পর বাকি রচনা ধীরে ধীরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাপাও শেষ হইয়া গ্রন্থটি অবশেষে মুক্তিলাভ করিল।

আমিও মুক্তি পাইলাম বলিয়া মনে হইতেছে।

এ-গ্রন্থ রচনা যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন বাংলা দেশ অখণ্ড এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত; আজ গ্রন্থ-রচনা যখন শেষ হইল

রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছায় ও কূট কৌশলে দেশ তখন দ্বিখণ্ডিত এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার অনাদিকালের নাড়ীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে বাংলাদেশ কখনও এত গভীর ও ব্যাপক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় নাই। ইহার ফলে আজ বাঙালী জীবন যে-ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সপ্তম-অষ্টম শতকের মাৎস্যন্যায় এবং ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি -বিপর্যয়েও তাহা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সীমানার এপার-ওপার লইয়া বাংলাদেশ ও বাঙালী এক এবং অখণ্ড। এই গ্রন্থে আমি সেই এক এবং অখণ্ড দেশ ও জাতিরই ধ্যান করিয়াছি। অন্যতর ধ্যান সম্ভব নয়; বহুদিন পর্যন্ত তাহার সম্ভবও হইবে না।

যত অধ্যয়ন, বীক্ষণ, মনন, আলোচনা ও গবেষণাই এই গ্রন্থের পশ্চাতে থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানস্পৃহা আমাকে এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত করে নাই। প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেগে এবং স্বদেশব্রতের দুর্দম দুরন্ত নেশায় বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। তখন বিস্তৃত বাংলার কৃষকের কুটিরে, নদীর ঘাটে, ধানের খেতে, বটের ছায়ায়, শহরের বুকে, নির্জন প্রান্তরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায় এই দেশের এবং এই দেশের মানুষের একটি রূপ আমি দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। পরিণত যৌবনেও বারবার বাংলার ও ভারতবর্ষের এক-প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছি—নানা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে; আজও তাহার বিরাম নাই। যত দেখিয়াছি, যত নিকটে গিয়াছি, তত সেই ভালবাসা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। এই ভালবাসার প্রেরণাতেই আমি এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—ভালবাসাকে জ্ঞানের বস্তুভিত্তিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে, দেশকে আরও গভীর আরও নিবিড় করিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে। আমার বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি প্রাচীন পুঁথির পাতায় নাই, হৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত ও বিচরমাণ। প্রাচীন অতীত আজিকার সদ্য বর্তমানের মতই আমার কাছে সত্য ও জীবন্ত। সেই সত্য জীবন্ত অতীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্থে—মৃতের কঙ্কালকে নয়।

দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশচ্ছেদ, প্রান্তীয় দ্বেষ ও হিংসা, চারিত্রদৈন্য, আর্থিক দুর্গতি প্রভৃতি সকল শত্রু মিলিয়া আজ বাংলাদেশকে এবং মূঢ়, আশাহত বাঙালী জাতিকে চরম দুর্গতির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই চরম দুর্গতি আজ দৈহিক যন্ত্রণার মত আমার এবং আমার মত অনেকের সমস্ত দেহমনকে উৎপীড়িত করিতেছে। এই সময়ে যে এই গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ। এই গ্রন্থ যদি বাঙালী জাতির প্রাণে কিছু আশার সঞ্চার করিতে পারে, ভবিষ্যতের কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে, দেশ ও জাতির প্রতি কিছু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগাইতে পারে, নিজেদের কিছু সত্য পরিচয় চিত্তের নিকটতর করিতে পারে এবং সেই ভালবাসা ও পরিচয়ের সম্পদ লইয়া বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে আত্মীয়-বন্ধনে নিজেকে বাঁধিতে পারে, তাহা হইলেই ঐতিহাসিকের চরম পুরস্কার ও সার্থকতা লাভ ঘটিয়া গেল। আর কিসেরই বা প্রয়োজন!

দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, দীর্ঘতর কাল ব্যাপিয়া গ্রন্থের বিষয়বস্তু ধ্যান করিয়াছি, সতীর্থ ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, পূর্বগামী ও সমসাময়িক পণ্ডিতমনীষীদের রচনার মধ্যে বিচরণ করিয়াছি। তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া ঋণ শোধ করিবার ইচ্ছাও আমার নাই। তবু যতটা সম্ভব যথাস্থানে নামোল্লেখ ও ঋণস্বীকারের ত্রুটি করি নাই। তাহা সত্ত্বেও হয়তো এমন অনেকেই রহিলেন যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই; তেমন হইয়া থাকিলে আমার একান্ত অনিচ্ছা ও অনবধানতাবশতই হইয়াছে। তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আমার এই ত্রুটি মার্জনা করেন। অনেক সতীর্থ, এবং এই পথের পথিক নহেন এমনও অনেকে, সহৃদয় বন্ধুবৎসলতায় দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া ধৈর্য ধরিয়া এই গ্রন্থের অনেক অংশের পাঠ শুনিয়াছেন, তর্ক করিয়াছেন, আলোচনা করিয়াছেন আমাকেই বাধিত ও উপকৃত করিবার জন্য। তাঁহাদের সকলকে আজ আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর, বন্ধুত্বের যাহা ঋণ তাহা তো শোধ করা যায় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙালী জাতির গৌরবময় প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ও উহার কর্মকর্তারাই আমাকে প্রাথমিক কাঠামো রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন; সেই প্রবর্তনারই পরিণতি এই গ্রন্থ। আজ গ্রন্থ-রচনা যখন শেষ হইল তখন পরম শ্রদ্ধায়, সকৃতজ্ঞ অন্তরে পরিষৎ ও পরিষৎ-কর্মকর্তাদের স্মরণ করিতেছি, এবং সর্বাগ্রে এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি।

এই গ্রন্থ-রচনায় একজন মহদাশয় মনীষীর প্রেরণা ও উৎসাহ কিছুতেই উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রেরণা ও উৎসাহ আগাগোড়া দীপ্যমান না থাকিলে এ-গ্রন্থ রচনা শেষ হওয়া দূরে থাক, সূত্রপাতই হয়তো হইত না। তাঁহার ইতিহাস-ধ্যানের আদর্শ, তাঁহার স্নেহ ও শুভেচ্ছা আমার জীবনের পরম ঐশ্বর্য। তাঁহার কাছে সত্যই আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। তিনি কৃপাবশে পরম স্নেহে এই গ্রন্থের একটি পরিচয়-পত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন; তাহাই ইহার শিরোভূষণ।

আমার সকল কর্মপ্রচেষ্টায় এবং ধ্যান ও মননে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাইয়া আসিতেছেন শ্রীমতী মণিকা দেবী; এই গ্রন্থের পশ্চাতেও সে-প্রেরণা ও উৎসাহ অনুক্ষণ জাগ্রত ছিল। সাংসারিক ক্ষয় ও ক্ষতি যাহা তাহাও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই।

আমার স্নেহাস্পদ প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান প্রভাসচন্দ্র মজুমদার ও সুনীলকুমার রায় এই গ্রন্থের নাম-সূচী সংকলনে আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমার একান্ত শুভকামনা ও সস্নেহ আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী, সোদরোপম শ্রীমান পুলিনবিহারী সেন এবং আমার প্রীতিভাজন প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক শ্রীমান সুধীররঞ্জন দাশ নানাদিক দিয়া আমার শ্রমলাঘব করিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়-বন্ধন এত ঘনিষ্ঠ যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সে-বন্ধনের অমর্যাদা করিব না।

গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যাপারে শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, প্রফুল্লকুমার বসু,

শান্তি দত্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ ও আশুতোষ-চিত্রশালার কর্মকর্তারা নানাভাবে আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সে-ঋণ শোধ করা যায় না।

এই ধরনের তথ্যবহুল ও গবেষণানির্ভর গ্রন্থে সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পাদটীকা থাকার প্রচলিত রীতি আমার অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত নয়; তবু, আমি পাদটীকা ব্যবহার করি নাই, অধ্যায়-শেষে এক-একটি করিয়া সংক্ষিপ্ত পাঠপঞ্জী দিয়াছি মাত্র। আমার যুক্তি এই যে, সাধারণ পাঠক যাঁহারা তাঁহাদের পাদটীকার প্রয়োজন নাই, তথ্য জানাতেই তাঁহাদের আগ্রহ এবং তথ্যবিবৃতিই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। পাদটীকা-কণ্টকিত গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের বিরাগ সর্বজনবিদিত। আর, যাঁহারা পণ্ডিত ও গবেষক, যাঁহারা তথ্যের মূল পর্যন্ত পৌঁছিতে চাহেন, তাঁহাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, এই গ্রন্থে এমন কোন উপাদান আমি ব্যবহার করি নাই, এমন কোন তথ্য বহন করিয়া আনি নাই যাহা তাঁহাদের কাছে অজ্ঞাত, যাহা এতদিন ছিল লোকচক্ষুর অগোচরে বা যাহা ছিল অনাবিষ্কৃত। আমি সুজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত, অনাদৃত ও অবহেলিত তথ্যগুলি নূতন করিয়া সাজাইয়াছি মাত্র, নূতন শৃঙ্খলায় বাঁধিয়াছি মাত্র, নূতন অর্থনির্দেশ সন্ধান করিয়া নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি মাত্র। তাহার জন্য তো পাদটীকার অলঙ্কার, পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া, এইটুকুই শুধু বলিতে পারি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণকেই আমি সজ্ঞানে বিকৃত করি নাই বা এমন কোন উপাদান ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যবহার করি নাই যাহা অবিসংবাদিতভাবে মিথ্যা বা অগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেখানে সংশয় বিদ্যমান অথবা যাহা শুধু অনুমান সেখানে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রাখিতে ত্রুটি করি নাই। গ্রন্থশেষে প্রাচীন বাংলার লিপিমালার একটি পঞ্জীও সংকলন করিয়া দিয়াছি: যাঁহাদের প্রয়োজন তাঁহারা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

প্রুফ্-সংশোধন ব্যাপারে আমি বরাবরই অত্যন্ত অপটু; তাহা ছাড়া, এই ধরনের গ্রন্থে সে-কাজ আগাগোড়া নিজে একা করা ছাড়া উপায় ছিল না, এবং তাহাও অন্য নানা কাজের ভিড়ের মধ্যে। সেই কারণে, এবং কিছুটা নিজের অজ্ঞতা এবং অনবধানতায় কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও অন্যান্য নানা প্রকারের ভুলচুক থাকিয়া গেল। তবে, আশা করি, তথ্যগত মারাত্মক ভুল, অথবা এমন ভুল যাহাতে ব্যাখ্যা বা অর্থই হইয়া যায় বিপরীত, তেমন বেশি নাই। যদি থাকে সহৃদয় পাঠক দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে উপকৃত হইব, এবং পরবর্তী সংস্করণে সঋণস্বীকার তাহা সংশোধন করিতে পারিব। তবু, গ্রন্থান্তে একটি সংশোধন ও সংযোজন জুড়িয়া দিয়া অপরাধ কিছুটা ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছি: কৌতূহলী পাঠক আগেই তাহা দেখিয়া যথাস্থানে সংশোধন করিয়া লইবেন। আর যাহা বাকি রহিল তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া উপায় নাই। ইতি

৩০ আশ্বিন, ১৩৫৬ নীহাররঞ্জন রায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষেপিত সংস্করণের ভূমিকা

মূল 'বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব' প্রকাশের সময়ই গ্রন্থকার ও প্রকাশকের প্রতি আচার্য যদুনাথের অন্যতম নির্দেশ ছিল এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করার। আচার্য যদুনাথের নির্দেশ শিরোধার্য মানিয়াও বার বার মনে হইয়াছে কাজটি আমার সীমিত সময় ও সাধ্যের অতীত। তাই তাঁহার প্রস্তাবে সাগ্রহ সম্মতি থাকা সত্ত্বেও নিজের ক্ষুদ্রশক্তিতে সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার সুযোগ বা অবকাশ আমার হয় নাই।

অবশ্য ইতিপূর্বে প্রকাশিত কিশোর-সংস্করণে এই সার-সংক্ষেপের একটা আংশিক প্রচেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বলিতে বাধা নাই, উহা মূলগ্রন্থের রেখাচিত্র মাত্র, প্রমাণপঞ্জীনির্ভর পূর্ণাংগ তথ্যবিবৃতি নয়। সেই রেখাচিত্রটি বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের চিত্তকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করিতে কিছুটা সহায়তা করিলেও সাধারণ পাঠকের জিজ্ঞাসা মিটাইবার উপকরণ সেখানে নাই। অবশ্য সে-উদ্দেশ্যও ঐ কিশোর-সংস্করণের ছিল না। সেই হিসাবে আচার্য যদুনাথের নির্দেশ এতদিন অপরিপূর্ণই ছিল।

বর্তমান সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য, মূলগ্রন্থের তথ্য ও যুক্তিকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া, প্রমাণপঞ্জীর বিচার ও আলোচনাকে এতটুকু উপেক্ষা না করিয়া, এমন কি মূলের ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গিকে অবিকৃত রাখিয়া এই সংক্ষেপকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক দিক হইতে বিবেচনা করিলে, বর্তমান সংস্করণ মূলগ্রন্থ অপেক্ষাও সংহত ও দৃঢ়নিবদ্ধ। সংহত উপস্থাপনের ফলে সংক্ষেপিত সংস্করণে তাই মূলগ্রন্থের যুক্তি ও প্রমাণ আরও স্বচ্ছ এবং স্বয়ংপ্রভ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বহুবিলম্বিত এই সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশের ফলে এতদিনে যে আচার্য যদুনাথের একটি নির্দেশ প্রতিপালিত হইল তাহা আমার পক্ষে গভীর সন্তোষের বিষয়। মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ দীর্ঘদিন যাবৎ নিঃশেষিত। সে-হিসাবে 'বাঙালীর ইতিহাস'-এর অনুরাগী পাঠকসম্প্রদায়ের প্রতি আমার একটা দায়িত্বও ছিল। লেখক-সমবায়-সমিতি বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করিয়া আমাকে দায়িত্বমুক্ত করিলেন, সেজন্য সমিতি আমার ধন্যবাদভাজন।

নীহাররঞ্জন রায়

সংক্ষেপকারের বক্তব্য

সংক্ষেপিত সংস্করণের আয়তন কী কারণে প্রত্যাশিত মাত্রা ছাড়াইয়া গেল, সে সম্পর্কে একটু কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

প্রথমত, বর্তমান সংস্করণ মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার বা রেখাচিত্র মাত্র নয়, —যুক্তিসূত্রে গ্রথিত প্রমাণপঞ্জীনির্ভর পূর্ণাঙ্গ তথ্যবিবৃতি। প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের যে সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ মূলগ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সমসাময়িক বাঙালীর সমগ্র জীবনধারার যে ব্যাপক পরিচয় গ্রন্থকারের অন্বিষ্ট, সূত্রাকারে উপস্থাপন করিলে সেই অখণ্ড দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা ছিল।

দ্বিতীয়ত, মূলগ্রন্থের যুক্তিবিন্যাসপদ্ধতিই এমন যে তথ্যসন্নিবেশে ও প্রমাণপ্রয়োগে প্রতিটি অধ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই কারণে মূলগ্রন্থের তিনটি অধ্যায় (১. বাংলার নদনদী; ২. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ; ৩. প্রাচীন বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন) বিশেষ কোন পরিবর্তন ছাড়াই স্বতন্ত্র পুস্তিকা-রূপে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ পুস্তিকামালায় প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছিল। স্বতন্ত্র অধ্যায়গুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। পুনরাবৃত্তি বর্জন করিলে সেইসব অধ্যায়ের কার্য-কারণ-সম্বন্ধগত যুক্তিপারম্পর্য ব্যাহত হইত।

তৃতীয়ত, মূলগ্রন্থটি ইতিহাস হইলেও সাহিত্য। নীহাররঞ্জনের দৃষ্টিতে ইতিহাস প্রাণহীন, নীরব, নীরস তথ্যমাত্র নয়, তাহা হৃদয়ের স্পর্শে সজীব, মুখর ও সরস। প্রাচীন বাংলার জীবন্ত অতীতকে তিনি প্রাণবন্ত রূপে ধরিতে চাহিয়াছেন একান্ত আন্তরিক অনুরাগে, হৃদয়ের উত্তপ্ত আবেগে। এই অনুরাগরঞ্জিত মানবিক বোধই মূলগ্রন্থকে সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করিয়াছে। সাহিত্য-মূল্যের প্রতি পক্ষপাতবশত, কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর সংক্ষেপের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, ইতিহাসের সজীব মুখরতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া গ্রন্থের কলেবর-হ্রাসে আমি স্বভাবতই কুণ্ঠিত হইয়াছি।

বস্তুত, মূলগ্রন্থের প্রাণহীন নিরুত্তাপ কঙ্কালটুকু পরিবেশন আমার উদ্দেশ্য ছিল না। নীহাররঞ্জনের আবেগদীপ্ত সামাজিক অনুভূতিকে পাঠক-হৃদয়ে যথাসাধ্য সঞ্চারিত করার আকাঙ্ক্ষাই আমাকে সংক্ষেপকার্যে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তথাপি মূলগ্রন্থের ব্যঞ্জনা ও দীপ্তি যদি কোথাও ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে তবে সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

জ্যোৎস্না সিংহ রায়

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের যুক্তি

এক

বাংলার ইতিহাস ও বাঙালীর ইতিহাসের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, এ কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবু বাঙালীর ইতিহাস যখন বলিতেছি তখন তাহার কারণ নিশ্চয়ই একটু আছে।

এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে অনেক গবেষকের সম্মিলিত চেষ্টা ও সাধনার ফলে আজ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আমাদের কাছে অল্পবিস্তর সুপরিচিত; অন্তত মোটামুটি কাঠামো সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা কিছু নাই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যাহা জানিবার সুযোগ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাচীন রাজবংশাবলীর কথা—রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়পরাজয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি এবং রাজকর্মচারীদের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ। কোনও কোনও পণ্ডিত মনীষী সমাজ সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমাজ সর্বত্রই বর্ণাশ্রমবদ্ধ সমাজ এবং তাঁহাদের আহৃত সমাজ-সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর বর্ণের সমাজ-সংবাদ। এ যাবৎ 'সমাজ' কথাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে, উচ্চতর বর্ণ-সমাজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং সে সংবাদও অত্যন্ত অপ্রচুর। মোটামুটি ইহাই ছিল কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাংলার ইতিহাসের উপাদান।

অবশ্য ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের কিছু কিছু জানিবার সুযোগ আছে। শিল্প,- সাহিত্য, ভাষা ও ধর্ম -সংপৃক্ত সংবাদ আহরণ ও আলোচনায় পণ্ডিত ও মনীষীরা নানাদিকে উল্লেখযোগ্য উদ্যম প্রকাশ করিয়া বাংলার ইতিহাসের সীমা ও পরিধি বিস্তৃত করিয়াছেন। ফলে, প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে আজ আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি অনেকটা সুস্পষ্ট। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও এ কথা সত্য ছিল যে, প্রাচীন বাংলার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ একটা রূপ কেহই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতাম তাহার অধিকাংশই বর্ণ-ধর্মের কথা—সে ধর্ম বৌদ্ধই হউক আর পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মই হউক—, সভাশিল্প বা নাগর সমাজের অভিজাত শিল্পের কথা, সংস্কৃত সভা-সাহিত্যের কথা। লোকধর্ম, লোক-শিল্প, লোকসাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা বহুদিন একেবারে সজাগই ছিলাম না।

বহুদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না...।" তিনি শুধু রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস-রচনা কামনা করেন নাই; চাহিয়াছিলেন বাংলার সেই ইতিহাস যে-ইতিহাস বলিবে ...রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। রাজ-সৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি?

...কতপ্রকার রাজকর্মচারী ছিল...? কে বিচার করিত...রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদের সুখ দুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য এ সকল কিরূপ ছিল?...কোন্ ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল?... তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্মভয় কিরূপ... বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত?...ভিন্ন দেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য কি প্রকারে নির্বাহ হইত?'

ইতোপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুযোগ্য সম্পাদনায় এবং প্রভূত শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ইংরাজি ভাষায় রচিত প্রাচীন বাংলার পরিপূর্ণ, তথ্যবহুল একটি সামগ্রিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনারম্ভেই যে অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে, এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে সেই অভাব কিছুটা মিটিয়াছে, এ কথা বোধ হয় বলা যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলার এই ইতিহাসকে বাঙালীর ইতিহাস বোধ হয় বলা চলে না। কারণ প্রথমত, ইতিহাসের কোন যুক্তি, কার্যকারণসম্বন্ধের কোনও ব্যাখ্যা বা ইঙ্গিত এই ইতিহাস-পরিকল্পনার পশ্চাতে নাই; এবং তাহা না থাকিবার ফলে এই গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর সমগ্র জীবনধারার যথার্থ পরিচয় ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন বাংলায় যাঁহাদের বলা হয় জনসাধারণ, যাঁহারা বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাহিরে অথবা বৌদ্ধধর্মের বাহিরে, যাঁহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্পভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক তাঁহাদের কথা এই গ্রন্থে যথেষ্ট স্থান পায় নাই: অথচ তাঁহারাই যে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এ সম্বন্ধে তো সন্দেহ নাই। যে লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী, গ্রাম্য জনসাধারণের জীবনযাত্রা, গ্রামের সঙ্গে নগরের পার্থক্য ও যোগাযোগের অধিকতর তথ্য, যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সমগ্র জীবনধারা প্রবহমান তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রভৃতি জনসাধারণের এই ইতিহাসকে পূর্ণতর ও উজ্জ্বলতর করিতে পারিত, তাহা পরিপূর্ণ মর্যাদায় এই গ্রন্থভুক্ত হইতে পারে নাই। তৃতীয়ত, এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায় বিচ্ছিন্ন; একে অন্যের সঙ্গে অপরিহার্য অনিবার্য সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত নয়। ফলে, রাজা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন দিকের যোগাযোগ প্রায় অস্পষ্ট। সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রের এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধের ইঙ্গিত অত্যন্ত কম। ধর্ম, সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে রাজা ও রাষ্ট্রের এবং বর্ণ-বিন্যস্ত, শ্রেণী-বিন্যস্ত বৃহত্তর সমাজের সম্বন্ধ-নির্ণয়ের চেষ্টাও যথেষ্ট নয়।

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আর্থিক বিন্যাস প্রভৃতি সমস্ত কিছুই গড়িয়া তোলে মানুষ: এই মানুষের ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। এই মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ; তাহার একটি কর্ম অন্য আর একটি কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে দেখা ও পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না—একটি কর্মের সঙ্গে অপরাপর কর্মকে যুক্ত করিয়া দেখিলে তবে তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। দেশকালধৃত মানুষের সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা সত্য এবং সর্বত্র স্বীকৃত। এই সত্য স্বীকৃতি না পাইলে ইতিহাস যথার্থ ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারে না।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির যুক্তি না তুলিয়াও বলা যায়, ঊনবিংশ শতকের মধ্যপাদ হইতেই মানবিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও

আলোচনায় এই সত্য স্বীকৃত যে, মানুষের সমাজই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকৃতির উৎস, এবং সেই সমাজের বিবর্তন-আবর্তনের ইতিহাস দেশকালধৃত মানব-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে। আমাদের দেশে ইতিহাসালোচনায় এই সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টি ও আলোচনাপদ্ধতি আজও পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। রাজ-কাহিনী এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকাহিনী আজও আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণা ও আলোচনার একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অথচ দেশে রাজা বা রাজপাদোপজীবী কয়জন? যুদ্ধবিগ্রহ নিত্য হইত না, সমগ্র ইতিহাসে তাহার স্থান কতটুকু? আজিকার দিনের সামগ্রিক যুদ্ধের মতো তখনকার দিনের যুদ্ধবিগ্রহ সমাজের মূল ধরিয়া টান দিত না। যুদ্ধের ফলাফল নিকট ও দূর ভবিষ্যৎকে একান্তভাবে রূপান্তরিতও করিতে পারিত না। রাজা ও রাজসভার বাহিরে ছিল অগণিত জনসাধারণ, বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত, বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা শাসিত, বিভিন্ন শ্রেণীর সীমায় সীমিত। তবু, বর্তমান কালে রাষ্ট্র যতটা সর্বগ্রাসী, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রাচীনকালে এমনটি এতটা হইবার সুযোগ ছিল না।

আসল কথা, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্র সমগ্র সমাজব্যবস্থার রক্ষক ও নিয়ামক মাত্র। সমাজ আছে বলিয়াই রাষ্ট্র এবং রাজাও আছেন। রাজা ও রাষ্ট্রের পক্ষে ধন যেমন অপরিহার্য, সমষ্টির পক্ষেও তাহাই। ধনব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা, শ্রেণীব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা সমস্তই সামাজিক ধনকে কেন্দ্র করিয়া। এই ধন উৎপাদনের তিন উপায় প্রাচীন বাংলায় দেখিতে পাওয়া যায়—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এই তিন উপায় তিন শ্রেণীর করায়ত্ত—ভূমিবান শ্রেণী, শিল্পী শ্রেণী, বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই তিন উপায়ে উৎপাদিত অর্থদ্বারা সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিপালিত হইত এবং এই তিন শ্রেণী ও রাষ্ট্র মিলিয়া উৎপাদিত ধন বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেন। কাজেই, রাজা ও রাষ্ট্র ছাড়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই তিন শ্রেণীর অর্থাৎ ধনোৎপাদক শ্রেণীর একটা বিশেষ স্থান ছিল। অথচ, ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানিবার সুযোগ নাই।

আবার, ধনোৎপাদক শ্রেণী ও কৃষিশ্রমিকদের জীবনাচরণ যে শুধুই ধনসর্বস্ব, ধনকেন্দ্রিক ছিল, এ কথা বলা চলে না। ইঁহাদের রক্ষা ও পালন যাঁহারা করিতেন সেই রাজা ও রাজপাদোপজীবীদের জীবনে ধর্ম ও শিল্পের, শিক্ষা ও সাহিত্যের, এক কথায় সংস্কৃতিরও প্রয়োজন ছিল। সেই সংস্কৃতি স্বভাবতই এমন হওয়া প্রয়োজন ছিল, যাহা তদানীন্তন সমাজসংস্থানের পরিপন্থী নয়। এই সংস্কৃতির পুষ্টি ও পালন ধনসাপেক্ষ; সেই ধন সমাজের উদ্বৃত্ত ধন। সেই ধনের কিয়দংশ যাঁহারা দিতেন ও দিতে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারাই পরোক্ষভাবে উচ্চতর সমাজস্তরের সংস্কৃতির আদর্শ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করিতেন। অপরোক্ষভাবে ইহাকে রূপদান করিতেন সমাজের বুদ্ধিজীবীরা—ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদেরা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলকরা এবং ইঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ- বা পৌরাণিক-ব্রাহ্মণ্য -ধর্মাশ্রয়ী। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ইঁহাদের বর্ণ- ও শ্রেণী -গত স্থান ও ব্যবহার, রাষ্ট্রের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ, ধনোৎপাদক ও বণ্টক শ্রেণীদের সঙ্গে সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লইবার সুযোগ আজও কম। ইঁহারা ছাড়া, সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে নিরক্ষর জনসাধারণেরও একটা মানস-জীবন ছিল, সংস্কৃতি ছিল। এ সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান স্বল্পই। অথচ, ইঁহারাও

সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ এবং এই সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ ও ইতিহাস বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কথা।

রাজা, রাজপাদোপজীবী, শিল্পী, বণিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ভূমিবান প্রভৃতি শ্রেণীর সেবার জন্য ছিল আবার অগণিত জনসাধারণ—নানা শ্রেণীর, নানা বৃত্তির সমাজসেবক ও সমাজশ্রমিক শ্রেণীর অসংখ্যাতর 'ইতর' জন—প্রাচীন লিপিমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে 'অকীর্তিত' বা অনুল্লিখিত জনসাধারণ। এই অকীর্তিত জনসাধারণও সমাজের অঙ্গবিশেষ, ইঁহাদেরও ধর্মবিশ্বাস ছিল, দেবদেবী ছিল, পূজানুষ্ঠান ছিল, সংস্কৃতির একটা ধারা ছিল। অথচ, ইঁহাদের কথাও আমরা কমই জানি।

কাজেই রাজা, রাষ্ট্র, রাজপাদোপজীবী, শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠী, মানপ, ভূমিবান মহত্তর, ভূমিহীন কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবক, সমাজশ্রমিক, 'অকীর্তিতান্ আচণ্ডালান্' প্রভৃতি সকলকে লইয়া প্রাচীন বাংলার সমাজ। ইঁহাদের সকলের কথা লইয়া তবে বাঙালীর কথা, বাঙালীর ইতিহাসের কথা।

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন,...'বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙালী জনসাধারণের কথা।' এই বাঙালী জনসাধারণের কথা এযাবৎ বাংলার ইতিহাসে সম্যক কীর্তিত হয় নাই।

দুই

কেন হয় নাই তাহার কারণ খুঁজিতে বেশি দূরে যাইতে হয় না। বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পাইয়াছি সমসাময়িক য়ুরোপীয়, বিশেষভাবে ইংরাজি ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণার রীতি-পদ্ধতি ও আদর্শ হইতে। এই আদর্শ, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তভাবেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং রাজা ও রাষ্ট্রই এই গবেষণার কেন্দ্র। সামাজিক চেতনা এই আদর্শ ও পদ্ধতিকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। রাষ্ট্রের পশ্চাতে যে বৃহত্তর সমাজ, সমাজের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ স্বার্থের লীলাধিপত্য, সমাজবিকাশের অমোঘ নিয়মের বশেই যে রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি তাহা এই পদ্ধতিতে ধরা পড়ে না।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই য়ুরোপের কোথাও কোথাও, বিশেষভাবে অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে, সমাজবিকাশের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সূত্রপাত হয় এবং তাহার ফলে সর্বত্র পণ্ডিতসমাজ এ কথা স্বীকার করিয়া লন যে, ধনোৎপাদনের প্রণালী ও বণ্টনব্যবস্থার উপরই বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের বৃহত্তর সমাজ-সংস্থান নির্ভর করে, বিভিন্ন বর্ণ, শ্রেণী ও স্তর এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া ওঠে। এই ব্যবস্থাকে রক্ষণ ও পালন করিবার জন্যই রাজা ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়; এবং এই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিবার জন্যই একটি বিশেষ সংস্কৃতির উদ্ভব ও পোষণের প্রয়োজন হয়। সমাজবিকাশের এই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বিংশ শতকের প্রথম পাদে ক্রমশ ইংলণ্ডেও প্রবর্তিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণায় এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও ইঙ্গিত বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেও ধরা পড়ে নাই।

উপরোক্ত ধ্যান-ও-ধারণাগত কারণ ছাড়া সমগ্র জনসাধারণের ইতিহাস রচিত না

হওয়ার একটা বস্তুগত কারণও আছে—তাহা জনসাধারণের ইতিহাস-রচনার উপযোগী উপাদানের প্রভাব। রাজা, রাজবংশ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাদর্শ ইত্যাদির কথাই প্রভৃত ... তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তবে আজ আমরা এতদিন পর আমাদের ইতিহাসের অল্পবিস্তর স্পষ্ট একটা রূপ দেখিতে পাইতেছি। এখনও এমন কাল ও এমন দেশখণ্ড আছে যাহার ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধেই যেখানে এই অবস্থা, সেখানে বৃহত্তর সমাজ ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে উপাদানের অপ্রাচুর্য থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী!

উদাহরণত, বাংলার রাষ্ট্র ও রাজবংশাবলীর ইতিহাসের বেশির ভাগ উপাদান জোগাইয়াছে প্রাচীন লেখমালা। ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় রাজসভাকবিবিরচিত রাজার বা রাজবংশের প্রশস্তি বা কোন ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিল, অথবা কোনও মূর্তি বা মন্দিরে উৎকীর্ণ উৎসর্গলিপি। লেখমালার উপাদান ছাড়া কিছু কিছু সাহিত্যজাতীয় উপাদানও আছে; ইহাদের অধিকাংশই আবার রাজসভার সভাপণ্ডিত, সভাপুরোহিত বা রাজগুরু দ্বারা রচিত স্মৃতি, ব্যবহার ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থ। ইহা ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশের সমসাময়িক লিপিমালা ও গ্রন্থাদি হইতে কিছু উপাদান পাওয়া যায়। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী এবং তিব্বতে ও নেপালে প্রাপ্ত ধর্ম- ও সম্প্রদায় -গত বিভিন্নবিষয়ক পুঁথিপত্র হইতেও কতক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এগুলির স্বরূপও প্রায় একপ্রকারের। কারণ বিদেশী পাশ্চাত্ত্য ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকের রচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকের শ্রেণী- ও সম্প্রদায় -গত স্বার্থ-দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আর তিব্বতে-নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি তো একান্তভাবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্রছায়ায় বসিয়াই লেখা হইয়াছিল। এই অবস্থায়, রাজা, রাজবংশ, রাষ্ট্র ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস রচনার উপাদানই তো অপূর্ণ ও অপ্রচুর, সামাজিক ইতিহাসের তো কথাই নাই।

অথচ, এই উপাদানগুলিই বাংলার বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসেরও উপাদান। সমাজ সম্বন্ধে যে সংবাদ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা যে শুধু পরোক্ষ, অপূর্ণ ও অপ্রচুর তাহাই নয়, কতকটা একদেশীয়, একপক্ষীয় হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমত সামাজিক ইতিহাসের সংবাদ দেওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়ত, যেহেতু স্বভাবতই এইসব উপাদানের উৎপত্তিস্থল হইতেছে রাজসভা, অভিজাত সম্প্রদায় বা ধর্মগোষ্ঠী, সেইহেতু অপক্ষপাত দৃষ্টিও তাহার মধ্যে নাই। তাহা ছাড়া, প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস রচনায় যে সাহায্য সমকালীন ধর্ম, স্মৃতি, সূত্র ও অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থাদি হইতে পাওয়া যায়, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস রচনায় সেই ধরনের সাহায্য একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। এইসব কারণেও যথার্থ বাঙালীর ইতিহাস রচনার দিকে আমাদের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

তিন

বস্তুত, সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস। এই সমাজ-বিন্যাসের বস্তুগত ভিত্তি, সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণী, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহাদের স্থান, তাহাদের দায় ও অধিকার, বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের

সংগে সমাজের সম্বন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগে সংস্কৃতির সম্বন্ধ, সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি ইত্যাদি সমস্তই প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের তথা জনসাধারণের ইতিহাসের আলোচনার বিষয়। আমার বিশ্বাস, সমাজতাত্ত্বিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক উপাদান সযত্নে বিশ্লেষণ করিলে আজ তাহার মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলা একেবারে অসম্ভব হয়তো নয়। বর্তমান গ্রন্থে তাহার চেয়ে বেশি কিছু করা হইতেছে না। ক্রমশ নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে, এবং আজ যাহা কাঠামো মাত্র, ক্রমশ আবিষ্কৃত উপাদানের সাহায্যে হয়তো সেই কাঠামোকে একদিন রক্তে মাংসে ভরিয়া সমগ্র একটা রূপ দেওয়া সম্ভব হইবে।

সমাজবিন্যাসের অথবা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ইতিহাস রচনার একটা সুবিধাও আছে, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচনায় যাহা নাই। রাষ্ট্রীয়, বিশেষভাবে রাজবংশের ইতিহাসে সন-তারিখ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য। এই ইতিহাসে ঘটনার মূল্যই সকলের চেয়ে বেশি এবং সেই ঘটনার কালপরম্পরার উপরই ইতিহাসের নির্ভর। সামাজিক ইতিহাস রচনায় এইজাতীয় ঘটনার মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম। রাজা বা রাজবংশের হঠাৎ পরিবর্তনে সমাজবিন্যাস রাতারাতি কিছু বদলাইয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বৃহৎ কিছু একটা উপপ্লব ঘটিলেই সমাজবিন্যাসও বদলাইয়া যায়; কিন্তু তাহাও একদিনে, দুই-দশ বৎসরে হয় না। বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে এই বিবর্তন চলিতে থাকে, সমাজপ্রকৃতির নিয়মে। প্রাচীন বাংলায় ঐতিহাসিক কালে এমন কোন সামাজিক উপপ্লব দেখা দেয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহ যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এইসব ঐতিহাসিক পরিবর্তন বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়া সমাজের মূল ধরিয়া টানিয়া সমাজবিন্যাসের চেহারাটাকে একেবারে বদলাইয়া দিতে পারে নাই। অদলবদল যে একেবারে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানের নিয়মের বশেই হইয়াছে। কাজেই, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের 'অজ্ঞাত যুগ' সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে একেবারে অজ্ঞাত নাও হইতে পারে।

অবশ্য সুবিধা যেমন আছে, তেমনই অসুবিধাও কম নাই। আগেই বলিয়াছি, জনসাধারণের ইতিহাস রচনার যেসব উপাদান আমাদের আছে, তাহার অধিকাংশই রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠীর আশ্রয়ে রচিত। কিন্তু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর যে অগণিত জনসাধারণ তাহাদের বা তাহাদের আশ্রয়ে রচিত কোনও উপাদানই আমরা পাই না কেন? চণ্ডাল পর্যন্ত যে অকীর্তিত জনসাধারণ তাঁহাদের কথা নাই বলিলাম, কিন্তু শিল্পী-মানপ-ব্যাপারী-বণিক-ক্ষেত্রকর প্রভৃতি সম্প্রদায় রাজসভা বা ধর্ম-গোষ্ঠী দ্বারা কীর্তিত বা কীর্তনযোগ্য বিবেচিত না হইলেও, ইঁহাদের সকলের দৈনন্দিন সুখদুঃখের, জীবনসমস্যার, নিজের বৃত্তি-সংপৃক্ত নানা প্রশ্নের এবং সাফল্য-অসাফল্যের প্রকাশ ও পরিচয় তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও ছিলই। কিন্তু তাহা কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। স্মৃতি-ব্যবহার-পুরাণ গ্রন্থাদিতে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর বর্ণসমাজের সংগে ইঁহাদের সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রসংগে। তাহা ছাড়া, রাজসভা ও ধর্মগোষ্ঠী উভয়েরই লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত; অথচ, এই 'দেবভাষা' যে প্রাকৃতজনের ভাষা ছিল না তাহা তো সর্বজনস্বীকৃত। প্রাচীন বাংলার প্রাকৃতজনের এই ভাষার বিশেষ কিছু পরিচয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। চর্যাগীতিগুলির ভাষা হয়তো দশম-দ্বাদশ শতকের এই প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু সন্ধ্যা-ভাষায় রচিত এই দোঁহা ও গানগুলিকে ঐতিহাসিক উপাদানরূপে পুরোপুরি গ্রহণ

করা সর্বত্র সম্ভব নয়। ডাক ও খনার বচনগুলিতে কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান আছে। এই বচনগুলিতে সমাজের যে পরিচয় টুকরা-টুকরাভাবে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতকের; কিন্তু যে-ভাষায় বর্তমানে ইহারা আমাদের হাতে আসিয়াছে, সে-রূপ ও সে-ভাষা এত প্রাচীন নয়। 'শূন্যপুরাণ', 'গোপীচাঁদের গীত', 'সেখ শুভোদয়া', 'আদ্যের গম্ভীরা', মুর্শিদ্যাগান, প্রাচীন রূপকথা সম্বন্ধেও এই সন্দেহ প্রযোজ্য। আসল কথা হইতেছে, জনসাধারণ প্রাকৃতজনসুলভ ভাব ও ভাষায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের যেসব সুখদুঃখ, ক্ষুদ্রবৃহৎ জীবনসমস্যা প্রকাশ করিত গানে গল্পে বচনে গাথায় রূপকথার আড়ালে, তাহা কেহ লিখিয়া রাখে নাই, লোকের মুখে মুখেই তাহা গীত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং বহুদিন পর তাহা হয়তো লিপিবদ্ধ হইয়াছে যখন প্রাকৃতজনের ভাষা লেখা-মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

তাই, প্রাচীন লিপিমালা এবং কিছু কিছু ধর্ম- ও সাহিত্য -গ্রন্থই বাঙালার ইতিহাসের উপাদান এবং ইহাদের সাক্ষ্যই প্রামাণিক। বাংলাদেশের লিপিগুলি কালানুযায়ী সাজাইলে খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কীবিজয়েরও প্রায় শতবর্ষ কাল পর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্তই ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় এবং এই সাত-আট শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাসের রূপ কতকটা স্পষ্ট হইয়া চোখের সম্মুখে ধরা দেয়। পঞ্চম শতকের আগে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট ও একান্ত অনুমানসিদ্ধ। লিপিগুলির সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যবহারের আর একটু বিপদও আছে। যে-কোনও লিপিবর্ণিত যে-কোনও অবস্থা সমগ্রভাবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে অথবা সমগ্র প্রাচীনকাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। বস্তুত, দেখা যায়, একই সময়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা, রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

চার

সমাজবিন্যাসের ইতিহাস বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় নরতত্ত্ব ও জনতত্ত্বের কথা এবং তাহারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ভাষাতত্ত্বের কথা। সেইজন্য বাঙালীর ইতিহাসের গোড়ার কথা বাঙালীর নরতত্ত্বের কথা, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর ভাষার কথা, বাঙালীর জন, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট ঊষাকালের কথা। বাঙালীর জন-গঠনের এই গোড়াকার কথাটা না জানিলে প্রাচীন বাংলার শ্রেণী- ও বর্ণ -বিভাগ, রাষ্ট্রের স্বরূপ, এক কথায় সমাজের সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়িবে না।

বাঙালীর ইতিহাসের দ্বিতীয় কথা, বাংলার দেশ-পরিচয়। ঐতিহাসিক কালের পূর্বেই যে সমস্ত বিভিন্ন কৌম একসঙ্গে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল তাহাদের বন্ধন-সূত্র ছিল পূর্ব-ভারতের ভাগীরথী-করতোয়া-লৌহিত্য-বিধৌত বিন্ধ্য-হিমালয়-বাহুবিধৃত ভূভাগ। এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের জল ও বায়ু এই দেশের অধিবাসী-দিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই দেশের প্রাচীন যে রাষ্ট্র ও জনপদ-বিভাগ তাহাও নির্ণীত হইয়াছে বাংলার নদনদীগুলির দ্বারা। বাংলার এই নদনদী, বনপ্রান্তর, জলবায়ুর উষ্ণ জলীয়তা, ঋতুপর্যায়, বিধৌত নিম্নভূমি, বনময়

সমুদ্রোপকূল সমস্তই এই দেশের সমাজবিন্যাসকে কমবেশি প্রভাবিত করিয়াছে। কাজেই বাংলাদেশের স্বত্য ভৌগোলিক পরিচয়ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কথা।

জাতি এবং দেশ হইতেছে সমাজরচনার ঐতিহ্য ও পরিবেশ। কিন্তু, সমাজ-সৌধের বস্তুভিত্তি হইতেছে ধন। কাজেই প্রাচীন বাংলার ধনসম্বল কী ছিল, ধনোৎপাদনের কী কী উপায় ছিল, কী কী ছিল উৎপন্ন বস্তু, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি কিরূপ ছিল এইসব তথ্য বাঙালীর ইতিহাসের তৃতীয় কথা।

প্রাচীন বাংলায় কৃষি ছিল ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রথম ও প্রধান উপায়। কৃষির সঙ্গে দেশের ভূমিব্যবস্থা জড়িত। এই ভূমিব্যবস্থার উপরই দেশের অগণিত জনসাধারণের মরণবাঁচন নির্ভর করিত। তাই, ভূমিব্যবস্থার কথা বাঙালীর ইতিহাসের চতুর্থ এবং সমাজবিন্যাসের প্রথম কথা।

প্রাচীন ও বর্তমান বাংলার সমাজবিন্যাসের দিকে তাকাইলে যে জিনিস সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয় তাহা বর্ণ-উপবর্ণের নানা স্তর-উপস্তরে বিভক্ত সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত বাঙালীর বর্ণসমাজ। বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধ, রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের স্থান, রাজবংশ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বর্ণবিন্যাসের সম্বন্ধ—এইসব কথা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাচীন বাঙালী সমাজ কৃষক ও ক্ষেত্রকর ছাড়াও চাকুরিজীবী রাজকর্মচারী, ছোট ছোট মানপ বা দোকানদার হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় বণিক, শ্রেষ্ঠী সার্থবাহ, ব্যাপারী, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল। এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাদের দায় ও অধিকার ইত্যাদি লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়।

বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর অগণিত জনসাধারণ বাস করিতেন হয় গ্রামে না হয় নগরে। এইসব গ্রাম ও নগরের সংস্থান, ইহাদের বিশেষ বিশেষ রূপ, গ্রাম ও নগর এই দুই সভ্যতার পার্থক্য, ধর্ম- ও শিক্ষা -কেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির চেহারা জানার চেষ্টায় বাঙালীর ইতিহাসের অষ্টম অধ্যায়।

এই যে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণের বিচিত্র জনসাধারণ, ইঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের যে বিচিত্র কর্ম, বিচিত্র দায় অধিকার তাহা ইঁহারা নির্বিবাদে পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত বাঁচাইয়া নির্বাহ করিতেন কি করিয়া? প্রত্যেকে স্বধর্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপন আপন রুচি ও কর্তব্যানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিবেন, এই আশ্বাস সমাজ দিতে না পারিলে সমাজবিন্যাস সম্ভব হইতে পারে না। এই আশ্বাস দিবার, প্রত্যেককে স্বধর্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার যন্ত্র হইতেছে রাষ্ট্র। সমাজ নিজের প্রয়োজনেই এই রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। প্রাচীন বাংলায় এই রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ, বিভিন্ন কালে রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিচয়, রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ও রাজস্বের ধরন-ধারন, রাষ্ট্রের সঙ্গে বর্ণ ও শ্রেণীর, গ্রাম ও নগরের সম্বন্ধ, ধনোৎপাদনে ও বণ্টনে রাষ্ট্রের আধিপত্য, রাষ্ট্রের সঙ্গে সামাজিক সংস্কৃতির যোগ ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্নের যথালভ্য উত্তর লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের নবম অধ্যায়।

সমাজবিন্যাস ও রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত একে অন্যকে প্রভাবিত করে এবং দুইয়ে মিলিয়া ইতিহাসচক্রকে আবর্তিত করে। সেইজন্যই সমাজবিন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে এবং অন্যতম প্রধান প্রভাবক হিসাবে রাজবৃত্তকথা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের দশম অধ্যায়।

সর্বশেষে প্রাচীন বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির কথা। মানসগত জীবন সকল মানুষের সমান নয়। যে শ্রেণী বা সমাজের সামাজিক ধনসঞ্চয় যত বেশি সেই শ্রেণী ও সমাজের মানসজীবন তত উন্নত। সংস্কৃতির মূলে আছে কায়িক শ্রম হইতে অবসর। উদ্বৃত্ত ধনের বলে অবসরের সুযোগে মানুষ চিন্তা, অধ্যয়ন, শিল্পচর্চা ইত্যাদি করিতে পারে এবং শ্রেণীগত, নিজস্ব ও বৃহত্তর সমাজগত মানসের চিন্তা, কল্পনা, ভাব ও অনুভাবকে রূপদান করিতে পারে। প্রাচীন বাংলায়ও তাহাই হইয়াছিল। এই সংস্কৃতির অর্ধেক পুরাতন-ঐতিহ্যজাত; এই ঐতিহ্যের মধ্যে আছে জনগত, বর্ণগত রক্তের স্মৃতি, পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির স্মৃতি। বাকী অর্ধেক গড়িয়া উঠিয়াছে সমসাময়িক সমাজবিন্যাসের প্রয়োজনে। অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের প্রয়োজনে গড়িয়া ওঠা প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির স্বরূপ ও সত্যকার চেহারা জানিবার প্রয়াস লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের শেষ কয়েকটি অধ্যায়।

প্রাচীন বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান পরিচয় তাহাদের ধর্মকর্মে। বিচিত্র ধর্মসংস্কার, বিশ্বাস, পূজা, আচার-অনুষ্ঠান, বারো মাসে তেরো পার্বণ, অসংখ্য দেবদেবী ও অন্যান্য প্রতীক লইয়াই প্রাচীন বাঙালীর জীবন। সমাজবিন্যাসের উপরও এইসব বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের প্রভাব কম পড়ে নাই। সেইজন্য ধর্মকর্মের কথা লইয়া প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়।

এই ধর্মকর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা, নৃত্যগীত ইত্যাদি। শিল্পই হউক আর নৃত্যগীতই হউক, ইহাদের প্রথম ও প্রধান আশ্রয় ছিল ধর্মকর্ম। শিল্পকলা-নৃত্যগীতের দিক হইতে ইহাদের যে বিশুদ্ধ শিল্পমূল্য বা সংস্কৃতিমূল্য তাহা তো আছেই; কিন্তু বাঙালীর ইতিহাসে তাহার আলোচনার মূল্য সমাজমানসের দিক হইতেই বেশি। এবং তাহাই মুখ্য এই আলোচনা লইয়া আমাদের ইতিহাসের চতুর্দশ অধ্যায়।

ধর্মকর্ম শিল্পকলার মতো সমাজমানসের অভিব্যক্তি দেখা যায় সমসাময়িক সাহিত্যে, জ্ঞানবিজ্ঞানে ও শিক্ষাদীক্ষায়। প্রাচীন বাংলায় ইহাদেরও প্রধান আশ্রয় ধর্মকর্ম, ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি। অবশ্য ইহাদের কতক অংশ গড়িয়া উঠিয়াছিল দৈনন্দিন জীবনচর্যার, বৃহত্তর সমাজচর্যার বা অন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে, কতক একান্তই সৃষ্টির প্রেরণায়—বুদ্ধিগত, ভাবকল্পনাগত, চিন্তাগত, অভিজ্ঞতাগত মানসের আত্মপ্রকাশের যে স্বাভাবিক বৃত্তি তাহারই প্রেরণায়। এই আত্মপ্রকাশের রূপ ও রীতি বহুলাংশে সমাজবিন্যাস দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। আবার সমাজ-বিন্যাসও ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেইজন্যই সামাজিক ইতিহাসে শিক্ষাদীক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনাও সমসাময়িক সমাজবিন্যাস ও সমাজমানসের পরিচয় হিসাবেই বেশি, বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক হইতে ততটা নয়। এই লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য-বিজ্ঞান ছাড়াও সংস্কৃতির আর-একটা আটপৌরে দিক আছে। আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, আমোদ-আহ্লাদ, দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, উৎসব-আচার-ব্যবহার প্রভৃতির মধ্যে জনসাধারণের জীবনচর্যার যে ঘনিষ্ঠতম পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কোথাও নয়। দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে দিকটা লইয়া জনসাধারণের জীবনেতিহাসের অন্যতম প্রধান, অপরিহার্য ও অবশ্য জ্ঞাতব্য একাদশ অধ্যায়।

ইতিহাস শুধু তথ্য মাত্র নয়। সমস্ত তথ্যের পশ্চাতে কার্যকারণপরম্পরার

অমোঘ নিয়ম সর্বদা সক্রিয়। এই নিয়মটিকে ধরিতে পারা, দেশকালধৃত নরনারীর গতি-পরিণতির প্রকৃতিটি ধরিতে পারা, সমাজের প্রবহমান ধারাস্রোতের পশ্চাতের ইঙ্গিতটি জানিতে পারাই ঐতিহাসিকের কর্তব্য। সকল তথ্যের পশ্চাতে বাঙালীর আদি ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির একটি সমগ্র ইঙ্গিত আমি মননকল্পনার মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে ইতিহাসের সেই ইঙ্গিতটি একটি অখণ্ড সমগ্রতায় উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পাঁচ

আমি কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই। যে-সমস্ত তথ্য ও উপাদান পণ্ডিতমহলে অল্পবিস্তর পরিচিত, প্রায় তাহা হইতেই আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি। আমি শুধু প্রাচীন বাংলার ও প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস একটি নূতন কার্যকারণসম্বন্ধগত যুক্তিপরম্পরায় একটি নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিতর দিয়া উপস্থিত করিয়াছি মাত্র। এই যুক্তিপারম্পর্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক যুক্তি ও দৃষ্টি বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন। আমার বিশ্বাস, এই যুক্তি ও দৃষ্টি অনুসরণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের যে সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অন্য উপায়ে সম্ভব নয়।

তাহা ছাড়া, আমি প্রাচীন বাংলা ও বাঙালীর সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রয়াসও করিতেছি না। আমি শুধু কাঠামো রচনার প্রয়াস করিয়াছি—ভবিষ্যৎ বাঙালী ঐতিহাসিকেরা ইহাতে রক্তমাংস যোজনা করিবেন, এই আশা ও বিশ্বাসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের গোড়ার কথা

এক

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে অগণিত জাতির মিলনক্ষেত্র কল্পনা করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রান্তিক দেশ বঙ্গভূমি সম্বন্ধেও এ কথা সমান প্রযোজ্য। রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট এই চতুর্জনপদসম্বন্ধ বাংলাদেশে প্রাচীনতম কাল হইতে কত বিভিন্ন জন কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে এবং কে কিভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব রাখে নাই। কিন্তু মানুষ তাহার রক্ত ও দেহগঠনে, ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানস সংস্কৃতিতে তাহা গোপন করিতে পারে নাই। সকলের উপর, এই বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছে বাঙালীর প্রাচীন সমাজবিন্যাসের মধ্যে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে ইঙ্গিত কিছুতেই ধরা পড়িবার কথা নয়।

বাংলাদেশে জনতত্ত্ব গবেষণার মাত্র শৈশবাবস্থা। এ কথা অবশ্য সকলেই জানেন বাঙালী এক সংকর জন, কিন্তু কথাটা ঐখানেই শেষ হইয়া যায় না, বরং ঐখানেই কথার আরম্ভ। অথচ, কী কী মূল উপাদানের জৈব সমন্বয়ের ফলে বাঙালী আজ এক সংকর জনে পরিণত হইয়াছে, এ কথা কমবেশি নিশ্চয় করিয়া বলিবার মতন যথেষ্ট উপকরণ দেশের সর্বত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও নৃতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সেদিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। অন্যদিকে, বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণ শুধু নৃতাত্ত্বিকের কাজ নয়; তাঁহার সঙ্গে ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকের জ্ঞান ও দৃষ্টির একত্র মিলন না হইলে বাঙালীর জনরহস্য উন্মোচন করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে।

বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণের প্রধানতম উপায়, বাংলাদেশের আচণ্ডাল সমস্ত বর্ণের এবং সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের, বিশেষভাবে প্রত্যন্তশায়ী জনপদবাসীদের সকলের রক্ত ও দেহগঠনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, এক কথায় নরতত্ত্বের পরিচয়। সেদিকে এক-আধটু পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। দেহগঠনের বিশ্লেষণেও এ পর্যন্ত যাহা স্বীকৃত ও অনুসৃত হইয়াছে তাহা শুধু নরমুণ্ড, নরকপাল ও নাসিকার পরিমিতি ও পরস্পর অনুপাত এবং চুল, চোখ ও চামড়ার রং আশ্রয় করিয়া। নরমুণ্ড, কপাল ও নাসিকার পরিমিতি ও পরস্পর অনুপাত বিশ্লেষণ যাহা হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট নয়। অধিকন্তু, যে পরিমিতি গ্রহণ করা হইয়াছে, লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহা খুবই অল্প। তাহা ছাড়া, যেসব নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে, সর্বত্র সেগুলির প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা যায় না। আর, পরিমিতি গণনায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তিগত ভুল থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবু যতটুকু হইয়াছে, তাহা হইতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং ভাষা, বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব নয়।

বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণের কিছুটা সহায়ক উপায়, বাংলাভাষার বিশ্লেষণ।

অবশ্য ভাষাবিশ্লেষণের সাহায্যে নরতত্ত্ব ঠিক নির্ণয় করা চলে না; কারণ মানুষ নানা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্মগত কারণে ভাষা বদলায়। তবে জননির্ণয়ে ভাষাবিশ্লেষণ যে অন্যতম সহায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন জনের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখা যায় সেই ভাষার জীবনচর্যার মূল শব্দগুলি বা পদরচনারীতি কিংবা পদভঙ্গি অথবা মানুষ ও স্থান ইত্যাদির নাম অন্য কোন জনের ভাষা হইতে গৃহীত বা উদ্ভূত, তখন স্বভাবতই অনুমান করা চলে যে পূর্বোক্ত জনের সঙ্গে শেষোক্ত জনের রক্তসংমিশ্রণ না হোক, মেলামেশা ঘটিয়াছে। ভাষাবিশ্লেষণের ইঙ্গিত তাই নরগোষ্ঠী নির্ধারণে না হউক জন-নিরূপণে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে; আর সেই ইঙ্গিতের মধ্যে যদি নরতত্ত্ব-বিশ্লেষণলব্ধ ইঙ্গিতের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূরক সাক্ষ্য হিসাবে জনতত্ত্ব নির্ণয়ের কাজেও লাগিতে পারে।

বাংলাদেশ ও বাংলার সংলগ্ন প্রত্যন্ত দেশগুলির ভাষার বিশ্লেষণ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আর্যপূর্ব ও দ্রাবিড়পূর্ব ভারতীয় ভাষা ও জন সম্বন্ধে যে মূল্যবান গবেষণার সূত্রপাত ইতিপূর্বে হইয়াছে তাহাও প্রাচীন বাংলার ভাষা ও জন সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিয়াছে এবং তাহার ফলে বাংলার জন-নিরূপণসমস্যা সহজ হইয়াছে।

বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণের অন্যতম সহায়ক উপায়, প্রাচীন ও বর্তমান বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ। ভাষায় যেমন তেমনই বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতিতেও বিভিন্ন জনের সংমিশ্রণের ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে। প্রত্যেক জনের ভিতরও এই দুইটি বস্তু একটি রূপ গ্রহণ করে এবং নানা উপায় ও উপকরণ, রীতি ও অনুষ্ঠান, আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিতর দিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কালচক্রে সেই জন যখন মিত্র বা শত্রুরূপে অন্য জনের সম্মুখীন হয়, একের সঙ্গে অন্যের আদান-প্রদান ঘটে তখন কোন জনই নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অন্যের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে পারে না। বাংলাদেশে প্রাচীনকালে যে সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন জনের বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতির কিছু কিছু পরিচয় সহজেই ধরা পড়ে এবং ভাষা ও নৃতত্ত্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহা হইতে জন-নির্ণয়ের কাজও কিছুটা সহজ হয়।

এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণের কাজও যে খুব অগ্রসর হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সংস্কৃতি, বিশেষভাবে ধর্ম ও মূর্তিতত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ কিছু কিছু যদিবা হইয়াছে, বাস্তব সভ্যতার বিশ্লেষণ একেবারেই হয় নাই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে সমাজের উচ্চ ও নিম্নস্তরের লোকাচার ও লোকধর্ম অল্পই স্থান পাইয়াছে এবং পুরাণানুমোদিত ধর্মের স্থানও যথেষ্ট হয় নাই; অথচ জনতত্ত্বের অনেক নিশানা ঐ গুহাগুলির মধ্যে নিহিত।

এ যাবৎ বাংলাদেশের কোথাও প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক কোনও যুগেরই কোনও নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক লৌহ- অথবা প্রস্তর -যুগের বিশেষ কোনও বাস্তবাবশেষও বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এমন কিছু পাওয়া যায় নাই যাহার ফলে সেই যুগের সভ্যতা এবং সেইসূত্রে নরতত্ত্ব নির্ণয়ের ইঙ্গিত কতকটা পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু যাহা নাই তাহা লইয়া দুঃখ করিয়াও লাভ নাই। যতটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা লইয়াই একটা হিসাব-নিকাশ আপাতত করা যাইতে পারে।

দুই

বাংলার বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর জনসাধারণের দেহগঠনের, বিশেষভাবে কেশবৈশিষ্ট্য, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা কপাল ও নরমুণ্ডের আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ করিয়া এ পর্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে জানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সকলের পরিমিতি একই মানদণ্ড অনুসারে গৃহীত হয় নাই; পণ্ডিতদের মধ্যে পরিমিতি গণনার যে বিভিন্নতা দেখা যায় ইহা তাহার অন্যতম কারণ। তবে মোটামুটি বৈশিষ্ট্যগুলি ধরিতে পারা খুব কঠিন নয়।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ একটি উপপুরাণ; ইহার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক। বর্ণ ব্রাহ্মণ বাদ দিয়া সমসাময়িক বাংলাদেশের জনসাধারণ যে ছত্রিশটি জাত-এ বিভক্ত ছিল, তাহার একটু পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচয়িতা শূদ্র-বর্ণের লোকদিগকে তদানীন্তন বর্ণবিভাগানুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ

(১) উত্তম সংকর বিভাগ ঃ করণ (সৎ শূদ্র), অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), উগ্র, মাগধ, গান্ধিক বণিক, শাঙ্খিক, কংসকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, গোপ, দাস (চাষী), রাজপুত্র, নাপিত, মোদক, বারজীবী, সূত (সূত্রধর) মালাকর, তাম্বুলী ও তৌলিক। (২০)

(২) মধ্যম সংকর বিভাগ ঃ তক্ষণ রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈল-কারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক (শাবার) শেখর ও জালিক। (১২)

(৩) অন্ত্যজ বা অধম সংকর (বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃত) ঃ মলেগ্রাহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, চর্মকার, ঘণ্টজীবী বা ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল ও তক্ষ। (৯)

ইহা ছাড়া তিনি অবাঙালী ও বৈদেশিক ম্লেচ্ছ কয়েকটি কোমের নামও করিয়াছেন, স্বতন্ত্র বিভাগের অধীনে, যথা, দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, গণক-গ্রহবিপ্র, বাদক, পুলিন্দ, পুক্কশ, খশ, যবন, সুহ্ম, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, বৃহদ্ধর্মপুরাণ যদিও বলিতেছেন ছত্রিশটি জাত বা বর্ণ-উপবর্ণের কথা, নাম করিবার সময় করিতেছেন একচল্লিশটির। পাঁচটি সম্ভবত পরবর্তী কালের যোজনা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডও খুব সম্ভব বাংলাদেশের রচনা ও বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের প্রায় সমসাময়িক। এই পুরাণেও সমসাময়িক বাংলার বিভিন্ন জাত-এর অনুরূপ একটা তালিকা পাওয়া যায়।

বর্ণ ও জনের দিক হইতে এই বিভাগ যে কৃত্রিম এ কথা অনস্বীকার্য, তাহা ছাড়া বর্ণ তো কিছুতেই জননির্দেশক হইতে পারে না। আর, উপরের বিভাগের প্রথম দুইটি ব্যবসায়কর্মগত, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগ দুইটি কতকটা জনগত। প্রথম বিভাগটি জলচল এবং দ্বিতীয় বিভাগটি জল-অচল বর্ণের বলিয়া অনুমেয়। কাজেই কি কর্মবিভাগ কি জনবিভাগ কোন দিক হইতেই ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক যুক্তি হয়তো মিলিবে না। বস্তুত, বর্ণবিভাগ যেখানে ব্যবসায়কর্মগত সেখানে প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই বিভিন্ন জনের বর্ণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবেই। এই বর্ণগুলি সেইজন্যই সংকর এবং স্মৃতি ও পুরাণে যে বার বার বর্ণসংকর ও জাতিসংকর কথা ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহার ইঙ্গিত ইতিহাস ও নরতত্ত্বের দিক হইতে নিরর্থক ও অযৌক্তিক নয়। ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে সাংকর্যের কথা যে বলা হয় নাই তাহার কারণ এই যে, এই সব পুরাণ ও স্মৃতি প্রায়শ তাঁহাদেরই রচনা। অথচ নরতত্ত্বের দিক হইতে দেখা

যাইবে এই জাতিসাংকর্য অম্বষ্ঠ ও করণদের সম্বন্ধে যতখানি সত্য ঠিক ততখানি সত্য ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও।

বাঙালী ব্রাহ্মণদের দেহদৈর্ঘ্য মধ্যমাকৃতি; মুণ্ডের আকৃতিও মাধ্যমিক, অর্থাৎ গোলও নয়, দীর্ঘও নয়; নাসিকা তীক্ষ্ম ও উন্নত। বিরজাশংকর গুহ মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের যে-পরিমিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু, সাম্প্রতিক কালে যাঁহারা এই বর্ণের মুণ্ডাকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, উত্তর- বা দক্ষিণ -রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র বা বৈদিক সকল পর্যায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যেই গোল মাথার একটা সুস্পষ্ট ধারা একেবারে অস্বীকার করা যায় না; কায়স্থদের মধ্যেও তাহাই। সংগে সংগে এই তিন পর্যায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার চ্যাপ্টা বিস্তৃত নাসার একটা অস্পষ্ট ধারাচিহ্নও অনস্বীকার্য, যদিও গোল এবং মধ্যমাকৃতির মুণ্ড ও উন্নত সুগঠিত নাসাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বিশ্লেষণের পরেও এ কথা বলা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে দীর্ঘ মস্তিষ্কাকৃতির স্বল্প হইলেও একটা অনুপাত ধরা পড়ে। এ কথা সাধারণভাবে অন্যান্য অংগপ্রত্যংগের পরিমিতিবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সত্য।

ব্রাহ্মণদের দেহগঠন সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, বাঙালী কায়স্থদের দেহবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তাহা সত্য। বস্তুত মুণ্ড ও নাসাকৃতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থের কোনও পার্থক্যই নৃতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে না; নরতত্ত্বের দিক হইতে ইহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠী। ব্রাহ্মণদের মতো ইহারাও মধ্যমাকৃতি, ইহাদেরও চুলের রং কালো, চোখের মণি মোটামুটি পাতলা হইতে ঘনবাদামী—যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে কালো বলিয়াই মনে হয়। গায়ের রং পাতলা বাদামী হইতে আরম্ভ করিয়া পাতলা গৌর।

ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য যে সমস্ত জাতির দেহবৈশিষ্ট্য-পরিমিতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কায়স্থ, গোয়ালা, কৈবর্ত, পোদ, বাগ্দী, বাউড়ী, চণ্ডাল, মালো; মালী, মুচি, রাজবংশী, সদ্গোপ, বুনা, বাঁশফোঁড়, কেওড়া, যুগী, সাঁওতাল, নমঃশূদ্র, ভূমিজ, লোহার, মাঝি (বেদে), তেলি, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, ময়রা, কলু, তন্তুবায়, মাহিষ্য, তাম্বুলী, নাপিত এবং রজকই প্রধান। ইহা ছাড়া যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের নলুয়া (মুসলমান) এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের কিছু কিছু পরিমিতিও গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জাত-এরই পরিমিতি-গণনা সমসংখ্যায় হইয়াছে এবং দেশের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে এই সব বর্ণ ও শ্রেণীগুলির মধ্যে বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অন্ত্যজ এই বিভাগ তিনটির প্রতিনিধিদের অনেকেরই সন্ধান মিলিবে।

ইঁহাদের সকলের সম্মিলিত বিশ্লেষণ হইতে দেহগঠন, চোখ ও চামড়ার রং, কেশবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সহজেই ধরা পড়ে। সর্বাগ্রে নমঃশূদ্রদের কথাই বলিতে হয়, কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকদের সংগে নরতত্ত্বের দিক হইতে ইঁহাদের কোনও পার্থক্য নাই। উচ্চবর্ণের লোকদের মতো ইঁহারাও দৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডের গঠন মাধ্যমিক এবং নাসা তীক্ষ্ম ও উন্নত; ইঁহাদের চোখ ও চামড়ার রংও মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মতো, অথচ স্মৃতিশাসিত হিন্দুসমাজে ইঁহাদের স্থান এত নিচে যে নরতত্ত্বের পরিমিতিগণনার মধ্যে তাহার কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে যুক্তি হয়তো পাওয়া যাইবে জাতিসংঘর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে

নরতত্ত্বগত পরিমিতিগণনায় যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের বাঙালী দেহদৈর্ঘ্যের দিক হইতে মধ্যমাকৃতি; নমঃশূদ্রেরাও তাহাই। উত্তম সংকর বিভাগের বাঙালীও সাধারণত মধ্যমাকৃতি, কিন্তু খর্বতার দিকে একটা ঝোঁক খুব স্পষ্ট। মালী ছাড়া মধ্যম সংকর বর্ণের লোকেরাও তদনুরূপ· মালীরা খর্বাকৃতি। অন্ত্যজ পর্যায়ের লোকেরা সাধারণত খর্বাকৃতি, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও কোন কোন জাত স্পষ্টতই মধ্যমাকৃতি এবং অনেক জাতের মধ্যে মধ্যমাকৃতির দিকে ঝোঁক সুস্পষ্ট। মুণ্ডাকৃতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, সাধারণত ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ এবং নমঃশূদ্রেরাও যেমন গোলাকৃতি, উত্তম সংকর পর্যায়ের অধিকাংশ বর্ণ তেমনই। আবার কোনও কোনও নিম্ন উপবর্ণের মধ্যে, যেমন পশ্চিম বাংলার ভূমিজ ও সাঁওতালদের মধ্যে, গোলের দিকে একটু ঝোঁক উপস্থিত। এই ধরনের ঝোঁক অবশ্য কিছু কিছু অন্য বর্ণের মধ্যেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। তেমনই আবার কতকগুলি বর্ণের মধ্যে দৈর্ঘ্যের দিকে ঝোঁক অত্যন্ত স্পষ্ট, যেমন মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, ময়রা, সুবর্ণবণিক, মুচি, বুনা, বাগ্দী, বেদে, পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান প্রভৃতিদের মধ্যে। কতগুলি বর্ণ তো স্পষ্টতই দীর্ঘমুণ্ডাকৃতি, যেমন উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের জেলে, রাজবংশীরা, বাঁশফোঁড়, মালী, বাউড়ী, তাম্বুলী, তেলি প্রভৃতি উপবর্ণের লোকেরা। নাসাকৃতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও নমঃশূদ্র বর্ণের লোকেরা সকলেই সাধারণত তীক্ষ্ণ- ও উন্নত -নাস। সুবর্ণবণিকদের মধ্যে তীক্ষ্ণ ও উন্নত নাসা হইতে চ্যাপ্টা পর্যন্ত সব ধারাই সমভাবে বিদ্যমান; পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেও তাহাই। ময়রাদের নাসাকৃতি মধ্যম, কিন্তু তীক্ষ্ণতার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট। উত্তম ও মধ্যম সংকর পর্যায়ের, এমন কি অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ পর্যায়ের অধিকাংশ বর্ণেরই নাসাকৃতি মধ্যম, তবে কোনও কোনও বর্ণের লোকদের মধ্যে যেমন গন্ধবণিক, নাপিত, তেলি, কলু, মালো প্রভৃতির, চ্যাপ্টার দিকে ঝোঁক সহজেই ধরা পড়ে। আবার কতগুলি বর্ণের নাসাকৃতি একেবারেই চ্যাপ্টা, যেমন, বেদে, ভূমিজ, বাগ্দী, বাউড়ী, তাম্বুলী, তন্তুবায়, রজক, মালী, মুচি, বাঁশফোঁড়, মাহিষ্য প্রভৃতি। সাঁওতালদের নাসাকৃতিও চ্যাপ্টা কিন্তু মধ্যমাকৃতির দিকে ঝোঁক আছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, বাঙালীর চুল কালো, চোখের মণি পাতলা হইতে ঘন বাদামী বা কালো, গায়ের রং সাধারণত পাতলা হইতে ঘন বাদামী, নিম্নতম শ্রেণীতে ঘনশ্যাম পর্যন্ত। দেহদৈর্ঘ্যের দিক হইতে বাঙালী মধ্যমাকৃতি, খর্বতার দিকে ঝোঁকও অস্বীকার করা যায় না। বাঙালীর মুণ্ডাকৃতি সাধারণত দীর্ঘ, উচ্চ বর্ণস্তরে গোলের দিকে বেশি ঝোঁক। নাসাকৃতিও মোটামুটি মধ্যম, যদিও তীক্ষ্ণ ও উন্নত নাসাকৃতি উচ্চতর বর্ণের লোকেদের ভিতর সচরাচর সুলভ।

বিভিন্ন পণ্ডিতের সম্মিলিত গবেষণার ফল মোটামুটি বাঙালীর জনসাংকর্যের ইঙ্গিত সমর্থন করে। কিন্তু এতক্ষণ বাঙালী জাতির দেহগঠনের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল, তাহা আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে যেসব জন ছিল ও পরে যেসব জন একের পর এক এ দেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, প্রবহমান রক্তস্রোতে নিজেদের রক্ত মিশাইয়াছে, তাহাদের হিসাব লইতে হয়।

বাঙালীর দেহগঠনের বৈশিষ্ট্যের যুক্তি খুঁজিতে গিয়া বহুদিন আগে রিজ্‌লী সাহেব বলিয়াছিলেন, বাঙালীরা প্রধানত মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে

উৎপন্ন। কিন্তু রিজ্‌লী-কথিত দ্রবিড় নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের কাছে অগ্রাহ্য। আর রিজ্‌লী-কথিত মোঙ্গোলীয় প্রভাব সম্বন্ধে বলিতে হয়, বাঙালীদের মধ্যে যে গোলমুণ্ডের দিকে ঝোঁক তাহা মোঙ্গোলীয় জনদের গোলমুণ্ড অথবা মধ্য-মুণ্ডের প্রভাবের ফল হইতে পারে না। ফলে, রিজ্‌লীর মোঙ্গোলীয়-দ্রবিড় সাংকর্যের মত এখন আর গ্রাহ্য নয়। কিন্তু, রিজ্‌লী বাঙালীর জনতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশে খুব ভুল কিছু করেন নাই: ভুল করিয়াছিলেন সেই বৈশিষ্ট্যের মূল অনুসন্ধানে। সেই মূলের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতীয় নরতত্ত্বের নব-নির্ণীত ইতিহাসের মধ্যে।

তিন

নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জন। ভারতীয় নিগ্রোবটুদের দেহবৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় কম, কারণ বহুযুগ পূর্বেই ভারতবর্ষের মাটিতে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তবে অনুমান করা যায় যে, ভারত ও বাংলার নিগ্রোবটুরা দেহগঠনে কতকটা তাহাদের প্রতিবাসী নিগ্রোবটুদের মতনই ছিল, বিশেষভাবে মালয় উপদ্বীপের সেমাং জাতির দেহগঠনের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল বলিয়া বিরজাশংকর গুহ মহাশয় অনুমান করেন। এখন নিগ্রোবটুদের অবশেষ প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও এক সময়ে এই জাতি ভারতবর্ষে এবং বাংলার স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিচিত্র জনসংঘর্ষের আবর্তে তাহারা টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই।

নিম্নবর্ণের বাঙালীর ও বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভিতর যে-জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নরতত্ত্ববিদেরা এক সময় তাহাদের নামকরণ করিয়াছিলেন আদি-অস্ট্রেলীয়, এখন যাহাদের বলা হয় ভেড্ডিড। এই জন এক সময় মধ্য-ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-ভারতে, সিংহল হইতে একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটামুটিভাবে ইহাদের দেহবৈশিষ্ট্যের স্তরগুলি ধরা পড়ে ভারতবর্ষের, বিশেষভাবে মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, সিংহলের ভেড্ডাদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস, তাম্রকেশ এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পশ্চিম-ভারতে এবং উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশে যেসব লোকের স্থান হিন্দু সমাজবিন্যাসের প্রান্ততম সীমায় তাহারা, দক্ষিণ-ভারতের চেঞ্চু, কুরুব, য়েরুব প্রভৃতি লোকেরা সকলেই সেই আদি-অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড গোষ্ঠীর লোক। পুরাণোক্ত নিষাদ, ভীল্লকোল্লরাও তাহাই। বাংলাদেশের, বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশফোঁড়, মাল-পাহাড়ী প্রভৃতিরা যে সেই আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইহাতে তো সন্দেহ নাই-ই, নমঃশূদ্র, পোদ, বাউড়ি, বাগ্দী, চণ্ডাল প্রভৃতির মধ্যে এমনকি বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যেও যে ভেড্ডিড উপাদান রহিয়াছে এমন অনুমান নৃতত্ত্ব-বিরোধী নয়। এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে পূর্বতন নিগ্রোবটুদের কোথায় কোথায় কতখানি রক্তমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহা বলা কঠিন, তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু যে ঘটিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। তাহা না হইলে মধ্য-ভারতের, দক্ষিণ-ভারতের এবং বাংলাদেশের আদি-অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে দেহবৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য দেখা যায়,

তাহার যথেষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর যে অংশ মধ্য ও পূর্ব-ভারতবর্ষের অধিবাসী জার্মান পণ্ডিত ফন্ আইকস্টেড্ট্ তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন 'কোলিড' এবং সিংহলীয় অংশের 'ভেড্ডিড'। শুধু ভারতবর্ষেই নহে, এক সময়ে ভারতবর্ষের বাহিরেও পূর্বে-পশ্চিমে ভেড্ডিডদের শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আরব, আফগানিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মালয়, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এই রক্তধারার প্রচুর চিহ্ন বিদ্যমান।

ভারতবর্ষের জনবহুল সমতল স্থানগুলিতে যে জনের বাস তাহাদের মধ্য হইতে আদিম অধিবাসীদের দেহলক্ষণগুলি বাদ দিলে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই জনের লোকেরা দেহদৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, কপাল সংকীর্ণ, মুখ খর্ব, গণ্ডাস্থি উন্নত, নাসিকা লম্বা ও উন্নত, কিন্তু নাসামুখ প্রশস্ত, ঠোঁট পুরু এবং মুখগহ্বর বড়ো, চোখ কালো এবং গায়ের চামড়া সাধারণত পাতলা হইতে ঘন বাদামী। দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ লোক এবং উত্তর-ভারতের নিম্নতর শ্রেণীর প্রায় সকলেই উপরোক্তবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দীর্ঘমুণ্ড জনের বংশধর এবং এই দীর্ঘমুণ্ড জনেরাই ভারতীয় জনপ্রবাহে যে দীর্ঘমুণ্ড ধারা বহমান তাহার উৎস। বাংলাদেশেও উত্তম ও মধ্যম এবং অন্ত্যজ পর্যায়ে যে দীর্ঘমুণ্ডের ধারাচিহ্ন দেখা যায়, তাহাও মূলত এই নরগোষ্ঠীর দান। মনে হয়, নব্য প্রস্তর যুগে ইহারা ক্রমশ মধ্য- ও দক্ষিণ -ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে।

দক্ষিণ-ভারতে যাহাদের দ্রাবিড় বলা হয়, তাহাদের মধ্যে পরবর্তী কালে ভেড্ডিড রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। অবশ্য পরিবেশের প্রভাবে তাহাদের চেহারা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পরিবেশ ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন চেহারাকেও কিভাবে প্রভাবিত করে মালপাহাড়ীরা তাহার বড় প্রমাণ। দুইশত বৎসর পূর্বেও মালেরা এবং মালপাহাড়ীরা ছিল অভিন্ন। কিন্তু উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হইতে নামিয়া সমতলে বাস করার ফলে উভয়ের চেহারায় একটা পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও দুইটি দীর্ঘমুণ্ড জন কিছু পরবর্তী কালেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই দুই জনের কিছু কিছু কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়াছে সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। মাক্রান, হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োর নিম্নস্তরে প্রাপ্ত কঙ্কালগুলি হইতে মনে হয় ইহাদের একটির দেহগঠন ছিল সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, মগজ বড়, ভ্রু-অস্থি স্পষ্ট, কানের পিছনের অস্থি বৃহৎ। এইসব দেহলক্ষণ পঞ্জাবের সমরকুশল, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কোনও কোনও শ্রেণী ও বর্ণের ভিতর এখনও দেখা যায়। কিন্তু এই জন পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় দীর্ঘমুণ্ড জনের পরিচয়ও মহেন্-জো-দড়োর কোনও কোনও কঙ্কালাবশেষ হইতেই পাওয়া যায়। এই জনের লোকেদের দেহগঠন তত সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নয়, বরং ইহারা দৈর্ঘ্যে একটু খর্ব, কিন্তু মুখাবয়ব তীক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট, নাসিকা তীক্ষ্ম ও উন্নত, কপাল ধনুকের মতো বঙ্কিম। সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যে পরিচয় হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে আমরা পাইয়াছি তাহা ইহাদেরই সৃষ্টি। উত্তর-ভারতে সর্বত্র সকল বর্ণের মধ্যেই, বিশেষভাবে উচ্চবর্ণের লোকেদের ভিতর এই দীর্ঘমুণ্ড নরবংশের রক্তধারা প্রবহমান এবং এই রক্তপ্রবাহের তারতম্যের ফলেই উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের লোকেদের মধ্যে দেহগঠনের সুস্পষ্ট তারতম্য দেখা যায়। বাংলাদেশে এই দীর্ঘমুণ্ড জনের রক্ত-

প্রবাহের ধারা কতখানি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কতকটা স্রোতস্পর্শ যে লাগিয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ কী?

উপরোক্ত দীর্ঘমুণ্ড জনেরা যে জনস্তর গড়িয়া তুলিয়াছিল, উত্তর-পশ্চিম হইতে তাহার উপর এক গোলমুণ্ড জন আসিয়া নিজেদের রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত করিল। এই জনের সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মুণ্ড-কঙ্কাল হইতে। বাংলাদেশের উচ্চবর্ণের ও উত্তম সংকর বর্ণের জনসাধারণের মধ্যে যে গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি, তীক্ষ্ন ও উন্নত এবং মধ্যম নাসাকৃতি ও মাধ্যমিক দেহদৈর্ঘ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কতকাংশে এই নরগোষ্ঠীর দান।

বাংলাদেশের জনসাধারণের কোনও কোনও অংশে মোঙ্গোলীয় রক্তের একটি ধারাও বিশেষভাবে নজরে পড়ে। মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে। এইসব মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে ইহাদের স্পর্শ গভীরভাবে কোথাও লাগে নাই, একমাত্র আসাম, উত্তরে হিমালয়শায়ী নেপাল-ভোটান এবং পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মদেশশায়ী প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসী লোকদের মধ্যে ছাড়া। আসামের উত্তর- ও পূর্ব -প্রান্তশায়ী পার্বত্যদেশগুলিতে আবার একটি পৃথক মোঙ্গোলীয় রক্তধারার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পথে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ বাংলাদেশেও আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এইভাবেই খানিকটা মোঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণত সমাজের নিম্নস্তরে। ব্রহ্মদেশে যে গোলমুণ্ড মোঙ্গোলীয় জনের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে তাহাদের সহিত সমগোত্রীয়তা আছে ত্রিপুরা জেলার চাকমাদের, টিপরাইদের এবং আরাকানের ও চট্টগ্রামাঞ্চলের মগদের।

বাংলাদেশের জনপ্রকৃতিতে যে মোঙ্গোলীয় শাখা সর্বাপেক্ষা বেশি স্বাক্ষর রাখিয়াছে তাহাদের বলা হয় প্যারোইয়ান। আসামের আও-নাগা ও সেমা-নাগাদের মধ্যে প্যারোইয়ানদের চওড়া মুণ্ড লক্ষণীয়। বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে নিম্নবর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই উপাদান বিশেষভাবে নজরে পড়ে। বাংলার কোচ ও রাজবংশীদের দেহলক্ষণে প্যারোইয়ানদের সঙ্গে সমগোত্রীয়তা সুস্পষ্ট। বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভেড্ডিড গোষ্ঠীর জনসাধারণের মধ্যে নানা মাত্রায় মোঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সাঁওতাল প্রভৃতি মুণ্ডাভাষী নরগোষ্ঠীতেও এই মিশ্রণের চিহ্ন দেখা যায়। তবে বিভিন্ন পরিবেশে জীবনযাত্রার বিচিত্র ধরন-ধারনে দেহলক্ষণের এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে কোথায় কী পরিমাণে এই রক্তধারা মিশিয়া আছে তাহা বলা শক্ত।

ভেড্ডিড ও দ্রবিড়রা ছাড়াও ভারতীয় জনস্তরে আর-একটি দীর্ঘমুণ্ড ধারা নজরে পড়ে। এই ধারাটি 'আর্য' বা 'ইন্দো-আর্য' নামে পরিচিত। সম্ভবত তিন-চারি হাজার বছর পূর্বে আরল-কাস্পিয়ান সাগরের নিম্নশায়ী অঞ্চল হইতে ইহাদের

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দলটি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাহার পূর্বেও উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা এদেশে আসা সম্ভব। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথ দিয়া 'ইন্দো-আর্য' বা ভারতীয় বৈদিক আর্যরা এদেশে প্রবেশ করে। পরে উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণ-ভারত ও পূর্ব-ভারতে ছড়াইয়া পড়ে এবং কালক্রমে এদেশে আদিবাসীদের সহিত মিশিয়া যায়। এই ইন্দো-আর্য নরগোষ্ঠীর দেহলক্ষণের বৈশিষ্ট্য হইতেছে দেহের বলিষ্ঠ গঠন, গৌরবর্ণ দীর্ঘ আকৃতি, দীর্ঘমুণ্ড, তীক্ষ্ম উন্নত নাসা এবং কটা চোখ। বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে অল্পবিস্তর এইরূপ দেহাকৃতি দেখা যায়। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ ও গোয়ালাদের শতকরা আট-দশ জনের মধ্যে দীর্ঘকায়, দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘনাসা গড়ন নজরে পড়ে। আর্য ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কালে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে বাংলাদেশে সঞ্চারিত হইয়া পূর্বতন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠনে এই ধারার দান অতি অল্প। এই রক্তপ্রবাহ উপরের স্তরের একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র এবং এই প্রবাহ বাঙালীর জীবন ও সমাজ-বিন্যাসের উচ্চস্তরেই আবদ্ধ; ইহার ধারা বাঙালীর জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এমনকি উপরের স্তরেও এই ধারা এত শীর্ণ ও ক্ষীণ যে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তাহা খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সহসা ধরা পড়ে না। বর্তমান যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা বা পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে বাঙালী ব্রাহ্মণের কোন সম্বন্ধই যে প্রায় নাই তাহার কারণ এই তথ্যের মধ্যে নিহিত। ঐসব দেশের ব্রাহ্মণরা যে সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের দাবি স্বীকার করেন না তাহার অন্যতম কারণ এই জনপার্থক্য নয় কি?

ইন্দো-আর্যদের ভারতে আসার ঠিক পরেই সম্ভবত পারস্য-তুর্কীস্থান এলাকা হইতে এদেশে শক জাতির অভিযান আরম্ভ হয়। ক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষত দক্ষিণ- ও পূর্ব -ভারতে তাহারা ছড়াইয়া পড়ে এবং অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া যায়। ইহাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হইতেছে দেহের মাঝারি গড়ন, চওড়া গোল মাথা, মাথার পশ্চাদ্‌ভাগ চ্যাপটা, লম্বা নাক, ঈষৎ পীতাভ চোখ। উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ দেহাকৃতি অল্পবিস্তর দেখা যায়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই উপাদান বিরল। নৃতাত্ত্বিকদের কাহারও কাহারও মতে, উচ্চবর্ণের বাঙালীদের গোল মাথার মূলে রহিয়াছে এই শকজাতীয় উপাদান।

বাঙালীর জনপ্রকৃতিতে এ পর্যন্ত যেসব উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলা যায়, ভেড্ডীয় উপাদানই বাংলার জনগঠনের মূল ও প্রধান উপাদান। পরে কালক্রমে নানা অবস্থায় তাহাতে কমবেশি মাত্রায় পশ্চিমে ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মোঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় উপাদান আসিয়া মিশিয়াছে। মোটামুটিভাবে ইহাই বাংলাভাষাভাষী জনসৌধের চেহারা এবং এই জনসৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত।

সংকর জন হইলেও বিচিত্র আদান-প্রদান ও মিশ্রণের ফলে বাঙালীর একটি নিজস্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৈশিষ্ট্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে অধিকাংশ বাঙালীই মধ্যমাকৃতি—মাথার গড়ন দীর্ঘও নয়, গোলও নয়, নাসিকা দীর্ঘও নয়, প্রশস্তও নয়, দেহাকৃতি দীর্ঘও নয়, খর্বও নয়। এই মধ্যমাকৃতি দেহলক্ষণই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ ও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন বর্ণের ও

জনের নরতাত্ত্বিক বিবরণের তুলনামূলক আলোচনা হইতে বাঙালীর বিভিন্ন বর্ণ বা জাত সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণরাই একমাত্র জাত যাহাদের সঙ্গে পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদের এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বাঙালী ব্রাহ্মণদের বেশি নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা দেখা যায় বাঙালী বৈদ্য ও কায়স্থদের সঙ্গে। বস্তুত, বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নরতত্ত্বের দিক হইতে একই গোষ্ঠীর লোক। নরতত্ত্বের দিক হইতে বলিতে পারা যায়, যেসব জাত (অর্থাৎ বৈদ্য-কায়স্থ, বৃহদ্ধর্মপুরাণের করণ ও অম্বষ্ঠ) দেহবৈশিষ্ট্যে ব্রাহ্মণদের যত সন্নিকটে, বাংলাদেশে সেই সব জাত-এর সামাজিক কৌলীন্য তত বেশি। বাঙালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পূর্ব-ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের, কিংবা নিম্নতম বর্ণ ও শ্রেণীর লোকদের রক্তসংমিশ্রণ বেশি ঘটিয়াছে এমন প্রমাণ নাই। ঘটে যে নাই তাহার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে এবং ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের, সামাজিক আচার-ব্যবহারে। নির্বিচার আন্তর্বিবাহ ও আন্তর্ভোজনে একটা আপত্তি বরাবরই তাহাদের ছিল। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈদ্য-কায়স্থদের যে নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা দেখা যায়, বাংলার অন্য কোন বর্ণ বা জাতের সঙ্গে সেই আত্মীয়তার প্রমাণ নাই। আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মধ্য-ভারতের ব্রাহ্মণদের নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা অপেক্ষা অনেক কম; বরং বাঙালী ব্রাহ্মণের আত্মীয়তা মধ্য-ভারতীয় অব্রাহ্মণদের সঙ্গে বেশি। উচ্চতম বর্ণের বিহারীদের সঙ্গে বাংলার উচ্চতম বর্ণের লোকদের কিছুটা আত্মীয়তা আছে। বাংলা-বিহারের ভৌগোলিক নৈকট্যে এবং ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদানে সে মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু সে মিলও বাঙালী বৈদ্য-কায়স্থদের সঙ্গে মিলের চেয়ে অনেক কম। এইসব কারণে মনে হয়, বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বর্ণের লোকেরা একটি বিশেষ ঐক্যবদ্ধ নরগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম সংকর বর্ণের অনেক বর্ণই এই নরগোষ্ঠীর সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ এমন অনুমানও সঙ্গে সঙ্গে করা চলে। অন্তত, বাঙালী কায়স্থরা যে বাঙালী সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, ইহা তো নরতাত্ত্বিক পরিমিতি-গণনা হইতেই ধরা পড়ে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলেন, কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরাই যথার্থ বঙ্গজনপ্রতিনিধি। বস্তুত, বাংলাদেশের সকল বর্ণের (বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের উত্তম ও মধ্যম বর্ণের সংকর বর্ণের) সঙ্গে কায়স্থদের আত্মীয়তাই তাই সবচেয়ে বেশি। বাংলার বাহিরে এক বিহারে কিছুটা ছাড়া অন্যত্র কোনও বর্ণের সঙ্গেই ইহাদের বিশেষ কোনও মিল নাই এবং এই তথ্য সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সম্বন্ধেও সত্য। কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে (সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-কথিত সৎশূদ্র) সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া বা বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অন্ত্যজ বর্ণের লোকদের কোনও রক্তসংমিশ্রণ ঘটে নাই এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, তেমনই নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল প্রভৃতির সঙ্গে বাংলার পোদ, বাগ্দী, বাউড়ী প্রভৃতি উপবর্ণের লোকদের সুপ্রচুর রক্তমিশ্রণ ঘটিয়াছে। নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক পরিমিতি-গণনার ফলাফল একটু চাঞ্চল্য-কর। দেহবৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ইহারা উত্তর-ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সমগোত্রীয়; বস্তুত, উত্তর-ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের চেয়েও বাঙালী নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। অথচ, এই নমঃশূদ্ররা এখন সমাজের একেবারে

নিম্নতম স্তরে! এই সামাজিক তথ্যের সঙ্গে নরতত্ত্বপ্রমাণগত তথ্যের ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

যাহাই হউক, বাংলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র বর্ণসমূহের ভিতর আপেক্ষিক সূক্ষ্ম ও স্থূল পার্থক্য, একই বর্ণের মধ্যে দেহপরিমিতির ভেদবৈচিত্র্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিচার করিলে বলিতেই হয়, এ সমস্তই বিচিত্র জনসাংকর্যের দ্যোতক।

চার

জনপ্রবাহ তো একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা; তাহার ইতিহাস কোথাও শেষ হইয়া যায় না। সেই ধারা এখনও বহমান। কাজেই, প্রাচীন বাংলাদেশে ঐতিহাসিক কালে সেই চিরবহমান ধারায় আরও কোনও কোনও জনের রক্তস্পর্শ লাগিয়াছে কিনা, লাগিলে কতটুকু লাগিয়াছে, তাহার পরিচয়ও এই সঙ্গেই লওয়া প্রয়োজন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমি তাহার 'ইন্ডিকা'-গ্রন্থে গঙ্গার পূর্বশায়ী দেশগুলির পরিচয় দিতে গিয়া মুরুণ্ড নামে এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্জাব অঞ্চলে এক মুরুণ্ড উপ-কোমের উল্লেখ গ্রীক ঐতিহাসিকরা একাধিকবার করিয়াছেন; ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মুরুণ্ডেরা সুপরিচিত। পূর্ব-ভারতে গঙ্গার পূর্বাঞ্চলে যে মুরুণ্ডদের কথা টলেমি বলিতেছেন তাহারা পঞ্জাবের মুরুণ্ডদেরই একটি শাখা হওয়া বিচিত্র নয়। তবে, এই মুরুণ্ডরা বাংলাদেশে নূতন কোনও রক্তপ্রবাহ বহন করিয়া আনে নাই, তাহা কতকটা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

বাংলার বাহিরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা সৈন্যসামন্ত লইয়া বহুবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছেন, কমবেশি অংশ জয় করিয়াছেন, এবং তাহার পর বিজয়গর্ব লইয়া, বহুবিধ ঐশ্বর্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সৈন্য-সামন্ত অধিকাংশ বিজেতা প্রভুর সঙ্গেই গিয়াছে। কিন্তু যাহারা স্থায়ী বাসিন্দা-রূপে হয়তো থাকিয়া গিয়াছে তাহারা জনসমুদ্রে জলবিন্দুবৎ কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। ইহারা ছাড়া, পাল ও সেন রাজাদের পট্টোলীগুলিতে এবং সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য লিপিতে দেখা যায় অনেক অবাঙালী ভারতীয় কোম-উপকোমের উল্লেখ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মদনপালের মনহলি পট্টোলীর তালিকাটি উদ্ধার করা যাইতে পারে; রাজকর্মচারীদের পরেই তালিকাগত করা হইয়াছে "গৌড়-মালব-চোড়-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-ভট্ট" প্রভৃতি (রাজ)-সেবকদের। ইহাদের মধ্যে মালব, চোড়, খশ, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, লাট সকলেই অবাঙালী; হূণেরা তো মূলত অ-ভারতীয়, কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহারা অন্তত চার-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিয়া ভারতীয় বনিয়া গিয়াছে। আমার ধারণা এইসব অবাঙালী কোমের লোকেরা বাংলাদেশে আসিয়াছিল বেতনভুক্ সৈনিকরূপে, না হয় রাজ-সরকারে একান্ত নিম্নস্তরের কর্মচারীরূপে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও এইরকম কয়েকটি ভিন্-প্রদেশী কোমের খবর পাইতেছি, যথা—খশ, যবন, কম্বোজ, খর, দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। যেভাবেই হউক, এইসব লোকেরা ক্রমশ বাংলাদেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল এবং এদেশেরই বিশাল জন-

সমুদ্রে নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিল। কর্ণাট হইতে কল্যাণের চালুক্য রাজবংশ, তামিলভূমি হইতে চোল রাজবংশ একাদশ শতকে বাংলাদেশে সার্থক বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়াছিল; যেসব সৈন্যসামন্ত এইসব অভিযানের সংগে আসিয়াছিল, তাহাদের কিছু কিছু এই দেশে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভবও নয়। ইহাদের আগে মালবরাজ যশোধর্মণও এক অভিযানে পূর্বভারতে আসিয়াছিলেন। প্রতিহারবংশীয় রাজারাও বাংলাদেশে একাধিক বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। শৈলবংশীয় রাজারাও এক সময়ে এদেশে এক সমরাভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এইসব বিচিত্র সেনা-বাহিনীর কিছু কিছু অংশ হয়তো পশ্চাতে থাকিয়া গিয়াছিল এবং পরবর্তী কালে মালব, চোড় (চোল), কর্ণাট, লাট প্রভৃতি নামে রাজসেবক হইয়া পাল ও সেন লিপিগুলিতে দেখা দিয়াছে। হূণ, খশ ইত্যাদিরাও হয়তো এইভাবেই আসিয়া থাকিবে। খশেরা তো হিমালয়ের সানুদেশের পার্বত্য জন; মোংগোলীয় রক্তের প্রভাব ইহাদের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে বাংলাদেশের মন্দিরে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উল্লেখ আছে; আদি-মধ্যযুগের দু-একটি লিপিতে বাংলার বাহিরের ভিন্নপ্রদেশাগত ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও নিশ্চয়ই নানা কাজে এদেশে আসিয়াছিল এবং অনেকেই কালক্রমে এদেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অশ্বরাও পাল আমলে, বোধ হয় তাহারও আগে, বাংলাদেশে আসিয়াছিল। তবে অগণিত জনপ্রবাহের মধ্যে ইহারা সংখ্যায় এত স্বল্প এবং ইহাদের প্রত্যেকের ধারা এত ক্ষীণ যে, নরতত্ত্বের দিক হইতে আজ আর তাহাদের পৃথক করিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, ইহারা সকলেই তো পূর্ববর্ণিত কোনও না কোনও বৃহত্তর জনের অংগীভূত ছিল এবং সেসব জাতি ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেই বাংলাদেশে তাহাদের রক্তপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া গিয়াছিল।

রাজা-রাজকুমারেরা অনেক সময় ভারতবর্ষেরই ভিন্‌প্রদেশী রাজকুমারীদের বিবাহ করিয়া আনিতেন; বাঙালী পাল-রাজারাই করিতেন, কর্ণাটদেশাগত সেন-রাজারা তো করিতেনই। পুরুষানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরিয়া এইরূপ হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টান্তও বিরাট জনগণপ্রবাহে জলবিন্দুবৎ।

এইসব দৃষ্টান্ত ছাড়া বাংলার ইতিহাসে কয়েকটি রাজবংশের পরিচয় আছে যাহারা বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া নিজেরা নিজেরা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়াছেন এবং এই দেশেরই বিরাট জনগণপ্রবাহে কালক্রমে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তুর্কী বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে এই রকম তিন-চারিটি প্রধান প্রধান রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে খড়্গ নামে একটি রাজবংশ সমতট অঞ্চলে প্রায় তিন-চার পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন; খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজ-রাজভট—এই চারজন রাজার নাম আমরা জানি। খড়্গ এই উপান্ত নামটি ভিন্‌প্রদেশী অবাঙালী নাম বলিয়া মনে হয়, অথচ ইঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। তিন পুরুষ ধরিয়া ইঁহারা অন্তত উপান্ত নামে নিজেদের জনপরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্থ পুরুষে তাহা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে যেন দেশী বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন। দশম শতকে কম্বোজাখ্য আর-এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাণগড়ে প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলিপিতে ও ইর্‌দা তাম্রপট্টে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। এই কাম্বোজান্বয়জ রাজারা কাহারা? কোথা হইতে ইঁহারা আসিয়াছিলেন? বহুদিন

আগে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন যে, এই কাম্বোজরা তিব্বত, ভোটান প্রভৃতি হিমালয়ের সানুদেশের কোন মোঙ্গোলীয় জনের শাখা, এবং বর্তমান উত্তরবঙ্গের কোচ্-পলিয়া-রাজবংশীদের পূর্বপুরুষ। আমার মনে হয়, আসামের পূর্ব-সীমান্তের গন্ধারসংলগ্ন একটা কম্বোজ দেশ ছিল, এবং বাংলার কম্বোজ-রাজবংশ সেই দেশ হইতে আগত। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ইঁহারা মোঙ্গোলীয় পরিবার-অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই অনুমান অসংগত নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বাংলাদেশে যেসব অবাঙালী জনের নাম করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কম্বোজ অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে একাধিক মোঙ্গোলীয় জন যে প্রাচীনকালে বাঙালীর জনপ্রবাহে রক্তধারা মিশাইয়াছে, এ কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুত, বাংলা ও আসামের প্রাচীন ইতিহাসে এই অঞ্চল হইতে একাধিক সমরাভিযান ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের স্বল্প-কালস্থায়ী উত্তর-বঙ্গ ও কর্ণসুবর্ণাধিকার তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত।

আর-এক বর্মণ রাজবংশ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রায় পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বর্মণেরা বাংলার দক্ষিণে কোন প্রদেশ, সম্ভবত উড়িষ্যা অন্ধ্রদেশ অঞ্চল হইতে আগত। কিন্তু যে ভিন্প্রদেশাগত রাজবংশ বাংলাদেশে আসিয়া প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বাঙালীর সমসাময়িক সমাজবিন্যাসকে আমূল বদলাইয়া স্মৃতি-শাসনের রূপান্তর ঘটাইয়া সমাজের উচ্চস্তরে নূতন এক সমাজবিন্যাস গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সেন-রাজবংশের কথা এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সেন রাজারা নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" বলিয়া। তাঁহারা যে দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এ কথা আজ সর্বজনবিদিত। কর্ণাটদেশবাসী চালুক্য রাজবংশ একাদশ শতকে বাংলা ও বিহারে একাধিক সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন; এইসব অভিযানের সঙ্গে যেসব সৈন্যসামন্ত আসিয়াছিলেন তাঁহারাই পরবর্তী কালে তিরহুত ও নেপালে "কর্ণাটক" রাজবংশ, রাঢ়ে ও বঙ্গে "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কর্ণাটদেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা তো জন হিসাবে মোটামুটি গোলমুণ্ড, উন্নতনাস পরিবারভুক্ত; উচ্চবর্ণের বাঙালীরাও তাহাই; কাজেই কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেন-রাজবংশ বাংলাদেশে এমন নূতন কোনও রক্তধারা বহন করিয়া আনেন নাই, যাহা বাংলাদেশে ছিল না।

তুর্কী বিজয়ের পরও বাংলাদেশে এই ধরনের শীর্ণ ক্ষীণ রক্তধারার স্পর্শ কিছু কিছু লাগিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহির হইতে যেটুকু আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দু-চারিটি দেওয়া যায়। কিছু কিছু আরবী মুসলমান পরিবার বাণিজ্যব্যপদেশে বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে; নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং বাংলার অন্যান্য জেলায়ও স্বল্পসংখ্যায় ইহাদের দর্শন মেলে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর আবর্তে ইহারা বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। নেগ্রিটো রক্ত-সংপৃক্ত হাবসীদের কথাও বলা যায়; বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ-ছয় জন হাবসী সুলতান বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছেন: তাহা ছাড়া দিল্লী-আগ্রার অনুকরণে এদেশেও হাবসী প্রহরী রাখার চলন কিছু কিছু ছিল। ইহারাও বাঙালীর রক্তেই নিজেদের রক্ত মিশাইয়াছে। আরাকানী মগ প্রভাবও উল্লেখ করা যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুর উৎপাতে বাংলার সমুদ্র-উপকূলশায়ী জেলাগুলি

পর্যুদস্ত হইয়াছিল; ইহারা চুরি ডাকাতি করিয়া মেয়ে ধরিয়া লইয়া আসিত আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এবং এদেশ হইতে বাহিরে লইয়া যাইত। এইসব মেয়ে বিক্রয় করাই ছিল ইহাদের ব্যবসা। বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থান ছিল এই ব্যবসার কেন্দ্র। এইভাবে কিছু কিছু মগ রক্তও বাঙালীর রক্তপ্রবাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। এইভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশে জাতি-সমন্বয় চলিয়াছে, চলিতেছে এবং সমগ্র জীবনপ্রবাহকে সমন্বিত গতি ও রূপ দান

পাঁচ

এ পর্যন্ত বাঙালীর জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাহা পাওয়া গেল ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে তাহার সমর্থন কতটুকু পাওয়া যায়, তাহা এখন দেখা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ ও পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির বিচিত্র ভাষার সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আনাম, মালয়, তালৈঙ্, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যেসব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ্ ও খ্মের গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যেসব ভাষায় রচিত, সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত ভাষা-পরিবারের নাম অস্ট্রিক। একটু মনঃসংযোগ করিলেই ধরা পড়িবে, এইসব অধিবাসীরা সকলেই জন হিসাবে একই গোষ্ঠীর নয়। স্বতঃই অনুমান হয় ঐসব ভূখণ্ডে সন্ধান-সম্ভাব্য আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল এবং ইহারা প্রায় সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। পরবর্তী কালে ইহাদের মধ্যে কমবেশি অন্য জনের রক্ত সংমিশ্রণ হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে, এমন কি অনেক জায়গায় নূতন কোনও জন তাহাদের একেবারে আত্মসাৎও হয়তো করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু পুরাতন জনের ভাষা তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং নানা জনবিবর্তনের ভিতর দিয়াও সেই ভাষাপ্রবাহ আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। অনুমান হয়, আদি-অস্ট্রেলীয়দের ভাষাই হয়তো ছিল যাহাকে আমরা বলিতেছি অস্ট্রিক। অস্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি এক সময় উত্তর-ভারতের অনেক স্থলেই ছিল। পরবর্তী যুগে দ্রাবিড় ও আর্য ভাষা পশ্চিম দিকে এবং ভোট-বর্মী ভাষা পূর্বদিকে এই ভাষাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে গ্রাস করিয়া একেবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছে; যেসব ক্ষেত্রে নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে তাহা সম্ভব নাই, সেইসব স্থানেই কোনও মতে দ্বীপের মতন আশ্রয়ের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক লোকের বুলিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

উত্তর- ও পূর্ব -ভারতে সর্বত্র, কাশ্মীরে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, বিহারে, উড়িষ্যায়, বাংলায়, আসামে, হিন্দুস্থানে, রাজপুতানায়, পঞ্জাবে, সীমান্তপ্রদেশে, বিশেষভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বত্র আর্যভাষার প্রবল প্রতাপ। এই আর্যভাষার প্রধান রূপ সংস্কৃত; যাহা প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রাকৃত। এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের অপভ্রংশ হইতে বর্তমান উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। বাংলাভাষা তাহার মধ্যে অন্যতম। এখন, যদি এ কথা প্রমাণ করা যায় যে, এই

প্রাকৃত-সংস্কৃতের ভিতর অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদরচনারীতির প্রভাব আছে (নিছক অস্ট্রিকরূপে অথবা সংস্কৃতকরণের ছদ্মবেশে) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আর্যভাষাভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এবং এ তথ্যও ধরা পড়িবে যে, অস্ট্রিকভাষী লোকের যে বিস্তৃতি আমরা আগে দেখিয়াছি তাহাপেক্ষাও তাহাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক, আরও গভীর ছিল। ঠিক এই তথ্যটাই সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, পশিলুস্কি-ব্লক-লেভী-বাগচী-স্টেনকোনো-চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা। ইঁহারা দেখাইয়াছেন, প্রাকৃতে-সংস্কৃতে হয় অস্ট্রিকরূপে না হয় সংস্কৃত-প্রাকৃতের ছদ্মবেশে, বিশুদ্ধ প্রাকৃত-সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে এমন অসংখ্য শব্দ ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এমন ব্যাকরণ ও পদরচনারীতি আছে যাহা মূলে অস্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত। বাঙালীর ইতিহাসে এমন কতকগুলি শব্দ ও রীতির উদ্ধার করা যাইতে পারে, যাহা একান্তভাবে না হউক বহুলভাবে বাংলাদেশে এবং বাংলার সংলগ্ন দেশগুলিতেই প্রচলিত। আমি শুধু সেইসব শব্দই উদ্ধার করিতেছি যেগুলির সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য।

আসামে ও বাংলাদেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (বিশ বা বিংশ নয়) এক পণ, অর্থাৎ ৮০ টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। হাটে বাজারে পান, সুপারি, কলা, বাঁশ, কড়ি, এমনকি ছোট মাছ ইত্যাদি দ্রব্যও এখনও এইভাবেই গণনা করিয়া ক্রয়বিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং এই গণনা-রীতিটি দুইই অস্ট্রিক। সাঁওতালী ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটির অর্থ ৮০ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪-ও। মূল অর্থ চার। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকেদের ভিতর কুড়ি শব্দ মানবদেহের কুড়ি অঙ্গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত; কুড়িই তাহাদের সংখ্যা গণনার শেষ অঙ্ক এবং কুড়ি লইয়া এক মান। কাজেই এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (৪×২০=৮০) এক পণ। এই অর্থে আশিও পণ, চারও পণ। এই পণও তাহা হইলে অস্ট্রিক শব্দ। আবার কুড়ি গোণ্ড বা গণ্ডাতে এক পণ (=৮০), এ-ও অস্ট্রিক ভাষারই গণনা। অর্থাৎ একগোণ্ডা বা গণ্ডাতে চার সংখ্যা; প্রত্যেক কুড়িতে (৪×৫) পাঁচটি গোণ্ডা। এই গোণ্ড বা গণ্ডই বাংলার গণ্ডা যাহা চার সংখ্যার সমান। চার কুড়িতে এক গণ্ডা। এই গণ্ডা হইতেই খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকের প্রাকৃত মহাস্থান শিলালিপির গণ্ডকমুদ্রা। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই গণ্ডকমুদ্রার প্রচলন বাংলাদেশে ছিল। দেখা গেল, এই সমস্ত গণনাপদ্ধতিটাই অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের। আর কড়ি মুদ্রা যেখানে গণনাক্রমে এতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেখানে ইহা তো সহজেই অনুমেয় যে, এই গণনাপদ্ধতি আদিম ভারত ও বৃহত্তর ভারতের সামুদ্রিকবাণিজ্যসমৃদ্ধ সভ্যতার সৃষ্টি। বাংলা গুড়ি বা গুঁড়া ও গুটি, এই শব্দগুলিও গোণ্ড বা গণ্ডা শব্দ হইতে উদ্ভূত।

বাংলা খাঁ খাঁ (করে ওঠা), খাঁখার (দেওয়া), বাঁখারি (বাখারি বা চেরা বাঁশ), বাদুর, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা), জাং (জঙ্ঘা), ঠেঙ্গ (গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের অংশ), ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোকরা, কলি (চুন), ছোট, পেট, খোস (পুরাতন বাংলায়, কচ্ছু), ঝোড় বা ঝাড়, বোপ, পুরাতন বাংলায় চিখিল (কাদা), ডোম (প্রাচীন বাংলায় ডোম্ব-ডোম্বী), চোঙ্গ, চোঙ্গা, মেড়া (=ভেড়া), বোয়াল (মাছ), করাত, দা' বা দাও, বাইগণ (বেগুন=সংস্কৃত বাতিঙ্গান,

বাতিগণ), পগার (জলময় গর্ত বা প্রণালী), গড়, বরজ (পানের), লাউ, লেবু-লেম্বু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত শব্দই মূলত অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাংলার প্রাচীন জনপদবিভাগের মধ্যে পুণ্ড্র-পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি-তাম্রলিপ্তি-দামলিপ্তি এবং বোধ হয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ এই দুটি নামও এই একই অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর, অন্তত এই দুটি নদীর নামও কোল কব-দাক্ এবং দাম-দাক্ হইতে গৃহীত। কোল দা বা দাক্=জল এবং দা বা দাক্ হইতেই সংস্কৃত উদক। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষার কথা দিয়াই দেশের পাহাড় পর্বত নদনদী গ্রাম জনপদ ইত্যাদির নামকরণ করিয়াছিল। তাহার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বাংলা বুলিতে লাগিয়া আছে, যেমন শিয়ালদহ বা শিয়াল-দা, ঝিনাইদহ বা ঝিনাই-দা, বাঁশদহ বা বাঁশ-দা (দহ=জলভরা গর্ত, নদীগর্ভের গর্ত); মুণ্ডা ঢেংক=বাংলা ঢেঁকি, মুণ্ডা মোটো=বাংলা মোটা। লেভি সাহেব তো বলেন, পুলিন্দ-কুলিন্দ, মেকল-উৎকল, উড্র-পুণ্ড্র-মুণ্ড, কোসল-তোসল, অঙ্গ-বঙ্গ, কলিঙ্গ-তিলিঙ্গ এবং সম্ভবত তক্কোল-কক্কোল, অচ্ছ-বচ্ছ, এই ধরনের জাতিবাচক যমজ নামকরণপদ্ধতিটাই অস্ট্রিক।

"আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" (অষ্টম শতক) নামক গ্রন্থে এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে এবং সম্ভবত প্রচলনস্থান সম্বন্ধেও একটু ইঙ্গিত আছে। এই গ্রন্থের মতে কামরাঙ্গা ফলের উৎপত্তিস্থান ছিল কর্মরঙ্গাখ্যদ্বীপে (=য়ুয়ান্ চোয়াঙের কামলঙ্ক, চীনা গ্রন্থের লংকীয়া, লংকীয়া-সু), নাড়িকের দ্বীপে (নারিকেল দ্বীপ), বারুসকদ্বীপে (বর্তমান, বারোস্), নগ্নদ্বীপ (বর্তমান, নিকোবর) বলিদ্বীপ ও যবদ্বীপে। এইসব দ্বীপের ভাষা 'র'-কারবহুল, অস্ফুট, অব্যক্ত (অস্পষ্ট, বা দুর্বোধ্য?) এবং নিষ্ঠুর (কর্কশ, রূঢ়)।

যে বৈশিষ্ট্যের কথা "মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে"র লেখক উল্লেখ করিয়াছিলেন, আর্য-ভাষার দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধে তাহা বলা কিছু অযৌক্তিক নয়। অস্ট্রিক ভাষায় 'ল' ও 'র'-র বাহুল্য সত্যই লক্ষ্য করিবার মতো। এই অসুরভাষাভাষী লোকদেরই ঋগ্বেদে 'অসুর' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না।

"আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প"-গ্রন্থের আর-একটি সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকারের মতে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের লোকেরা অসুরভাষাভাষী। কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির নাম এখনও 'অসুর' বুলি; কাজেই এই বুলিই এক সময় গৌড়ে-পুণ্ড্রে বহুল প্রচলিত ছিল, এ অনুমান সহজেই করা চলে। মধ্যভারতের পূর্বখণ্ডে যেসব লোকেরা অসুর বুলিতে কথা বলিত তাহারা আদি-অস্ট্রেলীয় পরিবারের লোক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ বোধ হয় নাই। গৌড়-পুণ্ড্রের আদিমতর স্তরেও এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বিস্তৃতি ছিল, এ কথাও নরতত্ত্ববিশ্লেষণ হইতে আগেই জানা গিয়াছে। ভাষার সাক্ষ্য হইতেও তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইল। আসামেও যে প্রাচীনতর কালে এই অসুরভাষাভাষী লোকের বিস্তৃতি ছিল, তাহা অনুমানেরও একটু কারণ আছে। কামরূপের বর্মণ রাজবংশের আদিপুরুষ সকলেই 'অসুর' বলিয়া পরিচিত; অন্তত, সপ্তম শতকের রাজারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের অসুর বলিয়াই জানিতেন এবং মহিরাঙ্গ অসুর, দানবাসুর, হাটকাসুর, সম্বরাসুর, রত্নাসুর, নরকাসুর প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের বংশধর বলিয়াই নিজেদের পরিচয়

দিয়াছেন। ই'হারা অস্ত্রভাষাভাষী ছিলেন বলিয়াই কি ই'হাদের নামে তাহার চিহ্ন থাকিয়া গিয়াছে?

জৈনদের "আচারঙ্গ সূত্র"-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মহাবীর (খ্রীস্টপূর্ব, ষষ্ঠ শতক) যখন পথহীন লাঢ় (রাঢ়দেশ), বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমিতে (মোটামুটি, দক্ষিণ-রাঢ়) প্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন এইসব দেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতগুলি কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করে, কিন্তু কেহই এই কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হয় না। বরং লোকেরা সেই জৈন ভিক্ষুকে আঘাত করিতে আরম্ভ করে এবং ছু ছু (থুক্থু) বলিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কামড়াইবার জন্য কুকুরগুলিকে লেলাইয়া দেয়। বাংলাদেশে এখনও লোকে কুকুর ডাকিবার সময় চু চু বা তু তু বলে। অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীতে কুকুরের প্রতিশব্দ হইতেছে 'ছক্' (খ্মের), 'ছ্যকে' (কোন্ টু), 'ছো' (প্রাচীন খ্মের), 'ছো' (আনাম, সেদাং, কাসেং), 'অছো' (তারেং), 'ছু' (সেমাং), 'ছুও', 'ছু-ও' (সাকেই)। এই তথ্য হইতে বাগ্চী মহাশয় মনে করেন যে, বাংলা চু চু বা তু তু মূলত অস্ট্রিক প্রতিশব্দ হইতেই গৃহীত এবং চু চু বা তু তু সংস্কৃত কুকুরার্থক বাংলা বা দেশজ শব্দ; ওটা শুধু ধ্বন্যাত্মক ডাক মাত্র নয়, চু চু বা তু তু বলিতে কুকুরই বুঝায়। এ অনুমান সত্য হইলে রাঢ়ে-সুহ্মে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়। আর ছিল যে তাহার জন্য প্রমাণ, এই দুই ভূখণ্ডে এখনও অস্ট্রিকভাষাভাষী পরিবারভুক্ত অনেক সাঁওতাল ও কোলদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্ট্রিক ভাষা হইতে যেমন, ঠিক তেমনই দ্রাবিড় ভাষা হইতেও আর্যভাষা সংস্কৃতে-প্রাকৃতে-অপভ্রংশে অনেক শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণরীতি ইত্যাদি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আর্যভাষাভাষী লোকেরা যে দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকেদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, এই তথ্য তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত বাংলা ভাষায় এই দ্রাবিড়স্পর্শ কোন্ দিকে কতখানি লাগিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রাচীন ও বর্তমান বাংলাদেশের স্থানের নাম, নামের উপান্ত 'ড়া' (বাঁকুড়া, হাওড়া, রিষড়া, বগুড়া), 'গুড়ি' (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি) জুলি (নয়নজুলি), জোল (নাড়াজোল), জুড় (ডোমজুড়), ভিটা, কুণ্ডু প্রভৃতি শব্দ উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহারা দ্রাবিড় ভাষার।

কিন্তু, নরতত্ত্ববিদদের কাছে এই দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকেদের সমস্যা বড় জটিল। সাম্প্রতিক নরতাত্ত্বিক পরিভাষায় দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর কোনও অস্তিত্বই নাই। দ্রাবিড় ভাষার নাম; নরগোষ্ঠীর নয়। বাংলাদেশে দ্রাবিড় ভাষার প্রচলনের দায়িত্ব প্রধানত আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর প্রথম ও তৃতীয়—এই দুই ধারার দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী দুইটির।

মোঙ্গোলীয় ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব প্রাচীন অথবা বর্তমান বাংলায় প্রায় নাই বলিলেই চলে। নরতত্ত্বের দিক হইতে মোঙ্গোলীয় রক্তপ্রবাহ বাঙালীর মধ্যে যেমন ক্ষীণ ও শীর্ণ, মোঙ্গোলীয় ভাষাপ্রভাবও তাহাই। তবে উত্তরতম ও পূর্বতম প্রান্তের মোঙ্গোলস্পৃষ্ট লোকেদের ভিতর চলতি বুলিতে কিছু কিছু ভোট-ব্রহ্ম ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। আর, অন্তত একটি নদীর নাম যে ভোট-ব্রহ্ম ভাষা

হইতে গৃহীত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়; এই নদীটি দিস্তাং বা তিস্তা, যাহার পরবর্তী সংস্কৃত রূপ ত্রিস্রোতা।

যাহা হউক, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বেদবহির্ভূত আর্য ভাষাপ্রবাহের উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল বৈদিক আর্যভাষাপ্রবাহের প্রবল স্রোত। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই ভাষা সমস্ত পূর্বতন ভাষাপ্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের নবরূপ দান করিয়া নিজের এক স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়া তুলিল। তাহার ফলে যে সংস্কৃত ভাষার বিকাশ হইল তাহাতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ, পদরচনারীতি, ব্যাকরণপদ্ধতি সমস্তই কিছু কিছু ঢুকিয়া পড়িল।

একান্তভাবে ভাষার দিক হইতে এই আর্যীকরণ সম্বন্ধে সুনীতিবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই উদ্ধৃতির ভিতর আর্য বা অনার্য বলিতে তিনি আর্য ভাষা ও অনার্য ভাষাকেই বুঝাইতেছেন; যেখানে আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী বলিতেছেন, সেখানেও আমি আর্য- বা অনার্য -ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী হিসাবেই বুঝিতেছি।

"ভারতবর্ষের সু-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, সব রকমের অনার্য [ভাষাভাষী] আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্য [ভাষী]-দের প্রথম সংস্পর্শ হয়তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য [ভাষাভাষী] ভারতে আর্য [ভাষী]-দের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ—অনার্য [ভাষী] ও আর্য [ভাষী]—পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্য [ভাষী]-রা বিদেশ হইতে আগত এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চ ছিল না। আর্য [ভাষী]-দের ভাষা আসিয়া দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল; উত্তর-ভারতের কোল ও দ্রাবিড় [ভাষী] অনার্য [ভাষী]-দের মধ্যে ঐক্যবিষয়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য [ভাষী] নরগোষ্ঠীর বিজেতৃ-মর্যাদা লইয়া আর্যভাষা সে অভাব পূর্ণ করিল।...... আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠীর] ভাষা ও আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠীর] ধর্ম—বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্য [ভাষী]-রা শিরোধার্য করিয়া লইল; অনার্য [ভাষী] আর্য [ভাষী]র পুরোহিত-ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনার্য [ভাষী] নরগোষ্ঠীর ধর্ম মরিল না, তাহাদের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্য [ভাষী] নরগোষ্ঠীর ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে যোগচর্যায়, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্য [ভাষী]-দের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য ও অনার্য [ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী] এই টানা ও পড়িয়ান্ মিলাইয়া হিন্দু-সভ্যতার বস্ত্র বয়ন করা হইল।

"উত্তর-ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠীর] সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতায় আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠী] অপেক্ষা অনার্য [ভাষী নরগোষ্ঠী]র দানই অনেক বেশি—কেবল আর্য [ভাষী]-দের ভাষা ইহার বাহন হইল। আর্য [ভাষী]-দের আগমনের সময় হইতেই হইতেছিল; গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে ইহা আরও অধিক পরিমাণে হইল। বাঙ্গালাদেশে আর্য-ভাষা লইয়া যখন উত্তর-ভারতের—বিহার ও হিন্দুস্থানের—লোকেরা দেখা দিল, যখন উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য-অনার্য [ভাষী নরগোষ্ঠী]-সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন মতবাদ বাঙ্গালাদেশে আসিল, তখন উত্তর-ভারতে মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাত হইয়া গিয়াছে। রক্তের বিশুদ্ধি বোধহয় তখন কোনও আর্য [ভাষী]-বংশীয়ের ছিল না।"

ভাষাবিশুদ্ধিও যে ছিল আর্যভাষী-নরগোষ্ঠীর তাহাও তো মনে হয় না।

ছয়

সংক্ষেপে জনতত্ত্ব ও ভাষাপ্রসঙ্গ লইয়া বাঙালীর গোড়াপত্তনের কথা বলা হইল। এইবার বাস্তব সভ্যতার উপাদান-উপকরণ এবং তাহার সঙ্গে বাঙালীর ও বাংলাদেশের সম্বন্ধের একটা দিগ্‌দর্শন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এই কৃষিই আমাদের প্রধান ধনসম্বল। বারিবহুল নদনদীবহুল সমতলপ্রধান বাংলাদেশে উত্তর-ভারতের অন্য প্রদেশাপেক্ষা কৃষির এক সমৃদ্ধতর রূপ দেখা যায়। এই কৃষিকার্য যে অস্ট্রিকভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় লোকেরাই আমাদের দেশে প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে 'লাঙ্গল' কথাটাই অস্ট্রিক্‌ভাষীদের ভাষা হইতে গৃহীত। আনামীয় ভাষায় এই 'লাঙ্গল' শব্দের মূলের অর্থ 'চাষ করা' এবং 'চাষ করিবার যন্ত্র' দুই বস্তুকেই বুঝায়। খুব প্রাচীনকালেই 'লাঙ্গল' শব্দটি আর্যভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, আর্যভাষীরা চাষ-কার্য জানিতেন না এবং সেইহেতু যে যন্ত্রদ্বারা চাষ করা হয় সে যন্ত্রের সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয় ছিল না। এই দুইই তাঁহারা পাইয়াছিলেন মূলত অস্ট্রিক-ভাষাভাষী লোকদের নিকট হইতে। অস্ট্রিকভাষী লোকেদের ভিতর যে কৃষিসভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, সমতলভূমিতে ও স্তরে স্তরে পাহাড়ের গা কাটিয়া চাষের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা বন্য ধানকে লোকালয়ের কৃষিবস্তু করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাই ছিল তাহাদের প্রধান উপজীব্য। অস্ট্রিকভাষী লোকদের বিস্তৃতি ভারতবর্ষে যে যে স্থানে ছিল সর্বত্রই এই ধান চাষেরও প্রচলন হইয়াছিল। পরবর্তী কালে দ্রবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা ভারতবর্ষে যব ও গম চাষের প্রচলন করে। জনবিস্তৃতি ও জলবায়ুর কারণ দুটি একত্র করিলেই বুঝা যাইবে, উত্তর-ভারতের লোকেরা কেন আজ পর্যন্তও সাধারণত রুটিভুক্ এবং বাংলা-আসাম-উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতলভূমির লোকেরা কেন ভাত-ভুক্।

ধান ছাড়া অস্ট্রিক্‌ভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান (বর) নারিকেল, জাম্বুরা, (বাতাবি লেবু), কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, ডালিম ইত্যাদিরও চাষ করিত। এই কৃষিদ্রব্যের নামের প্রত্যেকটিই মূলত অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহার প্রত্যেকটিই বাঙালীর প্রিয় খাদ্যবস্তু। কিন্তু চাষবাসের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও গো-পালন ইহারা জানিত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, অস্ট্রিকভাষী লোকেদের মধ্যে আজও গো-পালনের প্রচলন কম। যতদূর সম্ভব, গো-পালন আর্যভাষীদের সঙ্গে জড়িত।

তবে, তুলার কাপড়ের ব্যবহার অস্ট্রিকভাষীদেরই দান। কর্পাস (কার্পাস) শব্দটিই মূলত অস্ট্রিক। তাঁতী বা তন্তুবায়েরা যে প্রাচীন ও বর্তমান বাঙালী সমাজের নিম্নতর স্তরের ইহার মধ্যে কি তাহার কিছুটা কারণ নিহিত? পট (পট্টবস্ত্র, বাংলা পট্, পাট), কর্পট (=পট্টবস্ত্র) এই দুটি শব্দও মূলত অস্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত। মেড়া বা ভেড়ার সঙ্গে ইহারা পরিচিত ছিল। 'কম্বল' কথাটি মূলত অস্ট্রিক।

বুঝা গেল, অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়েরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। কিন্তু ইহাদের কতকগুলি শাখা অরণ্যচারীও ছিল। এই অরণ্যচারী নিষাদ ও ভীল,

কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা, গদব, হো, সাঁওতাল প্রভৃতিরা প্রধানত ছিল পশু-শিকারজীবী এবং পশু-শিকারে ধনুর্বাণই ছিল তাহাদের প্রধান অস্ত্রোপকরণ। বাণ, ধনু বা ধনুক, পিনাক এই সব কটি শব্দই মূলত অস্ট্রিক। ইহারা যেসব পশুপক্ষী শিকার করিত, অনুমান করা যায় তাহাদের মধ্যে হাতি, মেড়া (ভেড়া), কাক, কর্কট (কাঁকড়া), এবং কপোতের (যাহার অর্থ শুধু পায়রাই নয়, যে কোনও পক্ষীও) নাম করা যাইতে পারে। গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার (হস্তী অর্থে) এবং কপোত মূলত অস্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত। অন্যান্য অস্ত্রোপকরণের মধ্যে দা ও করাতের নামোল্লেখ করা যায়।

সমুদ্রতীরশায়ী দেশ, দ্বীপ ও উপদ্বীপবাসী অস্ট্রিকভাষী মেলানেশীয়, পলিনেশীয় প্রভৃতি লোকেরা জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গুঁড়িকাঠের একপ্রকার লম্বা ডোঙ্গা (এই কথাটিও অস্ট্রিক) এবং লম্বা খণ্ড খণ্ড গুঁড়িকাঠ একত্র করিয়া ভাসমান ভেলার আকারে বড় বড় নৌকা তৈয়ারি করিত। গুঁড়িকাঠের তৈরি ডিঙ্গা, ছোট নৌকা এখনও নদীখালবিলবহুল নিম্ন, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে বহুল প্রচলিত। এই সব ডোঙ্গা, ডিঙ্গা ও ভেলায় চড়িয়াই প্রাচীন অস্ট্রিকভাষী লোকেরা নদী- ও সমুদ্র -পথে যাতায়াত করিত এবং এইভাবেই তাহারা একটা বৃহৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যও গড়িয়া তুলিয়াছিল।

নির্মলকুমার বসু মহাশয় একটি জনগত তথ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আসামে, বাংলাদেশে, উড়িষ্যায়, দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র, • গুজরাটে মহারাষ্ট্রে সকল স্থানেই লোকেরা সাধারণত রান্নার কাজে সরিষা, নারিকেল অথবা তিল তৈলের ব্যবহার করিয়া থাকে। সেলাইবিহীন উত্তর- ও নিম্ন -বাস, সাধারণত ধুতি, চাদর, উড়ুনি, উত্তরীয় ইত্যাদির ব্যবহারই এইসব দেশের জনসাধারণের পরিধেয়। আর, যে পাদুকার ব্যবহার ইহারা করে তাহার পশ্চাদ্ভাগ উন্মুক্ত। বিহারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীরা কিন্তু পরিবর্তে ব্যবহার করে ঘৃত, সেলাইকরা জামাকাপড় এবং বন্ধ-গোড়ালি পাদুকা। এই পার্থক্যের মধ্যে জনপার্থক্যের একটু ইঙ্গিত অবশ্যই আছে।

অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়রা যে বাস্তব সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা একান্তভাবে গ্রামকেন্দ্রিক। কৃষিজীবী বলিয়া খাদ্যাভাব ইহাদের মধ্যে বড় একটা ছিল না এবং লোকসমৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল এ অনুমানও করা যাইতে পারে। পঞ্চায়েত প্রথা সম্ভবত ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্তিত। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্বে মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতিপ্রথা অনুসারে পঞ্চের নাম লইয়া শপথ করে। রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ মুণ্ডা, ও'রাও প্রভৃতি জাতির প্রত্যেক গ্রামসংঘ ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন-চিহ্ন-অঙ্কিত পতাকা সযত্নে ও সসম্মানে রক্ষিত হয়।

দীর্ঘমুণ্ড দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকেদের বাস্তব সভ্যতার উপাদান-উপকরণ আরও প্রচুর। মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ পর্যন্ত এক দীর্ঘমুণ্ড জন এবং পরবর্তী কালে ভূমধ্যজনসংপৃক্ত আর-এক দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী, এই দুই জনের রক্তধারার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষে সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তর-ভারতেও প্রায় সর্বত্রই এক বিরাট নরগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও স্থানে, উত্তর-ভারতের দুই-চারিটি স্থানে আকস্মিক আবিষ্কারে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কাহিনীতে, কিন্তু বিশেষভাবে হরপ্পা, মহেন-জো-দড়ো এবং নাল প্রভৃতি নিম্ন-

সিন্ধু উপত্যকায় একাধিক স্থানের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই নরগোষ্ঠীর বাস্তব সভ্যতার চিত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে।

নব্য-প্রস্তর যুগের এই দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষের নাগর সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। আর্যভাষায় 'উর', 'পুর' 'কূট' প্রভৃতি নগরজ্ঞাপক যেসব শব্দ আছে সেগুলি প্রায় সবই দ্রাবিড় ভাষা হইতে উদ্ভূত। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার বিবরণ, মহাভারতে ময়দানবের গল্প, মহেন্-জো-দড়োর নগরবিন্যাসের উন্নত ও সমৃদ্ধ রূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ সমস্তই প্রাক্-আর্যভাষী দীর্ঘমুণ্ড দ্রাবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর নগরনির্ভর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। নগরনির্ভর সভ্যতা জটিল; এবং এই সভ্যতার উপাদান-উপকরণ বহুল এবং জটিল হইতে বাধ্য। বিচিত্র খনিজ বস্তুর ব্যবহার তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই গোষ্ঠীর লোকেরা সোনা, রূপা, সীসা, ব্রোঞ্জ ও টিনের ব্যবহার জানিত; শিলাজতু, নানা প্রকারের পাথর, জান্তব হাড়, পোড়ামাটি, ও নানাপ্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক দ্রব্য ইত্যাদি নিজেদের বিচিত্র প্রয়োজনে, অলংকরণে বিচিত্র রূপে ও রচনায় ব্যবহার করিত। বর্শা, ছুরি, খড়্গ, কুঠার, তীর, ধনুক, মুষল, বাটুল, তরবারি, তীরের ফলা ইত্যাদি ছিল ইহাদের অস্ত্রোপকরণ। পাথরের হলমুখ, চকমকি পাথরের ছুরি ও কুঠার, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটির থালাবাটি ইত্যাদি বিচিত্র রূপের নিত্য ব্যবহার্য গৃহোপকরণ, মাটির তৈয়ারি নানাপ্রকারের খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের দেহসজ্জোপকরণ, খেলার জন্য গুটি, গুলি ও পাশা ইত্যাদি অসংখ্য, বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। গোরুর গাড়ি ও এই সভ্যতারই দান বলিয়া মনে হয়। সুতাকাটা, কাপড় বোনা তো ইহারা জানিতই। যব ও গম, মাছ, মেষ,- শূকর ও কুক্কুট -মাংস ছিল ইহাদের প্রিয় খাদ্যবস্তু; বৃহৎ বৃষ (কুকুদ্মান্), গোরু, মহিষ, মেষ, হাতি, উট; শূকর, ছাগল, কুক্কুট বা মুরগি, কুকুর ও ঘোড়া (?) ছিল ইহাদের গৃহপালিত জন্তু। তাম্র-প্রস্তর যুগের চিত্রকলার, জ্যামিতিক রেখাঙ্কন এবং অলংকরণের, মাটির পুতুল ও খেলনায় চারুকলার যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহারও কিছুটা এই দ্রাবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীরই সৃষ্টি। ছোট বড় রাস্তা, জলনিঃসরণের প্রণালী, বড় ছোট একাধিক-তলাবিশিষ্ট ইটকাঠের বাড়ি, দুর্গ, সিঁড়ি, খিলানযুক্ত দরজা, জানালা, স্নানাগার, কূপ, জলকুণ্ড, প্রাঙ্গণ; পূজামন্দির; মৃতদেহের সংকার-স্থান প্রভৃতি নগরবিন্যাসের যাহা কিছু অত্যাবশ্যক উপাদান, তাম্র-প্রস্তরযুগীয় দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর রচিত বাস্তব সভ্যতায় তাহার কিছুরই যে অভাব ছিল না হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ, সোনা, কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার এবং এসব বস্তুর সাহায্যে যে কারুশিল্প ইহারা জানিত তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ ভাষাতত্ত্বের মধ্যেও পাওয়া যায়। বাংলা কামার (পরবর্তী সংস্কৃত কর্মকার) তো দ্রাবিড় ভাষার 'কর্মার' শব্দ হইতেই গৃহীত। চারুশিল্পের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ, 'রূপ' ও 'কলা' এই দুইটি দ্রাবিড় শব্দ। মৃৎপাত্র যে তৈরি করিত তাহার নাম হইতেছে 'কুলাল'; বানর, গণ্ডার ও ময়ূরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ 'কপি', 'মর্কট', 'খড়্গ' (জন্তু অর্থে) ও 'ময়ূর' প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। চালের যে ক'টি শব্দ আছে সংস্কৃত ভাষায়, তাহার মধ্যে অন্তত দুইটি, 'তণ্ডুল' ও 'ব্রীহি', দ্রাবিড়ভাষা হইতে গৃহীত। লক্ষণীয় ইহাই যে, এই প্রত্যেকটি শব্দই ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ হইতে আহৃত। আর্য সভ্যতার প্রথম স্তরের ইতিহাসেই দ্রাবিড় সভ্যতার বাস্তব-উপকরণগত এইরূপ অনেক শব্দ ঢুকিয়া

পড়িয়াছে। পরবর্তী কালে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বস্তুবাচক আরও কত অসংখ্য শব্দ যে ঢুকিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দ্রাবিড়ভাষাভাষী বিভিন্ন দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর ভাষা ও বাস্তব সভ্যতার চলমান প্রবাহ যে বাংলার ভাষা ও সভ্যতার প্রবাহে স্রোতোধারা সঞ্চার করিয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। বাংলাদেশে এই ভাষাপ্রভাবের ও সভ্যতার বাহক, যতদূর অনুমান করা যায়, দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকেরা নিজেরা ততটা নয় যতটা আর্যভাষীরা নিজেরা। তবে, প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাগে নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। বাংলা ভাষার কিছু কিছু শব্দ ও পদরচনারীতি এবং ব্যাকরণপদ্ধতিতে দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট। বাস্তব সভ্যতায় দ্রাবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাব এতটা সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র না হইলেও সাধারণভাবে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার করিবার উপায় নাই। মনে হয়, বাঙালীর টাটকা ও শুকনা মৎস্যাহারে অনুরাগ, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য কারুশিল্পে দক্ষতা, চারুশিল্পের অনেক জ্যামিতিক নকশা ও পরিকল্পনা, নগরসভ্যতার যতটুকু সে পাইয়াছে তাহার অভ্যাস ও বিকাশ, বিলাসোপকরণের অনেক সামগ্রী, জলসেচনে উন্নততর চাষের অভ্যাস প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীপ্রবাহেরই ফল। মহেন্-জো-দড়োর ও হরপ্পার দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা যে মৎস্যাহারী ছিল তাহার প্রমাণ সুবিদিত: বৈদিক আর্যেরা ছিলেন মাংসাহারী; অবশ্য আগে হইতেই অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের ভিতরও মৎস্যাহারের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব-ভারতের অ্যাল্‌পো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষীদিগকে বৈদিক আর্যভাষীরা অভিহিত করিত "ব্রাত্য" বলিয়া। এই "ব্রাত্য" অবৈদিক আর্যদের ভিতর হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সূচনা বলিয়া অনুমান করিলে ইতিহাস-অসম্মত কিছু বলা হয় না। "ব্রাত্যষ্টোম" যজ্ঞ করিয়া ইহাদের শুদ্ধিসাধন করিয়া নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিবার একটা কৌশল বৈদিক আর্যরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই তথ্য হইতে মনে হয়, এই অ্যাল্‌পো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষীদের স্বতন্ত্র একটা বাস্তব সভ্যতার রূপও ছিল।

বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়েঘর অথবা পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে ইহারা বাস করিত, গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া স্থিতিলাভ করিবার পর পূর্ববর্তী অস্ট্রিক- ও দ্রাবিড় -ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রাম্য সভ্যতা এবং নাগর সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্যভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হইল আর্যভাষীদের বিরাট কীর্তি; অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।

বাংলাদেশ ও বাঙালীর বাস্তব সভ্যতার রূপ একান্তভাবেই গ্রামীণ। দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকদের উদ্ভূত নাগর সভ্যতার স্পর্শ বাংলাদেশে খুব কমই লাগিয়াছে। সেইজন্যই সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে নগরের সংখ্যাও কম এবং বাঙালীর সমাজবিন্যাসে নগরের প্রাধান্যও কম। নাগর সভ্যতার স্পর্শ বাংলা-

দেশে যে যথেষ্ট লাগে নাই, তাহার কারণ বাংলাদেশ চিরকালই ভারতের একপ্রান্তে নিজের কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতা লইয়া পড়িয়া থাকিয়াছে; সর্বভারতীয় প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে তাহার যোগ আর্যভাষা ও আর্যসভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই এবং সেই সূত্রে সে দ্রবিড় ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যতটুকু প্রবাহস্পর্শ পাইয়াছে, তাহাই বোধ হয় তাহার দ্রাবিড়ী উপাদান এবং সে উপাদান তাহার মূল অস্ট্রিক উপাদানকে একান্তভাবে বিলোপ করিতে পারে নাই।

সাত

এইবার মানস-সংস্কৃতি এবং জনপ্রবাহের খানিকটা সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

অস্ট্রিকভাষাভাষী প্রাচীন ও বর্তমান জনদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাহাতে মনে হয়, ইহারা অতি সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। ঐতিহাসিক যুগে ইহাদের বিবর্তন ও পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সংহতির কিছু অভাব ছিল; সহজেই ইহারা পরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিত। বার বার অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির নিকট রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করিয়াও যে ইহারা নিজেদের জনগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আজও বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই বশ্যতা স্বীকার করিয়াও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখাই ইহাদের প্রাণশক্তির মূল।

এই অস্ট্রিকভাষী মানুষেরা একাধিক জীবনে বিশ্বাস করিত, এখনও করে। পরবর্তী কালে এই ধারণাই হিন্দু পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদে রূপান্তরিত হয়। মৃতদেহ ইহারা কাপড় অথবা গাছের ছালে জড়াইয়া ডালে ঝুলাইয়া রাখিত, বা মাটির নিচে কবর দিয়া তাহার উপর বড় বড় পাথর সোজা করিয়া পুঁতিয়া দিত, অথবা স্ত্রীলোক হইলে কবরের উপর লম্বালম্বি করিয়া শোয়াইয়া দিত (গন্দ, কোরক, খাসিয়া প্রভৃতিরা এখনও ঠিক যেমনটি করে), মৃত ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে আহার্যও দান করিত। এইসব বিশ্বাস ও রীতিই পরবর্তী কালে হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্যে, মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ইত্যাদি ব্যাপারে রূপান্তরিত হইয়াছে। লিঙ্গপূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 'লিঙ্গ' শব্দটিই তো অস্ট্রিক ভাষার দান।

অস্ট্রিকভাষীরা বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ বিশেষ পশু, পক্ষী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহা করিয়া থাকে। বাংলাদেশে পাড়াগাঁয়ে গাছ-পূজা তো এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে শেওড়াগাছ ও বটগাছ; আর, পাথর ও পাহাড় পূজাও একেবারে অজ্ঞাত নয়। বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-মূল সম্বন্ধে যেসব বিধিনিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যেসব ফলমূল আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যেসব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন ইত্যাদি, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই এই আদিম অস্ট্রিকভাষাভাষী জনদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

ইহাদের অনেকগুলিই কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতার স্মৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, পান, সিন্দুর, কলাগাছ প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। ইহার প্রত্যেকটিই অস্ট্রিকভাষাভাষী জনদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ববাংলায়, এক বিবাহ ব্যাপারেই 'পানখিলি', 'গাত্রহরিদ্রা', 'গুটি-খেলা', 'ধান ও কড়ির স্ত্রী-আচার' প্রভৃতি যেসব অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ্য, অপৌরাণিক অনুষ্ঠান দেখা যায় তাহাও তো এই কৃষিসভ্যতা ও কৃষিসংস্কৃতির স্মৃতিই বহন করে। ধান্যশীর্ষপূর্ণ যে লক্ষ্মীর ঘটের পূজা বাংলাদেশে প্রচলিত তাহার অনুরূপ পূজা তো এখনও ওঁরাও-মুণ্ডাদের মধ্যে দেখা যায়। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে অথবা অন্য কোনও শুভকাজের প্রারম্ভে 'আভ্যুদয়িক' করিয়া পিতৃপুরুষের যে-পূজা আমরা করিয়া থাকি, তাহাও আমরা এই অস্ট্রিকভাষী লোকদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। এই ধরনের পিতৃপুরুষের পূজা এখনও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, হো ইত্যাদির মধ্যে সুপ্রচলিত। ওঁরাও প্রভৃতি জাতির চাণ্ডী-নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডীদেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। বাংলাদেশে হোলি বা হোলাক উৎসব এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চড়ক-ধর্মপূজার মিশ্রিত সমন্বিত রূপ বিশ্লেষণ করিলে এমন কতকগুলি উপাদান ধরা পড়ে যাহা মূলত আর্যপূর্ব আদিম নরগোষ্ঠীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। নিম্নশ্রেণী ও নিম্নবর্ণের অনেক ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে।

দ্রবিড়ভাষীরা খুব কর্মঠ ও উদ্যমশীল, সংঘশক্তিতে দৃঢ়, শিল্পসুনিপুণ এবং কতকটা অধ্যাত্মরহস্যসম্পন্ন প্রকৃতির লোক ছিল। ইহাদের প্রকৃতিতে ভাবুকতার এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সভ্যতার উন্নতির সহিত শ্রেণীবিভাগের বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু বিভাগ ছিল। উচ্চ-নীচ ভেদপ্রবণতা ও অস্পৃশ্যতাবোধ দ্রবিড়ভাষাভাষী নর-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। দ্রবিড়ভাষাভাষী লোকদের অস্পৃশ্যতাবোধ এবং শ্রেণীপার্থক্য পরবর্তী কালে আর্যভাষী সমাজে খানিকটা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগধর্ম ও আনুষঙ্গিক সাধনাপদ্ধতি যে ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা তো প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতাই অনেকটা প্রমাণ করিয়াছে।

আর্য এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি, অনেক দেবদেবী যথা, শিব ও উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূলে দ্রবিড়ভাষী লোকদের প্রভাব অনস্বীকার্য। যাগযজ্ঞও, যতদূর জানা যায়, ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর মধ্যেই যেন বেশি প্রচলিত ছিল। অরণি ও ব্রীহি, যজ্ঞের যে দুটি উপাদান, এই দুইটি শব্দই সম্ভবত মূলত দ্রবিড়ভাষার সঙ্গে সংপৃক্ত। পশুবলি যে ভূমধ্য-নরগোষ্ঠী-সংপৃক্ত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুতীরবাসী লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ তাহা কতকটা প্রমাণ করিয়াছে। এই মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই লোকের বাসের অনুপযোগী ক্ষুদ্র বৃহৎ এমন কয়েকটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলিকে কতকটা নিঃসংশয়েই মন্দির বা পূজাস্থান ইত্যাদি বলা যায়। 'পূজন' বা 'পূজা' এবং পুষ্প (এই শব্দ দুইটি ঋগ্বেদেই আছে) এই দুটি শব্দই দ্রবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংপৃক্ত। লিঙ্গ-

পূজা এবং মাতৃকাপূজা যে সিন্ধুতীরের প্রাগৈতিহাসিক লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহাও প্রমাণ করিয়াছে হরপ্পা-মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ। অবশ্য, এ দুটি পূজা সর্পপূজার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। লিঙ্গপূজাই ক্রমশ শিবের সঙ্গে জড়িত হইয়া শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি পূজায় রূপান্তরিত হয় এবং মাতৃকাপূজা ও সর্পপূজা ক্রমশ যথাক্রমে শক্তিপূজায় ও মনসা-পূজায়। দ্রাবিড়ভাষীদের আণ-মন্দি=পুং বানর-দেবতার ক্রমশ বৃষকপি এবং পরবর্তী কালে হনুমান-দেবতায় রূপান্তর অসম্ভব নয়। তেমনই অসম্ভব নয় দ্রাবিড়ভাষীদের বিণ্ বা আকাশ-দেবতার রূপান্তর বিষ্ণুতে এবং তাহা সুপ্রাচীন কালেই হয়তো হইয়াছিল। বৈদিক বিষ্ণুর যে-রূপ আমরা দেখি তাহাতে যেন দ্রাবিড়ভাষীদের আকাশ-দেবতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। শিব সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। শ্মশান-প্রান্তের-পর্বতের রক্তদেবতা একান্তই দ্রাবিড়ভাষীদের শিবন্; ইনিই ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আর্যদেবতা রুদ্রের সঙ্গে এক হইয়া যান। এই ধরনের সমন্বিত রূপ পৌরাণিক অনেক দেবদেবীর মধ্যেই দেখা যায়। এই সমন্বিত রূপই আর্য-ভাষীদের মহৎ কীর্তি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যে তাহাদের সুমহান দান।

মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় সেখানকার লোকেরা মৃতদেহ কবরস্থ করিত, কেহ কেহ আবার খানিকটা পোড়াইয়া শুধু অস্থিগুলি কবরস্থ করিত।

অ্যাল্পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতির সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। আর্যভাষী নর্ডিকেরা ইহাদের ভাষাজ্ঞাতি অ্যালপো-দীনারীয় লোকদের প্রীতির চক্ষে তো দেখিতই না বরং "ব্রাত্য" বা পতিত্ বলিয়া ঘৃণা করিত। এই "ব্রাত্য"রাও বৈদিক আর্যভাষীদের যাগযজ্ঞ, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতিকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না। এক কথায়, এই দুই গোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতি একেবারেই বিভিন্ন ছিল।

ভারতীয়, তথা বাংলাদেশের মানস-সংস্কৃতিতে মোঙ্গোলীয় ভোটব্রহ্ম বা চৈনিক বা অন্য কোনও নরগোষ্ঠীর স্পর্শ বিশেষ কিছু লাগে নাই।

শতাব্দীর বিরোধ-মিলনের মধ্য দিয়া কেমন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে আর্য-ভাষীরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল। সে জনের রক্তবিশুদ্ধতা আর রহিল না, তাহার রক্তে বিচিত্র রক্তধারার স্রোতোধ্বনি রণিত হইতে লাগিল, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও উচ্চ গ্রামে। এই সমন্বিত জনের নাম ভারতীয় জন। সে ধর্মও আর বেদ-ব্রাহ্মণের ধর্ম রহিল না; তাহার মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র পূর্বতন ধর্মের আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান সব মিলিয়া-মিশিয়া এক নূতন ধর্ম গড়িয়া উঠিল; তাহার নাম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সে সভ্যতাও বৈদিক আর্যভাষীর সভ্যতা থাকিল না; বিচিত্র পূর্বতন সভ্যতার উপাদান-উপকরণ আহরণ করিয়া তাহার এক নূতন রূপ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল; এই নূতন সমন্বিত সভ্যতার নাম ভারতীয় সভ্যতা। আর সেই সংস্কৃতিই কি বেদ-ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি থাকিতে পারিল? তাহার মানসলোকে কত যে পূর্বতন জন ও সংস্কৃতির সৃষ্টি-পুরাণ, দেবতাবাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকাহিনী, ধ্যানধারণা আশ্রয়লাভ

করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলকে আশ্রয় দিয়া, সকলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া, সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া এই সংস্কৃতিও এক নূতন সমন্বিত রূপ লাভ করিল; তাহার নাম ভারতীয় সংস্কৃতি।

এই সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও একটি চলমান প্রবাহ। ইতিহাসের আবর্তচক্রে বারবার নূতন নূতন জন, ধর্ম; সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে বিচিত্ররূপে তাহাদের বিরোধ-মিলন ঘটিয়াছে, আজও ঘটিতেছে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহাই জীবনের গতিধর্ম।

যে সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা এইমাত্র বলিলাম, তাহার জন্মনীড় হইল উত্তর-ভারতের গাংগেয় প্রদেশ। তাহাদের বাহন হইল আর্যভাষা। এই আর্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে গাংগেয় প্রদেশের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে। উত্তর-ভারতের মিশ্র আদি-নর্ডিকদের এবং কিয়ৎপরিমাণে অ্যাল্পো-দীনারীয়দের আর্যভাষাই সদ্যজায়মান বাঙালী জনকে একটা নূতন মানসরূপ দান করিল; আদিম বাঙালীর আদি-অস্ট্রেলীয় ও দ্রবিড় মন ও প্রকৃতির উপর ব্রাত্য অ্যাল্পো-দীনারীয় এবং মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মন ও প্রকৃতির চন্দনানুলেপন পড়িল এবং তাহাই বাঙালীকে, বাঙালী চরিত্রকে একটা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দান করিল। এই বিবর্তন-পরিবর্তন হাজার বৎসরেরও (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে খ্রীষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত মোটামুটি) অধিককাল ধরিয়া চলিয়াছিল।

যে প্রাগৈতিহাসিক কালের কাহিনী এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সেই কালের ঐতিহাসিক-গ্রাহ্য প্রমাণ সুদুর্লভ। তবু, নরতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব—এইসব উপায়ের সাহায্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এ পর্যন্ত যেসব নির্ধারণে পৌঁছিয়াছেন, তাহাই বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া, নানা ইংগিতগুলি ফুটাইয়া আমার এই রেখাচিত্র। এই ইতিহাস বাদ দিলে বাঙালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না: এই কারণেই আমি এমন ইংগিতে এই ইতিহাস উপস্থিত করিলাম যাহার ফলে বাঙালীর এবং বাংলার জীবনপ্রবাহের মূল উৎস আমাদের হৃদয়মনের নিকটতর হইতে পারে। "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।" এই অধ্যায় সেই 'সকালবেলায় সলতে পাকানো।'

তৃতীয় অধ্যায়

দেশ-পরিচয়

এক

দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাসকে জানিতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের যথার্থ ভৌগোলিক পরিচয় প্রয়োজন। দেশ এবং পাত্র অর্থাৎ দেশান্তর্গত বস্তু- ও প্রাণী -জগৎ কালকে তাহার বস্তুপ্রতিষ্ঠা দান করে। তখনই কালের বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তাই, ইতিহাসের অর্থই হইতেছে কাল, দেশ ও পাত্রের যথাযথ বর্ণনা এবং এই ত্রয়ীর সম্মিলিত রূপ ও তাহার ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাত্রের (দেশান্তর্গত প্রাণিজগতের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী সেই মানুষের) আদি কথা বলিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে দেশের বাস্তব বিবরণের কথা বলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কারণ দেশই হইতেছে মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি ও পরিবেশ। দেশের বস্তুগত রূপ বহুল পরিমাণে দেশান্তর্গত মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, সাধনা-সংস্কৃতি, আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নির্ণয় করে।

দুই

কোনও দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা এবং উহার ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা সর্বত্র সকল সময় এক না-ও হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় সীমা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। প্রাকৃতিক সীমা কখনও কখনও রাষ্ট্রসীমা নির্ধারণ করে; প্রাচীন ইতিহাসে তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমা প্রধানত নির্ণীত হয় ভূপ্রকৃতিগত সীমা দ্বারা, দ্বিতীয়ত একজনত্ব দ্বারা এবং তৃতীয়ত ভাষার একত্ব দ্বারা। সাধারণত দেখা যায় বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে। অন্তত, প্রাচীন বাংলায় তাহাই হইয়াছিল। জন ও ভাষার এই একত্ব-বৈশিষ্ট্য একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই একত্ব দানা বাঁধিতে বাঁধিতে প্রাচীন যুগের শেষাশেষি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মধ্যযুগের আগে তাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় নাই। বাংলার বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্র তাহাদের প্রাচীন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যসম্বন্ধে যখন আবদ্ধ হইল, যখন বিভিন্ন স্বতন্ত্র নাম পরিহার করিয়া এক বঙ্গ বা বাংলা নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল তখন বাংলার ইতিহাসের প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া, অপভ্রংশ পর্যায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাংলা ভাষা যখন তাহার যথার্থ আদিম

রূপ প্রকাশ করিল তখন আদিপর্ব শেষ না হইলেও প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। এই জন ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্তমান বাংলাদেশ এবং সেই দেশ চতুর্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত।

বাংলার উত্তর-সীমায় সিকিম এবং হিমালয়-কিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র শিখর; তাহারই নিম্ন উপত্যকায় বাংলার উত্তরতম দারজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা। এই দুই জেলার পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভোটান রাজ্যসীমা। দারজিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার এই তিনটি জেলাই প্রধানত পার্বত্য কোমদ্বারা অধ্যুষিত; কোচ, রাজবংশী, ভোটিয়া—ইহারা সকলেই ভোট-ব্রহ্ম জনের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা। উত্তর-পূর্ব দিকে রংপুর-কোচবিহারের প্রাকৃতিক সীমা একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নদই প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম সীমা নির্দেশ করিত। এই হিসাবে বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অধিকাংশই পুণ্ড্রবর্ধনের সীমাভুক্ত ছিল, এই অনুমান অসংগত নয়; মধ্যযুগে তো উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমতম প্রান্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলই।

বাংলার পূর্ব-সীমার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়; দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলশ্রেণীর বিন্যাস দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় বাংলার সীমা এই পার্বত্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। গোয়ালপাড়া জেলার মতো শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার কিয়দংশের লোকও বাংলাভাষাভাষী এবং সামাজিক স্মৃতিশাসন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি বাংলা-ভাষাভাষীর; জন ও জাতিও বাংলার। তাহা ছাড়া বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা মেঘনা উপত্যকারই উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে ত্রিপুরা ও পূর্ব-মৈমনসিং জেলার সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্টে-কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল। সিলেট সরকার আকবরের আমলে সুবা বাংলার অন্তর্গত ছিল; ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই জেলা ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ছিল। শ্রীহট্টের দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী এই দুই জেলা হইতে শ্রীহট্টকে এবং অন্যদিকে লুসাই জেলা ও ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলা-দেশকে পৃথক করিয়াছে। এই দুই শৈলশ্রেণী বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ সীমা-নির্দেশক।

উত্তরপ্রান্তে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমাই আধুনিক বাংলার সীমা নির্দেশ করিতেছে। অথচ, প্রাচীন ও মধ্য যুগে এই সীমা দক্ষিণে গঙ্গার তট বাহিয়া একেবারে দ্বারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বারভাঙ্গা তো দ্বারবঙ্গ (বা বঙ্গের দ্বার) শব্দেরই আধুনিক বিকৃত রূপ। পূর্ণিয়া সরকার আকবরের আমলেও বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল। তাহা ছাড়া কি ভূমি-প্রকৃতিতে কি প্রাচীন ভাষায় উত্তর-বিহার ও মিথিলার সঙ্গে উত্তর-বঙ্গ বা গৌড়পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর পার্থক্য অল্পই ছিল। উত্তর-বঙ্গ ও উত্তর-বিহারের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচিত হইয়াছে মধ্যযুগে। রাজমহল ও গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগনা প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমতম অংশ—ভবিষ্যপুরাণে এই ভূমিকে বলা হইয়াছে অজলা, উষর জঙ্গলময় ভূমি। এই জঙ্গলভূমিই য়ুয়ান-চোয়াঙ্-বর্ণিত কজঙ্গল। সুতরাং রাজমহল ও সাঁওতাল পরগনার কিয়দংশ যে বাংলার অন্তর্গত ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঁকুড়ার পশ্চিম-সীমায় মানভূম জেলা বর্তমানে বিহারের অন্তর্গত; অথচ এই মানভূম প্রাচীন মল্লভূমি=মালভূমেরই অন্তর্গত। বাঁকুড়া ও মানভূমের ভিতর কোন প্রাকৃতিক সীমা নাই;

সেই সীমা মানভূম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শৈলশ্রেণীই প্রাচীন বাংলার প্রান্তসীমা। ভাষায়, ভূপ্রকৃতিতে, সমাজ- ও কৌম -বিন্যাসে সাঁওতাল পরগনার সংগে যেমন উত্তর বীরভূমের, তেমনি মানভূমের সংগে বাঁকুড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দক্ষিণে মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমায় বালেশ্বর জেলা উড়িষ্যার অন্তর্গত এবং সিংহভূম বিহারের। এই দুইটি জেলারও কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত। উৎকল দেশও সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তির (বর্তমান দাঁতনের) অন্তর্গত ছিল। মনে হয়, রাজমহল হইতে যে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী এবং গৈরিক পার্বত্যভূমি দক্ষিণে সোজা প্রসারিত হইয়া ময়ূরভঞ্জ-কেওঞ্জর-বালেশ্বর স্পর্শ করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই বাংলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিম সীমা।

বাংলার দক্ষিণ-সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তাহারই তট ঘিরিয়া মেদিনীপুর-চব্বিশ পরগনা-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা ও ত্রিপুরার দক্ষিণতম প্রান্ত (অর্থাৎ চাঁদপুর)-নোয়াখালি-চট্টগ্রামের সমতট ভূমির সবুজ বনময় অথবা শস্যশ্যামল আস্তরণ। এই জেলাগুলির অধিকাংশ নিম্নভূমি ক্রমশ গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য নদনদীবাহিত পলিমাটি এবং সাগরগর্ভতাড়িত বালুকারাশির সমন্বয়ে।

এই প্রাকৃতিক-সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী-রাঢ়-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদীবিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য—ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য।

তিন

বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদী-গুলিই বাংলার প্রাণ; ইহারাই যুগে যুগে বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে, এখনও করিতেছে। এই নদীগুলিই বাংলার আশীর্বাদ, কখনও কখনও অভিশাপও। এইসব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমি গড়িয়াছে; সেই হেতু বদ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয়। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্ট ভূমি। বাংলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিক কালে উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার জলকে ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সহসা খাত-পরিবর্তনে কত দেশখণ্ডের চেহারা ও সুখসমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই দুরন্ত লীলার উপর আবার দূরদৃষ্টিহীন মানুষের দুর্বুদ্ধি, সাময়িক লোভ ও লাভের হিসাব জলনিকাশের ও প্রবাহের এইসব স্বাভাবিক পথগুলির সংগে যথেচ্ছাচারের ত্রুটি করে নাই। তাহার ফলে এইসব নদনদীগুলি বন্যায়

মহামারীতে দেশকে ক্ষণে ক্ষণে উজাড় করিয়া অথবা সুবিস্তৃত দেশখণ্ডকে শস্যহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করে না। প্রাচীন-কালে এই নদনদীগুলির প্রবাহপথের সঠিক ও সুস্পষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত নাই; পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে নদনদীগুলির ইতিহাস যতটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় নানা দেশী-বিদেশী বিবরণের ও নকশার সাহায্যে প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে নদনদীগুলির প্রবাহপথের যে চেহারা, তাহাদের যে আকৃতি-প্রকৃতি আমাদের দৃষ্টি- ও বুদ্ধি -গোচর, প্রাচীন বাংলায় সেই চেহারা সেই আকৃতি-প্রকৃতি অনেকেরই ছিল না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে; নূতন নদীর নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব নদনদীর ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। ইহাদের তীরে তীরে মনুষ্যসৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা। বাঙালী তাই এই নদীগুলিকে ভয়ভক্তি যেমন করিয়াছে, ভালও তেমনই বাসিয়াছে; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনই ভালবাসিয়া নাম দিয়াছে ইছামতী, ময়ুরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ) চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা, সুরমা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)।

বাংলার এই নদীগুলি সমগ্র পূর্ব-ভারতের দায় ও দায়িত্ব বহন করে। উত্তর-ভারতের প্রধানতম দুইটি নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলধারা, পলিপ্রবাহ এবং পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টিপাতপ্রবাহ বহন করিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার দায়িত্ব বহন করিতে হয় বাংলার কমনীয় মাটিকে। সেই মাটি সর্বত্র এই সুবিপুল জলপ্রবাহ বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই জলপ্রবাহ নূতন ভূমি যেমন গড়ে, মাঠে যেমন শস্য ফলায়, তেমনই ভূমি ভাঙেও, শস্য বিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভরে পদ্মাকে বলিয়াছে কীর্তিনাশা; পদ্মা বাঙালীর অনেক কীর্তিই নাশ করিয়াছে সত্য; অথচ এই মেঘনা-পদ্মাই তো আবার স্বর্ণশস্যের আকর; এই পদ্মার দুই তীরেই তো বাংলার ঘনতম মনুষ্যবসতি, সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের লীলা।

ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার নদ-নদীগুলি যে কতবার খাত বদলাইয়াছে তাহার কিছু কিছু হিসাব পাওয়া যায় বাংলার সমসাময়িক ভূমি-নকশায়। পর্তুগীজ, ডাচ্ ও ইংরাজ বণিক রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতেরা বাংলা ও ভারতের অনেকগুলি নকশা রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে বাংলার নদনদী ও জনপদগুলির ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি, পুরাতন নদীর মৃত্যু, নূতন নদীর জন্ম—সমস্তই এই নকশাগুলিতে ধরিতে পারা যায়। শুধু নকশাগুলিই নয়, ইব্‌ন্ বতুতা (১৩২৮-৫৪ খ্রীঃ) বারণি (চতুর্দশ শতক) রালফ্ ফিচ্ (১৫৮৩-৯১ খ্রীঃ) ফারনান্‌ডিজ (১৫৯৮ খ্রীঃ) ফনসেকা (১৫৯৯ খ্রীঃ) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গোবিন্দদাসের কড়চা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল জাতীয় সাহিত্যগ্রন্থ এবং মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাসেও এই পরিবর্তনের চেহারা ধরিতে পারা কঠিন নয়। ষোড়শ শতকের পরেই শুধু নয়, আগেও বাংলার প্রধান প্রধান নদনদীগুলি যুগে যুগে এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এমন অনুমান কিছুতেই অসংগত নয়; তাহার কিছু কিছু প্রমাণও আছে।

গঙ্গা-ভাগীরথী লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। তেলিগড় ও

সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম ছাড়িয়া রাজমহলকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের (১৬৬০) নকশায় দেখিতেছি, গঙ্গার তিনটি দক্ষিণবাহিনী শাখার জল কাসিমবাজারের একটু উত্তর হইতে একত্রবাহিত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সমুদ্রে। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পর রেনেলের (১৭৬৪-১৭৭৬) নকশায় দেখিতেছি, রাজমহলের দক্ষিণ-পূর্বে তিনটি বিভিন্ন শাখা একটিমাত্র শাখায় রূপান্তরিত এবং তাহাই দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা। রেনেল কিন্তু এই দক্ষিণবাহিনী নদীটিকে গঙ্গা বলিতেছেন না; তিনি গঙ্গা বলিতেছেন আর-একটি প্রবাহকে, আমরা যাহাকে বলি পদ্মা। ফান্ ডেন ব্রোকের আড়াইশত বৎসর আগে কবি কৃত্তিবাসের কাল (১৩২০ শক=১৪১৮-১৯ খ্রী)। কৃত্তিবাসের পিতৃভূমি ছিল বঙ্গে (পূর্ব বাংলায়); তাঁহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বঙ্গ (ভাগ) ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, যে-ফুলিয়ার "দক্ষিণে-পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী।" নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দক্ষিণবাহিনী নদী আমরা যাহাকে বলি ভাগীরথী (বর্তমান হুগলী নদী) তাহার কথাই কৃত্তিবাস বলিতেছেন। কিন্তু এই গঙ্গা ছোট গঙ্গা। কারণ, এগারো পার হইয়া কৃত্তিবাস যখন বারো বৎসরে প্রবেশ করিলেন তখন "পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়-গঙ্গা পার।" স্পষ্টতই গঙ্গার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী দুই প্রবাহকেই কৃত্তিবাস যথাক্রমে ছোট গঙ্গা ও বড় গঙ্গা বলিতেছেন। ইহা হইতে জানা গেল যে, পঞ্চদশ শতকের গোড়াতেই পদ্মা বৃহত্তরা নদী, উহাই বড় গঙ্গা। কিন্তু ঐতিহ্যমহিমায় কিংবা লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে বড় গঙ্গা ছোট গঙ্গার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। গঙ্গা-ভাগীরথীই যে প্রাচীনতরা এবং পুণ্যতোয়া নদী, এই সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও লিপিমালা একমত। পদ্মাকে গঙ্গা কখনও কখনও বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাগীরথী-জাহ্নবী একবারও বলা হয় নাই। ধোয়ীর পবনদূতে ত্রিবেণী-সংগমের ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে গঙ্গা; বল্লাল সেনের নৈহাটিলিপিতে গঙ্গা-ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে 'সুরসরিৎ' (দেবনদী)।

পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী সংকীর্ণতোয়া সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন তাহার প্রবাহ আজিকার মতো ক্ষীণ নয়; সাগরমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত বড় বড় বাণিজ্যতরীর চলাচল তখনও অব্যাহত। ফান্ ডেন ব্রোকের নকশায় এই পথের দুই ধারের নগর-বন্দরের এবং পূর্ব-ও-পশ্চিমাগত শাখা-প্রশাখা নদীগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। ফান্ ডেন ব্রোকের কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর আগে বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসামঙ্গলে এই প্রবাহপথের যে বিবরণ দিতেছেন তাহার সঙ্গে ফান্ ডেন ব্রোকের নকশার বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই এক। এই দুইজনের নিকট হইতে কয়েকটি প্রধান প্রধান তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহই, অন্তত কলিকাতা পর্যন্ত, পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতকের প্রধানতম প্রবাহ; দ্বিতীয়ত, ত্রিবেণীতে বা মুক্তবেণীতে সরস্বতী-ভাগীরথী-যমুনা-সংগম; তৃতীয়ত, কলিকাতা ও বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমানে আমরা যাহাকে বলি আদিগঙ্গা, সেই আদিগঙ্গার খাতেই ভাগীরথীর সমুদ্রযাত্রা। শোনা যায়, নবাব আলীবর্দীর আমলে কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমান ভাগীরথীপ্রবাহের প্রবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু আলীবর্দী নূতন প্রবাহপথ কাটিয়া বাহির করেন নাই; এ পথ আদিগঙ্গা অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক অপেক্ষাও পুরাতন, এবং বোধ হয়, সরস্বতীর প্রাচীনতর খাতের দক্ষিণতর অংশ।

পঞ্চদশ শতকের আগে ভাগীরথী অন্তত আংশিকত এই সরস্বতীর খাত দিয়াই

সমুদ্রে প্রবাহিত হইত, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আনুমানিক ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণে উলুবেড়িয়া-গঙ্গাসাগর খাতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, এমন লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। মৎস্য- ও -বায়ুপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত; এবং সম্ভবত সমুদ্রসন্নিকট গঙ্গার তীরেই ছিল তাম্রলিপ্তির সুবৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। মৎস্যপুরাণেই সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, বিন্ধ্য শৈলশ্রেণী (রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম শৈলমূল) -গাত্রে প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর (উত্তর-রাঢ়) বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত (সুহ্ম) দেশের ভিতর দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষেত্রে ভাগীরথীপ্রবাহের কথাই ইঙ্গিত করা হইতেছে এবং ইহাকেই বলা হইতেছে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। এই প্রবাহ উত্তর-রাঢ়দেশের ভিতর দিয়া দক্ষিণবাহী, এবং তাহার পূর্বে বঙ্গ, পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত। রাজমহল-গঙ্গাসাগরপ্রবাহই যে যথার্থত ভাগীরথী ইহাই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের ইঙ্গিত এবং এই প্রবাহের সঙ্গেই সুদূর অতীতের সূর্যবংশীয় ভগীরথ রাজার স্মৃতি বিজড়িত।

সপ্তগ্রামের নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি, কিন্তু সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী সোজা পশ্চিমবাহিনী হইয়া যুক্ত হইতেছে দামোদরপ্রবাহের সঙ্গে। দামোদর বর্ধমানের দক্ষিণে যেখান হইতে দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেইখানেই সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ এবং এই প্রবাহই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতর প্রবাহপথ; সরস্বতীর পথ ইহার নিম্ন অংশ মাত্র। তাম্রলিপ্তি হইতে এই পথে উজান বাহিয়া বাণিজ্যপোতগুলি পাটলিপুত্র-বারাণসী পর্যন্ত যাতায়াত করিত। এবং এই নদীতেই পশ্চিম দিকে ছোটনাগপুর-মানভূমের পাহাড় হইতে উৎসারিত স্ব-স্বতন্ত্র অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদ তাহাদের জলস্রোত ঢালিয়া দিত। দামোদর এবং রূপনারায়ণের প্রবাহপথ নিম্নপ্রবাহে ক্রমশ অধিকতর দক্ষিণবাহী হইয়াছে। দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহপথেই যে একসময় সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল, এমন অনুমান করিবার কারণ আছে। পরে সরস্বতী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার প্রবাহপথে কিছুদিন প্রবাহিত হইত। অষ্টম শতকের পরেই সরস্বতী-ভাগীরথীর এই প্রাচীনতর প্রবাহপথের মুখ এবং নিম্নতম প্রবাহ শুকাইয়া যায় এবং তাহার ফলেই তাম্রলিপ্ত বন্দর পরিত্যক্ত হয়। অষ্টম হইতে চতুর্দশ দশকের মধ্যে কোনও সময় সরস্বতী তাহার প্রাচীনতর পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানের খাত প্রবর্তন করিয়া থাকিবে এবং সেই খাতেও কিছুদিন ভাগীরথীর প্রবলতর স্রোত চলাচল করিয়া থাকিবে। দশম শতক হইতে নিম্নপ্রবাহে কলিকাতা-বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান পথই প্রধানতম পথ এবং আরও দক্ষিণে আদি-গঙ্গার পথ। আলীবর্দীর সময়ে আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হইয়া মধ্যযুগের সরস্বতীর পরিত্যক্ত পথেই গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ প্রবর্তিত হয়।

ত্রিবেণী-সংগমের অন্যতম নদী যমুনা। এই যমুনা এখন খুঁজিয়া বাহির করা আয়াসসাধ্য। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কালের 'যমুনা বিশাল অতি।' রেনেলের নকশায় যমুনা অতি খর্ব, ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র।

গঙ্গা-ভাগীরথীর উত্তর প্রবাহের কথা এইবার একটু বলা যাইতে পারে। প্রাচীন গৌড়ের পাঁচিশ মাইল দক্ষিণে এখন ভাগীরথী ও গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হইতেছে, কিন্তু প্রাচীন বাংলায়, অন্তত সপ্তদশ-শতক-পূর্ব বাংলায় গৌড়-লক্ষ্মণাবতী ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে। রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা খুব সম্ভব তখন খানিকটা উত্তর- ও

পূর্ব -বাহিনী হইয়া গৌড়কে পশ্চিম বা ডাইনে রাখিয়া রাঢ়দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইত। বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দা খুব সম্ভব এই উত্তর ও পূর্ব প্রবাহের প্রাচীন স্মৃতি বহন করে। ইহা আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতকের কথা; কিন্তু সপ্তদশ শতকেই গঙ্গা-ভাগীরথী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান পথ প্রবর্তন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেরও আগে বর্তমান প্রবাহপথের পশ্চিমে গঙ্গা-ভাগীরথীর উত্তর-প্রবাহের একটি প্রাচীনতর পথ বোধ হয় ছিল। পূর্ণিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের নিম্নভূমি ঘেঁষিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ঝিল ও নিম্ন জলাভূমিময় যে সুদীর্ঘ দক্ষিণবাহী রেখা চলিয়া গিয়াছে, সেই রেখাই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতম প্রবাহপথের নির্দেশক বলিয়া আমার ধারণা। এবং মৎস্যপুরাণোক্ত গঙ্গার প্রবাহপথের বর্ণনা আমার ধারণার পরিপোষক।

গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথের প্রাচীন ইতিহাস এখন এইভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে; (১) ঐতিহাসিক কালের সন্ধান-সম্ভাব্য প্রাচীনতম পথঃ পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হইয়া সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের তলদেশ দিয়া গঙ্গা সোজা দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িত; এই প্রবাহেই ছিল অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণের সংগম। এই তিনটি নদীই তখন নাতিদীর্ঘ। এবং এই প্রবাহেরই দক্ষিণতম সীমায় ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। (২) ইহার পরের পর্যায়েই গঙ্গার পূর্বদিক যাত্রা শুরু হইয়াছে। রাজমহল হইতে গঙ্গা খুব সম্ভব বর্তমান কালিন্দী-মহানন্দার খাতে উত্তর- ও পূর্ব -বাহিনী হইয়া গৌড়কে ডাইনে রাখিয়া পরে দক্ষিণ- ও দক্ষিণ-পশ্চিম -বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। তবে, তখনও দামোদর এবং রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার জল ভাগীরথীতে পড়িতেছে এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরও জীবন্ত। এই পর্যায় অষ্টম শতকের আগেই। (৩) তৃতীয় পর্যায়েও গৌড় গঙ্গার পশ্চিম তীরে; কিন্তু তাম্রলিপ্ত বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ দামোদর-রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার এবং কিছুদিনের জন্য সরস্বতীর জল লইয়া ভাগীরথীর যে পশ্চিমতর প্রবাহ তাহার পরিবর্তে কলিকাতা-বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথ এবং বেতড়ের দক্ষিণে আদিগঙ্গাপথের প্রবর্তন হইয়াছে। আলীবর্দীর সময়ে (মোটামুটি ১৭৫০) আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হওয়ায় বেতড়ের দক্ষিণে পুরাতন সরস্বতীর খাতে ভাগীরথীকে প্রবাহিত করা হয়। কর্নেল টলি আদিগঙ্গার খাতের খানিকটা অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৭৮৫); তাঁহার নামানুসারেই টালির নালা ও টালিগঞ্জ যথাক্রমে এই খাত এবং বামতীরের পল্লীটির বর্তমান নামকরণ।

আগেই বলিয়াছি, বড় গঙ্গা বা পদ্মা অর্বাচীনা নদী; কিন্তু পদ্মাকে যতটা অর্বাচীন পণ্ডিতেরা সাধারণত মনে করেন ততটা অর্বাচীন হয়তো সে নয়। রেনেল ও ফান্ ডেন ব্রোকের নকশায় পদ্মা বেগবতী নদী। সিহাবুদ্দিন তালিস্ (১৬৬৬) ও মির্জা নাথনের (১৬৬৪) বিবরণীতে দেখিতেছি ভুলুয়া এবং সন্দ্বীপের পাশ দিয়া গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহের সমুদ্রযাত্রা। কিন্তু তখনও সর্বত্র গঙ্গার এই প্রবাহের পদ্মা নামকরণ দেখিতেছি না। এই নামকরণ দেখিতেছি আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (১৫৯৬-৯৭), মির্জা নাথনের গ্রন্থে, ত্রিপুরা রাজমালায় এবং চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ-প্রসঙ্গে। আবুল ফজলের মতে কাজিহাটার কাছে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে; একটি প্রবাহ পূর্ববাহিনী হইয়া পদ্মা নাম লইয়া চট্টগ্রামের কাছে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ত্রিপুরা-রাজ বিজয়মাণিক্য ১৫৫৯ খ্রীঃ

যাত্রাপুরে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও (জন্ম, ১৪৮৫) ২২ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন, কোনও কোনও চৈতন্যজীবনীতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকেই পদ্মা প্রসিদ্ধা নদী, তাহার কিছু তীর্থমহিমাও আছে এবং চট্টগ্রামের নিকট তাহার সাগরমুখ এ তথ্য তাহা হইলে অনস্বীকার্য। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় কৃত্তিবাস যে এই পদ্মাবতীকেই বলিতেছেন বড় গঙ্গা তাহা তো আগেই দেখিয়াছি। ইব্‌ন্ বতুতা (১৩৪৫-৪৬ খ্রী) চট্টগ্রামকে হিন্দুতীর্থ গঙ্গানদী এবং যমুনা নদীর সংগমস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যমুনা বলিতে বতুতা ব্রহ্মপুত্রকেই বুঝাইতেছেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে, অন্তত চতুর্দশ শতকেও গঙ্গার পদ্মাবতী-প্রবাহ চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাহার অদূরে সেই প্রবাহ ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহের সহিত মিলিত হইত। তটভূমি প্রসারের সংগে সংগে চট্টগ্রাম এখন অনেক পূর্ব-দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে, ঢাকাও আর গংগা-পদ্মার উপর অবস্থিত নয়; পদ্মা এখন অনেক দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে, ঢাকা এখন পুরাতন গঙ্গা-পদ্মার খাত অর্থাৎ বুড়ীগংগার উপর অবস্থিত; পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) সংগম এখন গোয়ালন্দের অদূরে; এই মিলিত প্রবাহ আরও পূর্ব-দক্ষিণে গিয়া চাঁদপুরের অদূরে মেঘনার সংগে মিলিত হইয়া সন্দ্বীপের নিকট গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।

চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণের আগে বহুদিন এই প্রবাহের কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। একাদশ শতকের গোড়ায় চন্দ্রবংশীয় রাজা মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র তাঁহার ইদিলপুর পট্টোলী দ্বারা 'সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের' অন্তর্গত 'কুমারতালক মণ্ডলে' একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন। সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে দশম-একাদশ শতকে পদ্মা বা পদ্মাবতীর প্রবাহ ইদিলপুর-বিক্রমপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ঐদিক দিয়াই বোধ হয় সাগরে প্রবাহিত হইত; কুমারতালক মণ্ডলের (যে-মণ্ডল কুমার নদীর তল বা অববাহিকা) উল্লেখ হইতে অনুমান হয়, কুমার নদীও তখন বর্তমান ছিল এবং পদ্মার সংগে তাহার যোগও ছিল।

ইদিলপুর পট্টোলীর প্রায় সমসাময়িক চর্যাগীতির একটি পদেও বোধ হয় রূপকছলে পদ্মানদীর উল্লেখ আছে। পদটি সিদ্ধাচার্য ভুসুকুর রচনা এবং ভুসুকু একাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক। পদের প্রথম চারিটি লাইনের আপাত অর্থ এই: 'পদ্মাখালে বজ্রনৌকা পাড়ি বাহিতেছি। অদ্বয়-বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল। ভুসু, তুই আজ (যথার্থ) বঙ্গালী হইলি। চণ্ডালীকে তুই নিজের ঘরণী করিয়া লইয়াছিস।' সমস্ত পদটির সহজিয়া-মতানুগত গুহ্য অর্থ তো আছেই, তবে সেই গুহ্য অর্থ গড়িয়া উঠিয়াছে কয়েকটি বস্তুসম্পর্কগত শব্দকে অবলম্বন করিয়া। ভুসুকু বঙ্গালী অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণবঙ্গবাসী ছিলেন। ১০২১-২৫ খ্রীঃ রাজেন্দ্র চোল দক্ষিণ-রাঢ়ের পরই বঙ্গাল দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং এই বঙ্গাল দেশ অন্তত বিক্রমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যখন বঙ্গালী ও বঙ্গাল দেশের সংগে পদ্মা খালের কথা বলিতেছেন তখন 'পঁউআ খাল' এবং পদ্মা যে এক এবং অভিন্ন এ কথা স্বীকার করিতে আপত্তির কারণ নাই। ইদিলপুর-লিপি এবং ভুসুকুর এই পদটিই পদ্মা নদীর প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উল্লেখ।

দশম-একাদশ শতকে পদ্মার উল্লেখ দেখা গেল। কিন্তু মনে হয় গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বযাত্রার প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মা দশম-একাদশ শতক হইতেও প্রাচীন।

তবে তখন বোধ হয় পদ্মা এত প্রশস্তা ও বেগবতী নদী ছিল না, হয়তো ক্ষীণতোয়া সংকীর্ণধারাই ছিল। তাহা না হইলে য়ুয়ান-চোয়াঙ-এর বিবরণীতে আমরা নদীটির উল্লেখ পাইতাম। জ্যোতির্বেত্তা ও ভৌগোলিক টলেমি তাঁহার আন্তর্গাঙ্গেয় নকশা ও বিবরণীতে গঙ্গাপ্রবাহের পাঁচটি মুখের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষ্য ও পরবর্তী ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু অনুমান ঐতিহাসিকেরা করিয়াছেন এবং এইসব মোহনা অবলম্বনে প্রাচীন ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহপথেরও কিছু আভাস দিয়াছেন। ইঁহাদের কোনও কোনও মত সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয় টলেমির সময়েই অন্তত ঢাকা-ফরিদপুর পর্যন্ত পদ্মার প্রবাহ-পথের অস্তিত্ব ছিল।

পদ্মার প্রাচীনতম প্রবাহপথের নিশানা সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। মনে হয়, রাজসাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ার পাশ দিয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরীর খাত দিয়া ঢাকার পাশ দিয়া মেঘনা-খাড়িতে গিয়া পদ্মা সমুদ্রে মিশিত। ঢাকার পাশের নদীটিকে যে বুড়ীগঙ্গা বলা হয়, তাহা এই কারণেই। ঐ বুড়ী-গঙ্গাই প্রাচীন পদ্মা-গঙ্গার খাত।

পদ্মার প্রধান প্রবাহ ছাড়া পদ্মা হইতে নির্গত আরও কয়েকটি নদীর প্রবাহপথে ভাগীরথী-পদ্মার জল নিষ্কাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে জলাঙ্গী ও চন্দনা নদী দুইটি পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে প্রবাহিত। পদ্মা হইতে সমুদ্রে প্রবাহিত প্রাচীন নদীগুলির মধ্যে কুমার প্রধান ও প্রাচীনতর; মধ্যযুগে ভৈরবও ছিল অন্যতম। কুমার এবং ভৈরব দুইই এখন মরণোন্মুখ। বর্তমানে সাগরগামী পদ্মাশাখাগুলির মধ্যে মধুমতী ও আড়িয়ল খাঁই প্রধান। ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গা যেমন পদ্মার উত্তরতম প্রবাহপথের স্মারক, আড়িয়ল খাঁ তেমনই দক্ষিণতম প্রবাহপথের দ্যোতক।

ভাগীরথী-পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বুঝা যায়, দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতটীয় ভূভাগে অর্থাৎ নদী দুইটির অসংখ্য খাড়ি-খাড়িকাকে লইয়া কী তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে যুগের পর যুগ। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মন্ড হারবারের সাগরসঙ্গম পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশ পরগনার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য বা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি, কখনওবা নদীগর্ভে বিলীন, আবার কখনও খাড়ি-খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের একাধিক তাম্রপট্টোলীতে নব্যাবকাশিকা (নবসৃষ্ট ভূমি) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে নব্যাবকাশিকা সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র, অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্ন-জলাভূমি। খুলনার নিম্ন অঞ্চলে তো ভাঙাগড়া মধ্যযুগে এবং খুব সাম্প্রতিক কালেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। মধ্যযুগে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, তারানাথ প্রভৃতি লেখকরা, ময়নামতীর গান ও মানিকচন্দ্র রাজার গান-রচয়িতারা ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত নিম্নাঞ্চলটাকেই ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ভাটিরই কিয়দংশ প্রাচীন বাংলার সমতট, এইরূপ অনুমান বোধ হয় খুব অসংগত নয়।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে সুন্দরবন অঞ্চলে, চব্বিশ পরগনা-খুলনা-বাখরগঞ্জের নিম্নভূমিতে; এবং সমস্ত পরিবর্তনটাই ঘটিয়াছে মধ্যযুগে।

কারণ, এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমানে ঘন বসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। খাড়ি পরগনায় প্রাপ্ত অসংখ্য পাথরের মূর্তি, দু-চারটি ভগ্ন মন্দির, কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা ইত্যাদি সমস্তই চব্বিশ-পরগনা জেলার নিম্নভূমিতে প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত করে। অথচ, আজ এইসব অঞ্চল পরিত্যক্ত; অনেক অংশেই অরণ্য। খুলনার দিকে এবং বাখরগঞ্জের কিয়দংশে তো এখনও গভীর অরণ্য।

আকবরের আমলে মাহ্‌মুদাবাদ ও খলিফাতাবাদ সরকারের অন্তর্গত বর্তমান ফরিদপুর, যশোহর ও নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ গভীর-অরণ্যময় ছিল। পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে এবং ষোড়শ শতকের গোড়ায় কয়েকজন সুলতান এই সব অরণ্যে কিছু কিছু নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন। জেসুইট্ পাদ্রী ফারনান্‌ডিজ (১৫৯৮) হুগলী হইতে শ্রীপুর হইয়া চট্টগ্রামের সমস্ত পথটাই ব্যাঘ্রসংকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফন্‌সেকা (১৫৯৯) বাক্‌লা হইতে সপ্তগ্রামের পথ বানর- ও হরিণ -অধ্যুষিত বনময় ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। ষোড়শ শতকের শেষদিকে প্রতাপাদিত্য যশোরে সুন্দরবন অঞ্চলেই নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতকের পর কোনও সময় চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নভূমি কোনও অজ্ঞাত অনির্ধারিত কারণে পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর হইতেই এই অঞ্চল গভীর-অরণ্যময়। যশোর-খুলনা ও ফরিদপুরের নিম্নভূমিতে হিন্দু আমলেই ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ জনপদ গড়িয়া উঠিতেছিল এবং নূতন নূতন আবাদ পাঠান আমলেও নূতন জনপদ গড়িয়া তুলিতেছিল, কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডব এবং মানুষের ধ্বংসলীলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই ইহার উপর যবনিকা টানিয়া দেয়। ইহার উপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উন্মত্ত হত্যা ও লুণ্ঠনলীলা; তাহার ফলে বাখরগঞ্জ ও খুলনার নিম্নভূমি একেবারে জনমানবহীন গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া গেল।

পদ্মার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রবাহে উত্তর হইতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র অতি প্রাচীন নদ এবং তাহার তীর্থমহিমাও নেহাত অর্বাচীন নয়। পদ্মা-ভাগীরথীর ন্যায় ব্রহ্মপুত্রও অন্তত কয়েকবার খাত পরিবর্তন করিয়া যমুনা-পদ্মার পথে বর্তমান খাত গ্রহণ করিয়াছে এবং চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে। উত্তরপ্রবাহে লৌহিত্যের খাত পরিবর্তনের প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই। গারো পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ মোড় ঘুরিয়াই লৌহিত্য ঐ পাহাড়ের তলভূমি ঘেঁষিয়া, দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়া, শেরপুর-জামালপুরের ভিতর দিয়া, মধুপুর গড়ের পাশ দিয়া, মৈমনসিংহ জেলাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, বর্তমান ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল ভেদ করিয়া সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁর দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পাশ দিয়া ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইত। এই খাতই প্রাচীন এবং ব্রহ্মপুত্রের যাহা কিছু তীর্থমহিমা তাহা এই খাতেরই; জামালপুর-মৈমনসিংহ-লাঙ্গলবন্দের অষ্টমী-স্নান পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্মোৎসব।

ঢাকা জেলার উত্তরে এই ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহেরই ডান দিক হইতে একটি শাখাপ্রবাহ নির্গত হইয়াছে; ইহার নাম লক্ষ্যা (শীতললক্ষ্যা, শীতলক্ষ্যা)। লক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিক দিয়া ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া ঢাকার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জের

নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হইত। লক্ষ্যার এই প্রবাহ এখন ক্ষীণ, কিন্তু উনবিংশ শতকের গোড়ায়ও লক্ষ্যা প্রশস্তা বেগবতী নদী ছিল।

সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন ব্রোকের (১৬৬০) আগেই ব্রহ্মপুত্র ধলেশ্বরীর খাত পরিত্যাগ করিয়াছিল। কারণ ঐ সময়কার নকশাতে দেখা যায়, বর্তমান ঢাকা জেলার সীমায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বে মৈমনসিংহের ভিতর দিয়া আসিয়া পূর্ব-দক্ষিণতম কোণে ভৈরব-বাজার বন্দরের নিকট উত্তরাগত সুরমা-মেঘনার মিলন ঘটিতেছে এবং উভয়ের সম্মিলিত ধারা চাঁদপুরের দক্ষিণে সন্দ্বীপের উত্তরে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ভৈরব-বাজারের নিকট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত এই ধারা রেনেলের সময়েও (১৭৬৪) মেঘনা নামেই খ্যাত। ব্রহ্মপুত্র এই প্রবাহও পরিত্যাগ করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কোনও সময়। তখন হইতে ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবলতর হইয়া উঠে এবং বগুড়া-পাবনার পূর্বসীমাবাহিতা এই যমুনাই ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বহন করিয়া আনিয়া এখন গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা-প্রবাহে ঢালিয়া দিতেছে।

সপ্তদশ শতকে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ-ইতিহাস সুস্পষ্ট; চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের বা তাহার আগেকার প্রবাহের ইঙ্গিতও কিছু পাওয়া যাইতেছে দেওয়ানগঞ্জ জামালপুর-লাঙ্গলবন্দ ধলেশ্বরীর পথে। কিন্তু তাহার পূর্বে এই পথের ইতিহাস কোথাও পাইতেছি না। লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে এবং লিপি-মালায় অপ্রচুর নয়। প্রাচীন কামরূপ রাজ্য ছিল এই লৌহিত্যের তীরে। গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত ষষ্ঠ শতকের শেষাশেষি লৌহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এইসব প্রাচীন উল্লেখ সাধারণত লৌহিত্যের উত্তর-প্রবাহ সম্বন্ধে।

মেঘনা সম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলমালা হইতে মেঘনার উদ্ভব, কিন্তু উত্তর-প্রবাহে মেঘনা সুরমা নামেই খ্যাত এবং এই নামটি প্রাচীন। সুরমা শ্রীহট্ট জেলার ভিতর দিয়া মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়া ভৈরব-বাজারে একসময় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হইত। সুরমা যেখান হইতে পশ্চিমাগতি ছাড়িয়া দক্ষিণাগতি লইয়াছে, সেখান হইতে মেঘনা নামও লইয়াছে। এই নদীপথের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই। মেঘনার নিম্ন-প্রবাহের দুই তীরে সমৃদ্ধ জনপদের পরিচয় চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণেই পাওয়া যায়।

উত্তর-বঙ্গের নদনদীগুলির কথা এইবার বলা যাইতে পারে। উত্তর-বঙ্গের সর্বপ্রধান নদী করতোয়া। এই নদীর ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং ইহার তীর্থমহিমা বহুখ্যাত। করতোয়া-মাহাত্ম্য নামে সুপ্রাচীন পুঁথি ছাড়াও, মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়েও করতোয়া পুণ্যতোয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুন্দনগল (পুণ্ড্রনগর=বর্তমান মহাস্থানগড়, বগুড়ার অদূরে) এই করতোয়ার উপরেই অবস্থিত ছিল। খুব প্রাচীন কালেও যে করতোয়া বগুড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা মহাস্থানের অবস্থিতি হইতেই প্রমাণিত হয়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ যাইবার পথে এই করতোয়া নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; এই নদীই যে সপ্তম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপের মধ্যবর্তী সীমা এ খবরও টাং-সু গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের কবিপ্রশস্তিতে বলা হইয়াছে, বরেন্দ্রী দেশ গঙ্গা ও করতোয়ার

মধ্যবর্তী দেশ। বরেন্দ্রীর অন্তর্ভুক্ত গ্রাম ও নগরগুলির অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে সন্দেহ থাকে না যে সপ্তম শতকে বরেন্দ্রীর পূর্বদিক ঘিরিয়া পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব-সীমা দিয়া করতোয়া প্রবাহিত হইত।

করতোয়া ভোটান-সীমান্তের উত্তরে হিমালয় হইতে উৎসারিত হইয়া দারজিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরতম প্রবাহে ইহার নাম করতোয়া নয়, দিস্তাং বা তিস্তা, যাহার সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ি হইতে তিস্তার তিনটি স্রোত তিন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; দক্ষিণ-বাহী পূর্বতম স্রোতের নাম করতোয়া, দক্ষিণবাহী মধ্যবর্তী স্রোতোধারার নাম আত্রাই; দক্ষিণবাহী পশ্চিমতর স্রোতের নাম পূর্ণভবা বা পুনর্ভবা। একসময় মহানন্দা (এবং পুনর্ভবা) লক্ষ্মণাবতী-গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়া করতোয়ায় নিজের জলপ্রবাহ নিষ্কাশিত করিত, এমন প্রমাণ আছে। আত্রাই তিস্তা হইতে নির্গত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া জাফরগঞ্জের নিকটে করতোয়ার সহিত মিলিত হইত। দেখা যাইতেছে, তিস্তা হইতে নির্গত দুইটি স্রোতই উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া তাহাদের জলরাশি শেষ পর্যন্ত ঢালিয়া দিত তৃতীয় স্রোতটিতে অর্থাৎ করতোয়ায়; তাহা ছাড়া, সে নিজের এবং উত্তরতম প্রবাহ তিস্তার সমস্ত জলধারা তো বহন করিতই। এইসব কারণেই ষোড়শ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত করতোয়া ছিল অত্যন্ত বেগবতী নদী। আজ করতোয়া মৃতপ্রায়; আত্রাই-পুনর্ভবারও একই দশা। কিন্তু সপ্তদশ শতকেও অবস্থা তত খারাপ হয় নাই। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের নকশায়ও আত্রাই ও করতোয়ার মোটামুটি সমৃদ্ধ রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কিন্তু ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে হিমালয়-সানুর বিরাট বন্যায় আত্রাই-করতোয়ার সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গেল। উত্তর-প্রবাহে যে তিস্তা এই নদী দুইটির সমৃদ্ধির মূলে সেই তিস্তা তখন হইতে ব্রহ্মপুত্রমুখী, সে আর পুনর্ভবা আত্রাই-করতোয়ায় হিমালয়নদীমালার জল প্রেরণ করে না। এবং আজ যে এই নদী তিনটি, বিশেষভাবে করতোয়া, ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতেছে, তাহার কারণও তাহাই।

উত্তর-বঙ্গের আর-একটি প্রসিদ্ধ নদী কৌশিকী (বর্তমান কোশী)। কোশী উত্তর-বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। অথচ, এই নদী এক সময় ছিল পূর্ববাহী এবং ব্রহ্মপুত্রগামী; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া ধীরে ধীরে খাত পরিবর্তন করিতে করিতে কোশী পূর্ব হইতে একেবারে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। কোশী প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার নদীবিন্যাসের ইতিহাসে এক বিরাট বিস্ময়। কোশী (এবং মহানন্দার) এইরূপ বিস্ময়কর খাত পরিবর্তনের ফলেই গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হইয়া অস্বাস্থ্যকর এবং অনাবাসযোগ্য হইয়া উঠে, বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত হয় এবং অবশেষে পরিত্যক্ত হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার প্রধান প্রধান নদনদীর প্রবাহপথের খানিকটা ইতিহাস এইখানে ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলা দেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আলোচনাকালে এই কথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে এইসব নদনদীর প্রবাহপথ বারবার যেমন পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রাচীন কালেও সেইরূপ হইয়াছে, বিশেষত, পদ্মা ও গঙ্গার নিম্ন-প্রবাহে, নিম্ন-বঙ্গের সমস্ত তট জুড়িয়া, এমন কি উত্তর- ও পূর্ব -বঙ্গেও। বর্তমানেও এই ভাঙা-গড়া চলিতেছে।

চার

প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে যেসব গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রায়ই দেখা যায়, গ্রামের প্রান্তসীমায় রাজপথের উল্লেখ। অনুমান করিতে বাধা নাই, এই পথগুলিই গ্রাম হইতে গ্রামে ও নগরে বিস্তৃত ছিল। নূতন নূতন গ্রাম ও নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যাতায়াতপথ ক্রমশ বিস্তৃত হইয়াছে, এই অনুমান করা চলে। এইসব সাধারণ স্থলপথ ছাড়া নদীমাতৃক দেশের অসংখ্য নদনদী, খাটা-খাটিকা, খাল-বিল, যানিকা-স্রোতিকা ইত্যাদি বাহিয়া জলপথ তো ছিলই। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে যত লিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই এইসব জলস্রোতের উল্লেখ সুপ্রচুর। ইহাতে সহজেই মনের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে, জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াতই ছিল স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা প্রশস্ততর। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই নৌকা যাতায়াত পূর্ববঙ্গে, পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে অর্থাৎ নদনদীবহুল নিম্নশায়ী দেশগুলিতেই বেশি ছিল।

এইসব সাধারণ যাতায়াতপথ ছাড়া দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত এবং দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে যেসব স্থল- ও জল -পথ বিস্তৃত ছিল, যেসব পথ বাহিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য নরনারী তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ ও বিচিত্রকর্ম উপলক্ষে—সর্বোপরি শ্রেষ্ঠী, বণিক ও সার্থবাহের দল ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত করিত সেইসব সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত বহুপদলাঞ্ছিত পথগুলির বিবরণই উল্লেখযোগ্য। এইসব পথ দেশের শুধু যাতায়াতপথ নয়, বাণিজ্যপথও বটে এবং এইসব পথ বাহিয়াই বাংলাদেশে লক্ষ্মীর আনাগোনা। এইসব বহু পথই বর্তমান রেলপথগুলির পূর্ব পর্যন্ত শুধু লক্ষ্মীর নয়, সরস্বতীরও আনাগোনার পথ ছিল; রেলপথগুলি সাধারণত সেইসব সুপ্রাচীন পথ বাহিয়াই প্রতিষ্ঠিত।

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের স্থলপথের বিবরণ স্বল্প। লিপিগুলিতে, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে এবং কিছু সমসাময়িক সাহিত্যে কয়েকটি মাত্র প্রান্তাতিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকেরা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলেন এবং সেইসব বাণিজ্যপথের বিবরণই তাঁহারা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। তবু, ফা হিয়ান বা য়ুয়ান-চোয়াঙের মতো পর্যটক, যাঁহারা এক জনপদ হইতে অন্য জনপদে কিছু কিছু ঘোরাঘুরি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গত অন্তর্দেশের পথের ইঙ্গিতও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। এইসব পথ শুধু অন্তর্বঙ্গপথ নয়; বরং এই পথ বাহিয়াই বাংলাদেশ প্রাচীনকালে সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সকল প্রকার যোগ রক্ষা করিত।

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত পথের উল্লেখ আছে। ইৎসিঙ্ (সপ্তম শতকের তৃতীয় পাদের শেষাশেষি) তাম্রলিপ্তি হইতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখী একটি পথের ইঙ্গিত দিতেছেন। অষ্টম শতকের একটি শিলালিপিতে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতে মোটামুটি আন্তর্দেশিক পথগুলির একটু ইঙ্গিত পাইতেছি। চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর জেলা) হইতে তিনি আসিয়াছিলেন কজঙ্গলে (উত্তর রাঢ়); কজঙ্গল হইতে তিনি

গিয়াছেন পুণ্ড্রবর্ধনে; সেখান হইতে কামরূপ, কামরূপ হইতে সমতট (ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, ২৪ পরগনার নিম্নভূমি); সমতট হইতে তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুর); তাম্রলিপ্তি হইতে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা); এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ যেসব সুদীর্ঘ পথগুলির দ্বারা পরস্পরসংযুক্ত ছিল সেইসব পথের ইঙ্গিত য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী হইতে পাওয়া গেল। এইসব পথ তিনি নিজে আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার বহু আগে হইতেই বহু যানের চক্রপেষণে, বহু পশু ও বহু মানবের পদতাড়নায় এইসব পথ প্রশস্ত হইয়াছিল, তাঁহার পরেও বহুকাল পর্যন্ত এইসব পথ ক্রমাগত ব্যবহৃত হইয়া আজিকার রেলপথে বিবর্তিত হইয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের কোনো রেলপথই নূতন সৃষ্ট নবাবিষ্কৃত পথ নহে, প্রত্যেকটিই প্রাচীন পথের নিশানা ধরিয়া চলিয়াছে।

দেশ হইতে দেশান্তরের পথগুলির ইঙ্গিত এইবার ধরিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, বাংলাদেশ হইতে তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। একটি পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গ হইতে মিথিলা বা উত্তর-বিহার ভেদ করিয়া চম্পা (ভাগলপুর) হইয়া পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়া বুদ্ধগয়া স্পর্শ করিয়া বারাণসী-অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সেখান হইতে একেবারে সিন্ধু-সৌরাষ্ট্র-গুজরাটের বন্দর পর্যন্ত। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় গৌড় হইতে গুজরাট পর্যন্ত বাণিজ্যপথের ইঙ্গিত আছে। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী ও কথাসরিৎসাগরের গল্প হইতেও এই পথের আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পথটিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতেই। এই পথটি তাম্রলিপ্তি হইতে উত্তরাভিমুখী হইয়া কর্ণসুবর্ণের ভিতর দিয়া রাজমহল-চম্পা স্পর্শ করিয়া পাটলিপুত্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পথটির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে ইৎসিঙের বিবরণ এবং অষ্টমশতকীয় একটি লিপিতে। এই পথ তাম্রলিপ্তি হইতে সোজা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বুদ্ধগয়ার ভিতর দিয়া অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই তিনটি পথ আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাংলাদেশ উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত।

বাংলার পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে চীন ও তিব্বত। উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের ভিতর দিয়া বাংলাদেশ এই উত্তরশায়ী দেশ দুইটির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত। এই পথের বিবরণ পাওয়া যায় য়ুয়ান-চোয়াঙ এবং কিয়া-তানের ভ্রমণবৃত্তান্তে, চীন-রাজদূত চাঙ্-কিয়েনের প্রতিবেদনে এবং মুহম্মদ ইবন্ বখ্তিয়ারের আসাম তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত সুবিখ্যাত শিলা-লিপিটিতে। এই সাক্ষ্যগুলি হইতে পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ এবং কামরূপ হইতে সমতট পর্যন্ত দুইটি সুদীর্ঘ পথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এই দুই পথ দিয়া প্রাচীন কামরূপ এবং সুবর্ণকুড্যকের সমৃদ্ধ ও সুচারু বস্ত্রশিল্প, অগুরু, চন্দন, হাতি প্রভৃতি বাংলাদেশে আমদানি হইত এবং বাংলার সামুদ্রিক বন্দর ও আন্তর্দেশিক বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি হইতে রপ্তানি হইত। কিন্তু কামরূপই পূর্বাভিমুখী এই পথের শেষ সীমা নয়। য়ুয়ান-চোয়াঙের অন্তত সাতশত বৎসর আগে চাঙ্-কিয়েন নামক চৈনিক রাজদূত দক্ষিণ-চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-ব্রহ্ম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া কামরূপ হইয়া আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ পথের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিয়া-তান্ (৭৮৫-৮০৫ খৃঃ) নামে আর-

একজন চীনা পরিব্রাজক টাঁংকিন শহর হইতে কামরূপ পর্যন্ত আর-একটি পথের খবর বলিতেছেন। এই পথ কামরূপ হইতে আসিয়া, করতোয়া নদী পার হইয়া, পুণ্ড্রবর্ধনের ভিতর দিয়া, গঙ্গা পার হইয়া কজঙ্গল এবং সেখান হইতে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মহম্মদ ইবন বখ্‌তিয়ারের অভিযান সংক্রান্ত শিলালিপি হইতে মনে হয়, কামরূপ হইতে তিব্বত পর্যন্ত একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল। কামরূপে আসিয়া এই পথ চাঙ্‌-কিয়েন কথিত চীন-ভারত-আফগানিস্থান প্রান্তাতিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের সঙ্গে মিলিত হইত। হইতে পারে, এই পথ দিয়াও বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতী দূতেরা মগধ ও বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে যাতায়াত করিতেন।

কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আর-একটি পার্বত্য পথও বোধ হয় ছিল। এই পথ জলপাইগুড়ি-দারজিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম, ভোটান পার হইয়া হিমালয় গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া তিব্বতের মধ্য দিয়া চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস-গ্রন্থে (প্রথম শতক) এই পথের একটু ইঙ্গিত আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে, চীনদেশ হইতে যে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গদেশে আসিত তাহা পূর্বোক্ত কামরূপের পথে বা এই সদ্যোক্ত পথ বাহিয়া আসিত বলিয়াই মনে হয়। এই দুইটি পথের কোনটাই এখন আর বহুল ব্যবহৃত নয়। পার্বত্য প্রদেশের লোকেরাই শুধু এই পথ ব্যবহার করিয়া থাকে বঙ্গ ও আসামের সমভূমিতে আসিবার প্রয়োজনে। চাঙ-কিয়েন কথিত আসাম-দক্ষিণ-পূর্ব চীনের পথে লোক যাতায়াত মধ্যযুগেও ছিল, কিছুকাল আগেও ছিল। আসামে ও বাংলায় গোপনে আফিম আমদানি তো এই পথেই হইয়া থাকে। গত ভারত-ব্রহ্ম-চীন-জাপান যুদ্ধের তাগাদায় এই পথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশ হইতে পূর্বাভিমুখী আর-একটি স্থলপথ উল্লেখযোগ্য। এই পথটি পূর্ব-বাংলার ত্রিপুরা জেলার লালমাই-ময়নামতী (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান শ্রীহট্ট-শিলচর) ভিতর দিয়া, লুসাই পাহাড়ের উপর দিয়া, মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মদেশ ভেদ করিয়া মধ্য-ব্রহ্মদেশে পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পট্টিকেরা রাজ্যের সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের পাগান রাষ্ট্রের খুব ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই দুই রাজ্যের সংযোগ ছিল এই সদ্যোক্ত পথে; মধ্যযুগে মণিপুর-ব্রহ্মযুদ্ধের সৈন্যসামন্তও এই পথ দিয়াই যাওয়া-আসা করিয়াছে।

দক্ষিণশায়ী চট্টগ্রাম হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া নিম্ন-ব্রহ্মের প্রোম বা প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত আর-একটি পথের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। নবম-একাদশ শতকে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা সুপরিচিত। মধ্যযুগে আরাকান মুসলমান রাজসভায়ও বাংলা সাহিত্যের প্রচুর সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। অবশ্য চট্টগ্রাম-আরাকান-প্রোম স্থলপথের সমান্তরালবাহী জলপথও একটি ছিল।

আর-একটি স্থলপথের উল্লেখ করিলেই স্থলপথবৃত্তান্ত শেষ হইবে। এই পথটি তাম্রলিপ্তি-তমলুক হইতে, কর্ণসুবর্ণ হইতে সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া বাংলাদেশকে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌ এই পথ ধরিয়াই কর্ণসুবর্ণ

হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল, অন্ধ্র হইয়া দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। পাল ও সেন রাজারা এই পথেই দক্ষিণ দেশ আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চিম-চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্য, চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল এবং পূর্ব-গঙ্গবংশের রাজারা এই পথেই বঙ্গদেশ আক্রমণে সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। এই পথেই চৈতন্যদেব নীলাচল ও দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিলেন। এই পথেই বর্তমান কালের মাদ্রাজ পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত।

এইবার আন্তর্দেশিক নদী বা সামুদ্রিক জলপথের কথা বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য কয়েকটি জাতক-কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। এইসব জাতকের গল্পে দেখা যায় মধ্যদেশের বণিকরা বারাণসী বা চম্পা হইতে জাহাজে করিয়া গঙ্গা-ভাগীরথীপথে তাম্রলিপ্তি আসিত এবং সেখান হইতে বঙ্গোপসাগরের কূল ধরিয়া সিংহলে অথবা সুবর্ণভূমিতে (নিম্ন ব্রহ্মদেশ) যাইত। মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে আহৃত তথ্যে জানা যায়, ভাগীরথী-গঙ্গার উজান বাহিয়া সাগরমুখের বন্দর হইতে বাণিজ্যতরীগুলি প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের তদানীন্তন রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত যাওয়া-আসা করিত। নদীপথে গঙ্গা-ভাগীরথী বাহিয়াই বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তর-ভারতের যোগাযোগ ছিল। এ পথ প্রাগৈতিহাসিক এবং রেলপথ সূত্রপাতের পূর্বে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াত এই পথেই ছিল বেশি। ঊনবিংশ শতকেও বাঙালী নৌকাপথে কাশীধামে যাতায়াত করিত।

প্রাচীন বাংলার অন্য দুইটি প্রধান নদী করতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য-পথে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াতের সাক্ষ্য বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে, কামরূপ হইতে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত এক জলপথের ইংগিত পাওয়া যায় য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতে। এ কথা অনুমান করিতে কিছুমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না যে, উত্তর-আসামের রেশমজাতীয় বস্ত্রসম্ভার, বাঁশ, কাঠ, চন্দনকাঠ, পান-সুপারি, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-সুরমা-মেঘনা বাহিয়াই বাংলাদেশে আসিত। বাঁশ, কাঠ, ঘর ছাইবার খড় ইত্যাদি তো আজও ভাটির স্রোতে ভেলায় ভাসাইয়া বাংলাদেশে আনা হয়। পাট এবং ধান-চাল তো আজও নৌকাপথেই আমদানি-রপ্তানি হয় বেশি, বিশেষত পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং আসাম ও সুরমা-উপত্যকা অঞ্চলে। এক সময় উত্তর-বঙ্গ ও দক্ষিণ-বঙ্গে যোগাযোগ যে করতোয়া-নদীপথেই ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এ কথা আগেও বলিয়াছি যে, এই নদীমাতৃক দেশে স্থলপথ অপেক্ষা নদীপথেই যাতায়াত ও বাণিজ্য প্রশস্ততর ছিল।

নদীপথে আন্তর্দেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্যপথের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনেক বেশি পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহল ও সুবর্ণদ্বীপ যাত্রার কথা বলিয়াছি। সিংহলী ইতিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে উল্লিখিত লাড়দেশীয় রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃক সমুদ্রপথে সিংহল গমন এবং দ্বীপটি অধিকারের গল্পেতিহ্য সুপরিচিত। এ সাক্ষ্য ছাড়াও এই সম্বন্ধে অন্য প্রাচীন সাক্ষ্য বিদ্যমান। পেরিপ্লাসের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বঙ্গদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল; সমুদ্রপথে গঙ্গাবন্দর হইতে বাণিজ্যসম্ভার লইয়া বহু জাহাজ দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহলে যাতায়াত করিত। প্লিনিও এই বাণিজ্যপথের উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্থ শতকে ফা হিয়ান্ তাম্রলিপ্তি হইতে এক বাণিজ্য-জাহাজে চাড়িয়া সিংহল যান। ফা হিয়ানের পর হইতেই বহু চীন বৌদ্ধ সুপ্রিব্রাজক সিংহলে-বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করিতেন;

এবং তাহা সদ্যোক্ত সমুদ্রপথেই। সপ্তম শতকে ইৎসিঙের বিবরণী পাঠে জানা যায়, ঐ সময় অসংখ্য চীনদেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণ এই পথে বাংলা-সিংহলে যাতায়াত করিয়াছিলেন। অষ্টম শতকের পর বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরে বহুদিন এই পথের কথা আর শোনা যায় না; তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয়, তখন এই পথ ধরিয়া অর্থাৎ সমুদ্রোপকূল বাহিয়া সিংহল হইয়া গুজরাত পর্যন্ত সমুদ্রপথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। সিংহল হইতে মালয়, নিম্ন-ব্রহ্ম, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা, কম্বোজের সমুদ্রপথ তো ছিলই এবং তাহার প্রমাণও সুপ্রচুর।

তাম্রলিপ্তি হইতে নিম্ন-ব্রহ্মদেশ বা সুবর্ণভূমির দ্বিতীয় সমুদ্রপথের যে ইঙ্গিত মহাযান জাতকের গল্পে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সম্ভবত ছিল চট্টগ্রাম-আরাকানের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া। একাদশ শতকে এবং পরে মধ্যযুগে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আনাগোনা এই পথেই হইত। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও বাংলার সহিত নিম্ন-ব্রহ্মের সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুদূর স্মৃতি ধরিতে পারা কঠিন নয়। সুপারগ জাতকের গল্পেও পূর্ব-ভারতের বণিকদের সুবর্ণভূমিতে যাত্রার কথা আছে। মধ্যযুগে চীন বণিক ও পরিব্রাজকেরা, আরব বণিকেরা এবং পরে পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম হইতে এই সমুদ্রোপকূল বাহিয়াই আরাকান ও নিম্ন-ব্রহ্মদেশে যাওয়া-আসা করিতেন, এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়। ইৎসিঙ্ সপ্তম শতকেই একজন চীন পরিব্রাজকের মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রকূলবর্তী কেডা হইতে সোজা তাম্রলিপ্তি যাইবার সংবাদ দিয়াছেন। এই পথটির আভাস বোধ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতেই পাইতেছি। মহানাবিক বুধগুপ্তের যে-লিপিটি মালয়-উপদ্বীপে পাওয়া গিয়াছে সেই লিপিটিতে দেখিতেছি, বুধগুপ্ত বাণিজ্য-ব্যপদেশে রক্তমৃত্তিকা হইতে সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন মালয়ে। এই রক্তমৃত্তিকা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটি হওয়াই সম্ভব। নবম শতকের মাঝামাঝি দেবপালের নালন্দা-লিপিতেও বঙ্গসাগর বাহিয়া এক সমুদ্রপথের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

তৃতীয় আর-একটি পথের কথাও বলিতে হয়। এই পথের সর্বপ্রাচীন সংবাদ দিতেছেন ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বেত্তা টলেমি। তাম্রলিপ্তি হইতে যাত্রা করিয়া জাহাজগুলি সোজা আসিত উড়িষ্যা দেশের পলোরা বন্দরে এবং সেখান হইতে কোনাকুনি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া যাইত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-উপদ্বীপগুলিতে।

পাঁচ

নদনদী ও পাহাড়-পর্বত মিলিয়া বাংলার ভূ-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে এবং তাহা ইতিহাস আরম্ভ হইবার পূর্বেই। ঐতিহাসিক কালেও ভূ-প্রকৃতির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বিশেষত নবগঠিত ভূমিতে। তাহাতে প্রাগৈতিহাসিক কালের নবগঠিত ভূমি প্রসারিত হইয়াছে; কিন্তু ভূ-প্রকৃতির মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই, পুরাভূমিতেও নয়, নবভূমিতেও নয়।

ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পশ্চিমে বাংলার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংহভূম; ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত; তাহারই পূর্বদিক ঘেঁষিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকভূমি। মালভূমি অংশ একান্তই পার্বত্য, বনময়, অজলা এবং অনুর্বর। এখনও এই অংশে গভীর শালবন, পার্বত্য আকর ও কয়লার খনি। প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের অনেক অংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং তাম্রলিপ্তি রাজ্যেরও কিয়ৎ-পশ্চিমাংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ-রাঢ়ের রানীগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বন-বিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনী-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চল এই পুরাভূমিরই নিম্ন অংশ। এইসব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী (শিলাই), কাঁপিশা (কাসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। মুর্শিদাবাদের বহুলাংশ, বর্ধমানের পূর্বাংশ, বাঁকুড়ার স্বল্পাংশ, হুগলী-হাওড়া এবং মেদিনীপুরের পূর্বাংশ সদ্যোক্ত নদনদীগুলি- এবং ভাগীরথীপ্রবাহ -দ্বারা সৃষ্ট নবগঠিত ভূমি।

পশ্চিমবঙ্গের এই ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন সমর্থন কিছু কিছু পাওয়া যায়। ভট্ট ভবদেব (একাদশ শতক) তাঁহার ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে রাঢ়দেশের অজলা জঙ্গলময় প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অংশে রাঢ়ীখণ্ড-জাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে; বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম ও অজয় নদ এই দেশেব অন্তর্গত। এখানে কোথাও কোথাও লৌহ আকর আছে। ভবিষ্যপুরাণ ও ভবদেব ভট্ট-কথিত এই দেশের একাংশে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্-রামচরিত-বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি কথিত কয়ঙ্গল—কজঙ্গল—কজাঙ্গল—ক-চু-ওয়েন-কি'লো। বর্তমান কাঁকজোল এই ভূখণ্ডের স্মৃতিমাত্র বহন করে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ (সপ্তম শতক) বলিতেছেন, কজঙ্গলের উত্তর-সীমা গঙ্গা হইতে খুব বেশি দূরে নয়, ইহার দক্ষিণের বনপ্রদেশে বন্যহস্তী প্রচুর। এখানকার জনসাধারণ স্পষ্টাচারী, গুণবান এবং বিদ্যাচর্চার প্রতি ভক্তিমান। দেশটি সমতল, ভূমি জলীয় এবং সুশস্যপ্রসূ, বায়ু উষ্ণ। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তিনি কজঙ্গলের যে অংশে দামোদর-অজয়-ভাগীরথী উপত্যকা সেই অংশের কথা বলিতেছেন—যে অংশে বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম সেই অংশের কথা নয়। দক্ষিণের বনপ্রদেশ বন-বিষ্ণুপুর অঞ্চল বলিয়াই তো মনে হইতেছে।

য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরও বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। তাম্রলিপ্তির ভূমিও সমতল এবং জলীয়; বায়ু উষ্ণ, ফুল ফল শস্য প্রচুর। লোকের আচার-ব্যবহার রূঢ়, কিন্তু তাহারা খুব সাহসী। এই দেশে স্থল- ও জল -পথের সমন্বয়, এবং ইহার রাজধানী তাম্রলিপ্তির বন্দর সমুদ্রের একটি খাড়ির উপর অবস্থিত। এক্ষেত্রেও য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ মেদিনীপুরের পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ অংশের কথা বলিতেছেন —পশ্চিমের পার্বত্য অংশের কথা নয়।

য়ুয়ান্-চোয়াঙের সময় কর্ণসুবর্ণ লোকবহুল সমৃদ্ধ জনপদ। ভূমি ছিল সমতল এবং জলীয়, ফল ফুল শস্য ছিল প্রচুর; কৃষিকর্ম ভাল; বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। জনসাধারণ সচ্চরিত্র এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পোষক। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কর্ণসুবর্ণ

মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর সান্নিকটেই তিনি লো-টো-মো-চিহ্ নামক এক সুবৃহৎ বৌদ্ধ-বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন। লো-টো-মো-চিহ্ (=রক্তমৃত্তি=রক্তমৃত্তিকা) বর্তমান রাঙ্গামাটি; মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। রাঙ্গামাটি নামটি অর্থব্যঞ্জক। এই রাঙ্গামাটি সমতলভূমি হইলেও পুরাভূমির কিছু কিছু চিহ্ন যে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত রাঙ্গামাটি, লালবাগ প্রভৃতি নামের স্মৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। বাংলার অন্যত্রও যেখানে যেখানে স্থান-নামের সঙ্গে রাঙ্গা, লাল, রং প্রভৃতি শব্দ জড়িত সেই সব স্থান পুরাভূমির স্মৃতিবহ বলিয়াই মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে রাঙ্গামাটি, কুমিল্লার নিকটবর্তী লালমাটি বা লালমাই পাহাড়, রংপুর জেলা, আমিনগাঁও-এর পথে রাঙ্গিয়া রেলস্টেশন, তেজপুরের পথে রাঙ্গাপাড়া স্টেশন প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এই পুরাভূমির বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন রেখা চলিয়া গিয়াছে রাজমহলের নিকট গঙ্গা পার হইয়া ধলভূম-মানভূম-সিংভূম ধরিয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত। উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং মুর্শিদাবাদ এই পুরাভূমিরই বিস্তৃতাংশ। পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এই পুরাভূমিই গারো পাহাড় (মধুপুর গড় সহ), পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, তিনি পশ্চিম-বঙ্গের সমতল ভূমির ভূখণ্ডের সঙ্গেই পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সমতলভূমির পশ্চিমাঞ্চলের উত্তর অংশে ভবিষ্যপুরাণ-কথিত, বৈদ্যনাথ-বক্রেশ্বর-বীরভূমধৃত উষর ও জাঙ্গলময় যে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গলভূমি সেই ভূখণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। তিনি আসিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী এবং উৎসুক শিক্ষার্থী হিসাবে; বৌদ্ধধর্ম-সংঘ ও বিহারগুলির পরিচয় লাভই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এইসব বৌদ্ধবিহার বা শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সহজগম্য এবং লোকালয়প্রধান স্থানেই ছিল। কাজেই উষর, অনুর্বর ও জাঙ্গলময় স্থানগুলিতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই।

বগুড়া-রাজসাহীর উত্তর, দিনাজপুরের পূর্ব এবং রংপুরের পশ্চিম স্পর্শ করিয়া পূর্বোক্ত পুরাভূমির একটি বিস্তৃত স্ফীতি—উচ্চ গৈরিক ভূমি—দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাই মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্, বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রবিন্দু। এই বরিন্দের উত্তরে হিমালয়ের তরাই-পর্বতসানুর অস্বাস্থ্যকর জলীয় নিম্নভূমিতে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা, পুর্ণিয়ার কিয়দংশ। বরিন্দের গৈরিকভূমি অনুর্বর, পুরা-ভূমি। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ ঘিরিয়া তঙ্গন-আত্রাই, মহানন্দা-কোশী, পদ্মা-করতোয়ার জল ও পলিমাটি দ্বারা গঠিত নবভূমি। উপরোক্ত পুরোভূমিরেখাটুকু ছাড়া নবভূমির বাকি সবটাই সমতলভূমি, সুশস্যপ্রসূ, জলীয় এবং শ্যামল। বরিন্দ জনবিরল এবং মাটির রং গৈরিক; ঘন লোকবসতি সাধারণত পদ্মা-আত্রাই-করতোয়ার সমতলভূমিতেই দেখা যায়। প্রাচীন কালেও পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর সমৃদ্ধ জনপদগুলি সমস্তই এই নদনদীপ্লাবিত সমতলভূমিতে। রামচরিতে বরেন্দ্রভূমির যে শস্য-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সমৃদ্ধি সাধারণত এই সমতলভূমির।

বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন পুণ্ড্র, বা পুণ্ড্রবর্ধনেরই এক সুবৃহৎ অংশ, এমন কি কখনও কখনও সমার্থকও। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ভ্রমণব্যপদেশে পুণ্ড্রবর্ধনেও আসিয়াছিলেন। তখন এই দেশ সমৃদ্ধ, জনবহুল; ভূমি সমতল এবং জলীয়, শস্যসম্ভার প্রচুর, জল-বায়ু মৃদু। জনসাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান। আগেই বলিয়াছি, উত্তর-বঙ্গ এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু

প্রায় একই প্রকার। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কামরূপ-বিবরণ সেইজন্যই পুণ্ড্রবর্ধনের সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলিয়া যায়।

পশ্চিম-বাংলায় যেমন উত্তর-বঙ্গেও তেমনই, য়ুয়ান্-চোয়াঙের পরিচয় পুণ্ড্র-বর্ধনের সমতলভূমির সঙ্গে। কেন্দ্রভূমি বরিন্দের সঙ্গে বোধ হয় তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই। যাহাই হউক, রাঢ় ও উত্তর-বঙ্গের ভূ-প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা ও ভাগীরথীর ইতিহাস একত্রে স্মরণ করিলে মনে হয়, একসময় পুণ্ড্র-বরেন্দ্রভূমির সঙ্গে রাঢ়ভূমির, বিশেষত মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্দ্ধমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভাগীরথী যখন গৌড়কে ডাইনে রাখিয়া উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া পরে দক্ষিণবাহী হইত, পদ্মা যখন আরও সোজা পূর্ববাহী ছিল তখন তো পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর কিছুটা অংশ (মালদহ জেলা) রাঢ়ভূমির সঙ্গে যুক্তই ছিল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রাচীন বাংলার এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে বরাবরই ছিল। দিনাজপুর-রাজসাহী-মালদহের লোকভাষার প্রকৃতিও রাঢ়ের পূর্বাঞ্চলের লোক-ভাষা-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মোটামুটি-ভাবে পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী এবং রাঢ়-তাম্রলিপ্তিই বাংলাদেশের প্রাচীনতর পলিভূমি।

পূর্ব-বাংলা একান্তই নবভূমি এবং এই নবভূমি পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা-মেঘনার সৃষ্টি। এই নবভূমির উত্তরে, পূর্বে এবং পূর্ব-দক্ষিণে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী; ইহাদের সানু ও তলদেশ কোথাও কোথাও গৈরিক বালুকাময়, কখনও কখনও বালির শক্ত স্তরময়। চট্টগ্রামের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে হালিয়া-কান্দি অঞ্চল এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পুরাভূমির অন্তর্গতই বলিতে হয়। তাহা ছাড়া, ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার বিস্তৃত একটি অংশ জুড়িয়া গৈরিক পার্বত্য গজারী-বনময় একখণ্ড পুরাভূমির স্ফীতি দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা মধুপুর গড় নামে খ্যাত। ঢাকা জেলার ভাওয়ালের গড়ও তাহাই। পূর্ব-বাংলার আর সমস্ত ভূমিই জলীয় সমতলভূমি অর্থাৎ নবগঠিত ভূমি এবং এই ভূমি সর্বত্র খালবিল ও সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও এই নবগঠিত ভূমির দুইটি বিভাগ সুস্পষ্ট। ইহারই মধ্যে মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল-ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের বহুলাংশের গঠন পুরাতন এবং খুলনা, বাখরগঞ্জ, সমতল-নোয়াখালি ও সমতল-চট্টগ্রামের গঠন নূতন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অসংখ্য মূর্তি ও লিপি প্রথমোক্ত ভূখণ্ডে প্রাচীনকাল হইতেই বহুদিনস্থিত সমৃদ্ধ সভ্যতা ও জনা-বাসের দ্যোতক। এইসব পুরাতন-গঠন ভূখণ্ডকে অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এইসব ভূখণ্ডের তুলনায় খুলনা-বাখরগঞ্জ-নোয়াখালি-সমতল চট্টগ্রাম নূতন এবং লক্ষণীয় এই যে, এইসব ভূখণ্ডে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড় একটি চিহ্ন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

মধ্য- বা দক্ষিণ -বঙ্গে পুরাভূমির অস্তিত্ব কোথাও নাই; এই ভূমি একেবারে পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর সৃষ্টি এবং বাংলার নবভূমির অন্তর্ভুক্ত। খাড়িমণ্ডল-ব্যাঘ্রতটী-সমতট প্রভৃতি নাম লক্ষণীয়। নদীয়া জেলার কিয়দংশ, যশোহর, খুলনা এবং চব্বিশ-পরগনা এই ভূখণ্ডের অন্তর্গত। সমতট অবশ্য সমতল-ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—তাহার একাধিক লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান—কিন্তু সমতল ত্রিপুরাও তো ফরিদপুরের মতো নবভূমিরই অংশ। ইহাদের মধ্যে নদীয়া-যশোহর-চব্বিশ-পরগনা

পুরাতন-গঠন আর খুলনা-বাখরগঞ্জ নূতন-গঠন। চব্বিশ পরগনার গাঙ্গেয় অঞ্চল তো সুপ্রাচীন জনাবাস ও সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়াই মনে হয়।

য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ সমতটেও আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, এই সমতট সমুদ্র-তীরবর্তী দেশ; ইহার ভূমি জলীয় এবং সমতল। ইহার শস্যসম্ভার বা জনসমৃদ্ধি সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। য়ুয়ান্-চোয়াঙের সমতট তদানীন্তন যশোর-ফরিদপুর-ঢাকা অঞ্চল বলিয়াই যেন মনে হয়; অন্তত খুলনা-বাখরগঞ্জের ভূখণ্ড যে, নয় এ অনুমান বোধ হয় করা চলে। তখন বোধ হয় এইসব অঞ্চল ভাল করিয়া গড়িয়াই উঠে নাই। আগেই দেখিয়াছি, ষষ্ঠ শতকে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল নূতন সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র, তখনও তাহার নাম "নব্যাবকাশিকা"। বাখরগঞ্জের "নাব্য" অঞ্চল তাহার অনেক পরের সৃষ্টি।

জলবায়ু সম্বন্ধে য়ুয়ান্-চোয়াঙের সাক্ষ্য ভূ-প্রকৃতি প্রসঙ্গে কিছু কিছু জানা গিয়াছে; মোটামুটি একটা ধারণা তাহা হইতেই পাওয়া যায়। বাংলার জলবায়ু এখনও নাতিশীতোষ্ণ; তবে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত বীরভূমে, বর্ধমানের পশ্চিমাংশে এবং কতকটা মেদিনীপুরেও, গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর; অন্যত্র গ্রীষ্মের বায়ু উষ্ণ জলীয়। কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হইতেছে পূর্ব- ও উত্তর -বঙ্গে বারিপাতবাহুল্য। এই বারিপাত ভারত- মহাসাগর বাহিত মৌসুমী বায়ু -সঞ্জাত। এই বায়ু হিমালয়, গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া সমগ্র উত্তর- ও -পূর্ব বাংলাকে অবিরল বারিপাতে ভাসাইয়া দেয়। আর-একটি বায়ুপ্রবাহ বসন্তের। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের দক্ষিণা বাতাসের রূপকচ্ছলে কিঞ্চিৎ আভাস বোধ হয় ধোয়ী কবির পবনদূতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীতে বাংলার বসন্তকালীন পবনপ্রবাহের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতনামক সংকলনগ্রন্থে বিভিন্ন বাঙালী কবির রচিত বায়ুপ্রসঙ্গে প্রাকৃতিক বর্ণনাময় কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। বারিবাহী মৌসুমী বায়ুর কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে না; তবে, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে বঙ্গালদেশের অবিরল বারিপাতের একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। বর্ষার অবিরল বৃষ্টিপাত তো এখনও পূর্ব- ও দক্ষিণ -বঙ্গের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রাচ্যদেশ বাংলাদেশ যে প্রচুর জল এবং প্রচুর বারিপাতেরই দেশ, তাহা তো পাললিপির প্রসিদ্ধ "দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং" পদেই প্রমাণ। আর, গুরুগম্ভীর ঘন বর্ষায় মেদুর আকাশকে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" বলিয়া বাঙালী কবি জয়দেব যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, এবং তাহার শ্যামমহিমাকে যে চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা তো বাঙালীর একান্তই সুপরিচিত।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থ হইতে হেমন্তের বাংলার একটি ছবি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা গেল না; এটি একটি অজ্ঞাতনামা (বোধ হয় বাঙালী) কবির রচনা, এবং ধান্য- ও ইক্ষু -সমৃদ্ধ বাংলার অগ্রহায়ণ-পৌষের অনবদ্য মধুর বাস্তব চিত্র।

> কৃষকের বাড়ি কাটা শালিধান্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে [আঁটি আঁটি কাটা ধান আঙিনায় স্তূপীকৃত হইয়াছে—পৌষ মাসে এখনও যেমন হয়]; গ্রাম-সীমান্তের ক্ষেতে যে প্রচুর যব হইয়াছে তাহার শীষ নীলোৎপলের মতো স্নিগ্ধ শ্যাম; গোরু, বলদ ও ছাগলগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় পাইয়া আনন্দিত; অবিরত-ইক্ষুযন্ত্র-ধ্বনিমুখর [আখ-মাড়াই কলের শব্দে মুখরিত] গ্রামগুলি [নূতন ইক্ষু-] গুড়ের গন্ধে আমোদিত।

লোকি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত য়ুয়ান্-চোয়াঙের সাক্ষ্য হইতে ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। কজঙ্গলের লোকেরা স্পষ্টাচারী, গুণবান এবং শিক্ষাসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান; পুণ্ড্রবর্ধনের লোকেরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান; কামরূপের লোকেরা সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও হিংস্র প্রকৃতির; তাম্রলিপ্তির লোকেরা রূঢ়াচারী কিন্তু তাহারা কর্মঠ ও সাহসী; সমতটের লোকেরা কর্মঠ; কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ভদ্র ও সচ্চরিত্র এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সুপোষক; তাম্রলিপ্তির লোকেরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী। কিন্তু লোকপ্রকৃতির ব্যক্তিগত বিবরণ যথেষ্ট বস্তুগত ও প্রামাণিক সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। প্রথমত, এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির প্রশ্ন অনিবার্য; দ্বিতীয়ত, দুই-একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ হইতে সাধারণভাবে কয়েকটা মন্তব্যে পৌঁছানোও এইসব পর্যবেক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। তৎসত্ত্বেও বিদেশী লোকেরা বিভিন্ন সময়ে বাঙালীর লোকপ্রকৃতির সম্বন্ধে কী কী বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেন তাহার একটু হিসাব লওয়া হয়তো নিরর্থক নয়।

কামসূত্ররচয়িতা বাৎস্যায়ন (তৃতীয়-চতুর্থ শতক) বলিতেছেন, তাঁহার সময়ে প্রাচ্যদেশের লোকেরা মধ্যদেশের জনসাধারণ অপেক্ষা যৌন ও মিথুন ব্যাপারে অনেক বেশি শিষ্ট ছিল। প্রাচ্যদেশের অন্যান্য অনেক বিভাগের সঙ্গে গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটি বিভাগ তিনি জানিতেন; কাজেই তাঁহার এই মন্তব্য গৌড়-বঙ্গ সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই প্রযোজ্য। গৌড়বাসীরা সুপুরুষ ছিল, এ সাক্ষ্য বাৎস্যায়ন দিতেছেন এবং গৌড়নারীরা যে মৃদুভাষিণী, মৃদু-অঙ্গা এবং অনুরাগবতী ছিলেন তাহাও বলিতেছেন। তাহা ছাড়া তিনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক খবরও দিতেছেন। গৌড়পুরুষেরা আঙুলের সৌন্দর্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন, এবং মহিলারা নাকি তাহাতে খুব আকৃষ্টা হইতেন। অবশ্য বাংলার নগর-সভ্যতা তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শতকে যৌনব্যাপারে খুব নীতি- ও সংযম -পরায়ণ ছিল, অন্তত বর্তমান আদর্শে, তাহা মনে হয় না।

গৌড়বাসী সম্বন্ধে আরও খবর পাওয়া যাইতেছে: বাঙালীদের বিদ্যাচর্চায় অনুরাগের সাক্ষ্য য়ুয়ান্-চোয়াঙের নিকট হইতে আগেই পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, দেখা যাইতেছে, এখনকার মতো প্রাচীন কালেও বাঙালী ছাত্র ও শিক্ষকরূপে ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতবর্ষের বাহিরে যাতায়াত করিত। কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ গ্রন্থে কাশ্মীরে গৌড়দেশের ছাত্রদের বর্ণনা দিয়াছেন। গৌড়বাসীর অচির-ক্রোধপরায়ণতা এবং কলহপ্রিয়তা মিতাক্ষরা-লেখক বিজ্ঞানেশ্বরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে (আনুমানিক, পঞ্চম শতক) রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সুহ্মদের উল্লেখ আছে; কবি বলিতেছেন, বেতসলতা যেমন অবনত হইয়া নদীর স্রোতোবেগ হইতে আত্মরক্ষা করে, সুহ্মদেশীয় লোকেরা অবনত হইয়া উদ্ধত-উচ্ছেদ-কারী সেই রঘুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কবির এই উক্তির মধ্যে সুহ্ম-দেশীয়দের লোকপ্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা বলা শক্ত।

মহাবীর ও তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে ধর্মপ্রচারোদ্দেশে পথহীন লাঢ়দেশে, বজ্জ (বৃজ্জ?) ও সুব্ভভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক, খ্রীষ্টপূর্ব)। এই গল্পটি জৈনদের ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে বর্ণিত আছে। এই উপলক্ষে, এই কাহিনীটিতে রাঢ়বাসীদের রূঢ় আচরণের এবং বজ্জভূমিবাসীদের কুখাদ্য ভক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। তাহা ছাড়া, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প (অষ্টম শতক) গ্রন্থে গৌড় ও পুণ্ড্রের ভাষাকে অসুরভাষা বলা হইয়াছে। মহাভারতে

সমুদ্রতীরবাসী বঙ্গদের ম্লেচ্ছ এবং ভাগবত পুরাণে সুহ্মদের 'পাপ' কোম বলা হইয়াছে। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে, মধ্যদেশ বা আর্যাবর্ত হইতে বঙ্গদেশে গেলে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; এই দুই দেশ অশিষ্টভূমির অন্তর্গত এবং লোকেরা 'সংকীর্ণ-যোনয়ঃ'। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই সমস্ত উক্তি আর্যভাষাভাষী, আর্যসংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের উক্তি, এবং গৌড়-পুণ্ড্র-বঙ্গের অনার্য বা আর্যপূর্ব লোকদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ইহাদের জ্ঞানও ছিল না, শ্রদ্ধা-ভক্তিও ছিল না; কিন্তু আশ্চর্য এই, রাঢ়দেশবাসী মুকুন্দরামও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাঢ়দেশবাসীকে একটু রূঢ় ও হিংস্র প্রকৃতির লোক বলিয়াছেন। রাঢ়দেশের লোকেরা যে রূঢ় এবং অশিষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পদেও সুস্পষ্ট।

দক্ষিণ-রাঢ়ের ব্রাহ্মণেরা যে দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অংকে।

কবি ধোয়ী দক্ষিণ-রাঢ়ের (সুহ্মদেশের) প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন "রসময় সুহ্মদেশঃ।"

রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে হরিকেল (চন্দ্রদ্বীপ-শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-মৈমনসিং অঞ্চল) দেশের নারীদের খুব স্তুতিবাদ করা হইয়াছে, এবং রাঢ় ও কামরূপের নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতরা বলা হইয়াছে। রাজশেখর গৌড়াঙ্গনাগণের বেশভূষার বর্ণনা করিয়া যে স্তুতিবাদ করিয়াছেন সদুক্তিকর্ণামৃতনামক কাব্যসংকলন গ্রন্থে (১২০৬) তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলার ফলফুল-বৃক্ষলতা-শস্যসম্ভারের এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির পরিচয় দেশপরিচয়েরই অংশ; ধানসম্বল অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। ধান, যব, পাট, ইক্ষু, সরিষা, আম, মহুয়া, নানাবিধ বস্ত্র-সম্ভার, ধাতুদ্রব্য, খনিজদ্রব্য, লবণ পান, গুবাক, নারিকেল, বাঁশ, মাছ, ডালিম, ডুমুর (পর্কটী), খেজুর, পিপ্পল, এলাচ ইত্যাদি শস্য ও দ্রব্যসম্ভার কোথায় কী উৎপাদিত হইত তাহাও সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবজন্তু সম্বন্ধেও একই কথা।

ছয়

আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ। মুঘল আমলে এই দেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা-বাঙ্গালা নামের ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ (সংস্কৃত আলি, পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাই আবুল ফজলের ব্যাখ্যা। আল্ শুধু শস্যক্ষেত্রের আলি নয়, আল্ ছোটবড় বাঁধও বটে। এই নদীমাতৃক বারিবহুল দেশে বৃষ্টি, বন্যা এবং জোয়ারের স্রোত ঠেকাইবার জন্য ছোটবড় বাঁধ বাঁধা কৃষি ও বাস্তুভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। যেসব ভূখণ্ডে বারিপাত কম, ভূমি সাধারণত উষর, সেখানেও বর্ষার জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ছোট বড় বাঁধ বাঁধা প্রয়োজন হইত; এখনও হয়—যেমন বীরভূম অঞ্চলে। প্রাচীন লিপিতে এই ধরনের বাঁধের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ রকম দুই-

চারিটি বৃহৎ বাঁধ এখনও প্রাচীন অভ্যাসের স্মৃতি বহন করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রংপুর-বগুড়ার ভীমের (কৈবর্তরাজ ভীমের) জাঙ্গাল, বীরভূমের সিউড়ি অঞ্চলের দুই-চারিটি বাঁধের উল্লেখ করা যায়। আমার অনুমান, আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ এইঃ যে বঙ্গদেশ আল্- বা আলি -বহুল, যে-বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্টই হইতেছে আল্, সেই দেশই বাঙ্গালা বা বাংলা দেশ। মধ্যযুগের বাংলা-বাঙ্গালা, মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পর্যটকদের বেঙ্গালা—একই নাম। মার্কোপোলো এই দেশের নাম বলিতেছেন বাঙ্গালা, যদিও তাঁহার অবস্থিতিনির্দেশ স্পষ্টই ভ্রমাত্মক। যাহাই হউক, বাঙ্গালা-বাংলা নাম বর্তমান বঙ্গদেশের মোটামুটি প্রায় সমস্তটারই—কোনও কোনও দিকে বর্তমান সীমা অতিক্রমও করিয়াছে—উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে, মধ্যযুগীয় সাক্ষ্যে তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ-বঙ্গাল বলিতে যে দেশখণ্ড বুঝাইত তাহা বর্তমান বঙ্গ বা বাংলাদেশের সমার্থক নয়, বরং তাহার একটি অংশ মাত্র। প্রাচীন বাংলাদেশ যেসব জনপদে বিভক্ত ছিল বঙ্গ ও বঙ্গাল তাহার দুইটি বিভাগ মাত্র। এই দুইটি বিভাগের নাম হইতেই বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাংলাদেশের নামটির উৎপত্তি।

কিন্তু তাহার আগে জনপদবিভাগ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রাচীনতর সাক্ষ্যে, জনপদগুলির নাম যেভাবে আমরা পাই, তাহা ঠিক জনপদ বা স্থানের নাম নয়। বঙ্গ-গৌড়-পুণ্ড্র-রাঢ় এইসব কোম যেসব অঞ্চলে বাস করিত, পরে তাহাদের, অর্থাৎ সেই সেই অঞ্চলের নাম হইল বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি। এইভাবে বহুবচনে জনবাচক অর্থে এইসব নামের ব্যবহার একাদশ-দ্বাদশ শতকের সাক্ষ্য-প্রমাণেও দেখা যায়। দু-এক ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন সুবৃভ বা সুহ্মভূমি, বজ্জ বা বজ্রভূমি। দ্বিতীয়ত, জন হইতে বা জনকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত এক-একটি জনপদে এক-এক সময়ে এক-একটি রাষ্ট্র বা রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক সময়ে তাহাদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের সংকোচ বা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনপদটির সীমাও সংকুচিত বা বিস্তারিত হইয়াছে। পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য (সপ্তম শতক) এবং পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পুণ্ড্র-পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রভুক্তি; এই ভুক্তিটি এক সময়ে হিমালয়শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া (দামোদরপুর লিপি, পঞ্চম শতক) সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল (দ্বাদশ শতকে বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষদ্ লিপি)। অথচ, প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল বগুড়া-দিনাজপুর-রাজসাহী-রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করিয়া। বর্ধমান রাঢ় দেশের একটি অংশমাত্র ছিল, অথচ এক সময় এই বর্ধমান রাষ্ট্রবিভাগে রূপান্তরিত হইয়া বর্ধমানভুক্তি নাম লইয়া শুধু উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়-দেশকেই নয়, দণ্ডভুক্তি মণ্ডলকেও গ্রাস করিয়াছিল। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার বর্তমান দাঁতন অঞ্চল; এই অঞ্চল সপ্তম শতকে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুহ্মদেশ মোটামুটি দক্ষিণ-রাঢ়ের সমার্থক; মহাভারতে তাম্রলিপ্তিকে সুহ্মদেশ হইতে পৃথক বলা হইয়াছে; অধিকাংশ প্রাচীন সাক্ষ্যের ইঙ্গিতও তাহাই। কিন্তু দশকুমার-চরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপনায় তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্তকে আবার বঙ্গের অন্তর্ভুক্তও বলা হইয়াছে, অথচ প্রাচীন সাক্ষ্যের সর্বত্রই ইঙ্গিত এই যে, বঙ্গ ভাগীরথীর পূর্ব তীরে। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বুঝা যায়, রাষ্ট্রপরিধির বিস্তার ও সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে এক-

এক সময় এক-এক জনপদের সীমাও বিস্তারিত ও সংকুচিত হইয়াছে, সব জনপদের সীমা সকল সময় এক থাকে নাই। আসল কথা, প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্রসীমা সর্বত্র সকল সময় এক হয় না, প্রাচীন বাংলায়ও হয় নাই, জনপদবৃত্তান্ত পাঠের সময় এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এই জনপদকথা বলিবার সময় সেইজন্য প্রাকৃতিক সীমা নির্ধারণের চেষ্টাই প্রথম কর্তব্য, যদিও তাহা সহজসাধ্য নয়, সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রায়শ সুদুর্লভ। দ্বিতীয় কর্তব্য, বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট জনপদের রাষ্ট্রসীমার বিস্তার ও সংকোচ, এবং তাহার বিভিন্ন রাষ্ট্রগত ও সংস্কৃতিগত বিভাগের নির্দেশ। এ কাজও অত্যন্ত কঠিন; কারণ এক্ষেত্রেও সাক্ষ্যপ্রমাণ সুলভ নয়। তবু, যতটা সম্ভব মোটামুটি একটা ধারণা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বোধ হয় সর্বপ্রথম এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ" পদে বঙ্গজনদের বগধদের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। বগধ বোধ হয় মগধ। এবং এই গ্রন্থের ঋষিরা বঙ্গকে মগধের প্রতিবেশী জনপদ বলিয়াই জানিতেন বলিয়া মনে হয়। বোধায়নের ধর্মসূত্রে বঙ্গ জনপদটিকে কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আরট্ট,- পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ ও কলিঙ্গ -জনেরা একেবারে বৈদিকসংস্কৃতিবহির্ভূত, এবং তাহাদের দেশে যাতায়াত করিলে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, বোধায়ন এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। মহাভারতে দেখিতেছি, ভীম দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কোশীনদীতীরবর্তী পুণ্ড্র-রাজাকে পরাজিত করেন; তাহার পর, পর পর তিনি বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, প্রসুহ্ম রাজাদের এবং অনেক ম্লেচ্ছ কোমদের পরাভূত করেন। মহাভারতের আদিপর্বে বঙ্গজনদের উল্লেখ করা হইয়াছে অঙ্গ-কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম -জনপদের সঙ্গে; সভাপর্বে পুণ্ড্রদের সঙ্গে। রামায়ণেও অন্যান্য জনদের সঙ্গে বঙ্গজনদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই অযোধ্যায় অভিজাতবংশীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গজনেরা লাল (রাঢ়) জনদের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজ্ঞাপনা নামক একটি জৈন উপাঙ্গে বঙ্গজনদের সঙ্গে লাল (রাঢ়) জনদের উল্লেখ করিয়া উভয়কেই আর্য বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তকে বঙ্গজনদের অধিকারে বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মহাভারতের উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ, এবং প্রত্যেকটি দেশই স্ব-স্বতন্ত্র; কিন্তু জৈন উপাঙ্গটির ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, কোনও সময়ে তাম্রলিপ্ত বোধ হয় বঙ্গের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে। বঙ্গের উল্লেখ গুণ্টুর জেলার নাগার্জুনীকোণ্ড (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক) শিলালিপিতে, রাজা চন্দ্রের (চতুর্থ শতক) মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি এবং বাতাপীর (বাদামী) চালুক্যরাজ পুলকেশীর মহাকূট স্তম্ভলিপিতেও (সপ্তম শতক) দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের একটিতেও বঙ্গের অবস্থিতিনির্দেশ পাওয়া যায় না। কালিদাসের (চতুর্থ শতক?) রঘুবংশে এই নির্দেশ যেন অনেকটা স্পষ্ট। এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে পর পর পাঁচটি শ্লোক আছে। প্রথম দুইটি শ্লোকে তালীবনশ্যাম উপকূলে সুহ্ম জনদের পরাজয়ের কথা আছে; তার পরেই তিনি নৌসাধনোদ্যত বঙ্গজনদের পরাভূত করিয়া "গঙ্গাস্রোতোহন্তরে" জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গজনদের উৎখাত এবং প্রতিরোপিত করিয়া পরে তিনি কপিশা (কাসাই) নদী পার হইয়া উৎকলদিগের প্রদর্শিত পথে কলিঙ্গ অভিমুখে গিয়াছিলেন। মনে হয়

কালিদাসের সময়েও তাম্রলিপ্তি বঙ্গজনপদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রঘু সুহ্ম অর্থাৎ মোটামুটি দক্ষিণ রাঢ় জয় করিয়া বঙ্গ জয় করেন, এবং পরে কপিশা পার হইয়া উৎকলে যান। কিন্তু মহোদধির তালীবনশ্যামোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া সুহ্ম জয়ের উল্লেখ হইতে আমার মনে হয়, তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি সুহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল' দশকুমারচরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক; উভয়েই গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমান্তসংলগ্ন দেশ, এবং তাম্রলিপ্তিই যথার্থত সমুদ্রতীরবর্তী তালীবনশ্যাম ভূখণ্ড বলিয়া বর্ণিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে, বঙ্গ গঙ্গাস্রোতের বামে বা পূর্বদিকে হওয়া উচিত। পরবর্তী সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণে গঙ্গা-ভাগীরথীই যে বঙ্গের পশ্চিম সীমা, এই ইঙ্গিত বারবার পাওয়া যায়।

বৃহৎসংহিতায় উপবঙ্গ নামে একটি জনপদের উল্লেখ আছে। আনুমানিক ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক গ্রন্থে উপবঙ্গ বলিতে যশোর ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি কাননময় অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মনোরথ-পূরণি এবং অপদান নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গান্তপুত্ত এবং বঙ্গীশ এই দুইটি অভিধা হইতে মনে হয়, বঙ্গ শব্দটির সঙ্গে এই দুইটি অভিধার কোনও প্রকার যোগ ছিল, কিন্তু তাহাতে বঙ্গ, উপবঙ্গ, বঙ্গান্ত দেশের অবস্থিতির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবঙ্গ নামে আর-একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবঙ্গ পরবর্তী কালের অনুত্তর বঙ্গ বা দক্ষিণ-বঙ্গের মতো বঙ্গেরই একটি অংশ; কিন্তু ইহারও অবস্থিতি সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত আমাদের জানা নাই।

গুপ্ত আমলে বঙ্গের দুইটি বিভাগ ছিল বলিয়া মনে হয়। সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটিলিপিতে দেখিতেছি, সুবর্ণবীথিতে একজন উপরিকের শাসনকেন্দ্র ছিল। এই সুবর্ণবীথি নব্যাবকাশিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। নব্যাবকাশিকা যে ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চলের (ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের) নবগঠিত ভূমি তাহা তো আগেই বলিয়াছি। ঢাকা জেলার বর্তমান সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁ), সোনারং, সোনাকান্দি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে প্রাচীন সুবর্ণবীথির একটি অর্থগত যোগ আছে, এ অনুমান বোধ হয় সংগত।

পাল ও সেন আমলে বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বারবার বলা হইয়াছে, কিন্তু গুপ্ত আমলে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রবর্ধন দুই পৃথক রাষ্ট্রবিভাগে ছিল বলিয়া মনে হয়।

পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। মনে হয়, একাদশ শতকের শেষাশেষি বঙ্গের দুইটি বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল : একটি বঙ্গের উত্তরাঞ্চল, আর একটি অনুত্তর বা দক্ষিণাঞ্চল। অনুমান হয়, বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা, এবং সমুদ্রশায়ী খালনালা-সমাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনুত্তরবঙ্গ। অথবা, এমনও হইতে পারে, অনুত্তরবঙ্গ কোন বিশিষ্ট স্থানের নাম নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের বর্ণনাত্মক নাম মাত্র। কেশবসেন ও বিশ্বরূপ-সেন এই দুই সেনরাজদের আমলে বঙ্গের অন্তত দুইটি বিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে: একটি বিক্রমপুর-ভাগ, অপরটি নাব্য (ভাগ) বা নাবা (?) মণ্ডল। লিপিপ্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চল সমস্তটাই নাব্য নামে পরিচিত হইয়াছিল; এবং বর্তমান বিক্রমপুর

পরগনা সমগ্র এবং ইদিলপুর পরগনার কিয়দংশ লইয়া ছিল বিক্রমপুর ভাগ (কেশব-সেনের ইদিলপুর লিপি)।

বঙ্গের অবস্থিতি সম্বন্ধে বাৎস্যায়নকামসূত্রের টীকাকার যশোধর তাঁহার জয়মঙ্গলনাম্নী টীকায় বলিতেছেন ঃ বঙ্গ লৌহিত্যের পূর্বদিকে। যশোধরের এই উক্তি বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমত, প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে যশোধরের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত বিক্রমপুর পরগনা এবং ফরিদপুর-বাখরগঞ্জেরও কিয়দংশ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই সমস্ত ভূখণ্ডই ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে।

কোষকার হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধান-চিন্তামণিতে (দ্বাদশ শতক) বঙ্গ ও হরিকেলি জনপদ এক ও সমার্থক বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রাচ্যদেশের পূর্বতম সীমায় হরিকেলনামক জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় দুই চীন পরিব্রাজকের (সপ্তম শতক) বিবরণীতে। আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পগ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল তিনটি স্ব-স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য (খ্যা) এবং রূপচিন্তামোণিকোষ (রূপচিন্তামণিকোষ; পঞ্চদশ শতক) নামক দুইটি পাণ্ডুলিপিতে শ্রীহট্ট এবং হরিকোলা নামক জনপদ দুইটিকে এক বা সমার্থক বলা হইয়াছে। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে (নবম শতক) হরিকেলি জনপদের নারীদের খুব স্তুতিবাদ করা হইয়াছে, এবং তাহারা পূর্বদেশবাসিনী তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ডাকার্ণব-গ্রন্থে বর্ণিত চৌষট্টিটি তান্ত্রিক পীঠের একটি পীঠ হরিকেল, এবং এই হরিকেল ঢিক্‌কর, খাড়ি, রাঢ় এবং বঙ্গাল দেশ হইতে পৃথক। শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবকে আগে হরিকেল এবং পরে চন্দ্রদ্বীপেরও (বাখরগঞ্জ) রাজা বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অনুমান হয়, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। কান্তিদেবের চট্টগ্রামলিপিতে হরিকেলকে একটি মণ্ডল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে মনে হয়, হরিকেল সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ (চন্দ্রদ্বীপও বঙ্গে) এবং সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হইতেই হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হয। ডাকার্ণব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি দুইটির সাক্ষ্য একত্র করিলে হরিকেল বা হরিকোলা যে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। শ্রীহট্ট চৌষট্টি তান্ত্রিক পীঠের অন্যতম পীঠ। দ্বাদশ শতকে গুজরাটে বসিয়া হেমচন্দ্র যখন তাঁহার অভিধান লিখিতেছিলেন তখন তাঁহার পক্ষে বঙ্গ ও হরিকেল সমার্থক বলা হয়তো খুব অন্যায় হয় নাই।

আমরা শ্রীচন্দ্রের রামপাললিপিতে ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের প্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিয়াছি (দশম-একাদশ শতক)। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতেও চন্দ্রদ্বীপের তারামূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষদ লিপিতেও বোধ হয় [চ]ন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে (ত্রয়োদশ শতক); এই চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি পাটক নিশ্চয়ই ঘাঘর নদীর তীরবর্তী ঘাঘরকাটি নামক কোনও গ্রাম (বরিশাল জেলার ঝালকাটি প্রভৃতি কাটি-পদান্ত নাম লক্ষণীয়); এই ঘাঘর নদীর তীরেই ফুল্লশ্রী গ্রামে মনসার পাঁচালীর কবি বিজয়গুপ্তের (পঞ্চদশ শতক) বাসভূমি ছিল।

মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ সুপ্রসিদ্ধ স্থান। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের বাক্‌লা পরগনার বাক্‌লা সরকার (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলায়) আর চন্দ্রদ্বীপ একই স্থান বলিয়া বহুদিনই স্বীকৃত হইয়াছে। এই চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চল অন্তত ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে (চতুর্থ শতক) ডবাক-নেপাল-কর্তৃপুর-কামরূপের সঙ্গে, এবং বরাহমিহিরের (ষষ্ঠ শতক) বৃহৎ-সংহিতায় পুণ্ড্র-তাম্রলিপ্তক-বর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে সমতট নামে একটি জনপদের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে। সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয়, সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে। এই শতকেরই শেষাশেষি ইৎসিঙ্ সমতটে রাজভট নামে এক রাজার উল্লেখ করিতেছেন; রাজভট এবং আস্রফপুর পট্টোলীর (সপ্তম শতক) রাজ-রাজভট্ট একই ব্যক্তি। রাজরাজভট্টের অন্যতম রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলার বড়কাম্‌তা। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয় মধ্যবাংলার অন্তত কিয়দংশ এই সমতটের অংশ ছিল। অথচ, বর্তমান ত্রিপুরাও যে সমতটেরই অংশ ছিল, সপ্তম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তাহা অনস্বীকার্য; এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ সুপ্রচুর। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের দামোদরদেবের অপ্রকাশিত মেহার পট্টোলী ইত্যাদি সাক্ষ্যের ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ত্রিপুরা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্দ্র। এই কেন্দ্রস্থলটি যে একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পট্টিকেরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে (১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ); ব্রহ্মদেশীয় রাজবৃত্ত হ্মনান্ গ্রন্থে, এবং ১২২০ খ্রীষ্টাব্দের রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকাল দেবের একটি লিপিতে। কিন্তু অন্তত দ্বাদশ শতকে সমতটের পশ্চিম সীমা বোধ হয় মধ্য-বঙ্গ অতিক্রম করিয়া একেবারে বর্তমান চব্বিশ পরগনার খাড়ি পরগনা (প্রাচীন খাড়ি মণ্ডল) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিজয়সেনের বারাকপুর পট্টোলীতে দেখিতেছি খাড়ি মণ্ডলের ভূমির পরিমাপ করা হইতেছে "সমতটীয় নলেন"। সেনলিপিগুলিতে ভূমিপরিমাপের যে অভ্যাসের পরিচয় আমরা পাই তাহাতে মনে হয়, যে ভূখণ্ড যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত সেই জনপদে ব্যবহৃত নলেই ভূখণ্ডের পরিমাপ করা হইত। সেইজন্য মনে হয়, খাড়ি মণ্ডল তখন সমতটেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমতটের অর্থই হইতেছে তটের সঙ্গে যাহা সমান, অর্থাৎ সমুদ্রশায়ী নিম্নদেশ। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মেঘনা-মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডকেই বোধ হয় বলা হইত সমতট।

একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বঙ্গের একটি বিভাগের নূতন একটি নাম পাইতেছি, বঙ্গাল। বিজ্জল কলচুর্যের অবলুরালিপি, রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়-লিপি এবং আরও কয়েকটি দক্ষিণী লিপিতে প্রথম বঙ্গাল দেশের নামের উল্লেখ দেখিতেছি। অবলুরালিপি এবং আরও অন্তত দুটি দক্ষিণী লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি জনপদই একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এ অনুমান স্বাভাবিক যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল একাদশ শতকে দুই পৃথক জনপদ ছিল। পরেও ইহাদের পৃথক-ভাবেই গণ্য করা হইত। নয়চন্দ্র সূরীর হাম্মির মহাকাব্য (পঞ্চদশ শতক) এবং সাম্‌শ-ই-সিরাজ আফিফ্-র তারিখ-ই-ফিরুজসাহী গ্রন্থেও এই দুই জনপদকে পৃথকভাবে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু এই একাদশ শতকেরই রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়লিপি পাঠে মনে হয়, দক্ষিণ-রাঢ়ের পরেই ছিল বঙ্গাল দেশ, এবং দুই দেশের মধ্যসীমা ছিল বোধ হয় গঙ্গা-ভাগীরথী। লিপিতে উল্লিখিত রাজা

গোবিন্দচন্দ্র যে বংশের রাজা সেই বংশ যে হরিকেল-ত্রিপুরা-চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি ছিলেন, এ তথ্য ঐতিহাসিকদের কাছে সুবিদিত। বিক্রমপুর অঞ্চলেও গোবিন্দচন্দ্রের অন্তত দুইটি লিপিপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং এই অঞ্চলও গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত ছিল। দেখা যাইতেছে, একাদশ শতকে বঙ্গালদেশ বলিতে প্রায় সমস্ত পূর্ব-বঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতটশায়ী সমস্ত দেশখণ্ডকেই বুঝাইত। চন্দ্রদ্বীপ-হরিকেলও তখন বঙ্গাল দেশেরই অংশ। দ্বাদশ শতকে না হউক, ত্রয়োদশ শতকে এইসব অংশই আবার বঙ্গের বিক্রমপুর ও নাব্যভাগের অন্তর্গত। মানিকচন্দ্র রাজার গানের "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি" পদে অনুমান হয়, ভাটি ও বঙ্গাল দেশ এক সময়ে প্রায় সমার্থক ছিল। কিন্তু বঙ্গাল বা বাঙ্গাল দেশের কেন্দ্রস্থান বোধ হয় ছিল পূর্ববঙ্গে। গাস্টালডির (১৫৬১) নকশায় 'বেঙ্গালা'র অবস্থিতি যেন এই অঞ্চলেই দেখানো হইয়াছে; কিন্তু ষোড়শ শতক হইতে যত নকশা প্রায় প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি 'বেঙ্গালা'র অবস্থান আরও পূর্বদিকে। এই 'বেঙ্গালা' বন্দর যে কোন্ বন্দর তাহা বলা কঠিন; কেহ বলেন চট্টগ্রাম, কেহ বলেন প্রাচীন ঢাকা। ঢাকা শহরে বাঙ্গালা-বাজার এখনও প্রসিদ্ধ পল্লী ও বাজার; বাঙ্গালা-বাজার মধ্যযুগীয় 'বেঙ্গালা' বন্দরের স্মৃতি বহন করা অসম্ভব নয়।

পুণ্ড্রজনদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, এবং তারপরে বোধায়ন ধর্মসূত্রে। প্রথমোক্ত গ্রন্থের মতে ইহারা আর্যভূমির প্রাচ্য-প্রত্যন্ত দেশের দস্যু কোমদের অন্যতম; দ্বিতীয় গ্রন্থের মতে ইহারা সংকীর্ণযোনি, অপবিত্র, বঙ্গ- এবং কলিঙ্গ -জনদের ইহারা প্রতিবেশী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপ-আখ্যানের এই উল্লেখে দেখা যায়, পুণ্ড্ররা অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব কোমদের সংলগ্ন এবং আত্মীয় কোম। এই ধরনের একটি গল্প মহাভারতের আদিপর্বে আছে, একাধিক পুরাণেও আছে; সেখানে কিন্তু পুণ্ড্ররা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং সুহ্মদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। মানবধর্মশাস্ত্রে পুণ্ড্রদের বলা হইয়াছে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, যদিও মহাভারতের সভাপর্বে বঙ্গ ও পুণ্ড্র উভয় কোমকেই শুদ্ধজাত ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কর্ণ, কৃষ্ণ এবং ভীমের যুদ্ধ এবং দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও মহাভারতে পুণ্ড্র কোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ সুহ্ম, বঙ্গ এবং পুণ্ড্রদের পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গ ও অঙ্গকে একটি শাসন-বিষয়ে পরিণত করিয়া নিজে তাহার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণও একবার বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভীমের দিগ্বিজয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি মুদ্গগিরির (মুঙ্গের) রাজাকে নিহত করিয়া প্রতাপশালী পুণ্ড্ররাজ ও কোশী নদীর তীরবর্তী অন্য একজন ভূপালকে পরাভূত করেন, এবং তাহার পর বঙ্গরাজকে আক্রমণ করেন। উপরোক্ত উল্লেখগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, পুণ্ড্রদের জনপদ অঙ্গ, বঙ্গ এবং সুহ্ম কোমদের জনপদের সংলগ্ন, এবং হয়তো ইহারা একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, এই জনপদের অবস্থান মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের পূর্বদিকে এবং কোশী-তীরসংলগ্ন। জৈনদের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ কল্পসূত্রে গোদাসগণনামীয় জৈন সন্ন্যাসীদের তিনটি শাখার উল্লেখ আছে: তাম্রলিপ্তি শাখা, কোটীবর্ষ শাখা, পুণ্ড্রবর্ধন শাখা। এই তিনটি শাখার নামই বাংলার দুইটি জনপদ এবং একটি নগর হইতে উদ্ভূত। কোটীবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নগর। খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে এক পুদনগল বা পুণ্ড্র-

নগরের উল্লেখ আছে। এই পুন্দনগলই বোধ হয় ছিল তদানীন্তন পুন্ড্রের রাজধানী, বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান।

এইসব প্রাচীন সাক্ষ্য পরবর্তী সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুন্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুন্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং গুপ্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ধনাইদহ, বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং দামোদরপুর তাম্রপট্টোলী কয়টিতে এবং য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণে এই পুন্ড্রবর্ধন নামই পাওয়া যাইতেছে। উপরোক্ত পট্টোলীগুলিতে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের নাম হইতে এ তথ্য আজ নিঃসংশয় যে, তদানীন্তন পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তত বগুড়া-দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি সমস্ত উত্তর বঙ্গই বোধ হয় ছিল পুন্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগীরথী তীর হইতে আরম্ভ করিয়া করতোয়া পর্যন্ত। কারণ, য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ কজঙ্গল হইতে আসিয়াছিলেন পুন্ড্রবর্ধনে এবং করতোয়া পার হইয়া গিয়াছিলেন কামরূপে। কজঙ্গল এবং করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগই তাহা হইলে পুন্ড্রবর্ধন।

পরবর্তী কালে পৌন্ড্রভুক্তি, পুন্ড্র বা পৌন্ড্রবর্ধনভুক্তির রাষ্ট্রসীমা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে। ধর্মপালের (অষ্টম শতক) খালিমপুরলিপিতেই দেখিতেছি পুন্ড্রবর্ধনান্তর্গত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের উল্লেখ। সেন আমলে দেখিতেছি পুন্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা পশ্চিম দিকে খাড়িবিষয়—খাড়িমণ্ডল (বর্তমান খাড়ি পরগনা, ২৪ পরগনা), অন্যদিকে ঢাকা-বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত। বঙ্গের নাব্য এবং বিক্রমপুর ভাগও তখন পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত। রাঢ় দেশের কোনও অঞ্চল বোধ হয় কখনও পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

পুন্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থানের একটি নূতন নাম পাইতেছি দশম শতক হইতে: এই নাম বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী। ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি দক্ষিণী লিপিতে "বারেন্দ্রদ্যুতিকারিণ" এবং "গৌড়চূড়ামণি" জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রসিদ্ধতম উল্লেখ সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যের কবিপ্রশস্তিতে, এবং মদন-তুঙ্গদেবের তালচের পট্টোলীতে। কবি সন্ধ্যাকর বরেন্দ্রীকে পালরাজাদের পিতৃভূমি বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যে ইহার অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপিতে বরেন্দ্রীর উল্লেখ আছে; কিন্তু সিলিমপুর, তর্পণদীঘি এবং মাধাইনগর পট্টোলী তিনটিতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, বরেন্দ্রী পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেনরাজাদের পট্টোলীগুলিতে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে এ অনুমান নিঃসংশয়ে করা যায় যে, বর্তমান বগুড়া-দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা, এবং হয়তো পাবনাও (পদুবন্বা?) প্রাচীন বরেন্দ্রীর বর্তমান প্রতিনিধি। বরেন্দ্রীই মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্, তবে বরিন্দ্ প্রাচীন বরেন্দ্রী অপেক্ষা সংকীর্ণতর বলিয়া মনে হয়। তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বরিন্দকে গঙ্গার পূর্ব-তীরবর্তী এবং লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের একটি অংশ মাত্র বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুই বিভাগ গঙ্গার দুই তীরে; পশ্চিমে রাল্ (=রাঢ়); পূর্বে বরিন্দ (=বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র)। যাহা হউক, মধ্যযুগীয় সাহিত্য, ইতিহাস এবং কুলজী গ্রন্থে বরেন্দ্র-বরেন্দ্রীর উল্লেখ প্রচুর; লোকস্মৃতিতেও বরেন্দ্রী এবং বরেন্দ্রীর ঐতিহ্য বরাবর জাগরূক ছিল। ইহাদের ইঙ্গিতেও বরেন্দ্রী উত্তর-বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে।

রাঢ় জনপদের প্রাচীনতম উল্লেখ পাইতেছি, প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে।

মহাবীর তাঁহার কয়েকজন শিষ্যসহ রাঢ়া জনপদে আসিয়াছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক); এই জনপদ তখন পথবিহীন, আচারবিহীন, এবং লোকেরাও একটু নিষ্ঠুর ও রূঢ় প্রকৃতির। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে রাঢ় ও বঙ্গজনপদের একত্রে গ্রথিত করিয়া উভয়কেই আর্য বলা হইয়াছে। কোড়ীবর্ষ (বা পরবর্তী কোটীবর্ষ) ছিল তাহাদের রাজধানী। কোটীবর্ষ দিনাজপুর জেলায়, এবং দামোদরপুর পট্টোলীর (পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক) মতে কোটীবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত; পাল আমলেও তাহাই। আচারাঙ্গসূত্রে রাঢ়া জনপদের দুইটি বিভাগ : বজ্জ বা বজ্রভূমি, সুব্ভ বা সুহ্মভূমি। বজ্জভূমিতে জৈন সন্ন্যাসীদের অপরিস্কৃত নিকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ-কথিত বিজয়-সিংহের কাহিনী সুবিদিত। বঙ্গরাজ সীহবাহু (সিংহবাহু) লাড়দেশে সীহপুর নামে এক নগরের পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এই কাহিনীতে উল্লিখিত আছে। কাহারও মতে লাড়দেশ প্রাচীন লাঢ় বা রাঢ় জনপদ এবং সীহপুর বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর। সীহবাহু লাড়দেশে নগর পত্তন করিবার সময় বঙ্গ জনপদেরই রাজা ছিলেন। বঙ্গের সঙ্গে লাড়ের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং নৈকট্য দেখিয়া মনে হয়, লাড়দেশ বঙ্গের সংলগ্ন রাঢ়দেশ হওয়া অসম্ভব নয়। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে রাঢ়া জনপদের সৌন্দর্যের উল্লেখ আছে; হলায়ুধের অভিধান-গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাঢ় জনপদের দুইটি বিভাগের মধ্যে সুব্ভ—সুহ্মবিভাগ সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সম্ভবত প্রাচীনতর। সুহ্ম জনদের উল্লেখ আছে মহাভারতে কর্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে। দশকুমারচরিত গ্রন্থ কিন্তু সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তিকে পৃথক জনপদ বলিতেছে না, বরং তাম্রলিপ্তিকে সুহ্মের অন্তর্গত বলিয়া বলিতেছে। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহোদধির তালিবনশ্যামোপকণ্ঠে সুহ্মদের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। মনে হয়, রঘু গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূল বাহিয়া দক্ষিণ-সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং ইহারই দক্ষিণ অংশের ভূভাগ সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল। ধোয়ী কবির পবনদূতেও গঙ্গাতীরবর্তী সুহ্মের উল্লেখ আছে এবং এই দেশে গঙ্গা-যমুনা-সংগমে ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুরের পথের ইঙ্গিত আছে। এই গঙ্গা-যমুনা-সংগম ও ত্রিবেণী বর্তমান হুগলী জেলায়। এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে অনুমান করা চলে যে, গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম জনপদ; মোটামুটি ইহাই পরবর্তী কালের দক্ষিণ-রাঢ়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অবশ্য বলিতেছেন, সুহ্ম এবং রাঢ়া এক এবং সমার্থক। হয়তো কখনও সুহ্মজনপদের প্রভাবসীমা সমস্ত রাঢ়দেশেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, যেমন দশকুমারচরিত-মতে এক সময় সেই প্রভাব তাম্রলিপ্তিতেও বিস্তৃত হইয়াছিল; কিন্তু সাধারণত সুহ্মভূমি রাঢ়াভূমির দক্ষিণতম অংশ বলিয়াই পরিচিত ছিল।

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে সুহ্মজন এবং সমুদ্রশায়ী অন্যান্য ম্লেচ্ছদের সঙ্গে প্রসুহ্মনামীয় আর-একটি কোমের উল্লেখ আছে। প্রাচীন সাহিত্যে সুহ্ম জনপদের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুহ্মজনসংপৃক্ত আর-একটি কোমের নামও শোনা যায়, তাহার নাম ব্রহ্ম বা ব্রহ্মোত্তর। ব্রহ্মোত্তর খুব সম্ভব আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের বরমুহত্তর। কেহ কেহ মনে করেন ব্রহ্মোত্তর পাঠ যথার্থত

সুহ্মোত্তর (সুহ্মের উত্তরে যে জনপদ) হওয়া উচিত। প্রসুহ্ম এবং সুহ্মোত্তর কোন্ জনপদ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই; তবে অনুমান হয়, দুইটি নামই একই জনপদের দ্যোতক, এবং এই জনপদটি সুহ্মজনপদের উত্তরে, আচারাঙ্গসূত্রে যে ভূমিকে বলা হইয়াছে বজ্‌জ বা বজ্রভূমি, অর্থাৎ রাঢ়ের উত্তরাংশ। এই বজ্রভূমিই বোধ হয় কাব্যমীমাংসা এবং পবনদূত গ্রন্থের ব্রহ্ম (ভূমি) বা ব্রহ্মোত্তর (সমাসবদ্ধ ব্রহ্ম ও উত্তর) জনপদ। এই ব্রহ্ম যে রাঢ়েরই একটি অংশ তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পবনদূতে; এই গ্রন্থে সুহ্ম ও ব্রহ্ম দুটি জনপদই গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নবম-দশম শতক হইতেই রাঢ়ের দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ জানা যাইতেছে—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়—প্রাচীনতর কালের মোটামুটি বজ্‌জ বা ব্রহ্মভূমি ও সুহ্মভূমি। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়লিপিতে (একাদশ শতকের প্রথমপাদ) উত্তীর-লাঢ়ম (উত্তর-রাঢ়) এবং তক্কণ-লাঢ়ম (দক্ষিণ-রাঢ়) নাম একই সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে।

উত্তর-রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাইতেছি আনুমানিক নবম শতকের গঙ্গরাজ দেবেন্দ্র-বর্মণের একটি লিপিতে, এবং তারপর একাদশ শতকের রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে। রাজা ভোজবর্মণের বেলাবলিপিতে উত্তর-রাঢ় এবং তদন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে। সিদ্ধল গ্রাম বর্তমান বীরভূমের অন্তর্গত সিধল গ্রাম। এই সিদ্ধল গ্রামই পণ্ডিত-মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের জন্মভূমি। তথাকথিত ভুবনেশ্বরলিপিতে ভবদেব ভট্ট তাঁহার জন্মভূমি সিদ্ধল গ্রামের কথা বলিয়াছেন, এবং রাঢ়ের এই অঞ্চল যে অজলা এবং জাঙ্গলময়, তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন। বল্লালসেনের নৈহাটি পট্টোলীতেও উত্তর-রাঢ় এবং তদন্তর্গত বাল্লহিট্‌ঠা, জলসোথী, খাণ্ডয়িল্লা, অম্বয়িল্লা এবং মোলাদণ্ডী গ্রামের উল্লেখ আছে। সব কটি গ্রামই বর্তমান বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ জেলার যোগসীমায়। নৈহাটিলিপি অনুসারে উত্তর-রাঢ় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের আমলে দেখিতেছি উত্তর-রাঢ়মণ্ডল কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে; শক্তিপুর পট্টোলীতে এই খবর পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়ান-চোয়াঙের কজঙ্গলও এই উত্তর-রাঢ়ে। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অধ্যায়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়ীখণ্ড জাঙ্গল নামে এক জনপদ এবং তদন্তর্গত বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদনদীর উল্লেখ আছে। এই রাঢ়ীখণ্ড-জাঙ্গলও উত্তর-রাঢ়েরই অন্তর্গত। অনুমান হয়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতালভূমি সহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইয়া উত্তর-রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর সীমা। উত্তর-রাঢ়ের উত্তর সীমা বোধ হয় কোনও সময় গঙ্গা পার হইয়া আরও উত্তরে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু, অকাট্য লিপিপ্রমাণ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে গঙ্গা-ভাগীরথীই রাঢ়ের উত্তরতম সীমা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তবকাত-ই-নাসিরীর সাক্ষ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়লিপিতে দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি সুস্পষ্ট: দণ্ডভুক্তি এবং বঙ্গের মধ্যবর্তী জনপদ-খণ্ডই দক্ষিণ-রাঢ় বা তক্কণ-লাঢ়ম্। দক্ষিণ-রাঢ়ের প্রাচীনতম উল্লেখ মিলিতেছে বাক্‌পতি মুঞ্জের একটি লিপিতে, এবং শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে (৯৯১-৯২)। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে (একাদশ-দ্বাদশ শতক) রাঢ়ের এবং একটি দাক্ষিণী লিপিতে দক্ষিণ-রাঢ়ের উল্লেখ

আছে; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই জনপদটিকে গৌড় বা গৌড়দেশান্তর্গত বলা হইয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও (১৫৯৩-৯৪) দক্ষিণ-রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীধর এবং কৃষ্ণমিশ্র দক্ষিণ-রাঢ়ের দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম করিতেছেন; ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠিক এবং নবগ্রাম; আর মুকুন্দরাম বলিতেছেন দামুন্যা গ্রামের কথা, যে-দামুন্যা বা দামিন্যা ছিল তাঁহার জন্মভূমি। ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠিক (যেখানে ছিল অনেক শ্রেষ্ঠীর বাসস্থান=ভূরিশ্রেষ্ঠীজনাশ্রয়) বর্তমান হাওড়া জেলার ভুরসুট গ্রাম। নবগ্রাম বর্তমান হুগলী জেলায়, এবং দামুন্যা-দামিন্যা দামোদরের পশ্চিমে বর্তমান বর্ধমান জেলায়। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে বর্তমান হাওড়া, এবং হুগলী ও বর্ধমানের অধিকাংশ দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত। দ্বাদশ শতকের উড়িষ্যার চোড়গঙ্গ রাজাদের আধিপত্য মিধুনপুর (নিঃসন্দেহে বর্তমান মেদিনীপুর) পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরে মন্দার-রাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার দুর্গনগর আরম্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। মিধুনপুর না হউক, মন্দার এবং আরম্য বোধ হয় সেই সময় দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। মন্দার নিঃসন্দেহে বর্তমান মন্দারণ, মধ্যযুগের গড় মন্দারণ; এবং আরম্য বর্তমান আরামবাগ; দুই-ই বর্তমান হুগলী জেলায়।

রাঢ়দেশের দুইটি রাষ্ট্রবিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল-লিপি, দশম শতকের ইর্দালিপি, লক্ষ্মণসেনের নৈহাটি- ও গোবিন্দপুর -লিপিতে বর্ধমানভুক্তির সাক্ষাৎ মেলে। ইর্দালিপিতে দেখিতেছি, দণ্ডভুক্তিমণ্ডল অর্থাৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্ধমানভুক্তির সীমা বিস্তৃত; কিন্তু পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বোধ হয় দক্ষিণে বর্ধমানভুক্তির এত বিস্তার ছিল না, কারণ বরাহমিহির গৌড়ক, বর্ধমান ও তাম্রলিপ্তক পৃথক পৃথক জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাল ও সেন আমলে দণ্ডভুক্তিমণ্ডল ছাড়া বর্ধমানভুক্তির আরও তিনটি বিভাগ ছিল: উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ় মণ্ডল এবং পশ্চিম-খাটিকা। বর্ধমানভুক্তির অন্যতম রাষ্ট্রবিভাগ হিসাবে দক্ষিণ-রাঢ় মণ্ডলের উল্লেখ কোন লিপিতে নাই, কিন্তু এই মণ্ডলটিও যে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পাল ও সেন আমল ছাড়া দণ্ডভুক্তি সাধারণত তাম্রলিপ্ত জনপদেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অনুমিত। ইর্দালিপি ছাড়া রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়লিপি এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে যথাক্রমে তণ্ডবুত্তি= দণ্ডভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলের উল্লেখ আছে। দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর (প্রাচীন মিধুনপুর) জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ; বর্তমান দাঁতন প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতিবহ। পশ্চিম খাটিকা যে মোটামুটি বর্তমান হাওড়া জেলা, এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরে সে ইঙ্গিত তো আগেই করা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর পট্টোলীতে রাঢ়ের আর-একটি বিভাগের খবর পাওয়া যায়; ইহার নাম কঙ্কগ্রামভুক্তি, এবং উত্তর-রাঢ় এই ভুক্তির অন্তর্গত। শাসনোল্লিখিত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে মনে হয়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগনারও কিয়দংশ এই কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। পুরাণে তো বরাবরই এই জনপদটির দেখা মেলে; বঙ্গ, কর্বট ও সুহ্মজনেরা ছিলেন তাহাদের প্রতিবেশী। জৈন কল্পসূত্র-গ্রন্থে জৈন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখার নাম তাম্রলিপ্তি শাখা। জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থেও তামলিত্তি (তাম্রলিপ্তি) বঙ্গজনদের অধিকারে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জাতকের গল্পে, বৌদ্ধগ্রন্থে বারবার

তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সুবৃহৎ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে, টলেমির বিবরণে, ফা হিয়ান, য়ুয়ান্-চোয়াঙ ও ইৎসিঙের বিবরণে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বর্ণনা সুবিদিত। টলেমির সময়ে তাম্রলিপ্ত জনপদের রাজধানীই ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর; সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ বলিতেছেন, তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রের একটি উপবাহুর তীরে অবস্থিত ছিল। অষ্টম শতকের পর হইতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির পতন ঘটে, এবং বোধ হয় তাহার আগে সপ্তম শতক হইতেই দণ্ডভুক্তি জনপদের নামেই তাম্রলিপ্ত জনপদের পরিচয়। ইহাও হইতে পারে, এই সময় তাম্রলিপ্ত কিছুদিনের জন্য সুহ্ম জনপদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যাহাই হউক, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে বরাহমিহির তাম্রলিপ্তক জনপদকে গৌড়ক (মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং সম্ভবত পশ্চিম-বর্ধমান ও মালদহ) এবং বর্ধমান হইতে পৃথক জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তি গৌড়-কর্ণ-সুবর্ণরাজ শশাঙ্কের করতলগত। দশম শতকের ইর্দালিপিতে দণ্ডভুক্তিমণ্ডল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। একাদশ শতকের প্রথম পাদে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে দণ্ডভুক্তি দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গালদেশ, এবং উত্তর-রাঢ় হইতে পৃথক জনপদ-রাষ্ট্র; দ্বাদশ শতকের মধ্যপাদে আবার এই দণ্ডভুক্তি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত।

গৌড়পুর নামক একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে পাণিনিসূত্রে; কিন্তু এই গৌড়পুর বর্তমান বঙ্গদেশের কোনও স্থান কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কৌটিল্য বঙ্গদেশের অনেক জনপদেরই খবরাখবর রাখিতেন; তাঁহার অর্থশাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কামরূপে উৎপন্ন অনেক শিল্প ও কৃষিদ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায়। পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলিও গৌড়দেশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাৎস্যায়ন গৌড়দেশের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। বঙ্গ এবং পৌণ্ড্রের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। পুরাণে এক গৌড়দেশের উল্লেখ আছে (যেমন, মৎস্যপুরাণে)। বরাহমিহির (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক) গৌড়ক, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান এবং তাম্রলিপ্তক নামে ছয়টি স্বতন্ত্র জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষায় গৌড়ীরীতির খবর পাওয়া যাইতেছে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায়; বস্তুত প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উল্লেখ সুপ্রচুর। কিন্তু সর্বত্র গৌড়দেশের অবস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার উল্লেখ হইতে খানিকটা আভাস অবশ্য পাওয়া যাইতেছে, এবং সে আভাস যেন মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমানের দিকে। মুরারির অনর্ঘরাঘবে (অষ্টক শতক) চম্পা গৌড়জনপদের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে; এই চম্পা কি ভাগলপুর জেলার প্রাচীন চম্পা না মন্দারণ সরকারের অন্তর্গত বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে, দামোদরের বামতীরের চম্পানগরী, বলা কঠিন। অষ্টক শতকের শেষার্ধে (ধর্মপালের প্রায় সমসাময়িক) গৌড়ের রাষ্ট্রাধিকার প্রাচীন অঙ্গদেশে বিস্তৃত ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়া বা রাঢ়াপুরী এবং ভূরিশ্রেষ্ঠিক গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একটি দক্ষিণী লিপিতেও রাঢ়-দেশকে গৌড়দেশের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর (ত্রয়োদশ শতক) কিন্তু বলিতেছেন, গৌড়দেশ একেবারে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভবিষ্য-পুরাণের মতে গৌড়দেশের উত্তর সীমায় পদ্মা, দক্ষিণ সীমায় বর্ধমান। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোনও কোনও জৈনগ্রন্থে জানা যায়, বর্তমান মালদহ জেলার প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সমসাময়িক মুসলমান

ঐতিহাসিকদের ইঙ্গিতও তাহাই; বস্তুত, লক্ষ্মণাবতী নগরকেই তাঁহারা বলিয়াছেন গৌড় এবং এই গৌড় রাঢ়দেশে। শক্তিসংগমতন্ত্রে গৌড়দেশ বঙ্গ হইতে একেবারে ভুবনেশ (ভুবনেশ্বর) পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বলা হইয়াছে। কথাসরিৎসাগরে বর্ধমানকে গৌর (=গৌড়) জনপদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বলা হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যাইতেছে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ, এবং পরে একাধিক গ্রন্থে দেখা যায় গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকল লইয়া পঞ্চগৌড়। আর-এক গৌড়-উপনিবেশের খবর পাওয়া যাইতেছে দক্ষিণ-ব্রহ্মের পেগু শহরের নিকটবর্তী কল্যাণী-লিপিমালায়।

কিন্তু এইসব উল্লেখ ও বিবরণের মধ্যে গৌড় জনপদের সঠিক অবস্থিতি সুস্পষ্ট জানা গেল না; শুধু এইটুকু বুঝা গেল, মুর্শিদাবাদ-বীরভূমই এই জনপদের আদি কেন্দ্র; পরে মালদহ এবং বোধ হয় বর্ধমানও এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানের এই কয়টি জেলা লইয়াই প্রাচীন গৌড়। এই গৌড়ের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য যখন যেমন বিস্তৃত হইয়াছে—কখনও কলিঙ্গ, কখনও ভুবনেশ্বর—জনপদসীমাও তখন তেমনই বিস্তারিত হইয়াছে।

গৌড়ের অবস্থিতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় লিপি-প্রমাণ কী আছে দেখা যাইতে পারে; ঈশানবর্মণ মৌখরীর হড়াহালিপিতে (৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়জনদের বর্ণনা করা হইয়াছে "গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলিয়া। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় একাদশ শতকের গুর্গিলিপিতে। মনে হয়, গৌড়জনপদের দক্ষিণ সীমা ষষ্ঠ শতকে সমুদ্র হইতে খুব বেশি দূরে ছিল না। সপ্তম শতকে গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের নবাবিষ্কৃত মেদিনীপুরলিপি দুইটিতে দেখা যাইতেছে, গৌড়রাষ্ট্রের আধিপত্য সমুদ্রসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত; উৎকলসহ দণ্ডভুক্তি দেশ গৌড়-রাষ্ট্রসীমার অন্তর্গত বলিয়া এই লিপি দুইটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতে শশাঙ্কের যে ইতিহাস বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের রাজা; এবং কর্ণসুবর্ণ (=বর্তমান কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি অঞ্চল) ছিল তাঁহার রাজধানী, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলই ছিল গৌড়ের কেন্দ্রভূমি।

প্রতীহার-রাজ ভোজদেবের গওআলিয়রলিপিতে দেখিতেছি, পালরাজ [ধর্মপাল]কে বলা হইয়াছে 'বঙ্গপতি' এবং তাঁহার প্রজাবর্গকে 'বৃহদ্বঙ্গান্'। দ্বিতীয় নাগভট্ট যখন চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন তখন ধর্মপাল বঙ্গপতি এবং তাঁহার প্রজাবর্গ "বঙ্গান্", কিন্তু অন্যত্র সর্বত্রই সকল লিপিতেই পালরাজারা 'গৌড়েশ্বর'। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের (৮১৪-৮৭৭) কানহেরীলিপিতে গৌড় জনপদ গৌড়বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্মপালের রাজত্বকাল হইতেই গৌড়েশ্বর উপাধি পালরাজাদের নামভূষণরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে, যদিও তখন বঙ্গ জনপদ পৃথক স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান এবং পালেরা বঙ্গেরও অধিপতি। রাজা অমোঘবর্ষেরই নীলগুণ্ডলিপিতে বঙ্গ জনপদ-রাষ্ট্রের এবং কর্করাজের বড়োদা পট্টোলীতে (৭৯১-৯২) একই সঙ্গে বঙ্গ ও গৌড় জনপদ-রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বরলিপিতেও গৌড়নৃপ এবং বঙ্গরাজ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। এইসব প্রমাণ হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা চলে যে, গৌড় বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন হইতে স্বতন্ত্র জনপদ, এবং আমরা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ বলিতে

(অর্থাৎ মালদহ-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমানের কিয়দংশ) এখন যাহা বুঝি তাহাই ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদ। দক্ষিণ-রাঢ়মণ্ডল বা তাম্রলিপ্ত-দণ্ডভুক্তি বোধ হয় গৌড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যদিও গৌড়ের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও উৎকল-দণ্ডভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং গৌড় বলিতে এক-এক সময় হয়তো সমগ্র বাংলাদেশকেও বুঝাইত।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে মোটামুটিভাবে—একটু শিথিলভাবেই—কয়েকটি কথা বলা চলে। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত। এই জনপদগুলি প্রত্যেকেই স্ব-স্বতন্ত্র ও পৃথক; মাঝে মাঝে বিরোধ-মিলনে একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগের সম্বন্ধও দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রপরায়ণ। সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ—মালদহ-মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে উৎকল পর্যন্ত—সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে; কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনপদগুলি এক নাম লইয়া এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার সূচনা বোধ হয় দেখা দেয় শশাঙ্কের আগেই, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতে (হড়াহালিপির 'গৌড়ান্')। শশাঙ্ক তাহাকে পূর্ণ পরিণতি দান করেন। এই সময় হইতেই গৌড় নামটির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা যেন অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল এবং পাল-রাজারা বঙ্গপতি হওয়া সত্ত্বেও গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হইতেই ভালবাসিতেন। যাহাই হউক, শশাঙ্কের পর হইতে, অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই, বাংলাদেশের তিনটি জনপদই যেন সমগ্র বাংলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে—পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। দেশে বিভিন্ন জনপদ এবং তাহাদের নামস্মৃতি ছিলই, নূতন নূতন স্থানের বিভাগীয় নামের উদ্ভবও হইতেছিল (যেমন, পূর্ব ও দক্ষিণ-বাংলা অঞ্চলে বঙ্গাল, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট; উত্তর-বঙ্গ অঞ্চলে বরেন্দ্রী; তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে দণ্ডভুক্তি; পশ্চিম-বাংলা অঞ্চলে রাঢ়ের উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ) এবং এইসব বিভাগের আবার নূতন নূতন উপবিভাগও নূতন নূতন নাম লইয়া দেখা দিতেছিল; কিন্তু আর সকলেই যেন ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যেই নিজেদের সত্তা বিলোপ করিয়া দিতেছিল। রাঢ়ের মতন প্রাচীন জনপদও যেন ক্রমশ গৌড় নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছিল। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর স্মৃতি পুণ্ড্রবর্ধনের মধ্যে বাঁচিয়াছিল সেন আমলের প্রায় শেষ পর্যন্ত; কিন্তু এই পুণ্ড্রও যেন তাহার স্বতন্ত্র নামসত্তা গৌড়ের মধ্যে বিসর্জন দিতে যাইতেছিল। পাল এবং সেন রাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হওয়া। বঙ্গপতি যে মুহূর্তে গৌড়ের অধিপতি সেই মুহূর্তেই তিনি গৌড়েশ্বর। শশাঙ্কের সময় হইতেই একটিমাত্র নাম লইয়া প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টার সজ্ঞান সূচনা দেখা দিয়াছিল পাল ও সেন রাজাদের আমলে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল, যদিও বঙ্গ তখনও পর্যন্ত আপন স্বতন্ত্র জনপদপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছে। এক গৌড়-নাম লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ-নাম তখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিদ্যমান; পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের রাষ্ট্রসত্তা আছে; কিন্তু স্বতন্ত্র পৃথক জনপদসত্তা তখন আর নাই। পরবর্তী কালেও গৌড় নামে বাংলাদেশের কিয়দংশের জনপদসত্তা বুঝাইবার চেষ্টা

হইয়াছে; বাংলার বাহিরে বাঙালী মাত্রেই গৌড়বাসী ও গৌড়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়।

কিন্তু গৌড় নাম লইয়া বাংলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করিয়াছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। সেই সৌভাগ্যলাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে বঙ্গ-নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের। কিন্তু, সমগ্র বাংলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই; তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাংলাদেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যদিও আজিকার বাংলাদেশ আকবরী সুবা বাংলা অপেক্ষা খর্বীকৃত।

চতুর্থ অধ্যায়

ধনসম্বল

এক

সমাজসংস্থানের বস্তু-ভিত্তি হইতেছে ধন। এই ধন যে শুধু ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য তাহা নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও ইহা সমভাবে অপরিহার্য। ধন ছাড়া কোনও দেশের কোনও বিশেষ কালের সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য কল্পনাই করিতে পারা যায় না; ধন ছাড়া সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে না; শুধু রাষ্ট্রের কথাই বা বলি কেন, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি—কিছুই এই ধন ছাড়া চলিতে পারে না।

নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা শ্রেণীর অগণিত ও অলিখিত জনসমষ্টি লইয়া প্রাচীন বাংলার যে সমাজ, তাহার পরিকল্পনা এবং সংস্থানে যে ধন প্রয়োজন হইত, তাহা আসিত কোথা হইতে? লেখমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে রাজপাদোপজীবী- তাঁহারা ধন উৎপাদন করিতেন না। শিক্ষাবৃত্তি ছিল যাঁহাদের, ধর্মানুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন যাঁহারা, সমাজের তথাকথিত হেয় কর্ম ইত্যাদি যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও যতটুকু পরিমাণে নিজ নিজ বিশেষ বৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন ততটুকু পরিমাণে ধনোৎপাদনের দায় ও কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু, উৎপাদিত ধনের অংশ তাঁহারা ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে, নিজ নিজ সুযোগ ও অধিকার অনুযায়ী। সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে ধনোৎপাদন ইঁহারা কেহই করেন না বটে, তবে পরোক্ষভাবে ধনোৎপাদনে সাহায্য সকলকেই কিছু কিছু করিতে হয়, কোনও না কোনও উপায়ে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, ধনোৎপাদনের উপায় কী কী? প্রাচীন বাংলায় দেখিতেছি, ধনোৎপাদনের তিন উপায়ঃ কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। ইহাদের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান; আজ পর্যন্তও বাংলাদেশে কৃষিই প্রধান ধনসম্বল; তারপরেই শিল্প। এই কৃষি- ও শিল্প -জাত জিনিসপত্র লইয়া দেশে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে উৎপাদিত ধনের বৃদ্ধি এবং দেশের বাহির হইতে নূতন ধনের আগমন হইত। এই তিন উপায়ে আহৃত যে ধন, তাহাই প্রাচীন বাংলার ধনসম্বল। এবং এই ধনসম্বলের উপরই সমাজ, রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি—সবকিছুর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

দুই

এই ধনসম্বলের কথা বলিবার আগে আমাদের ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করিয়া লওয়া দরকার। আমাদের প্রধান উপাদান লেখমালা, এবং প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রাচীন লেখমালার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত এই সুপ্রাচীন প্রস্তর-

লেখখণ্ডটিতে প্রাচীন বাংলার ধনসম্বলের একটি প্রধান উপকরণের সংবাদ পাওয়া যায়। এই উপকরণটি ধান, কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। এই লেখখণ্ডটি ছাড়া, পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশসম্পর্কিত প্রচুর লিপির সংবাদ আমরা জানি, কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উপাদানও আমাদের অজ্ঞাত নয়, অথচ এই সর্বপ্রাচীন মহাস্থান-লেখখণ্ডটি এবং আরও দুই-চারিটি তাম্রশাসন ছাড়া বাংলাদেশের প্রধান উৎপন্ন ধন যে ধান লিপিতে সে উল্লেখ কোথাও নাই বলিলেই চলে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে অবশ্য বলা হইয়াছে, বরেন্দ্রীর লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্টিগোচর হইত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রের কমনীয় রূপে। অথচ, ইহা তো সহজেই অনুমেয় যে, আজও যেমন অতীতেও তেমনি, ধান্যই ছিল শুধু বরেন্দ্রভূমির নয়, সমগ্র বাংলাদেশেরই প্রধান ধনসম্বল। শুধু ধান সম্বন্ধেই নয়, অন্যান্য অনেক কৃষি- ও শিল্প -জাত বা খনিজ দ্রব্যের উল্লেখই আমাদের ঐতিহাসিক উপাদানে পাওয়া যায় না। কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্র যে বাংলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ছিল, এবং সুদূর মিশর ও রোমদেশ পর্যন্ত তাহা রপ্তানি হইত, সর্বত্র তাহার আদরও ছিল, এ কথা আমরা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পেরিপ্লাস গ্রন্থ অথবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিংবা চর্যাগীতি-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি; এ-যাবৎ বাংলাদেশসম্পর্কিত যত লেখমালার খবর আমরা জানি কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। উদাহরণ দিবার জন্য ধান্য ও বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ করিলাম মাত্র, তবে অনেক খনিজ, কৃষি- ও শিল্প -জাত দ্রব্যের সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে। কাজেই অনুল্লেখের যুক্তি অন্তত এক্ষেত্রে অনস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে না। কৃষি ও শিল্পের তদানীন্তন অবস্থায়, প্রাচীন বাংলার তদানীন্তন ভূমিব্যবস্থায়, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নদনদীর সংস্থানে যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক তাহা সমস্তই উৎপাদিত হইত, এই অনুমানই যুক্তিসংগত, তবু ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিতে বসিয়া কেবলমাত্র সেইসব উপকরণ বিবৃত করা যাইতে পারে যাহার উল্লেখ অবিসংবাদিত উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং যাহার উল্লেখ না থাকিলেও অস্তিত্বের অনুমান প্রমাণের অনুরূপ মূল্য বহন করে। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। তক্ষণ অথবা স্থাপত্যশিল্পের কোন উল্লেখ আমরা আমাদের জ্ঞাত উপাদানের মধ্যে পাই না, যদিও তিব্বতী লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ধীমান ও বীটপাল নামে বরেন্দ্রভূমির দুই খ্যাতনামা শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে "বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণি"র উল্লেখ আছে। ঠিক তেমনই স্বর্ণকার অথবা রৌপ্যকারের উল্লেখও নাই। অথচ বাংলাদেশে প্রাপ্ত অগণিত দেবদেবীর পোড়ামাটি ও পাথরের মূর্তিগুলি দেখিলে, পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মন্দির, স্তূপ এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ অথবা সমসাময়িক চিত্রে ও ভাস্কর্যে সেই যুগের ঘর-বাড়ি-মন্দিরাদির পরিকল্পনা দেখিলে, দেবদেবীর মূর্তিগুলির বিচিত্র গহনার সূক্ষ্ম ও বিচিত্রতর কারুকার্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে এ কথা অনুমান করিতে কোন আপত্তি করিবার কারণ নাই যে, তদানীন্তন কালে তক্ষণ- ও স্থাপত্য -শিল্প অথবা স্বর্ণ- ও রৌপ্য -জাত দ্রব্যাদির কোনও প্রকার অপ্রতুলতা ছিল; অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও একই কথা। গঙ্গা ও তাম্রলিপ্তি যে মস্ত বড় দুইটি বন্দর ছিল, এ খবর বিশেষভাবে পেরিপ্লাস গ্রন্থ, টলেমির বিবরণ, জাতকগ্রন্থ ও ফা হিয়ান-য়ুয়ান-চোয়াঙের

বিবরণীর ভিতর পাওয়া যায়। এই বন্দর হইতে এবং কিছু পরবর্তী কালে অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতেই সপ্তগ্রাম হইতে যে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপগুলিতে, দক্ষিণ-ভারতের উপকূল বাহিয়া সিংহলে, এবং পশ্চিম উপকূল বাহিয়া সুরাষ্ট্র-ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সমসাময়িক বিশদ প্রমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে। অন্তর্বাণিজ্যও নিশ্চয়ই ছিল, এই অন্তর্বাণিজ্য চলিত হয়তো অধিকাংশই নদীপথে, কিন্তু স্থল-পথেও কিছু কিছু না চলিত এমন নয়, অথচ এইসব বাণিজ্যসম্ভার, বাণিজ্যপথ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য খবরের আভাসও উপাদানগুলির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

পাওয়া যে যায় না, উল্লেখ যে নাই—তাহার কারণ তো খুবই পরিষ্কার। লেখমালাই হউক, অথবা লিখিত বিবরণই হউক, ইহাদের কোনটিই দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের, কিংবা দেশের সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিবার জন্য রচিত হয় নাই। দু-একটি ছাড়া সব লেখমালাই প্রায় ভূমির দান-বিক্রয়ের পট্টোলী। পূর্বোক্ত মহাস্থান-শিলালিপিখণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম শতক পর্যন্ত বহু তাম্রপট্টোলীর খবর আমরা জানি, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোথাও দত্ত বা ক্রীত ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির বা কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পাল, সেন ও অন্যান্য রাজবংশের সমস্ত পট্টোলীর খবর আমরা জানি তাহার প্রায় সব কটিতেই দত্ত অথবা ক্রীত ভূমির প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ-ভাবে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের পট্টোলীগুলিতে, ভূমিজাত দ্রব্যাদির আয়ের পরিমাণও উল্লেখ করা আছে। ভূমিসম্পর্কিত দলিল বলিয়াই ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের লেখমালায় ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই কেন, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লেখমালায় আছে কেন? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন, কিন্তু একটা অনুমান করা চলে। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীতে (৫০৭-৮ খ্রী) দেখিতেছি, মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে যে-গ্রাম দান করা হইতেছে তাহার শর্ত হইতেছে "সর্বতোভোগেন", অর্থাৎ দানগ্রহীতা সকল প্রকারে এই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার আয় ভোগ করিতে পারিবেন। পরবর্তী কালে এই "সর্বতোভোগে"র স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন হইয়াছিল, নানা বিশেষ ও অবিশেষ কারণে; ভোক্তার অধিকার সম্বন্ধে হয়তো প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এবং হয়তো এই কারণেই পরবর্তী কালে কতকটা বিশদভাবে এই অধিকারের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছিল; এবং তাহার ফলেই ভূমিজাত দ্রব্যাদির খবর আমরা কিছু কিছু পাই।

এ তো গেল লেখমালাগুলির কথা। অন্যান্য উপাদানগুলি সম্বন্ধেও দু-এক কথা বলা দরকার। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাংলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের খবর পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বিদেশী বণিক যাঁহারা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য। বাংলাদেশ হইতে যেসব জিনিস বিদেশে পশ্চিম-এশিয়ায়, মিশরে, রোমে, গ্রীসে যাইত তাহাদের

মধ্যে অজ্ঞাতনামা লেখক রেশম বস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐসব দেশে এই জিনিসের চাহিদা ছিল. তাই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে; অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যও নিশ্চয়ই ছিল; সেগুলির চাহিদা হয়তো তেমন ছিল না, রপ্তানিও হইত না, সেইজন্য তাহাদের উল্লেখ নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অপরোক্ষভাবে। কারণ, এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থোক্ত বিশেষ অধ্যায়টি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সংবাদ দিবার জন্য বিশেষভাবে রচিত নয়। রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসায় পূর্বদেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটি ক্ষুদ্র তালিকা আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে যেসব গন্ধ ও আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইত, এ তালিকায় শুধু সেইসব কয়েকটি দ্রব্যেরই নাম আছে। সেইজন্য আমাদের নানা উপাদানের মধ্যে প্রাচীন বাংলার ধনসম্বলের যে সংবাদ তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ। এইসব বিচ্ছিন্ন, টুকরা টুকরা তথ্য আহরণ করিয়া ধনসম্বলের মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

তিন

প্রথম কৃষি- ও ভূমি -জাত দ্রব্যাদির কথাই বলি। প্রাচীন বাংলায় কৃষি যে ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে 'ক্ষেত্রকরান্', 'কর্ষকান্', 'কৃষকান্' ইত্যাদি কথার বারংবার উল্লেখ আছে। জনসাধারণ যে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী, এবং কোনও স্থানে ভূমি দান-বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদোপজীবীদের, ব্রাহ্মণদের, এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অন্যান্য মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান-বিক্রয়ের ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিতে হইত।

এই ধরনের উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক তাম্রপট্টোলীতেই আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাল প্রমাণ, লোকের ভূমির চাহিদা। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত যত ভূমি দান-বিক্রয়ের তাম্রপট্টোলী দেখিতেছি, সর্বত্রই দেখি ভূমিযাচক বাস্তুক্ষেত্র অপেক্ষা খিলক্ষেত্রই চাহিতেছেন বেশি পরিমাণে; তাহার উদ্দেশ্য যে কৃষিকর্ম তাহা সহজেই অনুমেয়। যে জমি কর্ষিত হয় নাই সেই জমির চাহিদাই বেশী; উদ্দেশ্য কর্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ কী? অনেক পট্টোলীতে শুধু খিলক্ষেত্র প্রার্থনারই উল্লেখ আছে। অন্যত্র, যেখানে খিল ও বাস্তুক্ষেত্র উভয়ই প্রার্থনা করা হইতেছে, সেখানেও খিলক্ষেত্রের পরিমাণ বাস্তুক্ষেত্রের প্রায় বারো গুণ। পরবর্তী কালের পট্টোলীগুলিতে ভূমির পরিমাণ সমগ্রভাবে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সে ভূমির কতটুকু খিল কতটুকু বাস্তু তাহা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা নাই। তবু দত্ত ও ক্রীত ভূমির যে বিবরণ আমরা এই লিপিগুলিতে দেখি, তাহাতে মনে হয়, খিলভূমির কথাই বলা হইতেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাহা ছাড়া, কৃষির প্রাধান্য সম্বন্ধে অন্য একটি অনুমানও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমির পরিমাণ সর্বত্রই ইঙ্গিত করা হইয়েছে এমন মানদণ্ডে যাহা কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ বা আঢকবাপ, উন্মান (উয়ান)—এই সমস্ত মানই শস্যসম্পর্কিত। এক কুল্য, এক দ্রোণ বা এক আঢক (বাংলা, আঢ়া; পূর্ব-বাংলায় অনেক স্থানে দুন্

এবং আঢ়া শস্যমান এখনও প্রচলিত)—বীজ বপনের জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন তাহার পরিমাণই এক কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ অথবা আঢ়বাপ ভূমি এবং এই নামানুযায়ীই পঞ্চম হইতে মোটামুটি অষ্টম শতক পর্যন্ত সমস্ত ভূমির পরিমাপ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের তাম্রপট্টোলী (একাদশ শতক) কিংবা শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্রপট্টোলীতে (দশম শতক) ভূমিপরিমাপের মান হইতেছে হল, এবং হলই হইতেছে প্রধান কৃষিযন্ত্র। অবশ্য এ কথা সত্য যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমি সর্বত্রই ঠিক এই কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, উন্মান, হল ইত্যাদি মানদণ্ডে মাপা হইত না; তাহার জন্য অন্য মানদণ্ডের নির্দেশও পাইতেছি। নল-মানদণ্ডের নির্দেশ আছে (অষ্টকনবকনলাভ্যাম্, ৮×৯ নল) পঞ্চম শতকেই। তথাপি এই যে শস্যমান অথবা কৃষিযন্ত্রমানের সাহায্যে ভূমির পরিমাণের উল্লেখ, ইহার মধ্যে কৃষিপ্রধান সমাজের স্মৃতি জড়িত তাহা অনুমান করা অসংগত নয়।

ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। তবু, এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কী শস্য বুনিতে হইবে, কোন শস্যের জন্য কী প্রকার ভূমি, কী পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন, বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ, আবহাওয়া-তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, কৃষিপ্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক; ইহার ভূমি নিম্ন এবং বারিপাত কৃষির পক্ষে অনুকূল; ইহার ভূমির উর্বরতা সম্বন্ধে চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণভাবে এদেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধেও এই চীনা পরিব্রাজকের দু-চার কথা বলিবার আছে। পূর্ব-ভারতের যে কয়টি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্তত চারিটি বর্তমান বাংলাভাষাভাষী জনপদের সীমার ভিতর অবস্থিত—পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ। তাহা ছাড়া আর-একটি দেশেও তিনি গিয়াছিলেন, তাহার নাম কজঙ্গল অথবা কজাঙ্গল। এই দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমে, কীকট অর্থাৎ মগধ দেশের নিকটে; এই দেশের ভিতরেই বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও বীরভূমি (বীরভূম), অজয় ও অন্যান্য নদী; ইহার তিনভাগ জঙ্গল, একভাগ গ্রাম ও জনপদ, ইহার অধিকাংশ ভূমি ঊষর, স্বল্পভূমি মাত্র উর্বর। এই যে জঙ্গল ও জাঙ্গল প্রদেশ ইহাই য়ুয়ান-চোয়াঙের কজঙ্গল বা কজাঙ্গল। এই কজঙ্গল-কজাঙ্গল বর্তমান বাংলাদেশেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমার এই মন্তব্যের সমর্থন পাইতেছি ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বরলিপিতে (একাদশ শতক)। এখানেও রাঢ় দেশের যে অংশের বিবরণ পাইতেছি তাহা অজলা, অনুর্বর এবং জাঙ্গলময়। এখন দেখা যাক্ য়ুয়ান-চোয়াঙ্ এই পাঁচটি দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কী বলিতেছেন।

কজঙ্গল সম্বন্ধে তিনি বলেন, এদেশের শস্যসম্ভার ভাল। পুণ্ড্রবর্ধনের বর্ধিষ্ণু জনসমষ্টি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এদেশের শস্যসম্ভার ফুল ফল যে সুপ্রচুর তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সমতট ছিল সমুদ্রতীরবর্তী দেশ; এ দেশের উৎপাদিত শস্য সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রের এক খাড়ির উপরেই; এখানকার কৃষিকর্ম ভাল ছিল, ফলফুল ছিল প্রচুর। স্থলপথ

ও জলপথ এখানে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল বলিয়া নানা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি এখানে মজুত হইত এবং এখানকার অধিবাসীরা সেইহেতু প্রায় সকলেই বেশ সম্পন্ন ও বর্ধিষ্ণু ছিল। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও ছিল খুবই ধনী, এবং জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর; কৃষিকর্ম ছিল নিয়মিত ঋতু অনুযায়ী, ফলফুলসম্ভার ছিল সুপ্রচুর। দেখা যাইতেছে, য়ুয়ান-চোয়াঙের দৃষ্টিও দেশের কৃষিপ্রাধান্যের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সর্বত্রই তিনি উৎপন্ন শস্যসম্ভারের উল্লেখ করিয়াছেন, এক সমতট ছাড়া। সমুদ্র-তীরবর্তী এই দেশে স্বভাবতই কৃষিকর্মের অবস্থা হয়তো ভাল ছিল না। তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির হেতু যে শুধু কৃষিকর্মই নয়, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই এই দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

এইবার কৃষিজাত কী কী শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর আমরা জানি একে একে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমেই প্রধান শস্য ধান্যের সহিত আমাদের পরিচয়। এই পরিচয় আমরা পাই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ মহাস্থানের শিলালিপি-খণ্ডটি হইতে। ইহা একটি রাজকীয় আদেশ; রাজা অজ্ঞাত। তবে, অক্ষর দেখিয়া শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করেন, আদেশটি দিয়াছিলেন কোনও মৌর্য সম্রাট। পুণ্ড্রনগরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে সংবঙ্গীয়দের মধ্যে (অন্যমতে, ছবগীয়=ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে) কোনও দৈবদুর্বিপাকবশত নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছিল। এই দুর্গতি হইতে ত্রাণের উদ্দেশ্যে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার হইতে দুঃস্থ জনসাধারণকে ধান্য দেওয়া হইয়াছিল—খাইয়া বাঁচিবার জন্য, না বীজ হিসাবে, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু এই ধান্যবিতরণও ঋণ হিসাবে। এই শিলাখণ্ড হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণের প্রধান উপজীব্যই ছিল ধান্য; দুর্গতি-দুর্ভিক্ষের সময়ও এই ধান্যঋণ গ্রহণই ছিল জীবনধারণের উপায়। রাজাও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন; এই বিপদে রাজা ধান বিনামূল্যে বিতরণ করেন নাই, ঋণস্বরূপই দিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালের অসংখ্য লিপিতে এই ধান্যশস্যের উল্লেখ সর্বত্র নাই; কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধান্যই ছিল এই দেশের একমাত্র উপজীব্য, এবং শস্য বলিতে ধান্যই বুঝাইত সর্বাগ্রে; তাহার নাম করিবার প্রয়োজন হইত না। এই ধান্য একান্তভাবে বারিনির্ভর; সেই জন্য অগণিত নদনদী-খালবিল থাকা সত্ত্বেও এদেশের ছড়ায় গানে পল্লীবচনে, নানা লোকায়ত ব্রত ও পূজানুষ্ঠানে মেঘ ও আকাশের কাছে বারিপ্রার্থনার বিরাম নাই; অতীতেও ছিল না, আজও নাই। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, গোবিন্দপুর ও শক্তিপুর এই চারিটি তাম্রশাসনে-যে মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে, তাহাতে ধান্যোপজীবী বাঙালীর আন্তরিক আকুতি ধ্বনিত হইয়াছে মনে করিলে অনৈতিহাসিক উক্তি কিছু করা হয় না।

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-শাসনে এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-শাসনে ব্রাহ্মণদের অনেক গ্রামদানের উল্লেখ আছে; এইসব গ্রাম ছিল নানা শস্যক্ষেত্র এবং উপবনশোভায় অলংকৃত, এবং শস্যক্ষেত্রে শালিধান্য জন্মাইত প্রচুর। ধান এবং ধান-চাষ ইত্যাদি সম্বন্ধে আরও খবর জানা যায়। দু-একটি উল্লেখ করিতেছি। রঘুবংশ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গাভিযানের উল্লেখ আছে: কালিদাস বলিতেছেন, ধানের চারাগাছ যেমন করিয়া একবার উৎপাটন করিয়া আবার রোপণ করা হয় রঘু তেমনই করিয়া বঙ্গজনদের একবার উৎখাত করিয়া আবার প্রতিরোপিত করিয়াছিলেন। এই ধরনের

ধানের চাষ সহজ এবং নিরাপদ এবং বাংলাদেশের ও আসামাঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাটা ধান মাড়াই করার পদ্ধতি এখন যেমন সুপ্রাচীন কালেও তেমনই ছিল বলিয়া মনে হয়। রামচরিত-কাব্যের কবিপ্রশস্তিতে ধানের 'খলা' বা মাড়াই-স্থানের ইঙ্গিত আছে, এবং গোলাকারে সাজানো কাটা ধানের উপর দিয়া গোরু-বলদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁটিয়া কী করিয়া ধান মাড়াই করিত, তাহারও উল্লেখ আছে।

ধান্য, বিশেষভাবে শালিধান্য, এবং ইক্ষু সম্বন্ধে বাঙালী কবির কল্পনা নানাভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে উদ্ধৃত দুইটি বাঙালী কবির রচিত দুইটি শ্লোকে বর্ষায় ধানের ক্ষেত, হেমন্তে কাটা শালিধানের স্তূপ, আখের ক্ষেত, আখ-মাড়াই কল ইত্যাদি লইয়া যে কবিকল্পনা বিস্তারিত হইয়াছে তাহার এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সর্ষপ যে অন্যতম উৎপন্ন শস্য ছিল বাপ্যাঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলীতে উল্লিখিত 'সর্ষপযানক' কথাটিতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

য়ুয়ান্‌চোয়াঙ্ যে বাংলার সর্বত্রই প্রচুর ফলসশ্যসম্ভারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রচিত তাম্রপট্টোলীগুলিতে। খালিমপুর-তাম্রশাসনে দেখিতেছি, ধর্মপাল চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন, উৎপাদিত শস্যাদির কোন উল্লেখ নাই। দেবপালের মুঙ্গের-শাসনে দেখিতেছি, মোষিকা নামক একটি গ্রাম দান করা হইতেছে। এবং যে জমি দান করা হইতেছে তাহার উপর রাজা কোনও অধিকারই রাখিতেছেন না; শুধু ভূমির উপরকার স্বত্ব নয়, ভূমির নিম্নের স্বত্ব, জলস্থলের স্বত্ব, গাছগাছড়ার স্বত্ব—সবই দান করিয়া দিতেছেন। তিনটি উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ এখানে আছে, আম্র, মহুয়া, ও মৎস্য। নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপিতেও অনুরূপ সংবাদই পাওয়া যায়, শুধু মৎস্যের উল্লেখ নাই। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে যে কুরটপল্লিকা গ্রাম দান করা হইতেছে, তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির উল্লেখ ঠিক পূর্বোক্ত লিপিরই অনুরূপ; এখানেও মৎস্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু আম ও মহুয়ার উল্লেখ আছে। প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল মোটামুটি একাদশ শতকের প্রথমার্ধ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অথচ, ইহার কিছু পূর্ববর্তী, অর্থাৎ দশম শতকের একটি শাসনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির তালিকা অন্যরূপ। কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্দা তাম্রপটে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। এই গ্রামটি বর্ধমানভুক্তির দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অন্তর্গত। গ্রামটি দান করা হইতেছে সমস্ত অধিকার সমেত; যাঁহাকে দান করা হইতেছে তিনিই ইহার সব কিছু ভোগ করিবেন; বাস্তুক্ষেত্র, জলাধার, গর্ত, মার্গ (পথ), পতিত বা অনুর্বর জমি, আস্তাকুঁড় (=আবস্করস্থান), লবণাকর, সহকার (আম) ও মধুক বৃক্ষের ফলফুল, অন্যান্য গাছগাছড়া, হাট, ঘাট, পার বা খেয়া-ঘাট, (সহট্ট-ঘট্ট-সতর) ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার ভোগ্য। ধান্য ও অন্যান্য শস্য ছাড়া, আম্র-মধুক ছাড়া, এখানে আর-একটি উৎপন্ন দ্রব্যের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহা লবণ। মেদিনীপুর জেলার দান্তন সমুদ্রতীরবর্তী। জোয়ার যখন আসে, তখন সমুদ্রতীরবর্তী অনেক স্থানই নোনাজলে ভাসিয়া ডুবিয়া যায়; বড় বড় গর্ত করিয়া লোকে এখনও সেই জল ধরিয়া রাখে, পরে রৌদ্রে অথবা জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লবণ তৈয়ারী করে। এই প্রথা প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইর্দা লিপিটিতে। এই বড় বড় গর্তগুলিই শাসনোল্লিখিত লবণাকর। জল কিংবা তলের কিংবা পারঘাটের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া রাজা যে

ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী বা অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী ভূমি দান করিতেছেন বলিয়া দেখিতেছি, তাহার অর্থ পরিষ্কার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখি, জল, স্থল, পারঘাট ইত্যাদির অধিকার রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত; পারঘাটের আয় রাজার, ভূমির উপরকার অধিকার প্রজার হইলেও নীচেকার অধিকার রাষ্ট্র কখনও ছাড়িয়া দেয় না। সেইজন্যই যেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই অর্থশাস্ত্রেই দেখি, লবণে রাষ্ট্রের অথবা রাজার একচেটিয়া অধিকার। সেই একচেটিয়া অধিকারও ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে যেখানে রাজা ভূমিদান করিতেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপিতে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে; এই গ্রামটি দানের শর্তে পথ-গোপথের অধিকারও ছাড়া হইতেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অরণ্যের উপর অধিকার ত্যাগ। অথচ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অরণ্য রাষ্ট্র- সম্পদ ও -সম্পত্তি। এই অরণ্যদানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কাঠ অর্থোৎপাদনের একটি প্রধান উপায়। মদনপালদেবের মনহলি তাম্রপট্টে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির যে গ্রামদানের উল্লেখ আছে তাহাও দেখিতেছি সতলঃ...সাম্রমধূকঃ সজলস্থলঃ সগর্তোষরঃ সঝাট-বিটপঃ...। পুণ্ড্রবর্ধনেও তাহা হইলে বিস্তৃত মহুয়ার চাষ ছিল! এই মহুয়া গাছের আয় দুই প্রকারে—খাদ্য হিসাবে এবং মহুয়াজাত আসব হইতে। মহুয়া আসবের উল্লেখ কৌটিল্য তো বিশদভাবেই করিয়াছেন। ঝাট-বিটপও উল্লেখযোগ্য; বাঁশ অথবা অন্য গাছের ঝাড় ও অন্যান্য বড় গাছও এক রকমের অর্থাগমের উপায়। সাধারণ লোকেরা যে বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়াই ঘরবাড়ি বাঁধিত (খুঁটিও ব্যবহার করিত নিশ্চয়ই), তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় শবরীপাদের একটি চর্যাগীতিতে—"চারিপাসে ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।" চঞ্চালী=চঞ্চারিকা যে আমাদের বাঁশের চাঁচারি এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ কী? খুব ভাল বাঁশের ঝাড় ছিল বরেন্দ্রীতে; রামচরিতে এ কথার প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গেই সন্ধ্যাকর নন্দী বলিতেছেন যে, বরেন্দ্রীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ ছিল সেখানকার আখের ক্ষেত। এই ভূমির প্রাচীনতর ও বৃহত্তর সংজ্ঞা হইতেছে পুণ্ড্র। ব্রাত্য পুণ্ড্রদের বাসস্থান পুণ্ড্রদেশ, পুণ্ড্রবর্ধন। এই পুণ্ড্র=পুঁড় কোম বোধ হয় আখের চাষে খুব দক্ষ ছিল, এবং হয়তো সেইজন্যই আখের অন্যতম নামই হইতেছে পুঁড়; একজাতীয় দেশী আখকে বলে পুঁড়ি। আর-একটি লক্ষণীয় নাম গৌড়। গৌড় যে গুড় হইতে উৎপন্ন তাহার শব্দতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ সুবিদিত। এ তথ্যের মধ্যেও আখের চাষের ইঙ্গিত ধরিতে পারা কঠিন নয়। সুশ্রুত-গ্রন্থে পৌণ্ড্রক নামে একপ্রকার ইক্ষুর উল্লেখ আছে, এবং বহু সংস্কৃত নির্ঘণ্ট-রচয়িতা ও কোষকারদের মত এই যে, পুণ্ড্রদেশে যে-ইক্ষু জন্মাইত তাহাই পৌণ্ড্রক। আজকাল পৌঁড়িয়া, পুঁড়ি, পৌঁড়া প্রভৃতি নামে যে ইক্ষু ভারতের সর্বত্র চাষ হইতে দেখা যায় তাহা এই পৌণ্ড্রক ইক্ষু নাম হইতেই উদ্ভূত। সুপ্রাচীন কালেই প্রাচ্যদেশের ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য—চিনি ও গুড়—দেশে বিদেশে পরিচিত ছিল। গ্রীক লেখক ঈলিয়ন্ ইক্ষুদণ্ডপেষণজাত একপ্রকার প্রাচ্যদেশীয় মধুর (পাত্‌লা ঝোলা গুড়?) কথা বলিতেছেন। ইক্ষুনল পেষণ করিয়া একপ্রকার মিষ্টরস আহরণ করিত গঙ্গাতীরবাসী লোকেরা, এ কথা বলিতেছেন অন্যতম গ্রীক লেখক লুক্যান; এ সমস্তই খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর কথা।

উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিস্তৃততর উল্লেখ আমরা পাই পরবর্তী লিপিগুলিতে। একাদশ শতকের শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে পাই "সতলা।...সাম্রপনসা। সগুবাক-নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা...।" দ্বাদশ শতকের ভোজবর্মণের বেলবালিপিতে পাই "সাম্রপনসঃ..

সগুবাকনালিকেরা সলবণা সজলস্থলা সগর্তোষরা।" বিজয়সেনের বারাকপুর শাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের যে গ্রামে চার পাটক ভূমিদানের উল্লেখ আছে তাহার উৎপত্তিমূল্য (বার্ষিক আয়?) ছিল দুই শত কপর্দক পুরাণ। চার কড়িতে এক গণ্ডা, ষোল গণ্ডায় এক কপর্দক পুরাণ। বল্লালসেনের নৈহাটি-তাম্রপট্টে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ আছে; এই ভূমির পরিমাণ বৃষভশঙ্কর তর্থাৎ বিজয়সেনীয় নলের মাপে ৪০ উন্মান ৩ কাক। ইহার উৎপত্তিমূল্য ৫০০ কপর্দক পুরাণ এবং এই আয়ের অন্তত কিয়দংশ পাওয়া যাইতেছে ভূমিসম্বন্ধ 'ঝাট-বিটপ-গর্তোষর-জলস্থল-গুবাক-নারিকেল' হইতে। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-শাসনেও অন্যতম আয়ের পথ ঝাট-বিটপ ও গুবাক-নারিকেল। দত্তভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলাহিষ্ঠী গ্রামে। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর শাসনেও অন্যতম আয়ের পথ ঝাট-বিটপ এবং গুবাক-নারিকেল। ত্রয়োদশ শতকে বিশ্বরূপসেন বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ শাসন-দ্বারা নানা তিথিপর্ব উপলক্ষে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সমুদ্রতীরশায়ী নিম্ন প্রদেশে বিভিন্ন গ্রামে ১১টি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। এই ভূমি নালভূমি (অর্থাৎ কৃষিভূমি) ও বাস্তুভূমি দুইই ছিল, এবং আয়ের প্রধান উপকরণ ছিল পানের বরজ ও গুবাক-নারিকেল। বাকি আয় যে অন্যান্য উৎপন্ন শস্যাদি হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু সেসবের উল্লেখ নাই। অন্যান্য লিপিতেও এইরূপই; ধান্য ও অন্যান্য শস্য, মৎস্য ইত্যাদি উপকরণ অনুল্লিখিতই থাকিত। বিশ্বরূপের ভ্রাতা কেশবসেন এই 'বঙ্গে বিক্রমপুরভাগেই' তলপাড়াপাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাহার নির্দেশ হইতে মনে হয় গুবাক ও নারিকেলই ধান্য ইত্যাদি শস্যের পরে এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে জনৈক রাজা দামোদর পৃথ্বীধর নামক এক ব্রাহ্মণকে ৫ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। ভূমির আয় বা উৎপন্ন দ্রব্যাদির কোনও খবরই চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এই শাসনে উল্লেখ নাই, তবে গ্রামের দক্ষিণ-সীমায় 'লবণোৎসবাশ্রমসম্বাধা-বাটীর' উল্লেখ হইতে মনে হয়, এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল লবণ, এবং লবণ উত্তোলন। দনুজমাধব দশরথদেব সেনরাজবংশ অবসানের পর ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে পূর্ব-বাংলার রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একবার অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে পৃথক পৃথক ভাবে অনেকগুলি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিশেষ উল্লেখ তাহাতে নাই।

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্ত লেখমালাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল, ধান্য এবং অন্যান্য শস্য ছাড়া প্রাচীন বাংলার প্রধান ভূমি- ও কৃষি -জাত দ্রব্য হইতেছে, আম্র অথবা সহকার, মধূক অর্থাৎ মহুয়া, পনস অর্থাৎ কাঁঠাল, ইক্ষু, ডালিম্ব বা দাড়িম্ব, কর্পাট, খর্জুর, বীজ, গুবাক অর্থাৎ সুপারি, নারিকেল, পান, মৎস্য ও লবণ। আম তো বাংলাদেশের সর্বত্রই জন্মায়, এই জন্যই প্রায় সব ক'টি লিপিতেই আমের উল্লেখ আছেই। মহুয়ার উল্লেখ যে ক'টি লিপিতে প্রত্যেকটিরই স্থানের ইঙ্গিত উত্তর-বঙ্গে, শুধু ইরদা তাম্রপট্টের ইঙ্গিত মেদিনীপুর জেলার দাঁতনের দিকে। মহুয়ার চাষ এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই তখন ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। পনস অর্থাৎ কাঁটালের ইঙ্গিত পাইতেছি বিশেষভাবে পূর্ব-বাংলায়, ঢাকা অঞ্চলে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ কিন্তু বলিতেছেন কাঁটাল প্রচুর জন্মাইত পুণ্ড্রবর্ধনে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে, এবং সেখানে এই ফলের আদরও ছিল খুব। গুবাক ও নারিকেল তো এখনও প্রচুরতর পরিমাণে জন্মায় বাংলার গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-করতোয়া ও

বিশেষভাবে সমুদ্রতীর-নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে; লেখমালার ইঙ্গিতও তাই। ইক্ষুর বিচিত্র উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইক্ষুচাষের প্রধানতম স্থান ছিল উত্তর-বঙ্গ, তবে গঙ্গা-ভাগীরথীবাহিত দেশগুলিতেও বোধ হয় কিছু কিছু জন্মাইত। এক ডালিম্ব-ক্ষেত্রের উল্লেখ পাইতেছি লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে; ইহার অবস্থিতি ছিল বর্তমান হাওড়া জেলায় বেতড় গ্রামের নিকটেই, গঙ্গাতীরের সন্নিকটে। পর্কটি বৃক্ষের উল্লেখ পাইতেছি একাধিক পট্টোলীতে; বীজফল ও খেজুরের উল্লেখ তো ধর্মপালের খালিমপুরলিপিতেই আছে। কদলী বৃক্ষ বা ফলের উল্লেখ কোনও পট্টোলীতে বড় একটা দেখা যাইতেছে না; কিন্তু পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং নানা প্রস্তরচিত্রে বারবার ফলসমন্বিত বা ফলবিযুক্ত কলাগাছের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অস্ট্রিক্-আদি-অস্ট্রেলীয় আমল হইতে কলা বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। উত্তর-রাঢ়ে, বরেন্দ্রীতে গুবাক ও নারিকেলের উল্লেখ পাইতেছি শুধু লিপিগুলিতেই নয়, রামচরিতেও। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ আছে যে, বরেন্দ্রীর মাটি নারিকেল উৎপাদনের পক্ষে খুব প্রশস্ত। যাহাই হউক, নারিকেলের অধিক উল্লেখ পাই বঙ্গে বিক্রমপুর-ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমণ্ডলে, বঙ্গের নাব্য অর্থাৎ নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে, ঢাকা জেলার পদ্মাতীরবর্তী ভূমি অঞ্চলে। খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের (অষ্টম শতক) আস্রফপুর তাম্রপট্টোলী (২নং) হইতেই বুঝা যাইবে, সুপারির আদর কতটুকু ছিল ধনসম্বল হিসাবে। পানের বরজের উল্লেখ যে পাই, সে-ও বঙ্গের নাব্য প্রদেশে; অন্যান্য স্থানেও হইত সন্দেহ নাই। মৎস্যের সবিশেষ উল্লেখ বাংলার কোনও লিপি অথবা শাসনে নাই, কিন্তু যখনই ভূমি দান করা হইয়াছে, সজল অর্থাৎ জলাধার, খাল, বিল, প্রণালী, নালা, পুষ্করিণী ইত্যাদির অধিকার সমেতই দান করা হইয়াছে; অষ্টম-শতক-পরবর্তী শাসনগুলিতে সর্বত্রই তাহার উল্লেখও আছে। এই যে 'সজল' ভূমি দান, ইহা 'সমৎস্য' দান, এই অনুমান কিছু অসংগত নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অরণ্য এবং বহু ক্ষেত্রেই ঝাটবিটপ, তরুষণ্ডাদিসহ ভূমি দান করা হইয়াছে; ইহার আয়ও কম ছিল না। ঝাট অথবা ঝাড় আমার তো বাঁশের ঝাড় বলিয়াই সন্দেহ হয়, এবং অরণ্য ও বিটপ যে কাঠের কাঁচা মাল তাহাও সুস্পষ্ট। বাঁশ ও কাঠ এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যতম ধনসম্বল। লবণ ঠিক কৃষিজাত অথবা ভূমিজাত দ্রব্য না হইলেও এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইবে, উল্লিখিত শাসনগুলিতে যেখানে 'সলবণ' ভূমি দান করা হইতেছে, সেই ভূমি সর্বদাই সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নভূমিতে অথবা পদ্মার তীরে তীরে, মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে, চট্টগ্রামে। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা শাসনে যে লোনা-জোড়া-প্রস্তরের উল্লেখ আছে, তাহা যে লবণের গর্তের মাঠ, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে।

এইসব ছাড়া আরও কিছু কিছু ভূমিজাত দ্রব্যাদির খবর ইতস্তত অনুসন্ধানে জানা যায়। যেমন, বিদ্যাপতি তাঁহার কীর্তিকৌমুদী-গ্রন্থে গৌড় দেশকে "আজ্যসার গৌড়" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। আজ্য অর্থে ঘৃত, ঘৃতই গৌড় দেশের শ্রেষ্ঠ বস্তু। চতুর্দশ শতকের অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রাকৃত-পৈঙ্গল-গ্রন্থের একটি পদে প্রাকৃতবাঙালীসুলভ যে আহার্য-বর্ণনা আছে, তাহাতে কলাপাতায় ওগরা ভাত ও নালিতা শাক এবং মৌরলা মাছের সঙ্গে সঙ্গে গব্য (মহিষের নয়) ঘৃত ও দুগ্ধের উল্লেখ আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রভূমিতে এলাচের সুবিস্তৃত চাষ ছিল, এবং সেইসব ক্ষেত্রে খুব ভাল এলাচ উৎপন্ন হইত। প্রিয়ঙ্গুলতাও

উৎপন্ন হইত প্রচুর। এলাচ ও প্রিয়ঙ্গু-সরিষা যেমন হইত লবঙ্গও জন্মাইত তেমনই প্রচুর। সরিষার বাণিজ্যিক চাহিদা কেমন ছিল জানা নাই; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য মসলার সঙ্গে সঙ্গে এলাচ ও লবঙ্গ যে প্রচুর পরিমাণে পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং পূর্ব ও দক্ষিণ য়ুরোপে রপ্তানি হইত, পেরিপ্লাস-গ্রন্থে ও টলেমির ইন্ডিকা-গ্রন্থেই সে প্রমাণ আছে। রাজশেখর তাঁহার কাব্য-মীমাংসা গ্রন্থে পূর্বদেশে ১৬টি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই ষোলটি জনপদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন; যথা, লবলী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা। এই ষোলটি জনপদের চারিটি বর্তমান বাংলাদেশে; যথা, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। লাক্ষা রাঢ়দেশে ও উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমিতে এখনও জন্মায়। অগুরু বাংলাদেশে কোথাও জন্মায় কিনা, জানি না; তবে কামরূপের নানা জায়গায় জন্মায়, তাহার প্রমাণ পাইতেছি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও তাহার টীকায়। লবলী বরেন্দ্রীতে প্রচুর জন্মাইত; তাহার উল্লেখ রামচরিতে আছে। একই শ্লোকে উল্লিখিত আছে যে বরেন্দ্রী দেশে বড় বড় লকুচ, শ্রীফল ও খাদ্যোপযোগী কন্দমূল জন্মাইত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার বাংলাদেশের একটি আকরজ দ্রব্যের খবর দিতেছেন। কৌটিল্য যে অধ্যায়ে মণিরত্নের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনি কোথায় কোথায় ছিল, তাহার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন; এই তালিকার দুইটি জনপদ পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর (=ত্রিপুরা) নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে। বজ্রভূমিতে খুব সম্ভব হীরার খনি ছিল, এবং তাহা হইতেই বজ্রভূমি নামের উৎপত্তি। আইন-ই-আকবরী-গ্রন্থে কিন্তু মদারণ বা গড় মন্দারণে এক হীরার খনির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর-একটি আকরজ দ্রব্যের উল্লেখও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। গৌড়িক নামক একপ্রকার খনিজ রৌপ্যের নাম কৌটিল্য করিয়াছেন, এবং তাহা যে গৌড়দেশোৎপন্ন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন, এই রৌপ্যের রং অগুরু ফুলের মতন।

আর-একটি খনিজ দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ভবিষ্যপুরাণে। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়দেশের জাঙ্গলখণ্ডে লৌহখনির উল্লেখ আমরা পাইতেছি। বাঁকুড়া-বীরভূমে সাঁওতালভূমে তো এখনও জায়গায় জায়গায় লোহা আহরণ এবং লোহার তৈজসপত্র, গৃহোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈরি করা স্থানীয় দরিদ্রতর জনসাধারণের জীবনধারণের অন্যতম উপায়। এসব জায়গায় লোহা গলানোর পদ্ধতিও প্রাগৈতিহাসিক। ভারতবর্ষের বৃহত্তর লৌহ কারখানা তো এখনও বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমসীমা-সংলগ্ন। তাম্র বা তামা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা। সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া জামসেদপুর এবং তারপর পশ্চিমে চক্রধরপুর ছাড়াইয়া সমানেই তাম্রসমাবেশ এবং তাম্রখনিনিচয়। আমার তো মনে হয়, তাম্রলিপ্তি নামটির মধ্যেও এই তাম্রসমৃদ্ধির স্মৃতি জড়িত। এই স্মৃতিও প্রাগৈতিহাসিক।

বাংলাদেশের হীরাসমৃদ্ধির প্রমাণ আরও কিছু আছে। রত্নপরীক্ষা, বৃহৎসংহিতা, নবরত্নপরীক্ষা, রত্নসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই উল্লেখ আছে, পৌণ্ড্রদেশ একসময় হীরার জন্য বিখ্যাত ছিল; অগস্তি মত-গ্রন্থের মতে বঙ্গেও কিছু কিছু হীরা পাওয়া যাইত। তবে, মনে হয়, এই সমৃদ্ধি খ্রীষ্টপূর্ব শতকের; পেরিপ্লাস-গ্রন্থের সময় সে সমৃদ্ধি আর ছিল না। পেরিপ্লাসে গাঙ্গেয় মুক্তার উল্লেখের কথা আগেই বলা হইয়াছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও সংস্থাপনার মধ্যে হস্তীর একটি প্রধান স্থান ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাই, গঙ্গারাষ্ট্রের সম্রাট উগ্রসৈন্যের সামরিক শক্তি অনেকটা হস্তীর উপর নির্ভর করিত। পাল ও সেন রাজাদের হস্তী, অশ্ব, ও নৌবল লইয়াই ছিল সামরিক শক্তি। এই হস্তী আসিত কোথা হইতে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, কলিঙ্গ, অঙ্গ, করূষ এবং পূর্বদেশীয় হস্তীই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই পূর্বদেশ বলিতে কৌটিল্য বাংলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের কথা বলিতেছেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখনও গারো পাহাড় অঞ্চল হাতির জায়গা। আর এই বাংলাদেশেই তো পরবর্তী কালে হাতি ধরার এবং হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাচীন গৌড়দেশ যে হাতির জন্য বিখ্যাত ছিল তাহা রাজতরঙ্গিণীর কবির নিকটও সুবিদিত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণে, এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণেও তাহা জানা যায়। জীবজন্তু পশুপক্ষীও দেশের ধনসম্বলের মধ্যে গণ্য। হাতি ছাড়া অন্যান্য পশুর উল্লেখ কিছু কিছু বাংলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। যেসব জীবজন্তুর উল্লেখ বিভিন্ন পুট্টোলীতে আছে তাহার মধ্যে হরিণ, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র ও সর্প অন্যতম। আদিম বাঙালীর সর্প- ও ব্যাঘ্র -ভীতি সুবিদিত, এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় দেখাইয়া কী করিয়া তাহাদের পূজা আদায় করিয়াছিল তাহাও এখন আর অবিদিত নয়। মধ্যযুগে মনসাপূজা এবং দক্ষিণরায় বা ব্যাঘ্রপূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং কোন কোন প্রস্তরচিত্রে আরও অন্যান্য নানা জীবজন্তুর পরিচয় পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে গোরু, বানর, হরিণ, শূকর, ঘোড়া ও উট উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটি প্রাণী বিদেশাগত, এবং যুদ্ধ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারেই হয়তো ইহাদের আমদানি হইয়াছিল। পক্ষীর উল্লেখ ও পরিচয় কমই পাওয়া যায়; তবে হাঁস, বন্য ও গৃহপালিত কুক্কুট, কপোত, নানাজাতীয় জলচর বিহঙ্গ, কাক ও কোকিলের উল্লেখ ও পরিচয় লিপিগুলিতে, মৃৎ- ও প্রস্তর -চিত্রে ও সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়।

চার

বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয় বস্ত্রশিল্পের কথা। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশেবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাই যে এদেশের প্রধান শিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, পেরিপ্লাস গ্রন্থে, আরব, চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। কৌটিল্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশের দুকূল খুব নরম ও সাদা; পুণ্ড্রদেশের দুকূল শ্যামবর্ণ এবং দেখিতে মণির মতো পেলব; সুবর্ণ-কুড্যদেশের (কামরূপ) দুকূলের রং নবোদিত সূর্যের মতন। টীকাকার যোজনা করিতেছেন, দুকূল বস্ত্র খুব সূক্ষ্ম, ক্ষৌম বস্ত্র। পত্রোর্ণ-(জাত) বস্ত্র মগধ, সুবর্ণকুড্যক অর্থাৎ কামরূপে ও পুণ্ড্রদেশে উৎপন্ন হইত। পত্রোর্ণজাত বস্ত্র বোধ হয় এণ্ডি ও মুগাজাতীয় বস্ত্র (পত্র হইতে যাহার উর্ণা=পত্রোর্ণ?)। অমরকোষের মতে পত্রোর্ণ সাদা অথবা ধোয়া কোষেয় বস্ত্র; টীকাকার পরিষ্কার বলিতেছেন, কীট-

বিশেষের জিহ্বারস কোন কোন বৃক্ষপত্রকে এই ধরনের উর্ণায় রূপান্তরিত করে। লক্ষণীয় এই যে, কৌটিল্যোক্ত দেশগুলিতে এখনও খুব ভাল এণ্ডি-মুগাজাতীয় বস্ত্র উৎপন্ন হয়, বিশেষভাবে কামরূপে। পুণ্ড্রদেশে যে শুধু দুকূল ও পত্রোর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহাই নয়, মোটা ক্ষৌম বস্ত্রও উৎপন্ন হইত, কৌটিল্য সে কথাও বলিতেছেন। বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূল যেমন উৎপন্ন হইত, তেমনই শ্রেষ্ঠ কার্পাস-বস্ত্রেরও অন্যতম উৎপত্তিস্থল ছিল এই দেশ। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীন কালে তাহা হইলে চারিপ্রকার বস্ত্রশিল্প ছিল,—দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক। প্রাচীন বাংলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বারবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার রপ্তানির উল্লেখ পাওয়া যায় পেরিপ্লাস গ্রন্থে।

রপ্তানি দ্রব্যগুলির প্রথমেই পাইতেছি তেজপাতা। টলেমি বলেন, কিরাতদেশেই সবচেয়ে ভাল তেজপাতা উৎপন্ন হইত। উত্তর-বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে, শ্রীহট্টে এবং আসামের কোনও কোনও জায়গায় এখনও প্রচুর তেজপাতা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ব্যবসাও খুব বিস্তৃত। ইহার পরেই দেখিতেছি, গাঙ্গেয় পিপ্পলির উল্লেখ; ইহারও উৎপত্তিস্থল বোধ হয় ছিল বাংলার উত্তরে পার্বত্য সানুদেশ। পিপ্পলির পরেই পাইতেছি, মুক্তার উল্লেখ। এই মুক্তা যে গাঙ্গেয় মুক্তা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য হইতেছে গাঙ্গেয় সূক্ষ্মতম বস্ত্রসম্ভার। সর্বশেষ উল্লেখ পাইতেছি স্বর্ণখনির।

কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অর্থশাস্ত্র বা পেরিপ্লাস ছাড়াও অন্যত্র অনেক জায়গায় আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্‌ন্ খুর্দদ্‌বা নামক আরব ভৌগোলিকের (দশম শতক) নাম করা যাইতে পারে। আরবদেশীয় সওদাগর সুলেমান বলিতেছেন, এদেশে একপ্রকার সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র উৎপন্ন হইত, অন্য কোন দেশে এমন সূক্ষ্ম বস্তু উৎপন্ন হইত না; এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও সুকোমল ছিল যে একটা আংটির ভিতর দিয়া তাহাকে চালাইয়া দেওয়া যাইত। সুলেমান আরও বলেন যে, এ বস্ত্র ছিল কার্পাসের তৈরি। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে চীন-পরিব্রাজক চাও-জু-কুয়া পিং-কলো বা বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলিতেছেন, এদেশে খুব ভাল দুমুখো তলোয়ার তৈরি হয়, এবং কার্পাস এবং অন্যান্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ত্রয়োদশ শতকেরই শেষের দিকে (১২৯০) মার্কো পোলো বলিতেছেন, বাংলাদেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন করে, এবং তাহাদের কার্পাসের ব্যবসা ছিল খুব সমৃদ্ধ। পঞ্চদশ শতকে আর-একজন চীন-পরিব্রাজক মা-হুয়ান (১৪০৫) বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ ছাড়াও তাঁহার বিবরণটি অন্যান্য ধনসম্বলের পরিচয়ের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য : "নানাপ্রকার ধান, যব, গম ও সর্ষপ এদেশের প্রধান শস্য। এই দেশে নারিকেল, ধান, তাল ও কাজঙ্গ হইতে মদ তৈরি করা হয়, এবং সেই মদ প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় করা হয়। উৎপন্ন ফলের মধ্যে কলা, কাঁটাল, আম, ডালিম ও আখ প্রধান। এদেশে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়; এই বস্ত্র সাধারণত প্রস্থে দুই এবং দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত। এই দেশে রেশমের কীট পালিত হয় ও রেশমনির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়।"

কার্পাস সম্বন্ধে একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে চর্যাগীতি-গ্রন্থ হইতে। শবরপাদের একটি পদে আছে : 'বাড়ির বাগানে কার্পাসফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়াই আনন্দ—যেন ঘরের চারপাশ উজ্জ্বল হইল, আকাশের অন্ধকার টুটিল।' ইহা হইতেই বুঝা যায়, কার্পাসকে কতখানি মূল্য দেওয়া হইত তদানীন্তন বাংলাদেশে।

কাহ্নপাদের একটি পদে তাঁত বিক্রয়ের কথাও আছে, এবং সাধারণত ডোমনীরাই বোধ হয় তাঁত (বাঁশের) তৈরি করিত। আর-একটি পদের রচয়িতার নাম পাইতেছি তন্ত্রীপাদ। তন্ত্রীপাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে তাঁত-শিক্ষক অথবা তাঁত-গুরু। ইহাই বোধ হয় এই পদরচয়িতার পূর্বতন বৃত্তি ছিল; পরে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। নির্ধন ব্রাহ্মণের গৃহে নারীরা যে তুলা ধুনিয়া সুতা কাটিতেন তাহা কবি শুভাঙ্কের (আনুমানিক, একাদশ-দ্বাদশ শতক) একটি প্রশস্তিশ্লোকে জানা যায়।

সমসাময়িক কালেই আর-একজন অজ্ঞাতনামা কবি বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের সূক্ষ্ম বসনের উল্লেখ করিয়াছেন (সদুক্তিকর্ণামৃত)। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তিবাসী জ্যোতিরীশ্বর তাঁহার বর্ণরত্নাকর গ্রন্থে বাংলাদেশের 'মেঘ উদুম্বর', 'গঙ্গা-সাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', সিলহটী (শ্রীহট্ট-জাত), গাঙ্গেরী ইত্যাদি পট্ট- ও নেত -বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প এবং ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায়। পট্টবস্ত্র বা পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল, এবং নানা উপলক্ষে, বিশেষভাবে পূজা, ব্রত, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারেরও খুব প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ সুপ্রচুর। পাটের চাষ এখনকার মতো বিস্তৃত না হইলেও ছিল যে সন্দেহ নাই, এবং পাটের কচিপাতা বা নালিতা শাক এখনকার মতো তখনও বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ছিল।

বস্ত্রশিল্পের পরেই উল্লেখ করিতে হয় চিনি, লবণ ও মৎস্যের কথা। চিনি মারফত দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত বলিয়া মনে হয়। পৌণ্ড্রক ইক্ষু হইতে যে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয় এ কথা সুশ্রুত বহুদিন আগেই বলিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশ হইতে প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চিনির উল্লেখ করিয়াছেন মার্কো পোলো। ষোড়শ শতকের গোড়ায়ও ভারতের বিভিন্ন দেশে, সিংহলে, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে চিনি রপ্তানি লইয়া দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, এ সাক্ষ্য দিতেছেন পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা। লবণের ব্যবসা লইয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাড়াকাড়ির কথা সুবিদিত; ইহা হইতেই অনুমান হয়, অষ্টাদশ শতকেও লবণের ব্যবসা খুব লাভজনকই ছিল। মৎস্যের একটা বিস্তৃত আন্তর্দেশিক ব্যবসা নিশ্চয়ই ছিল, কাঁচা এবং শুকনা মৎস্য দুয়েরই। বাংলাদেশ তো চিরকালই মৎস্যাহারী, এবং বাঙালী স্মৃতিকার ব্রাহ্মণ ভবদেব ভট্ট যেমন করিয়া বাঙালীর মৎস্যাহারের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাংলার বাহিরে বাঙালীর এই মৎস্যপ্রীতি সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব ছিল। ভবদেব ভট্ট নানাপ্রকার মৎস্যের উল্লেখ করিয়াছেন; শুকনা মাছের কথাও বলিয়াছেন। দুইই ছিল ভক্ষ্য এবং সেই হেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম দ্রব্য।

কারুশিল্পও কম ছিল না। তাহার লিপি-প্রমাণ বিশেষ নাই, কিন্তু অনুমান সহজেই করা চলে। তক্ষণ- ও স্থাপত্য -শিল্প, স্বর্ণ- ও রৌপ্য -শিল্পের কথা আগেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। সোনা, রুপা, মণি, হীরা ও বিচিত্রদ্যুতিময়-প্রস্তর-সজ্জিত নানা অলংকার বিত্তশালী সমাজে ব্যবহৃত হইত, দেবদেবীর অলংকরণ-ঐশ্বর্য দেখিলে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবকত্-ই-নাসিরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণসেন সোনা ও রুপার বাসনে আহার করিতেন। রাজরাজড়া তো করিতেনই, বণিক-সাধু-সওদাগরেরাও করিতেন; তাহার কিছু আভাস মধ্যযুগের

বাংলা সাহিত্যেও আছে। রামচরিত-কাব্যে মণিময় ঘুঙুর, মুক্তা, হীরা ও নানা বিচিত্রবর্ণ প্রস্তরখচিত অলংকারের উল্লেখ আছে; বিজয়সেনের দেওপাড়ালিপি, লক্ষ্মণসেনের নৈহাটিলিপি এবং অন্যান্য লিপিতে দেবদাসী, রাজান্তঃপুরের নারী ও পরিচারিকাদের নানা মূল্যবান অলংকারসজ্জার উল্লেখ আছে। লৌহশিল্পও ছিল, দুই-একটি শাসনে কর্মকার তো রাজপাদোপজীবী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। চাও-জু-কুয়া যে বলিয়াছেন, বাংলাদেশে দুমুখো খুব ধারালো তলোয়ার তৈরি হয়, তাহার মধ্যে লৌহ ইত্যাদি ধাতুশিল্পে এদেশের শিল্পকৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। লৌহশিল্পের প্রচলন যে খুবই ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। কর্মকারের সুপ্রাচুর্য না থাকিলে তো কৃষিকর্ম এবং কৃষিসমাজ চলিতেই পারে না। দা', কুড়াল, কোদালি, খন্তা, খুরপি, লাঙ্গল ইত্যাদি ছাড়া লোহার জলপাত্র (ইদিলপুরলিপি) তীর, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর তৈরি হইত। অগ্নিপুরাণের মতে অঙ্গ ও বঙ্গদেশ তরোয়ালের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কুম্ভকারের মৃৎশিল্পের প্রচলনও ছিল খুব। কুম্ভকারের উল্লেখ দুই-একটি লিপিতে আছে। মনে হয়, কুম্ভকারবৃত্তির কেন্দ্র ছিল গ্রাম। পোড়ামাটির নানাপ্রকারের থালা, বাটি, জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দোয়াত, প্রদীপ ইত্যাদি পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, বজ্রযোগিনীর সন্নিকটস্থ রামপালে, ত্রিপুরায় ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর, মহাস্থান, সাভার ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকও বিস্তৃত মৃৎশিল্পের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের শাসনে মনে হইতেছে, হস্তিদন্তশিল্পের প্রচলনও ছিল। সূত্রধরের উল্লেখও কয়েকটি লিপিতে পাইতেছি; আশ্চর্যের বিষয় এই, ইঁহাদের উল্লেখ তাম্রপট্টগুলির খোদাইকররূপে, লিখিত শাসন ইঁহারাই তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করিতেন। না হইবার কারণও নাই; সূত্রধর যে শুধু কাঠ-মিস্ত্রী, তাহাই নয়; আমাদের প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে (যেমন, মানসারে) সূত্রধর বলিতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠ-মিস্ত্রী সকলকেই বুঝাইত। কাঠের শিল্পের প্রচলনও কম ছিল না। কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি কালের ভ্রূক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া আজ আর বাঁচিয়া নাই, কিন্তু স্তম্ভ, খিলান, খুঁটি ইত্যাদির দুই-চারিটি টুকরা আজও যাহা পাওয়া যায় তাহাদের কারু- ও শিল্প -নৈপুণ্য বিস্ময়কর। সংসারের আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, রথ, বিশেষভাবে নদীগামী নানাপ্রকার নৌকা ও সমুদ্রগামী বৃহদাকৃতি নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই তো ছিল কাঠের। সেই দিক দিয়া দেখিলে কাষ্ঠশিল্পের সমৃদ্ধি সহজেই অনুমেয়, এবং সমাজের মধ্যে এই শিল্পীদের একটা স্থানও ছিল। সাধারণভাবে শিল্পী ও শিল্পীগোষ্ঠীর কথার আভাস তো বিজয়সেনের দেওপাড়ালিপির মধ্যেও আছে। তাহা ছাড়া, পঞ্চম হইতে অষ্টম শতকের তাম্রপট্টোলীগুলিতে ভূমিদান-বিক্রয়ব্যাপারে বিষয়পতি বা অন্য রাজপ্রতিনিধি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে-কয়জন প্রধানের মতামত গ্রহণ করিতেন, তাহাদের মধ্যে প্রথম-কুলিক সর্বদাই অন্যতম। কুলিক অর্থ শিল্পী; এই প্রথম-কুলিক খুব সম্ভবত ছিলেন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান প্রতিনিধি। পূর্বোল্লিখিত ভাটেরা গ্রামের গোবিন্দকেশবদেবের লিপিতে গোবিন্দ নামে এক কাংস্যকার বা কাঁসারীর উল্লেখ পাইতেছি। কাঁসাশিল্পের আভাসও তাহা হইলেও কিছু পাওয়া গেল। নানাপ্রকার মিশ্র ধাতুশিল্পের প্রমাণ ও পরিচয় আরও পাওয়া যায় অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও অষ্টধাতুর রচিত মূর্তিগুলির মধ্যে।

সকল শিল্পের মধ্যে নৌ-শিল্প বা পোত-নির্মাণশিল্পের একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই ছিল; তাহার প্রমাণ শুধু বর্তমান চট্টগ্রামে কিংবা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নয়, প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মণের হড়াহালিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) গৌড়দেশ-বাসীদের "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলা হইয়াছে। কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পাল- ও সেন -বংশের লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান প্রভৃতি শব্দ তো প্রায়শ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় রাজবংশের, এবং সমসাময়িক বাংলাদেশের অন্যান্য রাজবংশেরও, সামরিক শক্তি নৌবলের উপর অনেকটা নির্ভর করিত। বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপিতে নৌযুদ্ধের বর্ণনাও আছে। সাধারণ লোকদের যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌ-যানের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট; এই নদীমাতৃক, খাড়িপ্রধান, বারিবহুল দেশে ইহা তো স্বাভাবিক। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘরলিপিতে (৫০৭-৮ খ্রী) বন্দর বা পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে। ধর্মাদিত্যের ২নং শাসনে "নৌদণ্ডক" কথার উল্লেখ আছে; বোধ হয় "নৌদণ্ডক" কথার অর্থ নৌকার আশ্রয়, অর্থাৎ বন্দর, ঘাট। এইসব উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নদনদীগামী ছোট বড় নৌকা, সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত একটা সমৃদ্ধ শিল্প ও ব্যবসায় প্রাচীন বাংলায় নিশ্চয়ই ছিল।

পাঁচ

নৌ-শিল্পের কথা হইতেই ধনোৎপাদনের তৃতীয় উপায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথার মধ্যে আসিয়া পড়া যাইতে পারে। এ পর্যন্ত ভূমিজাত ও শিল্পজাত যেসব দ্রব্যাদির কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ। হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয়গৃহ, হট্টবর, আপণ, মানপ (তৌলদার=দোকানদার=ছোট ব্যবসায়ী) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ প্রায়শ লেখমালাগুলিতে দেখা যায়; অষ্টম শতক পরবর্তী লিপিগুলিতে তো অনেক স্থলেই হাট-বাজার-ঘাট সমেত জমি দান করা হইয়াছে। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক ইত্যাদি রাজকর্মচারীর উল্লেখ হইতেও একটা সমৃদ্ধ অন্তর্বাণিজ্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়; হাটবাজার, বাণিজ্যশুল্ক এবং পারঘাট-খেয়াঘাটের কর ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্ব ছিল ইঁহাদের উপর। এইসব উপায় হইতে রাষ্ট্রের যথেষ্ট অর্থাগম হইত। ধর্মাদিত্যের পট্টোলী দুইটিতে "ব্যাপার-কারণ্ডয়" এবং "ব্যাপারণ্ড্য" নামে একপ্রকার রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; খুব সম্ভব ইঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষণা-বেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এবং ছোটবড় নগরগুলিই এইসব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। নব্যাবকাশিকা এবং কোটীবর্ষ যে বণিক ও ব্যবসায়ীদের খুব সমৃদ্ধ মিলনকেন্দ্র ছিল, এ খবর তো কোটালিপাড়া ও দামোদরপুর পট্টোলীতেই পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধনের এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রের খবর পাওয়া যাইতেছে সোমদেবের কথাসরিৎসাগর-গ্রন্থে। কিন্তু, শহর ছাড়া গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারেও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য নিশ্চয়ই চলিত। এইসব গ্রাম ও গ্রামান্তরের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। ভূমিজাত অন্যান্য কিছু কিছু দ্রব্য, যেমন পান, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদির ব্যবসা নিশ্চয়ই বিস্তৃততর ছিল এবং শুধু বাংলাদেশের ভিতরেই নয়, দেশের বাহিরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে

সুপারি ও নারিকেল এই দুই দ্রব্যই কিছু কিছু রপ্তানি হইত। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে পাই, দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া বাঙালী বণিকেরা গুজরাট পর্যন্ত যে বাণিজ্যসম্ভার লইয়া যাইতেন, তাহার মধ্যে গুয়া (ক) বা গুবাক, পান ও নারিকেলের উল্লেখ। গুয়া বা গুবাক যে সুপারি নাম লইল, তাহার ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের এই দ্রব্যটির বাণিজ্য-ইতিহাসও লুকাইয়া আছে। বর্তমান গৌহাটি শহরের নামটি আসিয়াছে গুয়া হইতে; গুবাক ক্রয়-বিক্রয়ের হাট বা হাটি অর্থে গুবাহাটি=গুয়াহাটি=গৌহাটি। এই গুবাক প্রাচীন কালেই আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশগুলিতে রপ্তানি হইত; ঐদেশীয় বণিকেরা এই দ্রব্য জাহাজ বোঝাই করিতেন পশ্চিম-ভারতের বন্দর শূর্পারক=সুপ্পারক=সোপারা হইতে এবং তাঁহারা এই দ্রব্যকে সোপারার ফল বলিয়াই জানিতেন; এই অর্থে পরবর্তী কালে গুবাক হইল সুপারি এবং সেই নামেই ভারতের সর্বত্র ইহার পরিচয়; কিন্তু বাংলাদেশের, বিশেষত পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও ইহার নাম গুবা বা গুয়া। গুবাকের ব্যবসা যে খুবই প্রশস্ত ছিল, এবং তাহা হইতে এই দেশের প্রচুর অর্থাগমও হইত, তাহার প্রমাণ তো ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্তও পাওয়া যায়। কোম্পানির আমলে সুপারি বাংলাদেশের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। বাংলাদেশের লবণ সামুদ্রিক লবণ। মধ্যযুগের যে দুইটি কাব্যের নাম কিছু আগে করিয়াছি, তাহাতেই প্রমাণ আছে লবণও অন্যতম বাণিজ্যসম্ভার ছিল। বাঙালী বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে পাথুরে লবণ লইয়া আসিতেন। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলেও দেখি, লবণের ব্যবসা লইয়া কাড়াকাড়ি। এই প্রয়াসের ইতিহাস পড়িলে স্বতই মনে হয়, ব্যবসাটা খুবই লাভবান ছিল। সে কথাটি না বুঝিলে প্রাচীন লিপিগুলিতে কেন যে ভূমিদানের সময় বারবারই 'সলবণ' কথাটি উল্লেখ করা হইতেছে, সে রহস্যটি ধরা পড়ে না।

তেজপাতা ও পিপ্পলের ব্যবসার উল্লেখও আমরা দেখিয়াছি। এই দুটি দ্রব্যের ব্যবসাও খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল, সন্দেহ নাই। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। এই শিল্প সম্বন্ধে আগে যে-সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, নানাপ্রকার বস্ত্রের ব্যবসা বাংলাদেশে খুব সুপ্রাচীন এবং শুধু প্রাচীন বাংলায়ই নয়, একেবারে অষ্টাদশ শতকের শেষ, ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত সর্বদাই এই বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা দেশের অর্থাগমের একটা মস্ত বড় উপায় ছিল।

অনুমান করা চলে যে, প্রাচীন বাংলায় অর্থাগমের অন্যতম নয়, প্রথম ও প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য। এ কথা যে একেবারে শূন্যকথা নয়, তাহা বস্ত্রশিল্প ও পিপ্পল সম্বন্ধে প্লিনির উক্তি হইতেও কতকটা বুঝা যায়। ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য, লবণ, নানা প্রকার হীরা, মুক্তা ও সোনা, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা-দ্রব্য ইত্যাদির কথা তো আগেই বলিয়াছি। বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্পে বাণিজ্য উপলক্ষে তাম্রলিপ্তির উল্লেখও সুপরিচিত। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে একাধিক জায়গায় উল্লেখ আছে, পাটলীপুত্র হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে বণিকদের পুণ্ড্র অথবা পুণ্ড্রবর্ধনে আসিবার কথা। ইৎসিঙ্ও এই পথেরই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, তাম্রলিপ্তি হইতে পশ্চিমবাহী পথ ধরিয়া যখন তিনি বুদ্ধগয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার পথসঙ্গী হইয়াছিল শতশত বণিক। তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যের উল্লেখও বারবার

নানা গ্রন্থে দেখা যাইতেছে। বিদ্যাপতির পুরুষ - পরীক্ষায় গুজরাটের সঙ্গে গৌড়ের বাণিজ্যসম্বন্ধের আভাস পাইতেছি। গঙ্গার মুখে গঙ্গাবন্দরের কথা, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্যসমৃদ্ধির উল্লেখ তো য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ও করিয়া গিয়াছেন। কথাসরিৎসাগরের মতেও তাম্রলিপ্তি বিত্তশালী বণিকদের কেন্দ্র ছিল; তাঁহারা লঙ্কা, সুবর্ণদ্বীপ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিলে সহজেই মনে হয়, প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা - বাণিজ্যেরই উপর। তাহা ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাঁহাদের আহ্বান করা হইতেছে, সেই পাঁচজনের মধ্যে দুইজন তো রাজকর্মচারীই—বিষয়পতি স্বয়ং এবং প্রথম-কায়স্থ, বা জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ; বাকি তিন জনের মধ্যে দুইজন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি—নগরশ্রেষ্ঠী এবং প্রথম-সার্থবাহ; অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম-কুলিক অর্থাৎ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাহা হইলে দেখিতেছি, রাষ্ট্রেও কতকটা আধিপত্য এই বণিক ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এইসব শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই ইঁহারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রাচীন বাংলার লক্ষ্মী ব্যবসাবাণিজ্য-নির্ভরই ছিলেন বেশি, এবং সেই লক্ষ্মী বাস করিতেন বণিক, ব্যাপারী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদির ঘরে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সওদাগরদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাহিনীগুলিতেও সে কথার প্রমাণ আছে; ধনপতি, হীরামানিক, দুলালধন ইত্যাদি নাম যে বণিকদের মধ্যেই পাই, তাহা একেবারে নিরর্থক নয়। অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে দেখা যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে সার্থবাহদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদেরও যথেষ্ট আধিপত্য ছিল।

এই সমৃদ্ধ বাণিজ্য স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথেই চলিত। বাণিজ্যপথের বিস্তৃততর আলোচনা ইতিপূর্বেই করিয়াছি। অনুমান হয়, নৌ-বাণিজ্যই প্রবলতর ও প্রশস্ততর ছিল। গুজরাট হইতে গৌড়ে, কিংবা বারাণসী হইতে পুণ্ড্রবর্ধনে যে বাণিজ্যের আভাস বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় কিংবা সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পাওয়া যায়, জাতকের বহু গল্পে তাম্রলিপ্তিতে বণিকদের যে আনাগোনার খবর পাওয়া যায় তাহা হয়তো স্থলপথেই বেশি হইত। বারাণসী হইতে মগধের ভিতর দিয়া অঙ্গের রাজধানী চম্পা হইয়া পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত সার্থবাহের গোরুর গাড়ির লহর চলাচলের পথও ছিল; কিন্তু চম্পা হইতে গঙ্গা ও ভাগীরথী বাহিয়া গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত নৌকাপথও প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই নদীপথের বন্দর ও দেশগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। স্থলপথের আর-একটি আভাস য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়। কজঙ্গল বা উত্তররাঢ় হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সেখান হইতে একটি বৃহৎ নদী পার হইয়া কামরূপে। এই পথেই কামরূপের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যসম্বন্ধ চলিত। পূর্ব ও নিম্ন বঙ্গের সঙ্গে কামরূপের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল সেই পথ ধরিয়া যে পথে এই চীন পরিব্রাজক কামরূপ হইতে সমতট ও তাম্রলিপ্তিতে আসিয়াছিলেন। আর, উড়িষ্যার সঙ্গে বাণিজ্যসম্বন্ধের স্থলপথ ধরিয়াই যে পরবর্তী কালে চৈতন্যদেব নীলাচল গিয়াছিলেন, তাহা তো সহজেই অনুমেয়।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর যে ছিল গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি, তাহাও সুস্পষ্ট। তাম্রলিপ্তিই জাতকের দামলিপ্তি এবং টলেমির তামালিতিস্, য়ুয়ান্-

চোয়াঙের তন্-তে ালহ্-তি। সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যপথের আভাস ফা হিয়ান্ রাখিয়া গিয়াছেন (চতুর্থ শতক)। তাহারও তিন-চারি শত বৎসর আগে ভারতের দক্ষিণসমুদ্রতীর বাহিয়া গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সুদূর রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধের আভাস তো পেরিপ্লাস ও টলেমির গ্রন্থেই পাওয়া যায়। মিলিন্দ-পঞ্হ গ্রন্থে বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গকে একটি অন্যতম সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্যান্য অনেক বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে। এই বন্দর কোন্ বন্দর তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই। বহু পরবর্তী কালেও সপ্তগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ভৃগুকচ্ছ-সুরাষ্ট্র-পাটন পর্যন্ত এই বাণিজ্যসম্বন্ধের বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যাইবে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায়। ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণ বৃহত্তর ভারতের দ্বীপগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, তবে অনুমান খুব সহজেই করা যাইতে পারে। দেশপরিচয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণভাবে এইসব পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলিতে বাংলাদেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট এবং পণ্ডিতমহলে এত বেশি আলোচিত হইয়াছে যে, প্রাচীন বাংলাদেশের সঙ্গে ইহাদের নিকট সম্বন্ধের কথা এখন আর কল্পনার বিষয় নয়। অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাণিজ্যসম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের ও ভারতের অন্যান্য দেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতি ক্রমশ এইসব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দেশে রাজ্যবিস্তার এইভাবেই হইয়া থাকে। সর্বাগ্রে বণিক; বণিকের সঙ্গে বণিকের প্রয়োজনেই ধর্ম ও পুরোহিত, তারপরেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসিয়া পড়ে সামরিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব। যাহা হউক, প্রত্যক্ষ বাণিজ্যসম্বন্ধের প্রমাণ প্রাচীন বাংলায় পাইতেছি না, কিন্তু নানা মনসামঙ্গল কাব্যে সে প্রমাণ ছড়াইয়া আছে; আরাকান ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্বন্ধের আভাস এইসব গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন কালে এই পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণও কি নাই? আমার মনে হয়, আছে। মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেস্‌লি জেলার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি শ্লেট পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই লিপিতে উল্লিখিত মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত; লিপিটি বহু আলোচিত। বুদ্ধগুপ্তের বাড়ি ছিল রক্তমৃত্তিকায়। এই রক্তমৃত্তিকা কোথায়, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। অক্ষর দেখিয়া লিপিটির তারিখ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক। লিপিটির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত; ধর্মপ্রেরণা একান্তভাবেই ভারতীয়; মহানাবিকটির নাম ও ধাম একান্তভাবেই ভারতীয়। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ (সপ্তম শতক) কর্ণসুবর্ণের বিবরণ দিতে বসিয়া এক রক্তমৃত্তিকার সন্ধান দিতেছেন; বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর একেবারে পাশেই ছিল লো-টো-মো-চিহ্ নামে বৃহৎ বৌদ্ধবিহার। চীন লো-টো-মো-চিহ্ পালি অথবা প্রাকৃত রত্তমটি=রত্তমত্তি=রক্তমৃত্তি বা রক্তমৃত্তিকা, বাংলা, রাঙামাটি। আমার তো মনে হয়, বুদ্ধগুপ্তের বাড়ি কর্ণসুবর্ণের এই রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি। প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক আবেষ্টনের কথা মনে রাখিলে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত যে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রতীরের দেশে, এই অনুমানই তো বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া মনে হয়। এবং যদি তাহাই হয়,

তাহা হইলে এইখানে আমরা প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারের একটা পাথুরে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। লক্ষণীয় এই যে, লিপির তারিখ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক। পরে আমি একাধিক প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, খ্রীষ্টপূর্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্তই বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ।

এই যে আমরা একটা প্রশস্ত, সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পরিচয় পাইলাম, এই বাণিজ্যে বাংলাদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত এবং সে অর্থের অধিকাংশ বণিকদের হাতেই কেন্দ্রীকৃত হইত, এই ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। কিন্তু এই অর্থ কী? ইহা কি মুদ্রায় বা বিনিময়-দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত? প্লিনি যে বলিয়াছেন, আধ সের পিপ্পলির দাম হইত ১৫ স্বর্ণ দিনার, এবং ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বার্ষিক রপ্তানির মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা, তাহা হইতে অনুমান হয়, বণিকেরা বাণিজ্য-পসরার বদলে মুদ্রাই লইয়া আসিতেন, এবং এই মুদ্রা সুবর্ণ-মুদ্রা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা দ্রম্ম। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পট্টোলীগুলিতে ভূমির মূল্যের উল্লেখ (স্বর্ণ)-দিনার অনুযায়ী, কিংবা পরবর্তী পাল- ও সেন -বংশের লিপিগুলিতে মূল্যের উল্লেখ পাই রৌপ্য দ্রম্মে। এই দুইটি মুদ্রার নাম হইতে মনে হয়, এক সময়ে এই দুই বিদেশী মুদ্রাই প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে আসিত, এবং বিনিময়-মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইত; পরে ইহাদের নাম হইতেই স্বর্ণ- ও রৌপ্য -মুদ্রা বাংলাদেশে দিনার ও দ্রম্ম নামে পরিচিত হইয়াছিল। 'দাম' এবং 'দর্মা' (বেতন) এই কথা দুইটি তো 'দ্রম্ম' হইতেই আমরা পাইয়াছি। এই দুই মুদ্রা প্রচলনের মধ্যেও প্রশস্ত বৈদেশিক বাণিজ্যসম্বন্ধের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিনিময়-বাণিজ্যও সঙ্গে সঙ্গে ছিল না, এ কথাও বলা চলে না। পেরিপ্লাস-গ্রন্থে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তো মনে হয়, এই বাণিজ্য পণ্য-বিনিময়েও মাঝে মাঝে চলিত। তবে বিনিময়-বাণিজ্য যে সাধারণ নিয়ম ছিল না তাহা খ্রীষ্টীয় শতকের আগে হইতে সমৃদ্ধ মুদ্রাপ্রচলন হইতেই প্রমাণিত হয়।

ছয়

বিনিময়ের জন্য মুদ্রার ব্যবহার অর্থনৈতিক সভ্যতার দ্যোতক। খ্রীষ্টীয় শতকের আগে হইতেই বাংলাদেশে মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। মহাস্থানের লিপিটিতে গণ্ডক নামে একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। এই মুদ্রা সোনা কি রূপার, বলার কোন উপায় নাই। তবে বহু পূর্ববর্তী কালের 'গণ্ডা' গণনারীতির সঙ্গে যে এই গণ্ডকমুদ্রার একটা শব্দতাত্ত্বিক সম্বন্ধ আছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন, মহাস্থানলিপিতে 'কাকনিক' নামে আর-একপ্রকার মুদ্রারও উল্লেখ আছে। এই মুদ্রারও রূপ, মূল্য বা ওজন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। গণ্ডকের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ যে কী ছিল বলা যায় না। পেরিপ্লাস-গ্রন্থে খবর পাওয়া যাইতেছে, গঙ্গা-বন্দরে ক্যালটিস্ নামে একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল; ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কথা। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা সংস্কৃত 'কলিত' অর্থাৎ সংখ্যাঙ্কিত

শব্দেরই রূপান্তর। বোধ হয় ইহারও আগে এক ধরনের নানাচিহ্নাঙ্কিত রৌপ্য- ও তাম্র -মুদ্রার বিস্তৃত প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে চব্বিশ পরগনার জাজ্রা এবং বেড়াচাম্পা, রাজসাহীর ফেট্‌গ্রাম, মৈমনসিংহের ভৈরববাজার, মেদিনীপুরের তমলুক এবং ঢাকার উয়াড়ী প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের রৌপ্য- ও তাম্র -মুদ্রা প্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রাপ্ত এইজাতীয় মুদ্রার নিকট আত্মীয়তা সহজেই ধরা পড়ে। সেইহেতু, সর্বভারতীয় সাধারণ অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে বাংলার একটা যোগাযোগ ছিল, এই অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। কুষাণ আমলের দুই-চারিটি স্বর্ণমুদ্রাও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ কখনও কুষাণ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; কাজেই অনুমান হয়, বাণিজ্যব্যপদেশে বা অন্য কোনও উপায়ে কিছু কিছু কুষাণ স্বর্ণমুদ্রা বাংলাদেশে আসিয়া থাকিবে।

উত্তর-বঙ্গ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এ তথ্য সুবিদিত। সেই আমলে গুপ্ত মুদ্রা-রীতি বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ছিল। গুপ্ত আমলে স্বর্ণ ও রৌপ্য দুই মুদ্রাই যে বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার লিপিপ্রমাণ প্রচুর; বিনিময়-মুদ্রা হিসাবে এই মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলী-গুলিতে ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে (স্বর্ণ)-দিনারে। প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাই যে ছিল দিনার, তাহা ইহাতেই সপ্রমাণ। রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল রূপক। বৈগ্রাম পট্টোলী হইতে প্রমাণ হয় যে, আটটি রূপক মুদ্রা অর্ধ দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোলটিতে এক দিনার। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (ধনাইদহ, দামোদরপুর ও বৈগ্রাম পট্টোলীর কালে) এক স্বর্ণ দিনারের ওজন ছিল ১১৭·৮ হইতে ১২৭·৩ মাষ পরিমাণ, এবং এক রূপকের ওজন ছিল ২২·৮ হইতে ৩৬·২ মাষ পরিমাণ। ইহা হইতে সোনার সঙ্গে রূপার আপেক্ষিক সম্বন্ধের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, রূপার আপেক্ষিক মূল্য সোনা অপেক্ষা বেশি ছিল। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কারণ বর্তমানে যে ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে আছে তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গুপ্ত আমলের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে যখন স্ব-স্ব-প্রধান ছোট ছোট রাজবংশের স্বতন্ত্র আধিপত্য চলিতেছে তখন রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন একেবারে নাই, অথচ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অব্যাহত, এবং এই স্বর্ণমুদ্রার যথার্থ স্বর্ণমূল্য অনেক কম, অবনত। বাংলাদেশের বহু স্থানে কিছু কিছু গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রৌপ্যমুদ্রা একেবারেই নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই, গুপ্ত আমলেও, যখন স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র -মুদ্রা বহুল প্রচলিত, তখনও মুদ্রার নিম্নতম মান কিন্তু কড়ি। চতুর্থ শতকে ফা হিয়ান বলিতেছেন, লোকে ক্রয়বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার করিত, এবং নিম্নতম মান কড়ি একেবারে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত কোনও দিনই ব্যবহারের বাহিরে চলিয়া যায় নাই। চর্যাপদগুলিতে (দশম-একাদশ শতক) দেখিতেছি, কবাড়ি (কড়ি), এবং বোড়ির (বুড়ি) ব্যবহার। মিনহাজ উদ্দীন তুরস্কাভিযানের বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, অভিযাত্রী তুরস্কেরা বাংলাদেশে কোথাও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন দেখিতে পান নাই; সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে লোকে কড়িই ব্যবহার করিত। ত্রয়োদশ শতকেও কড়ির প্রচলনের সাক্ষ্য অন্যত্র পাইতেছি। পঞ্চদশ শতকে মা-হুয়ান একই সাক্ষ্য দিতেছেন; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের সাক্ষ্য একই প্রকার। এমন কি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকেরাও দেখিয়াছেন কলিকাতা শহরে কর আদায় হইত কড়ি দিয়া; বাজারে অনেক ক্রয়-বিক্রয়ও কড়ির সাহায্যেই হইত।

মাৎস্যন্যায়পর্বের শেষে পাল রাজারা যখন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং শান্তি ও সুশাসন ফিরিয়া আসিল তখন আবার দেশে রৌপ্যমুদ্রার (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাম্রমুদ্রার) প্রচলন যেন ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সুবর্ণমুদ্রা আর ফিরিল না। সুবর্ণমুদ্রার ক্রমশ অবনতি ঘটিতে ঘটিতে শেষে যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বস্তুত, পালরাজা ও সেনরাজাদের আমলের একটি সুবর্ণমুদ্রাও বাংলাদেশে কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিংবা সমসাময়িক সাহিত্যে কোথাও তাহার কোনও উল্লেখও নাই। ধর্মপালের মহাবোধিলিপিতে দ্রম্ম নামক একপ্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে; এই উল্লেখই পাল আমলে দ্রম্মমুদ্রার প্রচলনের প্রমাণ। আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি হইতে মনে হয়, রৌপ্যমুদ্রারও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। যে অবনতি গুপ্ত-পরবর্তী যুগে দেখা গিয়াছিল, পালরাজারাও সেই অবনতি ঠেকাইতে পারেন নাই। ভাস্করাচার্যের (১০৩৬ শক=১১১৪ খ্রীঃ) লীলাবতী-গ্রন্থে একটি আর্যা আছে; কুড়ি কড়া বা কড়িতে এক কাকিনী, চার কাকিনীতে এক পণ, ষোল পণে এক দ্রম্ম (রৌপ্যমুদ্রা), ষোল দ্রম্মে এক নিষ্ক। অমরকোষের মতে এক নিষ্ক এক দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোল দ্রম্মে এক দিনার।

সেন আমলে কিন্তু তাহাও নাই। সুবর্ণমুদ্রা তো দূরের কথা, রৌপ্যমুদ্রাও একেবারে অন্তর্হিত। এই আমলে দেখিতেছি, ঊর্ধ্বতম মুদ্রামান পুরাণ বা কপর্দক-পুরাণ। এই পুরাণ বা কপর্দকপুরাণের একটিও বাংলাদেশের কোথাও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেইজন্যই এই মুদ্রার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। সম্ভবত কপর্দকপুরাণ ছিল একটা কাল্পনিক রৌপ্যমুদ্রা-মান, এবং এক নির্দিষ্টসংখ্যক কড়ির মূল্য ছিল সেই রৌপ্যমানের সমান। বহির্বাণিজ্য এবং পরদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যই এইরূপ মান নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল।

গুপ্তযুগের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতেই মুদ্রার, বিশেষভাবে সুবর্ণ- ও রৌপ্য -মুদ্রার, এরূপ অবনতি ঘটিল কেন, এই প্রশ্ন অর্থনীতিবিদের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে। গুপ্ত আমলে স্পষ্টত স্বর্ণই ছিল অর্থমান-নির্দেশক, পাল আমলে রৌপ্য; সেন আমলেও স্বীকারত রৌপ্য, কিন্তু সে রৌপ্য দৃশ্যত অনুপস্থিত। নিম্নতম মান কড়ি সব সময়ই ছিল, এবং ছোটখাট কেনাবেচায় ব্যবহারও হইত, কিন্তু অর্থমান নির্ণীত হইত সোনা বা রূপায়। সেন আমলে কড়িই মনে হইতেছে সর্বেসর্বা। মুদ্রার এই ক্রমাবনতি কি দেশের সাধারণ আর্থিক দুর্গতির দিকে ইঙ্গিত করে? না, রাষ্ট্রের স্বর্ণের ও রৌপ্যের গচ্ছিত মূলধনের স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করে?

সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজও হয়তো সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু তথ্য ও তথ্যগত অনুমান উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুপ্ত রাজাদের আমলের পর হইতেই, এমনকি শশাঙ্কের আমলেই, বাংলার রাষ্ট্রীয় অবস্থায় গুরুতর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। তারপর তো প্রায় সুদীর্ঘ এক শতাব্দীরও উপর দুরন্ত মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব চলিয়াছে; অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুইই খুব বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, এবং সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিও খানিকটা শিথিল হইয়াছিল। এই অবস্থায় সুবর্ণমুদ্রার অবনতি ঘটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, নকল মুদ্রা চলাও অস্বাভাবিক নয়। আর, রৌপ্যমুদ্রার অবনতিও একই কারণে হইয়া থাকিতে পারে। রূপা বাংলাদেশের

কোথাও পাওয়া যায় না; ইহাও হইতে পারে যে, বিদেশ হইতে রূপার আমদানি কোনও কারণে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুবিস্তৃত হইবার পরও সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ঘটিল না কেন, রৌপ্যমুদ্রাই বা স্বগৌরবে ও যথার্থ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইল না কেন, এ তথ্য ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়। পালরাজাদের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ছিল উত্তর-ভারত জুড়িয়া এবং হয়তো দক্ষিণ-ভারতেও; সমসাময়িক কালে অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে সুবর্ণ-মুদ্রার প্রচলনও ছিল অল্পবিস্তর। তথাপি পাল ও সেন বংশের মতন সমৃদ্ধ ও সচেতন রাজবংশ সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনে প্রয়াসী হইলেন না কেন? বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভেই আরবী মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করে। ইহাদের পূর্বদেশাভিযান আগেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমদেশাভিযানও চলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ইহারা একদিকে স্পেন ও অন্যদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, এবং চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য-প্রভুত্ব বিস্তার করে। অবশ্য একদিনে তাহা হয় নাই। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই এই বিবর্তনের সূত্রপাত এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে আসিয়া চরম পরিণতি। প্রথমে পশ্চিম-ভারতের বন্দরগুলি চলিয়া যায় আরবদেশীয় বণিকদের হাতে, এবং পরে পূর্ব-ভারতের। দক্ষিণ-ভারতীয় পল্লব, চোল ও অন্য দু-একটি রাজ্য প্রায় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহাও চলিয়া যায়। মুঘল আমলে তো প্রায় সমস্ত ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যটাই আরব-পারস্যদেশীয় বণিকদের হাতে ছিল; সেই বাণিজ্য লইয়াই তো পরে পর্তুগীজ - ওলন্দাজ - দিনেমার - ফরাসী - ইংরেজে কাড়াকাড়ি মারামারি।

এই সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া মাল বিদেশে রপ্তানি হইত, এবং তাহার বদলে দেশে প্রচুর সুবর্ণ ও রৌপ্য আমদানি হইত—এই সুবর্ণ রোমক দিনার এবং রৌপ্য রোমক দ্রক্ষ হওয়াই সম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব শতক হইতেই এই সমৃদ্ধির সূচনা দেখা দিয়াছিল এবং সমানে চলিয়াছিল প্রায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত। কিন্তু তারপরেই এই সমৃদ্ধ বাণিজ্যস্রোতে যেন ভাঁটা পড়িয়া গেল। যখন আবার সেই হাট খুলিল তখন বাণিজ্যকর্তৃত্ব চলিয়া গিয়াছে আরব বণিকদের হাতে এবং সেই হাটেরও চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের বাজারে যেসব জিনিসের চাহিদা ছিল তাহাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্তত এই সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যে বাংলাদেশের যে অংশ ছিল তাহা যে খর্ব হইয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত; সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ ও ইৎসিঙ্ তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বা কোনও হিসাবেই তাম্রলিপ্তির উল্লেখ অষ্টম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না। পলি পড়িয়া পড়িয়া সরস্বতী নদীর মুখ বন্ধ হইয়া গেল এবং নদীটিও খাত্ পরিবর্তন করিল। তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হইল, এবং আশ্চর্য এই, অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর কোথাও সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল না। চতুর্দশ শতকে দেখিতেছি ভাগীরথীতীরবর্তী সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির স্থান অধিকার করিতেছে এবং পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বাংলায় নূতন এক বন্দর চট্টগ্রাম গড়িয়া উঠিতেছে। সত্যই এই সুদীর্ঘ পাঁচ-ছয় শত বৎসর

সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের বিশেষ কোনও স্থান নাই। এবং সেইহেতু বাহির হইতে সোনারূপার আমদানিও কম। স্বর্ণদ্বারা অর্থমান নির্ণয় করিবার মতন ইচ্ছা বা অবস্থা পরবর্তী পাল বা সেন রাষ্ট্রের আর নাই, স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে। অথবা, যেহেতু বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য তাঁহাদের আর নাই, সেইহেতু স্বর্ণমানের প্রয়োজনও নাই। মুদ্রার অবস্থা যাহাই হউক, এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, অষ্টম শতক ও তাহার পর হইতেই ভারতীয় সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশের আর কোনও বিশেষ স্থান ছিল না, এবং অন্তর্বাণিজ্যে অল্পবিস্তর আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও সেইহেতু বণিককুল ও ব্যবসায়ীদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সে প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর থাকে নাই। অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে বঙ্গীয় সমাজ ক্রমশ কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, এবং কৃষকেরাই সমাজদৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিপত্তিও হ্রাস হইয়াছে।

কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার অনস্তিত্ব এবং রৌপ্যমুদ্রার অবনতি ও অনস্তিত্ব শুধু বহির্বাণিজ্যের অবনতি ও বিলুপ্তি দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল ও সেন আমলে খুব যে নামিয়া গিয়াছিল মনে হয় না। এই দুই আমলের লিপিগুলি এবং সমসাময়িক সাহিত্যের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় না লোকের, অন্তত সমাজের উচ্চতর আর্থিক শ্রেণীগুলির, ধনসমৃদ্ধির কিছু অভাব ছিল। মণিমুক্তাখচিত সোনারুপার অলংকারের যেসব পরিচয় লিপিগুলিতে, সমসাময়িক সাহিত্যে এবং শিল্পে দেখা যায় তাহাতে তো মনে হয় সোনারুপাও দেশে যথেষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও এই দুই রাজবংশ সুবর্ণমুদ্রা, এমনকি সেন রাজারা রৌপ্যমুদ্রারও প্রচলন করিলেন না। তবে কি বিনিময় ব্যাপারটা সোনা বা রুপার তালের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইত? রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চয় হইত তাহাও কি সোনা ও রুপার তাল? মুদ্রা-সংক্রান্ত এইসব অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমিবিন্যাস

এক

কৃষিপ্রধান সভ্যতায় ভূমিব্যবস্থা সমাজবিন্যাসের গোড়ার কথা। ভূমিব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণীবিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অথবা সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের ভূমির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দায় ও অধিকার, ইত্যাদি। সেইজন্য কৃষিনির্ভর সমাজে জনসাধারণের ইতিহাস জানিতে হইলে ভূমিব্যবস্থার ইতিহাসের পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থার এই পরিচয় অতি দুর্লভ ব্যাপার। প্রথমত, ভূমি দান-বিক্রয়ব্যাপার উপলক্ষে যে কয়টি রাজকীয় শাসনের খবর আমাদের জানা আছে, তাহাই এ বিষয়ে আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। ইহা ছাড়া পরোক্ষ সংবাদ হয়তো কিছু কিছু পাওয়া যায় প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র- এবং অর্থশাস্ত্র -জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে; কিছু উপকরণ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও পালি জাতক গ্রন্থাদি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্র- অথবা অর্থশাস্ত্র -জাতীয় গ্রন্থাদিতে যেসব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কতটা প্রযোজিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এ কথা হয়তো সহজেই অনুমান করা চলে, প্রচলিত বিধিব্যবস্থাগুলিই এইসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, অথবা, বিধিব্যবস্থাপক-দের আদর্শটাকেই তাঁহারা রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তখনই প্রশ্ন উঠিবে, এই সুবিস্তৃত দেশের সর্বত্রই কি একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, অথবা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে যাহা ছিল, খ্রীষ্টপরবর্তী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকেও কি তাহাই ছিল? এই যে একটির পর একটি বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা যদি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের, রাষ্ট্রাদর্শের অদল-বদল করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ভূমিব্যবস্থার অদল-বদল হয় নাই, সে কথা কেমন করিয়া বলা যাইবে? স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সব একই সময়ে রচিত হয় নাই, যদিও মোটামুটি তাহাদের কাল আমাদের একেবারে অজ্ঞাত নয়। ইহাও তো অনস্বীকার্য যে, স্মৃতি-শাস্ত্রের সমাজব্যবস্থা আদর্শ সমাজব্যবস্থার দিকে যতটা ইঙ্গিত করে, বাস্তব সমাজব্যবস্থার দিকে ততটা নয়। সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহা ছাড়া এইজাতীয় গ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ কোনোটিই আমরা প্রাচীন বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করিতে পারি না, কারণ কোন সাক্ষ্যপ্রমাণই নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের দিকে ইঙ্গিত করে না। ভূমির শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর; ভাগ, ভোগ, কর ইত্যাদি নির্ভর করে ভূমিলব্ধ আয়ের উপর, সে আয়ের তারতম্য ভূমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, ভূমির উপর অধিকার এবং সে অধিকারের স্বরূপ, তাহাও এই সুবিস্তৃত দেশে বিভিন্ন কালে একই প্রকার ছিল, এই অনুমানই

বা কী করিয়া করা যায়? যেজাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, এইসব গ্রন্থ প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের দ্বারা শাসিত সমাজের সৃষ্টি; কিন্তু এই সমাজের বাহিরে অনার্য, আর্যপূর্ব সমাজ ও সেই সমাজের অগণিত লোক আমাদের দেশে বাস করিত; "শিষ্টদেশ"বহির্ভূত এই বাংলাদেশে তাহাদের সংখ্যা ও প্রভাব কম ছিল না। পিতৃপ্রধান আর্য সমাজসংস্থান এবং মাতৃপ্রধান আর্যপূর্ব অথবা অনার্য সমাজসংস্থানে ভূমিব্যবস্থার তারতম্য থাকিতে বাধ্য; এবং এই তারতম্য প্রাচীন ভারতের ভূমিব্যবস্থাকে বিভিন্ন দেশখণ্ডে বিভিন্নভাবে রূপ দান করে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি? এইসব কারণে এই ভূমিব্যবস্থার পরিচয়ে আমি আমাদের প্রাচীন ভূমিদানবিক্রয়সম্বন্ধীয় তাম্রপট্টোলীগুলিকেই নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া মনে করি। প্রথমত, যাহা প্রচলিত ছিল, যে রীতি ও পদ্ধতি যখন অনুসৃত হইত, তাহাই যথাযথভাবে এই পট্টোলীগুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহাদের উৎস ও কালনির্দেশ সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে. ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব সংবাদ জানা একান্তই প্রয়োজন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় এইসব উপাদানে পাওয়া যায় না। অবশ্য বুদ্ধিসাধ্য, যুক্তিসাধ্য অনুমানে বাধা নাই, যতক্ষণ সে অনুমান সমাজবিবর্তনের সাধারণ ইতিহাসসম্মত নিয়ম, সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত অতিক্রম করিয়া না যায়। সেইসব ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্র- অর্থশাস্ত্র -জাতীয় উপাদানের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে, আমিও লইয়াছি।

দুই

ভূমিব্যবস্থাসম্পর্কিত যেসব পট্টোলী প্রাচীন বাংলায় এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলি ভূমিদানবিক্রয়সম্বন্ধীয়, এবং লিপিগুলিতে ভূমিদানবিক্রয়রীতিক্রম কমবেশি বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভূমিসম্পর্কিত দায় ও অধিকার, ভূমির প্রকারভেদ ইত্যাদি সংবাদ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই রীতিক্রমের একটু পরিচয় এইখানে লওয়া যাইতে পারে। রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণকে কিংবা দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমিদানের লিপি প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত নয়; কিন্তু প্রাচীন বাংলার এই পর্বের লিপিগুলি ঠিক এইজাতীয় দেবোত্তর ভূমিদানের দলিল নয়। এই শাসনগুলি একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন সব সংবাদ পাওয়া যায় যাহা সাধারণত প্রাচীন ভারতের ভূমিদানসম্পর্কিত শাসনগুলিতে বেশি দেখা যায় না।

প্রথমেই দেখিতেছি, ভূমিক্রয়েচ্ছু যিনি তিনি রাজসরকারের কাছে আবেদন বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। ক্রয়েচ্ছু একজন এবং একাধিক ব্যক্তি একই সঙ্গে ক্রয়ের ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সাধারণ গৃহস্থও হইতে পারেন, অথবা রাজসরকারের কর্মচারী বা তৎসম্পর্কিত ব্যক্তি বা অধিকরণের সভ্যও হইতে পারেন। রাজসরকার বলিতে সাধারণত যে অধিষ্ঠান বা বিষয়ে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থিতি সেই অধিষ্ঠানের আয়ুক্তক ও অধিষ্ঠানাধিকরণ, অথবা বিষয়ের বিষয়পতি ও বিষয়াধিকরণ এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের বুঝায়। রাজ-

সরকারের উল্লেখ-প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাজার এবং ভুক্তিপতি বা উপরিকের নামও উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত ছিল।

এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তির পরই দেখিতেছি, ভূমিক্রয়ের বিশেষ উদ্দেশ্যটি কী, তাহা আবেদনকর্তা সাধারণত প্রথম পুরুষেই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন, এবং তিনি যে ক্ষেত্র-, খিল, অথবা বাস্তু -ভূমির স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও বলিতেছেন। দেখা যাইতেছে, সর্বত্রই ভূমিক্রয়ের প্রেরণা ক্রীতভূমি দেবকার্য বা ধর্মাচরণোদ্দেশে দানের ইচ্ছা।

তৃতীয় পর্বে পুস্তপাল বা দলিলরক্ষকের বিবৃতি। ভূমিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির আবেদন রাজসরকারে পৌঁছিলেই রাজসরকার তাহা পুস্তপাল বা পুস্তপালদের দপ্তরে পাঠাইতেছেন; পুস্তপাল বা পুস্তপালেরা প্রস্তাবিত ভূমি আর কাহারও অধিকারে আছে কিনা, অন্য কেহ সেই ভূমি ক্রয়ের ইচ্ছা জানাইয়াছে কিনা, ভূমির মূল্য যথাযথ নির্ধারিত হইয়াছে কিনা, রাজসরকারের কোন স্বার্থ তাহাতে আছে কিনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য নির্ণয় করিতেছেন তাঁহার বা তাঁহাদের দপ্তরে রক্ষিত কাগজ-পত্র, শাসন ইত্যাদির সাহায্যে, এবং কোনপ্রকার আপত্তি না থাকিলে প্রস্তাবিত ভূমিবিক্রয়ের সম্মতি জানাইতেছেন। যে কয়টি শাসনের খবর আমরা জানি, একটি ছাড়া তাহার প্রত্যেকটিতে পুস্তপালদপ্তরের সম্মতিই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এই কারণে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ব্যাপারটা নেহাতই কার্যক্রমগত।

চতুর্থ পর্বে রাষ্ট্রের অনুমতি। যথানির্ধারিত মূল্য গ্রহণের পর রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্থানীয় রাজসরকার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভূমিবিক্রয়ের অনুমতি দিতেছেন; এবং বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দেশ করিয়া, অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমির মাপজোখ করিয়া বিক্রীত ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে হস্তান্তরিত করিয়া দিতেছেন। কী শর্তে তাহা দিতেছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। দেখা যাইতেছে, প্রায় সর্বত্রই এই শর্ত অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী।

পঞ্চম পর্বে ক্রেতার বা বিক্রেতার পক্ষ হইতে ক্রীত অথবা বিক্রীত ভূমি দানের বিবৃতি। এই পর্বে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কাহাকে কী উদ্দেশ্যে, কোন্ শর্তে ক্রীত-ভূমি দান করিতেছেন তাহা বলা হইতেছে।

ষষ্ঠ অথবা সর্বশেষ পর্বে এইজাতীয় দত্ত ভূমি রক্ষণাপহরণের পাপপুণ্যের বিবৃতি দেওয়া হইতেছে এবং শাস্ত্রোক্ত শ্লোকে তাহা সমাপ্ত হইতেছে। স্থানীয় রাজসরকারের সীলমোহর দ্বারা এইসব পট্টোলী নিয়মানুযায়ী পট্টীকৃত বা আধুনিক ভাষায় রেজেস্ট্রি করা হইত।

সমস্ত তাম্রশাসনেই যে সব কয়টি পর্বের উল্লেখ একইভাবে আছে, তাহা নয়। অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম কোথাও কোথাও থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি পট্টোলীগুলি একই ধরনের।

অবশ্য পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত একেবারে অন্য ধরনের ভূমিদানের পট্টোলীও যে নাই তাহা বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলী (৬ষ্ঠ শতক), জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী (৭ম শতক), লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী (৭ম শতক), এবং দেবখড়্গের আস্রফপুরের দুটি পট্টোলীর (৮ম শতক) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটিই ভূমিদানের শাসন, দত্তভূমি ক্রয়ের কোন উল্লেখই ইহাদের মধ্যে নাই; কাজেই পূর্বোক্ত শাসনগুলির ক্রমের সঙ্গে

এই পট্টোলীগুলির তুলনা করা চলে না। পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলি প্রথমত ভূমি-ক্রয়বিক্রয়ের শাসন এবং দ্বিতীয়ত ভূমিদানের শাসনও বটে। সদ্যোক্ত পট্টোলীগুলি শুধুই ভূমিদানের শাসন। ভূমিক্রয়ের শাসন কাহাকে বলে বার্হস্পত্য ধর্মশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে; বৃহস্পতি বলেন, ন্যায্য মূল্য দিয়া কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বাস্তু, ক্ষেত্র অথবা অন্য কোনো প্রকার ভূমি ক্রয় করেন এবং মূল্যের উল্লেখসমেত ক্রয়কার্যের একটি শাসন লিপিবদ্ধ করিয়া লন, তখন সেই শাসনকে বলা হয় ভূমি-ক্রয়ের শাসন। জার্মান পণ্ডিত য়লি মনে করেন, বৃহস্পতি খ্রীষ্টোত্তর ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতকের লোক; যদি তাহা হয় তাহা হইলে বৃহস্পতি পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলির প্রায় সমসাময়িক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাস্তু ও বাস্তুবিক্রয় অধ্যায়ে সর্বপ্রকার ভূমি, ঘরবাড়ি, উদ্যান, পুষ্করিণী, হ্রদ, ক্ষেত্র, ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্রম ও রীতির উল্লেখ আছে; এই অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পাই, এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মুখে হওয়া উচিত, এবং যিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়া ভূমি ডাকিয়া লইয়া ক্রয় করিতে রাজী হইবেন তাঁহার কাছেই প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে। ভূমির মূল্যের উপর ক্রেতাকে রাজসরকারে একটা করও দিতে হইবে, এ কথাও কৌটিল্য বলিতেছেন। মূল্যের উপর কোনপ্রকার করের উল্লেখ আমাদের লিপিগুলিতে নাই; ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। ক্রীত ভূমি-খণ্ডগুলি প্রায় সমস্তই ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে দানের জন্য, এবং সেইহেতুই তাহা কর-রহিত। তবে, ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটা যে কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মুখেই নিষ্পন্ন হইত তাহার উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক লিপিতেই পাওয়া যায়। কতকটা পূর্বোক্ত শাসনানুরূপ ভূমিবিক্রয়ের অন্তত একটি পাথুরে প্রমাণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এই লিপিটি নাসিকের একটি বৌদ্ধগুহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ, এবং ইহার তারিখ খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ। সেক্ষেত্রে ক্রেতা ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন জনৈক গৃহস্থের নিকট হইতে, রাজার বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে নয়। আমাদের লিপিগুলিতে কিন্তু সাধারণভাবে একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না যেখানে কোনও গৃহস্থ কোন ভূমি বিক্রয় করিতেছেন; সর্বত্রই যে-ভূমি বিক্রীত হইতেছে, তাহা রাজা বা রাষ্ট্র-কর্তৃকই হইতেছে। এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনকে অধিকার করে, প্রাচীন বাংলার সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোনও গৃহস্থই কি ভূমি বিক্রয় করেন নাই? সে অধিকার কি তাঁহার ছিল না? এইসব স্বাভাবিক প্রশ্নের কোন উত্তর পাইবার সূত্রও লিপিগুলিতে আবিষ্কার করা যায় না।

এইবার অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি একটু বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই বলা যায়, যতগুলি শাসনের সংবাদ আমরা জানি, তাহার সব কয়টিই ভূমিদানের শাসন, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের শাসন একটিও নয়। এই পর্বের শাসনগুলিকে সেই জন্য পূর্বোক্ত গুণাইঘর, বপ্পঘোষবাট, লোকনাথ বা আস্রফপুর লিপিগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, যদিও পাল ও সেন আমলের লিপি-গুলি অনেকটা দীর্ঘায়ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্মপালের খালিমপুর লিপিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা একটি নারায়ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি যুবরাজ ত্রিভুবনপালকে দিয়া রাজার কাছে চারিটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, এবং প্রার্থনানুযায়ী রাজা তাহা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ শাসনে এইরূপ প্রার্থনা বা অনুরোধের কোনও উল্লেখ নাই; রাজা যেন স্বেচ্ছায়

ভূমি দান করিতেছেন, এই রকম ধারণা জন্মায়। অথবা এমনও হইতে পারে, অনুরোধ বা প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বাহুল্য অনুমানে উল্লিখিত হয় নাই। পাল আমলে দেখা যায়, কোথাও কোথাও ভূমি দান করা হইতেছে কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই; কিন্তু সেন আমলে প্রায় সব দানই ব্যক্তিগত দান, এবং দানগ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ এবং দানের উপলক্ষ হইতেছে কোন ধর্মানুষ্ঠানের আচরণ। এই ধরনের দান কতকটা ব্রাহ্মণদক্ষিণাজাতীয়, এবং এসব ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। মনে হয়, যেসব ক্ষেত্রে কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা রাজাকে ভূমিদানের অনুরোধ জানাইয়াছেন, এবং রাজাও সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন; গুণাইঘর, লোকনাথ ও খালিমপুর লিপির সাক্ষ্য এই অনুমানের দিকেই ইঙ্গিত করে। আর, যেখানে রাজা অথবা রাষ্ট্র নিজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা, অথবা যেখানে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কোন আয়তনের প্রয়োজন রাজা নিজেই অনুভব করিয়াছেন, সেখানে রাজা নিজেই স্বেচ্ছায় ভূমিদান করিয়াছেন, কোন অনুরোধের অপেক্ষা বা অবসর সেখানে নাই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমার এই অনুমানের সাক্ষ্য অষ্টম শতকের আস্রফপুরলিপি দুইটিতে আছে। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবদেবের লিপির সাক্ষ্যও একই প্রকারের।

এই পর্বের লিপিগুলিতে দেখিলাম, ভূমিদান করিতেছেন সর্বত্রই রাজা স্বয়ং, কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতকের আগেকার লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য ভূমিদান গৃহস্থ ব্যক্তিরাই করিতেছেন, এবং দানের পূর্বে সেই ভূমি মূল্য দিয়া রাজার নিকট হইতে কিনিয়া লইতেছেন। দু-চার ক্ষেত্রে রাজাও ভূমিদান করিতেছেন, কিন্তু তাহাও ক্রেতার পক্ষ হইতেই; তিনি শুধু দানকার্যের পুণ্যের ষষ্ঠভাগ (ধর্মষড়্ভাগং) লাভ করিতেছেন। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, সপ্তম শতকের পূর্বে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য যত ভূমিদান তাহা অধিকাংশ গৃহস্থ ব্যক্তিরাই করিতেছেন কেন, আর উত্তরপর্বে ভূমিদান শুধু রাজারাই করিতেছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কি এই যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব আগে ব্যক্তিগতভাবে পুরজনপদবাসী গৃহস্থরাই পালন করিতেন, এবং পরে ক্রমশ সেই দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রাজাই গ্রহণ করিয়াছিলেন?

গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলীতেই দেখা যায় পুস্তপাল -নামক জনৈক রাজপুরুষের উল্লেখ; কেন্দ্রীয় ভুক্তি-সরকারে যেমন, আহার এবং মণ্ডল-অধিষ্ঠানেও তেমনই পুস্তপাল -নামীয় একজন রাজপুরুষ নিযুক্ত থাকাই যেন ছিল রীতি। ভূমিসংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রের দপ্তরের মালিকই ছিলেন তিনি, এবং তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল তাঁহার অধীন সমস্ত ভূমির সীমা, স্বত্ব, অধিকার, বিভাগ, অর্থাৎ জরিপসম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ ও হিসাব সংগ্রহ করা এবং তাহা প্রস্তুত রাখা। খুবই সম্ভব, এইসব সংবাদ লিপিবদ্ধ থাকিত তালপাতায় কিংবা ঐজাতীয় কোন বস্তুর উপর; আজ আর সেসব দপ্তর উদ্ধারের কোন উপায় নাই। পাল আমলে না হউক, অন্তত সেন রাজাদের আমলে কোন না কোন প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ জমি-জরিপের বন্দোবস্ত ছিল এবং সমস্ত জমির সীমা, স্বত্ব, অধিকার, শস্যোৎপত্তির গড়পড়তা পরিমাণ, কর বা খাজনা ইত্যাদির পরিপূর্ণ সংবাদ পুস্তপালের দপ্তরে মজুত থাকিত, এ অনুমান প্রায় ঐতিহাসিক সত্য।

শুধু যে দত্ত ভূমি সম্বন্ধেই এই জরিপ করা হইত তাহা মনে হয় না; রাজ্যের সমস্ত বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিল এবং অন্যান্য ভূমিও এই ধরনের জরিপের অন্তর্গত ছিল, এই অনুমানও সহজেই করা চলে। সেন আমলের পট্টোলীগুলিতে জমিসংক্রান্ত সংবাদ এমন সুসংবদ্ধ, সুনির্দিষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, এই ধরনের জরিপের সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা কঠিন।

তিন

ভূমিদান কী কী শর্তে করা হইত, কী কী দায় ও অধিকার বহন করিত তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ব পর্বের লিপিগুলির সংবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যথামূল্যে প্রস্তাবিত ভূমি ক্রয়ের জন্য গৃহস্থ আবেদন যখন জানাইতেছেন, তখন তিনি ভূমি ক্রয় করিতে চাহিতেছেন, সোজাসুজি এ কথা বলিতেছেন না; বলিতেছেন, 'আপনি আমার নিকট হইতে যথারীতি যথানির্দিষ্ট হারে মূল্য গ্রহণ করিয়া এই ভূমি আমাকে দান করুন।' এই যে ক্রয়ের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দানের প্রার্থনাও করা হইতেছে, ইহার অর্থ কী? এ কথার উত্তর পাইতে হইলে জমি কী শর্তে দান-বিক্রয় হইতেছে, তাহা জানা প্রয়োজন। যেসব লিপিতে শর্তের উল্লেখ পাইতেছি, দেখিতেছি সেই শর্ত একাধিক প্রকারের: (১) নীবীধর্মের শর্ত, (২) অপ্রদাধর্মের শর্ত, (৩) অক্ষয়নীবী (ধর্মের) শর্ত এবং (৪) অপ্রদাক্ষয়নীবীর শর্ত। বৈগ্রাম ও পাহাড়পুর পট্টোলী দুটিতে অক্ষয়নীবীধর্মের শর্তের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি শর্তের উল্লেখ আছে, সেটি হইতেছে, "সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" বা সকল প্রকার রাজস্ব-বিবর্জিত ভাবে। ইহার অর্থ এই যে, ভূমিগ্রহীতা সুচিরকাল ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন, কোনও রাজস্ব না দিয়া। রাজা বা রাষ্ট্র যে সুচিরকালের জন্য রাজস্ব হইতে ক্রেতা ও ক্রেতার বংশধরদের মুক্তি দিতেছেন, এইখানেই হইতেছে দান কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। ভূমির প্রচলিত মূল্য গ্রহণ করিয়া রাজা যে ভূমি বিক্রয় করেন, সেই ভূমিই যখন অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী "সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" করিয়া দেন তখন তাহা দানও করেন, এবং তাহা করেন বলিয়াই ভূমি বিক্রয় করিয়াও তিনি দানপুণ্যের এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। রাজা ভূমির আয়ের এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী, সেই এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকার যখন তিনি পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি দানপুণ্যের এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হইবেন, ইহাই তো যুক্তিযুক্ত।

এইবার নীবীধর্ম, অক্ষয়নীবীধর্ম বা নীবীধর্মক্ষয় এবং অপ্রদাধর্ম কথা কয়টির অর্থ কী, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বাংলাদেশের বাহিরে গুপ্ত-যুগের যে লিপির খবর আমরা জানি, তাহার মধ্যে অন্তত দুইটিতে অক্ষয়নীবী-ধর্মের উল্লেখ আছে। কোষকারদের মতে নীবী কথার অর্থ মূলধন বা মূলদ্রব্য। কোন ভূমি যখন নীবীধর্মানুযায়ী দান বা বিক্রয় করা হইতেছে, তখন ইহাই বুঝানো হইতেছে যে, দত্ত বা বিক্রীত ভূমিই মূলধন বা মূল্যদ্রব্য; সেই ভূমির আয় বা উৎপাদিত ধন ভোগ করা চলিবে, কিন্তু মূলধনটি কোনও উপায়েই নষ্ট করা চলিবে না। নীবীধর্ম কথাটির দ্বারা যাহা সূচিত হইতেছে, অক্ষয়নীবীধর্ম দ্বারা তাহাই আরও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। যে ভূমি সম্পর্কে এই শর্তের

উল্লেখ আছে, সেই ভূমিই কেবল চিরকাল ভোগ করিতে পারা যায়। লিপিগুলিতেও তাহাই দেখিতেছি। বস্তুত, যেসব ক্ষেত্রে নীবী বা অক্ষয়নীবীধর্মের উল্লেখ আছে, সেইসব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতচন্দ্রার্কতারকা ভোগের শর্তও আছে। "অপ্রদাধর্মেণ" এই শর্তের সঙ্গে "শাশ্বতচন্দ্রার্কতারকা" ভোগের শর্ত নাই। যাহা হউক, অনুমান হয়, এই শর্তানুযায়ী যে ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে, সেই ভূমিও দান অথবা বিক্রয়ের অধিকার ভোক্তার ছিল না। স্বেচ্ছামত ফিরাইয়া লইবার অধিকার দাতার অথবা রাজার ছিল কিনা, তাহা বুঝা যাইতেছে না। মনে হয়, অপ্রদাধর্মের সঙ্গে নীবী বা অক্ষয়নীবীধর্মের সূক্ষ্ম পার্থক্য হয়তো কিছু ছিল।

একটি জিনিস একটু লক্ষ্য করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, যে ভূমি কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে দান করা হইতেছে, সেই সম্পর্কেই শুধু অপ্রদাধর্ম বা অক্ষয়-নীবীধর্মের উল্লেখ পাইতেছি। সেইসব ক্ষেত্রেই কেবল রাজা রাজস্বের অধিকার ছাড়িয়া দিতেছেন। ব্যতিক্রম দু-একটি আছে; কিন্তু সেইসব ক্ষেত্রেও দানের পাত্র কোন ব্রাহ্মণ এবং তিনি দান গ্রহণ করিতেছেন কোন ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে। কোন গৃহস্থ যেখানে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ভূমি ক্রয় অথবা দান গ্রহণ করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে না আছে কোন চিরস্থায়ী শর্তের উল্লেখ, না আছে নিষ্কর করিয়া দিবার উল্লেখ।

অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যত রাজকীয় ভূমিদানলিপির খবর আমরা জানি, তাহার প্রত্যেকটিতেই ভূমিদানের শর্ত মোটামুটি একই প্রকার। শর্তাংশটি যে-কোন লিপি হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। খালিমপুরলিপিতে আছে "সদশপচারাঃ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যাঃ পরিহৃতসর্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্ক-ক্ষিতিসমকালং"।

সদশপচারাঃ বা সহ্যদশাপরাধাঃ আমাদের দণ্ডশাস্ত্রে দশ প্রকারের অপচার বা অপরাধের উল্লেখ আছে। তিনটি কায়িক অপরাধ, যথা—চুরি, হত্যা এবং পরস্ত্রী-গমন; চারিটি বাচনিক অপরাধ, যথা—কটুভাষণ, অসত্যভাষণ, অপমানজনক ভাষণ এবং বস্তুহীন ভাষণ; তিনটি মানসিক অপরাধ, যথা—পরধনে লোভ, অধর্মচিন্তা এবং অসত্যানুরাগ। এই দশটি অপরাধ রাজকীয় বিচারে দণ্ডনীয় ছিল; এবং সেই অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে জরিমানা দিতে হইত। রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ের মধ্যে ইহাও অন্যতম। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সেই ভূমির অধিবাসীদের জরিমানা হইতে যে আয়, তাহা ভোগ করিবার অধিকারও দান-গ্রহীতাকে অর্পণ করিতেছেন।

সচৌরোদ্ধরণা—চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাজার; কিন্তু তাহার জন্য জনসাধারণকে একটা কর দিতে হইত। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন দানগ্রহীতাকে সেই কর ভোগের অধিকার দিতেছেন।

পরিহৃতসর্বপীড়া—সর্বপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার হইতে রাজা দত্ত ভূমির অধিবাসীদের মুক্তি দিতেছেন। পরিহৃতসর্বপীড়া বলিতে যথার্থত কী বুঝাইত, তাহার সুস্পষ্ট ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের একাধিক লিপিতে আছে। রাজ্ঞী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপরিবারের লোকেরা, ও রাজপুরুষেরা যখন সফরে বাহির হইতেন, তখন সঙ্গের নৌকা, হাতি, ঘোড়া, উট, গোরু, মহিষের রক্ষক যাহারা তাহারা গ্রামবাসীদের ক্ষেত, ঘর-বাড়ি, মাঠ, পথ, ঘাটের উপর নৌকা এবং পশু ইত্যাদি বাঁধিয়া ও চরাইয়া উৎপাত অত্যাচার করিত। অপহৃত

দ্রব্যের উদ্ধারকারী যাহারা, তাহারা—দাণ্ডিক ও দাণ্ডপাশিক অর্থাৎ যাহারা চোর ও অন্যান্য অপরাধীদের ধরিয়া বাঁধিয়া আনিত, যাহারা দণ্ড দিত, তাহারাও সময়ে অসময়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিত। যাহারা প্রজাদের নিকট হইতে কর ও অন্যান্য নানা ছোটখাট শুল্ক আদায় করিত, তাহারাও প্রজাদের উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিত না। শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, রাজা নিজেও বোধ হয়, ইহাদের উপদ্রব-কারী বলিয়া মনে করিতেন।

অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য—দত্ত ভূমি হইতে আয়স্বরূপ কোন কিছু গ্রহণ করিবার অধিকারও রাজা ছাড়িয়া দিতেছেন, এই শর্তটির উল্লেখ লিপিতে আছে। এইসব অধিকারের ফলভোগী হইতেছেন দানগ্রহীতা: সেই ভূমি হইতে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ইত্যাদি যেসব আয় আইনত রাজার অথবা রাষ্ট্রেরই ভোগ্য, সেইসব সমেত ভূমি দান করা হইতেছে।

সর্বশেষ শর্ত হইতেছে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন—ভূমি দান করা হইতেছে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায় অনুযায়ী। এই কথাটির নানা জনে নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈজয়ন্তী-গ্রন্থমতে যে ভূমি কর্ষণের অযোগ্য, সেই ভূমি ভূমিচ্ছিদ্র; এই অর্থে কৌটিল্যও কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। কর বা রাজস্ব নাই, এই যে রীতি অর্থাৎ রাজস্ব-মুক্তির রীতি অনুযায়ী সমস্ত কর হইতে ভোক্তাকে মুক্তি দিয়া যে ভূমিদান, তাহাই ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়ানুযায়ী দান।

এইবার (১) ভূমির প্রকারভেদ, (২) ভূমির মাপ ও মূল্য, (৩) ভূমির চাহিদা, (৪) ভূমির সীমানির্দেশ, (৫) ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি, (৬) ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে? রাজার ও প্রজার অধিকার, খাস প্রজা, নিম্ন প্রজা ইত্যাদি ভূমিসম্পর্কিত অন্যান্য সংবাদ লওয়া যাইতে পারে।

চার

অষ্টমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলিতে আমরা প্রধানত তিন প্রকার ভূমির উল্লেখ পাইতেছি; বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। যে ভূমিতে লোকে ঘরবাড়ি তৈরি করিয়া বাস করিত অথবা বাসযোগ্য যে ভূমি, তাহা বাস্তুভূমি। যে ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন, সে ভূমি ক্ষেত্রভূমি। যেখানে দান-বিক্রয় হইতেছে, এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, সেখানে ভূমি পূর্বেই অন্য লোকের দ্বারা কর্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষেত্রভূমি দান-বিক্রয় যেখানে হইতেছে, সেখানে ভূমি হস্তান্তরিতও হইতেছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোন কোন লিপিতে কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্রভূমি বুঝাইতে "নালভূ" বা "নাভূ" কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে। নালজমি কথা তো এই অর্থে এখনো প্রচলিত।

ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন যেমন হইতে পারে, তেমনই কর্ষণযোগ্য কিন্তু অকর্ষিতও হইতে পারে। এমন যে ক্ষেত্র বা ভূমি, তাহা খিলক্ষেত্র। চাষ করিয়া করিয়া যে ভূমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া যায়, সে ভূমি অনেক সময় দু-চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে ভূমির উর্বরতা বাড়ে, এবং পরে তাহা আবার চাষ করা হয়। খিলক্ষেত্র বলিতে খুব সম্ভব এই ধরনের ভূমির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আর, যে ভূমি শুধু খিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কর্ষণের অযোগ্য ভূমি। এখনো পূর্ববাংলা ও শ্রীহট্টে কোন কোন স্থানে খিল জমি বলিতে অনুর্বর কর্ষণের অযোগ্য জলাভূমিকেই বুঝায়। তবে, এমনও হইতে পারে, খিল ও খিলক্ষেত্র বলিতে একই প্রকারের ভূমি নির্দেশ করা হইতেছে। কোন কোন লিপিতে, খিল-ভূমিকেই আবার বিশেষিত করা হইতেছে 'অপ্রহত' অর্থাৎ অকৃষ্ট বলিয়া। অমরকোষের মতে খিল ও অপ্রহত একার্থক এবং হলায়ুধ খিল অর্থে বুঝিয়াছেন পতিত জমি। যাদবপ্রকাশ তাঁহার বৈজয়ন্তী গ্রন্থে খিল ও অপ্রহত সমার্থক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। নারদ-স্মৃতির মতে যে ভূমি এক বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা অর্ধ-খিল, যাহা তিন বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা খিল। ক্ষেত্র ও খিলভূমির পূর্বোক্ত পার্থক্য পরবর্তী কালেও দেখা যায়। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ভূমির প্রকারভেদ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ (১) যে ভূমি কর্ষণাধীন, তাহা 'পোলজ' ভূমি; ইহাই প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রভূমি। (২) যে ভূমি কর্ষণযোগ্য, কিন্তু এক বা দুই বৎসরের জন্য কর্ষণ করা হইতেছে না উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সেই ভূমি 'পরৌতি' ভূমি; (৩) এইভাবে যে ভূমি তিন বা চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'চচর' ভূমি; (৪) এবং যাহা পাঁচ বা ততোধিক বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'বঞ্জর' ভূমি। আকবরের কালের ২,- ৩ ও ৪ -সংখ্যক ভূমিই খুব সম্ভব প্রাচীন বাংলার খিল ভূমি।

এই প্রধান তিন-চার প্রকার ভূমি ছাড়া অন্যান্য প্রকারের ভূমির উল্লেখও লিপিগুলিতে দেখা যায়। একে একে সেগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তল, বাটক, উদ্দেশ, আলি—বৈগ্রাম-পট্টোলীতে 'তলবাটক' কথা একসঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি ভূমি ক্রয় করিতেছেন, তিনি বাস্তুভূমিই ক্রয় করিতেছেন; উদ্দেশ্য—ঘরবাড়ি তৈরি করা, এবং ঘরবাড়ি করিয়া বাস করিতে হইলেই পায়ে চলিবার পথ এবং জল চলাচলের পথও তৈরি করা প্রয়োজন। এখনও বাংলাদেশের অনেক জায়গায় পথ অর্থে বাট কথাটির ব্যবহার প্রচলন আছে। এই পথের অর্থাৎ বাটকের সঙ্গে তল কথার উল্লেখ যেখানেই আছে, সেখানে তলের অর্থ নালা বা প্রণালী, এক কথায় জল নিঃসরণের পথ। নালা এবং প্রণালী, এই দুইটি শব্দের উল্লেখ অষ্টমশতকোত্তর লিপিতেও আছে। সাধারণত পথের ধারে ধারেই থাকিত জল নিঃসরণের পথ; তাহা ছাড়া কথা দুইটি বিপরীতার্থব্যঞ্জক। সেই জন্যই তল এবং বাটক প্রায় সর্বত্রই একত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে অনেক স্থলে তলের সঙ্গে উদ্দেশ কথাটিরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ বা উচ্চভূমি অর্থাৎ বাঁধ, ঢিপি, জমির আলি (আইল), বান্ধাইল (বরেন্দ্রভূমিতে এখনও প্রচলিত) ইত্যাদি বুঝায়, এবং বাঁধ বা জমির আলির পাশে পাশেই তো দেখা যায় ক্ষেতের জল নিঃসরণের প্রণালী।

জোলা, জোলক, জোটিকা, খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকা, যানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকা, হজ্জিক, খাল-বিল ইত্যাদি—এই প্রত্যেকটি শব্দই প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। দত্ত অথবা বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দেশ উপলক্ষেই এইসব কথা ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। যে অনতিপ্রসার খালের পথ দিয়া বিল, পুষ্করিণী, গ্রাম ইত্যাদির জল চলাচল করে, তাহারই নাম জোলা। জোলক, জোটিকা প্রভৃতি শব্দ জোলা শব্দেরই সমার্থক। খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে খাল অর্থে। যানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকাও

খাড়-খাটিকা কথার সমার্থক বলিয়াই মনে হয়। হজ্জিকা যে নিম্ন জলাভূমি, তাহার ইঙ্গিত তো আগেই করিয়াছি। ঠিক এই অর্থে জলা বা জল্লা কথা মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় আজও প্রচলিত। খাল—খাটা, খাটিকা, খাড়িকা ইত্যাদি কথারই সমার্থক।

হট্ট, হট্টিকা, ঘট্ট, তর—হট্ট, হট্টিকা সহজবোধ্য এবং আমাদের হাট, বাজার অর্থেই সর্বত্র ইহার ব্যবহার। ঘট্ট=ঘাট, এবং তর=খেয়া পারাপারের ঘাট।

গর্ত, ঊষর—গর্ত তো সহজবোধ্য। বন্ধ ডোবা, অনতিগভীর অনতিপ্রসার কর্ষণ-অযোগ্য ভূমি অর্থেই এই শব্দটির ব্যবহার লিপিতে আছে। ঊষর অর্থে অনুর্বর কর্ষণ-অযোগ্য উচ্চভূমি। একই লিপিতে একই ভূখণ্ড "সগর্তোষর" এবং "সজলস্থল" দানের উল্লেখ লিপিগুলিতে অপ্রতুল নয়। কাজেই জল অর্থে এ ক্ষেত্রে গর্ত বুঝাইতে পারে না; খুব সম্ভবত জলাশয়, পুষ্করিণী, কুম্ভ, বাপী ইত্যাদি বুঝায়।

গোমার্গ, গোবাট, গোপথ, গোচর ইত্যাদি—গোচর সোজাসুজি গোচার ভূমি। গোচরভূমি সুপ্রাচীন কাল হইতেই গ্রামবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি, এবং সাধারণত গ্রামের বহিঃসীমায়ই তাহার অবস্থিতি। এ সম্বন্ধে কৌটিল্য এবং ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। কৌটিল্যের মতে গ্রামের চারিদিকে ১০০ ধনু (৪০০ হাত) অন্তর বেড়া-দেওয়া গোচরভূমি থাকা প্রয়োজন। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানও অনুরূপ। ইহা কিছু আশ্চর্য নয় যে, লিপিগুলির ইঙ্গিতও তাহাই। যে পথে গ্রামের ভিতর হইতে গোরু, মহিষ প্রভৃতি গোচরভূমিতে যাতায়াত করে, সেই পথই গোমার্গ, গোবাট অথবা গোপথ।

অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে, গোচরের সঙ্গেই উল্লেখ আছে তৃণযূতি অথবা তৃণপূতি কথাটির। সীমানির্দেশ উপলক্ষেই কথাটির ব্যবহার। গোচরের মতো তৃণযূতির বা তৃণপূতির অবস্থানও গ্রামসীমায় বা দত্ত ভূমির সীমায়। তৃণ-যূতি এবং তৃণপূতি ও তাহাদের অর্থ লইয়া পণ্ডিতমহলে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কোষকারদের মতে পূতি এক ধরনের ঘাস, কাজেই তৃণ ও পূতি প্রায় সমার্থক। তৃণপূতিপূর্ণ যে গোচরভূমি, তাহাই তৃণপূতিগোচর এবং তাহা যে গ্রামসীমায় বা ক্ষেত্র ও খিলভূমির সীমায় অবস্থিত, তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

বন, অরণ্য ইত্যাদি—বন, অরণ্য সকল ক্ষেত্রেই গ্রামের বাহিরে। একাধিক লিপিতে বনভূমি, অরণ্যভূমি দানের উল্লেখ আছে। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কী করিয়া গ্রামের পত্তন করা হইত, তাহার পরিচয় অন্তত একটি লিপিতে আছে। কৌটিল্যের বিধানে বন, অরণ্য ইত্যাদি ছিল রাষ্ট্রসম্পত্তি; ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে অরণ্য-ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা যাইতে পারে, কৌটিল্য এই বিধানও দিয়াছেন। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কী করিয়া নূতন জনপদের পত্তন করিতে হয়, কৌটিল্য তাহারও ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীটি কৌটিল্যের বিধানের অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ।

মার্গ, বাট দুইই জনপদের লোক ও যানবাহন চলাচলের পথ। ইদ্দা তাম্র-পট্টের আবস্করস্থান তো আস্তাকুঁড় এবং সেইহেতু ঊষর ভূমির সঙ্গেই তাহার উল্লেখ।

পাঁচ

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে ভূমির মাপের ক্রম খুব সহজেই ধরিতে পারা যায়। সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে কুল্য অথবা কুল্যবাপ, তারপর দ্রোণ ও দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মাপ আঢ়বাপ। কুল্য, দ্রোণ ও আঢ় (পরবর্তী লিপিগুলির আঢক, বর্তমান পূর্ববাংলার আড়া) সমস্তই শস্যমান; এই শস্যমান দ্বারাই ভূমিমান নিরূপিত হইয়াছিল, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

কুল্য বা কুল্যবাপ—যে ভূমিতে বপন করা হয়, তাহা বাপক্ষেত্র; যে-পরিমাণ বাপক্ষেত্রে এক কুল্য বীজশস্য বপন করা যায়, সেই পরিমাণ ভূমি এক কুল্যবাপ ভূমি। দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপও যথাক্রমে এক দ্রোণ ও এক আঢ় বা আঢক শস্য বপনযোগ্য ভূমি। কাহারও কাহারও মতে কুল্য পূর্ববাংলার কুলা; এক কুল্য শস্য অর্থাৎ একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে তাহার বীজ যতটা পরিমাণ ভূমিতে বপন করা হয় তাহাই কুল্যবাপ।

দ্রোণবাপ ও আঢ়বাপ—দ্রোণ (=কলস) বর্তমানে বাংলার বহু জেলায় পল্লীগ্রামে দোনে বা ডোনে রূপান্তরিত হইয়াছে। আঢ় এখনও আড়া নামে প্রচলিত। প্রাচীন আর্যা ও কোষকারদের মতে এক কুল্যবাপ ভূমি আট দ্রোণবাপের সমান, এক দ্রোণবাপ চার আঢ়বাপের সমান, এক আঢ়বাপ চার প্রস্থের সমান।

এই ইঙ্গিত প্রাচীন সাহিত্য-ঐতিহ্য দ্বারাও সমর্থিত হয়। কুল্যই হোক আর দ্রোণই হোক, এ-সমস্তই ধান্যের আধার, যেহেতু ধান্যই বাংলার প্রধানতম শস্য। মনুসংহিতায় দ্রোণ বলিতেই ধান্যদ্রোণেরই ব্যাখ্যা ধরিয়াছেন বাঙালী কুল্লুকভট্ট। এই কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন এবং শব্দকল্পদ্রুম কোষ-সংকলয়িতার মতেঃ

৮ মুষ্টি=১ কুঞ্চি; ৮ কুঞ্চি=১ পুস্কল; ৪ পুস্কলে=১ আঢ়ক (আড়া); ৪ আঢ়কে=১ দ্রোণ এবং মেদিনীকোষের মতে ৭ দ্রোণ=১ কুল্য। শব্দকল্পদ্রুমে বলা হইয়াছে এক আঢ়কে সাধারণত ১৬ হইতে ২০ সের ধান ধরে, অর্থাৎ এক দ্রোণে ৬৪ হইতে ৮০ সের, এক কুল্যে ৫১২ হইতে ৬৪০ সের। এই পরিমাণ ধানের বীজ যে পরিমাণ ভূমিতে বপন করা হইত সেই পরিমাণ ভূমি হয়তো এক কুল্যবাপ। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

কুল্যবাপই হোক, আর দ্রোণবাপ বা আঢ়বাপ যাহাই হোক, মাপা হইত নলের সাহায্যে; এই নলই হইতেছে প্রাচীন উত্তর- ও পূর্ব -বাংলার প্রচলিত মানদণ্ড। বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং ফরিদপুরের তিনটি পট্টোলীতেই বলা হইতেছে, ৮, ৯ নলে (অষ্টকনবকনলাভ্যাম্) এক মান। কিন্তু এই মান কি প্রস্থ×দৈর্ঘ্যের মান, ৮ এবং ৯ দুই প্রকার নলের মান, কুল্যবাপের মান, দ্রোণবাপ না আঢ়বাপের মান তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। এই নলেরও দৈর্ঘ্য নির্ভর করিত ব্যক্তিবিশেষের হস্তের দৈর্ঘ্যের উপর। এই ধরনের ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপের মান অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদেও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল।

ষষ্ঠ শতক ও অষ্টম শতকের দুইটি লিপিতে ভূমি-মাপের একটি নূতন মানের সংবাদ জানা যাইতেছে। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলী এবং দেবখড়্গের ১নং আস্রফপুর পট্টোলীতে পাটক নামে একটি মানের উল্লেখ আছে, এবং তাহার পরের ক্রমেই যে মানের নাম উল্লেখ আছে তাহা দ্রোণবাপ। দ্রোণের সঙ্গে পাটকের সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই দুইটি পট্টোলীর দত্ত ভূমির পরিমাণ বিশ্লেষণ করিলে হয়তো

পাওয়া যাইতে পারে। আস্রফপুর-পট্টোলীটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ৫০ দ্রোণে এক পাটক হয়। গুণাইঘরলিপির সাক্ষ্যে ৪০ দ্রোণে এক পাটক। আগে দেখিয়াছি, ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ, তাহা হইলে ৫ কুল্যবাপ=১ পাটক।

পাটক এখানে নিঃসন্দেহে ভূমিমাপের মান; কিন্তু আস্রফপুরলিপি দুটিতেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে, পাটকা কথাটি গ্রাম বা গ্রামাংশ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। বস্তুত বাংলা পাড়া কথাটি পাটক হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়, অথবা দেশজ পাড়া হইতে পাটক।

পাল-সম্রাট্‌দের আমলে ভূমিপরিমাপের মান কী ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দানের বস্তু হইতেছে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ গ্রাম: বোধ হয় ইহা অন্যতম কারণ। একাদশ শতকে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রপট্টে দেখিতেছি, সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে পাটক। অষ্টম শতকে এই মান ফরিদপুরে প্রচলিত ছিল; একাদশ শতকে বিক্রমপুরেও দেখিলাম। মোটামুটি এই শতকেই শ্রীহট্টে দেখি উচ্চতর মান হইতেছে হল। কেহ কেহ মনে করেন কুল্‌বায়েরই অপর নাম হল বা হাল। গোবিন্দকেশবের ভাটেরা তাম্রপট্টে ২৮টি গ্রামে ২৯৬টি বাস্তু-ভিটা এবং ৩৭৫ হল জমি ছিল। শ্রীহট্টের ভূমি পরিমাপের বর্তমান ক্রম অনুযায়ী ১ হল=১০ই বিঘা=৩ই একর। শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনে উচ্চতর ভূমিমান দেখিয়াছি পাটক, কিন্তু এই রাজারই ধুল্লা শাসনে উচ্চতম মান দেখিতেছি হল, এবং দত্ত ভূমি-গুলি তো বিক্রমপুরে বলিয়াই অনুমান হয়। একাদশ শতকে বিক্রমপুরে কি পাটক ও হল, এই দুই মানই প্রচলিত ছিল, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাটকের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ কী? ধুল্লা শাসন হইতে এই খবরটুকু পাওয়া যাইতেছে যে, হলের নিম্নতর ক্রম হইতেছে দ্রোণ; কিন্তু দ্রোণের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না। দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার বেলবলিপিতে উচ্চতম ভূমিমান পাটক এবং নিম্নতর মান দ্রোণ। সেন রাজাদের লিপিগুলিতেও উচ্চতর মান পাটক অথবা ভূপাটক। এই লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভূমিমানের যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ (১) পাটক বা ভূপাটক, (২) দ্রোণ বা ভূদ্রোণ, (৩) আঢ়ক বা আঢ়াবাপ, (৪) উন্মান বা উদান বা উয়ান, (৫) কাক বা কাকিণী বা কাকিনিকা। পাটকের সঙ্গে দ্রোণের এবং দ্রোণের সঙ্গে আঢক বা আঢ়বাপের সম্বন্ধ ইতিপূর্বেই আমরা জানিয়াছি, কিন্তু আঢ়কের সঙ্গে উন্মানের বা উন্মানের সঙ্গে কাকের সম্বন্ধের কোনও ইঙ্গিত লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না। লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন পট্টোলীতে উপরোক্ত ক্রমের একটু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়; দ্রোণের নিম্নতর ক্রম দেওয়া হইয়াছে খাড়িকা(?), এবং তাহার পর যথারীতি উন্মান ও কাকিণী।

এই সম্বন্ধনির্ণয় এবং এ পর্যন্ত যে-সমস্ত ভূমিমানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যথাযথ মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রাচীন আর্যাশ্লোক এবং প্রচলিত ভূমি-পরিমাপরীতির একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

এ ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি যে, শস্যভাণ্ডমানের সাহায্যেই প্রাচীন কালে ভূমিমান নির্ধারিত হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ ইত্যাদি নামই তাহার প্রমাণ। পাটক বোধ হয় গোড়াতেই ছিল ভূমিমান। হলও তাহাই। খাড়ী (শুদ্ধ, খারী) কিন্তু শস্যভাণ্ডমান বলিয়াই মনে হয়, খাড়ী উচ্চতর মান, খাড়ীকা (ক-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন ক্ষুদ্রার্থে) বোধ হয় নিম্নতর মান। কাক বা কাকিণী গোড়ায় বোধ হয় ছিল মুদ্রামান। উন্মান অর্থই বোধ হয় তুলামান। কিন্তু গোড়ায় এইসব মান

মনুদ্রামান, ভাণ্ডমান, তুলামান বা ভূমিমান যাহাই থাকুক, উত্তর কালে ইহারা ভূমিমান নির্দেশে ব্যবহৃত হইত। সেন আমলের লিপিগুলিতেই প্রথম দেখিতেছি, এই ভূমি-মান ও শস্যমানের সঙ্গে তুলামান ও মুদ্রামান সম্পর্কিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে একটা অনুমান বোধ হয় সহজেই করা যায়। প্রাচীনতর কালে ভূমি যখন সুলভ ছিল, চাহিদা যখন খুব বেশি ছিল না, তখন ভূমির মাপের এত চুলচেরা বিচারও ছিল না। সুলভ ভূমির যুগে কতখানি ভূমিতে মোটামুটি কত বীজধান লাগে, কত লাঙ্গল লাগে, এই দিয়াই মোটামুটি জমির পরিমাণ নির্ণীত হইত। ক্রমে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাপ-জোখ নির্দিষ্টতর হইতে থাকে, এবং ক্রমশ আরও নিম্নতর মান নির্দেশের প্রয়োজন হয়। এই নিম্নতর মান যে তুলামান বা মুদ্রামান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাও জমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে।

পাটকের সঙ্গে কুল্যবাপের ও দ্রোণের, কুল্যবাপের সঙ্গে দ্রোণের, দ্রোণের সঙ্গে আঢক বা আঢ়বাপের সম্বন্ধ আমরা আগেই জানিয়াছি। এইবার আঢক বা আঢ়বাপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিণীর সম্বন্ধ কী, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কোন আর্যাশ্লোকের মধ্যে এই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। সমসাময়িক দানপত্র হইতে জানা যায়,

৪ কাক বা কাকিণী (পূর্ববাংলায়, চট্টগ্রামে কানি, রাঢ়ে কান)=১ উয়ান; ৫০ উয়ান=১ আড়ি; ৪ আড়ি=১ দ্রোণ।

কোন কোন শুভঙ্করীর বইয়ে যে আর্যা পাওয়া যায়, তাহাও উপরোক্ত সংবাদ সমর্থন করে।

এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ কতটুকু ছিল তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। কুল্যবাপের পরিমাণ যে বর্তমান কালের বিঘা হইতে অনেক বেশি ছিল, এ কথা নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বহুদিন আগেই বলিয়াছিলেন। কাছাড়ের ইতিবৃত্ত-লেখক উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহাশয় বলেন যে, ঐ জেলায় এক কুল্য-বাপ ১৪ বিঘার সমান। দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অনেক অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ অন্ততপক্ষে ৪০-৪২ একর অর্থাৎ প্রায় ১২৫ বিঘার কম ছিল না। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই।

অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ভূমিপরিমাপের মানদণ্ড ছিল নল; পরবর্তী যুগের মানদণ্ডও ইহাই। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-শাসনে প্রদত্ত ভূমি যে নল-মানদণ্ডে মাপা হইয়াছিল, তাহার নাম বৃষভশঙ্কর নল। বৃষভশঙ্কর ছিল রাজা বিজয়সেনের অন্যতম উপাধি। মনে হয়, বিজয়সেনের হাতের মাপে যে নলের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারই নাম হইয়াছিল বৃষভশঙ্কর নল। আনুলিয়া-শাসন হইতে প্রমাণ হয়, অন্তত লক্ষ্মণসেনের কাল পর্যন্ত এই বৃষভশঙ্কর নলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অথচ, বিজয়সেন নিজে কিন্তু ভূমি দান করিয়াছিলেন "সমতটনলেন" অর্থাৎ সমতটমণ্ডলে প্রচলিত মানদণ্ডের পরিমাপে। সমতটীয় নল পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির খাড়ি-বিষয়েও প্রচলিত ছিল (বারাকপুর শাসন)। বর্ধমান-ভুক্তির উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে এবং পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির ব্যাঘ্রতটী অঞ্চলে এই বৃষভশঙ্কর নল প্রচলিত ছিল। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-শাসনের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নল-মানদণ্ড বিভিন্ন প্রকার ছিল। সেন-আমলের লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে অর্থাৎ পশ্চিম-নিম্নবঙ্গে বৃষভশঙ্কর

নল প্রচলিত ছিল, কিন্তু বরেন্দ্রীমণ্ডলে অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গে প্রচলিত ছিল অন্য প্রকারের নল-মানদণ্ড। গোবিন্দপুর-তাম্রশাসনের প্রচলিত নলের মাপ ছিল ৫৬ হাত। লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াললিপিতে দেখি ২২ হাতের আর-এক নলের উল্লেখ

ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা কিছু সংবাদ, তাহা অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতেই শুধু পাওয়া যায়। পরবর্তী লিপিগুলিতে ভূমির মূল্য কোথাও দেওয়া হয় নাই; কারণ, এই যুগের পট্টোলীগুলি দানের পট্টোলী, ক্রয়-বিক্রয়ের নয়। দামোদরপুরের চারিটি পট্টোলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শতাধিক বৎসর ধরিয়া পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ষবিষয়ে এক কুল্যবাপ ভূমির মূল্য ছিল তিন দীনার। ফরিদপুরের পট্টোলী-গুলি মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিস্তৃত। পূর্ববাংলার এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভূমির মূল্য ছিল প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার। বৈগ্রাম পট্টোলীর দত্ত ভূমির প্রতি কুল্যবাপের মূল্য ছিল দুই দীনার। বৈগ্রাম উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সীমান্তে; দামোদরপুরও দিনাজপুর জেলায়; কিন্তু প্রথমটি কোটিবর্ষবিষয়ে, দ্বিতীয়টি পঞ্চনগরীবিষয়ে, এবং দুই স্থানে কুল্যবাপের মূল্যের পার্থক্য এক দীনার। যাহা হউক, এ কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে, এক-এক বিষয়ে ভূমির মূল্য ছিল এক-এক প্রকার—যেমন, পঞ্চনগরীবিষয়ে দুই দীনার, কোটিবর্ষ-বিষয়ে তিন দীনার, ফরিদপুর অঞ্চলে চারি দীনার। ভূমির মূল্যবৃদ্ধির হার কিরূপ ছিল তাহা বলিবার কোন উপায় নাই, তবে ভূমির চাহিদা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে মূল্যও যে ক্রমশ বাড়িতেছিল, এরূপ অনুমান করিলে খুব অন্যায় হয় না। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি হয় নাই। আমরা তো আগেই দেখিয়াছি, কোটিবর্ষবিষয়ে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া জমির দাম একই ছিল; বিভিন্ন অঞ্চলে দামের পার্থক্যও আগেই দেখিয়াছি। এই পার্থক্য খানিকটা যে ভূমির উর্বরতা, চাহিদা এবং স্থানীয় জীবিকামানসমৃদ্ধির উপর নির্ভর করিত, এ অনুমান সহজেই করা চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে, সর্বত্র খিল-, ক্ষেত্র এবং বাস্তু -ভূমির একই মূল্য। বাস্তুভূমি অপেক্ষা ক্ষেত্রভূমি, এবং ক্ষেত্রভূমি অপেক্ষা খিলভূমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই তো স্বাভাবিক, অথচ একটি লিপিতেও তেমন ইঙ্গিত নাই, বরং সর্বত্র সকল প্রকার ভূমির দাম একই, এই কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

অর্থনীতির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন মুদ্রার মূলগত মূল্য নির্ভর করে ক্রয়শক্তির তারতম্যের উপর। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড দেখাইয়াছেন, আকবরের আমলে মুদ্রার ক্রয়শক্তি ১৯১২ খ্রীষ্টশতকের চেয়ে অন্তত ছয়গুণ বেশি ছিল। সেইহেতু অনুমান করা চলে, প্রাচীন বাংলায় একটি রৌপ্য-মুদ্রার ক্রয়শক্তি আকবরের আমল অপেক্ষাও অন্তত কয়েকগুণ বেশি ছিল। প্রাচীন বাংলায় ১৬টি রৌপ্যকে ছিল ১ দীনার, অর্থাৎ তখনকার ১ দীনার বর্তমান ভারত-বর্ষের অন্তত ৯৬ টাকার কম কিছুতেই ছিল না।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পাল ও সেন আমলে ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা বলিবার উপায় বিশেষ নাই; তবে বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে এবং কেশবসেনের ইদিলপুরলিপিতে এই মূল্যের খানিকটা ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। রাজা কেশবসেনের ইদিলপুরশাসনে প্রদত্ত গ্রামটির বার্ষিক আয় (না, মোট মূল্য?) ২০০ শত মুদ্রা ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপসেনের লিপিতে ৩৩৬৷ উন্মান

ভূমির মোট বার্ষিক-আয় (না, মোট মূল্য ?) ছিল পাঁচ শত পুরাণ। সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সর্বত্রই আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা দত্ত ভূমির বার্ষিক আয়, ভূমির মোট মূল্য নয়, এবং এই আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে পুরাণ অথবা কপর্দকপুরাণ মুদ্রায়। এই বার্ষিক আয় হইতে ভূমির মোট মূল্য কী হইতে পারে, তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

ছয়

জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়ে, বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান দেশে, ইহা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকিলেও এই অনুমান কিছু কঠিন নয় যে, প্রাচীন বাংলায়ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়িতেছিল। যে সময় হইতে লিপিপ্রমাণ আমরা পাইতেছি, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ইহার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা যাইতেছে, ক্রেতার প্রয়োজনীয় সমগ্র পরিমাণ ভূমি একই জায়গায় একই ভূখণ্ডে পাওয়া যাইতেছে না; ক্রয়যোগ্য খিলভূমি যদিও একই গ্রামে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা একসঙ্গে এক ভূখণ্ডে পাওয়া যাইতেছে না, যাইতেছে পাঁচটি পৃথক ভূখণ্ডে। এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে সহজেই জনসাধারণের মধ্যে ভূমির চাহিদার পরিমাণ অনুমান করিতে পারা যায়। প্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও জনপদগুলিতে প্রায় সমগ্র পরিমাণ ভূমিতেই জনপদবাসীদের বসতি এবং চাষবাস ইত্যাদি ছিল, কাজেই কোন গ্রামেই একসঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি সহজলভ্য ছিল না, এই অনুমান অসংগত নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যানুযায়ী বন, অরণ্য ইত্যাদি কাটিয়া নূতন গ্রাম ও বসতির পত্তন করাও যে প্রয়োজন হইতেছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলার লোকনাথের পট্টোলীতে।

পরবর্তী কালেও এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রমাণ দুর্লভ নয়। সাহিত্য-পরিষদ্‌-পট্টোলীদ্বারা রাজা বিশ্বরূপসেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে ৩৩৬½ উন্মানভূমি দান করিয়াছিলেন ছয়টি বিভিন্ন গ্রামে ১১টি পৃথক পৃথক ভূখণ্ডে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের জন্য, হয় ক্রয় করিয়া না হয় দান গ্রহণ করিয়া অথবা উভয় উপায়েই, নিজের প্রয়োজনাধিক ভূমি সংগ্রহ করিয়া ভূমির বড় মালিক হইয়া বসিতেছেন, এমন অন্তত একটি দৃষ্টান্ত বিশ্বরূপসেনের এই লিপি হইতে পাওয়া যায়। এবং এই পরিচয়ের মধ্যে ভূমিসংগ্রহের ইচ্ছা সমাজের মধ্যে কিভাবে রূপ লইতেছিল, তাহার একটু আভাসও পাওয়া যাইতে পারে।

বিশ্বরূপসেনের পট্টোলীতে উল্লিখিত সর্বসুদ্ধ ৩৩৬½ উন্মান ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ শত (পুরাণ); তখনকার দিনে এই অর্থের পরিমাণ কম নয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিত হলায়ুধ শর্মা বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত সমগ্র পরিমাণ এই ভূমি রাজার নিকট হইতে ব্রহ্মত্র দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারী হইয়া বসিয়াছিলেন; রাষ্ট্রকে তাঁহার কোন করই দিতে হইত না, অথচ তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে সমস্ত করই তিনি পাইতেন। প্রয়োজনাধিক ভূমির অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা, ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমির স্বত্বাধিকার কেন্দ্রীকৃত হওয়ার ঝোঁক সমাজের মধ্যে কিভাবে বাড়িতেছিল, এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ভূমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ইঙ্গিত কতকটা ভূমির সূক্ষ্ম সীমানির্দেশের মধ্যেও

পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভূমির সীমা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, এবং রাষ্ট্রও এ সম্বন্ধে কম সচেতন ছিল না। প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি-সীমা এত সূক্ষ্মভাবে ও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িলেই মনে হয়, সূচ্যগ্র ভূমিও কেহ সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেন না। কালের অগ্রগতির সঙ্গে এই চেতনাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে এই সীমাবিবৃতি খুব বিস্তৃত নয়; কিন্তু পরবর্তী লিপিগুলিতে ক্রমশ এই বিবৃতি দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইবার দিকে ঝোঁক অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তাহা ছাড়া ভূমির পরিমাপের বর্ধমান সূক্ষ্মতাও ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে। অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে ভূমিপরিমাপের নিম্নতম ক্রম হইতেছে আঢ়বাপ, কিন্তু সেন আমলের লিপিগুলিতে দেখা যায়, নিম্নতম ক্রম আঢ়বাপ হইতে উন্মান, উন্মান হইতে কাকিনী পর্যন্ত নামিয়াছে। ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতেছিল, লোকেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও ক্রমশ সজাগ হইয়া উঠিতেছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক।

সাত

আগেই বলিয়াছি, ভূমি দান-বিক্রয়কালে সীমানির্দেশ খুব সূক্ষ্মভাবে ও সবিস্তারেই করা হইত। প্রস্তাবিত ভূমি দান-বিক্রয়ে যাহাতে গ্রামবাসীদের বসতি অথবা কৃষি-কর্মের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা প্রজারা তো দেখিতেনই, স্থানীয় অধিকরণও এ সম্বন্ধে সচেতন থাকিত। পাহাড়পুর পট্টোলীতে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভূমির সীমানির্দেশ কী করিয়া করা হইত, তাহার একটু ইঙ্গিত বৈগ্রাম-পট্টোলীতে পাওয়া যায়। তুষের ছাই ইত্যাদি চিরকালস্থায়ী বস্তুদ্বারা চারিদিকের সীমা চিহ্নিত করাই ছিল প্রচলিত রীতি। খুব সম্ভব, চারিদিকে লাইন ধরিয়া মাটি খুঁড়িয়া, তুষের ছাই ইত্যাদি দিয়া গর্ত ভরাট করা হইত; তাহার ফলে এই সীমারেখার উপর কোন ঘাস, গাছ ইত্যাদি জন্মাইত না, এবং এই অপ্রসূ অনুর্বর রেখাই সীমা-নির্দেশের কাজ করিত। মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে পদ্মবীচির-মালা-চিহ্নিত খুঁটি বা কীলকদ্বারা সীমানির্দেশ করার আর-এক প্রকার রীতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া গাছ, খাল, নালা, জোলা, নদী, পুষ্করিণী, মন্দির ইত্যাদি দ্বারাও সীমা নির্দিষ্ট হইত। যেখানে সমগ্র গ্রাম দান-বিক্রয়ের বস্তু, সেখানে গ্রামসীমা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে খণ্ড খণ্ড ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, সেখানেও প্রস্তাবিত ভূমির সীমা অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কমবেশি সবিস্তারে নির্দেশ করা হইয়াছে। অষ্টমশতকপূর্ব উত্তর-বঙ্গের লিপিগুলিতে এই ধরনের সীমানির্দেশ অনুপস্থিত; কিন্তু সমসাময়িক কালের নিম্ন- ও পূর্ব -বঙ্গের লিপিগুলিতে ভূমিসীমানির্দেশ সুবিস্তারিত।

পরবর্তী সেন আমলের লিপিগুলিতে গ্রাম অথবা খণ্ডভূমির সীমা কমবেশি সবিস্তারেই দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সর্বত্রই এই সীমা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, কোথাও ভুল হইবার সুযোগ নাই। ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি লইয়া বাদবিসংবাদও হইত, এ অনুমান স্বভাবতই করা

তাহা হয়তো এই কারণেও ভূমিসীমা সুস্পষ্ট- ও সুনির্দিষ্ট -ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভূমির এই সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট ও সবিস্তার সীমানির্দেশ, সুনির্দিষ্ট মূল্য, ভূমি-পরিমাপের মানের ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্মতা, বার্ষিক আয়ের পরিমাণ, হলমানদণ্ডের উল্লেখ ইত্যাদি একটু গভীরভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, ভূমিপরিমাপের, পরিমাণ নির্দেশের, জমি-জরিপ এবং জমির বার্ষিক আয়, জমির মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণের কোন না কোন প্রকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ছিল, এবং পুস্তপালের দপ্তরে এইসব বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র যথারীতি রক্ষিত হইত। এই কারণে ভূমি ক্রয়-বিক্রয় প্রস্তাবমাত্রই প্রথমে পুস্তপালের দপ্তরে পাঠাইতে হইত, এবং তিনি কাগজপত্র দেখিয়া দান অথবা ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মতি দিতেন। পঞ্চম শতকের লিপিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এই ব্যবস্থা আরও সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত হইয়াছিল কর ইত্যাদি ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে; মূল্য, আয়, ভূমিপরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে জরিপ ও ভূ-করনিয়ামক বিভাগের কাজকর্ম আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

আট

সপ্তমশতকপূর্ব লিপিগুলির কোন কোনটিতে আমরা ভূমিদানের অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি শর্ত দেখিয়াছি, "সমুদয়বাহ্যাপ্রতিকর", অর্থাৎ রাজা ভূমি দান করিতেছেন কেবল তখনই, যখন তিনি তাহা সকল প্রকারের করবিবর্জিত করিয়া দিতেছেন। রাজা যখন ভূমি করবিবর্জিত করিতেছেন, তখন রাজা দান ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই ভূমির ভোক্তাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, ইহা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, এবং এই কর যে নানাপ্রকারের ছিল, তাহার ইঙ্গিতও "সমুদয়বাহ্য" এই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কর্ষণযোগ্য ও কৃষ্ট ভূমির কর ছিল, বাস্তুভূমিরও ছিল, কিন্তু খিল অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির বোধ হয় কোন কর ছিল না। বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপিতে তাহার প্রমাণও আছে। কর কত প্রকারের ছিল, কী কী ছিল, তাহা এই যুগের লিপিগুলি হইতে জানিবার উপায় নাই, তবে উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠ ভাগ যে রাষ্ট্রের প্রধান প্রাপ্য ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। পাহাড়পুর- ও বৈগ্রাম -লিপিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি রাজার নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে সেই ভূমি দান করেন, তাহা হইলে রাজা শুধু যে ভূমির মূল্যটুকুই লাভ করেন তাহা নয়, ক্রেতা ভূমিদানের ফলস্বরূপ যে পুণ্য লাভ করেন, দত্ত ভূমি সর্বপ্রকার করবর্জিত করিয়া দেওয়াতে রাজা সেই পুণ্যের এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। অর্থাৎ, ভূমির উপস্বত্বের এক-ষষ্ঠ ভাগ যে রাজার তাহা এই উল্লেখের মধ্যে সুস্পষ্ট। ধর্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। অন্যান্য কর যাহা ছিল তাহার দু-একটি অনুমান করা যাইতে পারে। যে ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে এবং পরে ক্রেতা দান করিতেছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই লবণাকর, খেয়া-পারাপার-ঘাট, হাটবাজার, অরণ্য ইত্যাদি সংবলিত। এগুলির উল্লেখ নিরর্থক নয়। কৌটিল্য ও অন্যান্য অর্থ-শাস্ত্রকারদের মতে লবণ, অরণ্য ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এবং

তাহা হইতে রাজার তথা রাষ্ট্রের নিয়মিত আয় ছিল; এইসব যাঁহারা ভোগ করিতেন রাজসরকারকে তাঁহাদের কর দিতে হইত। হাটবাজার, খেয়াঘাট হইতেও একপ্রকার রাজস্ব আদায় হইত, জনসাধারণকেই এই করভার বহন করিতে হইত। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ছাড়া অন্যপ্রকারের করও ছিল, এবং পূর্বোক্ত করগুলি তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

রাজা যখন ভূমি দান করিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রকার করবিবর্জিত করিয়াই দান করিলেন; তাহার অর্থ এই যে, যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান এই দান গ্রহণ করিলেন, তিনি বা সেই প্রতিষ্ঠান সেই ভূমির সকল প্রকারের উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। নিম্ন-প্রজা যদি কেহ সেই ভূমি ভোগ করেন, তাহা হইলে তিনি দানগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার কর, উৎপাদিত শস্যের ভাগ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রদান করিবেন, রাজা বা রাষ্ট্রকে নয়।

পরবর্তী কালের লিপিগুলিতে প্রথমেই দেখিতেছি, রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সমস্ত 'রাজভাগভোগহিরণ্যপ্রত্যায়'-স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দান করিতেছেন, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে এসব কিছুই রাষ্ট্রকে বা রাজাকে দিতে হইবে না, সুস্পষ্ট বলিয়া দিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিয়া দিতেছেন যে, সেই ভূমির ক্ষেত্রকর ইত্যাদি অন্যান্য প্রকারের ভোক্তা যাহারা আছে বা হইবে, তাহারা যেন রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বিধিমত যথোচিত করপিণ্ডকাদি এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রত্যায় দানগ্রহীতাকে অর্পণ করেন। রাজভোগ্য বা রাষ্ট্রকে দেয় কয়েকটি উপস্বত্বের উল্লেখ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়ঃ—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য।

ভাগ—ভাগ বলিতে রাজার বা রাষ্ট্রের প্রাপ্য উৎপাদিত শস্যের ভাগ বুঝায়। শুধু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থেই যে রাজার এই ষষ্ঠভাগপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তাহাই নয়; আগেকার লিপিপ্রমাণের মধ্যেও দেখিয়াছি, উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠ ভাগই ছিল রাজার প্রাপ্য।

ভোগ—খুব সম্ভব, ফল ফুল কাঠ ইত্যাদি যেসব দ্রব্য মাঝে মাঝে রাজাকে তাঁহার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য দেওয়া হইত, তাহারই নাম ছিল ভোগ। বাংলাদেশের লিপিগুলিতে সর্বত্রই উল্লেখ আছে, ভূমিদানকালে তৎসংলগ্ন মহুয়া, আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছ ও অন্যান্য ঝাটবিটপ ইত্যাদি সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে দান করা হইত। তাহা হইতে এ অনুমান অসংগত নয় যে, এইসব ফল ফুল কাঠ বাঁশ হইতে একটা নিয়মিত আয়ের অংশ রাজার ভোগ ছিল।

কর—মুদ্রায় দেয় রাজস্ব অর্থে কর। অর্থশাস্ত্রে তিন প্রকার করের উল্লেখ আছে। (১) রাজার প্রাপ্য শস্যভাগ ছাড়া নির্ধারিত কালে নিয়মিতভাবে দেয় মুদ্রাকর; (২) আপৎকালে অথবা অত্যায়িক কালে দেয় মুদ্রাকর; (৩) বণিক ও ব্যবসায়ীদের লাভের উপর দেয় কর। প্রাচীন বাংলায়ও বোধ হয়, এই তিন প্রকার করই প্রচলিত ছিল।

হিরণ্য—হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ। এই হিরণ্য সর্বদাই উল্লিখিত হইয়াছে ভাগ-ভোগ-করের সঙ্গে। কোন কোন পণ্ডিত অর্থ করিয়াছেন, রাজা সব শস্যের ভাগ গ্রহণ করিতেন না, তাহার বদলে গ্রহণ করিতেন মুদ্রা, সেই মুদ্রাই হিরণ্য।

সেনরাজাদের আমলে ভূমিরাজস্ব যে মুদ্রায় দিতে হইত, এ অনুমান বোধ হয় করা যায়। এই আমলের প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমির বার্ষিক আয় প্রচলিত মুদ্রায়

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই রাজস্বের ক্রম ও পরিমাণ জানিবার কোনও উপায় নাই। কর্ষণযোগ্য ভূমির উৎপাদিত শস্যসম্পদের কমবেশির উপর আয়ের পরিমাণ নির্ভর করিত, এবং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ভূমির রাজস্বও সেই অনুযায়ীই নির্ধারিত হইত।

ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য ছাড়া জনসাধারণকে অন্যান্য করও দিতে হইত। এইজাতীয় সব করের উল্লেখ লিপিগুলিতে নাই; কিন্তু কয়েকটি সম্বন্ধে পরোক্ষ অনুমান সহজেই করা যায়। পাল ও সেন আমলের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই "সচৌরোদ্ধরণ" কথাটির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন, দান-গ্রহীতাকে শান্তিরক্ষার জন্য অর্থাৎ চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার কর রাজাকে দিতে হইত না।

আগেই দেখিয়াছি "সঘট্ট-সতর" অর্থাৎ ঘাট, খেয়া-পারাপার ঘাট ইত্যাদি সহ ভূমি দান করা হইত। এই খেয়া-পারাপার ঘাটের একটা রাজস্ব ছিল, এবং পরোক্ষ-ভাবে জনসাধারণকে তাহা বহনও করিতে হইত। হাট হইতেও এক প্রকারের রাজস্ব আদায় হইত। দুই-একটি লিপিতে হাটের রাজস্বও যে দানগ্রহীতার প্রাপ্য, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ধর্মপালের খালিমপুরলিপিতে অন্যান্য করের সঙ্গে পিণ্ডক কথার উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই পিণ্ডক এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পিণ্ডকর একই বস্তু। টীকাকার ভট্টস্বামী বলিতেছেন, সমগ্র গ্রামের উপর যে কর চাপানো হইত, তাহাই পিণ্ডকর। বাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদির উপরেও বোধ হয় নির্ধারিত হারে কর ছিল। দশ প্রকার অপরাধের জন্যও প্রজাকে জরিমানা দিতে হইত, তাহাও একপ্রকার রাজস্ব; আগেই সে কথা উল্লেখ করিয়াছি। উপরিকর নামে আর-একটি করের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্যান্য যেসব অতিরিক্ত কর রাষ্ট্রকে দিতে হইত, তাহাই বোধ হয় উপরিকর। অথবা, নিম্ন-প্রজাদের নিকট হইতে রাষ্ট্র যেসব কর সংগ্রহ করিতেন, তাহাও হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, অস্থায়ী প্রজাকে যে রাজস্ব দিতে হইত তাহাই উপরিকর। যেভাবেই হউক, এই উপরিকর রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নয়।

নয়

ভূমিসংপৃক্ত ব্যাপারে প্রজার দায় যাহা কিছু, তাহার কতকটা পরিচয় প্যওয়া গেল। এই ব্যাপারে প্রজার অধিকার কী ছিল, তাহার আলোচনা করিতে হইলে ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে, রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্যস্বত্বাধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ কী, সে বিচারও প্রসঙ্গত আসিয়া পড়িবে।

ভূমির মূল অধিকারী রাজা, না জনসাধারণ, ইহা লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রাচীন অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই তর্কের দুই পক্ষেরই বিস্তৃত মতামত পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এ তর্ক আমাদের আলোচনায় নিরর্থক। ভূমিস্বত্বের অধিকারী হইতেছেন কে, এ প্রশ্নের উত্তর পাইলেই ঐতিহাসিকের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। যুক্তির দিক হইতে ভূমির মূল অধিকারী কে ছিলেন, তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু মূল অধিকারী

যিনি বা যাঁহারাই হউন, ইতিহাসের বাস্তবক্ষেত্রে তিনি বা তাঁহারাই যে ভূমি-স্বত্বাধিকারী হইবেন, এমন না-ও হইতে পারে।

ভারতবর্ষে সমাজবিবর্তনের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক নিয়মে অনুমান করা চলে, অতি প্রাচীন কালে লোকসংখ্যা যখন খুব বেশি ছিল না, এবং ভূমি ছিল প্রচুর, তখন ভূমির অধিকারী কে, এ প্রশ্ন উঠিবার কোন অবকাশই ছিল না। পরের ভূমি লোভ করিবার প্রয়োজন হইত না, ভূমি লইয়া বিবাদেরও কোন অবকাশ হইত না; তারপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কৃষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতে লাগিল, ভূমি লইয়া বিবাদবিসংবাদও ততই বাড়িবার দিকে চলিল। এদিকে রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রেরও একটা বিবর্তন ঘটিতে লাগিল; রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমাজযন্ত্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। সমাজের রক্ষক ও পালক হইলেন রাজা; সমাজবিবর্তনের যে স্তরে এই নীতি স্বীকৃত হইল, সেই স্তরে এ কথাও সমাজের অন্তরে স্বীকৃত হইয়া গেল, ভূমির উপর অধিকারের উৎসও রাজা, এবং তিনিই ভূমিসম্পর্কিত বাদবিসংবাদের শেষ মীমাংসক কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্র তাই বলিয়া ভূমির মূল অধিকারী রূপে নিজেদের দাবি করিলেন না; কারণ, আদি প্রাচীন কালেও যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনই, এ প্রশ্ন উঠিবার কোন অবকাশই ছিল না। রাজা ও রাষ্ট্র ভূমির এবং ভূমিসংলগ্ন প্রজার ধারক, রক্ষক ও পালক হিসাবে ধারণ, রক্ষণ ও পালনের পরিবর্তে শুধু ভূমিস্বত্বের অধিকারিত্বের দাবি করিলেন। কিন্তু এই বিবর্তনের প্রথমাবস্থায় স্বভাবতই এই দাবিও সর্বজন-গ্রাহ্য ছিল না, কিংবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারও এ সম্বন্ধে ছিল না। যে-পরিমাণ ভূমি ব্যক্তিগতভাবে লোকেরা ভোগ করিত, তাহার পরিবর্তে গ্রামের সমাজযন্ত্রকে কিছু উপস্বত্ব দিতেই হইত—সেই সমাজযন্ত্র পরিচালনার জন্য; আর যে-সমস্ত ভূমি সমস্ত গ্রামবাসীদেরই প্রয়োজন হইত, যেমন পথ, ঘাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদি, সমগ্র গ্রামেরই যৌথ সম্পত্তি বলিয়া সহজেই লোকেরা মনে করিতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মূল অধিকারিত্বের কোন প্রশ্ন উঠিবার অবকাশ নাই। মূল অধিকারিত্বের দাবি যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালে রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং সমাজযন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে মৌর্য সম্রাটদের আমল হইতেই এই বিবর্তন দেখা দিয়াছিল। মৌর্য আমলেই ভারতবর্ষে একটা কেন্দ্রীকৃত কর্মচারিতন্ত্র-শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ক্ষমতাসম্পন্ন চক্রবর্তী সম্রাটদের চেষ্টায় ও প্রেরণায়, এবং সমাজযন্ত্রের সঙ্গে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই একই সঙ্গে ইহা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য বলা চলে না; তবে এই বিবর্তন মৌর্য আমলের পরে উত্তর-ভারতে সর্বত্রই স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ সর্বত্র স্বীকৃত হয়। সমাজযন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষ-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা জনসাধারণকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই সমাজব্যবস্থার ধারক ও নিয়ামক। এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে ভূমিব্যবস্থা অন্যতম প্রধান উপকরণ। বিবর্তনের যে স্তরে স্বীকৃত হইল যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই ভূমির উপর অধিকারের উৎস এবং তিনিই ভূমিসম্পর্কিত বাদ-বিসংবাদের শেষ মীমাংসক, তাহার পর হইতেই ক্রমশ ধীরে ধীরে এই চেতনা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল যে, রাজা ও রাষ্ট্র শুধু ভূমিব্যবস্থার নিয়ামক নহেন, দেশের ভূসম্পত্তির মালিকও। ইহার অন্যতম কারণ বোধ হয়, সেচব্যবস্থায় রাজার বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই যে লিপিগুলিতে প্রচুর খাটা, খাড়িকা, খাল ইত্যাদির উল্লেখ

পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ভূমির উর্বরতা বিধানের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক খনিত। তাহা ছাড়া এই প্লাবনের দেশে বাঁধ, আলি ইত্যাদির বিস্তৃত উল্লেখও রাষ্ট্রসহায়তার দিকেই ইঙ্গিত করে বলিয়া মনে হয়। রাজারা এই সেচব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করিতেন।

পালরাজাদের লিপিমালায় রাজা বা রাষ্ট্র কর্তৃক খনিত বহু দীঘির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব পুকুরের জল চাষ-আবাদের কাজেই ব্যবহৃত হইত, এবং রাজকীয় অথবা রাষ্ট্রের সাহায্যেই এগুলি খনিত হইত। ধোয়ী কবির "পবনদূত" কাব্যে দেখিতেছি, সেনরাজ বল্লালসেনদেব সুহ্মদেশের কেন্দ্রস্থল গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীসংগমে কোথাও একটি সুবৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; যাহাই হউক, মৌর্যযুগের ও পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতারাও রাজা ও রাষ্ট্রই যে ভূসম্পত্তির মালিক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু এক সময় সমাজই যে ভূমিব্যবস্থার নিয়ামক ছিল, সে স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না।

গুপ্ত আমলের যে কয়টি লিপি বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি, ভূমিবিক্রেতা হইতেছেন রাজা বা রাষ্ট্র। বস্তুত প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমিবিক্রয়ের আবেদন জানানো হইতেছে রাজা বা রাষ্ট্রযন্ত্রকে। এই লিপিগুলি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে স্বতই মনে হয়, রাজা বা রাষ্ট্র শুধু ভূমি-স্বত্বেরই অধিকারী নহেন, ভূমির মূল অধিকারীও। এই স্বত্বাধিকারতত্ত্ব বাংলা-দেশে বোধ হয়, গুপ্ত-আমলের পূর্বেই নির্ধারিত ও স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল। তবে, তিনি অধিকারী ছিলেন বলিয়াই ভূমি দান-বিক্রয়ে যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না; দেখিতে হইত, প্রস্তাবিত ভূমি দত্ত বা বিক্রীত হইলে গ্রামবাসীদের কৃষি ও অন্যান্য কর্মের কোনও অসুবিধা হইবে কিনা, অন্য কাহারও ভূমিস্বত্ব আহত হইবে কিনা। শুধু রাজাই অথবা রাষ্ট্রই যে দেখিতেন, তাহা নয়, গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, কখনো কখনো সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহা দেখিতেন। লিপিগুলিতে যে বার বার ভূমিদান-বিক্রয় স্থানীয় মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং প্রাকৃত জনকে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, তাহা প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই। বহু ক্ষেত্রে ইঁহারাই ভূমি অন্য ভূমি হইতে পৃথক করিয়া সীমা নির্দেশ করিয়া দিতেন। সর্বত্রই সকল লিপিতেই রাজা যেহেতু বিক্রেতা বা দাতা, তখন এই অনুমানই মনকে অধিকার করে যে, রাজ্যের সকল ভূমিরই স্বত্বাধিকারী এবং মূল মালিক, দুই-ই ছিলেন রাজা বা রাষ্ট্র। তাহা ছাড়া, লিপি-গুলিতে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না, যেখানে রাজা বা রাষ্ট্র মূল অধিকারত্ব ছাড়িয়া দিতেছেন; যাহা পাইতেছি, তাহা তাঁহার স্বত্বাধিকার। ভূমি যখন শুধু বিক্রয় করিতেছেন, তখন স্বত্বাধিকারের দাবি বজায় রাখিতেছেন কর গ্রহণের ভিতর দিয়া, আর যখন শুধু বিক্রয় নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূমি নিষ্কর করিয়া দান করিয়া দিতেছেন; তখন সেখানে স্বত্বাধিকারিত্বের দাবিও ছাড়িয়া দিতেছেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার মূল অধিকারিত্ব চলিয়া যাইতেছে না। আমার এই মন্তব্যগুলির সুস্পষ্ট প্রমাণ অষ্টমশতকপূর্বে বাংলার অন্তত দুই-তিনটি লিপিতে পাওয়া যাইবে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে এবং দেবখড়্গের আস্রফপুর পট্টোলী হইতে ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাইতেছে। প্রথমত, রাজা যে-কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁহার ইচ্ছামত এবং প্রয়োজনমত কাড়িয়া লইতে পারিতেন। ইহার পরিবর্তে অধিকারী ব্যক্তিদের যথোচিত মূল্য বা ক্ষতিপূরণ

কিছু দেওয়া হইত কিনা, তাহার উল্লেখ লিপিতে নাই; হইলে তাহার উল্লেখ থাকাটাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। রাজা বা রাষ্ট্র যদি ভূমির মূলে অধিকারী না হইতেন তাহা হইলে এইজাতীয় অধিকারের প্রয়োগ তিনি কিছুতেই করিতে পারিতেন, না। দ্বিতীয়ত, মহিলারাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন। তৃতীয়ত, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নীচে নিম্নাধিকারী প্রজার একটি স্তর ছিল। চতুর্থত, ব্যক্তিগত অধিকারের ভূমি হস্তান্তরিত হইত, দানেই হউক আর বিক্রয়েই হউক। এই হস্তান্তরের জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হইত কিনা বলিবার উপায় এ ক্ষেত্রে নাই; তবে পূর্বোক্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীর সাক্ষ্য যদি এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রানুমোদন ছাড়া এই ধরনের হস্তান্তর সম্ভব ছিল না। পঞ্চমত, একাধিক (দুই বা ততোধিক) ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একই ভূখণ্ডের অধিকারী হইতে পারিতেন।

অষ্টমশতকপরবর্তী পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি এইবার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। আগেই বলিয়াছি, পাল আমলের প্রায় সবগুলি লিপিই সমগ্র গ্রাম-দানের পট্টোলী, সেন আমলেরও কয়েকটি পট্টোলী তাহাই। এই গ্রামগুলি সমস্তই রাষ্ট্রের 'খাসমহল' ছিল, এ অনুমান খুব স্বাভাবিক নয়; বরং ভূমির মূল অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র, রাজ্যের যে কোন ভূমি, তাহা গ্রাম বা যে কোন ভূমিখণ্ড বা জনপদ-খণ্ডই হোক, দান-বিক্রয় করিতে পারিতেন, এই মন্তব্যই যুক্তিসংগত, এবং দান যখন করিতেছেন, তখন সেই গ্রামবাসী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি যাহা আছে তাহা সমেতই দান করিতেছেন; ইহার পর রাজা বা রাষ্ট্রকে যাহা কিছু দেয়, ব্যক্তি-গত ভূসম্পত্তির অধিকারীরা তাহা দানগ্রহীতাকে দিবেন, রাষ্ট্রকে আর নয়। কিন্তু এই যে রাজা ইচ্ছা- ও প্রয়োজন -মত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তিও দান করিয়া দিতেছেন, ইহাও রাষ্ট্রের মূল অধিকারিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে। ভূমির অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, সেন আমলের লিপিগুলিও তাহারই সমর্থন করে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষৎ-লিপিতে একসঙ্গে এইজাতীয় অনেক তথ্য পাওয়া যায়; প্রথমত, ক্রীত ভূমি পরে কাহারও নিকট হইতে দানস্বরূপে গ্রহণ করা যাইত। কী উপায়ে তাহা করা হইত লিপিতে বলা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এইসব ভূমি ব্যক্তিগত অধিকারেই ছিল, এবং ব্যক্তিগত অধিকারের বলেই বিক্রীতও হইয়া-ছিল। তৃতীয়ত, ভূমির ব্যক্তিগত অধিকারীরা ভূমি দানও করিতে পারিতেন এবং করিতেনও। কিন্তু এই দান রাজা যে অর্থে ভূমি দান করেন, সেই অর্থে নয়, নিষ্কর করিয়া দিবার ক্ষমতা এই ব্যক্তিগত অধিকারীদের নাই, ইঁহারা শুধু ভূমির মধ্য-স্বত্বাধিকার অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যক্তিগত অধিকার দান করেন, রাজার স্বত্বাধিকার অর্থাৎ কর গ্রহণের অধিকার দান করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর শাসনে দেখিতেছি, ভুল ধরা পড়িলে রাজা দত্তভূমি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করিতেন। এ ক্ষেত্রেও ভূমির মূল অধিকার যে রাজার তাহাই যেন ইঙ্গিত।

পাল আমলের শাসনগুলিতে দেখা যাইতেছে, প্রস্তাবিত ভূমিদানের সময় রাজা স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, এক কথায় প্রকৃতিপুঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "মতমস্তু ভবতাম্" [আমি এই ভূমি দান করিতেছি], আপনাদের সকলের অনুমোদন হউক। কেহ কেহ মনে করেন, গ্রামগোষ্ঠী ভূমির মালিক ছিলেন বলিয়া রাজাকে এই ধরনের অনুমতি লইতে হইত। এ অনুমান কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। গ্রামগোষ্ঠী ভূমির মালিক হইলে রাজা সেই ভূমি ক্রয় না করিয়া দান কিভাবে করিতে পারেন? তবে, এ যুক্তি হয়তো কতকটা সার্থক যে, এই

"মতমস্তু ভবতাম্" প্রাচীন গোষ্ঠী-অধিকারের সুদূর স্মৃতি বহন করিতেছে; কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে হয় না, যখন দেখা যায়, পরবর্তী কালের শাসন-গুলিতে একই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "বিদিতমস্তু ভবতাম্", 'আপনারা বিজ্ঞাপিত হউন,' অর্থাৎ ভূমিদানের ব্যাপারটি গ্রামবাসীদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে মাত্র। সেন আমলে বিজ্ঞাপিত করিবার প্রয়োজনে যে-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "বিদিতমস্তু", পাল আমলে সেই প্রসঙ্গেই সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বলা হইত "মতমস্তু"।

দশ

ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির যে-ইঙ্গিত পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা বাস্তু, ক্ষেত্র, খিল —সর্বপ্রকার ভূমি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। খুব প্রাচীন কালে লোকবসতি এবং কৃষি-কর্ম সাধারণত নদনদীপ্রবাহ অনুসরণ করিয়াই বিস্তৃত ছিল। কৃষিকর্মের উপরই জনসাধারণের জীবিকা নির্ভর করিত, এবং সেই কৃষির প্রধান নির্ভরই নদনদী। নদনদী-অনুসারী বসতি ও কৃষিকর্মের পরই বোধ হয় ছিল হয় বনভূমি বা ঊষর পার্বত্যভূমি, অথবা নিম্ন হজ্জিক জলাভূমি এবং সেইহেতু খিল বা 'পতিত্'। লোক-বসতি এবং কৃষিবিস্তার কখন কী গতিতে অগ্রসর হইয়াছে, বলিবার মতো প্রমাণ নাই; দেশের সর্বত্র সকল সময়ে একইভাবে হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। শাসন-ও বাণিজ্য -কেন্দ্র যেসব জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানে লোকবসতি এবং কৃষিক্ষেত্রের বিস্তারও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশি হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা কঠিন নয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বাহির হইতে আর্যভাষাভাষী লোকদের এই দেশে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদাও ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে, ইহাও খুব স্বাভাবিক।

এই লোকবসতি ও কৃষিবিস্তারের প্রথম নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় পঞ্চম শতক হইতে। লক্ষণীয় এই যে, পঞ্চম হইতে সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত যতগুলি ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলী আছে, তাহার অধিকাংশ দত্ত এবং বিক্রীত ভূমি 'অপ্রদ' অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত বিলি-বন্দোবস্ত হয় নাই; 'অপ্রহত' অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত কর্ষিত হয় নাই এবং 'খিল' অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত 'পতিত্' পড়িয়া আছে। নূতন নূতন বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি যেমন সৃষ্ট ও পত্তন হইতেছে, তেমনই পুরাতন ব্যবহৃত ভূমির উপরেও নূতন চাপ পড়িতেছে, এরকম দু-একটি দৃষ্টান্ত এই যুগের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। আস্রফপুর পট্টোলীতে দেখিতেছি, ভোগ করিতেছে এমন লোকের নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া অন্যত্র দান করা হইতেছে। ভূমির চাহিদাবৃদ্ধির ইহাও অন্যতম প্রমাণ।

পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রাম-গুলির যে আভাস লিপিগুলিতে পাওয়া যায় এবং "রামচরিতে" যাহা সুস্পষ্ট, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না যে, এই আমলে লোকবসতি ও কৃষির বিস্তার বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, রাজা, রাজপরিবার এবং সমৃদ্ধ লোকদের ভূমিদান করিয়া পুণ্যলাভের ইচ্ছা, ব্রাহ্মণপুরোহিতদের ভূমিসংগ্রহের লোভ প্রভৃতির প্রেরণায়ই দেশে ক্রমশ বসতি ও কৃষির বিস্তার হইয়াছে, লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যের ইহাই ইঙ্গিত।

"শাসন" ও "অগ্রহার" অর্থাৎ দত্তভূমি যাঁহারা ভোগ করিতেন তাঁহারা ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসম্পর্কিত অন্যান্য কতগুলি অধিকারও রাজা বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে লাভ করিতেন; এইসব অধিকারের কিছু কিছু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ প্রজাদের কী কী দায় ও অধিকার ছিল, তাহার কিছু কিছু আভাসও তাহা হইতেই পাওয়া যায়। ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য—এই চারি প্রকার কর তো তাহাদের দিতেই হইত। দশ রকম অপরাধের কোন অপরাধে অপরাধী হইলে জরিমানা দিতে হইত। হাটবাজার, খেয়াঘাট ইত্যাদির জন্যও কর ছিল। চোর-ডাকাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্র লইত বলিয়া সেজন্যও একটা কর নির্দিষ্ট ছিল। এই-গুলি নিয়মিত কর। তাহা ছাড়া, সময় সময় কোন বিশেষ উপলক্ষেও রাজাকে বা রাষ্ট্রকে অন্যপ্রকারে কর দিতে হইত—লিপিতে এগুলিকে বলা হইয়াছে 'পীড়া'। সমসাময়িক কামরূপের লিপিতে তো এগুলিকে উপদ্রবই বলা হইয়াছে। চাট-ভাটেরাও গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার উৎপাত উপদ্রব করিত। রাজপুত্রের জন্ম, রাজকন্যার বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে রাজাকে প্রজার কিছু দেয় তো চিরাচরিত বিধি; বাংলাদেশেও যে তাহার ব্যতিক্রম ছিল মনে হয় না। রাজা বা রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন হইলে প্রজার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিতেন। ভূমিতে অধিকার-বিহীন চাষী প্রজাও যে ছিল, সে প্রমাণও বিদ্যমান। রাষ্ট্রে ও সমাজে ভূমির ব্যক্তি-গত অধিকার স্বীকৃত হইত, ব্যক্তিগত অধিকারের ভূমি হস্তান্তরিত হইত, ভূমির ব্যক্তিগত যৌথ অধিকার (এজমালি স্বত্ব) স্বীকৃত হইত, নারীরা ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতেন, মধ্যস্বত্বাধিকারিত্বও অস্বীকৃত ছিল না, এইসব তথ্যও সাক্ষ্যপ্রমাণসহ আগেই উদ্ধার করা হইয়াছে। যে-ভূমি দান করা হইয়াছে সেই ভূমির উপর ও নীচের সমস্ত স্বত্ব-উপস্বত্বই রাজা ও রাষ্ট্র দান করিয়া দিতেছেন কিন্তু সাধারণ প্রজারা ভূমির নীচের অধিকার এবং সংলগ্ন জলের অধিকার লাভ করিত কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। অবশ্য, লিপিগুলি, বিশেষভাবে, অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলি পাঠ করিলে মনে হইতে পারে, দান ও বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার ভোগাধিকারই প্রজার উপর অর্পিত হইত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্ণবিন্যাস

এক

বর্ণবিন্যাস ভারতীয় সমাজবিন্যাসের ভিত্তি। খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ-ব্যাপারের বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করিয়া আর্যপূর্ব ভারতবর্ষে যে সমাজব্যবস্থার পত্তন ছিল তাহাকে পিতৃপ্রধান আর্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিল। এই নূতন করিয়া গড়ার পশ্চাতে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি অবশ্যই ছিল। যে যুগে বাংলাদেশের ইতিহাসের সূচনা সে যুগে বর্ণাশ্রম আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতীয় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ধীরে ধীরে তাহা পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতেছে। বর্ণাশ্রমের এই সামাজিক আদর্শের বিস্তারের কথাই এক হিসাবে ভারতবর্ষে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস। বর্ণাশ্রমই আর্যসমাজের ভিত্তি, শুধু ব্রাহ্মণ্য সমাজেরই নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ সমাজেরও। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর্যপূর্ব ও অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এই বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং আদর্শের মধ্যেই সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের কথা বলিতে গিয়া সেইজন্য বর্ণবিন্যাসের কথা বলিতেই হয়।

বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তিপদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকেরা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যে তাঁহারা সমস্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অথচ চাতুর্বর্ণ্যের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল; প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর-উপস্তর। ধর্মসূত্র- ও স্মৃতি -কারেরা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এইসব বিচিত্র বর্ণ, জন ও কোমের স্তর-উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সবকিছুকেই আদি চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই চেষ্টার কখনও বিরাম হয় নাই। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে স্মৃতিকারদের রচনার মধ্যে সমসাময়িক বাস্তব সামাজিক অবস্থার কিছুটা প্রতিফলন হয়তো আছে, কিন্তু যে যুক্তিপদ্ধতির আশ্রয়ে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা একান্তই অনৈতিহাসিক। অথচ আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতীয় সমাজ আজও এই যুক্তিপদ্ধতিতে বিশ্বাসী, এবং সুদূর প্রাচীন কাল হইতে আদি চাতুর্বর্ণ্যের যে কাঠামো ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী বর্ণব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করিয়া থাকেন। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এইসব বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ, সংকর বর্ণ সকল কালে ও ভারতবর্ষের সকল স্থানে এক প্রকারের ছিল না, এখনও নয়। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থগুলির একটিও বাংলাদেশে রচিত নয়; এবং একাদশ শতকের আগে বাংলাদেশে বাংলাদেশের সামাজিক প্রতি-

ফলন লইয়া একটিও স্মৃতিগ্রন্থ বা এমন কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই যাহার ভিতর সমসাময়িক কালের বর্ণবিন্যাসের ছবি কিছুমাত্র ধরা যাইতে পারে। একাদশ শতক হইতেই বাঙালী স্মৃতিকার ও পুরাণকারেরা সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে বাংলার সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির আদর্শ ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় বর্ণবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টার আগেই, বহুদিন হইতেই, আর্যপ্রবাহ বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; এবং সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণাশ্রমের যুক্তি এবং আদর্শও স্বীকৃতি লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন বাংলার বর্ণবিন্যাসের কথা বলিতে হইলে বাংলার আর্যীকরণের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা আরম্ভ করিতে হয়।

দুই

আর্যীকরণের তথা বাংলার বর্ণবিন্যাসের প্রথম পর্বের ইতিহাস নানা প্রকারের সাহিত্যগত উপাদানের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সে উপাদান রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনু-বোধায়ন প্রভৃতি স্মৃতি- ও সূত্র -কারদের গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বৌদ্ধ ও জৈন প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য নিহিত আছে। উত্তর-বঙ্গে এবং বাংলাদেশের অন্যত্র গুপ্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আর্যীকরণ তথা বাংলার বর্ণবিন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বর্ণবিন্যাস-ইতিহাসের প্রচুর উপাদান বাংলার অসংখ্য লিপিমালায় বিদ্যমান। সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক দু-একটি কাব্যগ্রন্থের, যেমন রামচরিতের, সাহায্যও লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের ঐতিহাসিকতা অবশ্যস্বীকার্য।

সেন-বর্মণ আমলে বাংলাদেশে কিছু কিছু স্মৃতি- ও ব্যবহার -গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেগুলি কখন কোন্ রাজার আমলে ও পোষকতায় কে রচনা করিয়াছিলেন তাহা সুনির্ধারিত। সমস্ত স্মৃতি- ও ব্যবহার -গ্রন্থ কালের হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কিছু কিছু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ভবদেব ভট্টের ও জীমূতবাহনের কয়েকটি গ্রন্থই প্রধান। লিপিমালায় যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেসব তথ্য এই স্মৃতি- ও ব্যবহার -গ্রন্থের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলে অনৈতিহাসিক বা অযৌক্তিক কিছু করা হইবে না।

স্মৃতি- ও ব্যবহার -গ্রন্থ ছাড়া অন্তত দুইটি অর্বাচীন পুরাণ-গ্রন্থ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গোপালভট্ট-আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত, এবং বাংলার কুলজী গ্রন্থমালায় হিন্দুযুগের শেষ অধ্যায়ের বর্ণবিন্যাসের ছবি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের একটিকেও প্রামাণিক সমসাময়িক সাক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বৃহদ্ধর্ম- ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচারালোচনা হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুরাণটিতে পদ্মা ও বাংলাদেশের যমুনা নদীর উল্লেখ, গঙ্গার তীর্থমহিমার সবিশেষ উল্লেখ, ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়ার বিধান (যাহা ভারতবর্ষের আর কোথাও বিশেষ নাই), ব্রাহ্মণেতর সমস্ত শূদ্রবর্ণের ছত্রিশটি উপ- ও সংকর -বর্ণে বিভাগ (বাংলার তথাকথিত 'ছত্রিশ জাত' যাহা ভারতবর্ষে

আর কোথাও দেখা যায় না) ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় এই পুরাণটির লেখক বাঙালী না হইলেও বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের পৃথক অনুল্লেখ, 'সৎ' ও 'অসৎ' পর্যায়ে শূদ্রদের দুই ভাগ, ব্রাহ্মণদের পরেই অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) এবং করণ (কায়স্থ)দের স্থান নির্ণয়, শঙ্খকার (শাঁখারী), মোদক (ময়রা), তন্তুবায়, দাস (চাষী), কর্মকার, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি উপ- ও সংকর -বর্ণের উল্লেখ প্রভৃতিও এই অনুমানের সমর্থক। বাংলাদেশের বাহিরে অন্যত্র কোথাও এই ধরনের বর্ণব্যবস্থা এবং এইসব সংকর বর্ণ দেখা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন; তবে এই কাল দ্বাদশ শতকের আগে নয় এবং চতুর্দশ শতকের পরে নয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে বলা যায়, এই দুই পুরাণে বাংলার আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ের বর্ণবিন্যাসের ছবির একটা মোটামুটি কাঠামো পাওয়া যাইতেছে।

বল্লাল-চরিত নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত। একখানির গ্রন্থকার আনন্দভট্ট; নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁর আদেশে তাঁহার গ্রন্থখানি রচিত হয়। রচনাকাল ১৫১০ খ্রীষ্টশতক। আর-একখানি গ্রথ পূর্বখণ্ড, উত্তরখণ্ড ও পরিশিষ্ট—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতার নাম গোপালভট্ট; গোপাল-ভট্ট বল্লালসেনের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন, এবং বল্লালের আদেশানুসারে ১৩০০ শকে গ্রন্থখানি রচিত হয়, এইরূপ দাবি করা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড দুইশত বৎসর পর ১৫০০ শকে আনন্দভট্ট রচনা করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে বল্লালের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বল্লালের যথার্থ কাল নয়; কাজেই গোপালভট্ট বল্লালের সমসাময়িক ছিলেন এ কথা সত্য নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থটিকে বলিয়াছিলেন 'জাল'; আর শাস্ত্রী মহাশয়-সম্পাদিত প্রথম গ্রন্থটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন 'জাল'!

গ্রন্থ দুটিকে 'জাল' বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই। অনেকের মতে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে প্রচলিত লোককাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল-চরিত এবং এইজাতীয় অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই কাহিনীটিকে সাধারণত যতটা বিকৃত প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করা হয় আমি ততটা বিকৃত বলিয়া মনে করি না। বল্লালচরিত-কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও ইহার মূলে যে সমাজেতিহাসের একটি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না।

বল্লাল-চরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুটা স্বীকার করা গেলেও কুলজীগ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশে কুলজীগ্রন্থমালা সুপরিচিত, সুআলোচিত। ব্রাহ্মণ-কুলজীগ্রন্থমালায় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী বা মিশ্র-গ্রন্থ, নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম, ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ, মেলপর্যায় গণনা, বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা, কুলার্ণব, হরিমিশ্রের কারিকা, এড়ুমিশ্রের কারিকা, মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা এবং সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী পঞ্চদশ শতকের রচনা বলিয়া অনুমিত; নুলো পঞ্চানন এবং বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থের কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতক হইতে পারে। বাকি কুলজীগ্রন্থ সমস্তই অর্বাচীন। বৈদ্য-কুলজীগ্রন্থের মধ্যে রামকান্তের কবিকণ্ঠহার এবং ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা সমধিক খ্যাত; ইহাদের রচনা-

কাল যথাক্রমে ১৬৫৩ ও ১৬৭৩ খ্রীষ্টশতক। কায়স্থ এবং অন্যান্য বর্ণেরও কুলজী-ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি কিছুতেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের আগেকার রচনা বলিয়া মনে করা যায় না। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একান্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক পণ্ডিত এইসব পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কুলজী-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুত, বাংলার কৌলীন্যপ্রথা একমাত্র এই কুলশাস্ত্র বা কুলজীগ্রন্থমালার সাক্ষ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

নানা কারণেই ঐতিহাসিকেরা এইসব কুলজী-গ্রন্থমালার সাক্ষ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পদ্ধতিতে আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নাই; এবং অনেকে তাঁহাদের সন্দেহ ব্যক্ত করিতেও দ্বিধা করেন নাই। কুলজী-গ্রন্থমালা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মোটামুটি নির্ধারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমত, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যখন কুলশাস্ত্রগুলি প্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে তখন মুসলমানপূর্ব যুগের বাংলার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর জ্ঞান ও ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিল। কোন কোন পারিবারিক ইতিহাসের অস্তিত্ব হয়তো ছিল। এইসব বংশাবলী এবং প্রচলিত অস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, অর্ধসত্য অর্ধকল্পনার নানা কাহিনীতে সমৃদ্ধ করিয়া সে কুলশাস্ত্রগুলি রচনা করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এইসব গ্রন্থোক্ত কাহিনী বংশমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে পড়িয়া নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে পাঠবিকৃতি লাভ করে এবং নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও কাহিনীদ্বারা সমৃদ্ধ-তর হয়। কাজেই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবে ইহাদের উপর নির্ভর করা কঠিন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে, প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসরের মুসলমানাধিপত্যের পর বর্ণহিন্দুসমাজ নিজের ঘর নূতন করিয়া গুছাইতে আরম্ভ করে; রঘুনন্দন তখনই নূতন স্মৃতিগ্রন্থাদি রচনা করিয়া নূতন সমাজনির্দেশ দান করেন। কুলশাস্ত্রগুলির রচনাও তখনই আরম্ভ হয়, এবং প্রচলিত ধর্ম- ও সমাজ -ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর কালের স্মৃতিশাসনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার একটা সুসংগত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও পণ্ডিতদের মধ্যে উদগ্র হইয়া দেখা দেয়। সেন-বর্মণ আমলই স্মৃতিরচনা ও স্মৃতি-শাসনের প্রথম সুবর্ণযুগ, কাজেই কুলশাস্ত্রকারেরা সেই যুগের সঙ্গে নিজেদের ব্যবস্থা-ইতিহাস যুক্ত করিবেন তাহাও কিছু আশ্চর্য নয়!

দ্বিতীয়ত, কুলশাস্ত্রকাহিনীর কেন্দ্রে বসিয়া আছেন রাজা আদিশূর। আদিশূর কর্তৃক কোলাঞ্চ-কনৌজ (অন্যমত, কাশী) হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য কয়েকটি বর্ণ-উপবর্ণের কুলজী-কাহিনী এবং কৌলীন্য-প্রথার ইতিহাস জড়িত। কৌলীন্যপ্রথার বিবর্তনের সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণ -সেনের নামও জড়িত হইয়া আছে এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজীর সঙ্গে আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের এবং ক্ষিতিশূরের পুত্র ধারাশূরের; বৈদিক-ব্রাহ্মণ কুলকাহিনীর সঙ্গে বর্মণরাজ শ্যামলবর্মণ এবং হরিবর্মণের নামও জড়িত। একাদশ শতকে দক্ষিণরাঢ়ে এক শূরবংশ রাজত্ব করিতেন, এবং রণশূর নামে অন্তত একজন রাজার নাম আমরা জানি। আদিশূর, ক্ষিতিশূর এবং ধরাশূরের নাম আজও ইতিহাসে অজ্ঞাত। সেন ও বর্মণ রাজবংশদ্বয় তো খুবই পরিচিত। কিন্তু আদিশূরই বাংলায় প্রথম ব্রাহ্মণ আনিলেন, তাঁহার আগে ব্রাহ্মণ ছিল না, বেদের চর্চা ছিল না, কুলজী গ্রন্থ-গুলির এই তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক; অথচ ইহারই উপর সমস্ত কুলজী-

কাহিনীর নির্ভর। অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের কিছু অভাব ছিল না, বেদ-বেদাঙ্গচর্চাও যথেষ্ট ছিল; অষ্টম শতকের আগেই বাংলার সর্বত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল। আর, অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ যেমন বাংলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই বাংলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা বাংলার বাহিরে গিয়াও বিচিত্র সম্মাননা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গজ ব্রাহ্মণদের কোন কাহিনী কুলশাস্ত্রগুলিতে নাই, অথচ (পূর্ব)-বঙ্গেও অনেক ব্রাহ্মণ গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং সম্ভবত বৈদিক ও গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের খবর অন্যতর স্বতন্ত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতেও পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র একান্তই ভৌগোলিক সংজ্ঞা; বৈদিক ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদিশূর-পূর্ব লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান; আর গ্রহবিপ্রেরা তো বাহির হইতে আগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। ইঁহাদের সম্পর্কে কুলজীর ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনৈতিহাসিক। বৈদ্য ও কায়স্থদের ভৌগোলিক বিভাগ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণ-সেনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, অথচ এই দুই রাজার আমলে যেসব স্মৃতি- ও ব্যবহার -গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইঁহাদের নিজেদের যেসব লিপি আছে তাহার একটিতেও এই প্রথা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিতমাত্রও নাই। তাহা ছাড়া, এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অসংখ্য অপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের যেসব উল্লেখ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও লিপিমালায় পাওয়া যায় তাঁহাদের একজনকেও ভুলিয়াও কুলীন কেহ বলেন নাই। বল্লাল ও লক্ষ্মণের নাম কৌলীন্যপ্রথা উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত থাকিলে তাঁহারা নিজেরা কেহ তাহার উল্লেখ করিলেন না, সমসাময়িক গ্রন্থ ও লিপিমালায় তাহার উল্লেখ পাওয়া গেল না, ইহা খুবই আশ্চর্য বলিতে হইবে! আদিশূর-কাহিনী এবং কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের গাঞী-বিভাগও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গাঞীর উদ্ভব গ্রাম হইতে; যে গ্রামে যে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করিতেন তিনি সেই গ্রামের নামানুযায়ী গাঞী-পরিচয় গ্রহণ করিতেন। বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট প্রভৃতি গ্রামের নামের সঙ্গে উপাধ্যায় বা আচার্য জড়িত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি। বস্তুত, বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট ব্রাহ্মণদের এইসব গ্রামনামায় পরিচয় অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতেই দেখা যাইতেছে। কাজেই এইসব গাঞীপর্যায়-পরিচয় স্বাভাবিক ভৌগোলিক কারণেই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার সূচনা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই দেখা গিয়াছিল —আদিশূর-কাহিনী বা কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে উহাকে যুক্ত করিবার কোন সংগত কারণ নাই। বৈদ্য এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ কুলজীতে আদিশূর এবং বল্লালসেনকে বলা হইয়াছে বৈদ্য। এ তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক। সেনেরা নিঃসন্দেহে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়; ইঁহারা এবং সম্ভবত শূরেরাও অবাঙালী। কাজেই বাঙালী বৈদ্য-সংকর-বর্ণের সঙ্গে ইঁহাদের যুক্ত করিবার কারণ নাই।

এইসব কারণে কুলশাস্ত্রের সাক্ষ্য ঐতিহাসিক আলোচনায় নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে, ইহাদের ভিতর দিয়া লোকস্মৃতির একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং সে ইঙ্গিত অস্বীকার করা কঠিন। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যে বর্ণ-উপবর্ণগত সমাজব্যবস্থা, যে স্মৃতিশাসন বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহার একটা প্রাচীনতর ইতিহাস ছিল, এবং লোকস্মৃতি সেই ইতিহাসকে যুক্ত

করিয়াছিল শূরে, সেন ও বর্মণ রাজবংশগুলির সঙ্গে—পাল, চন্দ্র বা অন্য কোন রাজবংশের সঙ্গে নয়, ইহা লক্ষণীয়। আমরা নিঃসংশয়ে জানি, সেন ও বর্মণ বংশদ্বয় অবাঙালী; শূরবংশও সম্ভবত অবাঙালী; ইহাও আমরা জানি, সেন এবং বর্মণ রাষ্ট্র ও রাজবংশ দুটির ছত্রচ্ছায়ায়ই এবং তাঁহাদের আমলেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুশাসন, সমস্ত পরিবেশ ও বাতাবরণ, সমস্ত খুঁটিনাটি সংস্কার লইয়া সর্বব্যাপী প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কুলজী-গ্রন্থগুলির ইঙ্গিতও তাহাই। এই হিসাবে লোকস্মৃতি মিথ্যাচরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। তবে, কুলশাস্ত্রগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু মাত্রই গ্রাহ্য, তাহাদের বিচিত্র খুঁটিনাটি তথ্য ও বিবরণগুলি নয়।

এইসব ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদি ছাড়া আর-একটি উপাদানের উল্লেখ করিতে হয়; এই উপাদান সহজিয়াতন্ত্রের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি। পদগুলি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন; ইহাদের তিব্বতী ভাষারূপও কিছুদিন হইল পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের রচনাকাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। এই পদগুলির যত গুহ্য অর্থই থাকুক, কিছু কিছু সমাজ-সংবাদও ইহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এবং বিশেষভাবে ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ পর্যায়ের বর্ণ-সংবাদ।

তিন

আর্যীকরণের সূচনার আগে এই দেশ আস্ট্রিক- ও দ্রবিড় -ভাষাভাষী—অস্ট্রিকভাষাভাষীই অধিকসংখ্যক—খুব স্বল্পসংখ্যক অন্যান্যভাষাভাষী কৃষি- ও শিকার -জীবী, গৃহ- ও অরণ্য -চারী অসংখ্য কোমে বিভক্ত লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, এইসব অসংখ্য বিচিত্র কোমদের ভিতর বিবাহ- ও আহার-বিহার -গত, ধর্ম- ও আচার -গত নানাপ্রকার বিধিনিষেধ বিদ্যমান ছিল; সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারণানুযায়ী বিচার করিলে ভারতীয় বর্ণবিন্যাস আর্যপূর্ব ও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। অবশ্যই এই মিলন একদিনে হয় নাই; বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম, বিচিত্র মিলন ও আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া এই সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। এই সমন্বয়কাহিনীই এক হিসাবে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির এবং কতকাংশে ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতিরও ইতিহাস। বাংলাদেশে এই বিরোধ-মিলনের-সমন্বয়ের সূচনা কিভাবে হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাচীন আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও আর্য- বৌদ্ধ ও -জৈন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এইসব গ্রন্থের সাক্ষ্য একপক্ষীয়। আর্যপূর্ব জাতি ও কোমদের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিবার মতন কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত নাই। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশ উত্তর-ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশ; আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব এদেশকে আক্রমণ করিয়াছে সকলের পরে। অন্যদিকে, তখন সমগ্র বাংলাদেশে আর্যপূর্ব সংস্কার- ও সংস্কৃতি -সম্পন্ন বিচিত্র কোমদের বাস; তাহাদের নিজস্ব সংস্কার- ও সংস্কৃতি -বোধ গভীর ও ব্যাপক। কাজেই এই দেশে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযান বিনা বিরোধ ও বিনা সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় নাই। বহু শতাব্দী

ধরিয়া এই বিরোধ-সংঘর্ষ চলিয়াছিল। লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, গুপ্ত আমলে আর্য-ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস, ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এদেশে স্বীকৃতই হয় নাই। তাহার পরেও ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের নিম্নস্তরে ও তাহার বাহিরে সংস্কার ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ বহুদিন চলিয়াছিল; সেন-বর্মণ আমলে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) বর্ণ-সমাজের উচ্চস্তরে আর্যপূর্ব লোকসংস্কৃতির পরাভব প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙালী সমাজের অন্তঃপুরে এবং একান্ত নিম্নস্তরে এই সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রভাব আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মে, লোকাচারে, ব্যবহারিক আদর্শে, ভাবনা-কল্পনায় আজও সেখানে আর্যপূর্ব সমাজের বিচিত্র স্মৃতি ও অভ্যাস সুস্পষ্ট। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিল্পে ধর্মে, বর্তমান বাঙালীর ধ্যানে মননে আচারে ব্যবহারে এখনও সেই স্মৃতি বহমান।

ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থের "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ" এই পদে কেহ কেহ বঙ্গ, মগধ, চের এবং পাণ্ড্য কোমের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করেন; এইসব কোমকে বলা হইয়াছে বয়াংসি বা 'পক্ষী-বিশেষাঃ', এবং ইহারা যে আর্য সংস্কৃতির বহির্ভূত তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই পদটির পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদের অবসর বিদ্যমান। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদের লোকদিগকে যে 'দস্যু' বলা হইয়াছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এই দুইটি ছাড়া আর কোন প্রাচীনতম গ্রন্থেই প্রাচীন বাংলার কোন কোমের উল্লেখ নাই। বুঝা যাইতেছে, সেই প্রাচীনকালে আর্যভাষীরা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচিত হন নাই; পরবর্তী সংহিতা- ও ব্রাহ্মণ্য -গ্রন্থাদি রচনার সময় তাঁহারা পুণ্ড্র, বঙ্গ ইত্যাদি কোমের নাম শুনিতেছেন মাত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি গল্প হইতে জানা যায় ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপগ্রস্ত পুত্রেরাই 'দস্যু'-আখ্যাত অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, এবং মুতিব কোমের জন্মদাতা। এই গল্পের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মহাভারতের এবং কতিপয় পুরাণের একটি গল্পেও শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের অন্যত্র, ভীমের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে বাংলার সমুদ্রতীরবাসী কোমগুলিকে বলা হইয়াছে 'ম্লেচ্ছ'; ভাগবত পুরাণে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খশ এবং সুহ্ম কোমের লোকদের বলা হইয়াছে 'পাপ'। বোধায়নের ধর্মসূত্রে আরট্ট (পাঞ্জাব), পুণ্ড্র, (উত্তর-বঙ্গ) সৌবীর (দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ), বঙ্গ (পূর্ব-বাংলা), কলিঙ্গ প্রভৃতি কোমের লোকদের অবস্থিতি নির্দেশ করা হইয়াছে আর্যবহির্ভূত দেশের প্রত্যন্ততম সীমায়; এইসব জনপদে কেহ স্বল্পকালের প্রবাসে গেলেও ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বোধায়নের কালে বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচয় যদি-বা হইয়াছে, কিন্তু তখনও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দৃষ্টিতে এইসব অঞ্চলের লোকেরা ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত। এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রাচীন আর্য, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও কিছু কিছু দেখা যায়। আচারঙ্গ=আয়ারঙ্গসূত্রের একটি গল্পে পথহীন রাঢ়দেশে মহাবীর এবং তাঁহার শিষ্যদের লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের যে বর্ণনা আছে, বজ্রভূমিতে যে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণের ইঙ্গিত আছে তাহাতে এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প-গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলের লোকদের ভাষাকে বলা হইয়াছে 'অসুর' ভাষা। এইসব বিচিত্র উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর- ও মধ্য -ভারতের লোকেরা পূর্বতম ভারতের বঙ্গ,

পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, যে কালে এইসব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। এই অন্যতর জাতি, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর-ভাষাভাষী লোকদের সেইজন্যই বিজেতৃসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় বলা হইয়াছে, 'দস্যু', 'ম্লেচ্ছ', 'পাপ', 'অসুর' ইত্যাদি।

কিন্তু এই দর্পিত উন্নাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। নানা বিরোধ-সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এইসব দস্যু, ম্লেচ্ছ, অসুর, পাপ কোমের লোকদের সঙ্গে আর্যভাষাভাষী লোকদের মেলামেশা হইতেছিল। এইসব বিরোধ-সংঘর্ষের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা পৌরাণিক গল্পে—রামায়ণে রঘুর দিগ্বিজয়, মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়, আচারঙ্গসূত্রে মহাবীরের রাঢ়দেশে জৈনধর্ম প্রচার ইত্যাদি প্রসঙ্গে। ইহাদের মধ্য দিয়াই আর্য ও আর্যপূর্ব সংস্কৃতির মিলনপথ প্রশস্ত হইতেছিল এবং আর্যপূর্ব সংস্কৃতির 'ম্লেচ্ছ' ও 'দস্যু'রা আর্যসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিতেছিল। এই স্বীকৃতিলাভ ও আর্যসমাজে অন্তর্ভুক্তির দুইটি দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাইতে পারে। রামায়ণে দেখা যাইতেছে, মৎস্য-কাশী-কোশল কোমের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-অঙ্গ-মগধ কোমের রাজবংশগুলি অযোধ্যা রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। ইহা অপেক্ষাও আর-একটি অর্থবহ গল্প আছে বায়ু- ও মৎস্য -পুরাণে, মহাভারতে। এই গল্পে অসুররাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বর্ণিত আছে; এই পাঁচপুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম; ইহাদের নাম হইতেই পাঁচ-পাঁচটি কোম জনপদের নামের উদ্ভব।

প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর বাংলাদেশের এইসব দস্যু ও ম্লেচ্ছ কোমগুলি ধীরে ধীরে আর্যসমাজব্যবস্থায় কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি ও স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একদিকে বিরোধ ও সংঘর্ষ, অন্যদিকে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চলিয়াছিল—কখনও ধীর শান্ত, কখনও দ্রুত কঠোর প্রবাহে। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরাভব ঘটিয়াছিল ক্রমে ক্রমে, অনেক পরে, এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবসর কম। মানব-ধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইতেছে পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব সমুদ্রতীর পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন বাংলাদেশের অন্তত কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্গত, এই যেন ইঙ্গিত। মনু পুণ্ড্র কোমের লোকদের বলিতেছেন 'ব্রাত্য' বা পতিত ক্ষত্রিয়, এবং তাহাদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করিতেছেন দ্রাবিড়, শক, চীন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের সঙ্গে। মহাভারতের সভাপর্বে কিন্তু বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থেও বঙ্গ এবং লাঢ় কোম দুটিকে আর্য কোম বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেখিতেছি, প্রাচীন বাংলার কোন কোন স্থান তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে, যেমন পুণ্ড্রভূমিতে করতোয়াতীর, সুহ্মদেশের ভাগীরথী-সাগর-সংগম। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে (৩য়-৪র্থ শতক) গৌড়-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ বাংলা এবং বাঙালীর আর্যীকরণ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এইসব পুরাণকথার ইঙ্গিত। বায়ু- ও মৎস্য -পুরাণে, মহাভারতে বঙ্গ-সুহ্ম-পুণ্ড্রদের তো ক্ষত্রিয়ই বলা হইয়াছে, এমন কি শবর, পুলিন্দ এবং কিরাতদেরও। কোন কোন বংশ যে ব্রাহ্মণ পর্যায়েও স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, ঋষি দীর্ঘতমসের গল্পটি তাহার কতকটা প্রমাণ

গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ বিজিত লোকই স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল শূদ্রবর্ণ পর্যায়ে। মনু বলিতেছেন, পৌণ্ড্রক ও কিরাতেরা ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু বহুদিন তাহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংস্পর্শে না আসায় তাহারা ব্রাহ্মণ্য পূজাচার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং সেইহেতু তাহাদের শূদ্র পর্যায়ে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য কোমদের ক্ষেত্রেও বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকিবে। মনু কৈবর্তদের বলিয়াছেন সংকর বর্ণ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ তাহাদের বলিতেছে ব্রাহ্মণ্য-সমাজ-বহির্ভূত। অবশ্য, একদিকে স্বীকৃতি-অন্তর্ভুক্তি এবং আর একদিকে উন্নীত-অবনীতকরণ যাহাই চলিতে থাকুক না কেন, এ তথ্য সুস্পষ্ট যে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য বর্ণবিন্যাসও বাংলাদেশে ক্রমশ তাহার মূল প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীরাই যে আর্য সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা বাংলাদেশে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাই নয়, জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরাও এ সম্বন্ধে সমান কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন। তাঁহারা বেদ-বিরোধী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য- সমাজব্যবস্থা -বিরোধী ছিলেন না, এবং বর্ণব্যবস্থাও একেবারে অস্বীকার করেন নাই।

মৌর্য ও শুঙ্গ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর্য সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা ক্রমশ বাংলাদেশে অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছিল। বিশেষত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের আধিপত্যকালে। রাষ্ট্রে যে আর্য সামাজিক আদর্শ গৃহীত ও স্বীকৃত হইতেছিল তাহা সুস্পষ্ট। বোধ হয় এই সময় হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, রাষ্ট্রকর্ম প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া অধিকতর সংখ্যায় উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষীরা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিতে থাকে। কিন্তু আর্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা গুপ্তকালের আগে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থাও বাংলাদেশে বোধ হয় তাহার আগে দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠে নাই।

চার

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপদ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজ উত্তর-ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইতে আরম্ভ করে।

এই যুগের লিপিমালায় প্রথমেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে অগণিত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের। দামোদরপুরলিপি (খ্রী ৪৪৩-৪৪), ধনাইদহ পট্টোলী (৪৪৮-৪৯), বৈগ্রাম পট্টোলী (৪৪৭-৪৮)—এই সবকয়টি লিপি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ব্রাহ্মণদের ভূমিদানসম্বন্ধীয়। এই অনুমান নিঃসংশয় যে, পঞ্চম শতকে উত্তর-বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, এই ধর্মের দেবদেবীরা পূজিত হইতেছেন, ব্রাহ্মণদের বসবাস বিস্তৃত হইতেছে, অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিতেছেন, আনিয়া বসবাস করাইতেছেন, এবং অযোধ্যাবাসী ভিন-প্রদেশী আসিয়াও এই দেশে মন্দির সংস্কার করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন। যেসব ব্রাহ্মণেরা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বেদবিদ্ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও আছেন। উত্তর-বঙ্গের সংবাদ বোধ হয়

আরও পাওয়া যায় কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুরলিপিতে। লিপিটি সপ্তম শতকের। এই লিপিতে দেখা যাইতেছে, ময়ূরশাল্মল অগ্রহারে ভূতিবর্মা ভিন্ন ভিন্ন বেদের ৫৬টি বিভিন্নগোত্রীয় অন্তত ২০৫ জন 'বৈদিক' বা 'সাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মণের বসতি করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সকলেই বাজসনেয়ী, ছান্দোগ্য, বাহ্বৃচ্য, চারক্য এবং তৈত্তিরীয়, এই পাঁচটি বেদ-পরিচয়ের অন্তর্গত, তবে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী-পরিচয়ের সংখ্যাই অধিক। ইঁহাদের অধিকাংশের পদবী স্বামী। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই উত্তরপূর্ব-বাংলায় (ভিন্ন মতে, শ্রীহট্ট অঞ্চলে) পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের খবর পাওয়া যাইতেছে বিজয়সেনের মল্লসারুললিপি (ষষ্ঠ শতক) এবং জয়নাগের বপ্যঘোষবাটলিপিতে (সপ্তম শতক)। শেষোক্ত লিপিটি দ্বারা মহা-প্রতীহার সূর্যসেন বপ্যঘোষবাটনামক একটি গ্রাম ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন; এই লিপিতেই খবর পাওয়া যাইতেছে কুটকুট গ্রামের ব্রাহ্মণদের; মল্লসারুললিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, দৈনিক পঞ্চ-মহাযজ্ঞ নিষ্পন্নের জন্য মহারাজ বিজয়সেন বৎসস্বামী নামক জনৈক ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমি দান করিতেছেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে রাঢ়া-রাষ্ট্রেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণ-ব্যবস্থা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই স্বীকৃত ও প্রসারিত হইয়াছে। এই তথ্যের প্রমাণ আরও পাওয়া যায় শশাঙ্কের মেদিনীপুরলিপি দুইটিতে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দণ্ডভুক্তিদেশেও যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণ-ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় ইহাদের সাক্ষ্যে।

মধ্য ও পূর্ব বঙ্গেও এই যুগে অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলীদত্ত ভূমির দানগ্রহীতা হইতেছেন লৌহিত্য-তীরবাসী জনৈক কাণ্ব-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ভট্টগোমীদত্ত স্বামী। যে মণ্ডলে (বারকমণ্ডলে; ফরিদপুর জেলায়) দত্ত ভূমির অবস্থিতি তাহার শাসনকর্তাও ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম বৎসপাল স্বামী। এই বংশের আর-এক রাজা ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলীদত্ত ভূমির দানগ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ চন্দ্রস্বামী, আর-একটির জনৈক বসুদেব স্বামী। মহারাজ সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটিলিপির দত্তভূমির দানগ্রহীতাও একজন ব্রাহ্ম, নাম সুপ্রতীক স্বামী। সপ্তম শতকের ত্রিপুরার লোকনাথলিপির সাক্ষ্যও একই প্রকার; এখানেও দেখিতেছি জনৈক ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ অনন্তনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ২১১ জন চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণের বসতি করাইবার জন্য পশুসংকুল বন-প্রদেশে ভূমিদান গ্রহণ করিতেছেন। গ্রামকুটুম্বি অর্থাৎ গৃহস্থদের মধ্যে শর্মা- ও স্বামী -পদবীযুক্ত অনেক নাম পাইতেছি।

শুধু যে ব্রাহ্মণেরাই ভূমিদান লাভ করিতেছেন তাহাই নয়; জৈন ও বৌদ্ধ আচার্যরা এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলিও অনুরূপ ভূমিদান লাভ করিয়াছেন। পঞ্চম শতকে উত্তর-বঙ্গে পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি লিপিতে দেখিতেছি (৪৭৮-৭৯ খ্রী) জনৈক ব্রাহ্মণ নাথশর্মা এবং তাঁহার স্ত্রী রামী এক জৈন বিহারে দানের জন্য কিছু ভূমি ক্রয় করিতেছেন। ষষ্ঠ শতকে (গুনাইঘরলিপি, ৫০৭-৮ খ্রী) ত্রিপুরা জেলায় মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের জন্য মহারাজ রুদ্রদত্ত কিছু জমি দান করিতেছেন। সপ্তম-অষ্টম শতকে ঢাকা জেলার আস্রফপুর অঞ্চলে দেখিতেছি, জনৈক বৌদ্ধ আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্র তাঁহার বিহার ইত্যাদির জন্য স্বয়ং রাজার নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে শর্মা ও স্বামী পদবী ছাড়া ব্রাহ্মণদের বোধ হয় অন্য পদবী-পরিচয়ও ছিল। যেমন চট্ট, ভট্ট, এবং বন্দ্য। ভট্ট অবশ্য "গাঞি"-পরিচয় হইলেও হইতে পারে। অথবা পণ্ডিত বা আচার্য অর্থেও 'ভট্ট' কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে। বন্দ্য পূজনীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে, আবার "গাঞি"-পরিচয় হওয়াও অসম্ভব নয়। চট্ট এবং বন্দ্য যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অসংখ্য "গাঞি"-পরিচয়ের মধ্যে দুটি, ঐ তথ্য পরবর্তী স্মৃতি- ও কুলজী-গ্রন্থে জানা যায়। 'ভট্ট' সম্বন্ধে কিছু জোর করিয়া বলা যায় না। যাহাই হউক, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই এই "গাঞি"-পরিচয়ের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব এবং অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে।

ব্রাহ্মণদের শর্মা পদবী-পরিচয় বাংলাদেশে আজও সুপ্রচলিত। কিন্তু পদবী-পরিচয় মধ্যযুগের সূচনা হইতেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নিধনপুরলিপির সাক্ষ্য ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোকস্মৃতি হইতে মনে হয়, ঐ লিপির দুই শতাধিক স্বামী-পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈদিক (পরবর্তী কালের, সাম্প্রদায়িক) ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অনুমান হয়, ইঁহারা সকলেই বাংলাদেশের বাহির হইতে আসিয়াছিলেন। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে তো এখনও ব্রাহ্মণদের স্বামী পদবী সুপ্রচলিত; প্রাচীন কালেও তাহাই ছিল। উত্তর-ভারতেও যে তাহা ছিল তাহার প্রমাণ গুপ্তযুগের লিপি-মালায়ই পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের কুলজী-গ্রন্থে বৈদিক ব্রাহ্মণদের দুই শাখার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। এইসব স্বামী-পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য, স্বামী পদবীর উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কিছু করা চলে না।

এইসব ব্রাহ্মণদের ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে রাজ-কর্মচারী, গ্রামবাসী গৃহস্থ, প্রধান প্রধান লোক, নগরবাসী শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ এবং অন্যান্য লোকের নাম-পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। এই নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি তথ্য লক্ষ্যগোচর হয়। প্রথমত, অধিকাংশ নামের রূপ সংস্কৃত। কতগুলি নামের দেশজ রূপ হইতে সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে, আর কতগুলির নামরূপ দেশজই থাকিয়া গিয়াছে। 'অক্' বা 'ওক্' প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া দেশজ বা ভাষা শব্দের নামকে সংস্কৃত ক-কারান্ত পদরূপে দেখাইবার যে রীতি আমরা পরবর্তী কালে বাংলাদেশে প্রচলিত দেখিতে পাই (যেমন সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে গৌড়-বঙ্গের কবিদের নাম-পরিচয়ে, এবং অন্যত্র) তাহাও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত নামে জনসাধারণ সাধারণত কোন পদবী ব্যবহার করিত না, শুধু পূর্বনামেই পরিচিত হইত (তেমন নামের সংখ্যাই অধিক)। তৃতীয়ত, এই নামগুলির মধ্যে কতকগুলি অন্ত্যনামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, যেগুলি এখনও বাংলাদেশে নাম-পদবী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন, দত্ত, পাল, মিত্র, নন্দি-নন্দী, বর্মণ, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, এমন কি দাম (দাঁ), ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে এগুলি অন্ত্যনাম এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। চতুর্থত, এইসব অন্ত্যনাম আজকাল যেমন বর্ণ-জ্ঞাপক, পঞ্চম-অষ্টম শতকে তেমন ছিল না, তবে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোকেরাই এই অন্ত্যনামগুলি ব্যবহার করিতেন; ব্রাহ্মণেরা শুধু শর্মা বা স্বামী পদবী এবং ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতি "গাঞি"-পরিচয় গ্রহণ করিতেন। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তথাকথিত 'ভদ্র' জাতের মধ্যে (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম-সংকর ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণোক্ত

সৎশূদ্র জাতের মধ্যে) চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর, দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, দেব, পালিত প্রভৃতি নামাংশ বা পদবীর ব্যবহার এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়া হিন্দু আমলের শেষেও যে চলিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের নামের মধ্যে।

লিপিগুলিতে অনেক ব্যক্তি-নামের উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই আছে অনেক স্থান-নামের উল্লেখ। এই নামগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, কতকগুলি নামের রূপ পুরাপুরি সংস্কৃত, যেমন, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটীবর্ষ, পঞ্চনগরী, নব্যাবকাশিকা, সুবর্ণবীথি, ঔদম্বরিক। কতকগুলি নামের দেশজরূপ হইতে সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে, যেমন, বায়িগ্রাম, পূর্ণিটম-পোট্টক, গোষাটপুঞ্জক, খাড়া(টা)পার, ত্রিবৃতা, শ্রিঘট্টিক, রোল্লবায়িকা ইত্যাদি। আবার, কতকগুলির নাম এখনও দেশজ রূপেই থাকিয়া গিয়াছে, যেমন, কুট্‌কুট্‌, নাগিরট্ট, ডোঙ্গা (গ্রাম), কণামোটিকা ইত্যাদি। মনে হয়, ব্যক্তি-নামের ক্ষেত্রে যেমন স্থান-নামের ক্ষেত্রেও তেমনই, আর্যীকরণ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

উপরোক্ত অন্ত্যনামগুলি যাঁহাদের ব্যক্তি-নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে তাঁহারা কোন্ বর্ণ বা উপবর্ণের স্থির করিবার কোন উপায় নাই। এই যুগের লিপি-গুলিতে কায়স্থ নামে পরিচিত এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর সংবাদ পাওয়া যায়, যেমন, প্রথম-কায়স্থ শাম্বপাল, স্কন্দপাল, বিপ্রপাল, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, কায়স্থ প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, কৃষ্ণদাস, জ্যেষ্ঠ কায়স্থ নলসেন ইত্যাদি। ইঁহারা যে রাজকর্মচারী এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। কায়স্থ বলিতে মূলত কোন বর্ণ বা উপবর্ণ বুঝাইত না। কোষকার বৈজয়ন্তী (একাদশ শতক) করণ অর্থে বলিতেছেন লেখক, এবং কায়স্থ ও করণ সমার্থক, ইহাও বলিতেছেন। ক্ষীর-স্বামীকৃত অমরকোষের টীকায়ও করণ বলিতে কায়স্থদের মতোই একশ্রেণীর রাজ-কর্মচারীকে বুঝানো হইয়াছে। চান্দেল্লরাজ ভোজবর্মার অজয়গড়লিপিতেও করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়া ধরা হইয়াছে। কায়স্থরা যে রাজকর্মচারী তাহা প্রাচীন বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য -স্মৃতিদ্বারাও সমর্থিত। বিষ্ণুস্মৃতিতে তাঁহারা রাজকীয় দলিল-পত্রাদির লেখক ছিলেন; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকাকার বলেন কায়স্থরা ছিলেন লেখক ও হিসাবরক্ষক। এখনও তো বিহার অঞ্চলে হিসাব রাখার লিখনপদ্ধতির যে বিশিষ্ট ধরন তাহাকে বলা হয় 'কাইথী' লিপি। বৃহদ্ধর্মপুরাণে করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলা হইয়াছে। উত্তর-বিহারে করণ সম্প্রদায় এখনও কায়স্থদেরই একটি শাখা বলিয়া পরিগণিত; উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থরা আজও অনেকে নিজেদের করণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মেদিনীপুরে, ওড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের করণরা চিত্র-গুপ্তকেই তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া মনে করেন; বাঙালী কায়স্থরাও তাহাই করেন। প্রাচীন কালে যাহাই হউক, পরবর্তী কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়াই বিবেচিত হইত। বাংলা-দেশে করণেরা ক্রমে কায়স্থ নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। যাহাই হউক, আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি অর্থাৎ মোটামুটি গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলার লিপিগুলিতে কায়স্থ শব্দের ব্যবহার যেমন পাইতেছি, তেমনই পাইতেছি করণ শব্দেরও। এ তথ্য মোটামুটি নিঃসংশয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, এই যুগের লিপিগুলিতে কায়স্থ কোন বর্ণ- বা উপবর্ণ -জ্ঞাপক শব্দ নয়—বৃত্তি-

বাচক শব্দ, অর্থাৎ কায়স্থরা এই যুগে এখনও বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠেন নাই। এই যুগের অন্তত দুইটি লিপিতে করণদের উল্লেখ পাইতেছি। গুনাইঘর পট্টোলীর লেখক সন্ধিবিগ্রহাধিক নরদত্ত ছিলেন করণ-কায়স্থ, এবং ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীর মহারাজ লোকনাথও নিজের পরিচয় দিতেছেন করণ বলিয়া। লোকনাথের করণ-পরিচয় অন্যদিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মাতামহ কেশবকে বলা হইয়াছে 'পারশব', পিতামহ 'দ্বিজবর', প্রপিতামহ 'দ্বিজসত্তমা', এবং বৃদ্ধ-প্রপিতামহ নাকি ছিলেন মুনি ভরদ্বাজের বংশধর। 'পারশব কেশব' কথার অর্থ তো এই যে, কেশবের ব্রাহ্মণ পিতা একজন শূদ্রাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বর ও শূদ্র কন্যার বিবাহ বোধ হয় তখনও সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। এক্ষেত্রে করণ বর্ণ- না বৃত্তি -বাচক শব্দ, তাহা কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না। এইটুকু বুঝা গেল, করণ বা কায়স্থ এখনও বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে বিবেচিত হইতেছে না; দুই শব্দেরই ব্যবহার মোটামুটি বৃত্তিবাচক, তবে বৃত্তি ক্রমশ বর্ণে বিধিবদ্ধ হইবার দিকে ঝুঁকিতেছে।

নামগুলির মধ্যে আর কোন্ কোন্ বর্ণ বা উপবর্ণ আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা বলিবার উপায় নাই; অন্ত্যনাম হিসাবে বর্মা কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যাইতেছে। এই যুগে বর্মণান্ত্য নাম উত্তর-ভারতের অন্যত্র ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক; কিন্তু বাংলায় অন্তত তেমন দাবি কেহ করিতেছেন না। রাজা-রাজন্যরা তো সাধারণত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিয়াই থাকেন, কিন্তু সমসাময়িক বাংলার রাজা-রাজন্যদের পক্ষ হইতেও তেমন দাবি কেহই জানান নাই। পরবর্তী পাল রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিও নিঃসংশয় নয়; কেবল বিদেশাগত কোন কোন রাজবংশ এই দাবি করিয়াছেন। বস্তুত, বাংলার স্মৃতি-পুরাণে-ঐতিহ্যে ক্ষত্রিয়-বর্ণের সবিশেষ দাবি কাহারও যেন নাই! নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী-ব্যবসায়ীর উল্লেখ এ যুগে প্রচুর; কিন্তু তাঁহাদের পক্ষ হইতেও বৈশ্যত্বের দাবি কেহ করিতেছেন না—সমসাময়িক কালে তো নয়ই, পরবর্তী কালেও নয়। বাংলার স্মৃতি-পুরাণ-ঐতিহ্যে বিশিষ্ট পৃথক বর্ণ হিসাবে বৈশ্যবর্ণের স্বীকৃতি নাই। বল্লাল-চরিত-গ্রন্থে বণিক-সুবর্ণবণিকদের বৈশ্যত্বের দাবি করা হইয়াছে; কিন্তু এ সাক্ষ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। অন্যত্র কোথাও কাহারও সে দাবি নাই; স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নাই, বৃহদ্ধর্ম- ও ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণে পর্যন্ত নাই। বস্তুত, বাংলাদেশে কোন কালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে গঠিত ও স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয় না; ইহার কারণ কী বলা কঠিন। বহুদিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন, বাংলার আর্যীকরণ ঋগ্বেদীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী হয় নাই, সেইজন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র লইয়া যে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজ, বাংলাদেশে তাহার প্রচলন নাই। বাংলার বর্ণসমাজ অ্যাল্পীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী গঠিত, এবং অ্যাল্পীয় আর্যভাষীরা ঋগ্বেদীয় আর্যভাষী হইতে পৃথক। চন্দ মহাশয়ের এই মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহার মধ্যে বাংলার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের প্রায়ানুপস্থিতির কারণ নিহিত থাকা অসম্ভব নয়। বাংলার বর্ণবিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের লইয়া গঠিত; করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য এবং অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্ত শূদ্র-পর্যায়ে; সর্বনিম্নে অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের এই বর্ণবিন্যাস পঞ্চম-অষ্টম শতকে খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও তাহার মোটামুটি কাঠামো এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পাঁচ

বর্ণ হিসাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের ইঙ্গিত-আভাস পরবর্তী পাল আমলেও দেখা যাইতেছে না। একমাত্র 'রামচরিত' গ্রন্থের টীকাকার পাল-বংশকে ক্ষত্রিয়-বংশ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষত্রিয় কি বর্ণ অর্থে ক্ষত্রিয়? রাজা-রাজন্য মাত্রই তো ক্ষত্রিয়; সমসাময়িক কালে সব রাজবংশই ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের দাবি করিয়াছে। তারানাথ তো বলিতেছেন, গোপাল ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জনৈক বৃক্ষ-দেবতার পুত্র; এ গল্প নিঃসন্দেহে টটেম-স্মৃতিবহ! আবুল ফজল বলেন, পাল রাজারা কায়স্থ; মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থ তাঁহাদের সোজাসুজি বলিয়াছে দাসজীবী। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তারানাথ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার দুইজনই বৌদ্ধ। পালেরা যে বর্ণ হিসাবে দ্বিজশ্রেণীর কেহ ছিলেন না, তারানাথ, আবুল ফজল এবং শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক সকলের ইঙ্গিতই যেন সেই দিকে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না।

করণ-কায়স্থদের অস্তিত্বের প্রমাণ অনেক পাওয়া যাইতেছে। রামচরিতের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা ছিলেন "করণানামগ্রণী", এবং পালরাষ্ট্রের সন্ধি-বিগ্রহিক। শব্দপ্রদীপ নামে একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থের লেখক আত্মপরিচয় দিতেছেন "করণান্বয়" অর্থাৎ করণ-বংশজাত বলিয়া; তিনি নিজে রাজবৈদ্য ছিলেন, তাঁহার পিতা ও প্রপিতামহ যথাক্রমে পালরাজ রামপাল ও বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থের লেখক শ্রীধরের (৯৯১ খ্রী) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাণ্ডুদাস; তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'কায়স্থকুলতিলক' বলিয়া। জজ্জ নামে গৌড়দেশবাসী এক করণিক খাজুরাহোর একটি লিপির (৯৫৩) লেখক। যুক্ত-প্রদেশের পিলিভিট্ জেলায় প্রাপ্ত দেবল প্রশস্তির (৯৯২) লেখক তক্ষাদিত্যও ছিলেন একজন গৌড়দেশবাসী করণিক। চাহমানরাজ রায়পালের নাডোললিপির লেখক ছিলেন (১১৪১) ঠক্কুর পেথড় নামে জনৈক গৌড়ান্বয় কায়স্থ। বীসলদেবের দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভলিপির (১১৬৩) লেখক শ্রীপতিও ছিলেন একজন গৌড়ান্বয় কায়স্থ। সমসাময়িক উত্তর ও পশ্চিম ভারতে করণ-কায়স্থেরা পৃথক স্বতন্ত্র বর্ণ বা বংশ বলিয়া গণ্য হইত, এ সম্বন্ধে অনেক লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের একটি লিপিতে (নবম শতক) বলভ-কায়স্থ বংশের উল্লেখ, ১১৮৩ বা ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি লিপিতে কায়স্থ বংশের উল্লেখ প্রভৃতি হইতে মনে হয় নবম-দশম-একাদশ শতকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই কায়স্থরা বর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাস্তু হইতে উদ্ভূত এই অর্থে বাস্তব্য কায়স্থের উল্লেখও একাধিক লিপিতে পাওয়া যাইতেছে। নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশেও করণ-কায়স্থেরা বর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে অন্তত একটি লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান।

কায়স্থদের বর্ণগত উদ্ভব সম্বন্ধে লিপিমালায় এবং অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নানা প্রকার কাহিনী প্রচলিত দেখা যায়। বেদব্যাসস্মৃতিমতে কায়স্থরা শূদ্রপর্যায়ভুক্ত। উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থের লেখক কবি সোড্ঢল (একাদশ শতক) কায়স্থবংশীয় ছিলেন; তাঁহার যে বংশপরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় কায়স্থরা ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিয়া দাবি করিতেন। ১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দের কলচুরীরাজ কর্ণের জনৈক কায়স্থ মন্ত্রীর একটি লিপিতে কায়স্থদের বলা হইয়াছে 'দ্বিজ'

(৩৪ শ্লোক); অন্য স্থানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে তাঁহারা ছিলেন শূদ্র। ব্রাহ্মণেরাও যে করণবৃত্তি গ্রহণ করিতেন তাহার একাধিক লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। করণিক শব্দ এইসব ক্ষেত্রে যে বৃত্তিবাচক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে, সাম্প্রতিক কালে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলার কায়স্থরা নাগর ব্রাহ্মণদের বংশধর, এবং এইসব নাগর ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবের নগরকোট, গুজরাট-কাথিয়াবাড়ের আনন্দপুর (অন্য নাম নগর) প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন। এই মত সকলে স্বীকার করেন না; এ সম্বন্ধে একাধিক বিরুদ্ধ যুক্তি যে আছে সত্যই তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পাল আমলের সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যত্র বৈদ্যবংশও পৃথক উপবর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থাদিতে বর্ণ হিসাবে বৈদ্যের উল্লেখ নাই; অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থে চিকিৎসাবৃত্তিধারী লোকদের বলা হইয়াছে বৈদ্যক। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ সমার্থক বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য দুই পৃথক উপবর্ণ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সহবাসে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ সংকর বর্ণের উল্লেখ একাধিক স্মৃতি ও ধর্মসূত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অম্বষ্ঠ-বৈদ্যের অভিন্নতা পরবর্তী কালে বাংলাদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু বাংলার বাহিরে সর্বত্র এই অভিন্নতা স্বীকৃত নয়; বর্তমান বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন কায়স্থ সম্প্রদায় নিজেদের অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; এবং অন্তত একটি অর্বাচীন সংহিতায় (সূত-সংহিতা) অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যদের অভিন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, দক্ষিণতম ভারতে অষ্টম শতকেই, কোন কোন লিপিসাক্ষ্য অনুযায়ী আরও কিছু আগেই, বৈদ্য উপবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বাংলার সমসাময়িক কোন লিপি বা গ্রন্থে এই অর্থে বা অন্য কোন অর্থে বৈদ্যক বা বৈদ্যবংশ বা বৈদ্যকুলের কোন উল্লেখ নাই। বস্তুত, তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তী পাল ও সেন-বর্মণ যুগে, একাদশ শতকের পাললিপিতে, দ্বাদশ শতকে শ্রীহট্ট জেলায় রাজা ঈশানদেবের ভাটেরালিপিতে। মনে হয়, একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে, অন্তত বাংলাদেশে, বৃত্তিবাচক বৈদ্য-বৈদ্যক শব্দ বর্ণ- বা উপবর্ণ -বাচক বৈদ্য শব্দে বিবর্তিত হয় নাই।

পাল আমলে কৈবর্তদের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বরেন্দ্রী-কৈবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সামন্ত কর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; অনন্তসামন্তচক্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপরায়ণ হইয়া রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন, এবং বরেন্দ্রী কাড়িয়া লইয়া সেখানে কৈবর্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বরেন্দ্রী কিছুদিনের জন্য দিব্য, রুদোক ও ভীম—এই তিন কৈবর্ত রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সমসাময়িক উত্তরবঙ্গসমাজে কৈবর্তদের সামাজিক প্রভাব ও আধিপত্য, জনবল ও পরাক্রম যথেষ্টই ছিল। বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদের বলা হইয়াছে অব্রহ্মণ্য। মনুস্মৃতিতে নিষাদ-পিতা এবং আয়োগব মাতা হইতে জাত সন্তানকে বলা হইয়াছে মার্গব বা দাস; ইঁহাদেরই অন্য নাম কৈবর্ত। মনু বলিতেছেন, ইঁহাদের উপজীবিকা নৌকার মাঝিগিরি। এই দুইটি প্রাচীন সাক্ষ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে, কৈবর্তরা কোন আর্যপূর্ব কোম বা গোষ্ঠী ছিল, এবং তাহারা ক্রমে আর্যসমাজের নিম্নস্তরে স্থানলাভ করিতেছিল। বৌদ্ধ জাতকের গল্পেও মৎস্যজীবীদের বলা হইয়াছে কেবত্ত—কেবর্ত। আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের কৈবর্তরা নৌকাজীবী বা মৎস্যজীবী। দ্বাদশ শতকে বাঙালী স্মৃতিকার ভবদেব

ভট্ট সমাজে কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে, রজক, কর্মকার, নট, বরুড়, মেদ, এবং ভিল্লদের সঙ্গে; এবং স্মরণ রাখা প্রয়োজন ভবদেব রাঢ়দেশের লোক। অমরকোষেও দেখিতেছি, দাস ও ধীবরদের বলা হইতেছে কৈবর্ত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ঐ সময়েও কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগাযোগের কোন সাক্ষ্য উপস্থিত নাই; কৈবর্তদের জীবিকাবৃত্তি যাহাই হউক, পালরাষ্ট্রের উদার সামাজিক আদর্শ কৈবর্তদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা- লাভ ও -সঞ্চয়ের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই; করিলে দিব্য এত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারিতেন না। সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাষ্ট্রের প্রসাদভোজী কবি; তিনি দিব্যকে দস্যু বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার বা তাঁহার শ্রেণীর বৃত্তি বা সামাজিক স্থান সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত তিনি করেন নাই। মনে হয়, সমাজে তাঁহাদের বৃত্তি বা স্থান কোনটাই নিন্দনীয় ছিল না। কৈবর্তরা যে মাহিষ্য, এ ইঙ্গিতও সন্ধ্যাকর কোথাও দিতেছেন না। একাদশ-দ্বাদশ শতকেও কৈবর্তরা বাংলাদেশে কেবট্ট বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্তত কেহ কেহ সংস্কৃতচর্চা করিতেন, কাব্যও রচনা করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ভক্ত অনুরাগী ছিলেন।

পালরাজাদের অধিকাংশ লিপিতে সমসাময়িক বর্ণসমাজের নিম্নতম স্তরের কিছু পরোক্ষ সংবাদ পাওয়া যায়। লিপিগুলির যে অংশে ভূমিদানের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে সেখানে রাজকর্মচারীদের সুদীর্ঘ তালিকার পরেই উল্লেখ করা হইতেছে ব্রাহ্মণদের, তাহার পরে প্রতিবাসী ও ক্ষেত্রকর এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান গৃহস্থ লোকদের (লক্ষণীয় যে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের কোন উল্লেখ নাই); ইঁহাদের পর একত্র করিয়া উল্লেখ করা হইতেছে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালদের। ভবদেব ভট্টের স্মৃতি-শাসনে চণ্ডাল অন্ত্যজ পর্যায়ের, চণ্ডাল এবং অন্ত্যজ এই দুই সমার্থক। মেদরাও অন্ত্যজ পর্যায়ের। মেদ ও চণ্ডালের সঙ্গে অন্ধ্রদের উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইঁহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল বাঙালী সমাজের নিম্নতম স্তরে। বেতনভুক সৈন্য হিসাবে মালব, খশ, কুলিক, হূণ, কর্ণাট, লাট প্রভৃতি বিদেশী ও ভিন্‌প্রদেশী অনেক লোক পালরাষ্ট্রের সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছিল, এই তালিকায় অন্ধ্রদের দেখা পাওয়া যায় না। ইঁহারা বোধ হয় জীবিকার্জনের জন্য নিজেদের দেশ ছাড়িয়া বাংলাদেশে আসিয়া এদেশের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং সামাজিক দৃষ্টিতে হেয় বা নীচ এমন কোন কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

ইঁহাদের ছাড়া চর্যাগীতে আরও কয়েকটি তথাকথিত নীচ জাতের খবর পাওয়া যাইতেছে, যথা ডোম বা ডোম্ব, চণ্ডাল, শবর ও কাপালি।

ডোমেরা সাধারণত নগরের বাহিরে কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত, বাঁশের তাঁত ও চাঙারি তৈরি করিয়া বিক্রয় করিত এবং ব্রাহ্মণস্পর্শ তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল। ডোম পুরুষ ও নারী নৃত্যগীতে সুপটু ছিল। কপালী বা কাপালি(ক)রাও নিম্নস্তরের লোক বলিয়া গণ্য হইত। ভবদেব ভট্ট চণ্ডাল ও পুক্কশদের সঙ্গে কাপালিকদের অন্ত্যজপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কাপালিকরা ছিল লজ্জাঘৃণাবিরহিত, গলায় পরিত হাড়ের মালা, দেহগাত্র থাকিত প্রায় উলঙ্গ। শবরেরা বাস করিত পাহাড়ে জঙ্গলে, ময়ূরের পাখ ছিল তাহাদের পরিধেয়, গলায় গুঞ্জাবীচির মালা, কর্ণে বজ্রকুণ্ডল।

শবর-শবরীদের গানের একটা বিচিত্র ধরন ছিল; সেই ধরন শবরী-রাগ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। *একাধিক চর্যাগীতির ইঙ্গিতে মনে হয় ডোম্ব ও চণ্ডাল*

অভিন্ন; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ডোম ও চণ্ডাল উভয়েই অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যপর্যায়ভুক্ত; কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত। চর্যাপদের সাক্ষ্য হইতে এই ধারণা করা চলে যে, সমাজের উচ্চতর শ্রেণী ও বর্ণের দৃষ্টিতে ইহাদের যৌন আদর্শ ও অভ্যাস শিথিল ছিল। পরবর্তী পর্বে দেখা যাইবে, এই শৈথিল্য উচ্চশ্রেণীর ধর্মকর্মকেও স্পর্শ করিয়াছিল।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণ-উপবর্ণের এই চিত্রে দেখা যাইতেছে এ যুগের রাষ্ট্রদৃষ্টি বর্ণসমাজের নিম্নতম স্তর চণ্ডাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বর্ণসমাজের মাপকাঠি ব্রাহ্মণ স্বয়ং এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও ধর্ম। সমাজে ইঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিস্তার ও গভীরতার দিকে তাকাইলেই বর্ণসমাজের ছবি স্পষ্টতর ধরিতে পারা যায়।

পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রসার আগেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সমাজে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ প্রসারিত হইতেছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ ও মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার শশাঙ্ককে বলিয়াছেন বৌদ্ধবিদ্বেষী। এই দুই সাক্ষ্যের একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি নদীয়া রুগসমাজের কুলজীগ্রন্থেও আছে। বাংলার বাহির হইতে ব্রাহ্মণাগমনের যে ঐতিহ্য কুলজীগ্রন্থে বিধৃত তাহার সূচনা দেখিতেছি শশাঙ্কের সঙ্গে জড়িত। কুলজীগ্রন্থের অন্য অনেক গল্পের মতো এই গল্পও হয়তো বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু এই ঐতিহ্য-ইঙ্গিত সর্বথা মিথ্যা না-ও হইতে পারে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ। সমসাময়িক কাল যে প্রাগ্রসরমাণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিরই কাল তাহা তো নানাদিক হইতে সুস্পষ্ট। য়ুয়ান-চোয়াঙ, ইৎসিঙ, সেংচি প্রভৃতি চীন ধর্মপরিব্রাজকেরা যেসব বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান করা চলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থাও বেশ সমৃদ্ধই ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ তথ্য অনস্বীকার্য যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা তাহার চেয়েও অনেক বেশি সমৃদ্ধতর ছিল। বাংলার সর্বত্র ব্রাহ্মণ দেবপূজকদের সংখ্যা সৌগতদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল, এ তথ্য য়ুয়ান-চোয়াঙই রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের তথা বর্ণব্যবস্থার প্রসার বাড়িয়াই চলিয়াছিল, এ সম্বন্ধে দেবদেবীর মূর্তি-প্রমাণই যথেষ্ট। জৈন ধর্ম ও সংস্কার তো ধীরে ধীরে বিলীন হইয়াই যাইতেছিল। আর, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কারও ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শকে যে ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতেছিল পাল-চন্দ্র-কম্বোজ রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের দিকে তাকাইলেই তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিতেছেন, মাৎস্যন্যায়ের পর গোপালের অভ্যুদয়কালে সমুদ্রতীর পর্যন্ত স্থান তীর্থিক (ব্রাহ্মণ?)দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল; বৌদ্ধমঠগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগের সামাজিক অবস্থাটা দেখা যাইতে পারে। এ তথ্য সুবিদিত যে পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের তাঁহারা পরম পৃষ্ঠপোষক; ওদন্তপুরী, সোমপুর এবং বিক্রমশীল মহাবিহারের তাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা; নালন্দা মহাবিহারের তাঁহারা ধারক ও পোষক। বাংলাদেশে যত বৌদ্ধ মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই এই যুগের; যত অসংখ্য বিহারের উল্লেখ পাইতেছি সমস্ত বিহারও এই যুগের; দেশ-বিদেশ-প্রখ্যাত যেসব বৌদ্ধ পণ্ডিতাচার্যদের উল্লেখ পাইতেছি তাহাও এই যুগের। চন্দ্রবংশও বৌদ্ধ; জিন (বুদ্ধ), ধর্ম ও সংঘের স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া চন্দ্রবংশীয় লিপিগুলির সূচনা; ইঁহাদের

রাজ্য হরিকেল তো বৌদ্ধতান্ত্রিক পীঠগুলির অন্যতম পীঠ। ভিন্নপ্রদেশাগত কম্বোজ রাজবংশও বৌদ্ধ, পরমসুগত।

অথচ, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সমাজাদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্যসংস্কারানুযায়ী, ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী। প্রায় সর্বত্রই ভূমিদান লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা, এবং সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণদের সম্মাননা না করিয়া কোন দানকার্যই সম্পন্ন হইতেছে না। তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি রাষ্ট্রের ও সমাজের সর্বত্র। লিপিগুলিতে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী এবং মন্দির ইত্যাদির উল্লেখ বারংবার দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত, পালযুগের লিপিমালা পাঠ করিলেই এ তথ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এইসব লিপির রচনা আগাগোড়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, ভাবকল্পনা, এবং উপমালংকার দ্বারা আচ্ছন্ন— ইঁহাদের ভাবাকাশ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের আকাশ। তাহা ছাড়া বৌদ্ধ পালরাষ্ট্র যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা পুরোপুরি স্বীকার করিত তাহার অন্তত দুটি উল্লেখ পাললিপিতে আছে। দেবপালদেবের মুঙ্গেরলিপিতে ধর্মপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি "শাস্ত্রার্থের অনুবর্তী শাসনকৌশলে (শাস্ত্রশাসন হইতে) বিচলিত (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন।" মাৎস্যন্যায়ের পরে নূতন করিয়া শাস্ত্রশাসনানুযায়ী বিভিন্ন বর্ণগুলিকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ হয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। আমগাছিলিপিতেও দেখিতেছি তৃতীয় বিগ্রহপালকে "চাতুর্বর্ণ্য-সমাশ্রয়" বা বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ছয়

পালরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্র সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। দেখিতেছি, বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্র যথারীতি পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া দুইবার ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিলেন—উভয় ক্ষেত্রেই দানকার্যটি সম্পন্ন হইল বুদ্ধভট্টারকের নামে এবং ধর্মচক্রদ্বারা শাসনখানা পট্টীকৃত করিয়া। কম্বোজরাজ পরমসুগত নয়পালদেব একটি গ্রাম দান করিলেন ভট্টপুত্র পণ্ডিত অশ্বত্থশর্মাকে; এবং এই দানকার্যের যাঁহারা সাক্ষী রহিলেন তাঁহাদের মধ্যে পুরোহিত, ঋত্বিক এবং ধর্মজ্ঞ অন্যতম। এই দুই রাষ্ট্রেই ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, পুরোহিত, শান্তিবারিক ইত্যাদি ব্রাহ্মণেরা রাজপুরুষ, এই তথ্যও লক্ষণীয়।

বস্তুত, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। এই যুগে সমাজব্যবস্থাব্যাপারে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে কিছু পার্থক্য ছিল না। সামাজিক ব্যাপারে বৌদ্ধেরাও মনুর শাসন মানিয়া চলিতেন। তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং অন্যান্য তিব্বতী বৌদ্ধগ্রন্থের সাক্ষ্য হইতেও অনুমান হয়, বর্ণাশ্রমী হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন সামাজিক পার্থক্যই ছিল না। যাঁহারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমশাসন প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু যাঁহারা গৃহী বৌদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে প্রচলিত বর্ণশাসন মানিয়াই চলিতেন। বৌদ্ধপণ্ডিতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে ধর্ম ও সামাজিক মতামত লইয়া দ্বন্দ্ব-কোলাহলের প্রমাণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু বৌদ্ধরা পৃথক সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তারানাথ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ আচার্যরা যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, পাল-

যুগের মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ তন্ত্রধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল, এবং ধর্মাদর্শ ও ধর্মানুষ্ঠান, পূজা-প্রকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন নূতন মত ও পথের উদ্ভব ঘটিতেছিল। তন্ত্রধর্মের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছিল, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভেদ কোন কোন ক্ষেত্রে ঘুচিয়া যাইতেছিল।

ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালনের দায়িত্ব এই যুগের বৌদ্ধ রাষ্ট্রও স্বীকার করিত। কিন্তু বর্ণ-বিন্যাস এবং প্রত্যেক বর্ণের সীমা পরবর্তী কালে যতটা দৃঢ়, অনমনীয় এবং সুনির্দিষ্ট রূপে বাঁধা পড়িয়াছিল, এই যুগে তাহা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, বাংলাদেশ তখনও পর্যন্ত তাহার নিজস্ব স্মৃতিশাসন গড়িয়া তোলে নাই; বস্তুত, স্মৃতিশাস্ত্র রচনার সূত্রপাতই তখনও হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এই যুগের সব ক'টি রাষ্ট্র এবং রাজবংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধসংস্কারাশ্রয়ী; ইঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার ধারক ও পালক হইলেও উত্তর- বা দক্ষিণ -ভারতের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসন ইঁহাদের নিকট একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, পালরাজবংশ উচ্চবর্ণোদ্ভব নন এবং উচ্চবর্ণোদ্ভব ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বর্ণশাসনের স্মৃতিসুলভ সুদৃঢ় আচার-বিচার বা স্তর-উপস্তরভেদ সম্বন্ধে খুব নিষ্ঠাপরায়ণও ছিলেন না। চতুর্থত, বাঙালী সমাজের অধিকাংশ লোকই তখনও বর্ণাশ্রমবহির্ভূত। ক্রমশ বর্ণাশ্রমের সীমার মধ্যে যাহারা আসিয়া অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল তাহারা সকলেই আর্যপূর্ব কৌম-সমাজের ও সেই সমাজগত সংস্কার ও সংস্কৃতির লোক। ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা, সংস্কার ও সংস্কৃতি তাহারা মানিয়া লইতেছিল অর্থনৈতিক আধিপত্যের চাপে পড়িয়া। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের সূত্রের মধ্যে তাহাদের গাঁথিয়া লওয়া খুব সহজ হয় নাই; অন্তত পাল ও চন্দ্র রাষ্ট্র সচেতন ও সক্রিয় ভাবে সেদিকে চেষ্টা কিছু করিয়াছিল বলিয়া তো মনে হয় না, প্রমাণও কিছু নাই। রাষ্ট্রীয় চাপ সেদিকে কিছু ছিল না; রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিও এ বিষয়ে উদার ছিল।

সাত

পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রে ও তাহাদের কালে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের আদর্শ ছিল উদার ও নমনীয়; কম্বোজ-সেন-বর্মণ আমলে সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন চেষ্টার ফলে এই আদর্শ হইল সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট। যে বর্ণবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থা আজও বাংলাদেশে প্রচলিত ও স্বীকৃত তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল এই যুগে দেড় শতাব্দীর মধ্যে।

কম্বোজ রাজবংশকে অবলম্বন করিয়াই এই বিবর্তনের সূচনা অনুসরণ করা যাইতে পারে। এই পার্বত্য কৌমটি বোধ হয় বাংলাদেশে আসার পর আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি আশ্রয় করেন। প্রথম রাজা রাজ্যপাল ছিলেন বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল হইলেন বাসুদেবের ভক্ত। নারায়ণপালের ছোট ভাই সম্রাট নয়পাল জনৈক ব্রাহ্মণকে বর্ধমানভুক্তিতে কিছু ভূমি দান করেন। বৌদ্ধ রাজার বংশধরদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় লইতে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, সমাজচক্র কোন দিক দিয়া ঘুরিতেছে। পালবংশের শেষের দিকেও একই চিহ্ন সুস্পষ্ট। পালবংশ

ও পালরাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিয়া সেনবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল; চন্দ্রবংশকে বিলুপ্ত করিয়া হইল বর্মণবংশের প্রতিষ্ঠা। যে দুইটি বংশ ও রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইল তাহারা উভয়েই বাঙালী ও বৌদ্ধ, এবং যে দুইটি বংশ ও রাষ্ট্র নূতন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারা উভয়েই ভিন্‌প্রদেশাগত, উভয়েই অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে এই দুইটি তথ্যই অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ।

সেন রাজবংশ কর্ণাটাগত; তাঁহারা আগে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে যোদ্ধৃবৃত্তি গ্রহণ করিয়া হইলেন ক্ষত্রিয়, এবং পরিচিত হইলেন ব্রহ্মক্ষত্ররূপে। বর্মণ বংশ কলিঙ্গাগত বলিয়া অনুমিত; এবং বর্ণ হিসাবে ক্ষত্রিয়। দক্ষিণদেশ সাতবাহন এবং তৎপরবর্তী সালঙ্কায়ন, বৃহৎফলায়ন, আনন্দ, পল্লব, কদম্ব প্রভৃতি রাজবংশের সময় হইতেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কেন্দ্র। দক্ষিণদেশের এই নিষ্ঠাপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার লইয়া সেন ও বর্মণ রাজবংশ বাংলাদেশে আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। পালবংশের শেষের দিকে এবং কম্বোজ রাজবংশে ব্রাহ্মণ্য বিবর্তনের সূত্রপাত কিছু কিছু দেখা দিয়াছিল। এখন, দেখিতে দেখিতে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ব্রতানুষ্ঠান দ্রুত প্রসারিত হইল। সহজ স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় এই দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয় নাই; পশ্চাতে ছিল রাষ্ট্রের ও রাজবংশের সক্রিয় উৎসাহ, অমোঘ ও সচেতন নির্দেশ।

এ বিষয়ে লিপিপ্রমাণগুলিই আগে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্মণ বংশ পরম বিষ্ণুভক্ত। এই রাজবংশের যে বংশাবলী ভোজবর্মার বেলাবলিপিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার গোড়াতেই ঋষি অত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি, ইঁহাদেরই বংশে নাকি বর্মণ পরিবারের অভ্যুদয়। রাজা জাতবর্মা দিব্যকেও পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এই দিব্য যে বরেন্দ্রীর কৈবর্তনায়ক দিব্য ইহা বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহার জাতবর্মার সৈন্যরা পুড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি বর্মণরাষ্ট্রের মনোভাব কিরূপ ছিল এই ঘটনা হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই বর্মণরাষ্ট্রেরই অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট ভবদেব অগস্ত্যের মতো বৌদ্ধ-সমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এবং পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের (বৌদ্ধদের নিশ্চয়ই, বোধ হয় নাথপন্থীদেরও) যুক্তিতর্ক খণ্ডনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন। জাতবর্মার পরবর্তী রাজা সামলবর্মা কুলজী-গ্রন্থের রাজা শ্যামলবর্মণ; এবং এই শ্যামলবর্মার নামের সঙ্গেই এবং অন্যমতে তাঁহারই পূর্ববর্তী রাজা হরিবর্মার সঙ্গে কান্যকুব্জাগত বৈদিক ব্রাহ্মণদের শকুনসত্র যজ্ঞের কিংবদন্তী জড়িত। সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মাকে পৌণ্ড্রভূমিতে কিছু জমি দান করিয়াছিলেন। ভট্ট ভবদেবের লিপিতে সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শ, সমাজ ও শিক্ষাদর্শ ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক খবর পাওয়া যায়। ভবদেবের মাতা সাঙ্গোক ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের "গাঞী"-পরিচয় বিভাগ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে আর তাহা হইলে কোন সন্দেহই রহিল না। ভবদেব সমসাময়িক কালের বাঙালী চিন্তানায়কদের অন্যতম; তিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফলসংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিলভট্টের মীমাংসাগ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতিগ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক, অর্থশাস্ত্র,

আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র, অস্ত্রবেদেও তিনি সুপণ্ডিত। তাঁহার কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি বা দশকর্মপদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ আজও প্রচলিত। পরবর্তী বাঙালী স্মৃতি- ও মীমাংসা -লেখকেরা ভবদেবের উক্তি ও বিচার বারবার আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুত, বাঙালীর সর্বপ্রকার সমাজকর্মের রীতি-পদ্ধতি বিধিনিয়ম সুনির্দিষ্ট সূত্রে গ্রথিত হইয়া সমাজশাসনের একান্ত ব্রাহ্মণতান্ত্রিক, পুরোহিততান্ত্রিক নির্দেশ এই সর্বপ্রথম দেখা দিল। ভবদেব ভট্ট পালযুগের শেষ আমলের লোক; এই সময় হইতেই এই একান্ত ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজশাসনের সূচনা এবং ভবদেবভট্টই তাহার আদিগুরু। বর্মণরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রসারের প্রথম কেন্দ্রস্থল হইল একদিকে রাঢ়দেশ, এবং কিছু পরবর্তী কালে, আর-একদিকে বিক্রমপুর।

বর্মণরাষ্ট্রে যাহার সূচনা সেনরাষ্ট্রে তাহার প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ্য সমাজ এই সময় হইতেই আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়কর্ম হইয়া উঠিল। এই সংরক্ষণী মনোবৃত্তির একটা কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। আগে দেখিয়াছি, ভবদেব ভট্ট বৌদ্ধদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধিত ছিলেন। সেন আমলে এই মনোবৃত্তি তীব্রতর হইয়া দেখা দিল। পাল আমলে বৌদ্ধ দেবদেবীরাও কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছিলেন, এবং শেষোক্ত দেব-দেবীরাও বৌদ্ধ ও শৈব তন্ত্রে স্থান পাইতেছিলেন। বৌদ্ধসাধনমালায় ব্রাহ্মণ্য মহাকাল ও গণপতির স্থান, বৌদ্ধতন্ত্রে ব্রাহ্মণ্য লিঙ্গ এবং শৈব দেবদেবীদের স্থানলাভ পালযুগেই ঘটিয়াছিল। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদির আচারানুষ্ঠান, সাধনপদ্ধতি, সাধনাদর্শ প্রভৃতি ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূজানুষ্ঠান প্রভৃতিকেও স্পর্শ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিভূদের কাছে তাহা ভাল লাগিবার কথা নয়, বিশেষত ভিন্নপ্রদেশাগত বর্মণ ও সেন রাষ্ট্রের প্রভুদের কাছে।

ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই সংরক্ষণী মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিল। আদিধর্মশাস্ত্রলেখক জিতেন্দ্রিয় ও বালকের কোন রচনা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; কিন্তু এই দুইজনেরই মতামত আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মার্ত ও ধর্মশাস্ত্র লেখকেরা। জীমূতবাহনও এই যুগেরই লোক, এবং তিনি সুবিখ্যাত ব্যবহারমাতৃকা, দায়ভাগ এবং কালবিবেক গ্রন্থের রচয়িতা। জীমূতবাহনের পরেই নাম করিতে হয় বল্লালসেনের গুরু, হারলতা এবং পিতৃ-দয়িতা গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা অনিরুদ্ধভট্টের। তিনি শুধু মহামহোপাধ্যায় রাজগুরু ছিলেন না, সেনরাষ্ট্রের ধর্মাধ্যক্ষও ছিলেন। অনিরুদ্ধের বসতি ছিল বরেন্দ্রীর অন্তর্গত চম্পাহিটি গ্রামে এবং কুলজীগ্রন্থের মতে চম্পটি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের অন্যতম গাঞী। অনিরুদ্ধশিষ্য রাজা বল্লালসেন স্বয়ং একাধিক স্মৃতিগ্রন্থের লেখক। তদ্রচিত আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর আজও অনাবিষ্কৃত; কিন্তু দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর বিদ্যমান। ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য রচয়িতা গুণবিষ্ণুও এই যুগের লোক। কিন্তু এইসব স্মৃতি-ব্যবহার-ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছেন লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ। হলায়ুধ স্বয়ং সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, এবং পণ্ডিতসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এক কথায়

বলা যাইতে পারে, যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি- ও ব্যবহার -শাসন পরবর্তী কালে শূলপাণি-রঘুনন্দন কর্তৃক আলোচিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া আজও বাংলাদেশে প্রচলিত তাহার সূচনা এই যুগে—বর্মণ ও সেন রাষ্ট্রের ছত্রচ্ছায়ায়। এই যুগে রচিত স্মৃতি- ও ব্যবহার -গ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণসমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট। স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, সম্পত্তি-বিভাগ, আহার-বিহারের বিচিত্র বিধিনিষেধ, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রপাঠের নিয়ম ও কাল—এক কথায় দ্বিজবর্ণের জীবনশাসনের কোন নির্দেশই এইসব গ্রন্থ হইতে বাদ পড়ে নাই। এই যুগের স্মৃতিশাসনই পরবর্তী বাংলার ব্রাহ্মণতন্ত্রের ভিত্তি।

রাষ্ট্রে এই একান্ত ব্রাহ্মণতান্ত্রিক স্মৃতিশাসনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। তাহা না হইবার কারণ নাই, কারণ ভবদেবের বংশ, হলায়ুধের বংশ, অনিরুদ্ধ ইঁহারা তো সকলেই রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি এবং সে রাষ্ট্রের নায়ক হরিবর্মা, সামল (শ্যামল) বর্মা, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন। শেষোক্ত দুইজন নিজেরাই স্মৃতিশাসনের রচয়িতা। তাহা ছাড়া শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারিধিকৃত, শান্তিবারিক, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, ব্রাহ্মণ-রাজপণ্ডিত ইঁহারা রাজপুরুষ হিসবে স্বীকৃত হইতেছেন এই যুগেই—কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রে। পাল আমলে কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে ইঁহাদের কোন স্থান নাই।

বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরম মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব; লক্ষ্মণ-সেন কিন্তু পরম বৈষ্ণব; লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশব উভয়েই সৌর অর্থাৎ সূর্যভক্ত। সেনবংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়াছিলেন। সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-দের অজস্র কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকার্যে বিজয়সেনের কখনও কোন ক্লান্তি ছিল না। বল্লালসেনের নৈহাটিলিপি আরম্ভ হইয়াছে অর্ধনারীশ্বরকে বন্দনা করিয়া; বল্লালসেন এই লিপি দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত তাঁহার মাতার ভূমিদান অনু-মোদিত ও পট্টীকৃত করেন। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়ালিপির ভূমিদানগ্রহীতা হইতেছেন কৌশিকগোত্রীয়, যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রঘুদেব শর্মা। লক্ষ্মণসেন যে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ধান্যশস্যপ্রসূ উপবনসমৃদ্ধ বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহাও এই লিপিতে উল্লেখ আছে। এই রাজার গোবিন্দপুর পট্টোলীর ভূমিদানগ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ। এই ভূমিদানকার্য প্রথম করা হইয়াছিল লক্ষ্মণসেনের অভিষেক উপলক্ষে। এই ভূমির সীমানির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, পূর্বদিকে বৌদ্ধ বিহারদেবতার এক আঢ়বাপ নিষ্কর ভূমির পূর্বসীমা আলি। সেনবংশের লিপিমালার মধ্যে এই একটিমাত্র স্থানে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ পাওয়া গেল; বরেন্দ্রীতে তাহা হইলে দ্বাদশ শতকের শেষপাদেও বৌদ্ধধর্মের প্রকাশ্য অস্তিত্ব ছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগরলিপি এবং সুন্দরবনলিপিতেও কয়েকজন শান্ত্যা-গারিক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের খবর পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন ধান্য-শস্যক্ষেত্র- ও অট্টালিকা -পূর্ণ বহু প্রসিদ্ধ গ্রাম ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আর-এক পুত্র বিশ্বরূপসেন নীতিপাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই রাজারই অন্য আর-একটি লিপিতে দেখিতেছি, হলায়ুধ নামে বাৎস্যগোত্রীয়, যজুর্বেদীয়, কাণ্বশাখাধ্যায়ী জনৈক ব্রাহ্মণ প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেববংশের লিপিগুলিতেও অনুরূপ সংবাদ

পাওয়া যাইতেছে। এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এবং বিষ্ণুভক্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা দামোদর যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধরশর্মাকে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই বংশেরই আর-একজন রাজা, অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীদশরথ-দেবের (=কুলজীগ্রন্থের দনুজমাধব=মুসলমান ঐতিহাসিকদের সোনারগাঁর রাজা, দনুজ রায়) আদাবাড়িলিপি দ্বারা যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করা হইয়াছে তাঁহাদের গাঞী-পরিচয় আছে। গাঞীপ্রথার প্রচলন ভবদেব ভট্টের কালেই আমরা দেখিয়াছি: বোধ হয় তাহারও বহু পূর্বে গুপ্ত আমলেই এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে (গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে বন্দ্য, চট্ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য পদবী-পরিচয় গাঞী পরিচয় হওয়াই সম্ভব, এ কথা আগেই বলিয়াছি)। ত্রয়োদশ শতকে এই প্রথা একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আদাবাড়িলিপির গাঞী-তালিকায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় গাঞী-পরিচয়ই মিলিতেছে।

এই সুবিস্তৃত লিপিসংবাদ হইতে কয়েকটি তথ্য সুস্পষ্ট দেখা দিতেছে। প্রথমত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও রাজবংশের সুদীর্ঘ দান-তালিকায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘে একটি দানের উল্লেখও নাই অথচ বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব তখনও ছিল, লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘিলিপি, রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেবের (১২২০) পট্টিকেরালিপিতেই তাহার প্রমাণ আছে। পঞ্চরক্ষা নামক মহাযানগ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকা অংশে জানা যায় ১২১১ শকে (=১২৮৯) মধুসেন নামক একজন বৌদ্ধ রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। বর্মণরাষ্ট্রেও বৌদ্ধ মহাযান মতের অস্তিত্ব ছিল। লঘুকালচক্র নামক মহাযান গ্রন্থের বিমলপ্রভা নামীয় টীকার একটি পুথি লেখা হইয়াছিল হরিবর্মা দেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে। যশোর কি ফরিদপুর অঞ্চলে পঞ্চদশ শতকেও বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় ১৪৯২ সংবতের (=১৪৩৬) মহাযান মতের বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের একটি অনুলিপি হইতে। পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের আমলে বৌদ্ধ রাজবংশের যে ঔদার্য ছিল সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সে ঔদার্যের এতটুকু চিহ্ন কোথাও দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের সেই উদারতার যুগ আর ছিল না। দ্বিতীয়ত, সেন-বর্মণ-দেব রাষ্ট্র ও রাজবংশ বাংলার অতীত সামাজিক বিবর্তনের ধারা, বিশেষভাবে, গৌরবময় পাল-চন্দ্র যুগের ধারা, গতি-প্রকৃতি ও আদর্শ একেবারে অস্বীকার করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ বাংলাদেশে পুনঃপ্রবর্তন করিতে চাহিয়া-ছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কালিদাস-ভবভূতি যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সমাজজীবনে সঞ্চার করিবার প্রয়াস লিপিগুলিতে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে সুস্পষ্ট।

ইহাই ব্রাহ্মণ্য সেন-রাষ্ট্রের ভাবপরিমণ্ডল।

কনক-তুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ; গোত্র, প্রবর, গাঞী প্রভৃতির বিশদ বিস্তৃত পরিচয়োল্লেখ; নীতিপাঠক শান্ত্যাগারিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের উপর রাষ্ট্রের কৃপাবর্ষণ ইত্যাদির সামাজিক ইঙ্গিত হইতেছে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রচলন এবং পাল-চন্দ্র যুগের সমন্বয় ও সমীকরণাদর্শের বিলোপ। বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সহজ স্বাভাবিক বিবর্তিত সমন্বয় নয়, ঔদার্যময় বিন্যাস নয়, এক বর্ণ, এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের

একাধিপত্যই সেন-বর্মণ যুগের একতম কামনা ও আদর্শ। সে বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ। সে ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এবং সে সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। এই কালের স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসা -গ্রন্থে আগেই দেখিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের জয়জয়কার; লিপিমালায়ও তাহাই দেখিলাম।

ভিন্-প্রদেশী বর্মণ ও সেন আধিপত্য সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই (তখন পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়) বাংলার ইতিহাসচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া গেল। বৈদিক, আর্য ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বাংলাদেশে গুপ্ত আমল হইতেই সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সে প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর ধরিয়া এই প্রবাহ চলিয়াছে। বৌদ্ধ খড়্গ-পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের কালেও তাহা ব্যাহত হয় নাই; বরং আমরা দেখিয়াছি সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে এইসব রাষ্ট্র ও রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও অনুশাসনকেই মানিয়া চলিত। বৌদ্ধ বলিয়াই হউক বা অন্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণেই হউক, পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের একটা ঔদার্য ছিল—ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শকেই একটা বৃহত্তর সমন্বিত ও সমীকৃত আদর্শের রূপ দিবার সজাগ চেষ্টা ছিল। সেন-বর্মণ আমলে কিন্তু সমাজব্যবস্থায় কোন ঔদার্য, অন্যতর আদর্শ ও ব্যবস্থার কোন স্বীকৃতিই আর রহিল না; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং তদনুযায়ী সমাজ ও বর্ণ-ব্যবস্থা একান্ত হইয়া উঠিল।

ফল যাহা ফলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফলিল। বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাহার পরিপূর্ণ রূপ দেখিতেছি সমসাময়িক স্মৃতিগ্রন্থাদিতে, বৃহদ্ধর্মপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে, সমসাময়িক লিপিমালায় এবং কিছু কিছু পরবর্তী কুলজীগ্রন্থমালায়।

ব্রাহ্মণতান্ত্রিক বর্ণব্যবস্থার চূড়ায় থাকিবেন স্বয়ং ব্রাহ্মণেরা—ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। নানা গোত্র, প্রবর ও বিভিন্ন বৈদিক শাখানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণেরা যে পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই উত্তর-ভারত হইতে বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তো আমরা আগেই দেখিয়াছি। "মধ্যদেশ-বিনির্গত" ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অষ্টম শতক হইতে ক্রমশ বাড়িয়াই যাইতে আরম্ভ করিল; ভিন্‌দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পরিবারদের বাংলাদেশে আসিয়া বসবাসের দৃষ্টান্ত এ যুগের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা এদেশে আসিয়া পূর্বাগত ব্রাহ্মণদের এবং তাঁহাদের অগণিত বংশধরদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক।

কুলজীগ্রন্থের আদিশূর-কাহিনীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বর্ণকাহিনী রচনার প্রয়োজন নাই; লিপিমালা ও সমসাময়িক স্মৃতিগ্রন্থাদির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই দেখিতেছি চট্ট, বন্দ্য ইত্যাদি গ্রামের নামে পরিচয় দিবার একটি রীতি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যাইতেছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে কিন্তু এই রীতি একেবারে সুনির্দিষ্ট সীমায় প্রথাবন্ধ নিয়মবন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভবদেব ভট্টের মাতা বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণকন্যা; টীকাসর্বস্ব গ্রন্থের রচয়িতা আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ (১১৫৯-৬০) বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ; ভবদেব স্বয়ং এবং শান্ত্যাগারাধিকৃত ব্রাহ্মণ রামদেব-শর্মা উভয়েই সাবর্ণগোত্রীয় এবং সিদ্ধলগ্রামীয়; বল্লালগুরু অনিরুদ্ধভট্ট চম্পাহিটী বা চম্পহট্টীয় মহামহোপাধ্যায়; জীমূতবাহন আত্মপরিচয় দিয়াছেন পারিভদ্রীয় বলিয়া। দশরথদেবের আদাবাড়ীলিপিতে দিণ্ডী, পালি বা পালী, সেউ, মাসচটক বা মাসচড়ক, মূল, সেহন্দায়ী, পূতি, মহান্তিয়াড়া এবং করঞ্জ প্রভৃতি গাঞী-

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হলায়ুধের মাতৃপরিচয় গোচ্ছাষণ্ডী-গ্রামীয়রূপে; লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি শ্রীনিবাসের মহিন্তাপনীবংশ-পরিচয়ও গাঞী-পরিচয়। বরেন্দ্রীর তটক, মৎস্যাবাস; রাঢ়ার ভূরিশ্রেষ্ঠী, পূর্বগ্রাম, তালবাটী, কাঞ্জিবিল্লী এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক গ্রামের (যথা ভট্টশালী, শকটী, রত্নমালী, তৈলপাটী, হিজ্জলবন, চতুর্থ খণ্ড, বাপড়লা) ব্রাহ্মণদের উল্লেখ সমসাময়িক লিপি ও গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইতেছে। সংকলয়িতা শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত (১২০৬) গ্রন্থেও দেখিতেছি বাঙালী ব্রাহ্মণদের নামের সঙ্গে—বর্তমান ক্ষেত্রে নামের পূর্বে—গ্রামের নাম অর্থাৎ গাঞী-পরিচয় ব্যবহারের রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যথা ভট্টশালীয় পীতাম্বর, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক, কেশরকোলীয় নাথোক, বন্দিঘটীয় সর্বানন্দ, ইত্যাদি। এইসব গাঞী-পরিচয় অল্পবিস্তর পরিবর্তিত রূপে কুলজীগ্রন্থমালার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পঞ্চগোত্রে বিভক্ত ১৫৬টি গাঞী-পরিচয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। কালক্রমে এই গাঞী-পরিচয়প্রথা বিস্তৃত হইয়াছে, বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত হইয়াছে; এই সীমিত, বিধিবদ্ধ প্রথারই অস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাইতেছি কুলজীগ্রন্থমালায়।

কিন্তু গাঞী-বিভাগ অপেক্ষাও সামাজিক দিক হইতে গভীর অর্থবহ বিভাগ ব্রাহ্মণদের ভৌগোলিক বিভাগ। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব প্রামাণ্য গ্রন্থ, এবং তাহার রচনাকালও সুনির্দিষ্ট। এই গ্রন্থে হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যথার্থ বেদবিদ্ ছিলেন না; ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল, তাঁহার মতে, উৎকলে ও পাশ্চাত্ত্যদেশসমূহে। হলায়ুধের সাক্ষ্য হইতে দেখিতেছি, দ্বাদশ শতকেই জনপদবিভাগানুযায়ী ব্রাহ্মণদের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; এবং লিপিসাক্ষ্য হইতে জানা যায়, এইসব ব্রাহ্মণেরা রাঢ় ও বরেন্দ্রীর বাহিরে পূর্ববঙ্গেও বসতি স্থাপন করিতেছেন। কুলজীগ্রন্থমালায় দেখা যায় কায়স্থ, বৈদ্য, বারুই প্রভৃতি অব্রাহ্মণ উপবর্ণদের ভিতরও রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশ্বাস-যোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই।

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র বিভাগ ছাড়া ব্রাহ্মণদের আর-একটি শ্রেণী—বৈদিক—বোধ হয় এই যুগেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কুলজীগ্রন্থমালায় এ সম্বন্ধে দুইটি কাহিনী আছে; একটি কাহিনীর মতে, বাংলাদেশে যথার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় রাজা শ্যামলবর্মা (বোধ হয় বর্মণরাজ সামলবর্মা) কান্যকুব্জ (কোনও কোনও গ্রন্থমতে, বারাণসী) হইতে ১০০১ শকাব্দে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অপর কাহিনীমতে, সরস্বতী-নদীতীরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যবনাক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন, এবং বর্মণরাজ হরিবর্মার পোষকতায় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তরভারত হইতে আগত এইসব বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই পাশ্চাত্ত্য বৈদিক নামে খ্যাত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আর-এক শাখা আসেন উৎকল ও দ্রাবিড় হইতে; ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। এই কুলজী-কাহিনীর মূল বোধ হয় হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। হলায়ুধ বলিতেছেন, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতি জানিত না। বাংলার ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বেদজ্ঞ বলিয়া দাবি করিলেও যথার্থত বেদচর্চার প্রচলন বোধ হয় সত্যই তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। হলায়ুধের আগে বল্লাল-গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টও তাঁহার পিতৃদয়িতা গ্রন্থে বাংলাদেশে বেদচর্চার অবহেলা

দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। যাহা হউক, সামলবর্মা ও হরিবর্মার সঙ্গে কুলজী-কাহিনীর সম্বন্ধ, তাঁহাদের মোটামুটি তারিখ, অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং হলায়ুধ -কথিত রাঢ়ে-বরেন্দ্রীতে বেদচর্চার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎকল ও পশ্চিম দেশসমূহে বেদজ্ঞানের প্রসার, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য এই দুই শাখায় বৈদিক ব্রাহ্মণের শ্রেণী-বিভাগ, এইসব বিচিত্র হেতুসমাবেশ দেখিয়া মনে হয় সেন-বর্মণ আমলেই বাংলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দিয়াছিল।

এইসব শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়া আরও দুই-তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সংবাদ এই যুগেই পাওয়া যাইতেছে। গয়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে (১০৫৯ শক=১১৩৭) এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণগ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পরিচয় জানা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইতেছে, দেবল ব্রাহ্মণেরা শাকদ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন। বল্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থে সারস্বত নামে আর-এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে। কুলজী-গ্রন্থের মতে ইঁহারা আসিয়াছিলেন সরস্বতী নদীর তীর হইতে। কুলজীগ্রন্থমতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষেরা গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত ছিলেন, এবং ইঁহারা বাংলাদেশে প্রথম আসিয়াছিলেন গৌড়রাজ শশাঙ্কের আহ্বানে তাঁহার রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে গ্রহযজ্ঞ করিবার জন্য। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি দেবল অর্থাৎ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানরা গ্রহবিপ্র বা গণক নামে পরিচিত হইতেছেন। যাহাই হউক, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণগ্রন্থে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, গণক বা গ্রহবিপ্ররা (এবং সম্ভবত, দেবল-শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাও) ব্রাহ্মণসমাজে সম্মানিত ছিলেন না; গণক-গ্রহবিপ্ররা তো 'পতিত' বলিয়াই গণ্য হইতেন, এবং সেই পাতিত্যের কারণ বৈদিক ধর্মে তাঁহাদের অবজ্ঞা, জ্যোতিষ ও নক্ষত্রবিদ্যায় অতিরিক্ত আসক্তি এবং জ্যোতির্গণনা করিয়া দক্ষিণা-গ্রহণ। এই গ্রহবিপ্রদেরই একটি শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন; ইঁহারাও 'পতিত' বলিয়া গণ্য হইতেন, কারণ তাঁহারাই সর্বপ্রথম শূদ্রদের নিকট হইতে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই ভট্ট ব্রাহ্মণ নামে আর-এক নিম্ন বা 'পতিত' শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে; সূত পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানরাই ভট্ট ব্রাহ্মণ, এবং অন্যলোকদের যশোগান করাই ইঁহাদের উপজীবিকা। ইঁহারা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের ভাট ব্রাহ্মণ। এখানেও 'পতিত' ব্রাহ্মণদের তালিকা শেষ হইতেছে না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম সংকর পর্যায়ের ২০টি উপবর্ণ ছাড়া (ইঁহারা সকলেই শূদ্র) আর কাহাদেরও পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতে পারিতেন না; মধ্যম ও অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের কাহারও পৌরোহিত্য করিলে তিনি 'পতিত' হইয়া যজমানের বর্ণ ও উপবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। মধ্যযুগের ও বর্তমান কালের 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ'দের উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছে। স্মার্ত ভবদেব ভট্ট বলিতেছেন, এইসব ব্রাহ্মণদের স্পৃষ্ট খাদ্য সংব্রাহ্মণদের খাওয়া নিষেধ। এই বিধিনিষেধ ক্রমশ কঠোরতর হইয়া মধ্যযুগেই দেখা গেল, পতিত বর্ণব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান দূরে থাক, তাঁহাদের স্পৃষ্ট জলও সংব্রাহ্মণেরা পান করিতেন না। তাহা ছাড়া কতকগুলি বৃত্তিও ছিল ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ; ভবদেব ভট্ট তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের তো প্রধান বৃত্তিই ছিল ধর্মকর্মানুষ্ঠান এবং অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাহা করিতেন, সন্দেহ নাই। আবার অনেক ব্রাহ্মণ ছোটবড় রাজকর্মও

করিতেন; ব্রাহ্মণ রাজবংশের খবরও পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে নায়কত্ব করিতেন, যোদ্ধ্ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন এমন প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভবদেবের পূর্বোক্ত তালিকায় দেখিতেছি, অনেক নিষিদ্ধবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পক্ষে শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনা, তাঁহাদের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পবিদ্যার চর্চা প্রভৃতি বৃত্তিও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কৃষিবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল না; যুদ্ধবৃত্তিতে আপত্তি ছিল না; মন্ত্রী, সন্ধি-বিগ্রহিক, ধর্মাধ্যক্ষ বা সেনাধ্যক্ষ হইলে কেহ পতিত হইত না! অথচ বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য নিষিদ্ধ ছিল।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশে আর যত বর্ণ আছে, সমস্তই সংকর; চতুর্বর্ণের যথেচ্ছ পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণ, এবং তাহারা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণদ্বয়ের উল্লেখই এই গ্রন্থে নাই। ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত শূদ্র সংকর উপবর্ণগুলিকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি উপবর্ণের স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিন পর্যায়ে ৩৬টি উপবর্ণ বা জাতের কথা বলিতেছে, যদিও তালিকাভুক্ত করিতেছে ৪১টি জাত। বাংলাদেশের জাত-সংখ্যা বলিতে আজও আমরা বলি ছত্রিশ জাত। ৩৬টিই বোধ হয় ছিল আদি সংখ্যা, পরে আরও ৫টি উপবর্ণ এই তালিকায় ঢুকিয়া পড়িয়া থাকিবে। উত্তম-সংকর পর্যায়ে ২০টি উপবর্ণ ঃ

(১) করণ—ইঁহারা লেখক ও পুস্তকর্মদক্ষ, এবং সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত। (২) অম্বষ্ঠ—ইঁহাদের বৃত্তি চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদচর্চা, সেই জন্য ইঁহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত। ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইঁহাদের বৃত্তি বৈশ্যের, কিন্তু ধর্মকর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে ইঁহারা শূদ্র বলিয়াই গণিত। (৩) উগ্র—ইঁহাদের বৃত্তি ক্ষত্রিয়ের, যুদ্ধবিদ্যাই ইঁহাদের ধর্ম। (৪) মাগধ—হিংসামূলক যুদ্ধব্যবসায়ে অনিচ্ছুক হওয়ায় ইঁহাদের বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছিল সূত বা চারণের এবং সংবাদবাহীর। (৫) তন্ত্রবায় (তাঁতী)। (৬) গান্ধিক-বণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যে বণিকের বৃত্তি; বর্তমানের গন্ধবণিক)। (৭) নাপিত। (৮) গোপ (লেখক)। (৯) কর্মকার (কামার)। (১০) তৈলিক বা তৌলিক (গুবাক-ব্যবসায়ী)। (১১) কুম্ভকার (কুমোর)। (১২) কংসকার (কাঁসারী)। (১৩) শাংখিক বা শংখকার (শাঁখারী)। (১৪) দাস—কৃষিকার্য ইঁহাদের বৃত্তি, অর্থাৎ চাষী। (১৫) বারজীবী (বারুই)—(পানের বরজ উৎপাদন করা ইহাদের বৃত্তি)। (১৬) মোদক (ময়রা)। (১৭) মালাকার। (১৮) সূত—(বৃত্তি উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু অনুমান হয় ইঁহারা চারণগায়ক—'পতিত' ব্রাহ্মণ)। ১৯ রাজপুত্র—(বৃত্তি অনুল্লিখিত; রাজপুত?)। (২০) তাম্বলী (তামলী)—পানবিক্রেতা। মধ্যম-সংকর পর্যায়ে ১২টি উপবর্ণ ঃ (২১) তক্ষণ—খোদাইকর। (২২) রজক। (২৩) স্বর্ণকার (সোনার অলংকার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক)। (২৪) সুবর্ণবণিক (সোনা-ব্যবসায়ী)। (২৫) আভীর (আহীর)—(গোয়ালা, গোরক্ষক)। (২৬) তৈলকার (তেলী)। (২৭) ধীবর—(মৎস্যব্যবসায়ী)। (২৮) শৌণ্ডিক—(শুঁড়ি)। (২৯) নট—যাহারা নাচে, খেলা ও বাজি দেখায়। (৩০) শাবাক, শাবক, শারক, শাবার (?)। (৩১) শেখর। (৩২) জালিক (জেলে, জালিয়া)।

অধম-সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ; ইঁহারা অস্পৃশ্য, এবং ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদের কাহারও কোন স্থান নাই। (৩৩) মলেগ্রহী (বঙ্গ-

বাসী সং : মলেগ্রহি)। (৩৪) কুড়ব (?)। (৩৫) চণ্ডাল (চাঁড়াল)। (৩৬) বরুড় (বাউড়ী?)। (৩৭) তক্ষ (তক্ষণকার?)। (৩৮) চর্মকার (চামার)। (৩৯) ঘট্টজীবী (পাঠান্তরে ঘণ্টজীবী—খেয়াঘাটের রক্ষক, খেয়াপারাপার মাঝি? বর্তমান পাটনী?) (৪০) ডোলাবাহী—ডুলিবেহারা, বর্তমান দুলিয়া, দুলে (?)। (৪১) মল্ল (বর্তমান মালো?)। এই ৪১টি জাত ছাড়া ম্লেচ্ছ পর্যায়ে আরও কয়েকটি দেশী ও ভিন্-প্রদেশী আদিবাসী কোমের নাম পাওয়া যায়; স্থানীয় বর্ণব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদের কোনও স্থান ছিল না, যথা, পুক্কশ, পুলিন্দ, খশ, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও অনুরূপ বর্ণবিন্যাসের খবর পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সমস্ত সংকর বা মিশ্র উপবর্ণগুলিকে সৎ ও অসৎ শূদ্র—এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। সংশূদ্র পর্যায়ে যাঁহাদের গণনা করা হইয়াছে তাঁহাদের নিম্ন-লিখিতভাবে তালিকাগত করা যাইতে পারে। তবে তালিকাটি অসম্পূর্ণ; কারণ, এই পুরাণই বলিতেছে, 'মিশ্রবর্ণ অসংখ্য, কে তাহার সমস্ত নাম উল্লেখ ও গণনা করিতে পারে?'

লক্ষণীয় যে, এই পুরাণ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠদের পৃথক উপবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, এবং উভয় উপবর্ণের যে উৎপত্তি-কাহিনী দিতেছে, তাহাও পৃথক। ১। করণ। ২। অম্বষ্ঠ (দ্বিজপিতা এবং বৈশ্যমাতার সন্তান)। ৩। বৈদ্য (জনৈক ব্রাহ্মণীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জাত সন্তান; বৃত্তি, চিকিৎসা)। ৪। গোপ। ৫। নাপিত। ৬। ভিল্ল (ইঁহারা আদিবাসী কোম; কী করিয়া সংশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হইলেন, বলা কঠিন)। ৭। মোদক। ৮। কুবর—? ৯। তাম্বুলী (তামলী)। ১০। স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক (ইঁহারা পরে ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হইয়া 'অসৎ শূদ্র' পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিলেন; স্বর্ণকারদের অপরাধ, সোনাচুরি)। ১১। মালাকার। ১২। কর্মকার। ১৩। শংখকার। ১৪। কুবিন্দক (তন্তুবায়)। ১৫। কুম্ভকার। ১৬। কংসকার। ১৭। সূত্রধার। ১৮। চিত্রকার (পটুয়া)। ১৯। স্বর্ণকার। সূত্রধার ও চিত্রকার কর্তব্যপালনে অবহেলা করায় ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হইয়া অসংশূদ্র পর্যায়ে গণ্য হইয়াছিলেন।

পতিত বা অসংশূদ্র পর্যায়ে যাঁহাদের গণনা করা হইত তাঁহাদের তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :

স্বর্ণকার। [সুবর্ণ]বণিক। সূত্রধার (বৃহদ্ধর্মপুরাণের তক্ষণ)। চিত্রকার ২০। অট্টালিকাকার। ২১। কোটক (ঘরবাড়ি তৈয়ার করা যাঁহাদের বৃত্তি)। ২২। তীবর। ২৩। তৈলকার। ২৪। লেট। ২৫। মল্ল। ২৬। চর্মকার। ২৭। শুঁড়ি। ২৮। পৌণ্ড্রক (পোদ?)। ২৯। মাংসচ্ছেদ (কসাই)। ৩০। রাজপুত্র (পরবর্তী কালের 'রাউত'?)। ৩১। কৈবর্ত (কলিযুগের ধীবর)। ৩২। রজক। ৩৩। কোয়ালী। ৩৪। গঙ্গাপুত্র (লেট-তীবরের বর্ণ-সংকর সন্তান)। ৩৫। যুঙ্গি (যুগী?)। ৩৬। আগরী (বৃহদ্ধর্মপুরাণের উগ্র? বর্তমানের আগুরী)।

অসংশূদ্রেরও নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে যাঁহাদের গণনা করা যায় তাঁহাদের তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :

ব্যাধ, ভড় (?), কাপালী, কোল (আদিবাসী কোম), কোঞ্চ (কোচ, আদিবাসী কোম), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী?), শরাক (প্রাচীন শ্রাবক-দের অবশেষ?), ব্যালগ্রাহী (বৃহদ্ধর্মপুরাণের মলেগ্রহী?), চণ্ডাল ইত্যাদি।

এই দুইটি বর্ণবিভাগের তালিকা তুলনা করিলে দেখা যায় প্রথমোল্লিখিত গ্রন্থের সংকর পর্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের সৎশূদ্র পর্যায় প্রায় এক এবং অভিন্ন; শুধু মগধ, গন্ধবণিক, তৌলিক বা তৈলিক, দাস, বারজীবী এবং সূত দ্বিতীয় গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে; পরিবর্তে পাইতেছি ভিল্ল ও কুবর এই দুইটি উপবর্ণের উল্লেখ, এবং বৈদ্যদের উল্লেখ। তাহা ছাড়া, প্রথম গ্রন্থের উত্তম-সংকর বর্ণের রাজপুত্র দ্বিতীয় গ্রন্থের অসৎ-শূদ্র পর্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থের মধ্যম-সংকর পর্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের অসৎশূদ্র পর্যায় এক এবং অভিন্ন: শুধু বৃহদ্ধর্মপুরাণের আভীর, নট, শাবাক (শ্রাবক ?), শেখর ও জালিক দ্বিতীয় গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে; পরিবর্তে পাইতেছি অট্টালিকাকার, কোটক, লেট, মল্ল, চর্মকার, পৌণ্ড্রক, মাংসচ্ছেদ, কৈবর্ত, গঙ্গাপুত্র, যুংগি, আগরী এবং কোয়ালী। ইহাদের মধ্যে মল্ল ও চর্মকার বৃহদ্ধর্মপুরাণের অধম-সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ধীবর ও জালিক—মৎস্যব্যবসাগত এই দুইটি উপবর্ণের খবর পাইতেছি; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাইতেছি শুধু কৈবর্তদের। ভবদেব ভট্টের মতে কৈবর্তরা অন্ত্যজ পর্যায়ের। ভবদেবের অন্ত্যজ পর্যায়ের তালিকা উপরোক্ত দুই পুরাণের তালিকার সংগে তুলনা করা যাইতে পারে ঃ রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ এবং ভিল্ল। ভবদেবের মতে চণ্ডাল ও অন্ত্যজ সমার্থক।

দেখা যাইতেছে, বর্ণ-উপবর্ণের স্তর- উপস্তর -বিভাগ সম্বন্ধে ইঁহাদের তিন-জনেরই সাক্ষ্য মোটামুটি একই প্রকার। এই চিত্রই সেন-বর্মণদের আমলের বাংলা-দেশের বর্ণবিন্যাসের মোটামুটি চিত্র।

প্রথমেই দেখিতেছি করণ ও অম্বষ্ঠদের স্থান। করণরা কিন্তু কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন না; এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বৈদ্যদের স্পষ্টতই অম্বষ্ঠ হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণ হিসাবে বৈদ্যদেরও উল্লেখ নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে; কিন্তু সেখানেও বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ দুই পৃথক উপবর্ণ, এবং উভয়ের উদ্ভবব্যাখ্যাও বিভিন্ন। এই গ্রন্থের মতে দ্বিজ পিতা ও বৈশ্য মাতার সংগমে অম্বষ্ঠদের উদ্ভব কিন্তু বৈদ্যদের উদ্ভব সূর্যতনয় অশ্বিনীকুমার এবং জনৈকা ব্রাহ্মণীর আকস্মিক সংগমে। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠরা যে এক এবং অভিন্ন এই দাবি সপ্তদশ শতকে ভরত-মল্লিকের আগে কেহ করিতেছেন না। তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বৈদ্যরা উপবর্ণ হিসাবে বিদ্যমান, এবং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য উভয়েই সাধারণত একই-বৃত্তি-অনুসারী ছিলেন। বোধ হয়, এক এবং অভিন্ন এই চিকিৎসাবৃত্তিই পরবর্তী কালে এই দুই উপবর্ণকে এক এবং অভিন্ন উপবর্ণে বিবর্তিত করিয়াছিল, যেমন করিয়াছিল করণ ও কায়স্থদের।

পালপর্বে দেখিয়াছি কৈবর্তদের সংগে মাহিষ্যদের যোগাযোগের কোন সাক্ষ্য উপস্থিত নাই এবং মাহিষ্য বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয়ের কোনও দাবিও নাই। সেন-বর্মণ-দেব পর্বেও কোন পুরাণ বা স্মৃতিগ্রন্থেও তেমন উল্লেখ নাই। বস্তুত, মাহিষ্য নামে কোন উপবর্ণের নামই নাই। কৈবর্তদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণের সংকলয়িতা বলিতেছেন, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সংগমে কৈবর্তদের উদ্ভব। লক্ষণীয় এই যে, গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদের প্রাচীন স্মৃতি-গ্রন্থে মাহিষ্যদের উদ্ভব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাই দিতেছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের লেখক কৈবর্ত সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা কোথায় পাইলেন, বলা কঠিন; কোন প্রাচীনতর গ্রন্থে

কৈবর্ত সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা নাই, সমসাময়িক বৃহদ্ধর্মপুরাণ বা কোন স্মৃতিগ্রন্থেও নাই। মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্যাখ্যার মধ্যেই কোন গোলমাল রহিয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতকে ভবদেব ভট্ট কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ধীবর ও মৎস্যব্যবসায়ী অন্য-একটি জাতের অর্থাৎ জালিকদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন মধ্যম-সংকর পর্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তীবর ও কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অসৎশূদ্র পর্যায়ে; এবং ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ইঙ্গিত এই যে, ইঁহারা মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী নন। তবে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ-সংকলয়িতা ইঁহাদের যে উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতেছেন, এইজাতীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তী কালে কৈবর্ত ও মাহিষ্যদের এক এবং অভিন্ন বলিয়া দাবি সমাজে প্রচলিত ও স্বীকৃত হয়। যাহাই হউক, বর্তমান কালে পূর্ববঙ্গের হালিক-দাস এবং পরাশরদাস এবং হুগলী-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের চাষী কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; আবার পূর্ববঙ্গে (ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ঢাকা অঞ্চলে) মৎস্যজীবী ধীবর ও জালিকরাও কৈবর্ত বলিয়া পরিচিত। বুঝা যাইতেছে, কালক্রমে কৈবর্তদের মধ্যে দুইটি বিভাগ রচিত হয়, একটি প্রাচীন কালের ন্যায় মৎস্যজীবীই থাকিয়া যায় (যেমন পূর্ববঙ্গে আজও), আর-একটি কৃষি (হালিক) -বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মাহিষ্যদের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। বল্লালচরিতে যে বলা হইয়াছে, রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত (এবং মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকার)দিগকে সমাজে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে কৈবর্তদের এক শ্রেণীর বৃত্তি পরিবর্তনের (চাষী-হালিক হওয়ার) এবং মাহিষ্যদের সঙ্গে অভিন্নতা দাবির যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

আট

উপরোক্ত উভয় পুরাণের মতেই করণ-কায়স্থ এবং বৈদ্য-অম্বষ্ঠদের পরেই গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার, তন্তুবায়-কুবিন্দক, মোদক এবং তাম্বুলীদের স্থান। গন্ধবণিক, তৈলিক, তৌলিক (সুপারী-ব্যবসায়ী), দাস (চাষী), এবং বারজীবী (বারুই),—সমাজনীতির দিক হইতে ইঁহাদেরও সদ্যোক্ত জাতগুলির সমপর্যায়ে গণ্য করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে কৃষিজীবী দাস ও বারজীবী, এবং শিল্পজীবী কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার ও তন্তুবায় ছাড়া আর কাহাকেও ধনোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না। গোপ, নাপিত, মালাকার—ইঁহারা সমাজসেবক মাত্র। মোদক, তাম্বুলী (তামলী), তৈলিক, তৌলিক এবং গন্ধবণিকেরা ব্যবসায়ী শ্রেণী, এবং সেইহেতু অর্থোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। করণ ও অম্বষ্ঠ বৃত্তিও ধনোৎপাদক বৃত্তি নয়। করণরা সোজাসুজি কেরানী, পুস্তপাল, হিসাবরক্ষক, দপ্তর-কর্মচারী; অম্বষ্ঠ-বৈদ্যরা চিকিৎসক। উভয়ই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য হইতে স্পষ্টই মনে হয়, স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিকেরা আগে উত্তম সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়েই গণ্য হইতেন; কিন্তু বৃহদ্ধর্ম- ও ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণ রচনাকালে তাঁহারা কিছুটা নিচে নামিয়া গিয়াছেন।

আশ্চর্য এই যে, সমাজের ধনোৎপাদক শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সৎশূদ্র বা উত্তম সংকর বলিয়া গণিত হন নাই। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, সূত্রধার, শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি, তক্ষণ, ধীবর-জালিক-কৈবর্ত

অট্টালিকাকার, কোটক প্রভৃতি জাতের নাম করিতেই হয়; ইঁহারা সকলেই মধ্যম-সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের। যুঙ্গি-যুগীরা এবং চর্মকারেরাও অর্থোৎপাদক শিল্পীশ্রেণীর অন্যতম; ইঁহারাও অসৎশূদ্র বা মধ্যম সংকর। নট সেবক মাত্র, ভবদেব ভট্টের মতে নট নর্তক। চর্মকার, শুঁড়ি, রজক—ইঁহারা সকলেই নিম্নজাতের লোক। ইঁহারা প্রয়োজনীয় সামাজিক স্তর সন্দেহ নাই, কিন্তু শৌণ্ডিক ও চর্মকার ছাড়া অন্য দুইটিকে ঠিক অর্থোৎপাদক স্তরের লোক বলা চলে কিনা সন্দেহ। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের মতে চর্মকারেরা একেবারে অন্ত্যজ পর্যায়ে পরিগণিত—তাঁহাদের বৃত্তির জন্য সন্দেহ নাই। অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত মল্ল (=মালো, মাঝি?) এবং রজক প্রয়োজনীয় সমাজশ্রমিক। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে মল্ল অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত।

সমাজশ্রমিকেরা কিন্তু প্রায় অধিকাংশ অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ পর্যায়ে—বর্ণাশ্রমের বাহিরে তাঁহাদের স্থান। চণ্ডাল, বরুড় (বাউড়ী), ঘট্টজীবী (পাটনী?), ডোলা-বাহী (দুলিয়া, দুলে), মল্ল (মালো?), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী?)—ইঁহারা সকলেই তো সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমিক-সেবক; অথচ ইঁহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে। অন্ত্যজ পর্যায়ের আর-একটি বর্ণ বেদে বা বাদিয়া; চর্যাগীতগুলি হইতে ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণ ও কোমের নরনারীর বৃত্তির একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়।

মনে রাখা দরকার, বর্ণ ও শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাহা একান্তই আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ের। প্রাচীনতর স্মৃতি- ও অর্থ -শাস্ত্র-গুলিতে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধের একটা চিত্র মোটামুটি ধরিতে পারা যায়, এবং অনুমান করা সহজ যে, অন্তত গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশেও অনুরূপ সম্বন্ধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে বাঙালী সমাজ প্রধানত কৃষি- ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প -নির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, এবং তখন হইতেই অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীগুলি ক্রমশ সামাজিক মর্যাদাও হারাইতে আরম্ভ করে। অথচ বুদ্ধিজীবী ও মসীজীবী যাঁহারা তাঁহারাই উপরের বর্ণস্তর অধিকার করিয়া আছেন। এমন কি, কৃষিজীবী দাস-সম্প্রদায়ও অনেক ক্ষেত্রে বণিক-ব্যবসায়ী এবং অতি প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক সম্প্রদায়গুলির উপরের বর্ণস্তরে অধিষ্ঠিত। মধ্য ও উত্তর-ভারতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতক হইতেই বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধের বিরোধও ক্রমশ তীব্রতর হইতেছিল। বাংলা-দেশে, মনে হয়, মোটামুটিভাবে পাল আমল পর্যন্ত এই বিরোধ খুব তীব্র হইয়া দেখা দেয় নাই; পাল আমলের শেষের দিকে, বিশেষভাবে সেন-বর্মণ-আমলে, উত্তর ও মধ্যভারতের বর্ণ- ও শ্রেণী -গত সামাজিক আদর্শ, এই দুইয়ের সুস্পষ্ট বিরোধ রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

নয়

উল্লিখিত তালিকাগুলিতে এবং সমসাময়িক লিপি ও স্মৃতিগ্রন্থে কতকগুলি আদি-বাসী আরণ্য ও পার্বত্য কোমের নাম পাওয়া যাইতেছে: যথা, ভিল্ল, মেদ, আভীর, কোল, পৌণ্ড্রক (পোদ?), পুলিন্দ, পুক্কশ, খশ, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর, অন্ধ্র ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভিল্লদের সৎশূদ্র পর্যায়ে কী করিয়া গণ্য করা

হইয়াছিল বলা কঠিন; ভবদেব ইঁহাদের মেদদের সঙ্গে বিন্যস্ত করিয়াছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। পৌণ্ড্রকরা অসৎশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন; বাকী সমস্ত কোমই হয় অন্ত্যজ, না হয় ম্লেচ্ছ পর্যায়ে। কোলেরা পুরাণোক্ত কোল্ল সন্দেহ নাই। পুরাণোক্ত কোল্ল-ভিল্লের দর্শন তাহা হইলে এখানেও পাওয়া যাইতেছে। পুলিন্দরাও প্রাচীন কোম এবং ইঁহাদের উল্লেখ বল্লালসেনের নৈহাটীলিপিতেও পাওয়া যাইতেছে। খশদের উল্লেখ পালদের লিপিতেই পাওয়া যাইতেছে। খর, পুক্কশ, ইঁহারাও পুরাণোক্ত আদিবাসী কোম। আভীররা বিদেশাগত প্রাচীন কোম এবং ভারতেতিহাসে সুবিদিত। বৃহদ্ধর্মপুরাণমতে উঁহারা মধ্যম-সংকর পর্যায়ভুক্ত। আর কোন বিদেশী কোমের পক্ষে কিন্তু এতটা সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই। কম্বোজরা উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের সুপরিচিত কোম হইতে পারে অথবা আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের বা তিব্বত অঞ্চলের পার্বত্য কোমও হইতে পারে; শেষোক্ত কোম হওয়াই অধিকতর সম্ভব। এক কম্বোজ রাজবংশ বাংলাদেশে কিছুকাল রাজত্বও করিয়াছিলেন। যবনরা বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মুসলমান। অন্ধ্রদের কথা তো পালপর্বে নিম্নতম স্তরের জাতগুলির আলোচনা প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। সুহ্মরা বাংলার প্রাচীনতম আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম। শবররাও তাহাই। যাহা হউক, উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে বুঝা যাইতেছে, হিন্দু বর্ণসমাজে ধীরে ধীরে যে স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া চলিতেছিল তাহার ফলে কোন কোন আদি বাঙালী কোম এবং বিদেশী কোম বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, যেমন পৌণ্ড্রক এবং আভীররা, এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য সত্য হইলে ভিল্লরাও; কোন কোন আদিবাসী কোম বর্ণাশ্রমের বাহিরে অন্ত্যজ পর্যায়ে স্থান পাইয়াছিল, যেমন, মেদ, ভিল্ল, কোল প্রভৃতি; আবার কেহ কেহ একেবারে ম্লেচ্ছ পর্যায়ে পুক্কশ, খশ, খর, কম্বোজ, যবনদের সঙ্গে, যেমন সুহ্ম, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি। অনুমান করা কঠিন নয়, ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী?), চণ্ডাল, মল্ল, ডোলাবাহী (দুলিয়া, দুলে), ঘট্টজীবী (পাটনী?), বরুড় (বাউড়ী) প্রভৃতিরাও আদিবাসী কোম। হিন্দু সমাজের সামাজিক স্বাঙ্গীকরণক্রিয়ার যুক্তিপদ্ধতিতে ইঁহারাও ক্রমশ সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান পাইয়াছিলেন।

দশ

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণ-উপবর্ণের সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বিষয়ে কয়েকটি তথ্যের সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। প্রথমেই আহার-বিহার লইয়া বিধিনিষেধের কথা বলা যাক। ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ এ সম্বন্ধে প্রামাণিক ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রজক, কর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কশ, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক এবং পতিত ও নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্পৃষ্ট বা পক্ব খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; এই নিষেধ অমান্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শূদ্রপক্ব অন্ন ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল; নিষেধ অমান্য করিলে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল; প্রাচীন স্মৃতিকারদের এই বিধান

ভবদেবেরও মানিয়া লইয়াছেন, তবে টীকা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়পক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক পালন করিলেই চলিবে; আর বৈশ্যপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে তিন-চতুর্থাংশ। ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করে তাহাকে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কিন্তু বৈশ্যপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। বৈশ্য শূদ্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলেও অর্ধেক প্রায়শ্চিত্তেই চলিতে পারে। শূদ্রহস্তে তৈলপক্ক ভর্জিত (শস্য) দ্রব্য, পায়স, কিংবা আপৎকালে শূদ্রপক্ক দ্রব্য ইত্যাদি ভোজন করিতে ব্রাহ্মণের কোন বাধা নাই; মনস্তাপপ্রকাশরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই দোষ কাটিয়া যায়। শূদ্রের পাত্রে রক্ষিত অথবা শূদ্রদত্ত জল পানও ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, অবশ্য স্বল্প প্রায়শ্চিত্তেই সে দোষ কাটিয়া যাইত; তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র কেহই চণ্ডাল ও অন্ত্যজ স্পৃষ্ট বা তাঁহাদের পাত্রে রক্ষিত জল পান করিতে পারিতেন না, করিলে পুরাপুরি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। নট ও নর্তকদের সম্বন্ধে ভবদেবের বিধিনিষেধ দেখিয়া মনে হয়, উচ্চতর বর্ণসমাজে ইঁহারা সম্মানিত ছিলেন না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে নটেরা অধমসংকরপর্যায়-ভুক্ত। কিন্তু সমসাময়িক অন্য প্রমাণ হইতে মনে হয়, যাঁহারা নট-নর্তকের বৃত্তি অনুসরণ করিতেন সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা কম ছিল না।

অন্ত্যজ জাতেরা বোধ হয় তখনও অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ডোম্ব-ডোম্বীরা যে ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য ছিলেন তাহার পরোক্ষ প্রমাণ চর্যাগীতিতে পাওয়া যায় (১০নং গীত)। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থের সংসর্গপ্রকরণ অধ্যায়ে অস্পৃশ্য-স্পর্শদোষ সম্বন্ধে নাতিবিস্তর আলোচনা দেখিয়াও মনে হয়, স্পর্শবিচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধিনিষেধ সমাজে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

বিবাহ-ব্যাপারেও অনুরূপ বিধিনিষেধ যে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। পালপর্বে উচ্চবর্ণ পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণ নারীর বিবাহ, ব্রাহ্মণবর ও শূদ্রকন্যায় বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। সবর্ণে বিবাহই সাধারণ নিয়ম ছিল, কিন্তু সেন-বর্মণ-দেব আমলেও চতুর্বর্ণের মধ্যে, উচ্চবর্ণ বর ও নিম্নবর্ণ কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই, এমন কি শূদ্রকন্যার ব্যাপারেও নহে; ভবদেব ও জীমূতবাহন উভয়ের সাক্ষ্য হইতেই তাহা জানা যায়। ব্রাহ্মণের বিদগ্ধা শূদ্রা স্ত্রীর কথা ভবদেব উল্লেখ করিয়াছেন: জীমূতবাহন ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকারগত রীতিনিয়মের কথা বলিয়াছেন; যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপারে সমবর্ণ স্ত্রী বিদ্যমান না থাকিলে অব্যবহিত নিম্নবর্তী বর্ণের স্ত্রী হইলেও চলিতে পারে, এইরূপ বিধানও দিয়াছেন। অবশ্য কোন পুরুষই উচ্চবর্ণে বিবাহ করিতে পারিতেন না। তবে, দ্বিজবর্ণের পক্ষে শূদ্রবর্ণে বিবাহ সমাজে ক্রমেই নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল। মনু ও বিষ্ণুস্মৃতি সম্বন্ধে জীমূতবাহনের টিপ্পনী হইতে স্বভাবতই এই অনুমান করা চলে যে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যানী এমন কি শূদ্রানীও বিবাহ করিতে পারিতেন, করিতেনও, কিন্তু তাঁহারা সর্বদা স্ত্রীর অধিকার লাভ করিতেন না। এই অনুমানের প্রমাণ জীমূতবাহনই অন্যত্র দিতেছেন; বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রানীর গর্ভে সন্তানের জন্মদান করিলে তাহাতে নৈতিক কোন অপরাধ হয় না; স্বল্প সংসর্গদোষ তাহাকে স্পর্শ করে মাত্র, এবং নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে অপরাধ কাটিয়া যায়। শূদ্রানীর সঙ্গে বিবাহ যে সমাজে ক্রমে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল তাহা বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীদের মর্যাদা সম্বন্ধে যে পার্থক্য করা হইতেছিল তাহাতেও পরিষ্কার। বর্ণাশ্রম-

বহিষ্কৃত যেসব জাত্ ছিল তাঁহাদের সংগে বিবাহ-সম্বন্ধের কোন প্রশ্ন বিবেচনার মধ্যেই আসে নাই, অর্থাৎ তাহা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, এমন কি শূদ্রদের পক্ষেও।

দ্বিজবর্ণ (এবং বোধ হয় উচ্চ জাতের শূদ্রবর্ণের মধ্যেও) সপিণ্ড, সগোত্র এবং সমান-প্রবরের বিবাহ সাধারণত প্রচলিত ছিল; ভবদেব ভট্টের সম্বন্ধ-বিবেকগ্রন্থে তাহার উপর বেশ জোরই দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য এবং প্রজাপত্য বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের মধ্যে কিংবা পিতার দিক হইতে সপ্তম পুরুষের মধ্যে হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর এবং কন্যা সগোত্র কিংবা সপ্রবরের হইলেও বিবাহ হইতে পারিত না। আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে তিন পুরুষ, কিংবা পিতার দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের বাহিরে হইলে বিবাহ হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহারা সমাজে শূদ্র পর্যায়ে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, এইসব বর্ণগত বিধিনিষেধ সাধারণত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই সবিশেষ প্রযোজ্য ছিল, এবং তাহাও ব্রাহ্মণের সংগে নিম্নতর বর্ণের আহার-বিহার-বিবাহ ব্যাপারে যোগাযোগ সম্বন্ধে। কালক্রমে এইসব বিধি-নিষেধই সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায় এবং বৃহত্তর সমাজে বিস্তৃত হইয়া অন্যান্য বর্ণ ও জাতের মধ্যেও স্বীকৃতি লাভ করে। সেন-বর্মণ-দেব আমলের বর্ণগত বিধিনিষেধের যে চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, এই সময়েই ব্রাহ্মণেরা বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাত্ হইতে প্রায় পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। একপ্রান্তে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, অন্যপ্রান্তে স্বাঙ্গীক্রিয়মাণ স্পর্শচ্যুত অধিকারলেশহীন অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়, আর মধ্য-স্থলে বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়। প্রত্যেকের মধ্যে দৃঢ় ও দুরতিক্রম্য প্রাচীর। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও নানা ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বিভেদপ্রাচীরে বিভক্ত, বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়ও নানাস্তরে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক স্তর দৃঢ় ও দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় সীমিত। অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায় তো একান্তই রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টির বাহিরে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উল্লেখ ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন ও অন্যান্য স্মৃতিকারেরা বারবার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা একান্তই ঐতিহ্যসংস্কারগত উল্লেখ বলিয়া মনে হয়। বাংলার আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলির সমসাময়িক কালে এই দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উপস্থিতির কোন নিঃসংশয় সাক্ষ্য আজও আমরা জানি না।

প্রাচীন বাংলার বর্ণবিন্যাসের পরিণতির কথা বলিতে গিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বাংলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ গ্রন্থে একটি উক্তি করা হইয়াছে; উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

"বর্ণভেদপ্রথার ক্রমবিবর্তনের শেষ পর্যায়ে দেখা যাইতেছে, অব্রাহ্মণ মাত্রই শূদ্ররূপে পরিগণিত হইতেছে। পুরাণগুলিতে 'শূদ্র' শব্দের যে বৃহত্তর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা হইতেই এই ধারণার সূত্রপাত। কারণ পুরাণে শূদ্র বলিতে শুধু চতুর্থ বর্ণকেই নির্দিষ্ট করা হয় নাই, অন্য তিন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও যাঁহারা অব্রাহ্মণ্য ও তান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁহাদেরও শূদ্র-পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বাংলাদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম ও তান্ত্রিক শাক্তধর্মের প্রভাব অনেক বেশী ছিল বলিয়াই সম্ভবত বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ ইত্যাদিতে বাংলাদেশের সকল উল্লেখযোগ্য জাতগুলিকেই শূদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।"

এগারো

বিভিন্ন পর্বে বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সম্বন্ধের কথা না বলিয়া বর্ণবিন্যাসের প্রসঙ্গ শেষ করা উচিত হইবে না।

বাংলাদেশে গুপ্তাধিপত্যের আগে এই সম্বন্ধে কোন তথ্যই অনুপস্থিত। গুপ্তাধিকারের কালে রাষ্ট্রযন্ত্রে অথবা রাষ্ট্রাধিকরণের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে যাঁহাদের নামের তালিকা পাইতেছি তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিলেই চলে। ভুক্তিপতি বা উপরিকদের মধ্যে যাঁহাদের দেখা মিলিতেছে তাঁহারা কেহ চিরাতদত্ত, কেহ ব্রহ্মদত্ত, কেহ জয়দত্ত, কেহ রুদ্রদত্ত, কেহ কুলবৃদ্ধি ইত্যাদি; বিষয়পতিরা কেহ বেত্রবর্মণ, কেহ স্বয়ম্ভূদেব, কেহ শণ্ডক; ইঁহাদের মধ্যে বেত্রবর্মণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিতে পারেন; স্বয়ম্ভুদেব সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, শণ্ডক যে অব্রাহ্মণ এ অনুমান সহজেই করা চলে। তারপরেই নিঃসন্দেহে যাঁহারা রাজকর্মচারী তাঁহারা হইতেছেন পুস্তপাল এবং জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থ। ইঁহাদের কাহারও নাম শাম্বপাল, কাহারও কাহারও নাম দিবাকরনন্দী, পত্রদাস, দুর্গাদত্ত, অর্কদাস, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, স্কন্দপাল ইত্যাদি। এইসব নামও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের। কুমারামাত্যদের মধ্যে একটি নাম পাইতেছি বেত্রজস্বামী—যিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া কতকটা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পুস্তপাল ও জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থদের সঙ্গে যাহারা স্থানীয় অধিকরণের রাষ্ট্রকার্য পরিচালনায় সহায়তা করিতেন তাঁহারা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক; ইঁহাদের নামের তালিকায় পাওয়া যায় ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, ধৃতিমিত্র, রিভুপাল, স্থাণুদত্ত, মতিদত্ত ইত্যাদি ব্যক্তিকে; ইঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে (পূর্ব)বঙ্গেও এই একই অবস্থা দেখিতেছি। শুধু সুবর্ণবীথির অন্তর্গত বারকমণ্ডলের বিষয়াধিনিযুক্তক ব্যক্তিদের মধ্যে দুইবার দুইজনের নাম পাইতেছি, গোপালস্বামী ও বৎসপালস্বামী। এই দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, পুস্তপাল ইত্যাদির নামের মধ্যে পাইতেছি বিনয়সেন নয়ভূতি, বিজয়সেন, পুরদাস ইত্যাদিকে, ইঁহারা অব্রাহ্মণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

অর্থাৎ, সপ্তম শতক পর্যন্ত রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের কোন প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না; বরং পরবর্তী কালে যাঁহারা করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ইত্যাদি সংকর শূদ্রবর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাধান্যই দেখিতেছি বেশি, বিশেষভাবে করণ-কায়স্থদের। শ্রেণী হিসাবে শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রাধান্যও যথেষ্ট দেখা যাইতেছে; বর্ণ হিসাবে ইঁহারা বৈশ্যবর্ণ বলিয়া গণিত হইতেন কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বুঝা যাইতেছে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করিলেও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা এখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সম্ভবত নিজেদের বর্ণানুযায়ী বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য বর্ণের লোকদের সম্পর্কে মোটামুটি বলা যায় যে, তাঁহারাও নিজেদের নির্দিষ্ট বৃত্তিসীমা অতিক্রম করেন নাই। রাষ্ট্রে করণ-কায়স্থদের প্রতিপত্তি বৃত্তিগত স্বাভাবিক কারণেই, শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তির কারণ অর্থনৈতিক।

কিন্তু, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বর্ণব্যবস্থার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ক্রমশ তাঁহারা প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন; ভূমিদান অর্থদান ইত্যাদি কৃপালাভের ফলে অনেক ব্রাহ্মণ ক্রমশ ব্যক্তিগতভাবে

ধনসম্পদের অধিকারীও হইতে থাকেন। করণ-কায়স্থেরাও রাজসরকারে চাকুরি করিয়া করিয়া রাষ্ট্রের কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই; রাজকার্যে সহায়তার জন্য যাঁহারা আহূত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে করণ-কায়স্থ এবং অন্যান্য 'ভদ্র' বর্ণের লোকই সংখ্যায় বেশি বলিয়া মনে হইতেছে।

সাধারণত অধিকাংশ লোকই নিজেদের বর্ণবৃত্তি অনুশীলন করিতেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-কামনা, অর্থ-নৈতিক-প্রেরণা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করিত। পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মণ আমলে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈন্য-সেনাপতি, রাজকর্মচারী, কৃষিজীবী ইত্যাদির বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা মন্ত্রী হইতেছেন; দাসজীবীরা রাজকর্মচারী, সভাকবি ইত্যাদি হইতেছেন, করণ-কায়স্থেরা সৈনিকবৃত্তি চিকিৎসাবৃত্তি ইত্যাদি অনুসরণ করিতেছেন; কৈবর্তরা রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হইতেছেন; এ ধরনের দৃষ্টান্ত অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অনবরতই পাওয়া যাইতেছে।

পাল-রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, রাষ্ট্র- ও সমাজ -পদ্ধতির পূর্বোক্ত রীতিক্রম সুস্পষ্ট ও সক্রিয়। প্রথমেই দেখিতেছি, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও আধিপত্য বাড়িয়াছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীদর্ভপাণি, পৌত্র কেদারমিশ্র ও প্রপৌত্র গুরব-মিশ্র রাজা ধর্মপালের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারিজন পাল সম্রাটের অধীনে পালরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন বেদবিদ্ পরমশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ রাজনীতি-কুশল। আরও একটি ব্রাহ্মণবংশের শাস্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ যোগদেব, পুত্র তত্ত্ববোধভূ বোধিদেব এবং তৎপুত্র বৈদ্যদেব—এই তিনজন যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপাল, রামপাল এবং কুমারপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই পরিবারও পাণ্ডিত্যে, শাস্ত্রজ্ঞানে, এক কথায় ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিতে যেমন কুশলী ছিলেন তেমনই ছিলেন রাজনীতি ও রণ-নীতিতে। নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপির দূতক ভট্ট গুরব ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপির দূতক ছিলেন ভট্টশ্রীবামন মন্ত্রী; ইনিও অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ সন্দেহ নাই। এই রাজার রাজগুরু ছিলেন শ্রীবামরাশি; ইনি বোধহয় একজন শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন।

একটি ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রধান রাজপুরুষের নাম বোধহয় পাওয়া যাইতেছে ধর্মপালের খালিমপুরলিপিতে, ইনি মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্মা। এই সামন্ত নরপতিটি যেন অবাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। কিছু কিছু বণিকের নাম পাইতেছি, যেমন বণিক লোকদত্ত, বণিক বুদ্ধিমিত্র; নামাংশ বা পদবী দেখিয়া মনে হয় ইঁহারা পরবর্তীকালের 'ভদ্র' সংকরবর্ণীয়, বৃত্তি অবশ্যই বৈশ্যের; করণ-কায়স্থদের প্রভাব ব্রাহ্মণদের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও খুব কম ছিল না। রামচরিত-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা প্রজাপতিনন্দী ছিলেন করণদের মধ্যে অগ্রণী এবং রামপালের কালে পালরাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক। আরও এক করণ-শ্রেষ্ঠ শব্দপ্রদীপ-গ্রন্থের রচয়িতা, কৈবর্ত দিব্য বিদ্রোহী হইবার আগে পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ বা সামন্ত ছিলেন। সামন্ত নরপতিদের মধ্যেও করণ-কায়স্থদের দর্শন মিলিতেছে। ত্রিপুরা পট্টোলীর মহারাজা লোকনাথ নিজেই ছিলেন করণ। কিন্তু করণের প্রভাব ঠিক আগেকার পর্বের মতন আর নাই। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের রাষ্ট্রে সর্বত্রই

যেন ছিল করণ-কায়স্থদের প্রভাব, পালচন্দ্র-পর্বে ঠিক ততটা প্রভাব নাই: পরিবর্তে ব্রাহ্মণ প্রভাব বর্ধমান।

কম্বোজ-সেন-বর্মণ পর্বের রাষ্ট্রে এই ব্রাহ্মণপ্রভাব ক্রমশ বাড়িয়াই গিয়াছে। ভবদেব ভট্ট ও হলায়ুধের বংশের কথা পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। একাধিক পুরুষ ব্যাপিয়া সেন-বর্মণ রাষ্ট্রে এই দুই পরিবারের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাহা ছাড়া, অনিরুদ্ধ ভট্টের মতো ব্রাহ্মণ-রাজগুরুদের প্রভাবও রাষ্ট্রে কিছু কম ছিল না। অধিকন্তু, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, তন্ত্রাধিকৃত, রাজপণ্ডিত প্রভৃতিরও প্রভাব এই পর্বের রাষ্ট্রগুলিতে সুপ্রচুর, এবং ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রভাবের পরিচয় বিশেষভাবে কিছু পাওয়া যাইতেছে না, বরং বল্লালচরিত, বৃহদ্ধর্ম- ও ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণের বর্ণতালিকা হইতে মনে হয়, শিল্পী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত অনেক বর্ণ রাষ্ট্রের অকৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া সমাজে নামিয়া গিয়াছিল। বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতি সেনরাষ্ট্র বোধহয় খুব প্রসন্ন ছিল না। ব্রাহ্মণদের পরেই রাষ্ট্রে যাঁহাদের প্রভাব সক্রিয় ছিল তাঁহারা করণ-কায়স্থ: ইহাদের প্রভাব হিন্দু আমলে কখনও একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; করণ-কায়স্থদের বর্ণগত বৃত্তিই বোধহয় তাহার কারণ। সেন-রাজসভার কবিদের মধ্যে অন্তত একজন করণ-কায়স্থ উপবর্ণের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তিনি উমাপতিধর। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের সংকলয়িতা কবি শ্রীধর দাসও বোধহয় করণ-কায়স্থ ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী কিন্তু ছিলেন জাতে তন্তুবায়: তন্তুবায়-কুবিন্দকেরা উত্তম-সংকর বা সংশূদ্র পর্যায়ের লোক, এ কথা স্মরণীয়।

রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের প্রভাবের মোটামুটি যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহা হইতে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাবপ্রতিপত্তিই সকলের চেয়ে বেশি ছিল। করণ-কায়স্থদের প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমেয়: ভূমির মাপ-প্রমাপ, হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, পুস্তপালের কাজকর্ম, দপ্তর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, লেখকের কাজ প্রভৃতি ছিল ইঁহাদের বৃত্তি। স্বভাবতই, তাঁহারা রাষ্ট্রে এই বৃত্তিপালনের যতটা সুযোগ পাইতেন অন্যত্র তাহা সম্ভব হইত না। কাজেই এক্ষেত্রে বর্ণ ও শ্রেণী প্রায় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তাহা বলা চলে না: ইঁহারা বৃত্তিসীমা অতিক্রম করিয়াই মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ, সান্ধিবিগ্রহিক ইত্যাদি পদ অধিকার করিতেন। রাজগুরু, রাজপণ্ডিত, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক ইত্যাদিরা অবশ্যই নিজেদের বৃত্তিসীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন বলা যাইতে পারে। বৈশ্য-বৃত্তিধারী বর্ণ-উপবর্ণ সম্বন্ধে বলা যায়, যতদিন শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা উন্নত ছিল, ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, ততদিন রাষ্ট্রেও তাঁহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য ছিল, কিন্তু অষ্টম শতকের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কমিয়া যাওয়ার সংগে সংগে রাষ্ট্রেও বৈশ্যবৃত্তিধারী লোকদের প্রভাব কমিয়া যাইতে থাকে। বল্লাল-চরিতের ইঙ্গিত সত্য হইলে সেন রাষ্ট্র তাঁহাদের প্রতি সক্রিয়-ভাবে অপ্রসন্নই ছিল।

যাহা হউক, এ তথ্য সুস্পষ্ট যে ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাবই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকরী ছিল। অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের প্রভাবও হয়তো সময়ে সময়ে কিছু কিছু ছিল। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা রাষ্ট্রে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালীই ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের প্রভাব কমিয়া যায় এবং তাঁহাদের কোন

কোন সম্প্রদায় সংশূদ্রপর্যায় হইতেও পতিত্ হইয়া পড়েন। কৈবর্তদের একটি সম্প্রদায় কিছুদিন রাষ্ট্রে খুব প্রভাবশালীই ছিলেন, আর কোন বর্ণের কোন প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল বলিয়া মনে হয় না।

বারো

পঞ্চম শতকের পর হইতেই এই বিচিত্র ভেদবিন্যাস ক্রমশ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে এবং সেন-বর্মণ পর্বে তাহা দৃঢ় ও অনমনীয় হইয়া সমাজকে স্তরে উপস্তরে বিভক্ত করিয়া সমগ্র সমাজবিন্যাস গড়িয়া তোলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশে এমন মানুষ, এমন সাধক ছিলেন যাঁহারা মানুষে মানুষে এই ভেদ-সংঘাত অস্বীকার করিয়া তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত জাত্- ও বর্ণ -ভেদ অতিক্রম করিয়া মানুষের মানবমহিমা, তাহার চিরমুক্ত প্রাণ ও আত্মার জয়ঘোষণাই ছিল তাঁহাদের অধ্যাত্মচিন্তা ও জীবনসাধনার আদর্শ। এই আদর্শ সবচেয়ে বেশি প্রচার করিয়াছেন ভাগবতধর্মী এবং সহজযানী সাধকেরা। সমাজে তাঁহাদের আদর্শ কতটা অনুসৃত হইয়াছিল বলা কঠিন। কিন্তু, সে আদর্শ যে অধ্যাত্মচিন্তায় এবং কিছু কিছু লোকের জীবনসাধনার কাজে লাগিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। অন্তত বিশেষ বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীতে জাত্ভেদ বর্ণভেদের কোন বালাইই ছিল না। ভাগবত তো খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন, ভগবানের কাছে সকলেরই সমান অধিকার, এমন কি কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, সুহ্ম, যবন, খশদেরও। উপনিষদ্‌ধর্মে, বৌদ্ধধর্মে, প্রাচীন ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মেও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে জাত-বর্ণকে অস্বীকার করা হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় এ কথাটা খুব ভাল করিয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা, এবং ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মপর্ব যদি বাংলাদেশে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ভাবের ভাবুকেরাও। বজ্র-সূচিকোপনিষৎ নামে একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বোধ হয় বাংলাদেশেই, এবং মনে হয় এই উপনিষদটি বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচনা। গ্রন্থটি ৯৭৩-৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থেও প্রচণ্ড যুক্তিতর্কে জাত্ভেদের যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে।

দোহাকোষের টীকায় আছে, শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ কিছু জাতি নাই, সমস্ত লোক একই জাতিতে নিবন্ধ, ইহাই সহজ ভাব। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মপর্বে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং সর্বশেষে বলা হইয়াছে, চার বর্ণই যখন এক পিতার সন্তান তখন সকলেই একই জাতি। বজ্রসূচিকো-পনিষদেও খুব জোরের সঙ্গে বর্ণ-ব্রাহ্মণত্বের দাবি অস্বীকার করা হইয়াছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের বেশির ভাগ সম্বন্ধই তো শবর-শবরী, ডোম-ডোম্নী, চণ্ডাল-চণ্ডালিনীদের সঙ্গে।

কিন্তু, এই উদার সমদৃষ্টি ও অধ্যাত্মভাবনা সামাজিকভাবে সমাজে গৃহীত হয় নাই, অধ্যাত্ম- ও ধর্ম -সাধনার ক্ষেত্রেই যেন সীমাবদ্ধ ছিল। পালযুগে বৌদ্ধ সহজধর্মের উদার আদর্শ কিছুটা সামাজিক জীবনেও সক্রিয় ছিল, কিন্তু দৈনন্দিন সামাজিক আচার, বিচার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং সমাজবিন্যাসে এই উদার মানবা-দর্শের স্বীকৃতি বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রেণী-বিন্যাস

এক

প্রাচীন বাংলার সমাজ যেমন বিভিন্ন বর্ণে তেমনই বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন অনুযায়ী সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব ও স্তরভেদ দেখা দেয়। যে সমাজে উৎপাদিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার, ব্যক্তিগত ধনাধিকার যে সমাজে স্বীকৃত নয়, সে সমাজে শ্রেণী-বিন্যাসের প্রশ্ন অবান্তর। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তায় সকলেরই খাইয়া বাঁচিবার অধিকার স্বীকৃত হইলেও, বাস্তব দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ধনের উপর সকলের সমানাধিকার কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বিংশ শতকের আগে মঠ-মন্দির, বিহার-সংঘারাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এই স্বীকৃতি ছিল না। কৌম সমাজের ধনসাম্যব্যবস্থার কথা বাদ দিলে, ঐতিহাসিক পর্বে ব্যক্তিগতধনাধিকারবাদ স্বীকৃতির উপরই ছিল প্রাচীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন বাংলায় ধনোৎপাদনের ছিল তিন উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান দুই উপায় ছিল বলিয়া মনে হয়। কৃষি ভূমিনির্ভর, ভূমির ব্যক্তিগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত অধিকারের উপর রাষ্ট্রের অধিকার প্রাচীন বাংলায় স্বীকৃত ছিল। কাজেই কৃষিদ্রব্য ক্ষেত্রকর বা কর্ষকরা উৎপাদন করিলেও বণ্টনব্যবস্থাটা ছিল ভূম্যধিকারী এবং রাষ্ট্রের হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বণিকদের হাতে, শিল্প ছিল শিল্পীদের হাতে; উৎপাদিত অর্থের বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইঁহাদের হাতে না থাকিলেও—খানিকটা তো রাষ্ট্রের হাতে ছিলই—অধিকাংশ ইঁহাদেরই করায়ত্ত ছিল। ধনোৎপাদনের তিন উপায় অবলম্বন করিয়া স্বভাবতই বাংলায় তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিবে, এবং উৎপাদিত ও বণ্টিত ধনের তারতম্যানুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীতে নানা স্তর থাকিবে তাহাও আশ্চর্য নয়।

ধন উৎপাদন ও বণ্টন ছাড়াও সমাজের অনেক কর্তব্য আছে যাহা সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর। ইহাদের একপ্রান্তে যেমন মিলিবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, ভাষা-সাহিত্য, এক কথায় সমাজের মানসজীবনের নায়কদের, শিক্ষা- ও ধর্ম -জীবীদের, তেমনই অন্যপ্রান্তে পাওয়া যাইবে সমাজের অঙ্গ-নির্গত আবর্জনা-পরিষ্কারক রজক-চণ্ডাল-বাউড়ী-পোদ-বাগদী ইত্যাদিদের। এইখানেই আসিয়া পড়ে সমাজের বর্ণবিন্যাসের কথা, এবং শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে তাহা জড়াইয়া যায়। বস্তুত, ভারতীয় সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী অঙ্গাঙ্গী জড়িত। বাংলা-দেশেও তাহাদের ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ণবিন্যাস অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে, বৃত্তি বা জীবিকা বর্ণনির্ভর, এবং বর্ণ জন্মনির্ভর। বিশেষ বর্ণের কেহ নির্ধারিত বৃত্তির সীমা অতিক্রম করিতেন না এমন নয়, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; অধি-কাংশ লোক নিজ নিজ বৃত্তিসীমা রক্ষা করিয়াই চলিতেন। বৃত্তি বা জীবিকা যেখানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণী একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে,

এবং শ্রেণীর মর্যাদাও সেই সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহা বিচিত্র নয়। উৎপাদিত ধন উৎপাদক ও বণ্টকেরা তো ভোগ করিতেনই, বিশেষভাবে করিতেন উৎপাদন ও বণ্টন যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাঁহারা। সমানাধিকারবাদের স্বীকৃতি যখন ছিল না, তখন সকলে সমভাবে সামাজিক ধন ভোগ করিতে পাইতেন না, তাহাও স্বাভাবিক। তাহার উপর এই বণ্টন আবার নিয়মিত হইত বর্ণ ও বৃত্তির মর্যাদা অনুযায়ী; কাজেই, ধনোৎপাদনের প্রধান তিন উপায় অনুযায়ী তিনটি শ্রেণী ছাড়া আরও অনেক অর্থনৈতিক শ্রেণী থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক নয়।

সব শ্রেণী-উপশ্রেণী একসঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই; সমাজের গঠন-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজকর্মের জটিলতা ও কর্ম-বিভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-উপশ্রেণীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। তবে, খ্রীষ্টপূর্ব শতকগুলিতেই ধনাগমের পূর্বোক্ত তিন প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়া তিনটি প্রধান শ্রেণী প্রাচীন বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ অবশ্য নাই, কিন্তু ষষ্ঠ-পঞ্চম-চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্ব শতকগুলিতে প্রতিবেশী অঙ্গ-মগধের সাক্ষ্য যদি আংশিকতও পুণ্ড্র-রাঢ়-সুহ্ম-বঙ্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়, এবং এইসব জনপদের কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে এই অনুমান অস্বীকার করা যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতেই এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহার আগে সবটাই অনুমান।

দুই

শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের প্রধান উপকরণ ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলী, এবং সমর্থক ও আনুষঙ্গিক উপকরণ—পাল ও সেন আমলে—সমসাময়িক সাহিত্য, বিশেষভাবে বৌদ্ধ চর্যাগীতি, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ও বাংলার স্মৃতিগ্রন্থ। বর্তমান প্রসঙ্গে পট্টোলীগুলির স্বরূপ বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

যদি অনুমান করা যায় যে, মৌর্যকালে বাংলাদেশ অথবা তাহার কতকাংশ মৌর্য সম্রাটদের করতলগত ছিল, এবং মৌর্য শাসনপদ্ধতি এ দেশেও প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, মৌর্যরাষ্ট্রে আমরা যেসব রাজপুরুষদের পরিচয় অশোকের লিপিমালা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা-গ্রন্থ হইতে পাই, সেইসব রাজপুরুষেরা এদেশেও বিদ্যমান ছিলেন, এবং মৌর্য প্রাদেশিক শাসনের যন্ত্র বাংলাদেশেও পরিচালিত হইত। কিন্তু তাহা হইলেও এই অনুমান হইতে আমরা একমাত্র রাজপুরুষশ্রেণী ছাড়া আর কোন শ্রেণীর খবর পাইলাম না। পরবর্তী যুগেও কতকটা তাহাই; উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমসাময়িক লিপিগুলি অধিকাংশই তো রাজরাজড়ার কীর্তিকলাপের বিবরণ। এইসব লিপিতে রাজপুরুষশ্রেণী ছাড়া আর কাহারও খবর বড় একটা নাই। সমসাময়িক সংস্কৃত সাহিত্যে, যেমন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে, ভাসের দু-একটি নাটকে, কালিদাসের শকুন্তলায় পরোক্ষভাবে সমাজের অন্যান্য বৃত্তি ও শ্রেণীর খবরাখবর কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। শুঙ্গ আমলের ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীতে কিংবা কিছু পরবর্তী কালের সাঁচীর শিলালিপিগুলিতে ও মথুরায় প্রাপ্ত কোন কোন লিপিতে, কোন কোন প্রাচীন মুদ্রায়ও এই ধরনের পরোক্ষ কিছু কিছু

খবর আছে; শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী-শ্রেণীর আভাস তাহাতে আছে। বস্তুত, একমাত্র জাতক-গ্রন্থ ছাড়া আর কোন উপাদানের ভিতরই প্রাচীন ভারতের শ্রেণী-বিন্যাসের সুস্পষ্ট চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চম শতক পর্যন্ত বাংলা-দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য।

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ-সংক্রান্ত পট্টোলীগুলি সমস্তই ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিল। এই পট্টোলীগুলির মধ্যে আমরা শ্রেণীসংবাদ যে খুব বেশি পাইতেছি, তাহা নয়; তবে দুইটি শ্রেণী বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, একটি রাজপুরুষ শ্রেণী, আর একটি বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাহা ছাড়া, মহত্তরাঃ, কুটুম্বিনঃ, ব্যবহারিণঃ প্রভৃতি গণ্যমান্য জনসাধারণের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ব্রাহ্মণদের বৃত্তি কী ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মহত্তর (মহতর=মাহাতো=মাতব্বর লোক অর্থাৎ সম্পন্ন গৃহস্থ), কুটুম্ব (অর্থাৎ গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থ) এবং 'অক্ষুদ্রপ্রকৃতি' জনসাধারণ কিংবা যে সমস্ত 'সংব্যবহারী' কোন বিশেষ প্রয়োজনে নিজেদের মতামত দিবার জন্য আহূত হইতেন, তাঁহাদের বৃত্তি কী ছিল, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন আভাস এই লিপিগুলিতে পাওয়া না গেলেও অনুমান করা খুব কঠিন নয়। যাঁহারা এই ব্যাপারে প্রধান তাঁহাদের মধ্যে রাজপুরুষ শ্রেণী এবং বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকদেরই নিঃসংশয় উল্লেখ আছে; তাঁহারা কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণীপর্যায়ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হন নাই, কিন্তু উল্লেখের রীতি দেখিয়া মনে হয়, শ্রেণীর ইঙ্গিত বর্তমান। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, রাজপুরুষদের উল্লেখ তাঁহাদিগের অধিকৃত পদমর্যাদার জন্যই; একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকেও উল্লেখ করা হইতেছে না।

অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলির স্বরূপ একটু ভিন্ন প্রকারের। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের দলিলগুলিতে ভূমি কিভাবে বিক্রীত হইতেছে, এবং পরে কিভাবে দান করা হইতেছে, তাহার ক্রমের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অষ্টম-শতক-পরবর্তী দলিলগুলিতে ভূমিক্রয়ের যে ক্রম তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে; আমরা শুধু দেখি, রাজা ভূমিদান করিতেছেন, এবং সেই ভূমিদান বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এই বিজ্ঞাপন যাঁহাদের নিকট করা হইতেছে, তাঁহাদের উপলক্ষ করিয়া সমসাময়িক প্রায় সমস্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, যাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, তাঁহাদেরও জানানো হইতেছে। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে এই ধরনের সর্বশ্রেণীর, সকল বৃত্তিধারী লোকের উল্লেখ নাই; সেখানে রাজপুরুষ, বণিক ও ব্যবসায়ী, মহত্তর, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ইত্যাদির বাহিরে আর কাহারও উল্লেখ করা হইতেছে না।

তিন

এইবার একে একে লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক প্রাচীন বাংলার শ্রেণী-বিভাগের চেহারাটা ধরিতে পারা যায় কিনা।

প্রথম কুমারগুপ্তের ধনাইদহ (৪৩২-৩৩ খৃ) লিপিতে দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে গ্রামের কুটুম্ব অর্থাৎ অন্যান্য গৃহস্থ-দের, ব্রাহ্মণদের এবং মহত্তর অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের; বিজ্ঞাপন দিতেছেন

একজন রাজপুরুষ। এই সম্রাটের ১নং দামোদরপুরলিপিতে (৪৪৩-৪৪ খ্রী) রাজপুরুষ হইতেছেন কোটিবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি কুমারামাত্য বেত্রবর্মা এবং ভূমি-বিক্রয়ব্যাপারে তাঁহার সহায়ক ও পরামর্শদাতা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ। ইঁহারা সকলেই অবশ্য রাজপুরুষ নহেন; প্রথম কায়স্থ খুব সম্ভব একজন রাজপুরুষ. বাকী তিনজনের দুইজন বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এবং একজন শিল্পীশ্রেণীর প্রতিনিধি। কয়েকজন পুস্তপালের উল্লেখ আছে, ইঁহারাও রাজপুরুষ। বৈগ্রাম পট্টোলী (৪৪৭-৪৮ খ্রী) মতে বিষয়পতি কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধির সহায়ক নগরশ্রেষ্ঠী; প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক অথবা প্রথম কায়স্থের সাক্ষাৎ পাইতেছি না। অন্যান্য সমসাময়িক লিপি হইতে আমরা জানি যে, পূর্বোল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ ইঁহারাই বিষয়াধিকরণ গঠন করিতেন। ইঁহাদের ছাড়া বিক্রীত ভূমিসংপৃক্ত দুই গ্রামের কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও সংব্যবহারীদিগকেও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। এই সংব্যবহারীরা বিষয়, মণ্ডল বা গ্রামের রাজ-প্রতিনিধির সহায়ক, কিন্তু রাজপুরুষ ঠিক নহেন। ২নং দামোদরপুর লিপির সাক্ষ্য (৪৪৭-৪৮ খ্রী) প্রথম কুমারগুপ্তের ১নং দামোদরপুরলিপিরই অনুরূপ। পাহাড়-পুর পট্টোলীতেও (৪৭৮-৭৯ খ্রী) আয়ুক্তক ও পুস্তপালের উল্লেখ পাইতেছি, অধিষ্ঠানাধিকরণের উল্লেখও আছে এবং ভূমি মাপিয়া সীমা ঠিক করিয়া দিতে বলা হইয়াছে গ্রামের ব্রাহ্মণ, মহত্তর ও কুটুম্বদিগকে। ৩নং ও ৪নং দামোদরপুরলিপির (৪৮২-৮৩ খ্রী; দ্বিতীয়টির তারিখ অজ্ঞাত) সাক্ষ্যও এইরূপই। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘরলিপিতে (৫০৭-৮ খ্রী) পঞ্চাধিকরণোপরিক, পুরপালোপরিক, সন্ধি-বিগ্রহাধিকরণ, কায়স্থ ইত্যাদি রাজপুরুষদের উল্লেখ দেখিতেছি; অন্য কোন শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ নাই। পরবর্তী শতকে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলীও ঠিক গুণাইঘরলিপির অনুরূপ। ঠিক এই ক্রমটি দেখা যায় পাল ও সেন যুগের লিপিগুলিতে। গুপ্তযুগের লিপিগুলি একটু অন্যরূপ; সেখানে কোন ব্যক্তি-বিশেষ রাজসরকারের নিকট হইতে ভূমি কিনিয়া দান করিতেছেন এবং সেক্ষেত্রে রাজ-সরকারের অর্থলাভ এবং পুণ্যলাভ দুইই হইতেছে। পাল ও সেন যুগে দানটা কিন্তু করিতেছেন রাজা স্বয়ং, কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে (ধর্মপালের খালিমপুরলিপি এবং দামোদরদেবের চট্টগ্রাম পট্টোলী)। গুণাইঘরলিপি এবং সপ্তম শতকের লোক-নাথের লিপি, ইহাদের উভয়েরই ধারাটা যেন পরবর্তী পাল ও সেন আমলের; গুপ্ত আমলের অন্যান্য-লিপি-নির্দিষ্ট ধারা যেন নয়! গোপচন্দ্রের মল্লসারুললিপি সম্বন্ধেও মোটামুটি একই কথা বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে আবার ফিরিয়া যাওয়া যাক। দামোদরপুরের ৫নং লিপি বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সাক্ষ্য ব্যাপারে এই স্থানে প্রাপ্ত অন্যান্য লিপির অনুরূপ। ফরিদপুরের ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব প্রভৃতির তাম্রপট্টোলীর সাক্ষ্য একটু অন্য প্রকার। ধর্মাদিত্যের ১নং শাসনে ভূমিক্রয়েচ্ছা জ্ঞাপন করা হইতেছে বিষয়মহত্তর-দিগকে; অর্থাৎ বিষয়ের প্রধান প্রধান লোকদের এবং অন্যান্য সাধারণ লোকদের গ্রামীয় ভূমির দান-বিক্রয়ের খবর দেওয়া হইল। ধর্মাদিত্যের ২নং লিপিতে ও সমাচারদেবের ঘুঘ্রাহাটি পট্টোলীতে নূতন খবর কিছু নাই। জয়নাগের বপ্যঘোষ-বাট পট্টোলীতেও তাহাই। লোকনাথের ত্রিপুরালিপিতে রাজপুরুষদের ছাড়া বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানীয় প্রধান ব্যবহারী ও জানপদদের নাম করা হইতেছে।

অষ্টম শতকের খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের আস্রফপুর পট্টোলীতে বিষয়পতিদের সঙ্গে সঙ্গে কুটুম্ব গৃহস্থদিগকেও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে।

এই বিশ্লেষণ হইতে এক শ্রেণীর লোক আমরা পাইতেছি যাঁহারা রাজপুরুষ, রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, কোথাও তাঁহাদের রাজপুরুষ বলা হইতেছে না, এবং সেইভাবে বিশেষ কোন একটি শ্রেণীভুক্তও করা হইতেছে না। আর এক ধরনের লোকের উল্লেখ পাইতেছি, যাঁহারা বিশেষ প্রয়োজনে আহূত হইলে রাষ্ট্রব্যাপারে রাজপুরুষদের সহায়তা করিয়া থাকেন; ইঁহাদিগকে কোথাও ব্যবহারিণঃ, কোথাও সংব্যবহারিণঃ, বিষয়ব্যবহারিণঃ, প্রধান-ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের বৃত্তি কী ছিল, আমরা জানি না; তবে ইহাই অনুমেয় যে, নানা বৃত্তির প্রধান প্রধান লোকদেরই আহ্বান করা হইত; বিষয় বা অধিষ্ঠান-অধিকরণের সভ্য, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, ইঁহারাও সেই হিসাবে সংব্যবহারী। মহত্তর অর্থাৎ প্রধান প্রধান সম্পন্ন গৃহস্থ, কুটুম্ব অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থ, অক্ষুদ্র-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান প্রধান অধিবাসী প্রভৃতি যাঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহাদের কাহার কী বৃত্তি বা কোন্ শ্রেণী ছিল, অনুমানের উপায় থাকিলেও সুনির্দিষ্টভাবে বলিবার উপায় নাই। তবে, রাজপুরুষ ও রাজপ্রতিনিধি ছাড়া এমন কতকগুলি ব্যক্তির খবর পাওয়া গেল যাঁহাদের বৃত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, যেমন, নগর-শ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিক। যেভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে ইঁহারা যে এক-একটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ তাহা বুঝা যাইতেছে। রাজপুরুষ ও এই বণিক-ব্যবসায়ী-শিল্পী শ্রেণী ছাড়া আর-একটি শ্রেণীর পরোক্ষ উল্লেখ আছে, সেটি ব্রাহ্মণদের। পূজা, ধর্মকর্ম ইত্যাদির জন্যই তো ইঁহারা ভূমিদান গ্রহণ করিতেছেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও ইঁহাদের অন্যতম বৃত্তি ছিল। অবশ্য, ইঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজপুরুষের বৃত্তি কিংবা অন্যান্য বৃত্তিও গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র।

এইবার অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ধর্মপালের খালিমপুর-শাসনে দেখিতেছি, নরপতি ধর্মপাল দুইটি গ্রাম দান করিতেছেন। দানের প্রার্থনা জানাইতেছেন, মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা; দানের হেতু হইতেছে নারায়ণ বর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারায়ণবিগ্রহের পূজা এবং বিগ্রহের পূজারী লাট (গুজরাট) -দেশীয় ব্রাহ্মণদের এবং মন্দির-ভৃত্যদের ব্যবহার। খালিমপুরলিপিতে যেভাবে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমিদানের যত পট্টোলী আছে, তাহার প্রায় সবটিতেই এই ধরনের একটি সূত্র উল্লিখিত আছে; প্রভেদের মধ্যে দেখা যায়, কোথাও রাজপুরুষদের তালিকাটি সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃততর। অবশ্য একটু-আধটু নূতন সংযোজনা কোথাও কোথাও আছে, সেগুলি আমাদের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেবপালের মুঙ্গেরলিপিতে রাজপাদোপ-জীবীদের তালিকায় চাটভাটজাতীয় সেবকদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে—"গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাটভাট-সেবকাদীন্—অন্যাংশ্চাকীর্তিতান্"; এবং প্রতিবাসী ও ব্রাহ্মণোত্তরদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে,—"মহত্তর-কুটুম্বি-পুরোগ-মেদান্ধ্রকচণ্ডালপর্যন্তান্" নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপিতেও ঠিক এই ধরনের উল্লেখ আছে। বস্তুত পালরাজাদের সমস্ত লিপিই এইরূপ। শুধু গৌড়-মালব-

খশ-হূণ প্রভৃতির সঙ্গে কোথাও কোথাও চোড়দেরও উল্লেখ আছে। চাটভাটদের জায়গায় চট্টভট্ট "ক্ষেত্রকরান্"এর পরিবর্তে পাওয়া যায় "কর্ষকান্"। কিন্তু দশম শতকের কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্দা-পট্টোলীতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা একটু অন্যরূপ। এখানে উল্লেখ পাইতেছি, স্থানীয় "সকরণান্ ব্যবহারিণঃ"-দের (কেরানীকুল সহ অন্যান্য রাষ্ট্রসহায়কদের), কৃষক ও কুটুম্বাদিগের এবং ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণদের যে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে ঠিক তাহা নয়, তাঁহাদের সম্মান জ্ঞাপনের পর অন্যদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। আর, রাজমহিষী, যুবরাজ, মন্ত্রী, পুরোহিত, ঋত্বিক, প্রাদেষ্টৃবর্গ, সকল শাসনাধ্যক্ষ, করণ (বা কেরানী), সেনাপতি, সৈনিকসংঘমুখ্য, দূতবর্গ, গূঢ়পুরুষবর্গ, মন্ত্রপালবর্গ এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বলা হইতেছে এই দান মান্য করিবার জন্য।

সেনরাজাদের এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজবংশের লিপিগুলি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই; তাহাদের সাক্ষ্য পাললিপিগুলিরই অনুরূপ। তবে পাল ও সমসাময়িক অন্য রাজাদের লিপিতে যেখানে পাইতেছি প্রতিবাসীদের কথা, পরবর্তী লিপিগুলিতে ঠিক সেইখানেই আছে জনপদবাসীদের কথা। কিন্তু, একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাল ও সমসাময়িক অনেকগুলি লিপিতে দেখা যায়, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষেত্রকর ইত্যাদির পরেই নিম্নস্তরের যে অগণিত লোক তাঁহাদিগকে সব একসঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া বলা হইতেছে, "আচণ্ডালান্" অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত; অর্থাৎ বর্ণবিন্যাস অধ্যায়ে ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ পর্যায়ে যতগুলি উপ-বর্ণের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি তাহারা সকলেই ঐ পদের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। পরবর্তী লিপিগুলিতে অর্থাৎ কম্বোজ-বর্মণ-সেন আমলের লিপিগুলিতে কিন্তু এই পদটি কোথাও নাই; চণ্ডাল পর্যন্ত নিম্নতম শ্রেণী ও বর্ণের অন্যান্য লোকেরা অনুল্লিখিত। পাল যুগের পরে সেন আমলে রাষ্ট্রের ও সমাজের উচ্চস্তরের অর্থাৎ এক কথায় উৎপাদন- ও বণ্টন -কর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন বদলাইয়া গিয়াছিল।

সমসাময়িক সাহিত্যেও এই শ্রেণীবিন্যাসের চেহারা কিছুটা ধরিতে পারা যায়; বৌদ্ধ চর্যাগীতিতে কয়েকটি আদিবাসী কোম ও উপবর্ণ এবং তাঁহাদের বৃত্তির ইঙ্গিত আছে; সেন আমলের দুই-একটি লিপিতেও আছে। সমসাময়িক বাঙালীর স্মৃতি ও পুরাণে ইঁহারা অন্ত্যজ- বা ম্লেচ্ছ -পর্যায়ভুক্ত, এবং শুধু বর্ণ হিসাবেই নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবেও ইঁহারা সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোক; ইঁহাদের অনুসৃত বৃত্তিতেই তাহা পরিষ্কার। ইঁহারা সকলেই সমাজের শ্রমিক-সেবক, আজিকার দিনের ভাষায় দিনমজুর, এবং আজিকার মতোই ভূমিহীন প্রজা। ইঁহাদের অব্যবহিত উপরের স্তরেই আর-একটি শ্রেণীর আভাস ধরিতে পারা যায়; ইঁহারা বিভিন্ন উপবর্ণে বিভক্ত, প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৃত্তি ও উপজীবিকা। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, ইঁহারা প্রায় সকলেই বৃহদ্ধর্মপুরাণের মধ্যম সংকর এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে শিল্পজীবীও আছেন, কৃষিজীবীও আছেন, এমন কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও নাই, এমন নয়; শিল্পজীবী, যেমন, তক্ষণ, সূত্রধার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক ইত্যাদি; কৃষিজীবী, যেমন, রজক, আভীর (বিদেশী কোম), নট, পৌণ্ড্রক (পোদ?), কৌরালী, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি; ব্যবসায়ী, যেমন, তৈলকার, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), ধীবর-জালিক ইত্যাদি। নিজ নিজ বৃত্তিই ইঁহাদের জীবিকা সন্দেহ নাই; কিন্তু জীবিকার জন্য ইঁহারা কমবেশি আংশিকত কৃষিনির্ভরও ছিল। ইঁহাদের বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটিই সামাজিক

কর্তব্য; সেই কর্তব্যের বিনিময়ে ইঁহারা ভূমির উপর অথবা ভূমিলব্ধ দ্রব্যাদির উপর আংশিক অধিকার ভোগ করিতেন, এই অনুমানও স্বাভাবিক। ইঁহারাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের অস্থায়ী প্রজা, ভাগচাষী ইত্যাদি। উন্নত সমাজাধিকার বা উৎপাদন- ও বণ্টন -কর্তৃত্ব যে ইঁহাদের নাই তাহা বর্ণবিন্যাসের স্তর হইতেও কতকটা অনুমান করা যায়। ইঁহাদেরই অব্যবহিত উপরের স্তরে ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, ভূমিস্বত্ববান্ কৃষক বা ক্ষেত্রকর, শিল্পী, ব্যবসায়ী, করণ-কায়স্থ-বৈদ্যক-গোপ-যুদ্ধ-চারণ প্রভৃতি বৃত্তিধারী বিভিন্ন লোক লইয়া একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিচয়ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণতালিকার মধ্যে ধরিতে পারা কঠিন নয়। তাহা ছাড়া, শিক্ষাদীক্ষা-ধর্ম-কর্মবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ যতি সম্প্রদায় তো ছিলেনই।

চার

এই বিশ্লেষণের ফলে কী পাওয়া গেল, তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন রাজপুরুষদের উল্লেখ আছে। মহারাজাধিরাজের অধীনে রাজা, রাণক, রাজনক- রাজন্যক, সামন্ত-মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক-মহামাণ্ডলিক, এইসব লইয়া যে অনন্ত সামন্তচক্র, ইঁহারাও রাজপাদোপজীবী। রাজা-রাজনক-রাজপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-প্রভৃতি নিম্নস্তরের রাজকর্মচারী পর্যন্ত সকলকে একত্রে একমালায় গাঁথিয়া বলা হইয়াছে "রাজপাদোপজীবিনঃ"। এই যে সমস্ত রাজপুরুষকে একসঙ্গে গাঁথিয়া একটি সীমিত শ্রেণীতে উল্লেখ করা, তাহা পাল আমলেই যেন প্রথম আরম্ভ হইল; অথচ আগেও রাজপুরুষ, রাজপাদোপজীবীরা ছিলেন। বোধ হয়, এইরূপভাবে উল্লেখের কারণ আছে। মোটামুটি সপ্তম শতকের সূচনা হইতে গৌড় স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা লাভ করে; বঙ্গ এই সত্তার পরিচয় পাইয়াছিল ষষ্ঠ শতকের তৃতীয় পাদ হইতে। সপ্তম শতকেই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ নিজস্ব রাষ্ট্র লাভ করিল, নিজস্ব শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিল। গৌড়- ও- কর্ণসুবর্ণাধিপ শশাঙ্ককে আশ্রয় করিয়াই তাহার সূচনা দেখা গেল; কিন্তু তাহার পরই অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া সমস্ত দেশ জুড়িয়া মাৎস্যন্যায়ের উৎপীড়ন। এই মাৎস্যন্যায়পর্বের পর পালরাষ্ট্র ও পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ আবার আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পাইল, নিজের রাষ্ট্র ও রাজ্য লাভ করিল, রাষ্ট্রীয় স্বাজাত্য ফিরিয়া পাইল, এবং পাইল পূর্ণতর বৃহত্তর রূপে। মর্যাদায় ও আয়তনে, শক্তিতে ও ঐক্যবোধে বাংলাদেশ নিজের এই পূর্ণতর বৃহত্তর রূপ আগে কখনও দেখে নাই। বোধ হয়, এই কারণেই রাষ্ট্র ও রাজপাদোপজীবীদের শুধু সবিস্তার উল্লেখই নয়, শাসনযন্ত্রের যাঁহারা পরিচালক ও সেবক তাঁহারা নূতন এক মর্যাদার অধিকারী হইলেন, এবং সরকারী চাকুরিয়াদের একটা সুস্পষ্ট শ্রেণীর খবর এই আমরা প্রথম পাইলাম।

রাজপাদোপজীবী সকলেই এক-অর্থনৈতিক-স্তরভুক্ত ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে সকলের উপরে ছিলেন রাণক, রাজনক, মহাসামন্ত, সামন্ত, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিক ইত্যাদি সামন্ত প্রভুরা; সর্বপ্রধান ভূস্বামী মহাসামন্ত-মহামাণ্ডলিকেরা; তাঁহাদের নিচের সামন্ত-মাণ্ডলিকেরা সামন্তসৌধের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে

মহামহত্তরেরা—বৃহৎ ভূস্বামীর দল; চতুর্থ স্তরে মহত্তর ইত্যাদি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভূস্বামীর দল এবং তাহার পর ধাপে ধাপে নামিয়া কুটুম্ব অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থ বা ভূমিবান্ প্রজা, ভাগীপ্রজা, ভূমিবিহীন প্রজা ইত্যাদি। মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক সামন্ত, মাণ্ডলিক—ইঁহারা সাক্ষাৎভাবে রাজপাদোপজীবী; কিন্তু মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতিরা রাজপাদোপজীবী নহেন, রাজসেবক মাত্র; রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আহূত হইলে রাজপুরুষদের সহায়তা ইঁহারা করিতেন, এমন প্রমাণ পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল লিপিতেই পাওয়া যায়।

অষ্টম-শতকপূর্ব লিপিগুলিতে আর-একটি শ্রেণীর খবর আমরা পাইতেছি; ইঁহারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আহূত হইলে রাজপুরুষদের সহায়তা করিতেন। পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতেও ইঁহারা উল্লিখিত হইতেছেন রাষ্ট্রসেবকরূপে। ইঁহারা হইতেছেন, জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, মহামহত্তর, মহত্তর, দাশগ্রামিক, করণ, বিষয়-ব্যবহারী ইত্যাদি। কোন কোন লিপিতে মহত্তর, মহামহত্তর ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিদের এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু চাটভাট ইত্যাদি অন্যান্য নিম্নস্তরের রাজকর্মচারীরা সর্বদাই রাজ-সেবকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টম-শতকপূর্ব লিপিগুলির জ্যেষ্ঠকায়স্থ বা প্রথম কায়স্থ তো রাজপুরুষ বলিয়াই মনে হয়; যে পাঁচজন মিলিয়া স্থানীয় অধিকরণ গঠন করেন, তিনি তাঁহাদের একজন। এই (রাজ) -সেবকদের মধ্যে গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় ইত্যাদি—জাতীয় ব্যক্তিদের উল্লেখ পাইতেছি। মনে হয়, ইঁহারাও কোন উপায়ে রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। যেভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, আমার তো মনে হয়, এইসব ভিন্ প্রদেশী লোকেরা বেতনভুক্ সৈন্যরূপে রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। পুরোহিতরূপে লাট- বা গুজরাট -দেশীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখ তো খালিমপুরলিপিতেই আছে। কিন্তু ঐদেশীয় সৈন্যরাও এদেশে রাজসৈনিকরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

যাহাই হউক, রাজপাদোপজীবী শ্রেণীরই আনুষঙ্গিক রূপে পাইলাম রাজ-সেবকশ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর সমস্ত লোকেরাই একস্তরের ছিলেন না, পদমর্যাদা এবং বেতনমর্যাদাও এক ছিল না। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্তরের বিত্ত ও মর্যাদার লোক এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে ছিল; কিন্তু যে স্তরেই হউন, ইঁহাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রাষ্ট্রের সঙ্গেই একান্তভাবে জড়িত ছিল।

রাজপাদোপজীবী শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়। মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক, সামন্ত, মাণ্ডলিক প্রভৃতির নীচের স্তরেই পাইতেছি উপরিক বা ভুক্তিপতি, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, অমাত্য, সান্ধিবিগ্রহিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী; ধর্মাধ্যক্ষ; দণ্ডনায়ক, মহাদণ্ডনায়ক, দৌঃসাধসাধনিক, দূত, দূতক, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক; রাজপণ্ডিত; কুমারামাত্য, মহাপ্রতীহার, মহাসেনাপতি, রাজামাত্য, রাজস্থানীয়, ইত্যাদি। সুবৃহৎ আমলাতন্ত্রের ইঁহারাই উপরতম স্তর, এবং ইঁহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থ একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত, তেমনই অন্যদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূস্বামীদের সঙ্গে। এই উপরতম স্তরের নিচেই একটি মধ্যবিত্ত, মধ্যক্ষমতাধিকারী রাজকর্মচারীর স্তর; এই স্তরে বোধ হয় অগ্রহারিক, ঔদ্রঙ্গিক, আবসথিক, চৌরোদ্ধরণিক, বলাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, দাণ্ডিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি; দশাপরাধিক, গ্রামপতি, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, শৌল্কিক, খোল, কোট্টপাল, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, প্রান্তপাল, ষষ্ঠাধিকৃত ইত্যাদি। ইঁহাদের নিম্নবর্তী স্তরে শৌল্কিক; গৌল্মিক,

গ্রামপতি, হট্টপতি, লেখক, শিরোরক্ষিক; শান্তকিক, বাসাগারিক, পিলুপতি, ইত্যাদি। সর্বনিম্ন স্তরে স্থান হইয়াছিল ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রসেবকদলের, এবং এই দলে হূণ-মালব-খশ-লাট-কর্ণাট-চোড় ইত্যাদি বেতনভুক্ সৈন্যরা ছিলেন, ক্ষুদ্র করণ বা কেরাণীরা ছিলেন, চাটভাটেরা ছিলেন এবং আরও অনেকে।

মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী ইত্যাদি যে বিভিন্ন স্তরের ভূম্যধিকারী ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর কম। ভূমিসম্পদে, এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগত গুণে ও চরিত্রে সমাজে যাঁহারা মান্য ও সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারাই মহামহত্তর ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন, এরূপ মনে করিলে অন্যায় হয় না। কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী—ইঁহারা স্বল্পভূমিসম্পন্ন গৃহস্থ; কৃষি, গৃহশিল্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা ইঁহাদের বৃত্তি ও জীবিকা। কৃষি ইঁহাদের বৃত্তি হইলেও ইঁহারা নিজেরা নিজেদের হাতে চাষের কাজ করিতেন বলিয়া মনে হয় না, যদিও ভূমির মালিক তাঁহারা ছিলেন। চাষের কাজ নিজে যাঁহারা করিতেন, তাঁহারা ক্ষেত্রকর, কর্ষক, কৃষক বলিয়াই পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টম শতকের দেবখড়্গের আস্রফপুরলিপির একটি স্থানে দেখিতেছি, ভূমি ভোগ করিতেছেন একজন, কিন্তু চাষ করিতেছে অন্য লোকেরা। মনে হয়, জমি নিম্নপ্রজাদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। এই নিম্নপ্রজাদের মধ্যে যাঁহারা নিজেরা চাষবাস করেন, তাঁহারাই ক্ষেত্রকর। যদি অনুমান করা যায় যে, সমাজের মধ্যে ভূমিসম্পদে ও শিল্পবাণিজ্যাদিসম্পদে সমৃদ্ধ নানা স্তরের একটা শ্রেণীও ছিল এবং এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি হইতেছেন মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদি ব্যক্তিরা, তাহা হইলে ঐতিহাসিক তথ্যের বিরোধী বোধ হয় কিছু বলা হয় না।

ব্রাহ্মণেরা বর্ণ হিসাবে যেমন শ্রেণী হিসাবেও তেমনই পৃথক শ্রেণী। দান-ধ্যান-ক্রিয়াকর্ম যাহা কিছু করা হইতেছে, ইঁহাদের সম্মাননা করার পর। ভূমিদান ইঁহারাই লাভ করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপাদোপজীবী শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়মে ইঁহারা পুরোহিত, ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, নীতিপাঠক, শান্ত্যাগারিক, শান্তিবারিক, রাজপণ্ডিত, ধর্মজ্ঞ, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রাদির লেখক, প্রশস্তিকার, কাব্য- সাহিত্য ইত্যাদির রচয়িতা। ইঁহাদের উল্লেখ পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে, সমসাময়িক সাহিত্যে বারংবার পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছাড়া পাল আমলের শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্যও কম ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যেমন শ্রেণী হিসাবে সমাজের ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও ব্যবহারের ধারক ও নিয়ামক ছিলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংঘগুলিও ঠিক তেমনই সমাজের কতকাংশের ধর্ম, শিক্ষা ও নীতির ধারক ও নিয়ামক ছিল। এই বৌদ্ধ-জৈন স্থবির ও সংঘ-সভ্যদের এবং ব্রাহ্মণদের লইয়া প্রাচীন বাংলার বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণী।

ক্ষেত্রকর শ্রেণীর কথা প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হইয়াছে। অষ্টম শতক হইতে প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই ক্ষেত্রকরদের উল্লেখ আছে। অথচ আশ্চর্য এই, অষ্টম শতকের আগে কোন লিপিতেই ইঁহাদের উল্লেখ নাই, যদিও উভয় যুগের লিপিগুলি ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও দানেরই পট্টোলী। এ তর্ক করা চলিবে না যে, ক্ষেত্রকর বা কৃষক পূর্ববর্তী যুগে ছিল না। খিল অথবা ক্ষেত্রভূমি দান-ক্রয়-বিক্রয় যখন হইতেছে, চাষের জন্যই হইতেছে। আর, ভূমি দান-বিক্রয় যদি সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভূমিব্যাপারে যাহার স্বার্থ সকলের বেশি সেই কর্ষকের উল্লেখ নাই

কেন? আর, অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী লিপিগুলিতে তাঁহাদের উল্লেখ আছে কেন? ইহার একটা কারণ আছে এবং এই কারণের মধ্যে প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের ইতিহাসের একটু ইঙ্গিত আছে।

ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, সমাজে ভূমির চাহিদা ক্রমশ বাড়িতেছিল, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমি কেন্দ্রীকৃত হইবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা দিতেছিল। সামাজিক ধনোৎপাদনের ভারকেন্দ্রটি ক্রমশ যেন ভূমির উপরেই আসিয়া পড়িয়াছিল; পাল ও বিশেষ করিয়া সেন আমলের লিপিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলে সমাজের কৃষিনির্ভরতার ছবিটাই যেন দৃষ্টি ও বুদ্ধি অধিকার করিয়া বসে। তাহা ছাড়া, জনসংখ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ভূমির আবাদ, জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম বসাইবার ও চাষের জন্য জমি বাহির করিবার চেষ্টাও চোখে পড়ে। সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে পৃথক ও সুনির্দিষ্ট ভাবে কৃষক বা ক্ষেত্রকর বলিয়া যে কাহারও উল্লেখ নাই তাহার কারণ এই নয় যে, তখন কৃষক ছিল না, কৃষিকর্ম হইত না; তাহার যথার্থ ঐতিহাসিক কারণ সম্ভবত সমাজ তখন একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়া উঠে নাই, এবং কৃষক বা ক্ষেত্রকররা উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠেন নাই।

যাহাই হউক, এই পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাসের যে তথ্য আমরা পাইলাম তাহাতে দেখিতেছি, রাজপাদোপজীবীরা সুস্পষ্ট সীমারেখায় নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী, এবং তাঁহাদেরই আনুষঙ্গিক ছায়ারূপে আছেন (রাজ)সেবক শ্রেণী। ইঁহারা রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক ও সহায়ক। ইঁহাদের মধ্যে আবার বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবীরা আর-একটি শ্রেণী; ইঁহারা সাধারণভাবে জ্ঞান-ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক। ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই অধিক; বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের সংঘগুরু এবং যতিরাও আছেন, সিদ্ধাচার্যরা আছেন, এবং স্বল্পসংখ্যক করণ-কায়স্থ, বৈদ্য, এবং উত্তম সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়ের কিছু কিছু লোকও আছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, লক্ষ্মণ-সেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী তন্তুবায় ছিলেন, এবং সমসাময়িক অন্য আর-একজন কবি, জনৈক পপীপ, জাতে ছিলেন কৈবর্ত। ব্রহ্মদেয় অথবা ধর্মদেয় ভূমি, দক্ষিণালব্ধ ধন ও পুরস্কার হইল এই শ্রেণীর প্রধান আর্থিক নির্ভর। ভূম্যধিকারীর একটি শ্রেণীও অল্পবিস্তর সুস্পষ্ট, এবং এই শ্রেণীও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। সর্বোপরি স্তরে সামন্ত শ্রেণী এবং পরে স্তরে স্তরে মহামহত্তর, মহত্তর ইত্যাদি ভূমিসমৃদ্ধ অভিজাত শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে কুটুম্ব ও প্রধান প্রধান গৃহস্থ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীর স্তর। চতুর্থ শ্রেণী হইতেছে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের লইয়া; দেশের ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় ইঁহাদের হাতে; কিন্তু বণ্টনব্যাপারে ইঁহাদের কোন হাত নাই; ইঁহারা অধিকাংশই স্বল্পমাত্র ভূমির অধিকারী অথবা ভাগচাষী ও ভূমিবিহীন চাষী। পাল ও সেন লিপিতে পঞ্চম একটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে; এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজের শ্রমিক-সেবক, অধিকাংশই ভূমিবঞ্চিত, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। এই শ্রেণী তথাকথিত অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছবর্ণের ও আদিবাসী কোমের নানাবৃত্তিধারী লোকদের লইয়া গঠিত। অষ্টম শতকের আগে ইঁহাদের উল্লেখ নাই, পালপর্বের পরেও ইঁহাদের উল্লেখ নাই। পাল ও সেন আমলের সমসাময়িক সাহিত্যে—কাব্যে, পুরাণে, স্মৃতিগ্রন্থে—ইঁহাদের বর্ণ- ও বৃত্তি -মর্যাদা

সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। লিপিপ্রমাণদ্বারাও সমসাময়িক সাহিত্যের সাক্ষ্য সমর্থিত হয়। রজক ও নাপিতরাও সমাজ-শ্রমিক, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আবার কর্ষক বা ক্ষেত্রকরও বটে। মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল ছাড়া আরও দু-একটি অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায়ের অর্থাৎ নিম্নতম অর্থনৈতিক স্তরের লোকদের খবর সমসাময়িক লিপিতে পাওয়া যায়, যেমন, পুলিন্দ, শবর ইত্যাদি। চর্যাপদে যে ডোম্, ডোম্বী, বা ডোম্নী, শবর-শবরী, কাপালিক ইত্যাদির কথা বার বার পাওয়া যায় তাঁহারাও এই শ্রেণীর। বাঁশের চাঙাড়ি ও বাঁশের তাঁত তৈরি করা তখন যেমন ছিল ইঁহাদের কাজ, এখনও তাহাই। শিল্পী-শ্রেণীর মধ্যে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের খবরও চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাইলাম, ইহার মধ্যে একটি পট্টোলীতেও ভুল করিয়াও বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কোন ব্যক্তির উল্লেখ নাই; ইহা আশ্চর্য নয় কি? অষ্টম-শতক-পূর্ববর্তী লিপিগুলিতে দেখিতেছি, স্থানীয় অধিকরণ উপলক্ষেই যে শুধু নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিকের নাম করা হইতেছে, তাহাই নয়, কোন কোন লিপিতে প্রধান ব্যবসায়ীদেরও উল্লেখ করা হইতেছে, অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে বণিক ও ব্যবসায়ীদেরও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। রাষ্ট্রব্যাপারেও তাঁহাদের বেশ আধিপত্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু অষ্টম শতকের পর এমন কী হইল, যাহার ফলে এই শ্রেণীর কোন উল্লেখই রহিল না? ভূমিদানের ব্যাপারে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই, এই তর্ক উঠিতে পারে। এ যুক্তি হয়তো কতকটা সত্য। কিন্তু আমার মনে হয়, এই অনুল্লেখ আকস্মিক নয়। অষ্টম শতকের পরে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী ছিলেন না, এইরূপ অনুমান মূর্খতা মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, তারানাথকথিত শিল্পী ধীমান ও বীটপালের কথা, শিল্পী মহীধর, শিল্পী শশিদেব, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী তথাগতসর, সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র এবং আরও অগণিত শিল্পী যাঁহারা পাললিপিমালা ও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা; বণিক বুদ্ধমিত্র ও বণিক লোকদত্তের কথা। শুধু পাল আমলেই তো নয়; সেন আমলেও শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের অপ্রাচুর্য ছিল না। বল্লালচরিতে বণিক ও বিশেষভাবে সুবর্ণবণিকদের উল্লেখ তো সুস্পষ্ট। আর, বৃহদ্ধর্ম- ও ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণ দুইটিতে তো শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর অগণিত উপবর্ণের তালিকা পাওয়া যাইতেছে। শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ করা যায়, তন্তুবায়-কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শংখকার, তক্ষণ-সূত্রধার, স্বর্ণকার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক ইত্যাদি; বণিক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা পাইতেছি, তৈলিক, তৌলিক, মোদক, তাম্বুলী, গান্ধিক-বণিক, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, ধীবর, ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতকের পূর্বে শ্রেণী হিসাবে শিল্পী - বণিক - ব্যবসায়ীদের যে প্রাধান্য রাষ্ট্রে ও সমাজে ছিল, সেই প্রাধান্য ও আধিপত্য সপ্তম শতকের পর হইতেই কমিয়া গিয়াছিল। বণিক ও ব্যবসায়ী বৃত্তিধারী যেসব বর্ণের তালিকা উপরোক্ত দুই পুরাণ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, লক্ষণীয় এই যে, ইঁহারা সকলেই ক্ষুদ্র বণিক ও ব্যবসায়ী। প্রাচীনতর কালের, অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহরা কোথায় গেলেন? আমি পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই প্রাচীন বাংলার সমাজ কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে,

এবং ক্ষেত্রকর-কর্ষকেরাও বিশেষ একটি শ্রেণীরূপে গড়িয়া ওঠেন। শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে হইল ঠিক ইহার বিপরীত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত দেখি—বোধহয় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক হইতেই, রাষ্ট্রে ও সমাজে ইঁহারাই ছিলেন প্রধান, তাঁহাদেরই আধিপত্য ছিল অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা বেশি। ইহার একমাত্র কারণ, তদানীন্তন বাঙালী সমাজ প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর। কৃষিও তখন ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু প্রধান ও প্রথম উপায় আর থাকে নাই, এবং সেই জন্যই রাষ্ট্রে ও সমাজে ইঁহাদের প্রাধান্যও আর থাকে নাই। লক্ষণীয় যে, অনেক শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণে মধ্যম সংকর- বা অসৎশূদ্র -পর্যায়ভুক্ত; যাঁহারা উত্তম সংকর- বা সৎশূদ্র -পর্যায়ভুক্ত তাঁহাদেরও মর্যাদা করণ-কায়স্থ, বৈদ্য-অম্বষ্ঠ, গোপ, নাপিত প্রভৃতির নিচে। বল্লালচরিতের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, বণিক ও বিশেষভাবে সুবর্ণবণিকদের তিনি সমাজে পতিত করিয়া দিয়াছিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্রে ও সমাজে ইঁহাদের প্রাধান্য থাকিলে এইরূপ স্থান নির্দেশ বা অবনতিকরণ কিছুতেই সম্ভব হইত না।

সদ্যোক্ত মন্তব্য ঐতিহাসিক অনুমান সন্দেহ নাই, তবে, এই অনুমানের স্বপক্ষে সমসাময়িক যুগের (দ্বাদশ শতক) একটি কবির একটি শ্লোক আমি উদ্ধার করিতে পারি। এই শ্লোকটিতে বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবনতি এবং কৃষক-ক্ষেত্রকর সম্প্রদায়ের উন্নতির ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি গোবর্ধনাচার্য তাঁহার এই পদটিতে বলিতেছেন:

> "হে শক্রধ্বজ! যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়! ইদানীংকালে লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ অথবা মেঢ়ি (গোরু বাঁধিবার গোঁজ) করিতে চাহিতেছে।"

পাঁচ

প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের সাহায্যে আমরা যাহা পাইলাম তাহার সার মর্ম এই। সুপ্রাচীন বাংলার শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে পঞ্চম শতকের আগে উপাদানের অভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, জাতকের গল্প, মিলিন্দপঞ্হ, পেরিপ্লাস্-গ্রন্থ, টলেমির বিবরণ, কথাসরিৎসাগরের গল্প, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র, মহাভারতের গল্প, গ্রীকঐতিহাসিকদের বিবরণ ইত্যাদি সমসাময়িক সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের একাধিক সুসমৃদ্ধ সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণী দেশে বিদ্যমান ছিল, এবং রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁহাদের প্রভাব এবং আধিপত্যও ছিল যথেষ্ট। ধনোৎপাদন- ও বণ্টন -ব্যবস্থায় এই শ্রেণীগুলির প্রভুত্বও সহজেই অনুমেয়। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্রে যে নাগর সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যে সদাগরী ধনতন্ত্রেরই সৃষ্টি এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ দেখি না। ধর্ম-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাজীবী একটি শ্রেণীর আভাসও পাওয়া যায়, এবং এই শ্রেণী জৈন এবং বৌদ্ধ যতি ও ব্রাহ্মণদের লইয়া গঠিত। সদাগরী ধনতন্ত্রপুষ্ট নাগর সভ্যতা তাঁহাদেরও স্পর্শ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া

যত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণই হউক, রাজপাদোপজীবীদের একটি শ্রেণীও গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদেরই অভিজাত প্রতিনিধি হইতেছেন গলদন—বাংলায় মৌর্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি অর্থাৎ মহামাত্র। সর্বনিম্ন শ্রেণীস্তরের একটু আভাসও পাওয়া যাইতেছে বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে; এই স্তরে ছিল ক্রীতদাসেরা। ক্রমপ্রসারমান আর্য-ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রান্তসীমায় যেসমস্ত আদিবাসী কোম স্থান পাইতেছিল তাহারাও অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহের নিম্নস্তরেই নিবদ্ধ হইতেছিল, এ অনুমানও খুব অসংগত নয়।

পঞ্চম শতকের গোড়া হইতে প্রায় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাসগত সামাজিক চেহারাটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা অনেক সহজ। এই পর্বে বাঙালী সমাজ প্রধানত শিল্প- ও ব্যবসা-বাণিজ্য -নির্ভর; অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর উল্লেখ না থাকিলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে তাঁহাদের প্রাধান্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কৃষক, ক্ষেত্রকর, কৃষিকর্ম, সবই সমাজে রহিয়াছে, কিন্তু যেহেতু সমাজ প্রথমত ও প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর, সেইহেতু কৃষকেরা সুসমদ্ধ সুসম্বদ্ধ শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু ষষ্ঠ শতকেই সামন্তপ্রথা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, ভূমির চাহিদা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সমাজ ভূমিসম্পদকেই যেন প্রধান সম্পদ বলিয়া মানিয়া লইবার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সপ্তম শতকের শেষার্ধ ও অষ্টম শতকের প্রায় প্রথমার্ধ জুড়িয়া এই বিবর্তন সম্পূর্ণ হইল; শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যেন ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় আর রহিল না। এই পর্বে অভিজাত ও অনভিজাত রাজপুরুষ, সংব্যবহারী ও রাজসেবকদের দেখা পাইতেছি; কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তখনও গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া রাজকর্মচারী বা রাজসেবকদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই; তাহার সূচনামাত্র দেখা যাইতেছে। জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীর পরিচয় এই যুগে সুস্পষ্ট। তাঁহাদের মর্যাদা ও সম্মাননা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নিম্নতর শ্রেণীস্তরের লোকেরা তো নিশ্চয়ই ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলির বাহিরে। অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে তাঁহারা গড়িয়া উঠেন নাই, উল্লেখও সেইহেতু নাই।

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত, বাঙালী সমাজ প্রধানত কৃষিনির্ভর। সামন্তপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত, ভূমিই সমাজের প্রধান সম্পদ, এবং সেই ভূমির অধিকারের ক্রমসংকুচীয়মান স্তর লইয়াই এই যুগের সমাজ। ইহার একপ্রান্তে মহামাণ্ডলিক-মহাসামন্তরা; অন্যদিকে লেশমাত্রভূমিবিহীন অসংখ্য প্রজার দল; মধ্যস্থলে ভূমি-সমৃদ্ধির ও অধিকারের নানা স্তর। এই বিচিত্র স্তরই প্রধানত শ্রেণীনির্দেশের দ্যোতক। ইহাই এই যুগের প্রথম ও প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্য। যেহেতু সমাজ প্রধানত ভূমিনির্ভর সেইহেতু এই পর্বে কৃষক-ক্ষেত্রকর শ্রেণীও সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সীমারেখা লইয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরও গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পী, বণিক এবং ব্যবসায়ীরাও সমাজে আছেন। কিন্তু ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর সমাজে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় নহে; সেইজন্য শ্রেণী হিসাবে রাষ্ট্রে এবং সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্যও আর নাই। স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার ফলে রাজপাদোপজীবী বলিয়া একটি সুস্পষ্ট শ্রেণী এই পর্বে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন স্তর; রাজপাদোপজীবী শ্রেণীরই আনুষঙ্গিক ছায়ারূপে রাষ্ট্রসেবক শ্রেণীর আভাসও

সুস্পষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে ভূমিসম্পদনির্ভর শ্রেণীস্তরসমূহের লোকদের দর্শনও মিলিতেছে। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীও সুস্পষ্ট; এই শ্রেণীতেও বিভিন্ন স্তর। একপ্রান্তে তিন্তিড়িপত্র- ও শাকান্ন -ভুক্ বিনয়নম্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; অন্যপ্রান্তে প্রভূত-অর্থসমৃদ্ধ রাজপণ্ডিত, বা পুরোহিত, পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনার ছদ্মবেশে সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী। ভূমিহীন সমাজ-শ্রমিকশ্রেণীও সুস্পষ্ট; ইঁহারা অধিকাংশ অন্ত্যজ- বা ম্লেচ্ছ -বর্ণবদ্ধ, স্বল্পসংখ্যক মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের নিম্নস্তর। পালপর্বে চণ্ডাল পর্যন্ত সমাজের নিম্নতম শ্রমিক-শ্রেণীস্তর সমাজদৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত; কিন্তু সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উগ্রতার ফলে তাঁহাদিগকে সমাজদৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ছয়

রাষ্ট্র ও শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিত পঞ্চম শতকের আগে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে দেখা যাইতেছে একটি শ্রেণী বরাবর রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিতেছে; ইঁহারা শিল্পী, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী ইত্যাদি। দেখিয়াছি, ইঁহারাই ছিলেন সেই যুগের প্রধান ধনোৎপাদক শ্রেণী; কাজেই রাষ্ট্রের পক্ষে ইঁহাদের আনুকূল্য খুবই স্বাভাবিক। আর-একটি শ্রেণীও রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ইঁহারা জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীর জৈন-বৌদ্ধ যতি সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ। এই শ্রেণী তখনও সম্পূর্ণ গড়িয়া উঠিয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে পরস্পর স্বার্থের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই; তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে মাত্র।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভূমিনির্ভর সামন্তপ্রথার প্রতিষ্ঠায় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইল— একটি বহুস্তরবদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রেণী; এবং আর-একটি জ্ঞানধর্মজীবী শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। সামন্তচক্র ছিল রাষ্ট্রের শক্তি ও নির্ভর; এবং এই সামন্তচক্রকে আশ্রয় করিয়াই ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অস্তিত্ব। কাজেই এই শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। জ্ঞানধর্মজীবী ব্রাহ্মণদের জীবিকানির্ভর ছিল ধর্মদেয়, ব্রহ্মদেয় ভূমি ও দক্ষিণা-পুরস্কারলব্ধ অর্থ। এই ভূমি ও অর্থ প্রাপ্তি নির্ভর করিত একদিকে রাষ্ট্র ও অন্যদিকে অভিজাত ভূম্যধিকারী শ্রেণীর কৃপার উপর। কাজেই ব্রাহ্মণরা এই দুয়েরই পোষক ও সমর্থক হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। তবে এই পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব বা আধিপত্য বড় একটা দেখা যাইতেছে না। ব্রাহ্মণরা সংখ্যায় তখনও স্বল্প, দেশে নবাগত অথবা নববর্ধিত, কাজেই প্রভুত্ব বিস্তারের সময় তখনও আসে নাই। পরে মোটামুটি সপ্তম-অষ্টম শতক হইতেই পৌর ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ক্ষমতা এবং অধিকারও হ্রাস পাইতে থাকে।

অষ্টম শতক হইতে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থবন্ধন আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এই ব্যাপারে পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রের পার্থক্য ছিল না। একান্তভাবে সামন্ততন্ত্রনির্ভর রাষ্ট্রে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং সমাজবিবর্তনের ইহাই নিয়ম। পাল ও চন্দ্র বংশ বৌদ্ধরাজবংশ হওয়া সত্ত্বেও, আগেই দেখিয়াছি, এই দুই রাষ্ট্রেই

ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। সেন-বর্মণ রাষ্ট্রে এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বাড়িয়াই গিয়াছিল এবং ভূম্যধিকারিতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে স্বার্থগ্রন্থিবন্ধন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বৌদ্ধ চন্দ্ররাজবংশের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা হয় নাই, কারণ অর্থ ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সমাজপদ্ধতির এই নিয়মই তখন কার্যকরী ছিল। তবে, বৌদ্ধ রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি ছিল উদার এবং সর্বত্রপ্রসারী এবং সেইহেতু পরবর্তী সেন-বর্মণ আমলের মতো পাল-চন্দ্র আমলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব ও আধিপত্য এমন সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিতে পারে নাই। পাল-চন্দ্র ও সেন-বর্মণ আমলে ভূম্যধিকারী শ্রেণীই রাষ্ট্রের প্রধান সহায় ও পোষক, এবং রাষ্ট্রও ইঁহাদের সহায় ও পোষক। সেন-বর্মণ রাষ্ট্র উপরন্তু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরও পোষক ও সহায়ক; পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের উদার সর্বত্রপ্রসারী দৃষ্টিও ইঁহাদের ছিল না। ইহার ফলেই বোধ হয় সেন-বর্মণ রাষ্ট্র সমাজের সকল শ্রেণীর সমর্থন ও পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই। অনুমান করা কঠিন নয় যে, শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন ও পোষকতা সেন-বর্মণ রাষ্ট্র লাভ করিতে পারেই নাই। ভূমিনির্ভর কৃষিপ্রধান সমাজে ও রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী অবজ্ঞাত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। তাহা ছাড়া, অন্ত্যজ- ও ম্লেচ্ছ -পর্যায়ভুক্ত যে সুবৃহৎ নিম্নতম সমাজ-শ্রমিক তাঁহারাও বোধ হয় সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। ইঁহাদের অনেকেই বজ্রযান-কালচক্রযান-সহজযান-মন্ত্রযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, শৈব তান্ত্রিক ধর্ম, নাথ ধর্ম ইত্যাদির নানা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের ধর্ম ও সমাজগত আদর্শ এইসব অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ধর্ম ও আচার সুনজরে দেখিত না। এইসব ভূমিবিহীন কৃষক ও অসংখ্য ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ সমাজ-শ্রমিকের কোন অধিকারই যে ছিল না, সমসাময়িক স্মৃতি-পুরাণই তাহার প্রমাণ।

অষ্টম অধ্যায়

গ্রাম-ও নগর-বিন্যাস

এক

প্রাচীন বাংলার বাস্তব সভ্যতার প্রাক্-আর্য ভিত্তির কথা পূর্বে বলিয়াছি। কৃষিজীবী অস্ট্রিকভাষাভাষী কোমগুলির সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা ছিল একান্তই গ্রামীণ; অন্তত অস্ট্রিক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া সমাজতত্ত্ব আলোচনায় দেখা যায়, একান্ত কৃষিনির্ভর এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-কুটীরশিল্পনির্ভর সমাজে গ্রামগুলি সাধারণত খুব বড় হয় না, এবং শহরের সংখ্যাও বেশি থাকে না। কৃষিযোগ্য ভূমি কোথাও এত সুপ্রচুর থাকে না যে নগরের মতো সীমাবদ্ধ স্বল্প স্থানে বহুসংখ্যক লোককে পালন করিতে পারে। সেইজন্যই গ্রাম যত বৃহৎই হউক না কেন, আয়তনে বা লোকসংখ্যায় কিছুতেই নগরের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে না। অধিকন্তু, নগরকে কেন্দ্র করিয়া নগরের প্রয়োজন মিটাইবার মতো কোথাও সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র থাকে না, থাকিতে পারে না; নগরের বাহিরে দেশের জনপদ জুড়িয়া সেই কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত থাকে, এবং সেই বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকর্ম যাঁহাদের চালাইতে হয় তাঁহাদিগকে কৃষিক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া নিকটেই বাস করিতে হয়। তাঁহাদের বসতিস্থানগুলিই গ্রাম। কৃষিনির্ভর সভ্যতা সেইজন্য গ্রামকেন্দ্রিক হইতে বাধ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পগুলিও গ্রামকেন্দ্রিক, কারণ সেগুলি কৃষিকর্মেরই আনুষঙ্গিক, এবং কৃষিজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কৃষিকর্ম পরিচালনার জন্য প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন জল; জল যেখানে সহজলভ্য কৃষিকর্মও সেখানে সমৃদ্ধ। প্রাচীন বাংলায় তাহাই দেখিতেছি। গ্রামগুলির পত্তনও সেইজন্যই সর্বত্র নদী, নালা, খাটিকা, খাল, বিল ইত্যাদির তীরে তীরে।

পানীয় জলের প্রয়োজন অবশ্য নগরেও থাকে, কিন্তু সে পানীয় নদনদীর জলপ্রবাহ ছাড়া অন্য উপায়েও মিটানো যায়; যেমন কূপের সাহায্যে খুব সুপ্রাচীন কালেও হইয়াছে। তবু, যেখানে স্বল্পমাত্র স্থান আশ্রয় করিয়া বহুলোক বাস করে সেখানে জলপ্রবাহের একটা প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু, ইহা ছাড়াও, নগরসভ্যতা নদী ও প্রশস্ত যাতায়াতপথকে আশ্রয় করিবার অন্য একাধিক কারণ প্রাচীন কালে ছিল। নগর একপ্রকারের নয়, কিংবা একই প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই। রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দেশের নানা জায়গায় কতকগুলি কেন্দ্র রচনার প্রয়োজন হইত; প্রধানত যাতায়াতের সুবিধার জনাই এইসব শাসনাধিষ্ঠানের কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল হয় নদীর তীরে, অথবা সুপ্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে, অথবা দুয়েরই আশ্রয়ে। রাজা-মহারাজদের রাজধানী ও জয়স্কন্ধাবারগুলি সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য; এবং এগুলিও গড়িয়া উঠিয়াছিল নদী বা রাজপথ বা উভয়েরই আশ্রয়ে। সৈন্যচালনা এবং সামরিক প্রয়োজনেও রাজধানী ও জয়স্কন্ধাবারগুলি নদী এবং

প্রশস্ত রাজপথ আশ্রয় করিত। আর-এক শ্রেণীর নগর গড়িয়া উঠিত একান্তই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃহত্তর শিল্পের প্রয়োজনে, যেমন নৌ-শিল্প, সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি। এইসব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র প্রশস্ত স্থলপথ বা জলপথ বা দুই পথের সংগমস্থলেই অবস্থিত হইত। তবে, সব নগরই যে এক-একটি পৃথক পৃথক কারণে গড়িয়া উঠে তাহা নয়; বরং প্রাচীন বাংলায় একাধিক কারণে এক-একটি নগরের পত্তন হইয়াছিল। সদ্যঃকথিত প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনেও কোন কোন নগর গড়িয়া উঠে, যেমন, এক-একটি স্থানের এক-একটি বিশেষ তীর্থমহিমা থাকে, এবং এইসব তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করিয়া বহু লোকের বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়, শিল্প ও ব্যবসাকর্ম বিস্তৃতি লাভ করে এবং ধীরে ধীরে নগর গড়িয়া উঠে। এইসব তীর্থ-কেন্দ্রে বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রও সময় সময় গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। বৃহৎ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সাধারণত পত্তন হইত গ্রাম বা নগর হইতে একটু দূরে, বিহার ও সংঘগুলি আশ্রয় করিয়া। এগুলি ঠিক নগর নয়, কিন্তু নগরোপম। প্রাচীন বাংলার এইরকম নগরোপম বৌদ্ধ-মহাবিহারের কিছু কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্রই হউক আর তীর্থকেন্দ্রই হউক, এগুলিরও আশ্রয় ছিল নদনদী প্রভৃতি জলপ্রবাহ এবং প্রশস্ত যাতায়াতপথ। সমাজতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, যে প্রয়োজনেই নগর গড়িয়া উঠুক না কেন, প্রধানত তাহাদের অর্থনৈতিক নির্ভর বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য; এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-অবনতির উপরই নগর-সভ্যতার উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে, যেমন কৃষির উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে গ্রামের উন্নতি-অবনতি।

প্রধানত কৃষিনির্ভর গ্রাম্য সভ্যতা এবং প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর নাগর সভ্যতা—এ দুয়ের আকৃতি শুধু নয়, প্রকৃতিও বিভিন্ন। গ্রামে যাঁহাদের বাস করিতে হইত, তাঁহারা সাধারণত কৃষিনির্ভর ভূম্যধিকারী, মহত্তর, কুটুম্ব, কৃষক বা ক্ষেত্রকর, সমাজ-শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, এবং কিছু কিছু কৃষি- ও গৃহস্থ -কর্মসম্পৃক্ত শিল্পী। ইঁহাদের জীবনের কামনা-বাসনা, ভাবনা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা সমস্তই কৃষিকর্ম এবং গ্রাম্য গার্হস্থ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিত। নগরে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত, ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজকর্মচারী, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, শিল্পী, বণিক ইত্যাদি, এবং ইঁহাদেরই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া, উপলক্ষ করিয়া স্থায়ী অস্থায়ী অন্যান্য বহুতর লোক; ইঁহাদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্য প্রয়োজন এবং অন্যান্য আরও বহুতর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বহুতর সমাজ-শ্রমিক। গ্রামে যেসব কৃষি- ও শিল্প -দ্রব্য ইত্যাদি উৎপন্ন হইত তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র নগরে-বন্দরে; কাজেই উৎপাদিত ধনের বণ্টনকেন্দ্র গ্রামে নয়। শাসনকেন্দ্রও নগরে, বাণিজ্যকেন্দ্রও তাহাই। কাজেই সামাজিক ধনের বৃহত্তর গতিকেন্দ্রই হইতেছে নগর; বণ্টনব্যবস্থাও প্রায় সবটাই নগরে। এই ব্যবস্থায় জাগতিক সুখ-সুবিধা যাহা কিছু তাহাও বেশি ভোগ করিত নগরগুলিই; বিশেষত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যতদিন ধনাগমের প্রথম ও প্রধান উপায় ততদিন তো নগরগুলিই দেশের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল। অবশ্য, সমাজ যে পরিমাণে কৃষিনির্ভর সেই পরিমাণে গ্রামগুলিও প্রাধান্য লাভ করে; প্রাচীন বাংলায়ও তাহা হইয়াছিল; ইহাই সমাজবিবর্তনের গতি-প্রকৃতির ধারা।

এইসব কারণেই প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের পূর্ণতর পরিচয় পাইতে হইলে গ্রাম- ও নগর -বিন্যাস সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সমস্ত তথ্যই জানা প্রয়োজন।

দুই

বাংলার লিপিগুলিতে বিক্রীত বা দত্ত ভূমি ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির বিবরণ যেভাবে পাইতেছি তাহা হইতে বাংলার গ্রামের সংস্থান ও সংগঠন সম্বন্ধে কতকগুলি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। পঞ্চম শতকের সাত-আটখানা লিপির প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি বাস্তুভূমির চেয়ে খিলভূমির চাহিদা অনেক বেশি, এবং খিলভূমি যে চাষের জন্যই দান-বিক্রয় হইতেছে এ সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই; পরবর্তী লিপিগুলির সাক্ষ্যও তাহাই। বস্তুত, আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত সমস্ত সাক্ষ্যেই দেখিতেছি কৃষিযোগ্য এবং কৃষি- ভূমির উপরই গ্রাম্য সমাজের নির্ভর, এবং তাহার চাহিদা উত্তরোত্তরই বাড়িয়া চলিয়াছে। লিপিগুলির বিশ্লেষণে স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, সেইসব খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষেত্র সমস্তই একে অন্যের সঙ্গে সংলগ্ন, এক খিলক্ষেত্রের সীমা আর-এক ক্ষেত্রের সীমার একেবারে গাত্রলগ্ন; বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রভূমি প্রায় নাই বলিলেই চলে। নূতন গ্রামের পত্তন যেখানে হইতেছে সেখানে সমস্ত বাস্তু- ও ক্ষেত্র -ভূমি একত্র নেওয়া হইতেছে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

পঞ্চম শতকের পাহাড়পুর পট্টোলীতে, বৈগ্রামলিপিতে, ষষ্ঠ শতকের গুণাইঘর পট্টোলীতে, সপ্তম শতকে জয়নাগের বপ্যঘোষবাট পট্টোলীতে যেসব ক্ষেত্রভূমি, বাস্তুভূমি এবং গ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যাইতেছে, ক্ষেত্রভূমি ক্ষেত্র-ভূমির সঙ্গে, এবং বাস্তুভূমি বাস্তুভূমির সঙ্গে একেবারে সংলগ্ন, এবং কোথাও কোথাও গ্রামও গ্রামের সংলগ্ন।

ইহা হইতে দুইটি তথ্য পরিষ্কার। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তু- ও কৃষি -ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে, সর্বপ্রকার ভূমির চাহিদা বাড়িয়াছে, বন-অরণ্য-ভূমি পরিষ্কার করিয়া নূতন গ্রামের পত্তন হইয়াছে, পতিত অথচ কর্ষণযোগ্য ভূমি কর্ষণাধীন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বাস্তু- ও ক্ষেত্র -ভূমি লইয়া প্রত্যেকটি গ্রাম পৃথক অথচ ঘনসন্নিবিষ্ট, দৃঢ়সংবদ্ধ, অর্থাৎ গ্রামান্তর্গত গৃহস্থবাড়িগুলি এবং কৃষিক্ষেত্রখণ্ডগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নয়। একান্তভাবে কৃষিনির্ভর গ্রামে তাহা হইতে পারে না, বরং প্রবণতা দেখা যায় ঠিক তাহার বিপরীত দিকে। তাহা ছাড়া, গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ও দৃঢ়সংবদ্ধ হইবার অন্য কারণও আছে। ভয়ভীতি, নানা-প্রকারের বিপদ-উৎপাত প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও গ্রামবাসীরা ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া বাস করিত, এবং সাধারণত এক-এক বৃত্তি আশ্রয় করিয়া সমশ্রেণীর লোকদের লইয়া এক-একটি পাড়া গড়িয়া উঠিত। এই ধরনের পাড়া ও গ্রামের গঠন প্রাচীন কৌমসমাজেরই দান।

প্রাচীন লিপিমালায় অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; সব গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যা সমান ছিল না, ইহা তো সহজেই অনুমেয়; প্রকৃতিও একপ্রকার ছিল না, এরূপ অনুমানেও বাধা নাই। ছোট ছোট গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম ছিল পাটক (বা পাড়া)। মল্লসারুললিপিতে বাটক নামে একটি জনপদবিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে। এই বাটক ও পাটক সমার্থক, এবং একই শব্দ বলিয়া মনে হইতেছে। আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত এই পাটক - বিভাগ বিদ্যমান। যেসব গ্রামের অবস্থিতি প্রশস্ত জল- ও স্থল -পথের উপর, বাস্তুক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র যেখানে সুলভ ও সুপ্রচুর, যেসব গ্রামে শিল্প-বাণিজ্যের সুযোগ ও প্রচলন বেশি, কিংবা যেসব গ্রামে শাসনকার্য পরিচালনার কোন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থাকিত, শিক্ষা, সংস্কৃতি বা ধর্মকর্মের কেন্দ্র

বলিয়া পরিগণিত হইত সেইসব গ্রাম সদ্যঃ-উক্ত এক বা একাধিক কারণে আয়তনে, লোকসংখ্যায় এবং মর্যাদায় অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিত, সন্দেহ নাই। এইরকম দুই-চারিটি বৃহৎ এবং মর্যাদাসম্পন্ন গ্রামের খবর লিপিমালা ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। আকৃতি ও প্রকৃতির এই পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেক গ্রামই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে একপ্রকার; যেমন, প্রত্যেক গ্রামই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত। বাস্তুভূমি ও ক্ষেত্রভূমি দুই প্রধান অঙ্গ; ইহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ঊষরভূমি, মালভূমি, গর্তভূমি, তলভূমি, গোচরভূমি, বাটক-বাট, গোপথ গোবাট-গোমার্গভূমি ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি—একেবারে পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। তাহা ছাড়া খাল, বিল, খাটিকা, খাটা, পুষ্করিণী, নদী, নদীর খাত, গাঙ্গিনিকা ইত্যাদির উল্লেখ তো আছেই। গোচর বা গোচারণভূমি প্রায়ই গ্রামের ক্ষেত্রভূমির প্রান্তসীমায় অথবা একেবারে এক পাশে, এবং সেইখান হইতে গ্রামের সীমা ঘেঁষিয়া গ্রামের ভিতর পর্যন্ত গোবাট-গোমার্গ-গোপথ। কোন কোন গ্রামে হট্ট, হট্টীয়গৃহ, আপণ ইত্যাদির উল্লেখও পাইতেছি; নানা দেবতার মন্দির, দেবকুল, জৈন ও বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদির উল্লেখও আছে। সব গ্রামে হাট, বাজার, মন্দির, বিহার ইত্যাদি থাকিত না; লিপিতেও তেমন উল্লেখ নাই, যেসব গ্রামে ছিল সেসব ক্ষেত্রেই উল্লেখ পাইতেছি মাত্র। কোন কোন গ্রামে বনজঙ্গল, ঝাড়, বড় বড় গাছ ইত্যাদিও ছিল লিপিতে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এইসব বনজঙ্গল হইতে জ্বালানি কাঠ, ঘরবাড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি সংগ্রহ হইত। বিক্রীত ও দত্ত ভূমির শ্রেণীবিভাগের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিগুলিতে পাওয়া যায় তাহাতে এ তথ্য সুস্পষ্ট যে, পঞ্চম শতকের আগেই বাংলার গ্রাম্য কৃষিনির্ভর সমাজ সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত ভাবে সমস্ত অধিগম্য ও প্রয়োজনীয় ভূমিকে সামাজিক স্বার্থসাধনের বিষয়ীভূত করিয়াছিল।

গ্রামগুলির আপেক্ষিক আয়তন সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত সেন আমলের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। বল্লালসেনের নৈহাটিলিপিতে দেখি; বল্লাহিট্ঠা গ্রামের আয়তন ৭ ভূপাটক ৭ দ্রোণ ১ আঢক ৩৪ উন্মান এবং ৩ কাক (বাস্তু, ক্ষেত্র, পতিত ভূমি এবং খালসহ), এবং বার্ষিক উৎপত্তিক ৫০০ কপর্দকপুরাণ। এই গ্রাম বর্ধমানভুক্তির উত্তররাঢ় মণ্ডলের অন্তর্গত। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুরলিপিতে দেখিতেছি, একই বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকার অন্তর্ভুক্ত বিড্ডারশাসন গ্রামের আয়তন (অরণ্য, জল, স্থল, গর্তভূমি, ঊষরভূমি, ইত্যাদি সহ) ৬০ ভূদ্রোণ ১৭ উন্মান; দ্রোণপ্রতি ১৫ পুরাণ হিসাবে বার্ষিক উৎপত্তিক ৯০০ পুরাণ। এই রাজারই তর্পণদীঘিলিপিতে দেখিতেছি, বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেলহিষ্ঠী গ্রামের আয়তন মাত্র ১২০ আঢ়াবাপ (আঢক) ৫ উন্মান; বার্ষিক উৎপত্তিক মাত্র ১৫০ কপর্দকপুরাণ। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম তিন বিভিন্ন আয়তনের। পাল ও সেন আমলের, এমন কি আগেকার পর্বের লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে, অধিকাংশ গ্রামই কোন নদনদী, খাল-বিল, খাটিকা, খাড়িকা প্রভৃতির তীরে অবস্থিত; অধিকাংশ গ্রামে ঘাট (সঘট্ট), পুষ্করিণী ইত্যাদিও দেখা যায়।

গ্রাম্যসমাজ যে কৃষিপ্রধান সমাজ তাহা তো বারবারই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে গ্রামে শিল্পীদের বাস ছিল না। বাঁশ ও বেতের শিল্প, কাষ্ঠশিল্প, মৃৎশিল্প, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প ইত্যাদির কেন্দ্র গ্রামেই ছিল। কৃষিকর্মের প্রয়োজনীয় বাঁশ ও বেতের নানাপ্রকার পাত্র ও ভাণ্ড, ঘরবাড়ি ও নৌকা,

মাটির হাঁড়িভাণ্ড প্রভৃতি, দা'-কুড়াল-কোদাল, লাঙ্গলের ফলা, খন্তা ইত্যাদি নিত্য-ব্যবহার্য কৃষিযন্ত্রাদি ইত্যাদির প্রয়োজন তো গ্রামেই ছিল বেশি। কার্পাস ফুল ও বীচি, তাঁত, তুলা, তুলাধুনা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় যে গ্রামের লোকেদেরই বেশি তাহার ইঙ্গিত পাইতেছি বিজয়সেনের দেওপাড়ালিপিতে; চর্যাগীতিগুলিতে এবং সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের দু-একটি শ্লোকে। সুতাকাটা দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহস্থবাড়ির মেয়েদের দৈনন্দিন কর্ম ছিল; কাপড় বুনিতেন তন্তুবায়-কুবিন্দকেরা, যুগি বা যুগীরা। কিন্তু এইসব শিল্প ছাড়া কোন কোন গ্রামে দুই-একটি সমৃদ্ধতর শিল্পও প্রচলিত ছিল। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের লিপিতে দেখিতেছি এক কাংসকার (বা কাঁসারী) গোবিন্দ, এক নাবিক দ্যোজ্যে এবং এক দন্তকার (হাতির দাঁতের শিল্পী) রাজবিগা নিজ নিজ গ্রামে বসিয়াই তাঁহাদের স্বীয় বৃত্তি অভ্যাস করিতেন। দুই-চারি জন ছোটখাট ব্যবসায়ীও যে গ্রামে বাস করিতেন না তাহা নয়। ষষ্ঠ শতকের কোটালিপাড়ার দুইটি পট্টোলীতে উল্লিখিত ভূমিসীমা প্রসঙ্গে যে "নৌদণ্ডক", "ঘাট" এবং "নাবাতক্ষেণী"র উল্লেখ পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, কোন কোন গ্রাম সমৃদ্ধ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রও ছিল।

গ্রামে কাহারা প্রধানত বাস করিতেন তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়; লিপি-গুলিতে এবং বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণেও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রামবাসী ছিলেন সাধারণত ব্রাহ্মণেরা, ভূমিবান্ মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্বরা; ক্ষেত্রকরেরা, বারজীবীরা, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকেরা; তন্তুবায়-কুবিন্দক, কুম্ভকার, কাংসকার, মালাকার, চিত্রকার, তৈলকার, সূত্রধার প্রভৃতি শিল্পীরা; তৌলিক, মোদক, তাম্বুলী, শৌণ্ডিক, ধীবর-জালিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা, গোপ, নাপিত, রজক, আভীর, নট-নর্তক প্রভৃতি সমাজ-সেবকেরা; বরুড (বাউড়ী), চর্মকার, ঘট্টজীবী (পাটুনী), ডোলবাহী (ডুলে, ডুলিয়া), ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি) ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী ?), বেদিয়া (বেদে), মাংসচ্ছেদ, চর্মকার, চণ্ডাল, কোল, ভীল্ল, শবর, পুলিন্দ, মেদ, পৌণ্ড্রিক (পোদ ?) প্রভৃতি অন্ত্যজ ও আদিবাসী পর্যায়ের লোকেরা। শেষোক্ত পর্যায়ের লোকেরা সাধারণত বাস করিতেন গ্রামের এক প্রান্তে। কোন কোন গ্রামে সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠীরাও বাস করিতেন বলিয়া মনে হইতেছে, যেমন দক্ষিণরাঢ়দেশের ভূরিসৃষ্টি বা বর্তমান ভুরসুট গ্রামে। শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী -গ্রন্থে (৯৯১-৯২) আছে, এই গ্রামটি ব্রাহ্মণদের একটি বড় কেন্দ্রস্থল তো ছিলই, তাহা ছাড়া বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠীজনের আশ্রয়ও ছিল।

তিন

আয়তনে ও মর্যাদায় গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি গ্রামের লিপিপ্রদত্ত বিবরণ উল্লেখ করিলে প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলির সংস্থান ও বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা একটু পরিষ্কার হইতে পারে।

পশ্চিম-বাংলার গ্রাম লইয়াই আরম্ভ করা যাক্। ঔদুম্বরিক বিষয়ের বপ্যঘোষবাট গ্রামের কথা আগেই বলিয়াছি। মল্লসারুললিপিতে কয়েকটি বাটক-পাটক এবং অগ্রহার গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। নয়পালের ইর্দালিপিতে

বৃহৎ-ছত্তিবন্না নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে; এই গ্রাম ছিল বর্ধমানভুক্তির দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ভোজবর্মার বেলাবলিপিতে উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে; ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে এই গ্রামকে আর্যাবর্তের ভূষণ, সমস্ত গ্রামের অগ্রগণ্য এবং রাঢ়লক্ষ্মীর অলংকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন সিদ্ধল গ্রাম এবং বর্তমান বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রাম এক এবং অভিন্ন। উত্তররাঢ়মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথীর অন্তর্গত বল্লাহিট্‌ঠা নামে আর-একটি গ্রামের ভৌগোলিক বিন্যাসের একটু বিস্তৃততর খবর পাওয়া যাইতেছে বল্লালসেনের নৈহাটিলিপিতে। খাণ্ডয়িল্লা (খাড়ুলিয়া), অম্বয়িল্লা (অম্বলগ্রাম), জেলাসোথী (বর্তমানেও ঐ নাম), মোলাডণ্ডী (মুড়ুন্দি) এবং বাল্লাহিট্‌ঠা (বালুটিয়া) গ্রাম তাহাদের প্রাচীন নামস্মৃতি লইয়া এখনও বিদ্যমান; ইহাদের বর্তমান সংস্থান হইতে প্রাচীন বাংলার গ্রামসংস্থানের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে বিড্ডারশাসন নামে আর-একটি গ্রামের পরিচয় পাইতেছি; এই গ্রাম বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম-খাটিকাভুক্তির বেতড্ডচতুরকের (হাওড়া জেলার বর্তমান বেতড়) অন্তর্গত। এই রাজারই শক্তিপুর শাসনে আরও কতকগুলি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আর-একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াই পশ্চিম-বাংলার গ্রাম-বর্ণনা শেষ করা যাইতে পারে। ভূরিসৃষ্টি গ্রামের কথা আগেই বলিয়াছি। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেও রাঢ়দেশান্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠীকা নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রামের উল্লেখ আছে (একাদশ শতক)। হুগলী জেলার দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে এই গ্রাম আজও ভুরসুট নামে পরিচিত; সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া এই গ্রাম ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল। অষ্টাদশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় ভুরসুটের জমিদার নরেন্দ্র রায়ের পুত্র ছিলেন।

পূর্ব- ও দক্ষিণ-বঙ্গের কয়েকটি গ্রামের একটু পরিচয় এইবার লওয়া যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতকের বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘরলিপিতে উত্তরমণ্ডলভুক্ত কাণ্ডেড়দক গ্রামের একটু বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। গ্রামটি মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষু-সংঘের একটি বড় কেন্দ্র ছিল এবং অন্তত দুইটি বৌদ্ধবিহারও ছিল এই গ্রামে। তাহা ছাড়া প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি মন্দিরও ছিল। গ্রামটির অবস্থিতি যে নিম্নশায়ী জলাভূমিতে এই সম্বন্ধে লিপিগত সংবাদ কোন সংশয়ই রাখে না। বর্তমান ত্রিপুরার ভাটি অঞ্চলে তাহা কিছু অসম্ভবও নয়। এই শতকেই ফরিদপুরে কোটালি-পাড়া অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গোপচন্দ্র-ধর্মাদিত্য-সমাচার-দেবের পট্টোলীগুলিতে। বারকমণ্ডলের একটি গ্রামে বহু ভূমি পতিত পড়িয়াছিল; সেই ভূমি হইতে রাজকোষে কোন অর্থাগম হইত না। কাজেই রাজা যখন সেই ভূমি ধর্মকার্যের জন্য বিক্রয় করিলেন তখন তাঁহার অর্থলাভ ও পুণ্যলাভ দুইই হইল। বারকমণ্ডলের আর-একটি গ্রামে বিক্রীত ভূমির সীমায় নাবাতক্ষেণীর উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় এই গ্রামেও একটি পত্তন বা বন্দর ছিল। এই মণ্ডলেরই আর-একটি গ্রামের বিক্রীত ভূমিসীমায় পাইতেছি একটি গোযান চলাচলের পথ, পাকুড় গাছ এবং একটি নৌদণ্ডক। তদানীন্তন কোটালিপাড়া অঞ্চলের গ্রামগুলি যে নৌগামী ব্যবসাবাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল, নৌদণ্ডক, নাবাতক্ষেণী, নৌযোগ, নৌঘাট প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার তাহার আংশিক প্রমাণ। অষ্টম শতকে ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা শহর হইতে ৩০ মাইল, শীতললক্ষ্যার অদূরে আশ্রফপুর গ্রাম) কয়েকটি গ্রামের পরিচয় পাইতেছি দেবখড়্গের আশ্রফপুরলিপি দুইটিতে। এই অঞ্চলের একটি বা একাধিক

গ্রামের বিভিন্ন পাটকে (পাড়ায়) চারিটি বৌদ্ধবিহার ও বিহারিক (ছোট বিহার) ছিল, এবং ইহাদের আচার্য ছিলেন বন্দ্য সংঘমিত্র। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রতিষ্ঠান, গঞ্জ, বন্দর, নৌকাযাতায়াতপথ ইত্যাদি লইয়া ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরার পূর্বোক্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে সমৃদ্ধজনপূর্ণ বসতি ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

ধর্মপালের খালিমপুরলিপিতে ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের মহন্তাপ্রকাশ-বিষয়ের অন্তর্গত ক্রৌঞ্চশ্বভ্রগ্রামের সীমাপরিচয়প্রসঙ্গে এই গ্রাম ও অন্য আরও তিনটি গ্রামের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উপরোক্ত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল যে দক্ষিণ-বঙ্গের ব্যাঘ্রাধ্যুষিত নিম্নশায়ী বনময় জনপদ এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। সমুদ্র-তীরবর্তী নিম্নভূমি বলিয়াই এইসব গ্রামাঞ্চলে গঙ্গিনিকা, যানিকা, স্রোত, স্রোতিকা, জোটিকা, খাটিকা, দ্বীপ, দ্বীপিকা প্রভৃতির এত প্রাদুর্ভাব। বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে বঙ্গের নাব্যভাগে রামসিদ্ধিপাটক নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। এই নাব্যভাগেই বিনয়তিলক নামে আর-একটি গ্রাম ছিল। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে বিক্রমপুর ভাগের অন্তর্গত তালপাড়া পাটক নামে আর-একটি গ্রামের খবর পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়লিপিতে পিঞ্জোকাষ্ঠি এবং কন্দর্প-শংকর নামে দুইটি গ্রামের উল্লেখ আছে। পিঞ্জোকাষ্ঠি বর্তমান ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগনার পিঞ্জরি গ্রাম। এই রাজারই সাহিত্য-পরিষদ্‌লিপিতে বিক্রম-পুর ভাগের [illegible] অন্তর্গত দেউলহস্তি গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যাইতেছে, এই গ্রামের পূর্বে ও পশ্চিমে [illegible] নদী। শ্রীমৎ ডোম্মনপালের সুন্দরবনলিপিতে পূর্বখাটিকার [illegible] নামে একটি গ্রামের সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় পাইতেছি, এই গ্রামের বাহিরে [illegible] একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়ালিপিতে মাথরণ্ডিয়া নামে আর-একটি গ্রামের অবস্থিতি ছিল ব্যাঘ্রতটীতে; ইহার সংলগ্ন ছিল আরও দুইটি গ্রাম; শান্তিগোপী এবং মালামঞ্চবাটী। বাংলার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রান্তের চাটিগ্রাম আনুমানিক দশম শতক হইতেই একটি সমৃদ্ধ ও মর্যাদাসম্পন্ন গ্রাম বলিয়া মনে হইতেছে। তিব্বতী বৌদ্ধপুরাণমতে, চাটিগ্রাম বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরু তিল-যোগীর জন্মভূমি ছিল (দশম শতক)। এই গ্রামে পণ্ডিত-বিহার নামে সুবৃহৎ একটি বৌদ্ধবিহার ছিল এবং বিহারে বসিয়া বৌদ্ধ আচার্যেরা [illegible] ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাদবিতর্ক করিতেন। এই চাটিগ্রামই পরে মধ্যযুগে পূর্ব-বাংলার বৃহত্তম সামুদ্রিক বাণিজ্যের বন্দর-নগরে পরিণত হইয়াছিল চট্টগ্রাম নাম লইয়া। রাজা গোবিন্দকেশবদেবের ভাটেরালিপিতে একসঙ্গে ২৮টি গ্রামের উল্লেখ আছে। ভট্টপাটক বর্তমান ভাটেরা গ্রাম, কুলাউড়া-শ্রীহট্ট রেলপথের পাশেই। বাকী ২৮টি গ্রামের নাম প্রায় অবিকৃতভাবে এখনও ভাটেরার আশেপাশে বিদ্যমান। এই গ্রামগুলিতেই প্রায় নয় শত বৎসরের পূর্বেকার গ্রামবিন্যাসের চেহারা এখনও কতকটা অনুমান করা চলে।

দামোদরপুরে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের একটি লিপিতে (৩নং) পলাশবৃন্দক নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে; পলাশবৃন্দক যে গ্রাম, এই ইঙ্গিত লিপিতেই পাওয়া যায়। পলাশবৃন্দক বোধ হয় খুব বড় গ্রাম ছিল, এবং ইহা যে একাধিক 'পলাশ'-পূর্বনাম গ্রামের সমষ্টি ছিল তাহা 'বৃন্দক' শব্দের ব্যবহার হইতেও অনুমেয়। এই লিপিতেই চণ্ডগ্রাম নামে আর-একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে অনেক গ্রামের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে স্বচ্ছন্দপাটক, সাতু-বনাশ্রমক, হিমবচ্ছিখরাবস্থিত ডোঙ্গাগ্রাম, বায়িগ্রাম (বর্তমান বৈগ্রাম, বগুড়া জেলা)।

পুরাণবৃন্দিকহরি, পুষ্ঠিমপোট্টক, গোষাটপুঞ্জক, নিম্নগোহালী, পলাশাট্ট, বট-গোহালী প্রভৃতি গ্রাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামগুলির প্রায় সবই দিনাজপুর-রাজসাহী-বগুড়া জেলার অন্তর্গত। মুঙ্গের জেলার নন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে অম্বিল গ্রামাগ্রহার নামে একটি অগ্রহার গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এই গ্রামে বিষয়পতি ছত্রমহের অধিষ্ঠান-অধিকরণের অবস্থিতি হইতে গ্রামটির আয়তন ও মর্যাদা অনুমান করা কঠিন নয়। শাসনাধিষ্ঠানরূপে কোন কোন গ্রাম যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়া আয়তনে ও গুরুত্বে বাড়িয়া উঠিত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। অম্বিলগ্রামাগ্রহারের মতো পলাশবৃন্দকও ছিল এইরকম একটি গ্রাম; এই গ্রাম হইতে রাজকীয় শাসনের নির্গতি দেখিয়া অনুমান করা চলে যে পলাশবৃন্দকেও শাসনাধিষ্ঠানের একটি কেন্দ্র ছিল।

প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপিতে কোটীবর্ষ-বিষয়ের গোকলিকা-মণ্ডলের অন্তর্গত কুরটপল্লিকা গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এই গ্রামের একটি অংশের নাম ছিল চুটপল্লিকা (অর্থাৎ ছোটপল্লী বা ছোটপাড়া)। দ্রাবিড়ী চুট শব্দের অর্থই তো ছোট। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছিলিপিতে কোটীবর্ষ-বিষয়ান্তর্গত ব্রাহ্মণীগ্রাম-মণ্ডল নামে একটি মণ্ডলের উল্লেখ আছে; ব্রাহ্মণীগ্রামই সম্ভবত মণ্ডলের শাসনাধিষ্ঠান ছিল, এবং সেইহেতু ঐ গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই মণ্ডলটির নামকরণ হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগরলিপিতে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুর-আবৃত্তিতে দাপানিয়া পাটক নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে; এই রাজারই তর্পণদীঘি শাসনে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলাহিষ্টী গ্রামের পূর্বসীমায় বৌদ্ধবিহার-সীমাজ্ঞাপক একটি বাঁধের উল্লেখ দেখিতেছি। কামরূপরাজ জয়পালের সময়ের (একাদশ শতক) সিলিমপুরলিপিতে বালগ্রাম নাম আর-একটি গ্রাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পুণ্ড্রদেশান্তর্গত এই গ্রাম বরেন্দ্রীর অলংকারস্বরূপ ছিল এবং এই গ্রাম ও তর্কারির মধ্যে সকটীনদীর ব্যবধান ছিল। তর্কারি ব্রাহ্মণ ও করণদের খুব বড় কেন্দ্র; তর্কারি-তর্কারিকা-তর্কার-টক্কার-টকারীর উল্লেখ সমসাময়িক অনেক লিপিতেই পাওয়া যায়। সন্দেহ নাই যে, এই গ্রাম সমসাময়িক কালে বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে একাধিক কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিশ্বরূপসেনের মদন-পাড়ালিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুরলিপি দুইই নির্গত হইয়াছিল ফল্গুগ্রাম হইতে এবং লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগরলিপি ধার্যগ্রাম জয়স্কন্ধাবার হইতে। ফল্গুগ্রাম ও ধার্যগ্রামে জয়স্কন্ধাবার স্থাপনার ইঙ্গিত হইতে এই অনুমান স্বাভাবিক যে, সমসাময়িক কালের সেনরাষ্ট্রে এই গ্রাম দুইটির বিশেষ একটা মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল, নহিলে মহারাজের জয়স্কন্ধাবার গ্রামে স্থাপিত হইতে পারিত না; কোন কোন গ্রামে যে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইত তাহার কতকটা যুক্তিসিদ্ধ অনুমান তো ব্রাহ্মণীগ্রাম-মণ্ডল হইতেই পাওয়া যায়। সেন আমলের শেষের পর্বে কোন কোন গ্রাম জয়স্কন্ধাবারের মর্যাদাও লাভ করিয়াছে, দেখিতেছি।

চার

বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন বহুলাংশে সুপ্রাচীন অস্ট্রিকভাষাভাষী আদিবাসীদের দানের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, নাগরিক সভ্যতা তেমনই পরিমাণে ঋণী দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকদের নিকট। নরতাত্ত্বিক গবেষণা ও

প্রাচীন বাংলার অনেক ব্যক্তি- ও স্থান -নাম সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ শব্দতাত্ত্বিক গবেষণা হইয়াছে তাহা এই ইঙ্গিতের সমর্থক।

বাংলাদেশ প্রধানত গ্রামপ্রধান, কিন্তু নগরও এদেশে একেবারে কম ছিল না এবং নাগরিক সভ্যতাও একেবারে নিম্নস্তরের ছিল না। উত্তর-ভারতের পাটলীপুত্র-শ্রাবস্তি-অযোধ্যা-সাকেত-ইন্দ্রপ্রস্থ-শাকলপুর-পুরুষপুর-ভৃগুকচ্ছ-কপিলবাস্তু প্রভৃতি নগরের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার নগরগুলির তুলনা হয়তো চলে না, কিন্তু পুণ্ড্র-মহাস্থান, কোটীবর্ষ-দেবকোট, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি কয়েকটি নগর-নগরী সর্বভারতীয় খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক লিপিমালায় এবং সাহিত্যে বাংলার অনেকগুলি নগর-নগরীর উল্লেখ ও বিবরণ জানা যায়; তাহা ছাড়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের খননকার্য, আবিষ্কার ইত্যাদি যেটুকু হইয়াছে তাহার ফলেও কোন কোন নগরের সংস্থান ও বিন্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু ধারণা করা চলে। গ্রাম ও নগরের পার্থক্য প্রাচীন ও মধ্য যুগে পৃথিবীর সর্বত্র যেমন, বাংলাদেশেও তাহাই। প্রথম ও প্রধান পার্থক্য, গ্রামগুলি প্রধানত ভূমি- ও কৃষি -নির্ভর, কিন্তু নগর নানা প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে, এবং কৃষি কতক পরিমাণে তাহার অর্থনৈতিক নির্ভর হইলেও শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থসম্পদই নগরসমৃদ্ধির প্রধান নির্ভর।

প্রাচীন বাংলায়ও নগরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল একাধিক প্রয়োজনে। পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের মতো নগর করতোয়াতীরবর্তী প্রখ্যাত একটি তীর্থ ছিল। দ্বিতীয়ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই নগর বৃহৎ এক রাজ্য ও জনপদ-বিভাগের রাজধানী ও প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। তৃতীয়ত, এই নগর সর্বভারতীয় এবং আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; একাধিক স্থলপথ এবং প্রশস্ত করতোয়ার জলপথ এই কেন্দ্রে মিলিত হইত। তাম্রলিপ্তির মতন নগরও একটিমাত্র প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রথমত, তাম্রলিপ্তি ভারতের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর, অন্যদিকে আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্দেশিক স্থলপথের কেন্দ্র এই নগর। এই কারণেই তাম্রলিপ্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাণিজ্যের এত বড় কেন্দ্ররূপে ভারতে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল। লক্ষণীয় এই যে, এই নগরে রাষ্ট্রীয় শাসনকেন্দ্র ছিল, দণ্ডীর দশকুমারচরিতের একটি গল্প ছাড়া আর কোথাও তেমন ইঙ্গিতও কিছু নাই। তাম্রলিপ্তির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ, এই নগর বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। কোটীবর্ষ প্রধানত এবং প্রথমত আন্তর্দেশিক রাজ্যবিভাগের বড় একটা শাসনকেন্দ্র ছিল বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া। দ্বিতীয়ত, সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতেও খুব সম্ভবত কোটীবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থিতির একটা গুরুত্ব ছিল। বিক্রমপুর শুধু শাসনকেন্দ্র হিসাবেই গুরুত্ব অর্জন করে নাই, ইহার সামরিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য; তাহা না হইলে একাধিক সেনরাজার আমলে এখানে জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত না। লক্ষ্মণসেনের পরাজয় এবং তুর্কীদের দ্বারা নবদ্বীপ অধিকারের পর সে গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, প্রাচীনকালে নদনদীবহুল নৌ-যাতায়াতপথের হৃদয়দেশে অবস্থিত থাকায় ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু, আনুমানিক নবম-দশক শতক হইতে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একটা বড় কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বা সামরিক প্রয়োজনে, কিংবা শুধু ধর্মকেন্দ্র হিসাবে কোন নগর প্রাচীন বাংলায় গড়িয়া উঠে নাই, তাহাও নয়। পঞ্চনগরী বিষয়ে শাসনাধিষ্ঠান, পুষ্করণ, ক্রীপুর, পাল ও

সেন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত রামপাল, রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী, শশাঙ্ক ও জয়নাগের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। সোমপুর (বর্তমান পাহাড়পুর), ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবেই। কিন্তু সমসাময়িক সাক্ষ্যে দেখা যায়, যে প্রয়োজনেই নগরগুলি গড়িয়া উঠুক না কেন, কমবেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা সর্বত্রই ছিল। বস্তুত, প্রাচীন বাংলার নগরগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেকটি নগরই প্রশস্ত ও প্রচলিত স্থল- ও জল -পথের সংযোগকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। ইহা একেবারে অকারণ বা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে চন্দ্রবর্মণ-কোট বলিয়া একটি দুর্গের উল্লেখ আছে; সামরিক প্রয়োজনে এই দুর্গ-নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপিতে এবং এই স্থানে প্রাপ্ত সমসাময়িক অন্যান্য লিপিতে স্থানটি নৌ-বাণিজ্য-প্রধান ছিল তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই কোট হইতেই বর্তমান কোটালিপাড়া নামের উদ্ভব, এরূপ অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়।

নগরের বাসিন্দা কাহারা ছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কর্মচারীরা তো বাস করিতেনই—ইঁহারা সকলেই চাকুরিজীবী, ধনোৎপাদক কেহই নহেন। রাজা-মহারাজ-সামন্তরাও নগরবাসীই ছিলেন। তীর্থমাহিমার জন্য বা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে যেসব নগর গড়িয়া উঠিত সেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও শিক্ষার গুরু, আচার্য, পুরোহিত প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকেরা, তাঁহাদের শিষ্য-ছাত্র প্রভৃতিরাও বাস করিতেন। অন্যান্য নগরবাসীদের ধর্মাচরণ ও অনুষ্ঠানের জন্যও প্রত্যেক নগরেই ব্রাহ্মণ, আচার্য, পুরোহিতের একটা সংখ্যা থাকিতই। ইঁহারা তো অনেকে রাজ-পাদোপজীবীর বৃত্তিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থাচরণোদ্দেশে এইসব নগরে লোক-যাতায়াতও ছিল; যাঁহারা আসিতেন অর্থব্যয় করিতেই আসিতেন। কাজেই এইসব তীর্থনগরে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের কেন্দ্রও গড়িয়া উঠিত। অধিকাংশ নগরে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা প্রেরণাও ছিল, এ কথা আগেই বলিয়াছি। এই ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক নগরেই বাস করিতেন, পঞ্চমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে এমন প্রমাণ প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। রাজকর্মচারী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের সংগে সংগে ইঁহারাই নগরের প্রধান বাসিন্দা। ইঁহাদের নিগম-কেন্দ্রগুলিও নগরে। তাহা ছাড়া, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কয়েকটি রাজপদের উল্লেখও লিপিগুলিতে দেখা যায়; এই পদগুলি এবং নগরশাসনসংক্রান্ত কয়েকটি রাজকীয় পদ (যেমন, পুরপাল, পুরপালোপরিক) রাজধানী, ভুক্তি অথবা বিষয়ের রাষ্ট্রযন্ত্রের সংগে সংপৃক্ত। ইঁহারা সকলেই যে নগরবাসী এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। দেওপাড়ালিপির "বরেন্দ্রকশিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি" রাণক শূলপাণিও নাগরিক। বৃহদ্ধর্ম- ও ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণে যেসব শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তালিকা আছে তাহাদের মধ্যে কর্মকার, কংসকার, শাঙ্খিক-শংখকার, মালাকার, তক্ষণ-সূত্রধার, শৌণ্ডিক, তন্ত্রবায়-কুবিন্দক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেকেই নগরে বাস করিতেন, সন্দেহ নাই। স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, অট্টালিকাকার, কোটক, অন্যান্য ছোট-বড় শিল্পী ও বণিকেরা তো একান্তই নগরবাসী ছিলেন। ইঁহাদের ছাড়া, অথচ ইঁহাদের সেবার জন্য রজক, নাপিত, গোপ প্রভৃতি কিছু সমাজসেবকও নগরে বাস করিতেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ম্লেচ্ছ

ও অন্ত্যজ পর্যায়ের কিছু কিছু সমাজশ্রমিকদেরও নগরে বাস করিতে হইত—যেমন, ডোম, চণ্ডাল, ডোলবাহী, চর্মকার, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি। কিন্তু ইঁহারা সাধারণত বাস করিতেন নগরের বাহিরে; চর্যাগীতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে 'ডোম্বীর কুঁড়িয়া' নগরের বাহিরে। এইসব সমাজসেবক ও সমাজশ্রমিকেরা নগরবাসী বটে, কিন্তু যথার্থত নাগরিক ইঁহারা নহেন; নাগরিক বলা যায় প্রধানত শ্রেষ্ঠী-শিল্পী-বণিকদের, নগরবাসী রাজ ও অভিজাত সম্প্রদায়দের, রাষ্ট্রপ্রধানদের এবং সমৃদ্ধ বিত্তবান্ ব্রাহ্মণদের।

এই নাগরিকেরাই সামাজিক ধনের প্রধান বণ্টনকর্তা। সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ধন যতদিন প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর ছিল ততদিন তো নগরগুলি সামাজিকধনলব্ধ ঐশ্বর্যবিলাসাড়ম্বরের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সামাজিক ধনের উৎপাদন যখন প্রধানত গ্রাম্য কৃষি ও গৃহশিল্প হইতে, তখনও নগরগুলিই সামাজিক ধনের কেন্দ্র, এবং সেই হেতু ঐশ্বর্যবিলাসাড়ম্বরেরও। বস্তুত, সমসাময়িক লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় গ্রাম ও নগরের প্রধান পার্থক্যই এই ধনৈশ্বর্যের তারতম্যদ্বারা চিহ্নিত। তৃতীয়-চতুর্থ শতকের বাৎস্যায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ-দ্বাদশ শতকের কাব্য ও প্রশস্তিগুলিতে সর্বত্রই নগরে নগরে দেখিতেছি শ্রেণীবদ্ধ প্রাসাদাবলী, নরনারীর প্রসাধন- ও অলংকার -প্রাচুর্য, বারাঙ্গনাদের কটাক্ষবিস্তার, নানাপ্রকার বিলাসের উপকরণ এবং অত্যুগ্র ঐশ্বর্যের লীলা, আর, সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে দেখিতেছি গ্রামবাসীদের সারল্যময় সহজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, এবং কখনো কখনো দারিদ্র্যের নিষ্করুণ চিত্র: অথচ, এইসব চিত্র যে যুগের সেই যুগে গ্রামের কৃষি- এবং গৃহ-শিল্প -লব্ধ ধনই প্রধান সামাজিক ধন।

পাঁচ

প্রাচীন লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক নগরের উল্লেখ ও বিবরণ পাইতেছি। সকল নগর গুরুত্বে, মর্যাদায়, আয়তনে বা অর্থসম্পদে সমান ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে, ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি নগরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে পারিলে প্রাচীন বাঙলার নগরবিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা একটু স্পষ্ট হইতে পারে:

বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীনতম নগর তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যসমৃদ্ধির কথা সুপরিচিত। মহাভারত, পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া টোডরমল্ল পর্যন্ত নানাগ্রন্থে নানা নামে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়—তাম্রলিপ্ত, তামলিপ্ত, তামলিপ্তি, তাম্রলিপ্তক, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্ভপুর, তামলিকা, বেলাকুল, তামোলিত্তি, দামলিপ্ত, টামালিটেস, টালুকটেই এবং তম্বলুক। সপ্তম অষ্টম শতক পর্যন্ত এই সামুদ্রিক বন্দরের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। টলেমি এই সামুদ্রিক বন্দর-নগরটির অবস্থিতি নির্দেশ করিতেছেন গঙ্গার উপরেই; কথাসরিৎসাগরের একটি গল্পে দেখিতেছি, তাম্রলিপ্তিকা পূর্বাম্বুধির অদূরস্থ নগরী; দশকুমারচরিতের মতে দামলিপ্ত সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ও সামুদ্রিক বন্দর, গঙ্গার তীরে, সমুদ্রের অদূরে; য়ুয়ান চোয়াঙও

বলিতেছেন তাম্রলিপ্তি সমুদ্রের একটি খাড়ির উপর অবস্থিত, যেখানে স্থলপথ ও জলপথ একত্র মিশিয়াছে। সমুদ্রমুখস্থিত এই বন্দর হইতেই ফা হিয়ান্ সিংহল এবং ইৎসিঙ্ শ্রীভোজ বা শ্রীবিজয়রাজ্যে (সুমাত্রা-যবদ্বীপ) যাইবার জন্য জাহাজে উঠিয়াছিলেন। রূপনারায়ণতীরবর্তী বর্তমান তমলুক শহর এই সুসমৃদ্ধ বাণিজ্য-নগরীর স্মৃতিমাত্র বহন করিতেছে। অন্যত্র আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পুরাতন সরস্বতী বা গঙ্গার অন্য কোন শাখানদীর উপর প্রাচীন তাম্রলিপ্তির অবস্থিতি ছিল; সেই নদীর খাত শুকাইয়া যাওয়ার ফলে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যসমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, এবং নগর হিসাবেও তাহার প্রাধান্য আর থাকে নাই। কিন্তু তাম্রলিপ্তি শুধু দুই জলপথের সংগমেই অবস্থিত ছিল না; স্থলপথে রাজগৃহ-শ্রাবস্তি-গয়া-বারাণসীর সঙ্গেও এই নগরীর যোগ ছিল; জাতকের গল্পগুলিতে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়া তাম্রলিপ্তি সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একটি বড় কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম শতকে ফা হিয়ান এই নগরে দুই বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধসূত্রের পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন ও পুনর্লিখন করিয়াছিলেন, কিছু কিছু বৌদ্ধ দেবদেবীর ছবিও আঁকিয়াছিলেন। সপ্তম শতকের শেষার্ধে ইৎসিঙ্ এই কেন্দ্রে বসিয়াই শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমান তমলুক শহরের অদূরে কয়েকটি ধ্বংসস্তূপ ছাড়া এই নগরের আর কিছুই এখন বর্তমান নাই। মাঝে মাঝে ভূমি চাষ করিতে গিয়া কিংবা গর্ত খুঁড়িতে গিয়া অথবা আকস্মিকভাবে কিছু কিছু প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক ইতস্তত পাওয়া গিয়াছে; কোন কোন মুদ্রা ও মূর্তির তারিখ প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে পুষ্করণ নামে একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে মহারাজ চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়ালিপিতে। এই নগর বাঁকুড়া জেলায় দামোদরের দক্ষিণ-তীরবর্তী বর্তমান পোখরনা গ্রামের স্মৃতির মধ্যে আজও বাঁচিয়া আছে। শুঙ্গ আমলের একটি যক্ষিণী-মূর্তির পোড়ামাটির ফলক এবং আরও কয়েকটি প্রত্নবস্তু পোখরনা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

বর্ধমানও অতি প্রাচীন নগর। জৈন কল্পসূত্র, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগরে বর্ধমান বসুধার অলংকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জৈন কল্প-সূত্রের মতে মহাবীর একবার অস্থিক গ্রামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন; টীকাকার বলিতেছেন পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল বর্ধমান। তিনি এই নাম-পরিবর্তনের একটা কারণও উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুললিপিতে, দশম শতকের ইর্দালিপিতে এবং দ্বাদশ শতকের নৈহাটি- ও গোবিন্দপুর -লিপিতে দেখিতেছি, এই নগর ভুক্তি-বিভাগের শাসনাধিষ্ঠান ছিল। অনুমান হয়, এই নগর দামোদরের তীরেই অবস্থিত ছিল, যদিও বর্তমান বর্ধমান শহর ও দামোদরের ব্যবধান অনেক। বর্ধমান প্রাচীন কালের অতি জনপ্রিয় নাম; বাংলার বাহিরেও স্থান-নাম হিসাবে ইহার প্রচলন দেখা যায়।

সিংহলী পুরাণে বিজয়সিংহকাহিনী প্রসঙ্গে লাল (রাঢ়) -দেশান্তর্গত সিংহপুর নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে; কেহ কেহ মনে করেন সিংহপুর বর্তমান হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার সিঙ্গুর।

দশম ও একাদশ শতকে দণ্ডভুক্তির কম্বোজরাজদের রাজধানী ছিল প্রিয়ঙ্গু,

নামক নগরে। এই নগরের অবস্থিতি জানা যায় না, তবে মেদিনীপুর বা হুগলী জেলার কোথাও ইহার অবস্থিতি বিচিত্র নয়।

কর্ণসুবর্ণ প্রাচীন পশ্চিম-বাংলার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। সপ্তম শতকে এই নগর গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী, এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর স্বল্প কিছুদিনের জন্য কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার জয়স্কন্ধাবার ছিল। এই শতকেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে মহারাজ জয়নাগের রাজধানীও ছিল এই নগরে। য়ুয়ান চোয়াঙ বলিতেছেন, এই নগরের পরিধি ছিল ২০ লি। সপ্তম শতকের কর্ণসুবর্ণ শুধু রাজধানী হিসাবেই খ্যাতি লাভ করে নাই; সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল এই নগর। নগরের বাহিরে অনতিদূরে রক্তমৃত্তিকা নামে একটি বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি এবং কানসোনা গ্রাম যথাক্রমে আজও রক্তমৃত্তিকা বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের স্মৃতি বহন করিতেছে। দুইই বহরমপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাপ্রবাহের তীরে অবস্থিত ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। জয়নাগের কালে ঔদুম্বরিক বিষয় নামে কর্ণসুবর্ণের একটি বিষয়-বিভাগ ছিল, এবং বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান বোধ হয় ছিল ঔদুম্বর নামক নগর। ঔদুম্বরিক বিষয় যে আইন-ই-আকবরীর ঔদম্বর পরগনা তাহা তো আগে বলিয়াছি; বীরভূমের অধিকাংশ এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ জুড়িয়া ছিল এই বিষয়ের বিস্তৃতি। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রায় দুই মাইল জুড়িয়া ছিল রাজধানীর বিস্তৃতি; নদী-প্রবাহে ধ্বংসাবশেষের অনেক ভাঙিয়া ধুইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইহা বুঝিতে কিছু কষ্ট হয় না।

অষ্টম শতকের শেষার্ধে অনর্ঘরাঘবের গ্রন্থকার মুরারি চম্পাকে গৌড়ের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই চম্পা গঙ্গাতীরবর্তী এবং বর্তমান ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পানগরী-চম্পাপুরী হওয়াই স্বাভাবিক; তবে আইন-ই-আকবরী-গ্রন্থের মন্দারন-সরকারের (হুগলী-মেদিনীপুর) অন্তর্গত চম্পানগরী হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়।

ধোয়ী কবির পবনদূতের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন-রাজাদের (অন্তত লক্ষ্মণসেনের) প্রধান রাজধানী ছিল বিজয়পুর। ধোয়ীর বিবরণীর আক্ষরিক অনুসরণ করিলে বিজয়পুর যে যমুনা ও ভাগীরথীর সংগমের অদূরে অবস্থিত ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কেহ কেহ বিজয়পুরকে নবদ্বীপ-নদীয়া বা রাজসাহী জেলার বিজয়নগরের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। ধোয়ীর পবনদূত কখনও গঙ্গা অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই; কাজেই বিজয়পুর উত্তর-বঙ্গে অবস্থিত হওয়া অসম্ভব। নবদ্বীপ-নদীয়া ত্রিবেণীর অনেক উত্তরে, পবনদূতের বর্ণনা অনুসারে বিজয়পুর ত্রিবেণী হইতে এতদূরে হইতে পারে না।

পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গের আর-একটি সুপ্রসিদ্ধ নগর দণ্ডভুক্তি-নগর। এই নগর দণ্ডভুক্তির এবং পরে দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলের শাসনাধিষ্ঠানরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানা ও দাঁতন শহর প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতি বহন করিতেছে।

যমুনা-সরস্বতী-ভাগীরথীর তিন 'মুক্তবেণী'র সংগমে অবস্থিত ত্রিবেণী প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান তীর্থনগরী। অন্তত সেন-রাজাদের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী আমল পর্যন্ত তীর্থ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে

ত্রিবেণীর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল; আজ সরস্বতীপ্রবাহ শুষ্ক, যমুনাপ্রবাহের চিহ্নও অনুসন্ধানের বস্তু, কিন্তু ত্রিবেণীর তীর্থস্মৃতি আজও বিদ্যমান।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে বা শেষার্ধে ত্রিবেণীর দুই মাইল দূরে ভাগীরথী-সংগমের সন্নিকটে সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রামে এক সুবৃহৎ বন্দর-নগর গড়িয়া উঠে, এবং সেন-রাজাদের রাজধানী বিজয়পুরের মর্যাদা অবলুপ্ত করিয়া দেয়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত সপ্তগ্রাম শুধু বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাজধানী, মুসলমান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সমসাময়িক সপ্তগ্রামের সুন্দর ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

সেন-রাজাদের অন্যতম রাজধানী বোধ হয় ছিল নবদ্বীপ, বা মিন্‌হাজ-উদ্‌-দীন-কথিত নদীয়া নগর। নদীয়া-নবদ্বীপ যে সেন-রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল তাহা কুলজীগ্রন্থমালা দ্বারাও সমর্থিত। সম্বন্ধনির্ণয় ও বল্লাল-চরিত গ্রন্থের মতে বল্লালসেন বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপ রাজধানীতেই বাস করিতেন।

গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন ও পদ্মপুরাণ গ্রন্থে এক বিজয়নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়; এই বিজয়নগর দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাঢ়দেশের সঙ্গেই সেন-রাজবংশের প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অসম্ভব নয় যে এই বিজয়নগর বিজয়সেনের নামের সঙ্গে জড়িত।

পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধন নগর উত্তর-বাংলার সর্বপ্রধান ও সুপ্রাচীন নগর। দিব্যাবদান, রাজতরঙ্গিণী, বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য অনেক সাহিত্যগ্রন্থে এবং লিপিমালায় পুণ্ড্রবর্ধনপুরের উল্লেখ হইতে এবং বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান-ধ্বংসাবশেষের প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনা হইতে সুপ্রাচীন এবং শতাব্দীর -পর শতাব্দী -অধ্যুষিত এই নগরটি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করা যায়।

বৌদ্ধপুরাণমতে বুদ্ধদেব স্বয়ং কিছুদিন পুণ্ড্রবর্ধন নগরে কাটাইয়াছিলেন। মৌর্যরাজত্বকালে পুদনগল (পুণ্ড্রনগর) জনৈক মহামাত্রের শাসনাধিষ্ঠান ছিল। গুপ্ত আমলে এই নগর পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির ভুক্তিকেন্দ্র ছিল, এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রনগর শুধু শাসনাধিষ্ঠানরূপেই নয়, ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থলপথ-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্ররূপেও বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙ যখন বাংলাদেশ পর্যটনে আসিয়াছিলেন তখন এই নগরের পরিধি ৩০ লি'রও (অর্থাৎ ৬ মাইল) অধিক ছিল। পরবর্তী পাল ও সেন আমলে প্রধান ভুক্তির শাসনকেন্দ্র হিসাবে ইহার মর্যাদা ও আয়তন বাড়িয়াই গিয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বলা হইয়াছে, পুণ্ড্রবর্ধনপুর বরেন্দ্রীর মুকুটমণি। আনুমানিক দ্বাদশ শতকের করতোয়া-মাহাত্ম্য-গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনপুরকে পৃথিবীর আদিভবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থেই পবিত্র-করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থানকে পুণ্য পৌণ্ড্রক্ষেত্র বা পৌণ্ড্রনগর বলিয়া উল্লেখও করা হইয়াছে। বগুড়া হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী করতোয়াতীরে মহাস্থান; মহাস্থানের সুবিস্তৃত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মৌর্যব্রাহ্মী লিপিখণ্ডের আবিষ্কার এবং লিপিখণ্ডে পুদনগলের উল্লেখ এবং করতোয়া মাহাত্ম্যের উক্তি পুণ্ড্রনগর ও মহাস্থান যে এক এবং অভিন্ন তাহা নিঃসংশয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

করতোয়ার বাম তীরে ৩০ বর্গমাইল জুড়িয়া মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃতি। নগর-প্রাকার, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মূর্তি, মন্দির, পরিখা, নগরোপকণ্ঠের বিহার, মন্দির, ঘরবাড়ি প্রভৃতির আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন নগরটির যে চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা কোন অংশেই প্রাচীন বৈশালী-শ্রাবস্তি-কৌশাম্বীর নগরসমৃদ্ধির তুলনায় খর্ব বলিয়া মনে হয় না। অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, মাটি পাথর ধাতব মূর্তি, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি প্রচুর এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নগরটির দুই অংশ। একটি অংশ পরিখাচিহ্নিত ও প্রাকারবেষ্টিত; এই অংশই প্রাকারবেষ্টিত নগর। অন্য অংশ প্রাকারের বাহিরে; এই অংশ নগরোপকণ্ঠ। নগরটি চারিধারের সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু, চারিদিকে সুপ্রশস্ত সুউচ্চ প্রাকার; চারিকোণে চারিটি উচ্চতর প্রাকারমঞ্চ; প্রাকারের বাহিরেই উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে পরিখা; পূর্বদিকে করতোয়া প্রবহমানা। নগরটি দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে আনুমানিক ৫,০০০ ফুট, প্রস্থে ৪,২০০ ফুট; সমস্ত নগরটি ক্ষুদ্র বৃহৎ মাটি-ইট-পাথরের স্তূপে এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুকরায় আকীর্ণ। নগর হইতে নগরোপকণ্ঠে এবং বাহিরে যাতায়াতের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি করিয়া সুপ্রশস্ত নগরদ্বার; পশ্চিম দিকে উত্তর কোণের কাছে প্রধান নগরদ্বার; এখনও এই দ্বার তাম দরওয়াজা নামে খ্যাত। পূর্বদিকে ঠিক ইহার বিপরীত কোণে শিলা-দেবীর ঘাটে যাইবার জন্য আর-একটি দ্বার; এই শিলাদেবীর ঘাটেই করতোয়ায় স্থানের প্রধান তীর্থকেন্দ্র।

নগরাভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় প্রাসাদ, রাষ্ট্রের অধিকরণ-গৃহ এবং অন্যান্য রাজকীয় প্রাসাদ ইত্যাদি, সার্থবাহ বণিক-নাগরিকদের বাসগৃহ হাট, মন্দির, সভাগৃহ, সৈন্য-সামন্তদের আবাসস্থল ইত্যাদি। রামচরিতে দেখিয়াছি, পুণ্ড্রনগরের সারি সারি আপন-বিপণি গৃহের বর্ণনা। নগরের সমাজসেবক ও শ্রমিকেরা, কুটুম্ব-গৃহস্থেরা বাস করিতেন নগরোপকণ্ঠে; সেখানেও ঘরবাড়ি, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। শুধু পুণ্ড্রনগরেই নয়—কোটীবর্ষ, রামপাল সর্বত্রই নগরবিন্যাস একই প্রকারের।

পুণ্ড্রনগর-পৌণ্ড্রক্ষেত্রের পরেই বলিতে হয় কোটীবর্ষ নগরের কথা। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে দেবীকোট, বাণপুর, উমাবন, শোণিতপুর প্রভৃতি কোটীবর্ষেরই বিভিন্ন নাম। অভিধান-কারদের মতে কোটীবর্ষের খ্যাতি ও মর্যাদা কৌশাম্বী, প্রয়াগ, মথুরা, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র প্রভৃতি নগরের চেয়ে কম নয়। জৈন কল্পসূত্রে বলা হইয়াছে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুর এক শিষ্য গোদাস প্রাচ্য-ভারতের জৈনদিগকে চারিটি শাখায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে তিনটি শাখার নাম তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন এবং কোটীবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত পাল আমলের শেষ পর্যন্ত কোটীবর্ষ নগরেই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সর্বপ্রধান বিষয় কোটীবর্ষ-বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান অবস্থিত ছিল। মুসলমান অধিকারের পর পুরাতন কোটীবর্ষ-নগরেই দেবীকোট-দীবকোট-দীওকোট নামে নূতন নগরের পত্তন হয়। একাদশ শতকের শেষে বা দ্বাদশ শতকের প্রথমে সন্ধ্যাকর নন্দী কোটীবর্ষ নগরের অসংখ্য পূজারী-পূজক-মুখরিত মন্দির ও প্রস্ফুটিত পদ্মহসিত দীঘির

দীর্ঘ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতক পর্যন্ত মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় দীব্‌কোট-দীওকোটের বর্ণনা পাঠ করা যায়।

হেমচন্দ্রের কোটীবর্ষ-বাণপুর পুনর্ভবাতীরস্থ এবং বলিরাজপুত্র বাণাসুরের ও উষা-অনিরুদ্ধের পুরাণ-স্মৃতি-বিজড়িত, বর্তমান দিনাজপুর জেলার বাণগড়, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সমস্ত বাণগড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জুড়িয়া এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিস্তৃত। কম্বোজ-রাজবংশের একটি এবং পালবংশের একটি লিপি, অসংখ্য মূর্তি, মন্দির ও প্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড, ভিত্তিস্তর, স্তম্ভখণ্ড, ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির-নিদর্শন প্রভৃতি এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমান হয়, এই নগর দৈর্ঘ্যে প্রায় ১,৮০০ এবং প্রস্থে ১,৫০০ ফুট বিস্তৃত ছিল; নগরটি চারিদিকে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাকারের পরেই পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে পরিখা, এবং পশ্চিমে পুনর্ভবা নদী। পূর্বদিকে প্রধান নগরদ্বার এবং নগর হইতে নগরোপকণ্ঠে যাইবার জন্য পরিখার উপরে সেতুর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। নগরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এখনও একটি সুউচ্চ স্তূপ বর্তমান, বোধহয় এইখানেই ছিল রাজপ্রাসাদ। নগরাভ্যন্তরে এবং প্রাচীরের বাহিরে নগরোপকণ্ঠে এখনও অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

পঞ্চম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্যতম বিষয় ছিল পঞ্চনগরী, এবং পঞ্চনগরীতেই বিষয়ের শাসনাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চনগরী দিনাজপুর জেলায় সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ স্থান নির্ণীত হয় নাই। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরও খুব পুরাতন তীর্থনগর বলিয়া মনে হয়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এই স্থানের অন্তত একাংশের নাম ছিল বটগোহালী (বর্তমান গোয়ালভিটা), এবং সেখানে জৈন শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর একটি বিহার ছিল। ধর্মপালের আমলে এই স্থান সোমপুর নামে খ্যাতি লাভ করে, এবং এইখানেই সোমপুর মহাবিহার (বর্তমান পাহাড়পুর) গড়িয়া উঠে। সোমপুর মহাবিহার সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থনগর ছিল। একাদশ শতকে (বর্মণ-রাষ্ট্রের?) বঙ্গাল সৈন্যরা এই মহাবিহার আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল।

পালরাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার উপায় নাই; তবে তাঁহারা রাজ্যের সর্বত্র—বোধহয় সামরিক গুরুত্ব এবং শাসনকার্যের সুবিধানুযায়ী—অনেকগুলি বিজয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। এগুলি যে নগরোপম এ সম্বন্ধে সন্দেহ কী? রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঘরবাড়ি, সৈন্যসামন্তাবাস, হাটবাজার, মন্দির, পথঘাট, উদ্যান প্রভৃতি সমস্তই এইসব দুর্গজাতীয় স্কন্ধাবারে থাকিত। ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে একেবারে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই ধরনের জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে; চন্দ্র-বর্মণ সেন আমলের অনেক লিপিই তো 'বিক্রমপুরসমাবাসিত বিজয়স্কন্ধাবার' হইতে নির্গত। যাহা হউক, পাল লিপিগুলিতে মুদ্গগিরি, বটপর্বতিকা, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী নগর, হংসাকোঞ্চী এবং পাটলীপুত্র জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। এইসব জয়স্কন্ধাবারের মধ্যে রামাবতী স্পষ্টতই নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; পাটলীপুত্র তো বহুদিনের প্রাচীন নগর; সুতরাং অন্য জয়স্কন্ধাবারগুলিও নগর না হইলেও নগরোপম ছিল, সন্দেহ নাই। মুদ্গগিরি বর্তমান মুঙ্গের নগর; গঙ্গার তীরেই ছিল তাহার অবস্থিতি। বিলাসপুর এবং হরধাম দুইই অবস্থিত ছিল গঙ্গার উপরে; বট-

পর্বতিকার অবস্থিতিনির্ণয় কঠিন; পর্বতিকার উল্লেখ হইতে অনুমান হয়, রাজমহল পর্বতের সংলগ্ন গঙ্গার তীরেই কোথাও এই জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটলীপুত্রও গঙ্গার তীরে। হংসাকোঞ্চী মহারাজ বৈদ্যদেবের কামরূপস্থ জয়স্কন্ধাবার বলিয়া মনে হয়। রামাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল; মদনপালের মনহালিলিপি এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই নগরের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। রামাবতী এবং আইন-ই-আকবরী কথিত রামাউতি যে এক এবং অভিন্ন নগর এ সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। পরবর্তী সেন আমলের গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরের অদূরে গঙ্গা-মহানন্দার সংগমস্থলের সন্নিকটে ছিল রামাবতীর অবস্থিতি। সন্ধ্যাকরের বর্ণনা হইতে মনে হয়, সমসাময়িক কালে রামাবতী সমৃদ্ধ নগর ছিল।

পাল আমলের জয়স্কন্ধাবারগুলির সামরিক গুরুত্ব লক্ষণীয়, এবং অনুমান হয়, এই সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই জয়স্কন্ধাবারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাটলীপুত্র, মুদ্গগিরি, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী এবং বোধহয় বটপর্বতিকাও—প্রত্যেকটিই গঙ্গার তীরে তীরে। এই গঙ্গা বাহিয়া রাজমহলের তেলিগড়ি ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়াই বাংলায় প্রবেশের পথ। এবং পাটলীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রামাবতী পর্যন্ত সমস্ত পথটিই সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন ছিল। পালরাষ্ট্র তাহাই করিয়াছিল। এই অনুমান আরও সমর্থিত হয় পরবর্তী কালে লক্ষ্মণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাণ্ডা ও রাজমহলে পর পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকেন্দ্রের অবস্থিতি হইতে।

সেন আমলের প্রায় শেষাশেষি লক্ষ্মণসেন রামাবতীর অদূরে লক্ষ্মণাবতী (মুসলমান ঐতিহাসিকদের গৌড়-লখনৌতি) নামে এক সুবিস্তৃত নগর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমহল হইতে ২৫ মাইল ভাটিতে গঙ্গা-মহানন্দার সংগমস্থলের এই নগর গঙ্গার তীর ধরিয়া প্রায় ১৪/১৫ মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। সেন আমলের লক্ষ্মণাবতীকে আশ্রয় করিয়া একটি সুলতানদের গৌড়-লখনৌতি নগর গড়িয়া উঠে। গৌড়-লখনৌতির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান, এবং তাহা হইতে প্রাচীনতর লক্ষ্মণাবতীর বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি খানিকটা অনুমান করা চলে। গৌড়-লখনৌতি হইতে রাজধানী কিছুদিন পর পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়; তবু লখনৌতির খ্যাতি ও মর্যাদা হুমায়ুন-আকবরের আমল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মুঘলেরা ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন জন্নতাবাদ। গঙ্গা ও মহানন্দার খাত পরিবর্তনের ফলে লখনৌতি ষোড়শ শতকের শেষাশেষি নাগাদ পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী কালে বাংলার রাজধানী টাণ্ডায় এবং সর্বশেষে রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমান রাজসাহী শহরের ৭ মাইল পশ্চিমে, গোদাবরী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া বা দেবপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিটি পাওয়া গিয়াছে দেওপাড়া গ্রাম হইতে; মনে হয়, প্রাচীন দেওপাড়া গ্রাম বিজয়সেন-প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগরের একটি অংশ ছিল; বিজয়নগর, চব্বিশনগর নাম দুইটি এবং দেওপাড়া প্রশস্তির ইঙ্গিত একান্ত অর্থহীন বলিয়া মনে হয় না। দেওপাড়ার উত্তরে দক্ষিণে প্রায় সাত-আট মাইল জুড়িয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন ইতস্তত এখনও বিদ্যমান। এই স্থান পদ্মাতীর হইতে খুব দূরেও নয়।

পূর্ব- ও দক্ষিণ -বাংলার সর্বপ্রাচীন নগর সিংহলী পুরাণ-কথিত বঙ্গনগর ও টলেমি-কথিত গঙ্গা-বন্দর। গঙ্গা-বন্দর গঙ্গার পঞ্চমুখের একটি মুখে অবস্থিত

ছিল; সম্ভবত দ্বিতীয় মুখের তীরে। পেরিপ্লাস-গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে গঙ্গা-বন্দর সমসাময়িক কালের সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র, এবং গ্রীক ঐতিহাসিকের মতে গঙ্গাহৃদি-গঙ্গরাষ্ট্রের রাজধানী ও প্রধান নগর। সিংহলী পুরাণ-কথিত বঙ্গনগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই।

ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার পট্টোলীগুলিতে নব্যাবকাশিকা, বারকমণ্ডল-বিষয় এবং সুবর্ণবীথী নামে যথাক্রমে একটি ভুক্তি(?)-বিভাগ, একটি বিষয়-বিভাগ এবং একটি বীথী-বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক-একটি শাসনাধিষ্ঠান ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু কাহার কোথায় অবস্থিতি ছিল নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

দেবখড়্গের আস্রফপুরলিপি দুইটিতে জয়কর্মান্তবাসক নামে একটি নগরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে; এই নগরটিই বোধ হয় খড়্গরাজাদের রাজধানী অথবা অন্তত জয়স্কন্ধাবার ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, কর্মান্তবাসক বা প্রাচীন কর্মান্ত এবং বর্তমান ত্রিপুরা জেলার বাড়কামতা গ্রাম এক এবং অভিন্ন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ সমসাময়িক সমতটের রাজধানীটির নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন।

বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্যের উল্লেখ একাদশ শতক হইতেই পাওয়া যায়। এই রাজ্যের রাজধানীর ইঙ্গিত ব্রহ্মদেশীয় রাজবৃত্তকাহিনীতেও জানা যায়। তবে পট্টিকেরা-নগরের সবিশেষ এবং সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ পাইতেছি ত্রয়োদশ শতকে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের একটি লিপিতে। ত্রিপুরা জেলার মধ্যযুগীয় পাটিকেরা এবং বর্তমান পাটিকারা পরগনা প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্যের নাম ও স্মৃতি বহন করিতেছে। প্রাচীন পট্টিকেরা নগর এবং ময়নামতী পাহাড়ের ময়নামতী গ্রাম খুব সম্ভবত এক এবং অভিন্ন। এই গ্রাম এবং আশপাশের গ্রাম হইতে অনেক প্রত্নবস্তু—লিপি, মূর্তি ও মূর্তির অংশ, ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড, পোড়ামাটির ফলক, ইট-পাথরের টুকরা ইত্যাদি—বহুদিন হইতেই সময় সময় পাওয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি আকস্মিক খননের ফলে ময়নামতীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে এক সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক লিপিখণ্ড, পোড়ামাটির ফলক, মূর্তি, মৃৎপাত্র ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। গোমতীর তীর এবং ময়নামতী পাহাড়ের ক্রোড়স্থিত এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষই প্রাচীন পট্টিকেরার ধ্বংসাবশেষ, এমন মনে করিবার সংগত কারণ বিদ্যমান।

দামোদরদেবের মেহারলিপিতে (১১৫৬ শক) মেহারকুল নামে একটি নগরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

পূর্ব-বাংলার বৃহত্তম প্রাচীন নগর শ্রীবিক্রমপুর। বিক্রমপুর চন্দ্র-, বর্মণ, সেন ও দেব -বংশীয় রাজাদের অন্যতম প্রধান জয়স্কন্ধাবার। এই "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" বিজয়সেনের একটি, বল্লালসেনের একটি, এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে অন্তত পাঁচটি শাসনলিপি নির্গত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের দুইটি লিপি এবং বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের লিপিগুলি কিন্তু বিক্রমপুর হইতে নির্গত নয়। বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার কি পরিত্যক্ত হইয়াছিল; না এই পরিবর্তন আকস্মিক? যে ধার্যগ্রাম ও ফল্গুগ্রাম হইতে এই লিপিগুলি উৎসারিত, সে গ্রাম দুটিই বা কোথায়?

বিক্রমপুর নামে একটি সুবিস্তৃত পরগনা এখনও ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ জুড়িয়া বিস্তৃত।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মুন্সীগঞ্জ শহরের অদূরে সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী (অতীশ-দীপংকরের জন্মভূমি) এবং পাইকপাড়া গ্রামের অদূরে রামপাল নামক স্থানে সুপ্রাচীন একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রায় পনেরো বর্গমাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। প্রায় ১৭-১৮টি গ্রাম এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়াইয়া আছে; সমগ্র স্থানটির ভৌগোলিক সংস্থান উল্লেখযোগ্য। রামপালের উত্তরে ছিল ইছামতী নদী; ইছামতীর প্রাচীন খাতের সমান্তরালে পূর্বপশ্চিমে লম্বমান একটি সুউচ্চ প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। পূর্বদিকে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহের খাত; পশ্চিমে ও দক্ষিণে দুইটি বিস্তৃত পরিখা; এই দুইটি পরিখা বর্তমানে যথাক্রমে মিরকাদিম খাল ও মকুহাটি খাল নামে পরিচিত। সদ্যোক্ত চতুঃসীমাবেষ্টিত বিস্তৃত নগরের মধ্যে উচ্চতর ভূমিতে রাজপ্রাসাদের বিরাট ধ্বংসস্তূপ আজও বল্লালবাড়ি নামে খ্যাত। এই নামের মধ্যে বল্লালসেনের স্মৃতি বিজড়িত সন্দেহ নাই। কিন্তু রামপাল নাম তো পালরাজ রামপালের, এবং খুব সম্ভব রামপালই এই নগর পত্তন না করিলেও ইহার খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন।

এই রামপালই চন্দ্র- বর্মণ- সেন- দেববংশের লিপিগুলির শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার বলিয়া মনে হইতেছে। সমগ্র বিক্রমপুর পরগনায় এমন সুপ্রশস্ত এবং ভৌগোলিক দিক হইতে এমন সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। রামপালের (একাদশ শতকের শেষার্ধ) নাম ও স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বলিয়া এই অনুমান আরও গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আমলেই প্রথম বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের কথা জানা যাইতেছে (একাদশ শতকের প্রথমার্ধ); ইঁহারাই হয়তো এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু রামপালই প্রকৃতপক্ষে ইহার খ্যাতি ও মর্যাদার যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা।

অরিরাজ দনুজমাধব দশরথদেবের আদাবাড়িলিপির কাল পর্যন্তও বিক্রমপুরে নগর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দনুজমাধব দশরথ, হরিমিশ্রের কারিকা-কথিত দনুজ-মাধব এবং জিয়াউদ্‌দীন বারনি-কথিত সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ-র রাজা দনুজ রায় যদি একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন—এবং তাহা হইবার কারণও বিদ্যমান—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার আগে কোন সময় দনুজমাধব দশরথ বিক্রমপুর হইতে তাঁহার রাজধানী সুবর্ণগ্রামে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই সময়ের আগে সুবর্ণগ্রামের কোন উল্লেখ প্রাচীনতর সাক্ষ্যে কোথাও নাই। সুবর্ণ-গ্রাম আজও ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের বিপরীত দিকে ধলেশ্বরীতীরের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম; এবং কিছু কিছু পুরাবস্তু এখানেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুঘলপূর্ব মুসলমান রাজাদের আমলে সুবর্ণগ্রামই ছিল পূর্ব-বাংলার রাজধানী। লক্ষ্যা-সংগমের অদূরবর্তী সুবর্ণগ্রামের অবস্থিতি যে সামরিক দিক হইতে গুরুত্বময়, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

ছয়

প্রাচীন বাংলার গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে এইবার দুই-একটি সাধারণ মন্তব্য করা যাইতে পারে। আয়তন বা আকৃতি-প্রকৃতিতে এক গ্রামের সঙ্গে আর-এক গ্রামের যত পার্থক্যই থাকুক, চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে আদি-পর্বের শেষ পর্যন্ত সমগ্রভাবে বাংলার গ্রামের

চেহারা ও প্রকৃতি একই থাকিয়া গিয়াছে। মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সে চেহারা ও প্রকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ একাধিক। প্রথম ও প্রধান কারণ, এই সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দীর মধ্যে গ্রাম্য উৎপাদনব্যবস্থার—কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদনোপায়ের—কোন পরিবর্তনই হয় নাই। একদিকে গোরু ও লাঙল, আখ মাড়াই যন্ত্র, অন্যদিকে চরকা ও তাঁতই প্রধান উৎপাদনযন্ত্র। দ্বিতীয় কারণ, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভূমিনির্ভর কৃষক-সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ তাহাও মোটামুটি একই থাকিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট গ্রামগুলি একাই একক; বড় গ্রামগুলি দেখিতেছি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত। আয়তনানুযায়ী প্রত্যেক গ্রামে গ্রামীয় মহত্তর, কুটুম্ব, গৃহস্থ, ভূমিবান ও ভূমিহীন কৃষক, কয়েকঘর শিল্পী, সমাজসেবক রজক, নাপিত ইত্যাদি এবং সমাজশ্রমিক চণ্ডাল; হাড়ি, ডোম ইত্যাদির বিভিন্ন আয়তন ও মর্যাদার বাস্তুগৃহাদি। এইসব বাস্তু পরস্পর দূরবিচ্ছিন্ন নয়; তবে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা যে অংশে বাস করে তাহা প্রধান গ্রামাংশ হইতে একটু বিচ্ছিন্ন। বাস্তুগৃহাদির সংলগ্ন গুবাক, নারিকেল, আম্র, মহুয়া, পনস প্রভৃতি ফলবৃক্ষ; পানের বরজ, পুষ্করিণী, তল, বাটক; কিছু কিছু পতিত বাস্তুভিটা, উচ্চনীচ ভূমি ইত্যাদি। বাস্তু হইতে অদূরে গ্রামের কৃষি-ক্ষেত্র; সেই সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যেকের ক্ষেত্রভূমিসীমা আলিদ্বারা সুনির্দিষ্ট; গ্রামের সমগ্র কৃষিভূমি সেইজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। ক্ষেত্রভূমির পাশ দিয়া মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বৃহৎ খাল নালা ইত্যাদি; এই খালনালাগুলি শুধু চাষের জল সরবরাহ করে না, গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর কাজও করে। ক্ষেত্রভূমির শেষ সীমায় গোবাট ও তৃণাচ্ছাদিত গোচরভূমি। গ্রামের পাশ দিয়া নদী বা গঙ্গিনিকা বা খাল বা অন্য কোন জলপ্রবাহ এবং গ্রাম্য লোকজন চলাচলের পথ। গ্রামের বাহিরে গ্রাম্য হাট, হট্টিয়গৃহ ইত্যাদি। যেসব গ্রাম সমুদ্র বা সমুদ্র-জোয়ারবাহী নদীর তীরে সেখানে সমুদ্র বা নদীর তীরে তীরে গ্রামের লোকেদের লবণের গর্ত। যেসব গ্রাম বর্ষায় জলপ্লাবিত হয়, সেসব গ্রামের নিম্নতর ভূমিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বাঁধ বা জাঙ্গাল। নদী বা খাল পারাপারের জন্য গ্রাম্য খেয়াঘাট। প্রত্যেক গ্রামেই ক্ষুদ্র বৃহৎ দু-একটি মন্দির; কোন কোন গ্রামে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৌদ্ধবিহার; পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের গৃহে চতুষ্পাঠী। যেসব গ্রাম ব্যবসাবাণিজ্যের যাতায়াতপথের কেন্দ্রে বা সীমায় অবস্থিত সেখানে গঞ্জ, বৃহৎ হাট; জলবাণিজ্যের কেন্দ্র হইলে নদীর ঘাটে বা সমুদ্রের খাড়ীতে অসংখ্য নৌকার সমাবেশ। এই তো মোটামুটি প্রাচীন বাংলার গ্রামের চিত্র, এবং এ চিত্র সমসাময়িক বাংলার লিপিগুলিতে সুস্পষ্ট। রামচরিতে এবং সদুক্তিকর্ণামৃতের দুই-একটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলির মনোরম কাব্যময় ছবি আঁকা হইয়াছে।

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়ালিপিতে শালিধান্যভারাবনত শস্যক্ষেত্র এবং রমণীয়-উদ্যান-শোভিত গ্রামের উল্লেখ আছে; শালিধান্য- ও ইক্ষুশস্য -সমৃদ্ধ এবং ইক্ষু-যন্ত্রধ্বনিমুখরিত বাংলার টুকরা টুকরা চিত্র লিপিমালায় এবং সমসাময়িক সাহিত্যে অন্যত্রও পাওয়া যায়।

গ্রামগুলি মোটামুটি অপরিবর্তিত, কিন্তু প্রাচীন বাংলার নগরগুলি সম্বন্ধে কিন্তু তাহা বলা চলে না। খ্রীষ্টপূর্ব শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত যতগুলি নগরের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহার অধিকাংশই যেন প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর। তাম্রলিপ্ত তো বটেই, এমন কি পুণ্ড্রনগর, বর্ধমান,

গঙ্গাবন্দর-নগর, নব্যাবকাশিকা-নগর বারকমণ্ডল-বিষয়ের নগর প্রভৃতি সমস্ত নগরই সুপ্রশস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য-পথের উপর অবস্থিত। ইহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা যেন বাণিজ্যসমৃদ্ধির উপরই নির্ভর করিত; পুণ্ড্রনগরের ক্ষেত্রে তীর্থমহিমা অবশ্যই কার্যকরী ছিল। এই উভয় কারণের জন্যই হয়তো মৌর্য ও গুপ্ত রাজারা এই-খানেই শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্তির গুরুত্ব নিরঙ্কুশ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী, পুষ্করণ প্রভৃতি নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে হয়তো গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোটিবর্ষের অবস্থান এবং প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ-ইঙ্গিতে মনে হয়, এই নগরের কিছু কিছু বাণিজ্য- এবং তীর্থ -মহিমাও ছিল। বস্তুত, অন্তত ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার সব কয়টি নগরেরই অবস্থিতি ও বিবরণ যতটুকু জানা যায়, তাহাতে মনে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বিবেচনার উপরই ইহাদের মর্যাদা ও অস্তিত্ব প্রধানত নির্ভর করিত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বাংলার নগর সভ্যতার যে সমসাময়িক চিত্র দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাতেও সদাগরী ধনতন্ত্রের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু সপ্তম শতক ও তাহার পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষত সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাংলার নগরগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে বদলাইতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বাংলার যে কয়টি নগরের বিবরণ দিতেছেন তাহাদের মধ্যে এক তাম্রলিপ্ত ছাড়া আর একটিরও বাণিজ্যপ্রাধান্যের ইঙ্গিত নাই, বরং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-প্রেরণার ইঙ্গিত আছে। কর্ণসুবর্ণ, ঔদুম্বর নগর, কজঙ্গল নগর, সমতট নগর, এমন কি পুণ্ড্রনগর সম্বন্ধেও য়ুয়ান-চোয়াঙের বর্ণনার ইঙ্গিত লক্ষণীয়। অষ্টম-নবম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত যে কয়টি নগরের বর্ণনা উপরে করা হইয়াছে, তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থিতি, নগর-বিন্যাস, এবং সমসাময়িক উল্লেখের ইঙ্গিত একটু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অধিকাংশ নগরের পশ্চাতে রাষ্ট্রীয়, বিশেষভাবে সামরিক প্রয়োজন-বিবেচনা সক্রিয়। মুদ্গগিরি, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, বিজয়পুর, সপ্তগ্রাম, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, পট্টিকেরা প্রভৃতি সমস্ত নগর সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। দু-একটি নগর, যেমন, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, সোমপুর এবং অন্যান্য বৌদ্ধবিহার-নগর প্রভৃতির পশ্চাতে হয়তো ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন-প্রেরণাই প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল। অন্যত্র সর্বত্রই এই প্রয়োজন-বিবেচনা গৌণ।

রামাবতী-লক্ষ্মণাবতী দুই-ই গঙ্গা-মহানন্দার সংগমের রাজমহল গিরিবর্ত্মের প্রবেশমুখের প্রহরী; পুণ্ড্রনগর করতোয়ার উপর; কোটিবর্ষ পুর্নভবার তীরে; রামপাল ইছামতী-ব্রহ্মপুত্রের সংগমে; পট্টিকেরা গোমতী নদী ও ময়নামতী পাহাড়ের ক্রোড়ে; বিজয়পুর ভাগীরথী-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিবেণীসংগমের অদূরে। মহাস্থান-বাণগড়-রামপালের ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটি নগরই প্রাকারবেষ্টিত, এবং প্রাকারের পরেই পরিখা। নগর হইতে নগরোপকণ্ঠে বা নদীর ঘাটে যাইবার জন্য প্রাকারের প্রত্যেক দিকেই এক বা একাধিক নগরদ্বার, এবং পরিখার উপর দিয়া সেতু। পরিখার অপর পারে নগরোপকণ্ঠে সমাজসেবক, সমাজশ্রমিক এবং নগরনির্ভর কুটুম্ব-গৃহস্থদের বাস; কোথাও কোথাও মন্দির, সংঘ, বিহার প্রভৃতিও আছে। নগরাভ্যন্তরে উচ্চতর ভূমির উপর প্রাচীরবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন রাজকীয় এবং শাসনকার্যসংক্রান্ত অট্টালিকাদি। সোজা সরল রেখায় পূর্বপশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান রাজপথদ্বারা সমস্ত নগর-

ভূমি পৃথক পৃথক চতুর্ভুজে বিভক্ত; রাজপথের দুইধারে সমান্তরাল প্রাসাদোপম অট্টালিকাশ্রেণী, প্রত্যেক অট্টালিকার চূড়ায় সুবর্ণকলস; মন্দির, বিহার, প্রমোদোদ্যান; বৃহৎ দীঘির চারিধার তালবৃক্ষ ও সুসজ্জিত প্রস্তরখণ্ডদ্বারা শোভিত ও অলংকৃত।

সকল নগরই যে এইরূপ সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান্ ছিল এমন বলা যায় না। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরও ছিল যাহাদের সামরিক বা রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোন গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল না, প্রধানত স্থানীয় শাসনাধিষ্ঠানের কেন্দ্ররূপেই যাহাদের পত্তন হইয়াছিল। এগুলি বরং অনেকটা বৃহৎ সমৃদ্ধ গ্রামের মতনই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ছোট ছোট বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিও তাহাই ছিল। গ্রামের সঙ্গে এইজাতীয় নগরের বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। অধিকাংশ লিপির সাক্ষ্যেই দেখা যায় এইজাতীয় ছোট ছোট নগরের সঙ্গে গ্রামগুলি একেবারে সংলগ্ন; নগরের পথ গ্রামে গিয়া মিশিয়াছে, অথবা গ্রামেরই পথ নগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। নিকটস্থ গ্রামের উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পবস্তু লইয়াই এইসব ছোট ছোট নগরের স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য।

সাত

পাল ও সেন আমলের লিপি ও সমসাময়িক সাহিত্য পাঠে মনে হয়, নগর ও গ্রামের প্রথম ও প্রধান পার্থক্যই যেন নির্ণীত হইত ঐশ্বর্য-বিলাসাড়ম্বরের তারতম্য দ্বারা। রামচরিতে রামাবতীর এবং পবনদূতে বিজয়পুরের বর্ণনায় দেখিতেছি, রাজপথের দুই ধারে চলিয়াছে প্রাসাদের শ্রেণী, নগরে সঞ্চিত প্রচুর মণিরত্নসম্ভার। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন নগরের নাগরিকদের ধনৈশ্বর্যের বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহারও আগে তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাংলাদেশের নগরগুলি যখন সদাগরী-বাণিজ্যলব্ধ ধনে সমৃদ্ধ তখন বাৎস্যায়ন এদেশের নগর ও নগর সভ্যতার কিছু আভাস রাখিয়া গিয়াছেন। গৌড়ের নগরপুষ্ট অবসরসমৃদ্ধ নরনারীদের কামলীলা ও ঐশ্বর্য-বিলাসের সুস্পষ্ট চিত্র তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; নাগর অভিজাত শ্রেণীর অবসর এবং স্বল্পায়াসলব্ধ ধনপ্রাচুর্য তাহাদিগকে ঐশ্বর্যবিলাস এবং কামলীলা চরিতার্থতার একটা বৃহৎ সুযোগ দিত, বাৎস্যায়নে তাহার আভাস সুস্পষ্ট। অভিজাতগৃহে নর্তকীবিলাসের ইঙ্গিতও বাৎস্যায়ন দিয়াছেন। কহ্লন তাঁহার রাজতরঙ্গিণীতে অষ্টম শতকের পুণ্ড্রবর্ধন নগরের নর্তকী কমলার কথা বলিতেছেন। কমলা নগরের কোন মন্দিরের দেবদাসী বা নর্তকী ছিলেন, নৃত্যেগীতে সুদক্ষা এবং অন্যান্য কলা-বিদ্যায় নিপুণা। সমসাময়িক নাগর অভিজাত সমাজে নর্তকীরা কিছু নিন্দনীয়ও ছিল না। তাহা হইলে সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে এবং ধোয়ী-কবি পবনদূতে যে ভাষায় নাগর বাররামাদের স্তুতিবাদ করিয়াছেন তাহা কিছুতেই সম্ভব হইত না; বরং ইঁহাদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, নাগর অভিজাত সমাজে নর্তকী, সভানারী, বাররামা, দেবদাসীরা অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের লিপিগুলিতেও ইঁহাদের উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদের সাক্ষাৎ মেলে। বিজয়সেন (দেওপাড়ালিপি) ও ভট্ট ভবদেব তাঁহাদের নির্মিত মন্দিরে শত শত দেবদাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নাগরিক ঐশ্বর্যবিলাসাড়ম্বরের চিত্র এইখানেই শেষ নয়। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, মণিরত্নখচিত ধাতব অলংকার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্র, প্রাসাদোপম

সৌধাবলী, মন্দির ইত্যাদির বর্ণনায় দশম-একাদশ-শতক-পরবর্তী লিপিগুলি এবং সমসাময়িক নাগর সাহিত্য ভারাক্রান্ত। সপ্তম শতকে ইৎসিঙ্ প্রয়োজন ও ক্ষমতার অতিরিক্ত বৃহৎ সামাজিক ভোজের অপব্যবস্থার কথাও বলিয়াছেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে একটি অর্থবহ শ্লোক আছে। গ্রাম্য ব্রাহ্মণ মেয়েরা মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মরকত প্রভৃতি দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না; কার্পাস-বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ব-বীচি, কুষ্মাণ্ডপুষ্পই তাঁহাদের অধিকতর পরিচিত। কিন্তু বিজয়সেনের কল্যাণে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার নগরবাসী এবং বিত্তবান হইয়াছিলেন। তখন নাগরিকরা ব্রাহ্মণীদের মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মরকত প্রভৃতি চিনিতে শিখাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে গ্রাম্য নারী এবং নগরের নাগরীদের প্রকৃতির পার্থক্যের যে ইঙ্গিত আছে তাহা লক্ষণীয়।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে গ্রাম্য ও নাগর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতি-পার্থক্য খুব সুন্দর ফুটিয়াছে। পল্লীগ্রামের লোকেরা নগর-বাসিনীদের চালচলন পছন্দ করিতেন না। কবি শুভাঙ্ক বলিতেছেন, নগরে রাজ-সৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্ন হারের মুক্তাসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকে; রাজপ্রাসাদে মূল্যবান প্রস্তরখচিত ফুল, কণ্ঠহার, কর্ণাঙ্গুরী, স্বর্ণখচিত বলয় এবং নূপুর পরিধান করিয়া ভৃত্যাঙ্গনারা ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং নগরপ্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া নগরাঙ্গনারা নিম্নে রাজপথে চলমান সুদর্শন যুবকের উপর কামকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন (সদুক্তিকর্ণামৃত)। অথচ, অন্যদিকে গ্রামজীবনের একাংশে নিষ্করুণ দারিদ্র্য। জীবনের সেই দিকটায় 'নিরানন্দে দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণবস্ত্র; ক্ষুধায় শিশুদের চক্ষু ও পেট কুক্ষিগত, আকুল হইয়া তাহারা খাদ্য প্রার্থনা করিতেছে। দীনা দুঃস্থা গৃহিণী চক্ষুর জলে আনন ধৌত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, একমান তণ্ডুলে যেন তাহাদের একশত দিন চলে।' আর-একটি পরিবারেও একই চিত্র। 'শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, তাহাদের দেহ শবের মতো শীর্ণ, আত্মীয়-স্বজনেরা মন্দাদর, পুরাতন ভগ্ন জলপাত্রে একফোঁটা মাত্র জল ধরে, গৃহিণীর পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র' (সদুক্তিকর্ণামৃত)।

অবশ্য, গ্রাম্য সমৃদ্ধির ছবিও আছে। একটি ছবি এইরূপ: 'বর্ষার প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে, ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে। অন্য কোন ভাবনা আর নাই। ঘরে গৃহিণী সারাদিনের শেষে প্রসাধনরতা। বাহিরে আকাশ হইতে জল ঝরিতেছে প্রচুর। গ্রাম্য যুবক সুখে নিদ্রা যাইতেছে।' অন্য আর-একটি ছবি: 'হেমন্তে কাটা শালিধান্যে চাষীর গৃহাঙ্গণ স্তূপীকৃত; নবজাত শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রসীমা ছাড়াইয়া যেন বিস্তৃত; গ্রামগুলি ইক্ষুপেষণযন্ত্রের শব্দে মুখর আর নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত' (সদুক্তিকর্ণামৃত)। বস্তুত, প্রাচীন বাংলার কৃষিজীবী গ্রাম্য বাঙালী গৃহস্থের পরম এবং চরম কামনাই হইতেছে, স্থানীয় শাসনকর্তা যেন লোভহীন হন, ধেনুস্বারা গৃহ যেন পবিত্র হয়, ক্ষেত্রে যেন চাষ হয় এবং গৃহিণী যেন অতিথিসৎকারে কখনও ক্লান্ত না হন। (শুভাঙ্ক—সদুক্তি-কর্ণামৃত)।

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্র-বিন্যাস

এক

প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখিতে হইলে রাষ্ট্রবিন্যাসের চেহারাটাও একবার দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন। সমসাময়িক সমাজেরই রূপ কমবেশি রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়, সেই সমাজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্র রচিত হয়। যখন সমাজের রূপ যেমন, সামাজিক আদর্শ যেমন, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয়, শাস্ত্র রচিত হয়; সেইরূপ আদর্শ যখন বদলায়, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় শাস্ত্রও বদলায়।

প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রবিন্যাস ব্যাখ্যার এই ধরনের কোন শাস্ত্র-সহায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। যাহা আছে তাহা রাষ্ট্রযন্ত্রের বাস্তব ক্রিয়াকর্মের এবং বিভিন্ন শাখা-উপশাখার, বিভাগ-উপবিভাগের পরিচয়জ্ঞাপক কতকগুলি রাজকীয় দলিল—ভূমি দানবিক্রয়ের পট্ট বা পাটা। এই ধরনের পট্টে রাষ্ট্রবিন্যাসসংক্রান্ত সকল সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়; ভূমি দানবিক্রয়ের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের যে অংশের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে সেইটুকুই শুধু আমরা পাইতেছি, এবং পরোক্ষভাবে আরও কিছু কিছু সংবাদের ইঙ্গিত পাইতেছি। একাদশ-দ্বাদশ শতকের সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থ হইতেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই-একটা খবর জানা যায়।

পূর্বাপর-সংলগ্ন-তথ্য-সম্বলিত উপাদান পঞ্চম শতকের আগে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার বহু আগে হইতেই উত্তরভারতে, বিশেষভাবে মগধ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া, সুবিস্তৃত রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও মতবাদ, জটিল অথচ সুসংবদ্ধ, বিভাগ-উপবিভাগবহুল রাষ্ট্রযন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল; মৌর্যাধিকারকালে ভারতবর্ষে তাহার সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট একটা রূপ আমরা দেখিয়াছি। মৌর্য রাষ্ট্রযন্ত্রই শক-কুষাণ আমলের রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও আদর্শ এবং রাষ্ট্রবিন্যাসের প্রভাবে গুপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রে ও রাষ্ট্রীয় বিন্যাসে বিবর্তিত হয়। মহাস্থান শিলাখণ্ডলিপির সাক্ষ্যে অনুমিত হয় বাংলাদেশের কিয়দংশ মৌর্যরাষ্ট্রের করকবলিত হইয়াছিল; তখন মৌর্য রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাদেশিক রূপও এদেশে প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু গুপ্তাধিকারের আগে আর্য সমাজবিন্যাস যেমন বাংলায় যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই, উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শ এবং বিন্যাসও তেমনই পূর্ণাঙ্গ প্রবর্তন লাভ করে নাই। গুপ্তাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিন্যাসের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সর্বপ্রথম উত্তরভারতীয় জীবননাট্যমঞ্চে প্রবেশ করিল। কাজেই, ঐতিহাসিক কালে বাংলার রাষ্ট্রবিন্যাসের যে চেহারা আমরা দেখি তাহা গুপ্ত আমলের উত্তরভারতীয় রাষ্ট্রবিন্যাসেরই প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিবর্তনের রূপ।

দুই

কিন্তু আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে। পঞ্চম শতকের আগে, এমন কি মৌর্য কালেরও আগে, প্রাচীন বাংলার জানপদেরা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত, তাহাদের সমাজ ছিল, রাষ্ট্রও ছিল। তাহারও আগে যখন রাজা ছিল না, কৌমসমাজ ছিল, ইতিহাসের সেই উষাকালেও সমাজের একটা শাসনপদ্ধতি ছিল। বাংলার বিভিন্ন

জেলায় সমাজের নিম্নতম স্তরে, অথবা পার্বত্য আরণ্য কৌমদের মধ্যে, যেমন সাঁওতাল, গারো, রাজবংশী ইত্যাদির মধ্যে, তাঁহাদের পঞ্চায়েতী প্রথায়, তাঁহাদের দলপতি নির্বাচনে, সামাজিক দণ্ডবিধানে, নানা আচারানুষ্ঠানে, ভূমি ও শিকারস্থানের বিলিবন্দোবস্তে, উত্তরাধিকারশাসনে এখনও সেই কৌম শাসনযন্ত্র ও পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সুপ্রাচীন কাল হইতেই আর্য সমাজযন্ত্র ও পদ্ধতি ইঁহাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে এবং কালে কালে ইঁহাদের অনেক রীতি-নিয়ম, বিন্যাস-ব্যবস্থা আত্মসাৎ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রবিন্যাসের কথা বলিতে গেলে এইসব অস্পষ্ট স্বল্পজ্ঞাত কৌম শাসনযন্ত্র ও রাষ্ট্রবিন্যাসের কথা একবার স্মরণ করিতেই হয়।

বাংলাদেশের সুপ্রাচীন কৌম সমাজবিন্যাসের গবেষণা বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলেও চলে। গারো, কোচ, বাহে, রাজবংশী, সাঁওতালদের সমাজশাসন সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য হয়তো আমাদের জানা আছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের নিম্নতর স্তরে নানা শাসনগত সংস্কার এখনও সক্রিয়; সেগুলির ঐতিহ্য-আলোচনা যথেষ্ট হয় নাই। এই কারণে বাংলার কৌম সমাজ ও শাসনবিন্যাস সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন। মোটামুটিভাবে এইটুকুই শুধু বলা চলে, আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতী শাসনযন্ত্র প্রাচীন কৌম সমাজের দান; পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত দলপতিই স্থানীয় কৌম শাসনযন্ত্রের নায়কত্ব করিতেন। মাতৃপ্রধান বা পিতৃপ্রধান কৌম ব্যবস্থানুযায়ী উত্তরাধিকারশাসন নিয়ন্ত্রিত হইত, এবং সামাজিক দণ্ডের ও নির্দেশের কর্তা ছিলেন পঞ্চায়েতমণ্ডলী। আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণ ও অব্যবহিত পরবর্তী মৌর্যাধিকারকালের আগেই বাংলাদেশে কৌমতন্ত্র নিঃসন্দেহে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল; এবং অনুমান হয়, কিছু পরেই মৌর্য রাষ্ট্র-বিন্যাসের প্রাদেশিক রূপ এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বাংলার এই রাজতন্ত্রের আদি পরিচয় মহাভারতের দুই-একটি কাহিনীতে এবং সিংহলী দীপবংশ-মহাবংশ পুরাণে বিজয়সিংহের গল্পে প্রথম পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নামে পুণ্ড্রদের এক রাজার কথা; ভীমকর্তৃক এক পৌণ্ড্রাধিপের পরাজয়ের কথা; বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম প্রভৃতি কৌম রাজাদের কথা; দুর্যোধনসহায় এক বঙ্গরাজের কথা; রামায়ণে প্রাচীন বাংলার কয়েকটি রাজ-বংশের কথা প্রভৃতি সমস্তই বাংলার আদি রাজতন্ত্রের পরিচয় বহন করে। দীপবংশ-মহাবংশের বঙ্গ ও রাঢ়াধিপ সীহবাহুর কথা প্রভৃতি হইতে মনে হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই বোধহয় বাংলার বিভিন্ন কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইতেছিল; কিন্তু সমগ্র দেশ বোধহয় একসঙ্গে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

তিন

রাজতন্ত্রের নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক ইতিহাস-কথিত গঙ্গারাষ্ট্রের বিবরণের মধ্যে। গঙ্গাহৃদি- গঙ্গারাষ্ট্রের সামরিক শক্তির এবং সেনাবিন্যাসের যে সংবাদ গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্বভাবতই অনুমান করা চলে যে, দৃঢ়সম্বদ্ধ সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রশৃঙ্খলা ছাড়া সামরিক শক্তির এইরূপ বিন্যাস কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু গঙ্গারাষ্ট্রের বাহিরে

সমসাময়িক বাংলার আর যেসব রাজা ও রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল তাহাদের সঙ্গে গঙ্গা-রাষ্ট্রের কী সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে, মহাভারত ও সিংহলী পুরাণের কাহিনী হইতে মনে হয়, এই রাজ্যগুলিতেও রাষ্ট্রীয় সচেতনতার অভাব ছিল না। প্রয়োজন হইলে এইসব রাষ্ট্র সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইত, পররাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের আদানপ্রদান করিত এবং সময় সময় প্রয়োজনমতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাষ্ট্র বৃহত্তর রাজ্য ও রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্র গ্রথিতও হইত। পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কাহিনীই তাহার প্রমাণ।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে বাংলার অন্তত একাংশের রাষ্ট্র-বিন্যাসের একটু আভাস পাওয়া যায় মহাস্থানের শিলাখণ্ডলিপিটিতে। মৌর্য আমলে উত্তরবঙ্গ মৌর্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; উত্তরবঙ্গে মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুড়নগল বা পুণ্ড্রনগর, বর্তমান বগুড়া হইতে পাঁচ মাইল দূরে মহাস্থানে। লিপিটিতে মহামাত্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, জনৈক রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বে বাংলায় তখন মৌর্য শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইত এবং জটিল মৌর্য রাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের রূপ তদানীন্তন বাংলাদেশেও প্রবর্তিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষে বা কোন প্রাকৃতিক অত্যায়িক কালে প্রজাদের বিপন্মুক্তির জন্য রাষ্ট্রের কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের অর্ধেক শস্য পৃথক করিয়া রাখিবেন, রাজা শস্যবীজ ও খাদ্য দিয়া প্রজাদের অনুগ্রহ করিবেন; বিনিময়ে রাষ্ট্র প্রজাদের দিয়া দুর্গনির্মাণ বা সেতুনির্মাণ ইত্যাদি কাজ করাইয়া লইবেন, অথবা শ্রম-বিনিময় না লইয়া এমনি দান করিবেন, কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে এইরূপ বিধান দিয়াছেন। মহাস্থানলিপিটিতে অনুরূপ রাষ্ট্রনির্দেশেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার কিছুটা ইঙ্গিত ধরা যায়। পুণ্ড্রনগরে একবার কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র হইতে পুণ্ড্রনগরে অধিষ্ঠিত মহামাত্রকে দুইটি আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। লিপির প্রথম লাইনটি ভাঙিয়া যাওয়াতে প্রথম আদেশটির স্বরূপ বলা কঠিন। দ্বিতীয়টিতে বিপৎপীড়িত প্রজাদের ধান্য এবং সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় অর্থসাহায্যও করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সাহায্য ঠিক দান নয়, ধার মাত্র; কারণ, রাষ্ট্র বা রাজা আশা প্রকাশ করিতেছেন, দেশ শস্যসমৃদ্ধ হইলে প্রজারা আবার রাজকোষে অর্থ এবং রাজকোষ্ঠাগারে ধান্য প্রত্যর্পণ করিবে। এই ব্যবস্থা একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ শাসনব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

ইহার পর বহুদিন পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রবিন্যাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুর ও নাগর সমাজের যে পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে পাওয়া যায়, তাহারও আগে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে, মিলিন্দপঞ্হ-গ্রন্থে যে সুসমৃদ্ধ সুবিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর জানা যায়, নাগার্জুনকোণ্ডর শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারসূত্রে সিংহল ও পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বঙ্গের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টতই মনে হয়, রাষ্ট্র- ও সমাজ-গত শাসন-শৃঙ্খলা বর্তমান না থাকিলে এই ধরনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বিশেষভাবে সুসমৃদ্ধ সুদূরপ্রসারী অন্তঃ- ও বহির্-বাণিজ্য কিছুতেই সম্ভব হইত না। সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনও এই অনুমানের অন্যতম ইঙ্গিত।

চতুর্থ শতকে রাঢ়দেশে একটি রাজা ও রাষ্ট্রের খবর পাওয়া যাইতেছে—এই রাষ্ট্র পুষ্করণাধিপ মহারাজ সিংহবর্মণ ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্মণের; কিন্তু ইঁহাদের রাষ্ট্র-যন্ত্রের বিন্যাস ও পরিচালনা সম্বন্ধে কোন তথ্যই জানা যাইতেছে না।

চার

গুপ্ত আমলে প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গুপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাদেশিক রূপ এদেশে পুরাপুরি প্রবর্তিত হইয়াছিল; স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রাদেশিক রূপের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এদেশে দেখা দিয়াছিল এ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা চলে না।

গুপ্ত সম্রাটদের রাজকীয় মর্যাদা ও রাজতন্ত্রের প্রধান পুরুষ হিসাবে তাঁহাদের ঔপাধিক আড়ম্বর ও সমারোহ সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা নররূপী দেবতা এবং দেবতানির্দিষ্ট অধিকারেই রাজা। এ তথ্যও সুবিদিত যে, গুপ্ত সম্রাটেরা বিজিত রাজ্যসমূহ সমস্তই তাঁহাদের সাক্ষাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রভুক্ত করিতেন না। অনেক অংশ থাকিত সামন্ত নরপতিদের শাসনাধীনে, এবং এইসব সামন্ত নরপতিরা নিজ নিজ রাজ্যে প্রায় স্বাধীন রাজা রূপেই রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের নিজেদের পৃথক রাষ্ট্রযন্ত্রও ছিল, এবং সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের রূপও ছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে এইসব সামন্ত রাজা ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ সাধারণত সর্বাধিপত্য স্বীকৃতিতেই আবদ্ধ ছিল; তবে যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁহারা সৈন্যবল সংগ্রহ করিতেন, নিজেরা যুদ্ধে যোগদান করিতেন। বাংলাদেশে এই সামন্ত নরপতিদের দায় ও অধিকার কিরূপ ছিল তাহার কিছু কিছু পরিচয় এই পর্বের লিপিমালা হইতে জানা যায়।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে আমরা অন্তত দুইজন সামন্ত নরপতির সংবাদ পাইতেছি, এবং এই দুইজনই মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সামন্ত; ইঁহাদের একজন মহারাজ রুদ্রদত্ত, এবং আর-একজন ছিলেন গুনাইঘরপট্ট-কথিত মহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেন। মল্লসারুললিপিতে বিজয়সেন শুধু 'মহারাজ' বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছেন। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, এইসব সামন্ত-মহাসামন্তরা কখনো কখনো মহারাজ বলিয়াই আখ্যাত ও ভূষিত হইতেন। গুনাইঘরপট্টে বিজয়সেনকে বলা হইয়াছে দূতক, মহাপ্রতীহার, মহাপিলুপতি পঞ্চাধিকরণোপরিক। রাষ্ট্রীয় অথবা রাজকীয় কার্যের জন্য যে রাষ্ট্রপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইতেন তাঁহাকে বলা হইত দূতক। মহা-প্রতীহার শান্তিরক্ষা বা যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারে নিযুক্ত শান্তিরক্ষক বা উচ্চ সামরিক কর্মচারী; মহাপিলুপতি রাজকীয় হস্তিসৈন্যের অধ্যক্ষ। পাঁচটি অধিকরণ (শাসন-কর্মকেন্দ্র; এক্ষেত্রে বোধহয় বিনয়াধিকরণের কথাই বলা হইয়াছে) মিলিয়া পঞ্চাধিকরণ; এই পঞ্চাধিকরণের যিনি প্রধান কর্মকর্তা তিনিই পঞ্চাধিকরণোপরিক। যাহা হউক, মহাসামন্ত মহারাজ বিজয়সেন যে সমসাময়িক রাষ্ট্রের এক প্রধান ও কারিৎকর্মা ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নাই; নহিলে এতগুলি বৃহৎ কর্মের কর্তৃত্বভার তাঁহার আয়ত্তে আসিবার কথা নয়। অথচ তাঁহার প্রভু বৈন্যগুপ্ত শুধু 'মহারাজ' আখ্যাতেই রাজকীয় দলিলে আখ্যাত হইয়াছেন। পট্ট-সাক্ষ্যে মনে হয়, সামন্ত নরপতিরা তাঁহাদের শাসিত জনপদে নিজেরা ভূমিদান করিতে পারিতেন না; মহারাজের কেন্দ্রীয়

রাষ্ট্রে ভূমিদানের অনুরোধ জানাইতেন। কিন্তু মল্লসারুললিপিতে দেখিতেছি-বিজয়সেন নিজেই ভূমিদান করিতেছেন। হয়তো তখন তিনি স্বাধীন নরপতি।

সামন্ত নরপতি -শাসিত জনপদ ছাড়া বাকী দেশখণ্ড ছিল খাস রাষ্ট্রের অধিকারে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্যবিভাগের নাম ছিল ভুক্তি; প্রত্যেক ভুক্তি বিভক্ত হইত কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েকটি বীথীতে, এবং প্রত্যেক বীথী কয়েকটি গ্রামে, এবং গ্রামই ছিল সর্বনিম্ন দেশবিভাগ।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে দুইটি ভুক্তিবিভাগের খবর পাওয়া যায়; বৃহত্তর ভুক্তিবিভাগ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ক্ষুদ্রতর। প্রথমটির খবর প্রত্যক্ষভাবে পাইতেছি দামোদরপুর পট্টোলী পাঁচটি হইতে, পরোক্ষভাবে পাহাড়পুর পট্টোলী হইতে; বর্ধমানভুক্তির খবর পাইতেছি মহারাজ গোপচন্দ্রের মল্লসারুললিপি হইতে। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তত তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। কোটিবর্ষ নামে একটি বিষয়ের খবর পাইতেছি ১, ২, ৪ ও ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে; ধনাইদহ পট্টোলীতে খাটাপারা বা খাদাপারা নামে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যাইতেছে; এবং বৈগ্রাম পট্টোলীতে পঞ্চনগরী নামে তৃতীয় আর-একটি বিষয়ের। মণ্ডলবিভাগের একটি-মাত্র উল্লেখ এই আমলের লিপিতে পাইতেছি, যদিও বাংলার বাহিরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যত্র এই বিভাগের বিদ্যমানতার সাক্ষ্য সুপ্রচুর। পাহাড়পুর পট্টোলীতে দক্ষিণাংশক বীথী ও নাগিরট্ট মণ্ডলের উল্লেখ পর পর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই মণ্ডল কোন বিষয়ের অন্তর্গত, না সরাসরি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। দক্ষিণাংশক বীথী এই মণ্ডলেরই একটি বিভাগ কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যত্র যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, মণ্ডল বিষয়ের ক্ষুদ্রতর বিভাগ। দক্ষিণাংশক বীথী ছাড়া আরও দুই-একটি বীথীবিভাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মুঙ্গের জেলায় রঙ্গপুর গ্রামে প্রাপ্ত নন্দপুর পট্টোলীতে (৪৮৯ খ্রীঃ) নন্দ-বীথি নামে এক বীথীর উল্লেখ আছে; এই বীথী অম্বিল গ্রামাগ্রহারের অন্তর্ভুক্ত; মনে হয়, এই অগ্রহারেই ছিল বিষয়পতি ছত্রমহের অধিকরণ বা বিষয়কর্মকেন্দ্র। এই অম্বিল গ্রামাগ্রহার যে বিষয়ের রাষ্ট্রকেন্দ্র, সেই বিষয়েরই অন্তর্গত ছিল নন্দবীথী। বক্কটক নামে আর-একটি বীথীবিভাগের উল্লেখ পাইতেছি গোপচন্দ্রের মল্লসারুললিপিটিতে এবং এই বীথী বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। সর্বনিম্ন রাষ্ট্রবিভাগ গ্রাম। কোন কোন ধর্মদেয় বা ব্রহ্মদেয় গ্রাম অগ্রহার নামে অভিহিত হইত। অনুমান হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বা রাষ্ট্রকর্মকেন্দ্র হিসাবে কোন কোন অগ্রহার গ্রাম বাড়িয়া উঠিয়া বড় হইত এবং অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিত। ছোট ছোট একাধিক গ্রাম বা পাড়া লইয়া একটি বৃহৎ গ্রামও গড়িয়া উঠিত, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলীর বায়িগ্রাম।

মহারাজাধিরাজ স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন। কখনো কখনো রাজকুমার বা রাজপরিবারের লোকেরাও ভুক্তিপতি নিযুক্ত হইতেন; ৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উপরিক মহারাজ ছিলেন জনৈক রাজপুত্র দেবভট্টারক। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ভুক্তিপতিদের বলা হইত উপরিক, কিন্তু বুধগুপ্তের রাজত্বকালে দেখিতেছি তাঁহাদের বলা হইতেছে, উপরিক মহারাজ বা মহারাজ। ভুক্তির শাসনযন্ত্রের স্বরূপ কী ছিল বলা কঠিন; বসারে প্রাপ্ত একটি সীলমোহরে দেখা যাইতেছে, উপরিকের শাসনকেন্দ্রে একটি অধিকরণ বা কর্মকেন্দ্র থাকিত; কিন্তু এই

কর্মকেন্দ্র কাহাদের লইয়া গঠিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে না। বুধ-গুপ্তের পাহাড়পুরলিপি পাঠে মনে হয়, উপরিক মহারাজের সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের স্থানীয় অধিকরণের সাক্ষাৎভাবে কোন সম্বন্ধ ছিল না, অন্তত ভূমি দানবিক্রয়ের ব্যাপারে। এই ক্ষেত্রে ভূমিবিক্রয়ের প্রস্তাবটি আসিয়াছিল প্রথম আয়ুক্তক নামে বর্ণিত কর্মচারী এবং স্থানীয় অধিকরণের সম্মুখে; আয়ুক্তক হইতেছেন বিষয়পতি। মল্লসারুললিপিতে বর্ধমানভুক্তির উপরিকের অধিকরণসংপৃক্ত কয়েকজন রাজকর্ম-চারীর খবর পাইতেছি; ইঁহাদের পদোপাধি ভোগপতিক, পত্তলক, চৌরোদ্ধরণিক, আবসথিক, হিরণ্যসমুদায়িক, ঔদ্রঙ্গিক, ঔর্ণস্থানিক, কার্তাকৃতিক, দেবদ্রোণী-সম্বন্ধ, কুমারামাত্য, আগ্রহারিক, তদায়ুক্তক, বাহনায়ক, এবং বিষয়পতি। উপরিক হইতেছেন ভুক্তির সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী, বিষয়পতি বিষয়বিভাগের সর্বোচ্চ রাজকর্ম-চারী; তদায়ুক্তক বোধহয় উপরিকনিযুক্ত কর্মচারী এবং আয়ুক্তক বা বিষয়পতির সমার্থক। কার্তাকৃতিক শিল্পকর্মের অধ্যক্ষ, অথবা রাজকীয় পূর্তবিভাগের কর্মকর্তা হইলেও হইতে পারেন। ভোগ একপ্রকারের সুপরিচিত কর; ভোগ-পতিকেরা বোধহয় সেই করের সংগ্রহকর্তা। চৌরোদ্ধরণিক উচ্চপদস্থ শান্তিরক্ষক কর্মচারী। আবসথিক হইতেছেন রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঘরবাড়ি, বিশ্রামস্থান ইত্যাদির অধ্যক্ষ। হিরণ্যসমুদায়িক মুদ্রায় দেয় কর সংগ্রহকর্মের অধ্যক্ষ। ঔদ্রঙ্গিক স্থায়ী প্রজাদের নিকট হইতে উদ্রঙ্গ নামক করের সংগ্রহকর্তা। ঔর্ণস্থানিক বোধহয় রেশম-জাতীয় বস্ত্রশিল্পকর্মের নিয়ামক কর্তা। দেবদ্রোণীসম্বন্ধ হইতেছেন মন্দির, তীর্থ-ঘাট ইত্যাদির রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। কুমারামাত্য বোধহয় বংশানুক্রমে প্রত্যক্ষ-ভাবে রাজা বা রাজকুমার কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাঁহাদের অধীন কর্মচারী। অগ্রহার হইতেছে ধর্মদেয়, ব্রহ্মদেয় ভূমি; এই ভূমির রক্ষক-পর্যবেক্ষকের নাম বোধহয় ছিল আগ্রহারিক। বাহনায়ক যানবাহন-যাতায়াত প্রভৃতির নিয়ামক কর্তা।

বিষয়পতি সাধারণত নিযুক্ত হইতেন উপরিককর্তৃক; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বোধহয় মহারাজাধিরাজ স্বয়ংই ছিলেন নিয়োগকর্তা। বিষয়ের শাসনকর্তাকে কোন কোন লিপিতে বলা হইয়াছে আয়ুক্তক, যেমন পাহাড়পুরলিপিতে; কোন লিপিতে কুমারামাত্য, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলীতে; কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত-রাজাদের আমলে সর্বত্রই তাঁহার পদোপাধি বিষয়পতি।

বিষয়পতি বিষয়াধিকরণের সর্বোচ্চ কর্মচারী, এবং বিষয়পতির অধিষ্ঠানস্থানেই বিষয়াধিকরণের শাসনকেন্দ্র। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের নবম অঙ্কে এক অধি-করণের বর্ণনা আছে। মৃচ্ছকটিকের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—অধিকরণিক, অধিকরণ-ভোজক, শ্রেষ্ঠী এবং কায়স্থদের লইয়া অধিকরণ গঠিত হইত, এবং এইসব অধিকরণের উপর ভূমিদানবিক্রয়কর্ম শুধু নহে, বিষয়শাসনসংক্রান্ত সর্বপ্রকার রাষ্ট্রকর্মের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল, এবং তাহার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিচার, দণ্ড-পুরস্কার, দানকর্মও বাদ পড়িত না। অনুরূপ ইঙ্গিত গুপ্ত-আমলের লিপিগুলিতেও পাওয়া যাইতেছে; তবে কোন কোন বিষয়ের বোধহয় কোন অধিকরণ থাকিত না, বিষয়পতি তাঁহার কর্মচারীদের লইয়া শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। প্রধান দায়িত্ব যে সর্বত্র বিষয়পতির উপরই ছিল সন্দেহ নাই। দামোদর পট্টোলী -কথিত (৪৪২-৪৪—৫৪৩-৪৪ খ্রীঃ) কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিকরণের যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখিতেছি, বিষয়পতির সহায়করূপে অধিকরণ গঠন করিতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ এবং প্রথম সার্থবাহ। প্রথম কায়স্থ খুব সম্ভব বিষয়পতিরা

কর্মসচিব এবং সেইহেতু রাজকর্মচারী। কিন্তু বাকী তিনজন যথাক্রমে বণিক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি। অনুমান হয়, শ্রেষ্ঠী, কুলিক, এবং সার্থবাহদের নিজস্ব নিগম ছিল, এবং বিষয়াধিকরণের নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক এবং প্রথম সার্থবাহ তাঁহাদের নিজস্ব নিগমের সভাপতি এবং সেই হিসাবে বিষয়াধিকরণে ইঁহাদের প্রতিনিধি ছিলেন। ইঁহারা কি স্ব স্ব নিগমকর্তৃক নির্বাচিত হইতেন, না রাষ্ট্র বা রাজাদ্বারা নিযুক্ত হইতেন? এ প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে, প্রায় সমসাময়িক নারদ ও বৃহস্পতি ধর্মসূত্রের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, এইসব নিগম-সভাপতিরা স্ব স্ব নিগমকর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। দ্বিতীয়ত, অধিকরণের এইসব সভ্যদের সঙ্গে বিষয়পতির সম্বন্ধ কী ছিল? কেহ কেহ মনে করেন, শাসনব্যাপারে ইঁহাদের সাক্ষাৎ দায়িত্ব কিছু ছিল না, অধিকরণের অধিবেশনে ইঁহারা উপস্থিত থাকিতেন মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন, সর্বময় দায়িত্ব ছিল বিষয়পতির, আর ইঁহারা ছিলেন উপদেষ্টা। কিন্তু লিপিগুলির প্রসঙ্গ-সাক্ষ্য এবং মৃচ্ছকটিকের বিবরণ একত্র করিলে মনে হয়, ইঁহারা শুধু সহায়ক বা উপদেষ্টা মাত্র ছিলেন না, বিষয়পতির সঙ্গে ইঁহারাও সমভাবে শাসনকার্যের দায়িত্ব নির্বাহ করিতেন।

বিষয়াধিকরণের সভ্যদের প্রয়োজনমত সাহায্য করিবার জন্য একটি পুস্তপালের দপ্তর থাকিত; বিশেষত, ভূমিদানবিক্রয়ব্যাপারে ইঁহাদের সাহায্য সর্বদাই প্রয়োজন হইত, কারণ ভূমির মাপজোখ, সীমা-নির্দেশ, ভূমির স্বত্বাধিকার, ইত্যাদি সবকিছুর দলিলপত্র ইঁহাদের দপ্তরেই রক্ষিত হইত। ভূমিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট ভূমিক্রয়ের ইচ্ছা ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের উদ্দেশ্য (প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ধর্মোদ্দেশে দান) এবং মূল্যদানের স্বীকৃতি স্থানীয় অধিকরণে আবেদনরূপে উপস্থিত করিতেন; অধিকরণ প্রস্তাবিত আবেদনটি পরীক্ষা করিবার জন্য পুস্তপালের দপ্তরে পাঠাইয়া দিতেন। পুস্তপালের দপ্তর বিক্রয় অনুমোদন করিলে এবং মূল্য রাজসরকারে জমা হইলে বিক্রয়কার্য নিষ্পন্ন হইত। এই বিক্রয়কার্য-সম্পাদনা পট্টীকৃত হইত তাম্রশাসনে, এবং বিক্রীত ভূমির উপর অধিকারের দলিল-প্রমাণস্বরূপ তাম্রশাসনখানি ক্রেতার হস্তে অর্পিত হইত। ভূমির মাপজোখ পুস্তপালরাই করিতেন এমন অনুমান করা যাইতে পারে।

বীথীবিভাগেরও যে একটা নিজস্ব অধিকরণ থাকিত তাহার প্রমাণ মল্লসারুল-লিপির সাক্ষ্যেই জানা যাইতেছে, তবে এই অধিকরণ কিভাবে গঠিত হইত, বলা যাইতেছে না। মহত্তর, খাড়্গী ও অন্তত একজন বাহনায়ক বক্কটক বীথী-অধিকরণের শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং ভূমি দানবিক্রয়ের ব্যাপারে এই অধিকরণের ক্ষমতা বিষয়াধিকরণের অনুরূপ ছিল। এই লিপিতে কুলবারকৃত নামে একাধিক বীথীঅধিকরণকর্মচারীর উল্লেখ পাইতেছি; বিক্রীত ভূমির বীথীকোষস্থ অর্থ অধিকরণের নির্দেশানুযায়ী বিলিবন্দোবস্ত করিবার ভার এই কুলবারকৃতদের উপর দেওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় অধিকরণসংপৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত দুইজন মহত্তর, তিনজন খাড়্গী এবং একজন বাহনায়কের সাক্ষাৎ পাইতেছি; তবে শাসনকার্যে ইঁহাদের দায়িত্ব কতখানি ছিল বলা কঠিন।

গ্রামের শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব কাহার উপর ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না, তবে গ্রামিক নামে জনৈক রাজ-পুরুষের (?) সাক্ষাৎ কোন কোন লিপিতে পাওয়া যাইতেছে, (যেমন, ৩নং দামোদরপুরলিপিতে); বোধহয় তাঁহারাই

ছিলেন গ্রাম্য শাসনযন্ত্রের কর্তা। অধিকাংশ গ্রামে গ্রামের প্রধান প্রধান লোকেরাই—ব্রাহ্মণ, মহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদিরা—বোধহয় শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। অন্তত ভূমি দানবিক্রয়ের ব্যাপারে ইঁহারা স্থানীয় শাসনযন্ত্রের উপদেষ্টা ও সহায়ক ছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন গ্রামে একটু বিস্তৃতর শাসনযন্ত্রও বিদ্যমান ছিল; সেসব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতিরা তো সহায়ক উপদেষ্টা হিসাবে থাকিতেনই; তাহা ছাড়া গ্রামিক এবং অষ্টকুলাধিকরণ নামে একটি অধিকরণও যে থাকিত, তাহারও প্রমাণ আছে (৩নং দামোদরপুর পট্টোলী এবং ধনাইদহ পট্টোলী দ্রষ্টব্য)। অষ্টকুলাধিকরণের গঠন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চকুলের উল্লেখ অনেক লিপিতেই দেখা যায়, এবং স্থানীয় রাষ্ট্রকার্যে, বিশেষত ভূমি- ও অর্থ -সংক্রান্ত ব্যাপারে পঞ্চকুলের দায়িত্ব যে অনেকখানি ছিল তাহা আমরা একাধিক স্বতন্ত্র সাক্ষ্যে জানিতে পাই। পঞ্চকুল যে কৌমতান্ত্রিক পঞ্চায়েত প্রথার সমগোত্রীয়, সন্দেহ নাই। অষ্টকুল বোধহয় পঞ্চকুলের মতোই জনসংঘ—আটজন প্রধান ব্যক্তি লইয়া গঠিত সমিতি।

বিষয়- ও বীথী -অধিকরণের মতো ভূমি দানবিক্রয়ের ব্যাপারে গ্রাম্য অধিকরণেরও একই অধিকার ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। ৩নং দামোদরপুর পট্টোলী ও ধনাইদহ-লিপি ও বৈগ্রামলিপির সাক্ষ্যে মনে হয় ঊর্ধ্বতন অধিকরণের নির্দেশানুযায়ী গ্রাম্য অধিকরণের কর্তৃপক্ষই ভূমি নির্বাচন করিয়া মাপজোখ করিয়া মূল্য লইয়া বিক্রয়কার্য সম্পাদন করিতেন এবং তাহা পট্টীকৃতও করিতেন।

ভুক্তি-অধিকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য স্থানীয় অধিকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই দেখিতেছি রাষ্ট্রযন্ত্রে জনসাধারণের ইচ্ছা, মতামত, দায় ও অধিকার কার্যকরী করিবার একটা সুযোগ ছিল। শিল্প- ও ব্যবসাবাণিজ্য -বহুল জনপদের অধিকরণগুলিতে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা স্থান পাইতেন; কৃষিবহুল, ভূমিনির্ভর জনপদের স্থানীয় বীথী ও গ্রাম্য অধিকরণগুলিতে গ্রামিক, অষ্টকুলাধিকরণ, কুটুম্ব, মহত্তর, ব্রাহ্মণ ইত্যাদির শাসনকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন—অন্তত সহায়ক ও উপদেষ্টারূপে। সুতরাং এই যুগের রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণকে একেবারে অবজ্ঞা করিয়া চালাতে পারে নাই, এ তথ্য স্বীকার করিতে হয়। তবে, জনসাধারণ বলিতে ভূমি- ও অর্থ -বান সমৃদ্ধ শ্রেণী এবং ব্রাহ্মণদেরই বুঝাইতেছে, সন্দেহ নাই।

পাঁচ

ষষ্ঠ শতকে বঙ্গ স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্র গড়িয়া তোলে। তখন উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে গুপ্ত বংশের আধিপত্য বিলীয়মান। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) যে নূতন রাষ্ট্রযন্ত্রের পত্তন হইল, তাহার রাষ্ট্রবিন্যাসও গুপ্ত আমলের প্রাদেশিক রাষ্ট্ররূপের আদর্শই স্বীকার করিয়া লইল। রাষ্ট্রবিভাগ, শাসনপদ্ধতি, রাজপাদোপজীবীদের উপাধি, দায় ও অধিকার, শাসনক্রম ইত্যাদি সমস্তই একপ্রকার রহিল। কাজেই ঐ পর্বে নূতন কথা বলিবার বিশেষ কিছু নাই।

রাষ্ট্রযন্ত্রের চূড়ায় বসিয়া আছেন মহারাজাধিরাজ স্বয়ং, তবে এই মহারাজাধিরাজ স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলেও স্থানীয় নরপতি মাত্র। ফরিদপুরে কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত পট্টোলীগুলিতে, বপ্যঘোষবাটলিপিতে, ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীতে উল্লিখিত

সকলেই স্বাধীন নরপতি সন্দেহ নাই, এবং সেই হিসাবেই মহারাজাধিরাজ, নৃপাধিরাজ, অধিমহারাজ প্রভৃতি উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গ মহারাজাধিরাজদের অধীনে সামন্ত নরপতির অস্তিত্ব ইহার অন্যতম প্রমাণ।

গুপ্ত আমলেই দেখিয়াছি, রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততন্ত্রনির্ভর। এই আমলেও তাহার ব্যতিক্রম নাই, বরং সামন্ততন্ত্রের প্রসারই দেখা যাইতেছে। সমাজের ভূমি-নির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বিজিত রাজ্যের রাজারাই বিজেতা মহারাজাধিরাজগণ কর্তৃক মহাসামন্ত রূপে স্বীকৃত হইতেন, এই-রূপ অনুমান অসংগত নয়। সামন্তরা সকলে যে একই পর্যায়- ও মর্যাদা -ভুক্ত ছিলেন না, তাহা তাঁহাদের উপাধি হইতেই সুপ্রমাণিত। কেহ ছিলেন মহাসামন্ত-মহারাজ, কেহ মহাসামন্ত, কেহ বা শুধু সামন্ত। ভূম্যাধিপত্যের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও অধিকার, রাজসভায় ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি প্রভৃতি উপর এই স্তরবিভাগ নির্ভর করিত সন্দেহ নাই।

বঙ্গ রাষ্ট্রের বৃহত্তম রাষ্ট্রবিভাগের নাম এই পর্বে কী ছিল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বর্ধমানভুক্তি (মল্লসারুললিপি) ও নব্যাবকাশিকা (ফরিদপুরলিপি), এই দুইটি যে বৃহত্তম বিভাগসমূহের দুইটি বিভাগ এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; বর্ধমান-ভুক্তির উল্লেখ হইতে মনে হয়, নব্যাবকাশিকাও ভুক্তিপর্যায়েরই রাষ্ট্রবিভাগ। ভুক্তির শাসনকর্তারা এ ক্ষেত্রেও উপরিক উপাধিতেই আখ্যাত হইতেছেন, যদিও স্থানুদত্তকে উপরিক বলা হয় নাই, শুধু মহারাজ বলা হইয়াছে। নাগদেব শুধু উপরিক নহেন, মহাপ্রতীহারও বটে; জীবদত্ত উপরিক এবং অন্তরঙ্গ। ইঁহারা নিযুক্ত হইতেন স্বয়ং মহারাজাধিরাজ কর্তৃক। শশাঙ্কের সময় দণ্ডভুক্তি বা দণ্ডভুক্তিদেশও বোধহয় ছিল একটি ভুক্তিবিভাগ, এবং তাহার শাসনকর্তার পদোপাধি ছিল উপরিক।

গুপ্তরাষ্ট্রে যেমন, বঙ্গরাষ্ট্রে এবং শশাঙ্কের গৌড়রাষ্ট্রেও তেমনই ভুক্তিঅধিষ্ঠানের একটি অধিকরণ নিশ্চয়ই ছিল। ফরিদপুরের পট্টোলীগুলিতে এই অধিকরণের উল্লেখ পাইতেছি না; শশাঙ্কের মেদিনীপুরলিপি দুইটিতে যে তাবীর অধিকরণের উল্লেখ আছে, সেই অধিকরণটি তো ভুক্তির অধিকরণ বলিয়াই মনে হইতেছে।

ভুক্তির নিম্নবর্তী রাষ্ট্রবিভাগ বিষয়ের খবর এই পর্বেও পাওয়া যাইতেছে। নব্যাবকাশিকা (-ভুক্তির) প্রধান একটি বিষয় ছিল বারকমণ্ডল বিষয়। বিষয়ের বিষয়পতি কখনও মহারাজাধিরাজ স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন, যেমন বপ্পঘোষবাটলিপিতে, কিন্তু সাধারণত উপরিকেরাই বিষয়পতি নিযুক্ত করিতেন, যেমন, বারকমণ্ডল বিষয়ে। ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীতেও এক সুব্বুঙ্গ বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি।

বিষয়পতিদের অধিকরণের খবর ফরিদপুর পট্টোলীগুলিতে তো আছেই, লোক-নাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতেও দেখা যায়। শেষোক্ত লিপিটিতে দেখিতেছি, বিষয়পতি ও তাঁহার অধিকরণ স্থানীয় শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন "সপ্রধান-ব্যবহারি-জনপাদান্"-দের সাহায্যে। ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার লিপিগুলিতে যে অধিকরণের উল্লেখ দেখিতেছি, তাহার গঠন ঠিক গুপ্ত আমলের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বিষয়াধিকরণের মতন নয়। ধর্মাদিত্যের দ্বিতীয় পট্টোলীতে বিষয়পতি এবং বিষয়াধিকরণ ছাড়া আরও ষোলো-সতেরো জন বিষয়-মহত্তর, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী এবং অনুল্লিখিত-সংখ্যক প্রকৃতিপুঞ্জের খবর পাওয়া যাইতেছে। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, কোটিবর্ষের বিষয়াধিকরণে নগরশ্রেষ্ঠী-প্রথমকুলিক-প্রথম সার্থবাহের যে স্থান, এখানে তাঁহাদের সেই স্থান নাই; বিষয়-মহত্তরেরাও বারকমণ্ডল বিষয়াধিকরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

-হেন বলিয়া মনে হইতেছে। ইঁহারা সম্ভবত জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে অধিকরণের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া শাসনকার্যের আলোচনা ও কর্তব্য নির্ধারণে সহায়তা করিতেন। ইহা ছাড়া বারকমণ্ডল বিষয়ের আরও একটু বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি। ঘুগ্রাহাটিলিপি এবং দুইটি কোটালিপাড়ালিপিতে বিষয়পতির অধি-করণের প্রধান হিসাবে একজন জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠাধিকরণিকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। মনে হয়, জ্যেষ্ঠাধিকরণিক ছিলেন অন্যান্য সভ্যদের মুখ্যতম প্রতিনিধি। এই অন্যান্য সভ্যরা কাহারা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এই অধিকরণের সহযোগী উপদেষ্টা হিসাবে থাকিতেন বিষয়-মহত্তরেরা, মহত্তরেরা, প্রধান ব্যাপারী বা প্রধান ব্যবহারীরা। বিষয়-মহত্তরেরা উচ্চতর পর্যায়ের; মহত্তরেরা তো স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বিত্তবান্ ও ভূমিবান্ লোক বলিয়াই মনে হয়; ব্যাপারী ও ব্যবহারীরা নিঃসন্দেহে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক।

ভূমিক্রয়দানবিক্রয়ব্যাপারে বঙ্গরাষ্ট্রের বিষয়াধিকরণগত সংবাদ গুপ্তরাষ্ট্রযন্ত্রেরই অনুরূপ: মল্লসারুললিপিতে বীথী-অধিকরণ সম্পর্কে কুলবারকৃত-আখ্যাত এক-শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ আগেই করা হইয়াছে; বঙ্গরাষ্ট্রের কোন কোন লিপিতেও কুলবার নামে রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি। ইঁহারা বোধহয় স্থায়ী অধিকরণ-কর্মচারী ছিলেন না, প্রয়োজনানুযায়ী অধিকরণ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন; ভূমি-আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে বোধহয় তাঁহারা দক্ষ ছিলেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, গুপ্তরাষ্ট্রের অধিকরণগুলিতে যেমন, বঙ্গরাষ্ট্রের অধিকরণেও জনসাধারণের মতামত ইত্যাদি জ্ঞাপন ও কার্যকরী করিবার সুযোগ ও উপায় ছিল; বিষয়-মহত্তর, মহত্তর, ব্যাপারী-ব্যবহারী ও প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মেলনই তাহার প্রমাণ।

বঙ্গরাষ্ট্রের কোন বীথী ও বীথী-অধিকরণ বা গ্রামাধিকরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না; তবে মনে হয়, পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রবিভাগ ও রাষ্ট্রযন্ত্রে ইহাদের স্থান ছিল—সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই মাত্র। গুপ্ত আমলের প্রাদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র বঙ্গরাষ্ট্রের কর্মধারা বা আমলাতন্ত্র একই-জাতীয় না হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র বিস্তৃততর হইবে, এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের রূপ লইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। বঙ্গরাষ্ট্রের আমলে তাহাই হইয়াছিল, এবং মল্লসারুললিপিতে সেই বর্ধিত বিস্তৃত আমলাতন্ত্রের প্রতিফলন দেখা যাইতেছে। এই আমলাতন্ত্র এখন হইতে ক্রমশ বিস্তারলাভ করিয়া সেন -আমলে অস্বাভাবিক স্ফীতি লাভ করিবে—ক্রমে আমরা তাহা দেখিব। ইতি-মধ্যেই (সপ্তম শতক) লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে সান্ধিবিগ্রহিক উপাধিক এক-কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকর্মচারীর উল্লেখ দেখা যাইতেছে। সান্ধিবিগ্রহিক পররাষ্ট্রব্যাপারে যুদ্ধ ও সন্ধি- শান্তিসম্পর্কিত উচ্চতম রাজকর্মচারী, প্রাদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রে সান্ধি-বিগ্রহিক থাকার কোন প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সে প্রয়োজন হইয়াছিল।

ছয়

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নবযুগের সূচনা দেখা গেল। প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া এই রাজবংশ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই বংশের প্রভাবশালী রাজারা বাংলাদেশের বাহিরে কামরূপে এবং উত্তর ভারতের সুবিস্তৃত দেশাংশ জুড়িয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, অসংখ্য ক্ষুদ্র

বৃহৎ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারে বাংলাদেশকে ইঁহারা আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জগতে একটা বিশিষ্ট স্থানে উন্নীত করিয়াছিলেন। এইসব সুবৃহৎ প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে-রাষ্ট্রের সচেতন কর্ম-কল্পনা সক্রিয় ছিল সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বতোমুখী বিস্তার ও জটিলতা সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া, যে রাষ্ট্রযন্ত্র গুপ্ত আমলে প্রবর্তিত হইয়া স্বাধীন বঙ্গরাজাদের, শশাঙ্ক ও অন্যান্য রাজাদের আমলে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া অভ্যস্ত ও আচরিত হইয়াছে, তাহা পালবংশের সুদীর্ঘ কালের ক্রমবর্ধমান প্রসারে আরও প্রসারিত, আরও গভীরমূল, আরও দৃঢ়সংবদ্ধ হইবে, তাহাও কিছু বিচিত্র নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের নূতন কোন বৈশিষ্ট্য পালরাষ্ট্র বা চন্দ্র- কম্বোজরাষ্ট্রে সূচিত হইয়াছিল, এমন নয়, বরং বলা যায় উত্তর ভারতের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার সূত্রে সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রবিন্যাসগত অনেক অভ্যাস, অনেক বৈশিষ্ট্য এই যুগের রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিয়াছিল।

এ-যুগেও রাষ্ট্রবিন্যাসের গোড়ার কথা রাজতন্ত্র এবং সে রাজতন্ত্র আরও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত আরও মহিমা- ও মর্যাদা -সমন্বিত। অব্যবহিত পূর্বযুগের স্বাধীন রাজারা ছিলেন মহারাজাধিরাজ। পাল ও চন্দ্র বংশের রাজারা শুধু মহারাজাধিরাজ মাত্র নন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর এবং পরমভট্টারকও। ভারতের অন্যত্র যেমন, বাংলাদেশেও তেমনই এই যুগে রাজাকে দেবতা ও পরমেশ্বরের নররূপী অবতার এবং পরমগুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ নামে আখ্যাত হইতেন, এবং প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন। তাঁহার দায় ও অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রাজার পুত্র কুমার নামে অভিহিত হইতেন, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতেন, যুদ্ধবিগ্রহেও যোগদান করিতেন। রাজারা রাষ্ট্রকার্যে ভ্রাতাদের সহায়তা এবং পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ভ্রাতা ও রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে সিংহাসন ও উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ হইত না, এমন নয়; দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে কৈবর্ত-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বোধ হয় ভ্রাতৃবিরোধ এবং মহীপাল কর্তৃক ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালের কারাবরোধ। তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর মূলে খুল্লতাত মদনপালের দায়িত্ব একেবারে ছিল না, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। পাললিপিমালার রাজপাদপোজীবীদের তালিকায়ও রাজপুত্রের উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশীয় লিপির এই তালিকায় রাজার এবং কম্বোজবংশের ইর্দা পট্টোলীতে মহিষীর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়।

পাল আমলে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়সংবদ্ধ হয়। সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সামন্তদের সংখ্যাও ছিল অনেক। ইঁহাদের অনেকেই বিজিত রাজ্য ও রাষ্ট্রের প্রভু ছিলেন; মহারাজাধিরাজ সম্রাটের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন; তবে, খালিমপুরলিপি পাঠে মনে হয়, পাল-সম্রাটেরা সময় সময় মহতী রাজকীয় সভা আহ্বান করিতেন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে, এবং তখন এইসব মহারাজা-মহাসামন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সামন্ত ও মাণ্ডলিক পর্যন্ত সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজাধিরাজ সম্রাটকে নিজেদের অধীনতার স্বীকৃতি জানাইতেন। পাল- ও চন্দ্র -লিপিমালায় রাজ-পুরুষদের যে তালিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে রাজন্, রাজনক,

রাজন্যক, রাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি ঔপাধিক রাজপাদোপজীবীদের সাক্ষাৎ মেলে। ইঁহারা সকলেই নানা স্তরের সামন্ত নরপতি। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্ব-কালে যাঁহারা পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহারাও 'অনন্ত সামন্ত-চক্র'। আবার রামপাল যাঁহাদের সহায়তায় পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে 'সামন্ত' আখ্যায়ই পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব জনপদে প্রায় স্বাধীন নরপতি। অপর-মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর তো নিজেও ছিলেন সামন্ত, পালরাষ্ট্রের দুর্দিনে যাঁহারা বিদ্রোহপরায়ণ হইয়া সেই রাষ্ট্রকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সামন্ত। এক বর্মণরাজ রামপালের শরণাগত হইয়াছিলেন এবং ইহা অসম্ভব নয় যে, বর্মণবংশ সামন্তবংশরূপেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং পরে স্বাধীন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কামরূপের বিদ্রোহী নরপতি তিঙ্গ্যদেবও পাল রাষ্ট্রের সামন্তই ছিলেন।

পাল-চন্দ্র পর্বের রাষ্ট্রেই আমরা সর্বপ্রথম একজন প্রধান রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি যাঁহার পদোপাধি মন্ত্রী বা সচিব এবং যিনি রাজা ও সম্রাট্‌দের সকল কর্মের প্রধান সহায়ক, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বপ্রধান কর্মচারী। ভট্ট গুরু মিশ্রের বাদল-প্রশস্তিতে দেখা যাইতেছে, একটি সম্ভ্রান্ত, শাস্ত্রবিদ্, সমসাময়িক পণ্ডিত-কুলাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ-পরিবার চারিপুরুষ ধরিয়া পাল-সম্রাটের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। মন্ত্রীরা সকলেই খুব প্রতাপবান ছিলেন, রাজা ও রাষ্ট্রের উপর তাঁহাদের আধিপত্য খুব প্রবল ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। আর-একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারও বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরিয়া পাল-রাজাদের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। শাস্ত্রবিদ্-শ্রেষ্ঠ যোগদেব বংশানুক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপালের সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এই দুইটি বংশানুক্রামক দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়, বংশানুক্রমিক মন্ত্রিত্বপদ পালরাষ্ট্রে প্রচলিত হইয়াছিল; এবং সম্ভবত এ ক্ষেত্রেও তাঁহারা গুপ্তবংশীয় প্রথাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। শুধু মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য অনেক পদনিয়োগের ক্ষেত্রে পাল- বর্মণ ও সেন -বংশীয় রাজারা এই বংশানুক্রমিক নিয়োগপ্রথা মানিয়া চলিতেন।

প্রধানমন্ত্রী (বাণগড়লিপির মহামন্ত্রী দ্রষ্টব্য) ছাড়াও রাজার এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য আরও কয়েকজন মন্ত্রী থাকিতেন, ইঁহাদের কাহারো কাহারো পদোপাধি পাল-চন্দ্রবংশের লিপিগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন, মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, রাজামাত্য, মহাকুমারামাত্য, দূত বা দূতক, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতীহার, মহাদণ্ডনায়ক, মহাদৌঃসাধসাধনিক, মহাকর্তাকৃতিক, মহাক্ষপটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, রাজস্থানীয় এবং অমাত্য। রাজপুত্রের পরই রাজামাত্যের উল্লেখ হইতে মনে হয়, মন্ত্রীর পরই ইঁহাদের স্থান। কুমারামাত্য সাধারণত বিষয়পতির সমার্থক। মহাকুমারামাত্য হয়তো বিষয়পতি বা কুমারামাত্যদের সর্বাধ্যক্ষ। দূত কোন স্থায়ী রাজপদ না-ও হইতে পারে; অন্তত তিনটি লিপিতে দেখিতেছি, মন্ত্রীরা এবং সান্ধিবিগ্রহিকেরাও দূত নিযুক্ত হইতেছেন (বাণগড়, আমগাছি ও মনহলি লিপি)। মহাসান্ধিবিগ্রহিক পররাষ্ট্রসংপৃক্ত যুদ্ধ- ও শান্তি ব্যবস্থা -বিষয়ক উচ্চতম রাজ-কর্মচারী। মহাসেনাপতি যুদ্ধবিগ্রহ-সম্পর্কিত উচ্চতম রাজপুরুষ। মহাপ্রতীহার পদোপাধি রাজপুরুষ ও সামন্ত উভয়েই দেখা যায়, এবং সামরিক ও অসামরিক উভয় বিভাগেই এই পদোপাধি প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের কর্মচারী মহাপ্রতীহার বোধহয়

রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমারক্ষক ঊর্ধ্বতম রাজকর্মচারী। মহাদণ্ডনায়ক বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা। মহাদৌঃসাধসাধনিক ও মহাকর্তাকৃতিকের দায় ও কর্তব্য কী তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মহাক্ষপটলিক আয়ব্যয় হিসাব-বিভাগের কর্তা। মহাসর্বাধিকৃত কী কাজ করিতেন এবং কোন্ বিভাগের কর্তা ছিলেন বলা কঠিন; তবে, সর্বাধিকারী পদবীটি এই রাজপদের স্মৃতি বহন করে। ইঁহারা সকলেই রাষ্ট্রযন্ত্রে এক-একটি প্রধান বিভাগের সর্বময় কর্তা, রাজধানীতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রে বসিয়া সেখান হইতে ইঁহারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্ম বিভাগের এবং জনপদ-বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন।

ইঁহাদের ছাড়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের আরও কয়েকজন পরিচালক থাকিতেন; তাঁহাদের উপাধি ছিল অধ্যক্ষ, এবং কাজ ছিল রাজকীয় অসামরিক বিভাগের হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই অধ্যক্ষদের দায় ও কর্তব্যের নির্দেশ কৌটিল্য-কথিত বিবৃতিরই অনুরূপ ছিল, সন্দেহ নাই। অধ্যক্ষদের মধ্যে নৌকাধ্যক্ষ বা নাবাধ্যক্ষ এবং বলাধ্যক্ষ নামীয় দুইজন রাজকর্মচারীও ছিলেন; নৌকাধ্যক্ষ রাজকীয় নৌবাহিনীর এবং বলাধ্যক্ষ রাজকীয় পদাতিক সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ।

ধর্ম- ও ধর্মানুষ্ঠান -সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহু ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছিল। ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য পাল এবং চন্দ্র রাষ্ট্রযন্ত্রে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইতেন; এবং সম্ভবত ইঁহারা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। নরপতিদের ব্যক্তিগত ও বংশগত ধর্ম যাহাই হউক না কেন, পাল- ও চন্দ্র -রাজারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত ধর্মমত দ্বারা রাষ্ট্রকে প্রভাবান্বিত হইতে দেন নাই। তাহা হইলে বংশানুক্রমিকভাবে দুই-দুইটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবার বহুকাল ধরিয়া পালরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই পোষকতা করিতেন এ সম্বন্ধে সুপ্রচুর লিপিপ্রমাণ এবং তিব্বতী গ্রন্থের সাক্ষ্য বিদ্যমান। মনে হয়, ধর্ম ও শিক্ষা ব্যাপারেও পাল রাষ্ট্রযন্ত্র সক্রিয় ছিল। চন্দ্র-রাজাদের লিপিতে শান্তিবারিক-উপাধিক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইঁহারা বোধ হয় তখনও রাজকর্মচারী হইয়া উঠেন নাই। কম্বোজরাজ জয়পালের ইর্দা পট্টোলীতেই সর্বপ্রথম ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ ও পুরোহিতের সাক্ষাৎ পাইতেছি রাজকর্মচারীরূপে।

পূর্বতন রাষ্ট্রযন্ত্রে যেমন, এই পর্বেও রাষ্ট্রের প্রধান বিভাগের নাম ভুক্তি। বাংলাদেশে পালরাষ্ট্রের তিনটি ভুক্তিবিভাগের খবর লিপিমালা হইতে জানা যায়; বৃহত্তম ভুক্তি পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি এবং তাহার পরই বর্ধমানভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি, বর্তমান বিহারে দুইটি, তীরভুক্তি (তিরহুত) এবং শ্রীনগরভুক্তি; বর্তমান আসামে একটি, প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তি। ভুক্তির শাসনকর্তার নাম উপরিক। এই উপরিক কখনো কখনো রাজস্থানীয়-উপরিক; অর্থাৎ শুধু ভুক্তির শাসনকর্তা নহেন, তিনি রাজপ্রতিনিধিও বটে। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জলিপিতে ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে ভুক্তিপতি।

ভুক্তির নিম্নতর বিভাগ মণ্ডল না বিষয়, তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা যায়, সাক্ষ্যও পরস্পরবিরোধী। লিপিসাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে, ভুক্তির নিম্নতর বিভাগ কোথাও মণ্ডল, কোথাও বিষয়। চন্দ্র-রাষ্ট্রে কিন্তু বিষয়ই বৃহত্তর বিভাগ এবং মণ্ডল বিষয়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে হইতেছে। বিষয়ের শাসনকর্তার পদোপাধি ছিল বিষয়পতি। পাল ও চন্দ্রদের কোন কোন লিপিতে বিষয়ের শাসনকর্তাকে আয়ুক্তক বলা হইয়াছে; অন্য দুই-একটি লিপিতে কিন্তু আয়ুক্তক বলিতে

ভুক্তি বা বিষয়ের উচ্চ কর্মচারী বলিয়া মনে হয়। পাল আমলের লিপিগুলিতে তদায়ুক্তক এবং বিনিয়ুক্তক পদোপাধিবিশিষ্ট দুইটি রাজকর্মচারীর খবর পাওয়া যায়। ইঁহারা বোধহয় ভুক্তি- ও বিষয় শাসন -সংপৃক্ত উচ্চ রাজকর্মচারী। মণ্ডলের শাসনকর্তার নাম খুব সম্ভব ছিল মণ্ডলাধিপতি (বা মাণ্ডলিক)।

বাংলার কোন পাল-লিপিতে কিংবা চন্দ্রদের কোন লিপিতে বীথী-বিভাগের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু বিহারে প্রাপ্ত অন্তত দুইটি লিপিতে আছে। ধর্মপালের নালন্দা-লিপির জম্বনদী-বীথী ছিল গয়া বিষয়ের অন্তর্গত। কম্বোজ-বর্মণ-সেন আমলে বাংলাদেশে বীথী-রাষ্ট্রবিভাগের সাক্ষাৎ মেলে; পাল-পূর্ব যুগেও বীথী-বিভাগের প্রমাণ বিদ্যমান; এই জন্য মনে হয়, পাল এবং চন্দ্র-রাষ্ট্রেও বীথী রাষ্ট্রবিভাগ প্রচলিত ছিল।

এইসব ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল বা বীথীর অধিকরণ ছিল কিনা, থাকিলে তাহাদের গঠনই বা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায়ই লিপিগুলিতে নাই। ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথী প্রভৃতি রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হইত, পূর্ব যুগের মতো জনসাধারণের কোন দায় ও অধিকার এ ব্যাপারে ছিল কিনা, তাহাও জানা যাইতেছে না। তবে, খালিমপুরলিপিতে একটু ইঙ্গিত যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লিপিতে জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, মহামহত্তর, মহত্তর এবং দাশগ্রামিক—ইঁহাদের বলা হইয়াছে "বিষয়ব্যবহারী"। অনুমান হয়, ইঁহারা সকলেই বিষয়ের শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দাশগ্রামিক দশটি গ্রামের কর্তা; পদাধিকারীর উল্লেখ হইতে মনে হয়, বিষয়ের অধীনে দশ-দশটি গ্রামের এক-একটি উপবিভাগ থাকিত, এবং দাশগ্রামিক ছিলেন এক-একটি উপবিভাগের শাসন-কর্মপর্যবেক্ষক।

রাষ্ট্রের নিম্নতম বিভাগ এই পর্বে গ্রাম, এবং গ্রামের স্থানীয় শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম গ্রামপতি; তিনিও অন্যতম রাজপুরুষ।

ইর্দা পট্টোলীতে প্রাদেষ্টৃ নামে এক শ্রেণীর রাজপুরুষের উল্লেখ আছে। এই রাজপুরুষটির উল্লেখ বাংলাদেশের আর কোন লিপিতেই দেখা যায় না, অথচ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে ইনি কর সংগ্রহ, শান্তিরক্ষা ইত্যাদি সংপৃক্ত শাসন-ব্যাপারে নিয়ামক উচ্চ রাজকর্মচারী। মনে হয়, কম্বোজ রাষ্ট্রেও এই পদাধিকারী উচ্চ রাজকর্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইর্দা পট্টোলীর রাষ্ট্রযন্ত্র-সংবাদ অন্যদিক হইতেও উল্লেখযোগ্য। এই লিপির রাজপুরুষদের তালিকায় দেখিতেছি, করণসহ অধ্যক্ষবর্গের উল্লেখ, সৈনিকসংঘমুখ্যসহ সেনাপতির উল্লেখ, গূঢ়পুরুষ এবং মন্ত্রপালসহ দূতের উল্লেখ। এইসব উল্লেখে স্পষ্ট বুঝা যায়, কম্বোজ-রাষ্ট্রযন্ত্রের বহু বিভাগ বিদ্যমান ছিল, এবং প্রত্যেক বিভাগের একজন করিয়া অধ্যক্ষ থাকিতেন। প্রত্যেক অধ্যক্ষের অধীনে বহু করণ (=কেরানী কর্মচারী) থাকিতেন। যুদ্ধবিগ্রহ-বিভাগ ছিল সেনাপতির অধীনে এবং তাঁহার অধীনে ছিলেন সৈনিক-সংঘের প্রধান কর্মচারীরা। পররাষ্ট্র-বিভাগের কর্তা ছিলেন দূত; এই বিভাগের বোধ হয় দুই উপবিভাগ; একটি উপবিভাগে মন্ত্রপালেরা, আর-একটিতে গূঢ়পুরুষেরা। মন্ত্র-পালেরা সাধারণভাবে পররাষ্ট্র-ব্যাপারে দূতকে মন্ত্রণাদান করিতেন; গূঢ়পুরুষেরা গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ করিতেন। এইসব বিভাগীয় বর্ণনা কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের রাষ্ট্রযন্ত্রবিভাগ বর্ণনার সঙ্গে প্রায় স্পষ্ট মিলিয়া যাইতেছে। পাললিপিতে নৌকাধ্যক্ষ ইত্যাদি অসামরিক অধ্যক্ষদের উল্লেখের কথা আগেই বলিয়াছি। চন্দ্র-

বংশীয় লিপিতেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রোক্ত 'অধ্যক্ষ-প্রচার'-অধ্যায়ের উল্লেখ দেখি-তেছি। বাংলার সমসাময়িক রাষ্ট্রবিন্যাসে কৌটিল্য-রাষ্ট্রনীতির প্রভাব অনস্বীকার্য। ইহা হইতে এই অনুমানও করা চলে, পাল ও চন্দ্র-রাষ্ট্রযন্ত্র কম্বোজ-রাষ্ট্রযন্ত্রের মতনই বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি কতকটা সুস্পষ্ট।

(ক) বিচার বিভাগ—এই বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী মহাদণ্ডনায়ক। মহা দণ্ডনায়কের পরেই দণ্ডনায়ক। দাশাপরাধিকও এই বিভাগের কর্মচারী বলিয়া মনে হইতেছে; স্মৃতিশাস্ত্র-কথিত দশ প্রকার অপরাধের বিচার ইনি করিতেন, এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে অর্থদণ্ড আদায় করিতেন।

(খ) রাজস্ব বিভাগ—আয়বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ কে ছিলেন বলা কঠিন; কোন পদোপাধিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। রাষ্ট্রের অর্থাগমের নানা উপায় ছিল। প্রধান উপায় কর। কর ছিল নানা প্রকারের; প্রধানত পাঁচ প্রকার করের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যায়—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য এবং উপরিকর। উপরিক, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, দাশগ্রামিক এবং গ্রামপতির রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে এইসব কর আদায় করা হইত। ভোগ-কর আদায়-বিভাগের যিনি সর্বময় কর্তা ছিলেন তাঁহার পদোপাধি ছিল ভোগপতি। ষষ্ঠাধিকৃত নামে একটি রাজপুরুষের উল্লেখ পাললিপিতে দেখা যায়। রাজা ছিলেন ষষ্ঠাধিকারী, অর্থাৎ প্রজার শস্যের বা শস্যলব্ধ আয়ের একষষ্ঠ অংশের প্রাপক। এই একষষ্ঠ অংশ আদায়-বিভাগের যিনি কর্তা তিনিই ষষ্ঠাধিকৃত। খেয়া-পারাপার-ঘাট হইতে আয় সংগ্রহের যিনি কর্তা তিনি তরিক। দেবপালের লিপিতে তরিক ও তরপতি দুয়েরই উল্লেখ আছে। তরপতি বা তরপতিক বোধহয় প্যরাপার-ঘাটের পর্যবেক্ষক। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংপৃক্ত শুল্ক আদায়-বিভাগের কর্তার পদোপাধি শৌল্কিক। দশ প্রকার অপরাধের বিচার ও অর্থদণ্ড আদায়-বিভাগের কর্তা হইতেছেন দাশাপরাধিক। চোর-ডাকাতের হাত হইতে প্রজাদের রক্ষার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের; সেই জন্য রাষ্ট্র প্রজাদের নিকট হইতে একটা কর আদায় করিতেন। যে বিভাগের উপর এই কর আদায়ের ভার—তাহার কর্তার পদোপাধি চৌরোদ্ধরণিক। কৌটিল্যের মতে বনজঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি; সুতরাং আয়ের এই অন্যতম উপায় যে বিভাগ হইতে সংগৃহীত হইত সেই বিভাগীয় কর্তার নাম গৌল্মিক।

(গ) আয়ব্যয়-হিসাব-বিভাগ—এই বিভাগের সর্বময় কর্তা বোধ হয় ছিলেন মহাক্ষপটলিক।

জ্যেষ্ঠকায়স্থও বোধহয় একজন উচ্চ রাজকর্মচারী। এই পর্বে পুস্তপালের উল্লেখ দেখিতেছি না। রাজকীয় দলিলপত্র বোধহয় জ্যেষ্ঠকায়স্থের তত্ত্বাবধানেই থাকিত।

(ঘ) ভূমি ও কৃষি-বিভাগ—এই বিভাগের কয়েকজন কর্মচারীর নাম লিপি-গুলিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রপ কৃষ্ট ও কৃষিযোগ্য ভূমির সর্বোচ্চ হিশাব রক্ষক ও *পর্যবেক্ষক। প্রমাতৃ ভূমির মাপজোখ, ভূমি-জরিপ ইত্যাদির বিভাগীয় কর্তা। পাল* ও সেন লিপিগুলিতে, বিশেষভাবে সেন লিপিগুলিতে, ভূমির মাপ ও সীমা নির্ধারণে, আয়োৎপত্তি নির্ধারণে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের উল্লেখ আছে, তাহাতে এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, ভূমি মাপজোখ-জরিপ সংক্রান্ত একটি সুবিস্তৃত ও সুপরিচালিত বিভাগ বর্তমান ছিল।

(ঙ) পররাষ্ট্র-বিভাগ—এই বিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্মচারী ছিলেন দূত; তাঁহার অধীনে মন্ত্রপাল ও গূঢ়পুরুষবর্গ। সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ বোধহয় ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক।

(চ) শান্তিরক্ষা-বিভাগ—এই বিভাগের অনেক রাজপুরুষের উল্লেখ লিপি-গুলিতে পাওয়া যাইতেছে। মহাপ্রতীহার সম্ভবত রাজপ্রাসাদের এবং রাজধানীর রক্ষকাবেক্ষক। দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক (দণ্ড এবং পাশ-রজ্জু), দণ্ডশক্তি,—সকলেই এই বিভাগের কর্মচারী। খোল খুব সম্ভব এই বিভাগের গুপ্তচর। কাহারো কাহারো মতে, চৌরোদ্ধরণিকও এই বিভাগের উচ্চ কর্মচারী। চট্টভট্ট বা চাটভাটরাও এই বিভাগেরই নিম্নস্তরের কর্মচারী সন্দেহ নাই।

(ছ) সৈন্য-বিভাগ—এই বিভাগের ঊর্ধ্বতম রাজপুরুষের পদোপাধি মহা-সেনাপতি, এবং তাঁহার নিচেই সেনাপতি। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চতুরঙ্গ বল ছাড়া পালরাষ্ট্রের বৃহৎ নৌ-বলও ছিল, এই পাঁচটি বলের প্রত্যেকটির একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকিতেন। পদাতিক সেনার কর্তা বলাধ্যক্ষ, নৌবলের কর্তা নৌকাধ্যক্ষ বা নাবাধ্যক্ষ। উষ্ট্রবলও ছিল, এবং তাহারও একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। সৈন্যবাহিনীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বেতনভুক্ সেনা ছিল। ইহা ছাড়া ছিলেন কোট্টপাল দুর্গাধিকারী-দুর্গরক্ষক; প্রান্তপাল রাজসীমারক্ষক; মহাব্যূহ-পতি যুদ্ধকালে ব্যূহরচনার কর্তা।

ইঁহারা ছাড়া পাল- চন্দ্র ও কম্বোজ -বংশীয় লিপিগুলিতেও আরও কয়েকজন রাজপুরুষের পদোপাধির পরিচয় পাওয়া যায়: যেমন, অভিত্বরমান, গমাগমিক, দূত প্রৈষণিক খণ্ডরক্ষ, স(শ)রভঙ্গ ইত্যাদি। অভিত্বরমান একশ্রেণীর সংবাদবাহী বা রাজকীয় দলিলপত্রবাহী দূত, এই অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। দূতপ্রৈষণিক অর্থ যিনি দূত প্রেরণ করেন, অথবা দূতের সংবাদবাহী। খণ্ডরক্ষ অর্ধমাগধী অভিধান-মতে শান্তিরক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ অথবা শুল্ক-পরীক্ষক; স(শ)রভঙ্গ বলিতে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন তীরধনুধারী সৈন্যবর্গের অধ্যক্ষ; আবার কেহ কেহ বলেন, শরভঙ্গ রাজার মৃগয়ার সঙ্গী। ইঁহারা কেহই উচ্চ রাজ-কর্মচারী নহেন।

পাল ও সমসাময়িক অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত কাঠামো হইতেই বুঝা যাইবে, এই যুগে আমলাতন্ত্র পূর্ব পূর্ব পর্ব অপেক্ষা অনেক বেশি বিস্তার ও স্ফীতি লাভ করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রযন্ত্রের স্ফীতি ও সূক্ষ্মতর বিভাগ সৃষ্টির অর্থই হইতেছে, রাষ্ট্রের বাহু সমাজের সর্বদেহে বিস্তৃত করা। পাল-পর্বে তাহারই সূচনা দেখা দিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনায় জন-সাধারণের প্রতিনিধিদের দায় ও অধিকার খর্বীকৃত হইয়াছে। গ্রাম্য স্থানীয় শাসনকার্য ছাড়া আর যে কোথাও এইসব প্রতিনিধিদের কোন প্রভাব ছিল, মনে হইতেছে না। পূর্ব পর্বে যেভাবে স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়, এ পর্বে তাহা নাই বলিলেই চলে। বস্তুত, সমাজ-বিন্যাসের বৃহৎ একটা অংশের দায়িত্ব ও অধিকার এই পর্বে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে। আমলাতন্ত্রের বাহুবিস্তৃতিই তাহার কারণ।

সাত

সেন-পর্বে সেন-বর্মণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্রে পাল-পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রের আদর্শই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল; রাষ্ট্রবিন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতিও মোটামুটি একই প্রকার। তবে, এই পর্বে আমলাতন্ত্র আরও বিস্তৃত হইয়াছে। রাজা ও রাজ-পরিবারের মর্যাদা, মহিমা ও আড়ম্বর আরও বাড়িয়াছে; রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশে ব্রাহ্মণ-ও পুরোহিত -তন্ত্র জাঁকাইয়া বসিয়াছে, রাষ্ট্রযন্ত্রবিভাগ বৃহত্তর গ্রামগুলিকেও বিভক্ত করিয়া একেবারে পাটক বা পাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের সুদীর্ঘ বাহু জনপদের ও জনসাধারণের শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে; ছোট-বড় রাজপদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, নূতন নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে, বড় পদগুলির মহিমা ও মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ, সেন বা বর্মণ বা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজ্যপরিধি পাল ও চন্দ্রবংশের রাজ্যপরিধি অপেক্ষা সংকীর্ণতর।

সেন-রাজারা পাল-রাজাদের রাজোপাধিগুলি তো ব্যবহার করিতেনই, উপরন্তু নামের সঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ বিরুদও ব্যবহার করিতেন। বিজয়সেন, বল্লাল-সেন, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের বিরুদ যথাক্রমে ছিল অরিবৃষভ-শঙ্কর, অরিরাজ নিঃশঙ্ক-শঙ্কর, অরিরাজ মদন-শঙ্কর, অরিরাজ বৃষভাঙ্ক-শঙ্কর, এবং অরিরাজ অসহ্য-শঙ্কর। তাহার উপর, একেবারে শেষ অধ্যায়ের রাজারা আবার এইসব বিরুদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি প্রভৃতি উপাধিও ব্যবহার করিতেন। সেন ও বর্মণ বংশের ঈশ্বরঘোষ ও ডোম্মনপালের লিপিগুলিতে রাজ্ঞী ও মহিষীর উল্লেখও পাইতেছি—ভূমিদানক্রিয়া তাঁহাদেরও বিজ্ঞাপিত হইতেছে। পালবংশের একটি লিপিতেও কিন্তু রাজপুরুষ হিসাবে রাজ্ঞী বা মহিষীর উল্লেখ নাই; চন্দ্র ও কম্বোজ বংশের লিপিতেই ইঁহাদের প্রথম উল্লেখ দেখা গিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ হইতেন, এবং সেই হিসাবে রাষ্ট্রকর্মে, সামরিক ব্যাপারে রাজার সহায়কও ছিলেন। শিরোরক্ষিক বোধহয় রাজার দেহরক্ষক; অন্ত-প্রতীহার প্রাসাদের অন্দর-মহলের রক্ষকাবেক্ষক। ইহাদের ছাড়া অন্তরঙ্গ ঔপধিক রাজবৈদ্যের সাক্ষাৎও পাইতেছি।

এই পর্বেও সামন্তরা অত্যন্ত প্রবল এবং সংখ্যায়ও প্রচুর; এক রাণক শূলপাণি বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি খোদিত করিয়াছিলেন; শূলপাণি ছিলেন "বারেন্দ্রক-শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি"। ত্রিপুরার রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের বংশ, চট্টগ্রাম ও ঢাকার দেববংশ, ঈশ্বরঘোষ, ডোম্মনপাল, মুঙ্গেরের গুপ্ত-উপান্ত-নামা এক রাজ-বংশ—ইঁহারা সকলেই তো সামন্ত-মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক বংশ ছিলেন, পরে কেহ কেহ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। ঢেক্করীর ঈশ্বর-ঘোষ যে মহামাণ্ডলিক ছিলেন তাহা রামগঞ্জলিপিতেই সপ্রমাণ। ঢেক্করীর এক মণ্ডলাধিপতি রামপালের সামন্তরূপে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন। রামগঞ্জলিপি পাঠে স্পষ্টতই মনে হয়, এইসব সামন্তরা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ জনপদে স্বাধীন রাজার মতোই আচরণ করিতেন।

মন্ত্রিবর্গের মধ্যে প্রধান মহামন্ত্রীর সাক্ষাৎ এই পর্বেও পাইতেছি। ভট্ট ভবদেবের পিতামহ আদিদেব এক (চন্দ্রবংশীয়?) বঙ্গ-রাজের মহামন্ত্রী, মহামাত্র এবং সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। ভট্ট ভবদেব স্বয়ং বর্মণরাজ হরিবর্মাদেবের মন্ত্রশক্তিসচিব ছিলেন।

মহামন্ত্রী নামে কোন পদের উল্লেখ সেনলিপিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু কোন কোন লিপিতে, মহামহত্তক, বা মহামত্তক নামীয় একজন রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি। সেনবংশের ভূমিদানলিপিগুলি সাধারণত মহাসান্ধিবিগ্রহিক দ্বারা অনুমোদিত হইত, এবং সান্ধিবিগ্রহিকেরা সাধারণত লিপিগুলির দূতের কাজ করিতেন। মহামহত্তক মনে হইতেছে সেন- রাষ্ট্রের ও -রাজার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রীও ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মহাসান্ধিবিগ্রহিকই প্রধান। মহাসান্ধিবিগ্রাহিকেরাই অধিকাংশ সেন-ভূমিদানলিপির দূত। বস্তুত, এই পর্বে মহাসান্ধিবিগ্রহিক এবং তাহার সহকারী সান্ধিবিগ্রাহিকেরাই সেন কেন্দ্রীয়রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কর্মচারী এবং রাজার প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে হইতেছে। নানা রাষ্ট্রকর্মে নিযুক্ত অন্যান্য প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে বৃহদুপরিক, মহাভৌগিক বা মহাভোগপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসেনাপতি, মহাগণস্থ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাসর্বাধিকৃত, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত ইত্যাদি রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি। ইঁহারা যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের এক-এক বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। পাল-পর্বে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের যেসব অধ্যক্ষের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, এই পর্বে তাঁহারা বিদ্যমান।

কম্বোজ- বর্মণ -সেন রাষ্ট্রযন্ত্রে পুরোহিততন্ত্রের প্রতিপত্তি লক্ষণীয়। পুরোহিত, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত, রাজপণ্ডিত, ইঁহারা সকলেই রাজপুরুষ। এই যুগের লিপিগুলিতে শান্তিবারিক, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত প্রভৃতি পুরোহিতের ছড়াছড়ি; ইঁহারা রাজপুরুষ ছিলেন নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে, রামগঞ্জলিপির ঠক্কুর রাজপুরুষ এবং ঠক্কুর হইতেই যে বর্তমান পদোপাধি ঠাকুর উদ্ভূত, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই।

পালপর্বের মত এ পর্বেও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান জনপদবিভাগগুলির দেখা মিলিতেছে; ভুক্তিপতির (উপরিকের) শাসনাধীনে ভুক্তি, মণ্ডলপতির শাসনাধীনে মণ্ডল, বিষয়পতির শাসনাধীনে বিষয়। কিন্তু বিষয় বা মণ্ডলের নিচের গ্রামসংক্রান্ত স্থানীয় বিভাগ-উপবিভাগের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ একাধিক নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পর্বের লিপিগুলিতে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি, বর্ধমান-ভুক্তি এবং কঙ্কগ্রাম-ভুক্তির খবর পাওয়া যাইতেছে। সেন-রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির সীমা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, উত্তর- ও দক্ষিণ -বঙ্গের প্রায় সমগ্র জনপদ এবং পূর্ববঙ্গের বৃহৎ একটি অংশ এই ভুক্তি-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। পাল-পর্বের বর্ধমান-ভুক্তি, লক্ষ্মণসেনের সময় খর্বীকৃত হইয়া দুইটি ভুক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল: উত্তরে কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি, দক্ষিণে বর্ধমান-ভুক্তি। দণ্ড-ভুক্তির কোন উল্লেখ এই পর্বে নাই। ভুক্তিপতি বা উপরিকদের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন; তাঁহার পদোপাধি বৃহদুপরিক, এবং তিনি সম্ভবত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ভুক্তির অব্যবহিত নিম্নতর বিভাগ, মণ্ডল না বিষয়—এ সম্বন্ধে এই পর্বেও নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। কোথাও দেখিতেছে ভুক্তির অব্যবহিত নিম্নবর্তী বিভাগ মণ্ডল, কোথাও দেখিতেছি বিষয়, আবার কোথাও কোথাও দেখিতেছি একেবারে বীথী। বর্ধমান-ভুক্তিতে ভুক্তির পরেই মণ্ডল, মণ্ডলের পর বীথী। কঙ্কগ্রাম-ভুক্তিতে ভুক্তির পরই বীথী।। বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত; কিন্তু বঙ্গ বিষয় না মণ্ডল, কিছুই বোঝা যাইতেছে না; মনে হয়, ইহাদের উভয়াপেক্ষা বৃহত্তর বিভাগ, কিন্তু এ বিভাগ রাষ্ট্রীয় বিভাগ নয়, ভৌগোলিক বিভাগ মাত্র। বঙ্গের দুই ভাগ;

বিক্রমপুর-ভাগ ও নাব্য-(ভাগ?)। অন্যত্র, বিষয় যেন মণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হইতেছে, যেমন, পরণায়ি-বিষয় সমতট-মণ্ডলভুক্ত। লক্ষণীয় এই যে, বিষয়-বিভাগ সেনরাষ্ট্রে বিশেষ দেখা যাইতেছে না।

অন্তত একটি ক্ষেত্রে মণ্ডলের পরবর্তী বিভাগ দেখিতেছি খণ্ডল; অন্যত্র মণ্ডলের পরেই বীথী, আর এক ক্ষেত্রে মণ্ডলের পরেই পাইতেছি চতুরক, অন্যত্র, চতুরক হইতেছে আবৃত্তির নিম্নতর বিভাগ, কিন্তু, আবৃত্তি কাহার বিভাগ, সঠিক জানা যাইতেছে না। তবে মণ্ডলের উপবিভাগ হওয়া অসম্ভব নয়। পাটক বর্তমান কালের পাড়া: চতুরক বর্তমানের চৌকি, চক; বোধহয় চতুরক গোড়ায় ছিল চারিটি গ্রামের সমষ্টি।

এইসব রাষ্ট্রীয় বিভাগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন তথ্যই লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না; স্থানীয় অধিকরণের উল্লেখও নাই। পাল-পর্বে গ্রামের শাসন-ব্যবস্থার নিয়ামক গ্রামপতির (গ্রামিকের) সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল; এ পর্বে তাঁহারও দেখা পাওয়া যাইতেছে না। এক কথায়, স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগা-যোগ একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অথচ, অন্যদিকে রাষ্ট্রের বাহু পাটক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া জনপদগুলিকে মণ্ডল, চতুরক, আবৃত্তি, গ্রাম, পাটক প্রভৃতিতেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

পাল-পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রবিভাগের সব কয়টি বিভাগ এই পর্বেও বিদ্যমান। বিচার-বিভাগে একটি নূতন পদোপাধির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে: এই উপাধিটি মহা-ধর্মাধ্যক্ষ। অঙ্গকরণিক নামেও এক রাজপুরুষের দেখা পাইতেছি। বিচারকার্য ব্যাপারে যিনি শপথ বা অঙ্গীকার করাইতেন তিনিই বোধহয় অঙ্গকরণিক। রাজস্ব-বিভাগে নূতন যে রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি তাঁহার পদোপাধি মহা-ভোগিক; ইনি ভোগ-কর আদায় বিভাগের সর্বময় কর্তা। ষষ্ঠাধিকৃত উপাধিক রাজপুরুষের উল্লেখ এই পর্বে নাই। তরিক-তরপতির উল্লেখও এই পর্বে নাই। তবে, হট্টপতি-উপাধিক এক রাজপুরুষের উল্লেখ রামগঞ্জলিপিতে আছে; ইনি হাট-বাজারের কর্তা সন্দেহ নাই, এবং সেই হিসাবে রাজস্ব-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকা অসম্ভব নয়।

ঠিক রাজস্ব-বিভাগ-সংপৃক্ত নয়, তবে হট্টপতির মতনই আর-একজন রাজ-পুরুষের দেখা পাইতেছি রামগঞ্জলিপিতে—তিনি পানীয়াগারিক। বোধহয় রাজকীয় বিশ্রামগৃহ, ভোজনশালা, পানীয়াগার প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা ছিল ইঁহার কাজ। ভোজবর্মার বেলাবলিপিতে পীঠিকাবিত্ত নামে আর একজন রাজকর্মচারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে; ইনিও বোধহয় রাজকীয় সভা-সমিতি-দরবারের আসন-সজ্জার ব্যবস্থা করিতেন।

আয়ব্যয়হিসাব-বিভাগে মহাক্ষপটলিক এই পর্বেও বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠকায়স্থের উল্লেখ এই পর্বে নাই; কিন্তু রামগঞ্জলিপিতে মহাকায়স্থের উল্লেখ আছে। এই লিপি-উল্লিখিত মহাকরণাধ্যক্ষ এবং লেখক, এবং বহু-সেনলিপি-কথিত করণ একান্ত-ভাবে আয়-ব্যয় হিসাব-বিভাগের কর্মচারী হয়তো নহেন।

পূর্ব-পর্বের ভূমি- ও কৃষি -বিভাগের ক্ষেত্রপ বা প্রমাতৃ কাহারো সাক্ষাৎ এ পর্বে পাইতেছি না।

অন্তঃরাষ্ট্র বিভাগের প্রধান ছিলেন মহামন্ত্রী বা মহামহত্তক। তাঁহাদের সহায়ক সচিব ও মন্ত্রী তো অনেকেই ছিলেন। পররাষ্ট্র-বিভাগের প্রধান ছিলেন মহাসান্ধি-

বিগ্রহিক; তাঁহার সহায়ক সান্ধিবিগ্রহিক। দূতও এই বিভাগের অস্থায়ী উচ্চ রাজপুরুষ; সান্ধিবিগ্রহিকেরাই সাধারণত দূতের কাজ করিতেন। মন্ত্রপাল বা গূঢ়-পুরুষবর্গের উল্লেখ এই পর্বে দেখিতেছি না।

শান্তিরক্ষা-বিভাগ এই পর্বেও খুব সক্রিয়। পূর্ব পর্বের মহাপ্রতীহার, চৌরোদ্ধরণিক, দণ্ডপাশিক, চাটভাট প্রভৃতি এই পর্বেও আছেন। অধিকন্তু, রামগঞ্জলিপিতে পাইতেছি দাণ্ডপাশিক-ঔপধিক এক রাজপুরুষের উল্লেখ; এই লিপিতেই শিরোরক্ষক এবং খড়্গগ্রাহ উভয়ই বোধহয় একশ্রেণীর দেহরক্ষক, এবং সেই হিসাবে উভয়েই শান্তিরক্ষা-বিভাগের কর্মচারী।

সৈন্য-বিভাগে মহাসেনাপতি এই পর্বেও সর্বময় কর্তা। কোট্টপালও আছেন; মহাব্যূহপতি, নৌবলাধ্যক্ষ, হস্তী-অশ্ব-গো-মহিষ-অজাবিকাধ্যক্ষরাও আছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় এই যে, এই পর্বে এই বিভাগে অনেক নূতন নূতন পদোপাধির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে; যেমন, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক এবং বূহধানুষ্ক। মহাপীলুপতি হস্তীসৈন্য-চালনাশিক্ষক, হস্তীসৈন্যের অধ্যক্ষ। মহাগণস্থও সামরিক কর্মচারী; ২৭ রথ, ২৭ হস্তী, ৮১ ঘোড়া এবং ১৩৫টি পদাতিক সৈন্য লইয়া এক-এক গণ। এই সৈন্য-গণের যিনি সর্বময় কর্তা তিনি মহাগণস্থ। মহাবলাধিকরণিক খুব সম্ভব সৈন্যসংক্রান্ত অধিকরণের প্রধান কর্তা। মহাবলাকোষ্ঠিক এবং বূহধানুষ্কের দায় ও কর্তব্য কি বুঝা যাইতেছে না। প্রান্তপালের উল্লেখ এই পর্বে নাই; দূতপ্রৈষণিক এবং খোল বিদ্যমান।

পাল- ও সেন -রাজাদের নৌবলের কথা নানাপ্রসঙ্গে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। নদীমাতৃক সমুদ্রাশ্রয়ী বাঙালীর রাষ্ট্র নৌবলনির্ভর হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। নৌবাট, নৌবিতান, নৌদণ্ডক ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ লিপিগুলিতে বারবার দেখা যায়।

সমসাময়িক লিপিতে আরও কয়েকটি রাজপদোপাধির সাক্ষাৎ মিলিতেছে। দোঃসাধনিক—দোঃসাধ্যসাধনিক—মহাদুঃসাধিক ইঁহাদের একজন। ইঁহার দায় ও কর্তব্যের স্বরূপ ঠিক বুঝা যাইতেছে না, তবে কাজটা খুব কঠিন দুঃসাধ্য রকমের ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। মহামুদ্রাধিকৃত আর একজন। রাজকীয় মুদ্রা শীলমোহর ইঁহার কাছে থাকিত। মহাসর্বাধিকৃতের কর্তব্যের স্বরূপ বুঝা যাইতেছে না। তদানিয়ুক্তক-ঔপধিক রাজপুরুষটির সঙ্গে পাল-পর্বের তদায়ুক্তক-বিনিয়ুক্তক রাজ-পুরুষদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, এমন অনুমান করা যাইতে পারে। খণ্ডপাল ও পাল-পর্বের খণ্ডরক্ষ একই ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। মোটামুটি ইহাই সেন-পর্বের রাষ্ট্রবিন্যাসের পরিচয়।

আট

অতঃপর বিভিন্ন পর্বে রাষ্ট্রবিন্যাস সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই-চারিটি উক্তি হয়তো অবান্তর হইবে না।

দৃশ্যত, মহারাজ-মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও অধিকারের কোন সীমা ছিল না; তিনি শুধু দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় প্রভু নহেন, শুধু শাসন, সমর ও বিচার-ব্যাপারের কর্তা

নহেন, সর্বপ্রকার দায় ও অধিকারের উৎসই তিনি। রাষ্ট্রবিন্যাসগত ব্যাপারে মতবাদের দিক হইতে এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি কেহ তোলে নাই। কিন্তু কার্যত রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সংস্কারের উপর কিছু কিছু বাধা-বন্ধন ছিলই, একেবারে পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী হইবার উপায় তাঁহার ছিল না। প্রথম বাধা-বন্ধন—মহামন্ত্রী এবং অপরাপর প্রধান মন্ত্রিবর্গ। ইঁহাদের উপদেশ সর্বত্র সকল সময় না হউক, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানিতেই হইত। অন্যান্য মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারাও রাজা এবং রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির অন্যায় আচরণের কতকটা বাধাস্বরূপ ছিলেন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় মহীপাল মন্ত্রীদের শুভ পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া সামন্ত-চক্রের বিরোধিতা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ ও বরেন্দ্রী উভয়ই হারাইয়াছিলেন।

আর-এক বাধা-বন্ধনের কারণ ছিলেন সামন্ত-মহাসামন্তরা। গুপ্ত-আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাংলার, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের, রাষ্ট্র- ও সমাজ -বিন্যাস একান্তই সামন্ততান্ত্রিক, এবং সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রই একদিকে সমাজের শক্তি, এবং অন্যদিকে দুর্বলতা। এইসব মিত্র ও সামন্ত-মহারাজদের একেবারে অবজ্ঞা করিয়া চলা কোন মহারাজের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। রামপাল যখন কৈবর্ত ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের কবল হইতে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের আয়োজন করিতেছিলেন তখন সাহায্য ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে সামন্তদের দুয়ারে দুয়ারে প্রায় করজোড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে—তথা ভারতবর্ষে—কোন রাজাই দেখিতেছি না যিনি রাষ্ট্রব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িতে বা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রাষ্ট্রদেহ, সমাজদেহ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুরই ধারক, পোষক ও বর্ধক ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের স্রষ্টা ছিলেন না। বরং তাঁহাকে চিরাচরিত সংস্কার, শাস্ত্রনির্দেশ, ধর্মনির্দেশ মানিয়া চলিতেই হইত।

শাসন-ব্যবস্থা যে মোটামুটি খুব বিস্তৃত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিচালিত ছিল এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রাচীন সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। তবে, এ কথা মনে করিবার প্রয়োজন নাই যে, সমস্ত রাজপুরুষরাই কর্তব্য- ও নীতি -পরায়ণ ছিলেন। বিষয়পতিরা যে মাঝে মাঝে লোভী হইয়া অত্যাচারী হইতেন, প্রজাসাধারণকে উৎপীড়ন করিতেন তাহার একটু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাইতেছি সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একটি শ্লোকে। পল্লী-বাসী কৃষিজীবী গৃহস্থের সুখ ও শান্তি লাভের চারিটি উপায়ের মধ্যে একটি উপায় বিষয়পতির (সাধারণভাবে, স্থানীয় শাসনকর্তার) লোভহীনতা।

অন্যান্য রাজপুরুষেরাও জনপদবাসীদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করিতেন। এইসব নানাজাতীয় পীড়ার উল্লেখ প্রতিবাসী কামরূপের সমসাময়িক লিপিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। চাটভাট প্রভৃতি "উপদ্রবকারীদের" সংখ্যাও কম ছিল না। রাষ্ট্রকে দেয় কর-উপকরও কম ছিল না; সম্পন্ন ও বিত্তবান্ গৃহস্থদের পক্ষে এইসব কর-উপকর দেওয়া ক্লেশকর ছিল না, এরূপ অনুমান করা যায়; কিন্তু সমাজের অর্থ-নৈতিক নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে করভার একটু বেশিই ছিল বই কি? বিভিন্ন প্রকারের করের তালিকা হইতে তো তাহাই মনে হয়। তাহা ছাড়া, রাজপুরুষেরা নানা প্রকারের পুরস্কার-উপহার গ্রহণ করিতেন—অর্থে, ফলে, শস্যে এবং অন্যান্য দ্রব্যে।

পাল ও সেন আমলের ভূমি- ও কৃষি -নির্ভর রাষ্ট্র ও সমাজের ভূমিবান্ মহত্তর, কুটুম্ব, সাধারণ গৃহস্থদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু, বৃহৎ ভূমিহীন গৃহস্থ এবং সমাজ-শ্রমিক গোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা যে স্বচ্ছল ছিল

এমন মনে হয় না। দারিদ্র্যের নিষ্করুণ বর্ণনা পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত তিনটি শ্লোকে। তিনটিই বাঙালী কবির রচনা; প্রথম শ্লোকটিতে কবি আক্ষেপ করিতেছেন:

> শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মতো শীর্ণ, বান্ধবেরা প্রীতিহীন, পুরাতন জীর্ণ জলপাত্রে স্বল্পমাত্র জল ধরে—এ সকলও আমায় তেমন কষ্ট দেয় নাই, যেমন দিয়াছিল, যখন দেখিয়াছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হাসিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিবার জন্য কুপিত প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে সূচ চাহিতেছেন।

দ্বিতীয় কবিতায় দারিদ্র্যের চিত্র আরও নির্মম, আরও নিষ্করুণ:

> বৈরাগ্যে (অথবা অন্নহীনতায়?) তাহার সমুন্নত দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণবস্ত্র; ক্ষুধায় শিশুদের চক্ষু কুক্ষিগত হইয়া এবং উদর বসিয়া গিয়াছে; তাহারা আকুল হইয়া খাদ্য চাহিতেছে। দীনা দুঃস্থা গৃহিণী চোখের জলে মুখ ভাসাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এক মান তণ্ডুলে যেন তাঁহাদের একশত দিন চলিতে পারে।

তৃতীয় কবিতাটি নিম্নরূপ:

> কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেওয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

লোকের এই দারিদ্র্য, এই দুঃখদৈন্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র যথেষ্ট সচেতন ছিল বলিয়া মনে হয় না। অথবা শ্রেণীবিন্যস্ত, ব্যক্তিগত-অধিকারনির্ভর, সামন্ততন্ত্র- ও আমলাতন্ত্র-ভারগ্রস্ত, একান্ত ভূমি- ও কৃষি-নির্ভর সমাজের ইহাই হয়তো সামাজিক প্রকৃতি!

দশম অধ্যায়

রাজবৃত্ত

এক

রাজবৃত্ত বর্ণন ইতিহাসের এক অপরিহার্য অধ্যায়। এক সময় এই বর্ণনাই সমস্ত ইতিহাস জুড়িয়া বিরাজ করিত। কিন্তু ইতিহাসের যে যুক্তি বাঙালীর ইতিহাসের মূলে, সেই যুক্তিতে রাজবৃত্ত বর্ণনা অপরিহার্য না হইলেও গৌণ।

বহু বৎসরের বহু পণ্ডিত ও গবেষকের শ্রমসাধনার ফলে প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত বর্ণনার কাজ আজ সহজ হইয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া, রাজবৃত্তের মোটামুটি পরিচয় বহু আলোচনার পর আজ আর বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। সেইহেতু খুব সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে রাজবৃত্ত কাহিনীর সার সংকলন করিবার চেষ্টা করা হইবে মাত্র।

প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত বর্ণন এ পর্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সমস্তই রাজা এবং রাজবংশের ব্যক্তিক দিক হইতেই হইয়াছে. বৃহত্তর সমাজের দিক হইতে নয়—বস্তুত রাজা এবং রাজবংশকে বৃহত্তর সমাজের সংগে যুক্ত করিয়া পরস্পর প্রভাব ও যোগাযোগ আলোচনা আমাদের ইতিহাসে এখনও কতকটা অবজ্ঞাত। রাষ্ট্র, রাজা বা রাজবংশের অভ্যুদয়, প্রসার বা বিলয় সমস্তই ঘটে অন্তর্নিহিত সামাজিক কারণে; এক কথায় সামাজিক আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা রাজবৃত্তকে গতি দেয়, অর্থদান করে। প্রাচীন বাংলার এই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক সর্বত্র সকল সময় সুস্পষ্ট নয়; যথেষ্ট তথ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। সেইসব ক্ষেত্রে রাজবৃত্তকাহিনী বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ব্যক্তিক কীর্তিকলাপের বিবরণ ছাড়া এখনও আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ে রাজবৃত্তকথা বলিতে গিয়া আমি কিন্তু এই বৃহত্তর সামাজিক আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক ব্যাখ্যা করিতে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছি। আমার ধারণা, রাজবৃত্তকথা এই উপায়েই অর্থব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইতে পারে, এবং রাজা, রাষ্ট্র ও রাজবংশের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন বিবৃতি হইতে মুক্তি পাইতে পারে। আমার একমাত্র চেষ্টা রাজা, রাষ্ট্র এবং রাজবংশের বিবরণগুলিকে কার্যকারণসম্বন্ধের অবিচ্ছিন্ন একটি প্রবাহে গাঁথিয়া তোলা—সমাজতত্ত্ব- এবং ইতিহাস -সম্মত ব্যাখ্যার সাহায্যে। সেইহেতু রাজবৃত্তের সকল পর্বেই আমার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সামাজিক ইঙ্গিতটি ব্যক্ত করা।

দুই

প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতম অধ্যায় অস্পষ্ট পুরাণকথায় সমাচ্ছন্ন। ইতিহাসের সেই প্রদোষ-ঊষায় কয়েকটি প্রাচীন কোমের নাম ও কিছু কিছু কীর্তিকলাপের বিবরণ মাত্র পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু, যেসব গ্রন্থে এইসব উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহার

একটিও এই জনদের পক্ষ হইতে রচিত নয়, প্রত্যেকটিরই উৎস অন্যতর জন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ইঁহাদের প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞা তাঁহাদের সকল উক্তি ও বিবরণীতে।

ঋগ্বেদে প্রাচীন বাংলার একটি কোমেরও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্ব-ভারতের অনেকগুলি 'দস্যু' কোমের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে পুণ্ড্র-কোম একটি। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও বগধ (মগধ?) জনদের ভাষা পাখির ভাষার সঙ্গে তুলিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন; এই দুই কোমের লোকদের তাঁহারা মনে করিতেন অনাচারী বা আচারবিরহিত। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আচারঙ্গ-সূত্রের উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে, পথহীন রাঢ়দেশ তখনও পর্যন্ত (আনুমানিক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) এক রূঢ় বর্বর কোম দ্বারা অধ্যুষিত এবং বজ্জভূমির (উত্তর-রাঢ়ের?) ভোজ্য প্রাচীন বিহারবাসী এইসব যতিদের কাছে অরুচিকর। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে সমুদ্রতীরবাসী বাংলার লোকদের বলা হইয়াছে 'ম্লেচ্ছ'; ভাগবত পুরাণে সুহ্মদের বলা হইয়াছে 'পাপ' কোম। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গ এবং পুণ্ড্র জন এবং জনপদগুলিকে একেবারে আর্য সংস্কার- ও সংস্কৃতি -বহির্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইসব জনপদে যাঁহারা প্রবাস যাপন করিতে যাইতেন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল জনপদের লোকেদের ভাষাকে বলা হইয়াছে 'অসুর' ভাষা। ঐতিহাসিক কালে (খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের আগে) প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে অসুরান্ত-উপাধিক রাজাদের নাম পাওয়া যাইতেছে। এইসব বিচিত্র উল্লেখ হইতে স্পষ্টতই বুঝা যায়, এইসব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। জনতত্ত্বের দিক হইতেও যে এইসব লোকেরা অন্যতর জনের লোক ছিলেন, তাহার ইঙ্গিত আমরা আগেই পাইয়াছি। এই অন্যতর জন, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষার লোকেদের সেইজনাই বিজেতৃজাতিসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় বলা হইয়াছে দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর ইত্যাদি।

কিন্তু এই দর্পিত উন্নাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আর্যভাষাভাষী আর্য সংস্কৃতির বাহকেরা ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছেন প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মের তাড়নায়, উর্বর শস্যক্ষেত্রের সন্ধানে, এবং আদিমতর কোমবৃন্দের উপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায়। এই বিস্তৃতির মূলে ছিল আর্যসংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের উন্নততর কৃষিব্যবস্থা, উন্নততর যন্ত্রাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র। তাহা ছাড়া মননশক্তি ও অভিজ্ঞতাতেও বোধ হয় ইঁহারা উন্নততর স্তরের লোক ছিলেন। গোড়ার দিকে এইসব বিভিন্ন জন, ভাষা ও সংস্কৃতির পরস্পর পরিচয় বিরোধের মধ্য দিয়াই হইয়াছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মূতিব কোমের লোকেরা ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি পুত্রের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; তাঁহারা যে আর্যভূমির প্রত্যন্ত দেশে বাস করিতেন তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঠিক এই ধরনের একটি গল্প আছে মহাভারতে এবং বায়ু-, মৎস্য- ইত্যাদি পুরাণে। এই গল্পে অসুর বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বর্ণিত আছে; এই পাঁচ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম; ইহাদের নাম হইতেই পাঁচ-পাঁচটি জনপদের নামের উদ্ভব। রামায়ণে

দেখিতেছি, বঙ্গদেশের লোকেরা অযোধ্যাধিপের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, এবং বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী এবং কোশল কোমবর্গ অযোধ্যা-রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রঘু কর্তৃক সুহ্ম- এবং বঙ্গ -বিজয়ের প্রতিধ্বনি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যেও আছে। মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও প্রাচীন বাংলার অনেকগুলি কোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব কোমদের মধ্যে পুণ্ড্র ও বঙ্গ কোমই সবচেয়ে পরাক্রান্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের কীর্তিকলাপ নগণ্য নয়; জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁহার মৈত্রীবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডব-ভ্রাতাদের পক্ষে শঙ্কা ও চিন্তার কারণ হইয়াছিল। এক বঙ্গরাজ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরবপক্ষে দুর্যোধনের সহায়ক হইয়াছিলেন।

সদ্যোক্ত পুরাণকথাগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ করা যাইতে পারে। কোম-গুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে আখ্যান বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এইসব আখ্যান এক সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। সে কালে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকরা পূর্ব-প্রত্যন্ত এইসব দেশগুলিতে কেবল প্রথম পদক্ষেপ করিতেছেন মাত্র। কোন বিজয় অভিযান নয়; আসিতেছেন দুঃসাহসী প্রথম পথিকৃতের মতো, যেমন বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি সন্তান। তাহার পরই আসিতেছেন প্রচারকের দল---একটি-দুটি করিয়া, যেমন বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমস। এইসব দুঃসাহসী পথিকৃৎ ও প্রচারক যখন দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর, কোমদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন পরস্পর সংযোগ ঘটিতে দেরি হইল না, প্রাকৃতিক নিয়মেই সকল বাধা ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম সক্রিয় হইল বিরোধের মধ্য দিয়াই। কর্ণ, ভীম ও কৃষ্ণের যুদ্ধকাহিনী, পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কর্তৃক জরাসন্ধের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন, বঙ্গরাজ ও দুর্যোধনের মৈত্রীবন্ধন, আচারঙ্গসূত্রের গল্পে সেই বিরোধের স্মৃতি সুস্পষ্ট। এইসব কোমের লোকেরা সহজে বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিরোধে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকদের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে রাজি হন নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সমাজ-প্রকৃতির নিয়মই জয়ী হইল; উন্নততর উৎপাদনব্যবস্থা, উন্নততর অস্ত্র- ও শস্ত্র -বিদ্যা এবং উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি জয়ী হইল।

প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর এইসব পূর্বদেশীয় কোমগুলি ক্রমশ আর্য সমাজব্যবস্থার এক প্রান্তে স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একদিকে সংঘাত ও বিরোধ এবং অন্যদিকে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চলিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে; সংস্কৃতির পরাভব ঘটিয়াছে অনেক পর। বস্তুত, এইসব কোমের ধর্ম- ও আচরণ -গত, ধ্যান- ও বিশ্বাস -গত পরাভব আজও সম্পূর্ণ হয় নাই। যাহাই হউক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেও দেখিতেছি, রাঢ়দেশে আর্য জৈনধর্মপ্রচারকেরা বাধা ও বিরোধের সম্মুখীন হইতেছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতিলাভও ঘটিতেছে। রামায়ণকাব্যে দেখিয়াছি, প্রাচীন বঙ্গের রাজকন্যারা অযোধ্যার রাজ-বংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। মানবধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইতেছে পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন বাংলা-দেশের অন্তত কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্গত, এই যেন ইঙ্গিত। কিন্তু মনুই আবার পুণ্ড্রকোমের লোকদের বলিতেছেন ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয়। মহাভারতের

সভাপর্বে কিন্তু বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; জৈন প্রজ্ঞাপনাগ্রন্থেও বঙ্গ এবং রাঢ় কোম দুটিকে আর্য কোম বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেখিতেছি প্রাচীন বাংলার কোন কোন স্থান তীর্থ বলিয়াও স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে। অর্থাৎ বাংলা এবং বাঙালীর আর্যীকরণ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এইসব পুরাণকথার ইঙ্গিত।

প্রাচীন সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংশ- ও মহাবংশ -কথিত সিংহবাহু ও তৎপুত্র বিজয়সিংহের লঙ্কাবিক্রমকাহিনী সুবিদিত। সিংহলী ঐতিহ্যের মতে বিজয়সিংহের লংকাগমনের তারিখ এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের তারিখ (অর্থাৎ ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্ব) একই। মোটামুটি ষষ্ঠ-পঞ্চম খৃষ্টপূর্ব শতকে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাম্রলিপ্ত-তাম্রপর্ণী বা সিংহল-ভরুকচ্ছ-সুপ্পারকের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ একেবারেই অপ্রতুল নয়। সমুদ্রবণিজ-জাতক, শংখ-জাতক, মহাজনক-জাতক ইত্যাদি গল্পে তাম্রলিপ্তি-সিংহলের বাণিজ্যের কথা বহুবার উল্লিখিত আছে। এসব গল্পে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের বাণিজ্যিক চিত্র প্রতিফলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

সদ্যোক্ত জাতকের গল্প ও পালি মহানিদ্দেশ-গ্রন্থের ইঙ্গিত, মহাভারতে বঙ্গ ও পুণ্ড্র রাজগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট হস্তী, মুক্তা এবং মূল্যবান বস্ত্রাভরণ উপঢৌকন আনয়ন, সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক সুবর্ণ উপহার দান, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাংলাদেশজাত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের বর্ণনা, মিলিন্দ-পঞহ-গ্রন্থে বাংলার সমৃদ্ধ স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণ, পেরিপ্লাস-গ্রন্থে, স্ট্রাবো ও প্লিনির বিবরণীতে বাংলার বিচিত্র মূল্যবান বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভারের বিবরণ প্রভৃতি পড়িলে মনে হয়, খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশ কতকগুলি কৃষি- ও শিল্প -জাত দ্রব্যে এবং খনিজদ্রব্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল; এইসব সমৃদ্ধির লোভেই হয়তো উত্তর-ভারতের ক্ষমতাবান রাজা ও রাজবংশ পূর্ব-ভারতের এই জনপদগুলির দিকে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আশ্রয় করিয়া আর্য সমাজ ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করে।

অঙ্গ (উত্তর-বিহার)-পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ-কলিঙ্গ কোমের লোকেরা, অন্ধ্র-পুণ্ড্র-শবর-পুলিন্দ-মূতিব জনেরা যে সুপ্রাচীন বাংলায় মোটামুটি একই নরগোষ্ঠীর লোক ছিলেন, এ তথ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষি এবং মহাভারতকারের অজ্ঞাত ছিল না। ইঁহারা বোধহয় ছিলেন অস্ট্রিক-ভাষী আদি-অস্ট্রেলয়েড্ নরগোষ্ঠীর লোক, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের ভাষায় 'অসুর'। উপরোক্ত বিচিত্র উল্লেখ হইতেই দেখা যায়, সেই সুপ্রাচীন কালেই ইঁহারা কোমবদ্ধ হইয়াছেন এবং এক-একটি জনপদকে আশ্রয় করিয়া এক-একটি বৃহত্তর কোমসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কোমবদ্ধ সমাজ যখন ছিল, সেই সমাজের একটা শাসনশৃংখলাও নিশ্চয়ই ছিল। তাহা না হইলে প্রাচীনতম বাংলার যে সমৃদ্ধ বাণিজ্যবিবরণের কথা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণগ্রন্থাদিতে পাঠ করা যায়, সেই সমৃদ্ধ বাণিজ্য সম্ভব হইত না। কিন্তু এই শাসনশৃংখলার স্বরূপ কী ছিল বলা কঠিন। গোড়ার দিকে এই শাসনব্যবস্থা বোধ হয় কোমতান্ত্রিক, কিন্তু মহাভারতে ও সিংহলী বিবরণীতে যে যুগের কথা পাইতেছি সেই যুগে কোমতন্ত্র রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাংলায় রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইতে হইতে মৌর্য আমলের খুব আগে হইয়াছিল বলিয়া যেন মনে হয় না।

তিন

প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন লেখকদের কৃপায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে বাংলার রাজবৃত্তকথা অনেকটা স্পষ্ট। এই গ্রীক ও লাতিন লেখকেরা আলেক্‌-জান্দারের ভারত-অভিযান সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; এই প্রসঙ্গেই প্রথম শোনা যাইতেছে যে, বিপাশা নদীর পূর্বতীরে দুইটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল, একটি প্রাচ্য এবং আর একটি গঙ্গারাষ্ট্র (?)। প্রাচ্য রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র, এবং গঙ্গারাষ্ট্রের গঙ্গা (-নগর)। পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণ হইতে জানা যায়, গঙ্গা-নগর সামুদ্রিক বাণিজ্যের বৃহৎ বন্দর ছিল; টলেমি আরও বলিতেছেন, এই গঙ্গা-বন্দরের অবস্থিতি ছিল কুমার নদীর মোহানায়। গ্রীক-লাতিন লেখক কথিত গঙ্গারাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল, এবং প্রাচ্যরাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিকে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্ত প্রাচ্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। কার্টিয়াসের বিবরণী পড়িলে মনে হয়, প্রাচ্য- ও গঙ্গা -রাষ্ট্র দুই স্বতন্ত্র রাজ্য, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে একই রাজার অধীনে এবং একই রাষ্ট্রে সংবদ্ধ। দিয়োদরসও বলিতেছেন, প্রাচ্য ও গঙ্গা একই রাষ্ট্র একই রাজার অধীন। মনে হয়, প্রাচ্য ও গঙ্গা দুইটি স্বতন্ত্র জনপদ-রাষ্ট্র হিসাবেই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে কিংবা তাহার আগে কোন সময় দুই জনপদ-রাষ্ট্র এক রাজার অধীন হয়, এবং একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, যদিও তাহার পরেও খুব সম্ভব দুই জনপদের সৈন্যসামন্ত প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল।

এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন উগ্রসেনের পুত্র। পুরাণে যাঁহাকে বলা হইয়াছে মহাপদ্মনন্দ তাঁহাকেই বোধ হয় মহাবোধিবংশ গ্রন্থে উগ্রসেন বলা হইয়াছে। উগ্রসেন নীচকুলোদ্ভব নাপিতের পুত্র ছিলেন, এ সাক্ষ্য পূর্বোক্ত লেখকেরাই দিতেছেন; হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব নামক জৈন গ্রন্থেও মহাপদ্মকে বলা হইয়াছে নাপিত-কুমার। পুরাণে কিন্তু মহাপদ্মনন্দকে শূদ্রগর্ভোদ্ভব বলা হইয়াছে। মহাপদ্মকে আরও বলা হইয়াছে 'সর্বক্ষত্রান্তক নৃপঃ' এবং 'একরাট্‌'। যিনি কাশী, মিথিলা, বীতিহোত্র, ইক্ষ্বাকু, কুরু, পঞ্চাল, হৈহয় ও কলিঙ্গদের পরাভূত করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে গঙ্গারাষ্ট্র স্বীয় প্রাচ্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা কিছু অসম্ভব নয়। যাহাই হউক, আজ এ তথ্য সুবিদিত যে, উগ্রসেনের সমবেত প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্রের সুবৃহৎ সৈন্য এবং তাঁহার প্রভূতধনরত্নপরিপূর্ণ রাজকোষের সংবাদ আলেকজান্দারের শিবিরে পৌঁছিয়াছিল, এবং তিনি যে বিপাশা পার হইয়া পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হইয়া ব্যাবিলনে ফিরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহার মূলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই সংবাদগত কারণটিও অগ্রাহ্য করিবার মতন নয়।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া সুবিস্তৃত নন্দ-সাম্রাজ্যের উত্তরাধি-কারী হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম ও তাঁহার পুত্রদের গঙ্গারাষ্ট্রও মৌর্যসাম্রাজ্যের করতলগত হইয়াছিল। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ, মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলাখণ্ডলিপি এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া মানিলে স্বীকার করিতে হয়, পুণ্ড্র-বর্ধন বা উত্তরবঙ্গ নিঃসন্দেহে মৌর্য-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ তো পুণ্ড্র-বর্ধন ছাড়া প্রাচীন বাংলার অন্যান্য জনপদেও (যথা কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, সমতট) মৌর্য সম্রাট অশোক-নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার দেখিয়াছিলেন যা তাহাদের

বিবরণ শুনিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন। মহাস্থানের ব্রাহ্মী লিপিতে দেখিতেছি, রাজধানী পুন্দনগলে (পুণ্ড্রনগরে) একজন মৌর্য মহামাত্র নিযুক্ত ছিলেন, এবং স্থানীয় রাজকোষ ও রাষ্ট্রশস্যভাণ্ডার গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় এবং ধান্যশস্যে পরিপূর্ণ ছিল।

শুঙ্গ রাজাদের আমলেও বোধ হয় বাংলাদেশ পাটলিপুত্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। তবে শুঙ্গ শিল্পশৈলী এবং সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশে কিছু কিছু নানা-চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; এইসব মুদ্রা মৌর্য ও শুঙ্গ আমলের হইলেও হইতে পারে। তবে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পেরিপ্লাস-গ্রন্থে নিম্ন-গাঙ্গেয় ভূমিতে 'ক্যালটিস' নামক একপ্রকার সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনের খবর পাওয়া যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের বাংলাদেশ সম্বন্ধে পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে আরও কিছু খবর পাওয়া যাইতেছে। যে গঙ্গারাষ্ট্রের কথা গ্রীক ও লাতিন লেখকদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে, সেই গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গাবন্দর নগর তখনও বিদ্যমান। এই গঙ্গাবন্দরে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত, এবং ইহার সন্নিকটেই কোথাও সোনার খনি ছিল। গঙ্গাবন্দরের অবস্থিতি যে কুমার নদীর মোহনায় অর্থাৎ প্রাচীন কুমারতালক-মণ্ডলে, এই ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে সুবর্ণবীথির উল্লেখ, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় সুবর্ণগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় সোনারঙ্গ, সোনাকান্দি, বর্তমান বাংলার পশ্চিম প্রান্তে সুবর্ণরেখা নদী ইত্যাদি সমস্তই সুবর্ণস্মৃতিবহ। টলেমি নিম্নমধ্য-বঙ্গে যে সোনার খনির কথা বলিতেছেন তাহা কাল্পনিক না-ও হইতে পারে।

কুষাণ আমলের কিছু কিছু সুবর্ণ ও অন্য ধাতব মুদ্রা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। মহাস্থানের ধ্বংসস্তূপেও কণিষ্কের (?) মূর্তি-চিহ্নিত একটি সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাংলাদেশে কুষাণাধিপত্যের কোন অকাট্য প্রমাণ নাই; এইসব মুদ্রা হয়তো বাণিজ্যসূত্রে এখানে আসিয়া থাকিবে। অথবা, শক এবং কুষাণ জনগোষ্ঠী-সংপৃক্ত টলেমি-কথিত মুরুণ্ডরা হয়তো প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কখনো বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন, এবং কুষাণমুদ্রার প্রচলনও তাহারাই করিয়া থাকিলেন। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলিবার কিছু উপায় নাই।

বস্তুত, গ্রীক-লাতিন লেখকবর্গ-কথিত গঙ্গারাষ্ট্র এবং মৌর্য আমলের পর হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে গুপ্তরাজবংশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্তকাহিনী সম্বন্ধে স্বল্প তথ্যই আমরা জানি। অথচ, পেরিপ্লাস ও টলেমির বিবরণ, মিলিন্দপঞ্হ জাতকের গল্প, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতেছি, এই সময়ে বাংলাদেশে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ এবং ভারতের বাহিরে বিদেশের সঙ্গে—একদিকে মিশর ও রোম সাম্রাজ্য, অন্যদিকে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ এবং চীন—তাহার যোগাযোগ। বৌদ্ধধর্ম প্রচারসূত্রে সিংহল ও পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগেরও কিছু কিছু পরিচয় জানা যাইতেছে। রাষ্ট্র- ও সমাজ -গত শাসনশৃঙ্খলা বর্তমান না থাকিলে এই ধরনের সুদূরপ্রসারী অন্তর- ও বহির্ -বাণিজ্য কিছুতেই সম্ভব হইত না। সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনও এই অনুমানের অন্যতম ইঙ্গিত। যাহাই হউক, এই আমলে বাংলাদেশ ধনরত্নে ও উৎপন্ন

দ্রব্যাদিতে খুবই সমৃদ্ধ ছিল, সন্দেহ নাই; এবং সমৃদ্ধির আকর্ষণেই মহাপদ্ম-নন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্তদের আমল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ একের পর এক বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলকামও হইয়াছেন। আর, বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা তো মিশরদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্যন্ত সকলেই করিয়াছে। মহাবোধিবংশ-গ্রন্থে মহাপদ্মের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম পাইতেছি ধন (নন্দ); এই ধননন্দ সম্বন্ধে সিংহলী মহাবংশ-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, এই রাজা প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন নানা ন্যায় ও অন্যায় উপায়ে। য়ুয়ান-চোয়াঙও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন; কথাসরিৎসাগরের এক গল্পেও নন্দরাজের ধনের পরিমাণের উল্লেখ আছে। নন্দদের এই বিপুল অর্থ ও সম্পদের কতকটা অংশ যে গঙ্গারাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না; মৌর্যরাও নিশ্চয়ই এই বিপুল ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

মধ্য- ও উত্তর -ভারত হইতে যেসব রাজবংশ, যেসব বণিক ও ব্যবসায়ী যুদ্ধ, রাষ্ট্রকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশে আসিয়াছেন, তাঁহারাই মধ্য- ও উত্তর-ভারতের আর্য-ভাষা, আর্য-ধর্ম এবং আর্য-সংস্কৃতিও বহন করিয়া আনিয়াছেন। সেই পথ বাহিয়া সেইসব ক্ষেত্রে আসিয়া আর্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন আর্য ধর্ম ও শিক্ষার প্রচারকেরা। প্রথম জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতি, পরে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আরও পরে, বিশেষভাবে গুপ্ত আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

বাধা ও বিরোধ গড়িয়া তোলা সত্ত্বেও সমসাময়িক বাংলার প্রাচীন কোমগুলি এই প্রভাব ঠেকাইতে পারে নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাভব স্বীকারের প্রধান সামাজিক কারণ এইসব প্রাচীন কোমগুলি তাহাদের কৌম-সামাজিক মন পরিত্যাগ করিয়া রাজতন্ত্রের বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে স্থায়িভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই; নিজ নিজ কৌম স্বার্থবুদ্ধিই বোধহয় এই পরাভবের কারণ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাহিরের বিজেতা রাষ্ট্রগুলির উন্নততর উৎপাদনব্যবস্থা এবং উন্নততর শস্ত্র ও যুদ্ধপ্রণালী নিঃসন্দেহে যেমন পরাভবের অন্যতম কারণ, তেমনই উহাদের উন্নততর সামাজিক ব্যবস্থাও ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরাভবের হেতু।

চার

খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয় শতকের শেষ বা চতুর্থ শতকের সূচনা হইতেই বাংলাদেশ যে নিঃসংশয়ে কৌম সমাজ- ও রাষ্ট্র -ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়; জনপদগুলির কৌম-নাম তখন জনপদ-নামে বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, যদিও বঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যও বিদ্যমান।

দিল্লীর কুতুব্-মিনারের কাছে মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভের লিপিতে চন্দ্র নামক এক রাজা বঙ্গজনপদসমূহে (বঙ্গেষু) তাঁহার শত্রুনিধনের গৌরব দাবি করিতেছেন। মেহেরৌলি-লিপিতে এ কথা বলা হইয়াছে যে বঙ্গীয়েরা একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া রাজা চন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করিয়াছিল। এই চন্দ্র কে, তাহা লইয়া ঐতিহাসিক-দের মধ্যে বিচিত্র মত আছে। কাহারও মতে ইনি গুপ্তসম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, কাহারও মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; কেহ কেহ আবার মনে করেন ইনি সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-

লিপির চন্দ্রবর্মা, অথবা, এমনও হইতে পারে, তিনি একেবারে স্বতন্ত্র নরপতি ছিলেন। ইনি যিনিই হউন, এ তথ্য সুস্পষ্ট যে, বঙ্গজনেরা চন্দ্রের আক্রমণ পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিলেন: এবং চন্দ্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁহারা পরাভূত হইয়াছিলেন।

বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি লিপিতে সিংহবর্মাপুত্র পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মা নামক এক রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই পুষ্করণাধিপই বোধহয় সমসাময়িক রাঢ়ের অধিপতি। কেহ কেহ মনে করেন, ইনিই এলাহাবাদ-লিপি-কথিত এবং গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত চন্দ্রবর্মা।

সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে সমতট ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর প্রায় সকল জনপদই গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল নেপাল, কর্তৃপুর, কামরূপ, ডবাক এবং সমতট। সমুদ্রগুপ্তই বাংলায় প্রথম গুপ্তাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সে অধিকার বোধহয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তেরও আগে কোন রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। চীন পরিব্রাজক ইৎসিঙ্ মহারাজ শ্রীগুপ্ত নামে একজন নরপতির সংবাদ দিতেছেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের প্রপিতামহ মহারাজগুপ্ত (আনুমানিক তৃতীয় শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ পাদ) বোধহয় একই ব্যক্তি। এ তথ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বরেন্দ্রভূমি তৃতীয় শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পাদেই গুপ্তাধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। মেহেরৌলি-লিপির চন্দ্র যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বঙ্গজনদের জয় করিয়াছিলেন, এ তথ্য স্বীকার করা চলে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া রাঢ়-দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এ তথ্যের সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। এলাহাবাদলিপির সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সমতট ছাড়া বাংলাদেশের আর সকল অংশই সমুদ্রগুপ্তের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রানুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের আমল হইতে একেবারে প্রায় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার গুপ্ত রাজত্বের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্র-বর্ধন। ৫০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন সময়ে সমতটেও গুপ্তাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান: এই সময়ে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নামে একজন গুপ্তান্তা-নামীয় রাজা ত্রিপুরা জেলায় কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। সম্ভবত বৈন্যগুপ্ত গুপ্তরাষ্ট্রেরই সামন্ত-রাজরূপে পূর্ববাংলায় রাজত্ব করিতে ছিলেন, পরে গুপ্তরাষ্ট্রেরই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নিঃসংশয় ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং সম্ভবত একেবারে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ গুপ্তাধিকারভুক্ত ছিল, এবং এই রাজ্যখণ্ডের প্রধান কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি। এই রাজ্যবিভাগ এত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইত যে, সম্রাট স্বয়ং ছিলেন ইহার শাসনকর্তা—উপরিক বা উপরিক-মহারাজ হইতেন একেবারে রাজকুমারদেরই একজন।

গুপ্তাধিকারে বাংলাদেশে সুবর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার প্রচলন প্রায় সর্বব্যাপী বলিলেই চলে। সুবর্ণমুদ্রা দিনার এবং রৌপ্যমুদ্রা রূপক। সাধারণ গৃহস্থরাও ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে সুবর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহার করিতেছেন, প্রত্যেকটি লিপিতে তাহা

তাহাই। প্রাচীন বাংলার সর্বোত্তম বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও এই যুগেই। সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা, হাজারিবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ের লিপি, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র প্রভৃতির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাক্ষ্য এই যুগেরই অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে। নিকষোত্তীর্ণ, সুমুদ্রিত এবং যথানির্দিষ্ট ওজনের সুবর্ণমুদ্রার বহুল প্রচলনও দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির দ্যোতক। মনে হয়, নিয়মিত এবং সুসংবদ্ধ প্রণালীগত রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার ফলে দেশের অর্থগত ও সমাজগত ব্যবস্থার, তথা বাণিজ্য-ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে দেশের এই যুগের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখিতেছি, স্থানীয় রাষ্ট্রাধিকরণ (বিষয়াধিকরণ) যে পাঁচটি লোক লইয়া গঠিত তাহার মধ্যে দুইজন বোধহয় রাজপুরুষ, বাকি তিনজনই শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ছিল বলিয়াই রাষ্ট্রে এইসব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকৃতও হইয়াছিল; রাষ্ট্রে বণিক, শ্রেষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সমাজের আধিপত্য, দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি, সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন, বাৎস্যায়নবর্ণিত নাগর জীবনের বিলাসলীলা, এই সমস্তই সওদাগরী ধনতন্ত্রের দিকে নিঃসংশয় ইঙ্গিতদান করে। এই যুগের বাংলার সামাজিক ধন শ্রেষ্ঠী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের আয়ত্তে, এবং সেই ধনেই রাষ্ট্র পুষ্ট; সামাজিক ধন উৎপাদন ও বণ্টনের সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্র যেমন ইঁহাদের পোষক ও সমর্থক, ইঁহারাও তেমনই রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক। লক্ষণীয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-সমাজের কোন স্থান রাষ্ট্রে প্রায় নাই বলিলেই চলে। কৃষি ও সাধারণ গৃহস্থ সমাজ তো নিশ্চয়ই ছিল; মধ্যবিত্ত সমাজও একটা ছিলই; সেই সমাজের লোকেরা ভূমিলব্ধ-আয়নির্ভর যেমন ছিলেন, তেমনই কিছুটা পরিমাণে শিল্প-বাণিজ্য-বাণিজ্য-ব্যবসায়নির্ভরও বোধ হয় ছিলেন।

যে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর সমাজের কথা এইমাত্র বলিয়াছি স্বভাবতই তাহার কেন্দ্র ছিল নগরগুলিতে। এই নাগর সমাজের জীবনপ্রণালীর কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে। সওদাগরী ধনতন্ত্রে পুষ্ট নগর-সমাজে যে অবসর ও বিলাসলীলা, যে কামচাতুর্যলীলা রাজান্তঃপুরে এবং ধনী সমাজের গৃহান্তঃপুরে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়, ভারতবর্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে, বাংলাদেশ চিরকালই উত্তর-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত বলিয়া, এবং এখানে আর্যপূর্ব গ্রাম্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব বহুদিন সক্রিয় ছিল বলিয়া এদেশে নগর ও নগর-সমাজ কোনদিনই খুব একান্ত ও সমাদৃত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবু, সামাজিক আবর্তন-বিবর্তনের নিয়ম এবং উত্তর-ভারতের স্পর্শ এড়াইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আগেকার রাষ্ট্রপর্বে দেখিয়াছি বাংলার জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার, এবং এই দুই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার। এই যুগেও এই দুই ধর্মের বিস্তার অব্যাহত, এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশের সমর্থন ও পোষকতা ইহাদের পশ্চাতে বিদ্যমান। অশ্বমেধ-যাজী ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তসম্রাটেরা এই দুই ধর্মের, বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নালন্দা-মহাবিহারের গোড়াপত্তন তো তাঁহাদের পোষকতায়ই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; অন্তত য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্য তাহাই। সারনাথ-বিহারের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সাধনার পিছনেও তাঁহাদের পোষকতা সক্রিয় ছিল। বাংলাদেশেও অনুরূপ সাক্ষ্য

বিদ্যমান। ই-ৎসিঙের মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো যদি বরেন্দ্রদেশান্তর্গত মৃগ-স্থাপন স্তূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে মহারাজা শ্রীগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের একজন পোষক ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। পাহাড়পুর পট্টোলীর (৪৭৮-৭৯) সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, জৈন ধর্ম ও সংঘও গুপ্তরাজাদের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ছিলেন মহাদেবের ভক্ত অর্থাৎ শৈব্য; তিনি তাঁহার সামন্ত মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর (গুণিকাগ্রহার) গ্রামে কিছু জমি দান করিয়াছিলেন মহাযানাচার্য শান্তিদেব-প্রতিষ্ঠিত মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের আশ্রমবিহারের সেবার জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মর্তব্য যে, গুপ্তরাজবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী, এবং ইঁহাদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম—এখন আমরা যাহাকে বলি হিন্দুধর্ম, তাহার অভ্যুত্থান ও প্রসারলাভ ঘটে। মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি এই যুগেই রচিত হয়. এবং পৌরাণিক দেবদেবীরা এই সময়ে পূজা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রাজকীয় ঔদার্য ও পোষকতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সবিশেষ পোষক ও ধারক হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সমসাময়িক লিপিগুলির সাক্ষ্যও তাহাই। অধিকাংশ লিপিতেই ব্রাহ্মণদের সাক্ষাৎ তো পাইই. ভূমিদান তো তাঁহারাই লাভ করিতেছেন, কিন্তু তাহার চেয়েও লক্ষণীয়, বিবিধ ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞ, এবং পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার প্রচলন, ব্রাহ্মণদের জন্য নূতন নূতন বসতি স্থাপন ইত্যাদি। এই যুগে যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ বলবত্তর হইতেছে তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাই যখন দেখি সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তিরাও নূতন নূতন ব্রাহ্মণবসতি করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন এবং অহা ব্রাহ্মণদের দান করিতেছেন। ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করিবার যে-রীতি পরবর্তী কালে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইয়াছে তাহার সূত্রপাতও দেখি এই সময় হইতে। অব্যবহিত পরবর্তী যুগে যে এই অভ্যাস আরও বাড়িয়া গিয়াছে. তাহার প্রমাণ ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের প্রত্যেকটি লিপিতেই পাওয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই যে সবিশেষ পোষকতা ইহার রাষ্ট্রীয় ইঙ্গিত লক্ষণীয়: এই পোষকতার ফলেই ব্রাহ্মণ. ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে. এবং তাঁহারাই ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক আদর্শ নির্দেশের নিয়ামক হইয়া উঠেন। উত্তর-ভারতে এই শ্রেণী ও শ্রেণীগত সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন আগেই দেখা দিয়াছিল। গুপ্তাধিপত্যকে আশ্রয় করিয়া বাংলাদেশে সেই বিবর্তন এই যুগেই. অর্থাৎ চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা দিল; এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই আর্য ভাষা. আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে বাংলাদেশে প্রবাহিত হইল। প্রত্যন্তস্থিত বাংলাদেশ এই যুগে উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল; এবং তাহা সম্ভব হইল বাংলাদেশ গুপ্ত-রাজবংশের প্রায় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ার ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত আদানপ্রদানের ফলে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে।

পাঁচ

খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম শতকে বর্বর হূণেরা ভারতবর্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের ভিত্তি একেবারে নাড়িয়া দিল। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় গুপ্ত-

সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; পূর্বতম প্রত্যন্তে সামন্ত নরপতি মহারাজ বৈন্যগুপ্ত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া মহারাজাধিরাজ হইয়া উঠিলেন। মধ্য-ভারতে যশোধর্মন নামে জনৈক দিগ্বিজয়ী বীর প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়া শিথিলমূল গুপ্তসাম্রাজ্যসৌধটিকে প্রায় ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। যশোধর্মন লৌহিত্যতীর পর্যন্ত তাঁহার অপরাভূত সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং সম্ভবত বাংলাদেশ আর একবার বৈতসীবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এই অপরাজেয় যোদ্ধার কাছে মস্তক অবনত করিয়াছিল। তিনি দুর্ধর্ষ হূণদেরও পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নেতা মিহিরকুলকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন কাশ্মীরে। কিন্তু যশোধর্মন কোন রাজবংশ বা স্থায়ী রাজ্য বা রাজত্ব গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। সুযোগ পাইয়া উত্তর-ভারতের বড় বড় সামন্তেরা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া নূতন নূতন রাজ্য ও রাজবংশ গড়িয়া তুলিলেন; কনৌজ-কোশলে মৌখরী রাজবংশ এবং স্থানীশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ মস্তক উত্তোলন করিল। বাংলাদেশও এই সুযোগ গ্রহণে অবহেলা করিল না। সর্বাগ্রে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল পূর্ব- ও দক্ষিণ -বঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চল। ৫০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-বঙ্গ বৈন্যগুপ্তের অধীন ছিল; বর্ধমান অঞ্চল তখন বৈন্যগুপ্তের সামন্ত বিজয়সেনের শাসনাধীনে। অনুমান হয়, বর্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরা পর্যন্ত বৈন্যগুপ্তের রাজ্য বিস্তৃত ছিল; এই অঞ্চলই ষষ্ঠ শতকের প্রথম অথবা দ্বিতীয় পাদে, ৫০৭-৮'র কিছু পরে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া বসিল। এই শতকেরই শেষপাদে কোন সময়ে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল গৌড়। গৌড় ও বঙ্গের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসই ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস।

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাঁচটি এবং বর্ধমান অঞ্চলে আবিষ্কৃত একটি, এই ছয়টি পট্টোলীতে তিনটি মহারাজাধিরাজের খবর পাওয়া যাইতেছে : গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব। ইঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কী সম্পর্ক তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে তিনজনে মিলিয়া অন্যূন ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই রাজত্বের কাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত। লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, গোপচন্দ্রই ইঁহাদের প্রথমতম এবং প্রধানতম, এবং ইঁহাদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের ছিল দুইটি বিভাগ, একটি বর্ধমানভুক্তি, অপরটি নব্যাবকাশিকা (নূতন অবকাশ বা নবসৃষ্ট ভূমি= ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল ?)। বর্ধমান অঞ্চলের যে-বিজয়সেন একদা ছিলেন মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সামন্ত, তিনি এখন সামন্ত হইলেন গোপচন্দ্রের। আবিষ্কৃত সুবর্ণমুদ্রা হইতে মনে হয়, সমাচারদেবের পরও আরও কয়েকজন রাজা এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম পৃথুজবীর (মতান্তরে, পৃথুবীর অথবা পৃথুবীরজ) ও আর একজনের নাম সুধন্যা (বা শ্রীসুধন্যাদিত্য)। বাতাপী বা বাদামীর চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা ৫৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন সময় একবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার এই আক্রমণের ফলে, অথবা গৌড়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় ও রাজ্যবিস্তারের ফলে, অথবা দুয়েরই সম্মিলিত ফলে বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য কিছুদিনের জন্য ক্ষুন্ন হইয়া থাকিবে।

সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সমতটে একটি বৌদ্ধ রাজবংশের খবর পাওয়া যাইতেছে আস্রফপুরের দুইটি লিপিতে এবং চীন পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্-

ও সেং-চি'র বিবরণীতে। আস্রফপুরের দুইটি লিপিতে নৃপাধিরাজ খড়্গোদ্যম, (পুত্র) জাতখড়্গ (পুত্র) দেবখড়্গ এবং (পুত্র) রাজরাজ (ভট্ট) নামে চারজন রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই বংশ ইতিহাসে খড়্গবংশ নামে খ্যাত, ত্রিপুরা জেলার দেউলবাড়িতে একটি মূর্তির পাদপীঠে দেবখড়্গের স্ত্রী এবং রাজরাজভট্টের মাতা প্রভাবতীর নাম উৎকীর্ণ আছে। সেং-চি রাজভট নামে সমতটের এক বৌদ্ধ রাজার নাম করিয়াছেন, এবং ই-ৎসিঙ্ ও দেববর্মা নামে পূর্বদেশের এক রাজার খবর দিতেছেন। দেববর্মা ও দেবখড়্গ এক ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন, না-ও হইতে পারেন; কিন্তু সেং-চি-কথিত রাজভট যে আস্রফপুর পট্টোলীর রাজরাজভট্ট এ তথ্য নিঃসংশয় বলিলেই চলে। এই বংশের অন্তত একটি জয়স্কন্ধাবার ছিল কর্মান্তবাসক (বোধ হয়, ত্রিপুরা জেলার বর্তমান বড়কামতা)। অনুমান হয়, বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চল এই বংশের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যাহাই হউক, খড়্গ এই উপান্ত নাম দেশজ বলিয়া মনে হয় না। খড়্গ বংশ বোধ হয় স্বাধীন রাজবংশ ছিল না। খড়্গবংশীয় রাজারা প্রথমে বোধ হয় বঙ্গে রাজত্ব করিতেন, পরে সমতটে রাজত্ব বিস্তার করিয়া থাকিবেন।

ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত সপ্তমশতকীয় একটি পট্টোলীতে আর-একটি সামন্ত রাজবংশের খবর পাওয়া যাইতেছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা একজন অধিমহারাজ; তাঁহার পুত্র ছিলেন মহাসামন্ত শিবনাথ, শিবনাথের পুত্র শ্রীনাথ শ্রীনাথের পুত্র ভবনাথ তারপর লোকনাথ। অনেকে মনে করেন এই সামন্ত রাজবংশ খড়্গবংশীয় নৃপাধিরাজদের আধিরাজত্ব স্বীকার করিতেন।

লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে লোকনাথেরই সমসাময়িক জনৈক নৃপ জীবধারণের উল্লেখ আছে। এই জীবধারণ যে বংশের রাজা ছিলেন সেই বংশকে রাতবংশ বলা যাইতে পারে, এবং ত্রিপুরা জেলার কৈলান গ্রামে আবিষ্কৃত একটি পট্টোলী হইতে এই বংশের দুইটি রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। অক্ষর-সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, এই সমস্ত রাজবংশ সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সমতটের অধীশ্বর ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন সমতটেশ্বর শ্রীজীবধারণ রাত। বলা বাহুল্য, এই রাতবংশও সামন্তবংশ, স্বাধীন রাজবংশ নহে। তবে খড়্গ বংশ বা লোকনাথের বংশ বা রাতবংশ, ইঁহারা নামেই শুধু সামন্তবংশ; কার্যত ইঁহারা স্বাধীন নরপতিদের মতোই ব্যবহার করিতেন। রাতবংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী, এবং শ্রীধারণ নিজে ছিলেন বৈষ্ণব।

খড়্গ বংশ, লোকনাথের বংশ এবং রাতবংশের রাজারা প্রায় সমসাময়িক, এবং এই প্রত্যেকটি রাজবংশই সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কে কাহার পরে সমতটের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; তবে মনে হয়, খড়্গ বংশ প্রথমে বঙ্গেই রাজত্ব করিতেন, পরে রাজা দেবখড়্গ সমতটে রাজ্যবিস্তার করেন। বোধ হয়, খড়্গদের সামন্ত হিসাবে লোকনাথ সমতটের অধীশ্বর হন, এবং লোক-নাথকে পরাজিত করিয়া রাতবংশীয় জীবধারণ নিজ বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে সমতটে একটি ব্রাহ্মণরাজবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং নালন্দার বৌদ্ধ মহাস্থবির য়ুয়ান-চোয়াঙের গুরু শীলভদ্র সেই রাজবংশের সন্তান ছিলেন বলিয়া য়ুয়ান-চোয়াঙ্ নিজেই সাক্ষ্য দিতেছেন। এই ব্রাহ্মণ রাজ-বংশ রাতবংশ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

অসম্ভব নয় যে, সপ্তম শতকে গৌড়ে এবং উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে শশাঙ্কের

যে গৌড়তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, খড়্গ ও রাতবংশীয় রাজারা গোড়ায় তাহারই সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এইসব সামন্তবংশ একে একে কার্যত স্বাধীন হইয়া উঠেন।

এই সংক্ষিপ্ত তথ্যবিবৃতি হইতেই বুঝা যাইবে, সপ্তম শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত কি অষ্টম শতকের গোড়া পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল; কিন্তু ঘন ঘন রাজবংশ পরিবর্তন ও প্রবল সামন্তাধিপত্য দেখিয়া মনে হয়, এই স্বাতন্ত্র্যের মূল শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। তাহা ছাড়া, সমসাময়িক অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে জানা যায়, বঙ্গ ও সমতট এই সময় একাধিকবার বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে।

সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে যখন বঙ্গ ও সমতটে খড়্গ ও রাতবংশীয় সামন্তদের প্রভুত্ব চলিতেছে তখন গৌড়ের অবস্থাটা কী. তাহা দেখা যাইতে পারে।

৫নং দামোদর লিপির সাক্ষ্যানুযায়ী পুণ্ড্রবর্ধন ৫৪৪ খ্রীষ্ট শতকেও জনৈক গুপ্তরাজের অধীন। মহাসেনগুপ্ত নামক জনৈক গুপ্ত-নরপতি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের চতুর্থপাদ) লৌহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড় ষষ্ঠ শতকের চতুর্থ পাদের আগে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সপ্তম শতকের সূচনায় দেখা যাইতেছে, জনৈক শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে দেখা দিতেছেন এবং গৌড়রাষ্ট্র উত্তর-ভারতের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করিতেছে।

গৌড়ের এই স্বাতন্ত্র্যলাভ ঐতিহাসিকেরা যতটা আকস্মিক বলিয়া মনে করেন, ততটা আকস্মিক নয়। ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার অব্যবহিত আগে কোন সময়ে কনৌজ-কোশলের মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার সঙ্গে একবার গৌড়জনদের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। হড়াহালিপিতে ঈশানবর্মা দাবি করিয়াছেন, তিনি গৌড়জনদের সমগ্র জনপদের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্রাশ্রয়ী করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঈশানবর্মার দাবি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়েই গৌড়জনপদ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই জনপদ একান্তই সমুদ্রনির্ভর। একাদশ শতকের গুরগি শিলালিপিতেও দেখা যাইতেছে, গৌড়জনপদের একটি সমুদ্র-জলদুর্গ ছিল। যাহা হউক, গৌড় জনপদ বোধ হয় ষষ্ঠ শতক হইতেই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী, এবং ঈশানবর্মার গৌড়বিজয় বোধ হয় বংশপরম্পরাবিলম্বিত গুপ্ত-মৌখরী সংঘর্ষের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী মাত্র। গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধন; তাঁহাদের দুই পুত্র ও এক কন্যা; রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন মৌখরীরাজ গ্রহবর্মা। গৌড়-স্বাতন্ত্র্যের নায়ক শশাঙ্ক ইঁহাদের সকলের, এবং মহাসেনগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজ দেবগুপ্তের সমসাময়িক, কাজেই তাঁহার ইতিহাস এবং গৌড় স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস ইঁহাদের সকলের সঙ্গে জড়িত। সে ইতিহাস সমসাময়িক লিপিমালা, বাণভট্টের হর্ষচরিত, য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী এবং আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার ফলে পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক-কাহিনীও অল্পবিস্তর সুপরিচিত।

শশাঙ্কের প্রথম পরিচয় মহাসামন্তরূপে। কাহার মহাসামন্ত তিনি ছিলেন,

বলা কঠিন, তবে মনে হয় মহাসেনগুপ্ত বা তৎপরবর্তী মালবাধিপতি দেবগুপ্ত তাঁহার অধিরাজ ছিলেন। যাহা হউক, এ তথ্য নিঃসংশয় যে, ৬০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন সময়ে শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকটে কানসোনা) নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

গৌড় ও মগধের অধিকার লইয়া মৌখরীদের সঙ্গে গুপ্তদের একটা সংগ্রাম কয়েক পুরুষ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। দুই পুরুষ সংগ্রাম চলিবার পর মহাসেনগুপ্তের পিতা নিজের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজ কন্যা মহাসেনগুপ্তাকে পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধনের মহিষীরূপে অর্পণ করেন। এই মৈত্রীবন্ধনের ভয়ে কিছুদিন মৌখরী-বিক্রম শান্ত ছিল। কিন্তু অবন্তীবর্মার পুত্র গ্রহবর্মা যখন মৌখরীবংশের রাজা, তখন মালবের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা দেবগুপ্ত। পক্ষ-প্রতিপক্ষের রূপ তখন বদলাইয়া গিয়াছে। মগধ ইতিমধ্যেই গুপ্তহস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে; মালবরাজ মহাসেনগুপ্তের দুই পুত্র, কুমার ও মাধব, প্রভাকরবর্ধনের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং মালবের অধিপতি হইয়াছিলেন দেবগুপ্ত। দেবগুপ্তের মৈত্রীবন্ধন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সঙ্গে, যে শশাঙ্ক মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থের মতে ইতিমধ্যেই বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অন্য দিকে গ্রহবর্মাও ইতিপূর্বেই প্রভাকরবর্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্ধন-হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; সেই সূত্রে তাঁহার মৈত্রীবন্ধন পুষ্যভূতিবংশের সঙ্গে। বৃদ্ধ প্রভাকরবর্ধনের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মাকে আক্রমণ ও হত্যা করিয়া রানী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে কারারুদ্ধ করেন। দেবগুপ্ত তাহার পর যখন স্থানীশ্বরের দিকে অগ্রসরমান শশাঙ্কও তখন দেবগুপ্তের সহায়তার জন্য কনৌজের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; কিন্তু দেবগুপ্তের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার আগেই সদ্যসিংহাসনারূঢ় রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে দেব-গুপ্তের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে পরাভূত ও নিহত করেন। তাহার পর হয়তো তিনি ভগিনী রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিবার জন্য কনৌজের দিকে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগেই তাঁহাকে শশাঙ্কের সম্মুখীন হইতে হয়, এবং তিনি তাঁহার হস্তে নিহত হন। বাণভট্ট ও য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, শশাঙ্ক রাজ্য-বর্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন; অন্য দিকে হর্ষবর্ধনের লিপির সাক্ষ্য এই যে, রাজ্যবর্ধন সত্যানুরোধে (হয়তো কোন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য) তাঁহার শত্রুর শিবিরে গিয়াছিলেন, এবং সেইখানেই তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক আর স্থানীশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ মৌখরীরাজবংশের পরাভবের আর কিছু বাকি ছিল না। হর্ষবর্ধন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই সসৈন্যে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মৈত্রীবন্ধন, সংবাদবাহক ভণ্ডীর মুখ হইতে রাজ্যবর্ধন-হত্যার বিস্তারিত বিবরণ ও বিন্ধ্যপর্বতে রাজ্যশ্রীর পলায়ন-বৃত্তান্ত প্রাপ্তি, সসৈন্যে ভণ্ডীকে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া নিজে রাজ্যশ্রীর উদ্ধারে গমন ও অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার আগেই রাজ্যশ্রীর উদ্ধার, এবং তাহার পর গঙ্গাতীরে ভণ্ডীচালিত সৈন্যের সঙ্গে পুনর্মিলন ইত্যাদি বাণভট্টের কৃপায় আজ অতি সুবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য। কিন্তু তাহার পর শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সম্মুখ-যুদ্ধ কিছু হইয়াছিল কিনা এ সম্বন্ধে বাণভট্ট নীরব। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের

গ্রন্থকারের মতে এই সময় প্রাচ্যদেশের রাজা ছিলেন সোম (=চন্দ্র=শশাঙ্ক); তাঁহার রাজধানী ছিল পুণ্ড্র। হর্ষবর্ধন এই সোমরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বিবরণ কতটুকু সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন; তবে, তাঁহার এই জয় যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, এবং কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক যে সমগ্র গৌড় দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং উৎকল ও কঙ্গোদ দেশের অধিপতি ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত শ্রীমাধবরাজের (৬১৯ খ্রীষ্টশতক) একটি লিপি এবং সামন্ত-মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তির মেদিনীপুরে (প্রাচীন নাম, মিধুনপুর) লিপি দুইটির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়, দণ্ডভুক্তিদেশ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উৎকলদেশ দণ্ডভুক্তিবিভাগের অন্তর্গত ছিল। ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

শশাঙ্ক কীর্তিমান নরপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। অজ্ঞাতকুলশীল মহাসামন্ত-রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন উত্তর-ভারতের সর্বোত্তম রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির (কনৌজ-স্থানীশ্বর-কামরূপ মৈত্রী) বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া, শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে তিনি সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, এ তথ্যই ঐতিহাসিকের প্রশংসিত বিস্ময় উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট। পুরুষপরম্পরাবিলম্বিত কনৌজ-গৌড়-মগধ সংগ্রাম তাঁহারই শৌর্য ও বীর্যে নূতন রূপে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। উত্তর-ভারতের আধিপত্য লইয়া পালরাজ ধর্মপাল-দেবপাল প্রভৃতির আমলে গৌড়-কনৌজের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরবর্তী-কালের বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা শশাঙ্কের আমলেই দেখা দিল, এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করাইলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও মগধের অধিকার লইয়া প্রায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসে গৌড়তন্ত্র বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের এই সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য নয় বলিয়াই মনে হয়। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ যখন বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন তখন এই দেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত : কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। পাঁচটি জনপদের মধ্যে এক সমতট ছাড়া আর বাকি চারিটিই নিঃসন্দেহে শশাঙ্কের রাজ্যান্তর্গত ছিল। মনে হয় তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রত্যেকটি জনপদই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রপরায়ণ হইয়া উঠে; এবং ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে কজঙ্গলে ভাস্করবর্মা-হর্ষবর্ধন সাক্ষাৎকারের আগেই ভাস্করবর্মা কোন সময় পুণ্ড্রবর্ধন-কর্ণসুবর্ণ জয় করেন। চীনা রাজতরঙ্গের সাক্ষ্যানুযায়ী ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্করবর্মা পূর্ব-ভারতের নরপতি ছিলেন। ৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কঙ্গোদ এবং কজঙ্গলও হর্ষবর্ধন কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল, য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ হইতে এইরূপ মনে হয়। তাম্রলিপ্তি দণ্ডভুক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, তবে ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মগধের রাজা ছিলেন পূর্ণবর্মা, কিন্তু ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে কি তাহার অব্যবহিত আগে মগধও হর্ষবর্ধন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা বোধ হয় বেশি দিন গৌড়-কর্ণসুবর্ণ নিজ করায়ত্ত রাখিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের গৌড়তন্ত্র বিনষ্টির স্বল্পকাল পরেই গৌড়ে জয়

নামক কোন নাগরাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এইরূপ একটি ইঙ্গিত আছে। আনুমানিক সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে মহারাজাধিরাজ জয়নাগ নামক এক রাজা কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধাবার হইতে কিছু ভূমিদানের আদেশ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। জয় নামক এক রাজার নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রাও বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার জয়, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের জয়, এবং বপ্পঘোষবাট পট্টোলীর জয়নাগ এক এবং অভিন্ন বলিয়া বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বিবরণ হইতে মনে হয়, ভাস্করবর্মার কর্ণসুবর্ণাধিকারের পর শশাঙ্কপুত্র মানব পিতৃরাজ্য পুনরধিকারের একটা চেষ্টা করিয়া থাকিবেন, এবং সে-চেষ্টা হয়তো ক্ষণস্থায়ী সার্থকতাও লাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার পরই কর্ণসুবর্ণ জয়নাগের করায়ত্ত হয়, এবং তিনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় স্বতন্ত্র নরপতিরূপে পরিচিত হন। যাহাই হউক, ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই শশাঙ্কের গৌড়-রাজ্য একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। শশাঙ্ক গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া যে বৃহত্তর গৌড়তন্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অন্তত কিছুকালের জন্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে জনৈক গৌড়াধিপ আবার, বোধ হয় শশাঙ্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, মগধ হইতে গুপ্তবংশের অবশেষ অবলুপ্ত করেন এবং মগধেরও আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু সে চেষ্টা সত্ত্বেও গৌড়তন্ত্র আর পুনরুত্থাব করা গেল না। তাহার পর সুদীর্ঘ একশত বৎসর সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে গভীর ও সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা, মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত প্রভাব।

এই যুগের স্বাধীন গৌড়-রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল গৌড়তন্ত্র গড়িয়া তোলা; শশাঙ্কই ছিলেন এই আদর্শের নায়ক। গৌড়তন্ত্রে রাষ্ট্রের গঠনবিন্যাস এবং পরিচালনপদ্ধতি গুপ্ত আমলেরই অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; রাষ্ট্রবিভাগ এবং রাজকর্মচারীদের যে ইঙ্গিত সমসাময়িক লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা দ্বারা এই অনুমান সমর্থিত হয়। এই যুগে নূতন একটি রাষ্ট্রবিভাগ, বীথীর নাম শুনা যাইতেছে, অন্তত বঙ্গে-সমতটে; ভুক্তি এবং বিষয়-বিভাগের মতো বীথী-বিভাগেরও একটি অধিকরণ থাকিত। ভুক্তির যিনি উপরিক বা শাসনকর্তা থাকিতেন তাঁহার মর্যাদা এই যুগে ক্রমশ যেন বাড়িয়া যাইবার দিকে। তাঁহাকে কখনো কখনো মহারাজা বলা হইয়াছে, যেমন গুপ্ত-আমলেও বলা হইত; শশাঙ্কের অন্যতম মেদিনীপুরলিপিতেও দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে মহাপ্রতীহার; সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটিলিপিতে উপরিক জীবদত্তকে অধিকন্তু বলা হইয়াছে অন্তরঙ্গ। তাহা ছাড়া, মল্লসারুল পট্টোলীতে (গোপচন্দ্রের আমল) অনেক নূতন নূতন রাজপুরুষের নামের দীর্ঘ তালিকা সর্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে; স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অনেক বেশি আত্মসচেতন হইয়াছে, নূতন নূতন সামাজিক দায় ও কর্তব্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। এই সচেতনতা ও স্বীকৃতি ক্রমশ বাড়িয়াই যাইবে এবং তাহার পূর্ণতর রূপ দেখা যাইবে পাল আমলে, এবং পূর্ণতম রূপ সেন- ও বর্মণ-বংশীয় রাজাদের আমলে। যাহা হউক, বিস্তৃত কর্মচারিতন্ত্র (এখন আমরা যাহাকে বলি আমলাতন্ত্র) রচনার সূত্রপাত এই যুগেই প্রথম দেখা যাইতেছে। ছোটখাট সামাজিক দায় ও কর্তব্য সম্বন্ধেও রাষ্ট্র সচেতন হইতেছে; সমাজের অভ্যন্তরেও রাষ্ট্র হস্ত সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছে; আগে যাহা ছিল পল্লী বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্গত তাহা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইতেছে, এই ইঙ্গিত কিছুতেই অবহেলা করিবার মতন নয়।

বিষয়াধিকরণ যাঁহারা গঠন করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ-কুলিকদের দেখিতেছি না; পরিবর্তে পাইতেছি মহত্তর এবং ব্যাপারী বা ব্যবহারী প্রভৃতিদের। মহত্তরেরা স্থানীয় প্রধান, ব্যাপারী-ব্যবহারীরা তো স্পষ্টতই শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের আধিপত্য এখনও বিদ্যমান; তবে সে আধিপত্য এখন অন্যান্য স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করিতে হইতেছে।

এই যুগে রাষ্ট্রের আর-একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার মতন। বাংলাদেশে এই আমলেই পুরাপুরি সামন্ততন্ত্র রচনার সূত্রপাত দেখা যায়। শশাঙ্কের জীবনই তো আরম্ভ হইয়াছিল মহাসামন্তরূপে; তাহা ছাড়া, শশাঙ্কের একটি লিপিতে দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা সামন্ত-মহারাজ সোমদত্তের উল্লেখ পাইতেছি; কঙ্গোদের শৈলোদ্ভববংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় শ্রীমাধবরাজও শশাঙ্কের একজন মহাসামন্ত ছিলেন। গুণাইঘরলিপির দূতক মহাপ্রতীহার মহারাজ বিজয়সেনও গোপচন্দ্রের একজন শ্রীমহাসামন্ত ছিলেন। বিজয়সেন গোপচন্দ্রের আগে মহারাজ বৈন্যগুপ্তেরও অন্যতম মহাসামন্ত ছিলেন। মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের কুর্পালালিপিতে এবং জয়নাগের বপ্পঘোষবাটলিপিতেও সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। খড়্গবংশীয় রাজারাও বোধ হয় সামন্ত নরপতিই ছিলেন; এবং লোকনাথের বংশও তো সামন্ত বংশ। রাতবংশীয় রাজারাও সামন্ত-মহাসামন্তই ছিলেন। এই সামন্তদের সঙ্গে মহারাজাধিরাজদের সম্বন্ধের রূপ ও প্রকৃতি কী ছিল, পরস্পরের দায় ও অধিকার কী ছিল, বলা কঠিন। তবে অনুমান হয়, কোন কোন সামন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপেই রাজত্ব করিতেন, শুধু দলিলপত্রে নিজদের সেইভাবে প্রচার করিতেন না। মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দুর্বল হইলে অথবা অন্য কোন উপায়ে সুযোগ পাইলেই তাঁহারা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া বসিতেন। সামন্ত রাজাদেরও আবার সামন্ত থাকিতেন; পরবর্তী কালের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় (যেমন, রামচরিতের) তাহা হইলে সামন্তদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যবাহিনী দিয়া এবং নিজে যুদ্ধে যোগ দিয়া মহারাজাধিরাজকে সাহায্য করা। এ পর্বের বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র এবং গৌড়তন্ত্র আমলাতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র লইয়াই গঠিত।

সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন এই যুগেও দেখা যাইতেছে—বঙ্গ, সমতট এবং গৌড় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই। কিন্তু সুবর্ণমুদ্রার সেই নিকষোত্তীর্ণ সুমুদ্রিত রূপ আর নাই; নকল মুদ্রার প্রচলনও আরম্ভ হইয়াছে। রৌপ্যমুদ্রা তো একেবারেই নাই। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবর্তন মুদ্রার এই অবনতির অন্যতম কারণ হইতে পারে। রাষ্ট্রও যেন সামাজিক ধনোৎপাদনের দিকে এই যুগে খুব বেশি দৃষ্টি রাখে নাই; উৎপাদিত ধনের বণ্টনব্যবস্থার দিকেই রাষ্ট্রের ঝোঁকটা যেন বেশি। বাণিজ্য-ব্যবসায় ব্যাপারে যেন একটু মন্দা পড়িয়াছে; মহত্তর-গ্রামিক-কুটুম্বদের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। এই যুগেই ভূমির চাহিদা বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বাৎস্যায়নের আমলে নাগর-সমাজকেই যেমন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ বলিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছিল, এই আমলে সেই আদর্শে যেন একটু ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে; ভূমি- ও কৃষি -নির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ক্রমশ গ্রামকেন্দ্রিক হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এই প্রকৃতি এখনও

সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই; কোটালিপাড়ার পট্টোলীগুলিতে তাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র পাওয়া যাইতেছে।

এই যুগের বঙ্গ ও সমতটের রাজারা সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী; রাতবংশ ও আচার্য শীলভদ্রের পিতৃবংশও ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী; লোকনাথের সামন্তবংশও তাহাই। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। নিধনপুর-শাসনের সাক্ষ্যে ভাস্করবর্মাকেও শৈব বলা যাইতে পারে। সমাচারদেবের রাজত্বকালে বলি-চরু-সত্র প্রবর্তনের জন্য জনৈক ব্রাহ্মণ রাজকীয় ভূমিদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব, জয়নাগ বা লোকনাথের আমলের যে-কয়টি ভূমিদানলিপি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতার প্রমাণ। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের রাজকীয় লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন নামে ও রূপে বিষ্ণু ক্রমশ পূজা ও সমাদর লাভ করিতেছেন। এই যুগে অর্থাৎ ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে গৌড়ে-কামরূপেও শৈবধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং উভয় স্থানেই রাজা শৈব। কিন্তু বিষ্ণু এবং কৃষ্ণধর্মই অধিক প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। রাজবংশের মধ্যে একমাত্র খড়্গরাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ, আর কোথাও বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই।

ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় গুণাইঘরলিপির (৫০৭-৮) সাক্ষ্যে দেখিয়াছিলাম বৌদ্ধধর্ম ত্রিপুরা অঞ্চলে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পোষকতা লাভ করিতেছে। প্রায় দেড় শত বৎসর পর সপ্তম শতকের শেষপাদে দেখিতেছি, বৌদ্ধধর্ম আবার রাষ্ট্র ও রাজবংশের পোষকতা ও সমর্থন লাভ করিতেছে। লক্ষণীয় এই যে, এই পোষকতা ঢাকা-ত্রিপুরা অঞ্চলেই যেন সীমাবদ্ধ: কালপ্রান্তিক দুইটি সাক্ষ্যই বঙ্গ ও সমতটে। আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে— খড়্গবংশীয় বৌদ্ধরাজত্বেও এবং বৌদ্ধ-রাজমহিষী প্রভাবতী দেবীর পোষকতায়ও তাহা হইয়াছে। এই যুগের রাষ্ট্র ও রাজবংশ বৌদ্ধ (বা জৈন) ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে খুব শ্রদ্ধা- ও অনুগ্রহ -পরায়ণ ছিলেন এমন মনে হয় না। অথচ দেশে বৌদ্ধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কিছু অপ্রতুলতা ছিল, এমন নয়। জনসাধারণের বেশ একটা অংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী ছিল; য়ুয়ান-চোয়াঙ, ই-ৎসিঙ্ এবং সেং-চি'র বিবরণ এবং আস্রফপুরলিপির সাক্ষ্যেই তাহা সুস্পষ্ট।

বৌদ্ধ ধর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রে এই নেতিবাচক ঔদাসীন্য কি কখনো কখনো ইতিবাচক বিদ্বেষ ও শত্রুতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল? য়ুয়ান-চোয়াঙ্ অবশ্য সুস্পষ্ট অভিযোগই করিয়াছেন শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ও শত্রুতা সম্বন্ধে। শশাঙ্কের মৃত্যু সম্বন্ধেও য়ুয়ান-চোয়াঙ্ একটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সেই প্রসঙ্গেও শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ এবং তাহার ফলে শশাঙ্কের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে। বোধিদ্রুম ধ্বংস ও এই মৃত্যুকাহিনীর প্রতিধ্বনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও আছে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বৌদ্ধ শ্রমণ, আংশিকত হর্ষবর্ধনের প্রসাদপ্রার্থী এবং সেইহেতু শশাঙ্কের প্রতি বিদ্বিষ্ট। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পও বৌদ্ধ লেখকের রচনা এবং বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত গ্রন্থ। কাজেই এ বিষয়ে ইঁহাদের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা একটু কঠিন। তবু, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের রাজবংশের ও রাষ্ট্রের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের যে সংক্ষিপ্ত যুক্তি আমি উপস্থিত করিয়াছি তাহার পটভূমিকায় শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষকাহিনী একেবারে নিছক অনৈতিহাসিক কল্পনা, এখন মনে হয় না। কিছুটা সত্য কোথাও না থাকিলে য়ুয়ান-

চোয়াঙ্ বারবার একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন, এ কথা মনে করা একটু কঠিন। কোথাও সত্যের বীজ একটু সুপ্ত না থাকিলে শতাব্দীর লোকস্মৃতিই বা এই ইঙ্গিত ধরিয়া রাখিবে কেন?

শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত, এই যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল বাংলা ও আসামের সর্বত্র। কোন কোন রাজবংশ এই নবধর্ম ও সংস্কৃতির গোঁড়া পোষক ও ধারক হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, যেসব উচ্চকোটি শ্রেণীসমূহের মধ্যে এই ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছিল সেই সব শ্রেণীই তো রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক, কাজেই, তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও সহায়ক হইবে রাষ্ট্র, ইহা আর বিচিত্র কী? দ্বিতীয়ত, শশাঙ্কের অন্যতম প্রধান শত্রু হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ধর্মের অতি বড় পোষক; শত্রুর আশ্রিত ও লালিত ধর্ম নিজের ধর্ম না হইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ স্বাভাবিক। যুয়ান-চোয়াঙ্ শশাঙ্কের অপকীর্তি যেসব স্থানের সহিত যুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির অবস্থিতি বাংলার বাহিরে। অন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নয়, যথা বণিজ্যে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি। তৃতীয়ত, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু অবস্থা হয়তো ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজার খুব রুচিকর ছিল না। যুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয়, বাংলার পাঁচটি বিভাগেই বৌদ্ধ ধর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব, প্রসার ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল—শশাঙ্কের সময়ে এবং পরেও। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই সময় বৌদ্ধ-চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিরূপ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল, এরূপ ইঙ্গিত দুর্লভ নয়। তবে, শশাঙ্ক বৌদ্ধদের খুব কিছু অনিষ্ট যে করিতে পারেন নাই তাহা তো যুয়ান-চোয়াঙ্ ও ই-ৎসিঙের বিবরণীতেই সুস্পষ্ট। তাহা হইলে শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যুয়ান-চোয়াঙ্ এবং ৫০ বৎসর পরে ই-ৎসিঙ্ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এতটা সমৃদ্ধি দেখিতে পাইতেন না।

এই প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন হইল শশাঙ্ক-চরিত্রের কলঙ্কমুক্তির চেষ্টায় নয়; ইহার সামাজিক ইঙ্গিত উদ্ঘাটনের জন্য। শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধবিদ্বিষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার সামাজিক সমগ্রতা সম্বন্ধে সচেতনা ছিল না, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব ছিল, এবং সমাজের একটা অংশ, যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎই হউক, রাষ্ট্রের পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই। অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রের অবারিত কৃপা লাভ করিয়াছে।

ছয়

৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হইল। তাঁহার পর চীনা পুরাণের মতে অর্জুন বা অরুণাশ্ব নামে তীরভুক্তির (তিরহুত) শাসনকর্তা পুষ্যভূমি-সিংহাসন দখল করেন। অর্জুন বা অরুণাশ্ব মগধে হর্ষবর্ধনের নিকট প্রেরিত এক চীনা রাজদূত ওয়াঙ্-হিউয়েন-ৎসের সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গদের হত্যা করেন; রাজদূত নেপালে পলাইয়া গিয়া সেদেশ ও তিব্বত হইতে একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া অরুণাশ্বের রাজধানী (বোধ হয় মগধ) ধ্বংস করেন, এবং অরুণাশ্বকে বন্দী করিয়া চীন দেশে লইয়া যান। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সাহায্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া চীনা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এই ঘটনা

বোধ হয় ঘটিয়াছিল ৬৪৮-র গোড়ায় বা শেষে; কিন্তু চীনা রাজবৃত্ত-বর্ণিত এই কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। তবে, হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব-ভারতের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগে চীন-তিব্বত-কামরূপের লোলুপ দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তিব্বতরাজ স্রং-ৎসন-গ্যাম্পো (৬০০-৬৫০) ভারতীয় আবর্তে যোগদান করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের বহু স্থান জয় করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। মনে হয়, এই দাবি একেবারে নিরর্থক নয়। গ্যাম্পোর আমল হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল তো প্রায় দুইশত বৎসর তিব্বতের অধীন ছিল। কামরূপে ভাস্করবর্মার রাজবংশ এক ম্লেচ্ছরাজ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, এ তথ্যও সুবিদিত। এই ম্লেচ্ছরাজ গ্যাম্পো হওয়া বিচিত্র নয়। কামরূপের শালস্তম্ভ ও তদ্বংশীয় রাজারা যে ভোট-ব্রহ্ম নরগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ কী? গ্যাম্পো ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তনুত্যাগ করেন, এবং তাঁহার পৌত্র কি-লি-প-পু (৬৫০-৬৭৯) তিব্বতের অধিপতি হন; তিনিও দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, এবং মধ্য-ভারত পর্যন্ত তাঁহার রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ৭০২ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল ও মধ্য-ভারত তিব্বতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু এই বিদ্রোহ বোধ হয় রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। যাহা হউক, এইসব রাষ্ট্রীয় উপপ্লবের ঢেউ বাংলাদেশে আসিয়াও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিব্বত-রাষ্ট্রের ভীতিশঙ্কাময় প্রভাব বহুদিন ভারতবর্ষে, বিশেষত কাশ্মীর, কামরূপ, নেপাল এবং বাংলাদেশে সক্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং সম্ভবত শুধু সপ্তম শতকেই নয়, সমস্ত অষ্টম শতক এবং নবম শতকের কিয়দংশ জুড়িয়া বাংলাদেশকে বার বার তিব্বতী অভিযানে বিব্রত ও পর্যুদস্ত হইতে হইয়াছিল, এমন কি পাল-সম্রাট ধর্মপাল সিংহাসন আরোহণ করিবার পরও। নারায়ণপালের রাজত্বকালেও একাধিক তিব্বতী সামরিক অভিযান বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তিব্বতরাজ খ্রী-স্রং-দে-বৎ-সন (৭৫৫-৯৭ খ্রী) ভারতবর্ষ জয়ের দাবি করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মু-তিগ-বৎসন-পো-ও ভারতবর্ষে বিজয়বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর-একজন তিব্বতরাজ রল-প-চন (আ ৮১৭-৮৩৬) বাংলাদেশ জয় করিয়া একেবারে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া লদাকী-রাজবৃত্তে দাবি করা হইয়াছে। এইসব দাবি-দাওয়া কতখানি সত্য বলা কঠিন। তবে, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে নবম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একদিকে কামরূপ-বাংলা-বিহারকে এবং অন্যদিকে নেপাল ও কাশ্মীরকে বারবার তিব্বতী রাষ্ট্রীয় ও সামরিক পরাক্রমের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। বঙ্গ-তিব্বত ইতিহাসের এই বিরোধ-মিলনপর্ব আজও খুব সুবিদিত নয়; তথ্য স্বল্প, অস্পষ্ট এবং অসমর্থিত। তবে, এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, মাৎস্যন্যায়ের পর্বে একশত বৎসর ধরিয়া যে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে বাংলার আকাশ সমাচ্ছন্ন তাহার খানিকটা মেঘ ও ঝড় বহিয়া আসিয়াছে তিব্বতের হিমতুষারময় পার্বত্যদেশ হইতে।

হর্ষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মগধ রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। এই বিপর্যয়ের পর্বেই মগধে এক নবগুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রথম রাজা আদিত্যসেন (গুপ্ত); আদিত্যসেন এবং তাঁহার তিনজন বংশধর প্রত্যেকেই স্বাধীন মহারাজাধিরাজরূপে পর পর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন প্রায় অষ্টম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। বাংলাদেশের কোন অংশ এই রাজবংশের করায়ত্ত ছিল কিনা, বলা কঠিন; ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

অষ্টম শতকের প্রথম পাদের শেষে অথবা দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভেই শৈলবংশীয় কোন রাজা পৌণ্ড্রদেশ অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। শৈলবংশ হিমালয়-উপত্যকাবাসী; কিন্তু ইঁহাদের রাষ্ট্রীয় পরাক্রম বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া গুর্জর, কাশী এবং বিন্ধ্য অঞ্চল গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদের পৌণ্ড্রাধিকার বা ইঁহাদের বংশ ও রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বাংলাদেশে এইসব বৈদেশিক আক্রমণ ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল কনৌজরাজ যশোবর্মার মগধ এবং গৌড়াক্রমণ ও বিজয়ের ফলে। এই দুর্ধর্ষ বিজয়মদমত্ত রাজা ৭২৫ হইতে ৭৩৫-র মধ্যে কোন সময় মগধ জয় করেন। মগধ জয়ের পর তিনি গৌড়রাজকেও পরাজিত ও নিহত করেন। বাক্‌পতিরাজ তাঁহার সভাকবি ছিলেন, এবং তিনি এই মগধ ও গৌড় বিজয়কাহিনী লইয়া গৌড়বহ নামে একটি (অসমাপ্ত?) প্রাকৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে দেখা যায় মগধ ও গৌড় বিজয়ের পর যশোবর্মা সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হন এবং বঙ্গদেশও জয় করেন। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, প্রায় সমস্ত বাংলাদেশই তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। কিন্তু যশোবর্মা অধিকদিন তাঁহার এই বৈদ্যুতিক দিগ্বিজয় ভোগ করিতে পারেন নাই।

সম্ভবত ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরেই যশোবর্মা কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ললিতাদিত্য কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু রাজ্যবিজয়ের কথা কহ্লন্ রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কহ্লনের বিবৃতি পাঠ করিলে মনে হয়, গৌড় কিছুদিনের জন্য হইলেও কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় সম্বন্ধে কহ্লন্ একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া নিজের সৈন্যদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একা ঘুরিতে ঘুরিতে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। জয়ন্ত নামে এক ব্যক্তি তখন পুণ্ড্রবর্ধনের সামন্ত-রাজা। জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সঙ্গে জয়াপীড়ের প্রণয় সঞ্জাত হয় এবং তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পঞ্চগৌড়াধিপতিদের পরাজিত করেন, এবং জয়ন্তকে তাঁহাদের অধিরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কহ্লনের এই কাহিনীর ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন; তবে মনে হয়, এই সময় গৌড়দেশ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বহুধা বিভক্ত ছিল, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাই নিজ নিজ স্থানে রাষ্ট্রপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

আনুমানিক অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে গৌড়ে আর-একটি বৈপ্রান্তিক অভিযানের খবর পাওয়া যায়। নেপালের লিচ্ছবিরাজ দ্বিতীয় জয়দেবের একটি লিপিতে দেখিতেছি (৭৫৯ অথবা ৭৪৮), জয়দেবের শ্বশুর (কামরূপের?) ভগদত্তবংশীয় হর্ষ গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ এবং কোশলের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

এইসব বিচিত্র বৈপ্রান্তিক সমরাভিযান সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত; সুতরাং ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। তবে, সদ্যোক্ত সমস্ত সাক্ষ্যগুলি একত্র করিলে এই তথ্যই মনকে অধিকার করে যে, এই একশত বৎসর গৌড়রাষ্ট্রে সর্বময় প্রভু কেহ ছিলেন না, রাষ্ট্রের কোন সামগ্রিক ঐক্য ছিল না; এবং এই সমৃদ্ধ অথচ বহুধাবিভক্ত দেশ-পরিবার ভিন্-প্রদেশী রাজা ও রাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

গৌড়তন্ত্রের যখন এই অবস্থা বঙ্গরাষ্ট্রের অবস্থাও যে তখন ইহার চেয়ে দৃঢ়

ছিল তাহা বলা যায় না। তবে, বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র সপ্তম শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত খড়্গ- ও রাত -বংশের নায়কত্বে একটা মোটামুটি সামগ্রিক ঐক্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং কতকটা অনধিগম্যতাও বোধ হয় তাহার অন্যতম কারণ। বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক তিব্বতী লামা তারনাথের মতে খড়্গবংশের পতনের পর বঙ্গরাষ্ট্র চন্দ্রবংশীয় রাজাদের করায়ত্ত হয় এবং তাঁহারা বঙ্গে, এবং কখনো কখনো গৌড়ে, প্রায় অষ্টম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গোবিন্দ-চন্দ্র এবং ললিতচন্দ্র এই বংশের শেষ দুই রাজা, বোধ হয় ললিতচন্দ্রের আমলে বঙ্গ যশোবর্মার বিজয়ী সমরাভিযানের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই রাজা যিনিই হউন, গৌড়বহের কবি বাক্‌পতিরাজ তৎকালীন বঙ্গবীরদের খুবই সুখ্যাতি করিয়াছেন।

তারনাথের বিবৃতিমতে ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া অভূতপূর্ব নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়। গৌড়-বঙ্গ-সমতটে তখন আর কোন রাজার আধিপত্য নাই, রাষ্ট্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক স্ব স্ব গৃহে সকলেই রাজা। আজ একজন রাজা হইতেছেন, কাল তাঁহার ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুটাইতেছে। ইহার চেয়ে নৈরাজ্যের বাস্তব চিত্র আর কী হইতে পারে! প্রায় সমসাময়িক লিপি (যেমন, খালিমপুরলিপি) এবং কাব্যে (যেমন, রামচরিত) এই ধরনের নৈরাজ্যকে বলা হইয়াছে মাৎস্যন্যায়। বাহুবলই একমাত্র বল, সমস্ত দেশময় উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল শক্তির উন্মত্ততা—এই যখন হয় দেশের অবস্থা, প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে তাহাকেই বলে মাৎস্যন্যায়। বৎসরের পর বৎসর বাংলাদেশ এই মাৎস্যন্যায় দ্বারা পীড়িত হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত এই উৎপীড়ন যখন আর সহ্য হইল না তখন সমগ্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কেরা একত্র হইয়া নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে অধিরাজ বলিয়া নির্বাচন করিলেন—এই রাষ্ট্রনায়ক অধিরাজটির নাম গোপালদেব। কিন্তু এই বিপ্লবগর্ভ ইতিহাস পরবর্তী পর্বের।

এই মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব চলিয়াছিল একশত বৎসর ধরিয়া—সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার শশাঙ্কের পর হইতেই গৌড়তন্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ দিতেছেন; শশাঙ্কের পর যাঁহারা রাজা হইতেছেন তাহারা কেহই পুরা এক বৎসর রাজত্ব করিতে পারিতেছেন না! শিশু নামক এক হতভাগ্য রাজা একপক্ষকাল মাত্র রাজত্ব করিবার পরই নাকি নিহত হন। বারবার বৈপ্রাদেশিক রাষ্ট্র ও রাজাকর্তৃক পরাজিত পর্যুদস্ত হওয়ার কথা তো আগেই বলিয়াছি। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এই পর্বেই আবার পূর্ব-প্রত্যন্ত দেশে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষের খবরও পাওয়া যাইতেছে। এ সমস্ত বিবরণ একত্র করিলে মনে হয়, এই সুদীর্ঘ একশত বৎসর বাংলাদেশে—অন্তত গৌড়ে—কোথাও কোন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় ছিল না। খালিমপুরলিপিতে আছে, মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্যই প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজা নির্বাচন করিয়া-ছিল, কিন্তু এই প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্যন্যায়ের ফলে কতদূর উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহা এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও উল্লেখের ভিতর হইতে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না; কিন্তু অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কী?

এই মাৎস্যন্যায়ের সামাজিক ইঙ্গিত ধরিবার মতন সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চাতের ইতিহাসের ধারা হইতে মোটামুটি অনুমান

হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। প্রথমত, ব্যবসা-বাণিজ্যের পশ্চাতে রাষ্ট্রের যে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাবিন্যাস থাকা প্রয়োজন এই যুগে তাহার কোন সাক্ষ্যই পাওয়া যাইতেছে না; শান্তি ও শৃঙ্খলা যেখানে অব্যাহত নাই সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি কল্পনা করা কঠিন। ইহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সুবর্ণমুদ্রা এমন কি রৌপ্যমুদ্রারও অপ্রচলন হইতে; বস্তুত এই যুগের কোন প্রকার মূল্যবান ধাতব মুদ্রা বাংলাদেশের কোথাও এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আর-একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, তাম্রলিপ্তির ইতিহাসের মধ্যে। অষ্টম শতকের সাক্ষ্যেও তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাইতেছি, কিন্তু তাম্রলিপ্তির সেই সম্পদসমৃদ্ধির কথা আর কেহ বলিতেছেন না। অষ্টম শতকের শেষার্ধ হইতে উল্লেখও আর পাওয়া যাইতেছে না, এবং চতুর্দশ শতকের আগে সমগ্র বাংলাদেশের আর কোথাও বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের আর কোন বন্দরই গড়িয়া উঠিল না! দেশের অর্থসম্পদ ছিল না এ কথা সত্য নয়, কিন্তু এই অর্থসম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ নয় বলিয়াই যেন মনে হয়—ভূমিলব্ধ, কৃষিলব্ধ সম্পদ। পরবর্তী পালযুগে বাংলার সমাজ প্রধানত কৃষি- এবং গৃহশিল্প -নির্ভর হইয়া পড়িয়াছে।

রাষ্ট্রবিন্যাস ব্যাপারে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই; সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রায় অনুপস্থিত। তবে, এই যুগের রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে সামন্ততন্ত্র। সর্বময় অধিরাজ কেহ সাধারণত নাই, থাকিলেও তো মাৎস্যন্যায়ই হইতে পারিত না। সামন্তরাই এ যুগের নায়ক, এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান। মাৎস্যন্যায়ের শেষ পর্বে এইসব সামন্ত নায়কেরাই তো একত্র হইয়া গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ বলিতে খালিমপুরলিপি ও রামচরিত এইসব সামন্ত-নায়কদেরই বুঝাইতেছে; ইঁহারাই ছিলেন প্রকৃতির নায়ক।

ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা আগেকার রাজবৃত্ত-পর্বেই বলিয়াছি। বঙ্গের খড়্গ-বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, আর যেসব রাজা, রাজবংশ বা সামন্তদের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। এই একশত বৎসরের মধ্যে ভিনদেশী যেসব অভিযাত্রীরা বিরোধের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিব্বতী স্রং-ৎসন্-গাম্পো এবং তাঁহার পৌত্র কি-লি-পি-পু ছাড়া আর প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ই-ৎসিঙ ও সেংচি'র বিবরণী পড়িলে মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও খুব কম ছিল না। কিন্তু যে ধর্মের যেরূপ প্রভাবই থাকুক না কেন এই দুর্যোগে দুর্দিনে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই দেশব্যাপী অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার কিছু কিছু ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল নিশ্চয়ই। তাহার কিছু কিছু প্রমাণ-পরিচয় বোধ হয় বাংলার দুই-চারিটি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে পাল-সম্রাট ধর্মপালের আমলে বৌদ্ধ সোমপুর-মহাবিহার প্রতিষ্ঠার আগে সেই স্থানে যে একটি জৈন-বিহার ছিল, এ তথ্য পাহাড়পুরের পট্টোলীতেই (৪৭৮-৭৯) প্রমাণ; এই বিহারের ধ্বংসাবশেষের উপরই সোমপুর-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও দেখা যায়, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ধ্বংসস্তূপের উপর পরবর্তী পাল আমলের বিহার-মন্দির ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। মনে হয়, এইসব ধ্বংসকার্য এই নৈরাজ্য ও বৈদেশিক আক্রমণের যুগেই সম্ভব হইয়াছিল। তাহা

ছাড়া, বৌদ্ধধর্মের যে সমৃদ্ধ অবস্থাই য়ুয়ান-চোয়াঙ, ই-ৎসিঙ ও সেংচি বর্ণনা করিয়া থাকুন না, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কার ক্রমশ জয়ী ও সর্বব্যাপী হইতেছিল।

ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক হইতে একশত বৎসর ধরিয়া বাংলায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। যে সংস্কৃত ভাষা বাঙালী পণ্ডিতদের হাতে কোনপ্রকারে ভাবপ্রকাশের উপায় মাত্র ছিল (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের সংস্কৃত লিপিগুলিই তাহার প্রমাণ), সেই সংস্কৃত ভাষা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি, বিশেষভাবে পাল আমলের সূত্রপাত হইতেই, অপূর্ব ছন্দলালিত্যময় কাব্যময় ভাবপ্রকাশের বাহন হইয়া উঠিয়াছে (দ্রষ্টব্য, লোকনাথের লিপি, পাল আমলের লিপিগুলি)। বৌদ্ধধর্ম আরও বিস্তৃত হইয়াছে শুধু তাহাই নয়, বাংলার বহুস্থানে সুবৃহৎ মহাবিহার ইত্যাদিও স্থাপিত হইতেছে অষ্টম শতকের শেষপাদ হইতেই, এবং বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর সংখ্যা ও প্রসার ছিল সীমায়িত তাহাদের সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, বিষ্ণু, শৈব, শাক্ত এবং নানা মিশ্র দেবদেবীতে দেশ যেমন ছাইয়া গিয়াছে, তেমনই তাঁহাদের প্রভাবও বাড়িয়া গিয়াছে। পাল আমলের সূচনা হইতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই সমৃদ্ধি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধিও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই বিবর্তন সমস্তটাই সংঘটিত হইয়াছে মাৎস্যন্যায়ের একশত বৎসরের মধ্যে, এবং পাল আমলে দেশে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপিত হওয়ার পর তাহার সম্পূর্ণ রূপটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই একশত বৎসরের বৈদেশিক আক্রমণের দুর্যোগ-দুর্বিপাককে আশ্রয় করিয়াই উত্তর-ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্রমপ্রসারমান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা বাংলাদেশে আসিয়া বিস্তৃততর সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম যে পাল আমল হইতে উত্তরোত্তর তন্ত্রাশ্রিত হইয়াছে তাহার মূলে স্রং-ৎসন্-গ্যাম্পো এবং তাঁহারও পরবর্তী একাধিক তিব্বতী অভিযানের কোন প্রভাব নাই, খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের কোন প্রভাব নাই, এ কথাই বা কে বলিবে? একশত বৎসরের রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের কোন্ ফাঁকে কে বা কাহারা কোন্ সংস্কৃতির ধারায় কোন্ নূতন স্রোত বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তাহার হিসাব, এমন কি ইঙ্গিতও রাখে নাই। অথচ, বৃহৎ সামাজিক আবর্তন-বিবর্তন তো এই রকম দুর্যোগের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে।

সাত

মাৎস্যন্যায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল সেই গোপালদেব ছিলেন দয়িতবিষ্ণুর পুত্র এবং বপ্যটের পৌত্র। সমসাময়িক যুগসুলভ পৌরাণিক বংশমর্যাদায় নিজেদের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাল-অধিপতিদের কাহারও দেখা যায় না; পাল রাজাদের দলিলপত্রে অথবা রাজ-সভায় রচিত কোন গ্রন্থেই সে চেষ্টা নাই। প্রশ্ন, খালিমপুরলিপিতে উল্লিখিত প্রকৃতি-পুঞ্জ কাহারা? প্রকৃতির অভিধানগত অর্থ প্রজা। কিন্তু বাংলার তৎকালীন সমস্ত প্রজাবর্গ অর্থাৎ জনসাধারণ সম্মিলিত হইয়া গোপালকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, প্রকৃতি অর্থ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্মচারী,

এবং গোপালকে রাজা নির্বাচন তাঁহারাই করিয়াছিলেন। এই মতও সমর্থনযোগ্য নয়; কারণ, সেই নৈরাজ্যের যুগে বাংলাদেশে পরস্পর বিবদমান অনেকগুলি রাষ্ট্রের আধিপত্য। কোন্ রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীরা একত্র হইয়া এই নির্বাচন করিয়াছিলেন? সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মিলিত নির্বাচনও সেই নৈরাজ্যের যুগে সম্ভব ছিল না; তাহা হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামন্ত-নায়কদের সঙ্গে প্রজাবর্গের একটা প্রবল বিরোধের ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যাইত। বরং মনে হয়, এই সামন্ত-নায়কেরাই সকলে একত্রে এই নির্বাচনকার্যটি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সামন্ত-নায়কদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। দেশে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র যখন বিদ্যমান তখনই সামন্ত-নায়কদের সংখ্যা অনেক; নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ের পর্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র যখন দুর্বল হইয়া বা ভাঙিয়া পড়িয়াছে তখন ইঁহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াই গিয়াছে। ইঁহারাই গোপাল-নির্বাচনের নায়ক। যাহা হউক, এই শুভবুদ্ধির ফলে বাংলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক শত্রুর কাছে বারবার অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল। শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এই ধরনের শুভ সামাজিক বুদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত বিরল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোন সময় গোপালদেব পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের বিলয় ঘটে। সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন একটি রাজবংশের রাজত্ব খুব কম দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়। গোপালদেবের কুলগৌরব কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না, তেমন দাবিও কোথাও করা হয় নাই। হয়তো তিনিও একজন অন্যতম সামন্ত-নায়ক ছিলেন। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার হরিভদ্রকৃতটীকায় এবং খালিমপুরলিপির "ভদ্রাত্মজ" শব্দের ব্যাখ্যায় মোটামুটি চেষ্টাটা হইয়াছে পালবংশের রাজকীয় আভিজাত্য প্রমাণের দিকে। কিন্তু এই দুইটি পদের একটিও নিঃসংশয়ে তেমন কিছু ইঙ্গিত করে না। বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপিতে পালরাজাদের সূর্য-বংশীয় বলা হইয়াছে; সোঢ়ঢল কবির উদয়সুন্দরী কথায় পালরাজাদের সূর্যবংশীয়-মান্ধাতা-পরিবার-সম্ভূত বলা হইয়াছে; কিন্তু এইসব দাবির মূলে কোন সত্য আছে কিনা সন্দেহ। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে ধর্মপালকে বলা হইয়াছে "সমুদ্রকুলদীপ"; তারনাথও ধর্মপালের সঙ্গে সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন; ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও সমুদ্রের সঙ্গে ধর্মপালমহিষীর একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। সমুদ্রাশ্রয়ী ও জলনিধি-দুর্গনির্ভর গৌড়জনদের সঙ্গে অথবা সামুদ্রিক ও সমুদ্রাশ্রয়ী আদি-অস্ট্রেলীয়-পলিনেশীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলার পালবংশের কোন সম্বন্ধের ইঙ্গিত এইসব কাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকা অসম্ভব নয়। রামচরিতে এবং তারনাথের ইতিহাসে পালরাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি উপস্থিত করা হইয়াছে; এ দাবি কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিতে রাজা মাত্রেই ক্ষত্রিয়। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে পালবংশকে বলা হইয়াছে "দাসজীবিনঃ"; আবুল ফজল বলিয়াছেন "কায়স্থ"। যাহা হউক, উপরোক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে এ তথ্য পরিষ্কার যে, ইঁহারা উচ্চতর বংশ- বা বর্ণ -সম্ভূত নহেন। সমসাময়িক রাজবংশের ইতিহাসে এই ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

সন্ধ্যাকর-নন্দী সুস্পষ্ট বলিতেছেন, পালরাজাদের জনকভূমি বরেন্দ্রীদেশ। ভোজদেবের গোয়ালিওরলিপিতে পাল-রাজা (ধর্মপাল)কে বলা হইয়াছে বঙ্গপতি।

মনে হয়, ইঁহাদের আদিভূমি বরেন্দ্রভূমি, এবং সেখানেই গোপাল কোন সামন্ত-নায়ক ছিলেন; রাজা নির্বাচিত হইবার পর তিনি বঙ্গদেশেরও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং বোধ হয় গৌড়েরও। তারনাথ ঠিক এই কথাই বলিতেছেনঃ পুণ্ড্রবর্ধনের কোন ক্ষত্রিয়বংশে গোপালের জন্ম, কিন্তু পরে তিনি ভঙ্গালের (=বঙ্গল বা বঙ্গালের) রাজা নির্বাচিত হন।

গোপালদেব বরেন্দ্রী ও বঙ্গে রাজা হইয়াই দেশে যত যথেচ্ছপরায়ণ শক্তি বা সামন্ত-নায়কেরা ছিলেন তাঁহাদের দমন করেন, এবং বোধ হয় সমগ্র বাংলাদেশে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতের আধিপত্য লইয়া গুর্জরপ্রতীহার-রাষ্ট্রকূট-পালবংশে বংশপরম্পরাবিলম্বিত এক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল। এই যুগে উত্তর-ভারতাধিপত্যের প্রতীক ছিল কনৌজ-রাজলক্ষ্মী। গুর্জরপ্রতীহার-বংশের কেন্দ্রভূমি গুর্জরত্রাভূমি (রাজপুতনা); রাষ্ট্রকূটেরা চালুক্য বংশের অধিকার লইয়া দাক্ষিণাত্যের অধিপতি; আর, ধর্মপাল গোপালদেবের উত্তরাধিকার লইয়া সমগ্র বাংলাদেশের সর্বময় রাষ্ট্রনায়ক। ধর্মপালের সাম্রাজ্যলিপ্সা পশ্চিমমুখী, বৎসরাজের পূর্বমুখী। এই সময়ে উত্তর-ভারতে আর কোন পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ও রাজবংশ না থাকাতে এই রাজচক্রবর্তিত্বের সংঘর্ষ প্রথম আরম্ভ হইল ধর্মপাল (আ ৭৭০-৮১০) ও প্রতীহাররাজ বৎসরাজের (আ ৭৮৩-৮৪) মধ্যে। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন, এবং হয়তো আরও পর্যুদস্ত হইতেন, কিন্তু দক্ষিণ হইতে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব (আ ৭৮০-৭৯৫) একেবারে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঝড়ের মতো আসিয়া পড়িয়া প্রথমে বৎসরাজ এবং পরে ধর্মপাল উভয়কেই পরাজিত করিলেন। বৎসরাজ রাজপুতনায় পলাইয়া গেলেন; কিন্তু ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাওয়াতে ধর্মপালের বিশেষ কিছু অসুবিধা হইল না। তিনি অবাধে এবং নির্বিবাদে তাঁহার রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই ভোজ (বর্তমান বেরারের অংশ, প্রাচীন ভোজকটক), মৎস্য (আলওয়ার, এবং জয়পুর-ভরতপুরের অংশ), মদ্র (মধ্য-পঞ্জাব), কুরু (পূর্ব-পঞ্জাব) যদু (বোধ হয় পঞ্জাবের সিংহপুর, যদুর-রাষ্ট্র), যবন (বোধ হয় পঞ্জাব বা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন আরব খণ্ডরাষ্ট্র), অবন্তী (বর্তমান মালব), গন্ধার (পশ্চিম-পঞ্জাব) এবং কীর (পঞ্জাবের কাংড়া জেলা) রাজ্য জয় করেন। এই সাম্রাজ্য-বিস্তারচক্রেই তিনি কনৌজের অধিপতি ইন্দ্ররাজ (ইন্দ্রায়ুধ)কে পরাজিত করেন, এবং সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন চক্রায়ুধকে। কেদার (হিমালয়-সানুতে গাড়োয়াল জেলায়) এবং গোকর্ণের (নেপাল রাজ্যে বাগমতী নদীর তীরে) উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ধর্মপাল নেপালেরও অধিপতি ছিলেন। ধর্মপালের মুঙ্গেরলিপির একটি শ্লোকে হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া ধর্মপালের সমরাভিযানের একটু ইঙ্গিত আছে। হয়তো এই নেপালের অধিকার লইয়াই তিব্বতরাজ মু-তিগ্-ব্ৎসন-পো'র সঙ্গে ধর্মপালের সংঘর্ষ হইয়া থাকিবে, কারণ নেপাল এই সময়ে তিব্বতের অধীন ছিল। পঞ্চগৌড়াধিপ ধর্মপাল যে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা গুর্জররাষ্ট্রবাসী সোঢ্চল কবির উদয়সুন্দরীকথাতেও (একাদশ শতক) স্বীকৃত হইয়াছে। এইসব বিজিত রাজ্য ধর্মপালের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্মপাল ইহাদের তাঁহার গৌড়-বঙ্গ-মগধধৃত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত করেন নাই; স্ব স্ব রাজ্যে

ইহাদের রাজারা স্বাধীন নরপতি রূপেই স্বীকৃত হইতেন, কিন্তু ধর্মপালের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু ইতিমধ্যে বৎসরাজপুত্র দ্বিতীয় নাগভট প্রতীহার-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন এবং সিন্ধু, অন্ধ্র, কলিঙ্গ ও বিদর্ভ রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পূর্বপরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রথমেই কনৌজ আক্রান্ত হইল এবং চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্মপালের নিকট পলাইয়া গেলেন। নাগভট পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন. এমন সময় মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের নিকট এক তুমুল সংগ্রাম হইল। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন. কিন্তু এবারেও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ আসিয়া নাগভটকে একেবারে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়া দিলেন এবং এই পরাক্রান্ততর নরপতির কাছে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ দুইজনেই স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ আবার দাক্ষিণাত্যে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্মপাল আবার রাহুমুক্ত হইলেন। এই সাময়িক নতি স্বীকার সত্ত্বেও ধর্মপালের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উত্তর-ভারতে তাঁহার সর্বময় আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এমন কোন সাক্ষ্য উপস্থিত নাই। ধর্মপালপুত্র দেবপালের সিংহাসন আরোহণের কালে রাজ্যে কোথাও কোন যুদ্ধবিগ্রহ বা অশান্তি কিছু ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (আ ৮১০-৮৫০) রাজা হইয়া পিতৃ-আদর্শানুযায়ী পাল-সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটেরা তখনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; আরও নিকটে উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ) তখন নিজ নিজ রাজ-বংশের অধীনে পরাক্রান্ত রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে; দূরে দক্ষিণে পান্ড্যরাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া, উত্তর-ভারতাধিপত্যের আদর্শ তখনও উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সক্রিয়; মৌর্য ও গুপ্ত যুগের আদর্শ ছিল সর্বভারতীয় একরাট্ হওয়া; হর্ষবর্ধন-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় আদর্শ "সকলোত্তরপথনাথ" বা "সকলোত্তরপথস্বামী" হওয়া। এই আদর্শ অনুসরণে দেবপালের সহায়ক হইলেন পর পর তাঁহার দুই প্রধান মন্ত্রী ; ব্রাহ্মণ দর্ভপাণি ও তাঁহার পৌত্র কেদারমিশ্র। লিপিমালার সাক্ষ্য এই যে, এই দুই মন্ত্রীর সহায়তায় দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমস্ত উত্তর-ভারত হইতে কর ও প্রণতি আদায় করিয়াছিলেন। তাঁহার এক সমরনায়কের (খুল্লতাতভ্রাতা জয়পাল) সহায়তায় তিনি উৎকল-রাজাকে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজাকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়ী সমরাভিযান তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় প্রতীহাররাজ নাগভটের পৌত্র ভোজদেবের সঙ্গে দেবপালের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সংঘর্ষে ভোজদেব জয়ী হইতে পারেন নাই; কিছুদিন পর রাষ্ট্রকূটরাজের কাছেও তিনি পরাজিত ও পর্যুদস্ত হন। যে দ্রবিড়নাথকে দেবপাল পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ। যাহা হউক, এই তথ্য সুস্পষ্ট যে, দেবপাল ধর্মপালের সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং হিমালয়ের সানুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। দেবপালের সময়েই পালসাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আরব-দেশী বণিক ও পর্যটক সুলেমান এই সময় (৮৫১) কয়েকবারই ভারতবর্ষে

আসা-যাওয়া করিয়াছিলেন; তাঁহার বিবরণীতে দেখা যাইতেছে দেবপালের সৈন্যদলে ৫০,০০০ হাজার হাতি ছিল এবং সৈন্যদলের সাজসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ ধোওয়া, গুছানো ইত্যাদি কাজের জন্যই ১০ হইতে ১৫ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। ধর্ম-পালের সাম্রাজ্যে যেমন, দেবপালের সময়ও তেমনই বিজিত রাজ্যের রাজারা স্ব স্ব রাষ্ট্রে স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইতেন; কেন্দ্রীয় রাজা ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত তাঁহারা ছিলেন না, যদিও দেবপালের সর্বময় আধিপত্য তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইত।

দেবপালের মৃত্যুর (আ ৮৫০) কিছুদিন পর হইতেই পালবংশের সাম্রাজ্য-গৌরবসূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। প্রথম বিগ্রহপাল (আ ৮৫০-৮৫৪) হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের মধ্যে (আ ৯৬০-৯৮৮) এই সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ভাঙিয়া পড়িল। প্রথম বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র ছিলেন না; দেবপালের সমরনায়ক বাক্‌পাল বোধ হয় ছিলেন তাঁহার পিতা। দেবপালের পুত্র থাকা সত্ত্বেও এই উত্তরাধিকারপরিবর্তন কেন হইয়াছিল বলা কঠিন; হয়তো পালসাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা এবং অন্তর্বিরোধ ইহার অন্যতম কারণ। বিগ্রহপালের অন্য নাম শূরপাল; তিনি ধর্মনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয়; পুত্র নারায়ণ-পালকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া তিনি ধর্মাচরণোদ্দেশে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। প্রতীহাররাজ ভোজদেবও নারায়ণপালের রাজত্বকালেই প্রায় মগধ পর্যন্ত সমস্ত পাল-সাম্রাজ্য অধিকার করেন, এবং কলচুরীরাজ গুণাম্বোধিদেব এবং গুহিলোট-রাজ দ্বিতীয় গুহিল ভোজদেবের এই বিজয়ের অংশীদার হন। এই সময়েই বোধ হয় চাহলরাজ প্রথম কোকল্লদেব (৮৪০-৮৯০) বঙ্গরাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন। ভোজ-দেবের পুত্র প্রতীহার মহেন্দ্রপাল পাটনা এবং গয়া পার হইয়া একেবারে পুণ্ড্রবর্ধনের পাহাড়পুর অঞ্চল পর্যন্ত প্রতীহারসাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। মহেন্দ্রপাল বেশি দিন উত্তরবঙ্গ ও বিহার ভোগ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়; নারায়ণপাল তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে বঙ্গ-বিহার পুনরধিকার করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। প্রতীহারদের কতকটা খর্ব করা সম্ভব হইলেও রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের নিকট নারায়ণপালকে বোধ হয় কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দেবপালের সময়ে উৎকল ও কামরূপ দেবপালের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু নারায়ণপালের কালে রাজা মাধববর্মা শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে (আ ৮৫০) শৈলোদ্ভব-বংশ উড়িষ্যার এবং রাজা হর্জর ও পুত্র বনমালের নেতৃত্বে কামরূপ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে।

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল (আ ৯০৮-৯৪০) এবং পৌত্র দ্বিতীয় গোপালের (আ ৯৪০-৯৬০) রাজত্বকালে পালসাম্রাজ্য অন্তত মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় গোপালের পুত্র বিগ্রহপালের আমলে মগধের অধিকার বোধ হয় পালবংশের করচ্যুত হইয়া থাকিবে। প্রতীহার- ও রাষ্ট্রকূট -ভয় এই সময় আর ছিল না বটে, কিন্তু উত্তর-ভারতে চন্দেল্ল ও কলচুরী এই দুই রাজবংশ এই সময় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা এবং তাঁহার পুত্র ধঙ্গ (আ ৯৫৪-১০০০) গৌড়, অঙ্গ এবং রাঢ়দেশ ... সমরে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। কলচুরীরাজ প্রথম যুবরাজ (আ দশম শতকের প্রথম পাদ) গৌড়-কর্ণাট-লাট-কাশ্মীর-কলিঙ্গ দেশে সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণরাজ (আ দশম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ) বঙ্গালদেশ জয় করিয়াছিলেন। এইসব ক্রমান্বয় পরাজয় ও সামরিক

বিপর্যয় পালসাম্রাজ্যের সামরিক ও রাষ্ট্রীয় দৈন্য সূচিত করে সন্দেহ নাই। চন্দেল্ল ও কলচুরী লিপিমালায় গৌড়-অঙ্গ-রাঢ়া-বঙ্গালের পৃথক পৃথক উল্লেখ হইতেও মনে হয় বাংলাদেশেও পালরাজ্য বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অন্তত রাঢ়া অঞ্চল ও বঙ্গালদেশে যে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ বাণগড়লিপিতে বিদ্যমান।

এই সময় উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে কম্বোজ নামে এক রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। দিনাজপুর-স্তম্ভলিপিতে এবং ইর্দা-তাম্রপট্টে "কম্বোজকুলতিলক" কয়েকজন রাজার খবর পাওয়া যায়। উহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পশ্চিম-বঙ্গের অন্তত কিয়দংশ এবং বোধ হয় উত্তর-বঙ্গেরও কিয়দংশ কম্বোজকুলতিলকদের করায়ত্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল প্রিয়ঙ্গু নামক স্থানে; স্থানটি কোথায় এখনও জানা যায় নাই। এই কম্বোজদের আদিভূমি কোথায় তাহা লইয়াও বিতর্কের অন্ত নাই। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা উত্তরপশ্চিম-সীমান্তের কম্বোজদেশাগত; কেহ কেহ বলেন, কম্বোজ দেশ তিব্বতে; আবার কাহারও মতে পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের কম্বুজ এই কম্বোজদেশ। প্যাগ্-সাম্-জোন্-জাং নামক তিব্বতী গ্রন্থে লুসাই পর্বতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক কম্-পো-ৎস বা কম্বোজ দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কম্-পো-ৎস এবং বাণগড় ও ইর্দালিপির কম্বোজ এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গও এই সময় পালবংশের করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। হরিকেল অঞ্চলে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব (আ দশম শতকের প্রথমার্ধ) নামে এক বৌদ্ধ রাজার খবর পাওয়া যায় চট্টগ্রামের একটি তাম্র পট্টোলীতে। ইঁহার রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বর্ধমানপুর; বর্ধমানপুর শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বোধ হয় কোন স্থান হইবে।

ত্রিপুরা জেলার ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত নর্তেশ শিবের এক প্রস্তরমূর্তির পাদপীঠে লড়হচন্দ্র (আ দশম শতকের শেষার্ধ) নামে এক রাজার নাম [illegible] যায়। বোধ হয় ত্রিপুরা অঞ্চলেই তাঁহার আধিপত্য ছিল। লড়হচন্দ্র অন্তত ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (আ দশম শতকের তৃতীয় পাদ)।

ঢাকা জেলার রামপাল ও ধুল্লা, ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর এবং কেদারপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে এক চন্দ্র-রাজবংশের চারিজন রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে—পূর্ণচন্দ্র, পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র (পত্নী শ্রীকাঞ্চনা) এবং পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রয়ী। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র হরিকেলের অধিপতি ছিলেন, এবং চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ জেলা) ছিল তাঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র। লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল ইঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গোবিন্দচন্দ্র নামে আর-একজন চন্দ্রান্তনামা রাজার নাম জানা যায় চোলরাজ রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়লিপি হইতে (১০২১)। ইনি বঙ্গালদেশের অধিপতি ছিলেন। বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় রাজাদের এবং গোবিন্দচন্দ্রকে যথাক্রমে কলচুরীরাজ এবং অন্তত একজন চোলরাজের পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বঙ্গালদেশ জয় সুবিদিত।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের (আ ৯৮৮-১০৩৮) প্রথম ও প্রধান কীর্তি "অনধিকৃতবিলুপ্ত পিতৃরাজ্য" পুনরুদ্ধার। সমস্ত বঙ্গদেশই তো পাল-রাষ্ট্রের করচ্যুত হইয়া পাল-রাজ্য শুধু মগধাঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হইয়া গিয়াছিল।

মহীপাল হৃত উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ পুনরুদ্ধার করিলেন। উত্তর-বিহার বা অঙ্গ-দেশে মহীপালের লিপি পাওয়া গিয়াছে; মনে হয় মহীপাল এই দেশও পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। মগধ তো পিতৃ-অধিকারে ছিলই; সারনাথে একটি এবং নালন্দায় দুইটি মহীপালের রাজ্যাঙ্কের লিপি পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গও তিনি পুনরধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই; তবে রাজেন্দ্র-চোলের তিরুমলয়লিপির সাক্ষ্যে মনে হয়, পশ্চিম বঙ্গের অন্তত কিয়দংশে তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। এই সময় দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ-রাঢ় এবং বঙ্গালদেশ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন নরপতির অধীন। কেবল উত্তর-রাঢ় মহীপালের অধীন ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজত্বের শেষদিকে পুনর্বিজিত সাম্রাজ্যের কিয়দংশ আবার বোধ হয় মহীপালের করচ্যুত হইয়াছিল। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ্ নিয়ল্‌তিগিন যখন বারাণসী আক্রমণ করেন তখন বারাণসী কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেবের অধীন ছিল।

মহীপাল শুধু যে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাই নয়, বিলুপ্ত সাম্রাজ্যেরও অন্তত কিয়দংশের উদ্ধার সাধন করিয়া পালবংশের লুপ্ত গৌরবও খানিকটা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সারনাথে অনেক জীর্ণ বিহার ও মন্দিরের সংস্কার, নূতন বিহার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধগয়াবিহারের সংস্কার ইত্যাদি সাধনের ফলে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জগতেও বাংলাদেশ কতকটা তাহার স্থান ফিরিয়া পাইয়া-ছিল। সেই জন্যই বাঙালীর লোকস্মৃতি মহীপালের গানে মহীপালকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; লোকে আজও 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' ভুলে নাই। বাংলার কয়েকটি নগর ও দীর্ঘিকা এখনও এই নৃপতির স্মৃতি বহন করিতেছে। মহীপালের সমগ্র রাজ্যকাল কাটিয়াছিল সাম্রাজ্যের হৃত অংশ ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে। বোধ হয়, এই জন্যই এই সময়ে পঞ্জাবের যাহী রাজারা গজনীর সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যে সমবেত হিন্দুশক্তিসংঘ গড়িয়া তুলিতেছিলেন, মহীপাল তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। সমসাময়িক হিন্দু-শক্তিপুঞ্জ পশ্চিমদিকে সুলতান মামুদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় মহীপালের পক্ষে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার অন্তত আংশিকত সম্ভব হইয়াছিল। মহীপাল বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই যে, একাধিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই উত্তর-ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ একে একে পশ্চিমাগত মুসলিম অভিযাত্রী কর্তৃক পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইতেছিল। ভারতের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শের স্থলে স্থানীয় প্রাদেশিক সচেতনতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা দিতেছিল; অষ্টম শতকের সূচনা হইতেই ভারতের সমুদ্র বৈদেশিক বাণিজ্যে আরব ও পারসিক বণিকেরা বৃহৎ অংশীদার হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ক্রমশ উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণ-ভারতে হস্তান্তরিত হইতেছিল; অষ্টম শতকের সূচনা হইতেই এইসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ সক্রিয় হইতে আরম্ভ করে, এবং ভারতের সমাজে ও রাষ্ট্রে ইহাদের অনিবার্য ফলের সূচনা দেখা দেয়। মহীপাল কিংবা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোন রাষ্ট্রই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রেরণা মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়িয়াছিল সেই আদর্শ সক্রিয় থাকিলে বৈদেশিক অভিযাত্রী

প্রতিরোধ অনেকটা সহজ হইত, কিন্তু এই যুগে আর তাহা ছিল না। তবু পঞ্জাবের যাহী রাজারা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের সমগ্র রাষ্ট্রশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটা প্রতিরোধ রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাসে ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের ইহাই ছিল ঐতিহাসিক কর্তব্য। মহীপাল এই সামগ্রিক ঐক্যাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নাই এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেন নাই; স্থানীয় প্রান্তিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শই তাঁহার কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। তবে, এ সম্বন্ধে শুধু মহীপালকেই দায়ী করা চলে না, দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট ও চোলেরা এবং উত্তর-ভারতের দুই-একটি রাষ্ট্রও সমান দায়ী। রাষ্ট্রকূটেরা তো এইসব বৈদেশিক অভিযাত্রীদের সহায়তাই করিয়াছিলেন। বস্তুত, অষ্টম শতক হইতেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্থানীয় প্রান্তিক আত্মকর্তৃত্বের যে আদর্শ বলবত্তর হইতেছিল সেই আদর্শই ইহার জন্য দায়ী।

মহীপাল গৌড়তন্ত্রের, তথা পালসাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারে অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পুনরুদ্ধার স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। মহীপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই রাজ্য ও রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ভাঙন রোধের চেষ্টা যে কিছু হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই; হওয়া সম্ভব ছিল না। স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাহির ও ভিতর হইতে ক্রমাগতই পালরাজ্য ও রাষ্ট্রকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং সেই আঘাতে রাজ্য ও রাষ্ট্র ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ অন্যান্য সামাজিক কারণও ছিল।

মহীপালের পুত্র জয়পালের (আ ১০৩৮-১০৫৫) রাজত্বকালে বঙ্গ ও গৌড় কলচুরীরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের হস্তে পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে, কিন্তু তিব্বতী সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, এই যুদ্ধ জয়-পরাজয়ে মীমাংসিত হয় নাই। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের (অতীশ) মধ্যস্থতায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সন্ধি-শান্তির প্রতিষ্ঠায় এই যুদ্ধ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু জয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আ ১০৫৫-৭০) কর্ণ বোধ হয় দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং অন্তত বীরভূম পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই দ্বিতীয় আক্রমণের পরিণতিই বোধ হয় তৃতীয় বিগ্রহপাল এবং কর্ণ-কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ। বঙ্গে এই সময় চন্দ্র বা বর্মারা রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং কর্ণ প্রথমবারের আক্রমণে ইঁহাদেরই একজন রাজাকে পরাজিত করিয়া থাকিবেন।

লক্ষ্মীকর্ণের হাত হইতে উদ্ধার সম্ভব হইলেও পশ্চিম বঙ্গ বোধ হয় বেশি-দিন আর পালসাম্রাজ্যভুক্ত থাকে নাই। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামে এক সামন্ত-রাজ এই সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে স্বাধীন মহারাজাধিরাজরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইঁহার কেন্দ্র ছিল বর্ধমান জেলার ঢেক্করী নামক স্থানে। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে এই সময়ে পট্টিকেরা রাজ্য গড়িয়া উঠে; এই রাজ্যের সঙ্গে সমসাময়িক পগানের (ব্রহ্মদেশ) অনিরুদ্ধের রাজবংশের রাষ্ট্রীয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধের বিবরণ জানা যায়। দ্বাদশ শতকে রণবঙ্কমল্ল নামে অন্তত একজন নরপতির নামও আমরা জানি। পূর্ব-বঙ্গের অন্যান্য স্থানে একাদশ শতকের শেষার্ধে এবং দ্বাদশ শতকে চন্দ্রবংশ এবং পরে বর্মণবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই পূর্ব-বঙ্গ পুনরুদ্ধার পালরাজারা আর করিতেই পারেন নাই।

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আ ১০৫৫-১০৭০) বাংলাদেশে আর-এক নূতন বহিঃশত্রুর আক্রমণ দেখা দিল। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত-রচয়িতা বিল্হন্ বলিতেছেন, কর্ণাটের চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের জীবিতকালেই পুত্র (ষষ্ঠ) বিক্রমাদিত্য এক বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন (১০৬৮ আ)। চালুক্যলিপিতেও এই দিগ্‌বিজয়ের কিছু আভাস আছে, এবং বাংলায় একাধিক চালুক্যরাজ কর্তৃক একাধিক সমরাভিযানের উল্লেখ আছে। এইসব কর্ণাটদেশীয় সমরাভিযানকে আশ্রয় করিয়াই কিছু কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামন্তপরিবার বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং সৈন্যাভিযান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁহারা এখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। বিহার ও বাংলাদেশের সেন-রাজবংশ এবং (পূর্ব)-বঙ্গের বর্মণ রাজবংশ এইসব দক্ষিণী কর্ণাটী-পরিবার হইতেই উদ্ভূত বলিয়া ইতিহাসে বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার উপর আর-একটি ভিন্-প্রদেশী আক্রমণের সংবাদ জানা যায়। উড়িষ্যার রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড়, রাঢ়া এবং বঙ্গে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। আর-এক উড়িষ্যারাজ উদ্যোতকেশরী গৌড়সৈন্যবিজয়ের দাবি জানাইতেছেন। এই সব ভিন্-প্রদেশী আক্রমণের ফলে ক্ষীয়মান পালরাজ্য প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। মগধেও পাল-রাজাদের মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। জয়পালের সময় হইতেই পরিতোষ এবং তৎপুত্র শূদ্রক নামে দুই সামন্ত গয়া অঞ্চলে প্রধান হইয়া উঠিতেছিলেন। বর্মণ রাজবংশ পূর্ব-বাংলায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিল; কামরূপরাজ রত্নপাল গৌড়রাজকে উদ্ধত অস্বীকারে অপমানিত করিতে এতটুকু ভীতিবোধ করিলেন না।

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র : দ্বিতীয় মহীপাল (আ ১০৭০-১০৭৫), দ্বিতীয় শূরপাল (আ ১০৭৫-৭৭) এবং রামপাল (আ ১০৭০-১১২০)। মহীপাল যখন রাজা হইলেন তখন ঘরে-বাহিরে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নিজ পরিবারের মধ্যে নানা চক্রান্ত, সামন্তরা বিদ্রোহোন্মুখ। ভ্রাতা রামপালকে পারিবারিক চক্রান্তের মূলে ভাবিয়া মহীপাল শূরপাল ও রামপাল দুই ভ্রাতাকেই কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্ত এইখানেই বিপদের শান্তি হইল না। বিদ্রোহী সামন্তদের দমনে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন, অথচ তাঁহার সৈন্যদল এবং যুদ্ধোপকরণ যথেষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না। বরেন্দ্রীর কৈবর্ত-সামন্তদের বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তিনি যুদ্ধে পর্যুদস্ত এবং নিহত হইলেন; কৈবর্ত-নায়ক দিব্য (দিব্বোক, দিবোক) বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করিলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-কাব্যে এই বিদ্রোহ, মহীপাল হত্যা এবং রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রীর পুনরুদ্ধার ইত্যাদির সুবিস্তৃত ইতিহাস কাব্যকৃত করা হইয়াছে। সন্ধ্যাকর রামপালপুত্র মদনপালের অনুগ্রহভাজন; মহীপালের উপর তিনি যে খুব শ্রদ্ধিত ছিলেন মনে হয় না। তিনি মহীপালকে নিষ্ঠুর এবং দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহীপাল লোকশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া জনপ্রিয় রামপালকে চক্রান্তকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, অথচ রামপাল যথার্থত তাহা ছিলেন না। মহীপালের প্রকৃতি, চরিত্র এবং রাষ্ট্রবুদ্ধি সম্বন্ধে সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য কতখানি প্রামাণিক বলা কঠিন। তবে তিনি যে দুর্বল এবং রাষ্ট্রবুদ্ধিহীন ছিলেন, এ সম্বন্ধে বোধ হয় সংশয় নাই। ঘটনাচক্রের পরিণতিই তাহার প্রমাণ।

দিব্য সম্বন্ধেও সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য কতটুকু গ্রাহ্য, বলা কঠিন। মনে হয়, দিব্য পালরাজাদের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, এবং পালরাষ্ট্রের দুর্বলতায় এবং রাজ-পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ লইয়া তিনি বিদ্রোহপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে কোন প্রজাবিদ্রোহের নায়কত্ব করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ উপস্থিত নাই; সন্ধ্যাকর তো দিব্যকে 'কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ' বলিয়াছেন, এই বিদ্রোহকে 'অনীক ধর্ম-বিপ্লব' বলিয়াছেন (অনীক অন্যায়, অপবিত্র)। যাহাই হউক, বরেন্দ্রীর এই কৈবর্ত-বিদ্রোহে মহীপাল নিহত হইলেন, এবং দিব্য বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করিলেন।

বরেন্দ্রাধিপ দিব্যকে যুদ্ধে বর্মণ-বংশীয় বঙ্গরাজ জাতবর্মার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কৈবর্ত-রাজ্যের কিছু ক্ষতি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। শূরপাল বেশিদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই; রামপাল রাজা হইলে দিব্যর রাজত্ব-কালেই বরেন্দ্রী একাধিকবার রামপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। দিব্যর পুত্র রুদোকের আমলেও রামপাল কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রুদোকের ভ্রাতা ভীম বরেন্দ্রীর অধিপতি হওয়ার পর সুপ্রতিষ্ঠিত কৈবর্তশক্তি পরাক্রান্ততর আকারে দেখা দিল। ভীম জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন; তাঁহার স্মৃতি আজও জীবিত। রামপাল শঙ্কিত হইয়া প্রতিবেশী রাজাদের ও পালরাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামন্তদের দুয়ারে দুয়ারে তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিলেন। অপরিমিত ভূমি ও অজস্র অর্থ দান করিয়া এই সাহায্য ক্রয় করিতে হইল। রামচরিতে এইসব রাজা ও সামন্তদের যে তালিকা দেওয়া আছে তাহা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে তদানীন্তন বাংলা ও বিহারের রাষ্ট্রতন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা হইতে আরও বুঝিতে পারা যায়, অঙ্গ বা উত্তর-বিহার এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া রামপালের রাজত্বের বিস্তার আর কোথাও ছিল না।

অবশ্য রামপালের এই সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে ক্ষোণী-নায়ক ভীমের পক্ষে আঁটিয়া উঠা সম্ভব ছিল না। গঙ্গার উত্তর-তীরে দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হয়, এবং ভীম জীবিতাবস্থায় বন্দী হন। ভীমের অগণিত ধনরত্নপূর্ণ রাজকোষ রামপালের সেনাদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। ভীম সপরিবারে রামপালহস্তে নিহত হন। বরেন্দ্রী এবং কৈবর্ত-রাজকোষ রামপালের করায়ত্ত হইল, করভারপীড়িত বরেন্দ্রীতে সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসিল। রামাবতী নগরে বরেন্দ্রীর রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

বরেন্দ্রী উদ্ধারের পর রামপাল হৃতরাজ্যের অন্যান্য অংশ উদ্ধারে যত্নবান হইলেন। (পূর্ব)-বঙ্গের এক বর্মণরাজ, বোধ হয় হরিবর্মা, নিজ স্বার্থে রাম-পালের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। রামপালের এক সামন্ত কামরূপ জয় করিয়া রামপালের প্রিয়পাত্র হইলেন। রাঢ়দেশের সামন্তদের সহায়তায় উড়িষ্যারও অন্তত কিয়দংশ জয় তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল; অবশ্য তাহা করিতে গিয়া কলিঙ্গের চোড়গঙ্গরাজাদের সঙ্গে অন্তত পরোক্ষে কিছু সংঘর্ষে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। বোধ হয় উৎকলে-কলিঙ্গে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে গিয়াই রামপালকে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের (আ ১০৭০-১১১৮) আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়।

এই সময় কর্ণাটের লুব্ধদৃষ্টি বরেন্দ্রীর উপর পতিত হয়। অবশ্য এই কর্ণাটেরা বোধ হয় সুদূর দক্ষিণের কর্ণাটবাসী নয়। ইঁহারা সম্ভবত পশ্চিম-বঙ্গ ও

মিথিলার দুই কর্ণাট রাজবংশ। কর্ণাটাগত এক সেনবংশ ইতিমধ্যেই পশ্চিম-বঙ্গে, এবং আর-এক সেনবংশ মিথিলায় নিজেদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আপাতত মিথিলার সেনবংশীয় রাজা নান্যদেবের (আ ১০৯৭) সঙ্গে রামপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যাহা হউক, মিথিলা (উত্তর-বিহার) যে রামপালের করচ্যুত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

কাশী-কান্যকুব্জাধিপতি পরাক্রান্ত গাহড়বাল রাজাদের সঙ্গেও রামপালকে যুঝিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র মদনপালের সঙ্গে গৌড়-সৈন্যের সংগ্রামের ইঙ্গিত গাহড়বাললিপিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মদনপাল নিশ্চিত জয়লাভ করিয়াছিলেন, এমন বলা যায় না। বরং রামচরিতে এমন ইঙ্গিত আছে যে, বরেন্দ্রী মগধদেশের বিক্রম সংযত করিয়া রাখিয়াছিল।

রামপাল বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি কৃতী পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। নির্বাসনে জীবন আরম্ভ করিয়া বিদ্রোহীদের হাত হইতে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার, বাংলার অধিকাংশের পুনরুদ্ধার, উড়িষ্যা ও কামরূপে আধিপত্য বিস্তার, এবং একাধিক বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও পাল-রাজ্য ও রাষ্ট্রের সীমা এবং আধিপত্য মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখা, তাঁহার রাষ্ট্রবুদ্ধি, দৃঢ়চরিত্র এবং অদম্য শৌর্যবীর্যের পরিচায়ক।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা সামাজিক ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তন না হইলে শুধু কোন রাজা বা সম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ রাজ্য বা রাষ্ট্রকে পরিণামবিনাশের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। মহীপালের মতন সম্রাট পারেন নাই, রামপালও পারিলেন না। যে বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সংকীর্ণ আত্মসচেতনতা ভারতীয় রাষ্ট্রবুদ্ধিকে এই যুগে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল, মহীপাল বা রামপাল কেহই তাহা দূর করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে তখন বৈদেশিক আধিপত্যের ঘন কৃষ্ণমেঘ ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশ ক্রমশ ঢাকিয়া ফেলিতেছিল; মুসলমান অধিকারের সীমা ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতেছিল!

পালসাম্রাজ্যের এই বিষাদান্ত পরিণতির কথা বলিবার আগে বঙ্গের বর্মণ-বংশের কথা একটু বলিয়া লইতে হয়। যাদববংশীয় এই বর্মণ রাজারা কলিঙ্গদেশের সিংহপুর নামক স্থান হইতে একাদশ শতকের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পাদে কোন সময় পূর্ব-বঙ্গে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন। বজ্রবর্মাপুত্র জাতবর্মা এই বংশের প্রথম রাজা। জাতবর্মা কলচুরীরাজ কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন, এবং অঙ্গ, কামরূপ এবং বরেন্দ্রী-নায়ক দিব্যকে পরাজিত করেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, জাতবর্মা তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। জাতবর্মার পশ্চাতে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব এবং কর্ণের সহায়তা ছিল, এ সন্দেহ অমূলক নয়। জাতবর্মার পর পুত্র মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা রাজা হন; বিক্রমপুর ছিল তাঁহার রাজধানী, এবং তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন ভট্ট ভবদেব। হরিবর্মার পর ভ্রাতা শ্যামলবর্মা বঙ্গের রাজা হন; তাঁহার রাষ্ট্রীয় কোন কীর্তিই জানা নাই, তবে তিনি বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণদের লোকস্মৃতিতে আজও বাঁচিয়া আছেন। কুলজী-গ্রন্থের মতে শ্যামলবর্মার আমলেই বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমন। তাঁহার

পুত্র ভোজবর্মা এই বংশের শেষ রাজা; তাঁহার রাজত্বকালে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই পূর্ববঙ্গের বর্মণ-রাজ্য সেনরাজবংশের করতলগত হয়।

রামপালের চারি পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র বিত্তপাল ও রাজ্যপালের সিংহাসন আরোহণের সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই। অন্য দুই পুত্র কুমারপাল ও মদনপালের মধ্যে কুমারপাল (আ ১১২০-২৫) রাজা হন, তাঁহার পর কুমারপাল-পুত্র তৃতীয় গোপাল (আ ১১২৫-১১৪০) এবং গোপালের পর রামপালের অন্যতম পুত্র মদনপাল (আ ১১৪০-১১৫৫) রাজা হইয়াছিলেন। রামচরিত-কাব্যপাঠে মনে হয়, সিংহাসনারোহণের এই ক্রম সম্বন্ধে একটা রহস্য কোথাও ছিল।

যাহা হউক, এই তিনজনের রাজত্বকালেই চারিশত বৎসরের সযত্নলালিত পালরাজ্য ও -রাষ্ট্র ধীরে ধীরে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। ধর্মপাল-দেবপাল যে সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, মহীপাল যাহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, রামপাল যাহাকে শেষবারের জন্য আত্মপ্রত্যয় এবং প্রতিষ্ঠা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, ইঁহারা আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

কুমারপালের নিজের প্রিয় সেনাপতি বৈদ্যদেব কামরূপে এক বিদ্রোহ দমন করিয়া নিজেই এক স্বাধীন নরপতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। পূর্ববঙ্গে ভোজবর্মার নেতৃত্বে বর্মণরা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইল। দক্ষিণ হইতে কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজারা আরম্য (=বর্তমান আরামবাগ) দুর্গ জয় করিয়া মেদিনীপুরের (মিধুনপুর) ভিতর দিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত ঠেলিয়া চলি [illegible] আসিলেন; পাল ও গঙ্গদের সংগ্রামের এবং দক্ষিণের কল্যাণ-চালুক্যদের [illegible] সুযোগ লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে কর্ণাটাগত সেন-রাজবংশ মস্তক উত্তোলন করিল। এই সেন-রাজবংশ ইতিপূর্বেই পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এইবার তাহারা একেবারে গৌড়ের হৃদয়দেশ আক্রমণ করিল। কালিন্দী-নদীর তীরে, বোধ হয় মদনপালের রাজধানীর নিকটেই এক তুমুল যুদ্ধ হইল; এই যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত, কারণ রামচরিতে যেমন মদনপালের জয় দাবি করা হইয়াছে, তেমনই দেওপাড়ালিপিতে সেনরাজ বিজয়সেনের পক্ষ হইতেও জয়ের দাবি জানানো হইয়াছে।

অন্যদিকে দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গাহড়বালরাজারাও এই সময় বাংলাদেশে আবার নূতন করিয়া সমরাভিযানে উদ্যত হইলেন। ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই পাটনা অঞ্চল তাঁহাদের অধিকারে চলিয়া গেল; ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে গেল মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের অঞ্চল। মদনপালের রাজত্বের অষ্টম বৎসর পর্যন্ত বরেন্দ্রীর অন্তত কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। এইটুকু ছাড়া বাংলাদেশের আর কোন অংশই তাঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া মনে হয় না; তবে বিহারের মধ্য ও পূর্বাঞ্চল তখনও পালরাজ্যভুক্ত ছিল। মদনপালের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে তাহাও আর রহিল না, এবং পালরাজ্যের শেষচিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

মদনপালই পালবংশের শেষ রাজা। তবে তাঁহার পরও গোবিন্দচন্দ্র (আ ১১৫৫-১১৬২) নামে একজন গৌড়েশ্বরের নাম পাওয়া যায়। লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, গয়া জেলাই ছিল তাঁহার রাজ্যকেন্দ্র; গৌড়রাজ্যের কিয়দংশও হয়তো এক সময় তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বাংলার ইতিহাসে পালবংশের আধিপত্যের চারিশত বৎসর নানাদিক হইতে

গভীর ও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বর্তমান বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন হইয়াছে এই যুগে; এই যুগই প্রথম বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয়ের যুগ।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় খ্রীষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সমস্ত ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য। মাঝে মাঝে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন তাহা হইয়াছে, তখনই ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিদেশীর নিকট লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে, এবং প্রচুর মূল্য দিয়া আবার সেই পুরাতন আদর্শকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে। মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশ এই আদর্শের প্রতীক। সপ্তম শতকেও এই আদর্শ সক্রিয়, কিন্তু তখন সীমা সংকীর্ণতর হইয়া গিয়াছে, সর্বভারত হইতে সকল-উত্তরাপথে সেই আদর্শ নামিয়া আসিয়াছে; অষ্টম শতকেও এই আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতীহার ও পালবংশের সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ, এবং তাহাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটবংশ সদাজাগ্রত। অন্যদিকে ধীরে ধীরে অন্য একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল; এই আদর্শ স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই আদর্শ মাথা তুলিতে আরম্ভ করে; কিন্তু ধর্মপাল-দেবপাল-বৎসরাজ-নাগভটের সময়েও উত্তরাপথস্বামিত্বের আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতেই স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শের জয়জয়কার। এই সময় হইতেই যেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশখণ্ডের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এক-একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে এবং এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে সচেষ্ট হইয়া উঠে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মোটামুটি অষ্টম শতক বা তাহার কিছু পর হইতে এক-একটি বৃহত্তর জনপদরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মূলগত এক কিন্তু এক-একটি বিশিষ্ট লিপি বা অক্ষর-রীতি, ভাষা এবং শিল্পাদর্শ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তাহাদের এক-একটি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের, বিশেষত উত্তর-ভারতের, মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যার প্রত্যেকটি প্রাদেশিক লিপি ও ভাষার ভ্রূণ ও জন্মাবস্থা মোটামুটি এই চারিশত বৎসরের মধ্যে। বাংলা লিপি ও ভাষার গোড়া খুঁজিতে হইলে এই চারিশত বৎসরের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। বাংলার ভৌগোলিক সত্তাও এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এক-একটি স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সত্তাও গড়িয়া উঠে—এই যুগেই। বঙ্গ-বিহার এই রাষ্ট্রীয় সত্তার সূচনা সপ্তম শতকেই দেখা দিয়াছিল, এবং তাহার প্রতীক ছিলেন শশাঙ্ক। কিন্তু পরবর্তী একশত বৎসরের মাৎস্যন্যায়ে এই রাষ্ট্রীয় সত্তাই আহত হইয়াছিল সকলের চেয়ে বেশি। পাল-রাজারা আবার তাহা জাগাইয়া তুলিলেন; বাঙালী নিজস্ব স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভ করিল, এবং চারিশত বৎসর ধরিয়া তাহা ভোগ করিল। শুধু তাহাই নয়, ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপালের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৃপায় এই রাষ্ট্র একটা আন্তর্ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বাদও কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিল। অধিকন্তু, এই পালরাজাদের পোষকতা ও আনুকূল্যে, নালন্দা-বিক্রমশিলা-ওদন্ড-পুরী-সারনাথের বৌদ্ধ সংঘ ও মহাবিহারগুলিকে আশ্রয় করিয়া আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতেও বাংলাদেশ একটি গৌরবময় স্থান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই সকলের সম্মিলিত ফলে বাংলায় এই যুগেই সামগ্রিক ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠে—ইহাই

বাঙালীর স্বদেশ ও স্বাজাত্য -বোধের মূলে, এবং ইহাই বাঙালীর একজাতীয়ত্বের ভিত্তি। পালযুগের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

এই দানের মূলে পালরাজাদের কৃতিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। পালরাজারা ছিলেন বাঙালী, বরেন্দ্রী তাঁহাদের পিতৃভূমি। বংশপ্রতিষ্ঠায়ও ইঁহারা পুরাপুরি বাঙালী। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের বংশাভিজাত্যের দাবি ইঁহাদের নাই। তাঁহারা উচ্চতর তিন বর্ণের কেহ নহেন এই সংস্কার লোকস্মৃতিতে ষোড়শ শতকেও বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। তারনাথ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকারই বোধ হয় যথার্থ ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটি রাখিয়াছেন। তারনাথ বলিতেছেন, জনৈক বৃক্ষদেবতার ঔরসে ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে গোপালের জন্ম; কাহিনীটি টটেম-স্মৃতি-জড়িত বলিয়া সন্দেহ করিলে অন্যায় বা অনৈতিহাসিক কিছু করা হয় না। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-বহির্ভূত সমাজের সংস্কার এই গল্পের মধ্যে বিদ্যমান। গোপাল এই সমাজ, সংস্কার ও সংস্কৃতির লোক। অথচ এই পালরাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, স্মৃতি, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষাক, চতুর্বর্ণের রক্ষক ও সংস্থাপক; ধর্মে ইঁহারা বৌদ্ধ, পরম সুগত; ইঁহারা মহাযানী বৌদ্ধসংঘ ও সম্প্রদায়ের পরম অনুরাগী পোষক; অথচ বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মও ইঁহাদের আনুকূল্য ও পোষকতা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মে ব্রাহ্মণেরা নিয়োজিত হইতেন, মন্ত্রী এবং সেনাপতিও হইতেন, আবার কৈবর্তরাও স্থান পাইতেন না, এমন নয়। এইভাবে পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করিয়া বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক সমন্বয় সম্ভব হইয়াছিল।

গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত বাংলার বুকের উপর দ্রুত প্রবাহিত হইতেছিল, এবং মোটামুটি সপ্তম শতকে যে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল—শশাঙ্ক তো ইহারই প্রতীক—সেই স্রোত ও সংঘর্ষ সমন্বিত হইল এই চারিশত বৎসর ধরিয়া পালরাজাদের বৃহৎ ছত্রছায়ায়। এই আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বাহিরে যে বৃহৎ আর্যেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি দেশের অধিকাংশ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল তাহাও অন্তত কিছুটা যে পাল-রাজচ্ছত্রের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুরের অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং সমসাময়িক ধর্মমত ও সম্প্রদায়গুলিতে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেই এই সময়ই আর্যেতর দেবদেবী, আচার ও সংস্কার ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, এবং কিছু কিছু স্বীকৃতিও লাভ করে। এই যুগের দেবদেবীর মূর্তিতত্ত্ব তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই সুবৃহৎ সমন্বয় অবশ্যই সংগঠিত হইয়াছিল আর্য ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কৃতির আদর্শানুযায়ী; এই আর্য বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আশ্রয় করিয়াই বাংলাদেশ উত্তরোত্তর উত্তর-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সচেতন যোগসাধন আরম্ভ হইয়াছিল গুপ্ত আমলে, কিন্তু পূর্ণরূপে গ্রহণ করিল পাল আমলে, এবং বাংলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল আর্যেতর ধর্ম এবং মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত হইয়া। এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং ইহা পাল আমলের শ্রেষ্ঠ দান।

কিন্তু জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সমন্বয় ও সমীকরণ পাল যুগের রাষ্ট্রীয়

সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ শুধু যে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল তাহা নয়, সাম্রাজ্যিক গুপ্ত আমলের পর হইতে অন্তর্‌রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এই আদর্শ কার্যকরী হইল। ইহা হইতেই সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, এবং মোটামুটি ষষ্ঠ শতক হইতে বাংলাদেশেও মহারাজাধিরাজের বৃহত্তর রাজ্যের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তনায়ক ও সামন্তরাজার রাজ্যবিস্তার। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ইঁহারা প্রায় স্বাধীন নরপতির মতন ব্যবহার করিতেন; শুধু মৌখিকত মহারাজাধিরাজকে মানিয়া চলিতেন মাত্র। পাল আমলে এই সামন্তপ্রথা বাংলাদেশে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বস্তুত, পালরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভিত্তিই এই সামন্ততন্ত্র, এবং এই সামন্ততন্ত্র পালরাষ্ট্রের শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতাও। বিজিত রাষ্ট্রসমূহ মৌর্য বা গুপ্ত রাষ্ট্রের মতো এই আমলে আর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইত না, তাহারা পালরাষ্ট্রের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিত মাত্র। কেন্দ্রীয় অন্তর্‌রাষ্ট্রেও যে অসংখ্য সামন্ত নরপতি ও নায়ক ছিলেন, পাললিপিমালা ও রামচরিতই তাহার প্রমাণ। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও রাজবংশ যখন দুর্বল হইত তখন আত্ম-কর্তৃত্বের আদর্শ মস্তকোত্তোলন করিত। দেবপালের মৃত্যুর পর বিজিত রাষ্ট্র-সমূহ স্থানীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াই পালসাম্রাজ্য ভাঙিয়া দিয়াছিল; মহীপাল সেই সাম্রাজ্যের কতকাংশ জোড়া লাগাইয়াছিলেন, কিন্তু বেশীদিন তাহা স্থায়ী হয় নাই। বিজিত ও অবিজিত রাষ্ট্র এবং অন্তর্‌রাষ্ট্রের সামন্তবর্গ মহীপালের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। আর দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে যাঁহারা বিদ্রোহ করিয়া-ছিলেন তাঁহারা তো অন্তর্‌রাষ্ট্রেরই অনন্তসামন্তচক্র। আবার, রামপাল যখন বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়া পালরাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন তখনও তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন এই সামন্তবর্গ। আবার ইঁহারাই রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্য ও রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়া তাহাদের বিলুপ্তির পথে আগাইয়া দিয়া-ছিল।

সামন্ততন্ত্র যখন ছিল তখন সামন্ততান্ত্রিক বীরধর্ম এবং সেই ধর্মোদ্ভূত বীর-গাথাও প্রচলিত ছিল। এই বীরধর্মের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় দেবপালের সামন্ত বলবর্মার (নালন্দালিপি) চরিত্রে, রামচরিতে রামপালের সামন্তদের আচরণে, ভীম-সহায়ক হরির আচরণে। আর, বীরগাথার পরিচয় পাওয়া যায় ধর্মপালসম্বন্ধীয় গাথায় (খালিমপুরলিপি), উত্তরবঙ্গের মহীপালের গানে, যোগীপাল-ভোগীপালের গীতে। সূতেরা (পরবর্তী কালের ভাট-ব্রাহ্মণেরা) যে বীরগাথা গাহিয়া বেড়াইতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের লিপিটিতে। এই বীরধর্ম বা স্বামিধর্ম সম্বন্ধে সবচেয়ে সুন্দর সংবাদ পাওয়া যায় তৃতীয় গোপালের নিমদীঘি বা মান্ডা শাসনে। তাহা ছাড়া, সামন্ততান্ত্রিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সতীদাহপ্রথাও পাল আমলের শেষ দিকে এবং সেন আমলে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ-গ্রন্থে (২।৮।৩—১০) মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া মরিবার জন্য সমাজনায়কেরা দ্বিজ নারীদের পুণ্যলাভে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। বাংলাদেশ একাদশ-দ্বাদশ শতকেই সামন্ততন্ত্রের সব কটি লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সন্দেহ নাই।

সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন প্রসারিত হইয়াছিল, তেমনই প্রসারিত হইয়া-ছিল আমলাতন্ত্র। বস্তুত, পালযুগের লিপিমালায় এই তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই যুগে রাষ্ট্রের বৃহদ্‌বাহু সমাজের সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্মের বিচিত্র বিভাগে বিচিত্র কর্মচারী রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে গ্রামের

হাট খেয়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। লৌকিক প্রায় সমস্ত ব্যাপারই রাষ্ট্রশাসনের গন্ডীর অন্তর্ভুক্ত, এমন কি পারলৌকিক ধর্মাচরণ পর্যন্ত। প্রধান প্রধান কর্মচারী, যেমন মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদির হাতে ক্ষমতাও প্রচুর কেন্দ্রীভূত হইত অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়েই। এইসব কর্মচারীরা কখনো কখনো সুযোগ পাইলে রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল আচরণ করিতেন না, এমন নয়। দিব্য তো একজন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়; আর, বৈদ্যদেব তো কুমারপালের সেনাপতিই ছিলেন।

এই সামন্ততন্ত্র ও আমলাতন্ত্র অকারণে গড়িয়া উঠে নাই। এই আমলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের খবর একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। তাম্রলিপ্ত মৃত; নূতন কোন বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া খবর নাই। বিহার-বাংলার সঙ্গে সুমাত্রা-যবদ্বীপ-ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপগুলির যোগাযোগ অবশ্য অব্যাহত; কিন্তু একটি প্রমাণও ব্যবসা-বাণিজ্যিক যোগাযোগের দিকে ইঙ্গিত করে না, সবই যেন ধর্ম- ও সংস্কৃতি -সম্বন্ধীয়। তবে আন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত; লিপিগুলিতে বণিক-ব্যবসায়ী ইত্যাদির সংবাদ অপ্রতুল নয়, নানাপ্রকার কারু- এবং চারু -শিল্পের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে, এবং শিল্পীদের গোষ্ঠী যে ছিল তাহার অন্তত একটি প্রমাণ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয় রাষ্ট্রে ও সমাজে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর প্রাধান্য খুব ছিল না। তাহা ছাড়া, বর্ণ ব্রাহ্মণ্য-সমাজে তাঁহারা উচ্চস্থান অধিকার করিতেন বলিয়া মনে হয় না। রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের খবর যদি বা পাওয়া যাইতেছে, সুবর্ণমুদ্রা একেবারে নাই। এইসব সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি রাষ্ট্রে ও সমাজে খুব ছিল না। অথচ অন্যদিকে সমাজে ভূমি- ও কৃষি -নির্ভরতা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে তাহার প্রমাণ প্রচুর। প্রধানত ভূমিনির্ভর সমাজে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

এই একান্ত ভূমিনির্ভরতার ছবি পালযুগের রাজকর্মচারীদের তালিকাটি দেখিলেও চোখে পড়ে। সামরিক ও শাসনসংক্রান্ত কর্মচারী ছাড়া অধিকাংশ রাজপদ ভূমি- ও কৃষি -সম্পর্কিত।

সার

বাংলার সেন-রাজবংশ "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" এবং "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" "কর্ণাটক্ষত্রিয়" বলিয়াও তাঁহারা আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ বীরসেনকে চন্দ্রবংশীয় এবং পুরাণকীর্তিত বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটলক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারীদের হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া একটি উক্তিও সেনলিপিতে দেখা যায়। কর্ণাটাগত চন্দ্রবংশীয় কোনও সেন-পরিবার রাঢ়ভূমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই পরিবারে সামন্তসেনের জন্ম হয়।

ব্রহ্ম-ক্ষত্রি বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন পরিবারের পূর্বপুরুষরা আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেন। সামন্তসেন নিজে ব্রহ্মবাদী ছিলেন; তাহা ছাড়া সেনরাজারা যে এক সময় বৈদিক যাগযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার কিছু আভাসও সেনলিপি-

গুলিতে আছে। ভারতবর্ষের অন্যত্রও চার-পাঁচটি ব্রহ্মক্ষত্রিয় রাজবংশের খবর জানা যায়।

এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন পরিবার কী করিয়া কখন বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। পালরাজাদের সৈন্যদলে (এবং বোধহয়, আমলাতন্ত্রেও) অনেক ভিনপ্রদেশী—খশ-মালব-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট—লোক নিযুক্ত হইতেন, কর্ণাটীরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন নাই। কোন সেনবংশীয় কর্ণাটী রাজকর্মচারী হয়তো ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া আপন সামন্তত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, এবং পরে পালবংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন। অথবা, দক্ষিণাগত কোন সমরাভিযানের সঙ্গেও এই কর্ণাটী সেন পরিবারের বাংলাদেশে আসা বিচিত্র নয়। কর্ণাটী চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য একবার উত্তর-ভারতে সমরাভিযানে আসিয়াছিলেন, এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড়, মগধ, নেপাল প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন (১১২১, ১১২৪ খ্রী)। তাঁহারই এক সামন্ত আর-একবার কলিঙ্গ বঙ্গ, গুর্জর, মালব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন (১১২২-২৩ খ্রী)। কর্ণাটী চালুক্যবংশেরই রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৭-৩৮ খ্রী) ও তাঁহার পুত্র সোম বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, নেপাল, অন্ধ্র, গৌড় ও দ্রবিড় দেশে বিজয়ী সমরাভিযানের দাবি করিয়াছেন। এইসব বিচিত্র কর্ণাটী সমরপ্রবাহের সঙ্গেই কর্ণাটী সেনবংশ বাংলায় আসিয়া থাকিবেন। বস্তুত, বাংলাদেশে যখন সামন্তসেন-পুত্র হেমন্তসেন এবং তৎপুত্র বিজয়সেন ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তখন মিথিলা ও নেপালে আর-একটি কর্ণাটী সেনবংশও ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতেছিল, এই বংশই নান্যদেবের বংশ। এই সময়েই কান্যকুব্জ-বারাণসীতে গাহড়বাল রাজবংশও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন; ইঁহারাও কর্ণাটগত বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই প্রত্যেকটি রাজবংশই গোঁড়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার এবং সংস্কৃতি আশ্রয়ী।

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্তচক্রের বিদ্রোহের এবং ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ লইয়া রাঢ়দেশ অঞ্চলে স্থানীয় সামন্তাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (আ ১০৯৫-১১৫৮ খ্রী) শূর পরিবারের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের পূর্ব-ভারতে সমরাভিযানের সময় এক রণশূর দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজা ছিলেন; আর-এক শূর-নরপতি লক্ষ্মীশূরের খবর পাওয়া যায় রামচরিতে; তিনি অপর-মন্দারের (হুগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চল) সামন্ত নৃপতি ছিলেন। আর-এক শূররাজ আদিশূর বাংলার লোকস্মৃতিতে আজও বাঁচিয়া আছেন; কুলজী-গ্রন্থের মতে আদিশূরের নাম বাংলার কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শূর পরিবারে এই বিবাহ রাঢ়দেশে বিজয়সেনের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকিবে। কিন্তু তিনি কী করিয়া রাঢ়দেশের অন্যান্য সামন্তদের জয় করিয়াছিলেন, কী করিয়া বর্মণদের পরাজিত করিয়া পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পালবংশের প্রভুত্ব হইতে উত্তর-বঙ্গ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেওপাড়ালিপিতে তাঁহার হস্তে গৌড়, কামরূপ এবং কলিঙ্গরাজ এবং বীর, নান্য, রাঘব এবং বর্ধন নামে কয়েকজন সামন্ত-নরপতির পরাজয়ের দাবি করা হইয়াছে। বর্ধন রামচরিতোক্ত কৌশাম্বীর

(বগুড়া বা রাজসাহী জেলায়) নরপতি দ্বোরপবর্ধন; বীর রামপালের সহায়ক। রাঘব সম্ভবত কলিঙ্গনরপতি অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের (১১৫৬-১১৭০ খ্রী) দ্বিতীয় পুত্র। নান্য মিথিলার কর্ণাটীবংশীয় সেনরাজ নান্যদেব বলিয়াই মনে হয়। আর, যে-গৌড়পতিকে বিজয়সেন পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন, তিনি মদনপাল হওয়াই সম্ভব। গৌড়-জয় অর্থ বরেন্দ্রী-জয়, কারণ গৌড়েশ্বর পালরাজাদের আধিপত্য মদনপালের সময়ে বাংলাদেশে বরেন্দ্রীর বাহিরে কোথাও ছিল না। লক্ষ্মণসেনের আগে গৌড়বিজয় বিজয়সেন বা তৎপুত্র বল্লালের ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছিল বলে মনে হয় না; কারণ ইঁহাদের নিজেদের লিপিতে ইঁহারা গৌড়েশ্বর উপাধি দাবি করেন নাই। লক্ষ্মণসেনই সর্বপ্রথম এই উপাধি ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহাও রাজত্বের শেষদিকে। বিজয়সেন বর্মণবংশীয় রাজাদের হাত হইতে (পূর্ব)বঙ্গও কাড়িয়া লইয়াছিলেন; রাজকীয় লিপিই তাহার অকাট্য সাক্ষ্য। বস্তুত, সেনবংশের গোড়াকার দিকে সমস্ত লিপিরই উৎস "বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে"; বিজয়সেনের কলিঙ্গ ও কামরূপ-জয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ কঠিন; তাঁহার পৌত্র লক্ষ্মণসেনও এই দুই দেশে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণের দাবি করিয়াছেন।

যাহাই হউক, রামপাল-পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশার সুযোগ লইয়া বিজয়সেনই বাংলায় সেনবংশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরাক্রান্ত রাজবংশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় দেশ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করিল বটে; কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই রাষ্ট্র ও রাজবংশ বাংলার ও বাঙালীর নয়। কবি উমাপতিধর কিংবা শ্রীহর্ষ বিজয়সেনের, কিংবা পরবর্তী সভা-কবিরা সেনরাজাদের স্তুতি ও চাটুবাদে যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকুন না কেন সমসাময়িক বাঙালী জনসাধারণ এই রাজবংশকে আপনার বলিয়া মনে করিয়াছিল, এ কথা মনে করা কঠিন। গোপাল বাঙালী ছিলেন, পালবংশের পিতৃভূমি বাংলাদেশ; সেই হিসাবে পালরাজারা যতটা বাঙালী জনসাধারণের হৃদয়ের নিকটবর্তী ছিলেন, সেনরাজারা তাহা হইতে পারেন নাই। এই তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার জিনিস নয়। সেনরাজাদের মহিমা যাহা যতটুকু গীত হইয়াছে তাহা সভাকবিদের কণ্ঠে; যেটুকু তাঁহাদের স্মৃতি আজও জাগরূক, তাহা ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিশাসিত সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে মাত্র; পালবংশকে বাঙালী ভালবাসিয়াছিল, এবং তাঁহাদের গৌরবকে নিজেদের জাতীয় গৌরব বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল—বাংলাদেশে তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বল্লাল ব্যতীত সেনরাজাদের একজনের সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে কিনা সন্দেহ। বাংলা সাহিত্যে বা লোকস্মৃতিতে সেনরাজারা বাঁচিয়া নাই।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন (১১৫৮-১১৭৯) একবার গৌড় আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, বোধ হয় গোবিন্দপালের আমলে। বল্লালের অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থে এই গৌড়বিজয়ের একটু ইঙ্গিত আছে। বল্লাল-চরিত গ্রন্থে তাঁহার মগধ ও মিথিলায় বিজয়ী সমরাভিযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কিন্তু এই দুই-শতক-পরবর্তী গ্রন্থের সাক্ষ্য কতখানি প্রামাণিক বলা কঠিন। তবে, মিথিলা অধিকার একেবারে অমূলক না-ও হইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বল্লালের সময় বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রী এবং মিথিলা সেনরাজ্যভুক্ত ছিল; আর একটি ছিল বাগড়ী (সুন্দরবন-মেদিনীপুর অঞ্চল)। বল্লাল কর্ণাট-চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জগদেকমল্লের কন্যা রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থ সমাপনের (আরম্ভ শকাব্দ ১০৯০) আগেই

বল্লালসেন পুত্র লক্ষ্মণসেনের স্কন্ধে রাজ্যভার এবং গ্রন্থসমাপনভার অর্পণ করিয়া সপত্নীক গঙ্গা-যমুনা সংগমে (ত্রিবেণীতে?) নিরঞ্জরপুর নামক স্থানে বানপ্রস্থে গিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন যখন সেন-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন তিনি প্রায় ষাট বৎসরের পরিণত প্রৌঢ়। পিতামহ বিজয়সেনের আমলেই গৌড়-কলিঙ্গ-কামরূপের রণক্ষেত্রে তিনি শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়; তাঁহার রাজত্বকালে এই তিনটি দেশই যে সেনরাজ্যভুক্ত হয়, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহার পুত্রদের লিপিতে বলা হইয়াছে লক্ষ্মণসেন পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। পশ্চিমে তাঁহার রাজত্ব প্রয়োগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। শেষ পালরাজ গোবিন্দপালের পর মগধাঞ্চল গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল; বিজয়সেন এই অঞ্চল সেন-রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা খুব সার্থক হয় নাই। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দেও বুদ্ধগয়া অঞ্চল গাহড়বালদের অধিকারে ছিল বলিয়া লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। কাশীও গাহড়বালদের অধীনেই ছিল, এবং যে কাশীরাজকে লক্ষ্মণসেন পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্র। লক্ষ্মণসেন প্রয়াগ পর্যন্ত দেশ গাহড়বালদের করচ্যুত করিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন তবে, মুসলমান বিজয় পর্যন্ত গয়া অঞ্চল যে লক্ষ্মণসেনের আধিপত্যের অন্তর্গত ছিল অশোকচল্লের দুইটি লিপিই তাহার প্রমাণ। বারাণসী-প্রয়াগেও হয়তো একবার তিনি বিজয়ী সমরাভিযান করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের মগধাধিকার এবং প্রয়াগ পর্যন্ত সমরাভিযান গাহড়বালশক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই রাজ্যই ছিল ক্রমাগ্রসরমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধ-প্রাচীর; সেই প্রাচীরকে দুর্বল করিয়া লক্ষ্মণসেন রাষ্ট্র ও সমরবুদ্ধির কতটুকু পরিচয় দিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের প্রশ্ন অনিবার্য। এ তথ্য সুবিদিত যে, মুহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি প্রায় বিনা বাধায় সমস্ত বিহার ও বাংলা জয় করিয়াছিলেন; গাহড়বাল রাজ-শক্তির প্রতিরোধ-প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ার পর আর কোন বাধাই তাঁহার সম্মুখে উত্তোলিত হয় নাই।

যাহা হউক, লক্ষ্মণসেন যে-রাজ্য ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রাজ্য ও রাষ্ট্র ভিতর হইতে আপনি দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের যে-ব্যাধি পালরাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল, সেনরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই ব্যাধিরই এক রাষ্ট্রীয় রূপ সামন্ততন্ত্র।

সুন্দরবন অঞ্চলে (পূর্ব খাটিকা) এক মহামাণ্ডলিকের পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীডোম্মনপাল প্রধান হইয়া উঠিয়া স্বাধীন রাজ্যখণ্ড প্রতিষ্ঠা করিলেন (১১৯৬)।

এই সময়েই ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা-রাজ্য আবার কতকটা প্রাধান্য লাভ করে, এবং রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব নামে এক নরপতি সেখানে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন (১২০৪-১২২০)। বর্তমান কুমিল্লা শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলেই ছিল বোধ হয় তাঁহার রাজধানী।

মেঘনার পূর্বতীরে আর-একটি নূতন স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশও এই সময়েই গড়িয়া উঠিল। এই বংশ দেববংশ নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতেই পুরুষোত্তমদেবের পুত্র মধুমথন বা

মধুসূদনদেব প্রথম রাজা আখ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেবই এই বংশের পরাক্রান্ত নরপতি (১২৩১-১২৪৩)। দামোদর বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে এই বংশের আর-এক রাজা দশরথদেব তাঁহার রাজ্য আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুরে রাষ্ট্রকেন্দ্র গড়িয়া ঢাকা অঞ্চলও রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

বাংলার বাহিরে, গুপ্ত-উপান্তনামা এক বংশ মুঙ্গের অঞ্চলে সেনবংশের মহামাণ্ডলিক সামন্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল মুঙ্গের জেলার লখীসরাইর নিকট জয়নগর (প্রাচীন জয়পুর)। এই বংশের রাজা কৃষ্ণগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র সংগ্রামগুপ্ত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই।

অনৈক্য ও বৈষম্যমূলক স্থানীয় আত্মকর্তৃত্ব ব্যাধির এইসব দুর্লক্ষণ যখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিতেছিল, তখন অন্যদিকে পশ্চিম হইতে ক্রমাগ্রসরমান মুসলমান রাজশক্তি পূর্বদিকে লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া দিতেছিল। কুতুব-উদ্-দীন তখন দিল্লীর তক্তে আসীন। উত্তর-ভারতের হিন্দুরাষ্ট্রশক্তি তখন একে একে সকলেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে; রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিতে কিছু নাই। এই ধরনের বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রীয় অবস্থায় মুসলমান অভিযাত্রীর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতাপকে আশ্রয় করিয়া সেনাপতিদের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়াইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে তুর্কজাতীয় যুদ্ধব্যবসায়ী মুহম্মদ বখ্‌ত্-ইয়ার খিলজী অন্যতম। দিল্লীর তক্ত তাঁহাকে বিহার ও বাংলাদেশ জয় করিবার জন্য আদেশ করে নাই; বখ্‌ত্-ইয়ার স্বেচ্ছায় তাঁহার সৈন্যদল লইয়া বিহার-বাংলায় ভাগ্যান্বেষণে অগ্রসর হইলেন। বখ্‌ত্-ইয়ার কর্তৃক বিহার-বাংলা জয়ের কাহিনী লক্ষ্মণসেনের পক্ষ হইতে কেহ লিখিয়া রাখে নাই। সভাকবি শরণ অবশ্য লক্ষ্মণসেন কর্তৃক একবার এক ম্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন; হইতে পারে এই ম্লেচ্ছরাজ বখ্‌ত্-ইয়ার। অথবা এমনও হইতে পারে, বখ্‌ত্-ইয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর লক্ষ্মণসেন যখন বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন লখনৌতি বা লক্ষ্মণাবতীর কোন সুলতানের সঙ্গে সেনরাজের সংঘর্ষ হইয়া থাকিতে পারে।

যাহাই হউক, লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে ম্লেচ্ছদের (তুরুস্কদের) একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল, এবং সে-সংঘর্ষে সেনরাজ জয়ী হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে তাহা নবদ্বীপ জয়ের আগে না পরে, ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় তাহা বলা কঠিন। আমার মনে হয়, নবদ্বীপ জয়ের অব্যবহিত পরে।

নবদ্বীপ জয় সম্বন্ধে মুসলমান অভিযাত্রীদের পক্ষে বিস্তৃত সাক্ষ্য উপস্থিত, এবং সেই সাক্ষ্য দিতেছেন ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর দিল্লীর ভূতপূর্ব কাজী মৌলানা মিন্‌হাজ-উদ্-দীন। তিনি লখ্‌নৌতিতে দুই বৎসর কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানে দুইটি বৃদ্ধ সুপ্রাচীন সৈন্যের মুখে বখ্‌ত্-ইয়ারের বিহারবিজয়কাহিনী এবং অন্যান্য "বিশ্বস্ত" লোকের মুখে বঙ্গবিজয়কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম জানা প্রয়োজন। বখ্‌ত্-

ইয়ারের আক্রমণের সময় সেনরাজ লক্ষ্মণসেন (রায় লখ্‌মনিয়া) নুদীয়া (নদীয়া= নবদ্বীপ) রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন।

বর্তমান চুনারের ১১ মাইল পূর্বে ভুইলি গ্রাম; এই গ্রামই ছিল বখ্‌ত্‌-ইয়ারের জায়গীরের কেন্দ্রভূমি। গাহড়বাল-সামন্তরাজদের পরাভূত করিয়া বখ্‌ত্‌-ইয়ার মুনের ও বিহার অঞ্চলের নানা জায়গায় লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাহারই লোভে প্রচুর খিল্‌জি ও তুর্কী দস্যুব্রতী তাঁহার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইল। উত্তর-বিহারে মিথিলাকে আশ্রয় করিয়া তখন হিন্দু কর্ণাটক রাজবংশের আধিপত্য; কনৌজের সিংহাসনে তখনও জয়চন্দ্রপুত্র হরিশচন্দ্র আসীন; রোহ্‌তস্‌ অঞ্চলের হিন্দু মহানায়কেরা তখনও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছেন; বিহারে শোন-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে নবনেরাপত্তনের সামন্তদের আধিপত্য বিদ্যমান। এইসব হিন্দুরাজশক্তিকে উৎখাত করা বখ্‌ত্‌-ইয়ারের উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই রাজশক্তি যেখানে শিথিল সেইসব স্থান লুণ্ঠন ও অধিকার করাই হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। বৎসর দুই এইভাবে কাটাইবার পর বখ্‌ত্‌-ইয়ার হঠাৎ একদিন বিহার-দুর্গ আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বসিলেন এবং তাহার অধিবাসীদের প্রায় সকলকেই হত্যা করিলেন, প্রচুর ধনরত্ন লুটিয়া লইলেন এবং প্রচুর গ্রন্থ পোড়াইলেন (১১৯৯)। বস্তুত, যে দুর্গনগরটি তিনি অধিকার করিলেন তাহা দুর্গই নয়, এক বিরাট বৌদ্ধ-বিহার, এবং এই বিহারই প্রখ্যাত ঔদণ্ড্‌ বা ওদন্তপুর বিহার; যে অধিবাসীদের তিনি হত্যা করিলেন তাঁহারা সকলেই মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু। এই বিহার হইতেই বর্তমান বিহার জনপদের নামকরণ।

ওদন্তপুর বিহার ধ্বংসের প্রায় এক বৎসর পর দ্বিতীয়বার বখ্‌ত্‌-ইয়ার বিহারে সমরাভিযানে আসেন এবং নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন (১২০০ খ্রী)।

ইতিমধ্যে বিহার-ধ্বংস ও মগধাধিকারের সংবাদ নদীয়ায় রায় লখ্‌মনিয়ার এবং তাঁহার কর্মচারীদের কর্ণগোচর হয়। রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, মন্ত্রিবর্গ এবং জ্যোতিষীরা তখন লক্ষ্মণসেনকে পরামর্শ দিলেন, তুর্কী অভিযাত্রীকে বাধা দিয়া কাজ নাই, দেশ পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে এই দেশ তুর্কী-দের দ্বারা বিজিত হইবে! খোঁজ লইয়া জানা গেল, তুর্কী অভিযাত্রীটির চেহারা একেবারে শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে! রায় লখ্‌মনিয়া মন্ত্রী ও জ্যোতিষীবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না; অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বণিকেরা পূর্ববঙ্গে, আসামে ও অন্যান্য স্থানে পলাইয়া গেলেন; রায় লখ্‌মনিয়া পলাইলেন না। ইহার (মগধ-জয়ের) পর বৎসরই (১২০১ খ্রী) বখ্‌ত্‌-ইয়ার একদল সৈন্য গঠন করিয়া বিহার-সরিফ হইতে গয়া ও ঝাড়খণ্ড জনপদের ভিতর দিয়া নদীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য রহিল পশ্চাতে। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি নিজে আঠারোজন অশ্বারোহী সৈন্যমাত্র লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন; অশ্ব-বিক্রেতা মনে করিয়া কোথাও কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। প্রাসাদের ভিতরে ঢুকিয়াই বখ্‌ত্‌-ইয়ার ও তাঁহার সঙ্গীরা তরবারি উন্মুক্ত করিয়া লোকের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্বিপ্রহর, রায় লখ্‌মনিয়া ভোজনে বসিয়াছেন; এমন সময় প্রাসাদের দরজা এবং নগরের মধ্যস্থল হইতে তুমুল আর্তনাদ ও কোলাহল উত্থিত হইল। তৎক্ষণ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বাকী সৈন্যদলের একটি বৃহৎ অংশ নগরের ভিতরে ঢুকিয়া

পড়িয়াছে এবং বোধ হয় নগর অবরুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। ব্যাপার যে কী তাহা রায় লখ্‌মনিয়া বুঝিবার আগেই বখ্‌ত্‌-ইয়ার রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন; অনেক লোক তাঁহার তরবারির আঘাতে প্রাণও দিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া লখ্‌মনিয়া প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়া নগ্নপদে সংকনাট এবং বংগ অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। সমস্ত সৈন্যদল আসিয়া যখন নদীয়া এবং তাহার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান অধিকার করিল, বখ্‌ত্‌-ইয়ার তখন সেইখানে (প্রাসাদে ?) শিবির স্থাপন করিলেন। রায় লখ্‌মনিয়া (পূর্ব)বঙ্গে আরও কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর লোকান্তরগমন করেন। মিন্‌হাজের তবকাত্‌-ই-নাসিরী রচনার কালেও (১২৬০-র পরও) রায় লখ্‌-মনিয়ার বংশধরেরা (পূর্ব)বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। রায় লখ্‌মনিয়ার প্রাসাদ ও নগর অধিকারের পর বখ্‌ত্‌-ইয়ার কয়েকদিন ধরিয়া নদীয়া বিধ্বস্ত করিয়া গৌড়-লখ্‌নৌতিতে গিয়া নিজ শাসনকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। ইহার পর তিনি মহোবায় গিয়া কুতব্‌-উদ্‌-দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কয়েক বৎসর পর (১২০৬) তিনি তিব্বত-জয়ের জন্য দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এক সমরাভিযানে গিয়াছিলেন, মিন্‌হাজ এই অভিযানের বিবরণও রাখিয়া গিয়াছেন। বখ্‌ত্‌-ইয়ার তিব্বত পর্যন্ত অগ্রসরই হইতে পারেন নাই; মধ্যপথেই নানাভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মিনহাজ কথিত তিব্বতাভিযানের একটু পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় কামরূপের একটি লিপিতে।

ইহাই বখ্‌ত্‌-ইয়ারের অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য কর্তৃক বিহার, গৌড় ও বরেন্দ্রী বিজয়ের প্রায় ঔপন্যাসিক কাহিনী। প্রথমত, মিনহাজ পঞ্চাশ বৎসর পর যাঁহাদের মুখ হইতে শুনিয়া এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি এবং বিশ্বস্ততা কতটুকু নির্ভরযোগ্য বলা কঠিন। দ্বিতীয়ত, মগধ-জয়ের পরেও এক বৎসর না হউক, অন্তত কিছু সময় তো সেনরাষ্ট্র নিশ্চয়ই পাইয়াছিল; সেই সময়ের মধ্যেও কি লক্ষ্মণসেন শত্রুপ্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই? যে অস্ত্র ও সৈন্যবল, যে শৌর্য-বীর্য কাশী-কলিঙ্গ-কামরূপ জয় করিয়াছিল, তাহারা কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল? মগধরাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া নদীয়া পর্যন্ত কোথাও কি লক্ষ্মণসেন নিজের রাজ্য ও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য কোন প্রতিরোধ দান করেন নাই? নদীয়ার রাজপ্রাসাদ রক্ষারও কি কোন ব্যবস্থাই ছিল না? এসব অতৃপ্ত প্রশ্নের কোন উত্তরই মিনহাজের বিবরণীতে নাই। তৃতীয়ত, মিন্‌হাজ অলৌকিক গালগল্পেও আস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন: লক্ষ্মণসেনের জন্ম-কাহিনীই তাহার প্রমাণ। বিহার-বঙ্গ বিজয়কাহিনীতেও এই ধরনের প্রচলিত গাল-গল্প কিছু ঢুকিয়া পড়ে নাই এ কথাই বা কী করিয়া বলা যাইবে?

মিন্‌হাজ-বিবরণ রচনার এক শতকের মধ্যে ইসামী নামে এক ঐতিহাসিক ফুতুহ্‌-উস্‌-সালাতিন্‌ নামক গ্রন্থে নদীয়া - অধিকারের আর-একটি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

ইসামীও বলিতেছেন, বখ্‌ত্‌-ইয়ার অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশেই নদীয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি লক্ষ্মণসেনকে সংবাদ পাঠাইলেন, প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের আনীত তাতার-অশ্ব, চীনা বস্ত্রসম্ভার এবং অন্যান্য মূল্যবান্‌ দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য। রায় যখন কারবানে (অশ্বদের বিশ্রামস্থলে) আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বখ্‌ত্‌-ইয়ার তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দান করিলেন,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অনুচরদের ইঙ্গিত করিলেন হিন্দুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে। তুর্কী সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল, হিন্দু রক্ষী সৈন্যেরা অতর্কিত আক্রমণ ঠেকাইতে না পারিয়া পরাভূত হইল, কিন্তু তাঁহাদের একদল রায় লখ্-মনিয়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া স্থির বিক্রমে আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল। অবশেষে যখন দুর্ধর্ষ খিল্জি অশ্বারোহীরা ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিয়া কয়েকজন হিন্দু-সওয়ারকে হত্যা করিল, তখন রায় লখ্মনিয়া বখ্ত্-ইয়ারের হাতে বন্দী হইলেন।

উপরোক্ত দুইটি বিবরণেই এবং সমসাময়িক ইতিহাসে একটি তথ্য পরিষ্কার। প্রথমত, আক্রমণটা ঘটিয়াছিল বেলা দ্বিপ্রহরে যখন প্রাতঃসভা শেষ করিয়া সভাসদ, কর্মচারী ও রক্ষী সৈন্যরা সকলেই যে যাঁহার ঘরে ফিরিয়া গিয়া স্নানাহার ও বিশ্রামে রত। দ্বিতীয়ত, ১৯ জন অশ্বারোহী তুর্কী সেনাকে কেহই আক্রমণকারী বলিয়া মনে করেন নাই, অশ্ববিক্রেতা মনে করিয়াই রক্ষীরা তাঁহাদের বাধা দেয় নাই। তৃতীয়ত, সহসা অতর্কিত অবিশ্বস্ত আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য কেহ প্রস্তুতও ছিল না। চতুর্থত, প্রথম ১৯ জনের (বখ্ত্-ইয়ার ও ১৮ জন তুর্কী অশ্বারোহী) পক্ষেই প্রাসাদ ও নগরাধিকার সম্ভব হইত না, যদি না পশ্চাতের বৃহত্তর তুর্কী ও খিল্জি অশ্বারোহী সেনাদল ততক্ষণে নগরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া চারিধারে আক্রমণ ও লুণ্ঠন শুরু করিয়া দিত। পঞ্চমত, নবদ্বীপ সেনরাজাদের রাজধানী ছিল না, ছিল গঙ্গাতীরবর্তী একটি তীর্থস্থান এবং সেখানে একেবারে গঙ্গার কূল ঘেঁষিয়া ছিল রাজার প্রাসাদ। এই প্রাসাদ সুদৃঢ় অট্টালিকা নয়, তদানীন্তন বাংলার রুচি ও অভ্যাস অনুযায়ী কাঠ ও বাঁশের তৈরী সমৃদ্ধ বাংলা-বাড়ি। মুঘলপ্রাসাদ বা দুর্গনগর বলিতে যাহা বুঝায় নবদ্বীপে তাহার কিছু ছিল না। ষষ্ঠত, বিদেশী অশ্ব-বিক্রেতার আসা-যাওয়া নগরে নিশ্চয়ই ছিল; সুতরাং অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে ১৯ জন অশ্বারোহীর আগমন কাহারও মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে নাই। সপ্তমত, প্রাচ্য ইতিহাসে স্বল্প-সংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণে কোনো নগরাধিকার একেবারে অজ্ঞাত নয় এবং নিছক কল্পনার সৃষ্টিও নয়।

এসব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বখ্ত্-ইয়ারের নবদ্বীপাধিকার কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না, কিংবা তাহাতে তদানীন্তন বাঙালীর ভীরুতাও কিছু প্রমাণিত হয় না। আলোচিত সাক্ষ্যে স্পষ্টই বুঝা যায়, নবদ্বীপে শত্রু-আক্রমণের কোন প্রতিরোধ-ব্যবস্থাই ছিল না।

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে মিন্হাজ ও ইসমীর বিবরণের সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। বখ্ত্-ইয়ার তথা বিদেশী শক্তির কাছে নবদ্বীপ তথা সেনরাষ্ট্র ও বাঙালীর পরাজয়ের কারণ আরও গভীর, আরও অর্থবহ, এবং তাহা সমগ্র উত্তর-ভারতের সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। ইসলামধর্মী আরব, তুর্কী, খিল্জি প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উত্তর-ভারত তো কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সমানেই যুঝিতেছিল, সাহস ও বীর্যের পরিচয়, দেশাত্মবোধের পরিচয় কম দেয় নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিল তিল করিয়া এইসব বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছিল—নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, সামরিক শক্তির অভাবে নয়। ভারতীয় পদাতিক, হস্তিসৈন্য ও স্বল্পসংখ্যক মাত্র অশ্বসৈন্যনির্ভর সামরিক শক্তি অপেক্ষা আরব খিল্জি - তুর্কীদের দ্রুত ও সুকৌশলী ঘোড়সওয়ারী সেনাদল অধিক কার্যকরী ছিল সন্দেহ নাই। এইসব

কারণ ছাড়া, সমসাময়িক বাংলাদেশে যে মনোবৃত্তি এই বৈদেশিক পরাভবের হেতু তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। উত্তর-ভারত তো একটু একটু করিয়া ইতিপূর্বেই দিল্লীর তক্তের অধীন হইয়া গিয়াছিল; সাহব্-উদ্-দীন ঘোরী কর্তৃক গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রের পরাজয়ের (১১৯৪) পর পূর্বদিকের একমাত্র পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ও রাষ্ট্র ছিল লক্ষ্মণসেনের। এই রাজ্যেরই কিয়দংশ যখন অধিকৃত হইয়া গেল, বিহার ধ্বংস হইল, তখন জনসাধারণের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নয়। এই আতঙ্কেই দেশের লোক (পূর্ব)বঙ্গে, কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল, এমন কি নবদ্বীপও প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, মিন্হাজের এই ইঙ্গিত মিথ্যা না-ও হইতে পারে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অনেক ব্রাহ্মণদের দল যে এই সময় নানাদিকে পলাইয়া গিয়াছিলেন, এ সাক্ষ্য তো বৌদ্ধ লামা তারনাথও রাখিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণের প্রতিরোধের মনোবৃত্তি যে ছিল না, এবং গড়িয়া তুলিতে চেষ্টাও কেহ করে নাই, এ তথ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিবর্গ যে লক্ষ্মণসেনকে যুদ্ধ না করিয়া দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, রাষ্ট্রেরও প্রতিরোধ-ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, ভাগ্যনির্ভর পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের জ্যোতিষগণনা ও শাস্ত্রের দোহাইয়ের যে ইঙ্গিত মিন্হাজ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করিবার কারণ দেখিতেছি না। এই যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের—ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেরই—পাণ্ডিত্যখ্যাতি স্মৃতি- ও জ্যোতিষ -নির্ভর। আর, যেসব সুবিস্তৃত ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ, বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রে স্নান, পূজা, উপবাস, হোম, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদির দর্শন সেন আমলের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়, তাহা তো সমস্তই জ্যোতিষনির্ভর। রাজারা স্বয়ং জ্যোতিষচর্চা করিতেছেন, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন দুজনই জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিতেছেন এমন তথ্যও রাজবৃত্তের ইতিহাসে সহজে দেখা যায় না। কাজেই, সেই সংকটময় মুহূর্তে মিন্হাজ জ্যোতিষীদের উক্তি ও আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতেছে না; তৃতীয়ত, যদি মানিয়া লওয়া যায় যে (এবং তাহা করিতে কিছু বাধা দেখা যাইতেছেনা), লক্ষ্মণসেন বিহারে, বাংলার পথে এবং নবদ্বীপে শত্রু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয়, এই বাধা যথেষ্ট ছিল না, এবং সংঘর্ষের পশ্চাতে সৈন্যদলের চিত্তশক্তি ও প্রতিরোধকামনা খুব প্রবল ছিল না। মিন্হাজ বখ্ত্-ইয়ারের তিব্বতাভিযানের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনার কথা গোপন করেন নাই; প্রতিরোধ প্রবল হইলে এক্ষেত্রেও মিন্হাজ অন্তত তাহার উল্লেখ করিতেন। তাহা ছাড়া, বিহার-ধ্বংসের যে বিবরণ তারনাথ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণও খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করা যায় না। নবদ্বীপেও প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হয়তো কিছু হইয়াছিল, কিন্তু বখ্ত্-ইয়ারের বুদ্ধি ও আক্রমণকৌশল তাহা সহজেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। আসল ব্যাপার এই যে, যেখানে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়মান, উপদেষ্টা ও মন্ত্রিবর্গ পরাজয়ী মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক সেখানে সৈন্যদলের ও জনসাধারণের প্রতিরোধ দুর্বল হইতে বাধ্য। এইজন্যই কোন প্রতিরোধই কার্যকর হয় নাই। বস্তুত, লক্ষ্মণসেনের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে ভিতর হইতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল; গাহড়বালদের প্রতিরোধ-প্রাচীর যতদিন বজায়

ছিল ততদিন নিশ্চিন্ত হইয়া কলিঙ্গ-কামরূপ-কাশী জয় লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার সৈন্যদের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার হয় নাই; কিন্তু সে প্রাচীর যখন ভাঙিয়া পড়িল তখন দুর্ধর্ষ মুসলমান অভিযাত্রীদের ঠেকাইয়া রাখিবার মতন ইচ্ছা বা শক্তি রাষ্ট্র-যন্ত্রের ছিল না। ব্রাহ্মণ, বণিক, উপদেষ্টা জ্যোতিষী ও মন্ত্রিবর্গের আচরণই তাহার প্রমাণ।

চারিদিকে যখন এই আতঙ্ক ও পরাজয়-মনোবৃত্তির আচ্ছন্নতা তখন বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের নিজের আচরণ সত্যই প্রশংসনীয় এবং যথার্থ রাজকীয় মর্যাদাবোধের পরিচায়ক। শত্রু অগ্রসরমান জানিয়া এবং উপদেষ্টা ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে বিচলিত হইয়া তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করেন নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে ও কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তারপর যখন প্রায় সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, শত্রুসৈন্য অতর্কিতে এবং অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও অধিকার করিল, তখন তাঁহার পলায়ন ছাড়া কোন পথ ছিল না। লক্ষ্মণসেন কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি হতভাগ্য! সমাজ - ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, বাংলার ইতিহাস শতাব্দী ধরিয়া যে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, লক্ষ্মণসেন তাহার শেষ অধ্যায় মাত্র। তাঁহার ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য বা অন্যান্য গুণাবলী তাঁহাকে কিংবা বাংলাদেশকে সেই পরিণতির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে নাই! লক্ষ্মণসেনের ব্যক্তিগত পরাক্রম ও অন্যান্য গুণাবলীর সাক্ষ্য তো মিনহাজ নিজেও দিয়াছেন : 'রায় লখ্‌মনিয়া মহৎ রাজা ছিলেন; হিন্দুস্থানে তাঁহার মতো সম্মানিত রাজা আর কেহ ছিল না। তাঁহার হাত কাহারও উপর কোন অত্যাচারে অবিচারে অগ্রসর হইত না। একলক্ষ কড়ির কমে তিনি কাহাকেও কিছু দান করিতেন না।'

নদীয়া বা নবদ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার ঠিক কবে হইয়াছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতণ্ডার অন্ত নাই। মোটামুটি মনে হয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার কিছু পরে (১২০১ খ্রী) এই ঘটনার সংঘটন কাল। শেক শুভোদয়া-গ্রন্থে এই ঘটনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১১২৪=১২০২ খ্রীষ্টাব্দ, এবং এই তারিখ পাগ্‌-সাম্‌-জোন-জাং নামক তিব্বতী গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত।

নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণসেন (পূর্ব)বঙ্গে গিয়াছিলেন এবং সেখানে অত্যল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করেন (১২০৬ ?) মিনহাজ এ কথা বলিতেছেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের সাক্ষ্যে মনে হয় লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন এবং রাজত্ব করিতেছিলেন। বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে নির্গত লক্ষ্মণসেনের লিপিগুলির মধ্যে ভাওয়াল ও মাধাইনগর লিপি দুইটি তুর্কী-বিজয়ের পরবর্তী হওয়া অসম্ভব নয়। কবি শরণ ছাড়া কবি উমাপতি ধরও একটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে লক্ষ্মণসেন কর্তৃক এক ম্লেচ্ছরাজ জয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। গৌড় ও বরেন্দ্রীর মুসলমান নরপতি ও সেনানায়কেরা কেহ কেহ হয়তো পূর্ব- ও দক্ষিণ -বঙ্গের সেনরাজ্যের বাকী অংশ অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দীকাল সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। প্রধান কারণ, নদনদীবহুল পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক সংস্থান, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপ ও কেশব তিনজনই এইসব সংঘর্ষে জয়ী হইয়াছিলেন, লিপিগুলিতে যেন তাহারই ইঙ্গিত।

লিপিপ্রমাণ হইতে এ তথ্য নিঃসংশয় যে, লক্ষ্মণসেনের বংশ বঙ্গে আরও অর্ধ শতাব্দীকালের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের রাজ্য পূর্ব- ও দক্ষিণ

-বঙ্গে বিস্তৃত ছিল। মিনহাজ বলিতেছেন, তাঁহার গ্রন্থরচনাকালেও সেনরাজারা বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বরূপ ও কেশব দুইজনেই লক্ষ্মণসেনের ন্যায় নিজেদের "গৌড়েশ্বর" এবং "পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ" বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। রাজ্যের অধিকাংশই তাঁহাদের করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজেদের রাজকীয় দলিলপত্রে অভ্যস্ত ও চিরাচরিত ধরাবাঁধা ঔপাধিক আড়ম্বরের ত্রুটি হয় নাই। বস্তুত, নবদ্বীপ করচ্যুত এবং বখত্-ইয়ার লখ্নৌতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও সেনরাজারা যেভাবে তাঁহাদের লিপিগুলিতে সর্বপ্রকার ঔপাধিক আড়ম্বর বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না, এই মুসলমান বিজয়ের যথার্থ ঐতিহাসিক ইঙ্গিত তাঁহারা যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্যেও এই সংকটময় বৈপ্লবিক যুগের কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যাইতেছে না।

বিশ্বরূপ ও কেশব দুইজনই "সসর্গ-যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দান করিয়াছেন। একাধিক মুসলমান সুলতান—গিয়াস-উদ্-দীন, (১২১১-১২২৬), মালিক সৈফ্-উদ-দীন (১২৩১-৩৩), ইজ্-উদ্-দীন বলবন্ (১২৫৮)—কয়েকবারই বঙ্গ (পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ) বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তবে, সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। বিশ্বরূপ ও কেশবের পরও আরও কয়েকজন সেনরাজার নাম আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী এবং রাজাবলী-গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে মাধবসেন এবং শূরসেনের নাম একান্ত অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে। পঞ্চরক্ষা-গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপিতে (১২৮৯ খ্রী) মধুসেন নামে এক নরপতির খবর পাওয়া যায়। বিশ্বরূপের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে সূর্যসেন (শূরসেন ?) এবং পুরুষোত্তমসেন নামে দুই রাজকুমারের উল্লেখ আছে। সেনবংশীয় কোন কোন রাজপুত-রাজকুমার স্থানীয় সামন্তরাজরূপেও রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব-বঙ্গেও সেনরাষ্ট্র ভিতর হইতে ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। পট্টিকেরা (ত্রিপুরা জেলা) রাজ্যে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব এবং ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামে দেববংশ কর্তৃক স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার কথা আগেই বলা হইয়াছে। মনে হয়, ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ কোন রকম করিয়া মুসলমানাধিকারের হাত হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল—কোথাও সেনবংশীয় রাজাদের নায়কত্বে, কোথাও অন্য কোন স্থানীয় রাজা বা সামন্তের নায়কত্বে ; নদীবহুল জলমগ্ন ভাটি অঞ্চলে মুসলমান অভিযাত্রীরা বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করিতে পারে নাই। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের পর বাংলাদেশের কোথাও আর কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র হিন্দু নরপতির নাম শোনা যাইতেছে না।

সেন রাজবংশ বাঙালী ছিলেন না, দক্ষিণের কর্ণাটদেশ হইতে এদেশে আসিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলাদেশের ও বাঙালী জাতির আধিপত্য লাভ করিয়া-ছিলেন। লক্ষণীয় এই যে, এই যুগে আর-একটি রাজবংশ (পূর্ব)বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; এই বর্মণ রাজবংশও অবাঙালী, ইঁহারাও বিদেশাগত, বোধ হয় কলিঙ্গাগত। পালবংশ মুখ্যত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, সেনবংশ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। আর যে চন্দ্ররাজবংশকে অধিকারচ্যুত করিয়া বর্মণবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহারাও পালরাজাদের মতো বৌদ্ধ, আর বর্মণেরা এবং মেঘনা-অঞ্চলের দেব-বংশের রাজারা,

সেনদের মতনই গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। এই দুই তথ্যের মধ্যে এই যুগের সামাজিক ইঙ্গিত অনেকাংশে নিহিত।

সুদীর্ঘ পালযুগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই যুগে অপরিবর্তিত; নূতন কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই যুগে গড়িয়া ওঠে নাই, রাষ্ট্রযন্ত্রেরও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ সমভাবে বিদ্যমান, সামগ্রিক ভারতীয় ঐক্যবোধ ও আদর্শ, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় আদর্শ কিছু গড়িয়া উঠে নাই। সামন্ততন্ত্র সমভাবে সক্রিয়। উত্তরোত্তর ভূমির চাহিদা বাড়িতেছে; সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর হইয়া উঠিতেছে। অথচ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ক্ষেত্রকর বা কৃষক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত। পালযুগের লিপিমালায় সর্বত্রই কৃষক-কর্ষক-ক্ষেত্রকরদের উল্লেখ তো আছেই, চণ্ডালদের পর্যন্ত উল্লেখ আছে; অর্থাৎ সমাজের কোন স্তরই তখন রাষ্ট্রের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না। স্পষ্টই দেখিতেছি সেনযুগে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রাজ্য-পরিধিও পালসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই; তাহাও সংকীর্ণই বলা যায়, যদিও লক্ষ্মণসেন প্রায় মহীপালের রাজ্য-সীমা উদ্ধার করিয়াছিলেন, তবে স্বল্পকালের জন্য মাত্র। অথচ, অন্য দিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজ- ও সামন্ত -বংশেরই রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমবর্ধমান। নূতন নূতন রাজকর্মচারীদের নাম এই যুগে প্রথম শোনা যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসংকুচীয়মান নূতন নূতন রাজ্যবিভাগ—খণ্ডল, চতুরক, আবৃত্তি, পাটক ইত্যাদি। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, একদিকে রাষ্ট্রের সমাজদৃষ্টি যত সংকীর্ণ হইতেছে, পরিধি যত সংকীর্ণ হইতেছে, আমলাতন্ত্রের বিস্তার হইতেছে তত বেশি। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তত বিস্তৃত হইতেছে। আমলাতন্ত্র যে সংখ্যায় ও অধিকারবৃদ্ধিতে স্ফীত ও অতি-মাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও অবকাশ নাই। শুধু তাহাই নয়, রাজার সর্বময় কর্তৃত্বও বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় আড়ম্বরও। পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, মহা-তন্ত্রাধিকৃত প্রভৃতি নূতন নূতন রাজপুরুষ (ইঁহারা সকলেই ধর্মাচরণ-ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত) রাজসভা জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিতও আছেন; তিনিও এই যুগে অন্যতম রাজকর্মচারী। আমলাতন্ত্রের এই সুদীর্ঘ ও সর্বব্যাপী বাহুবিস্তার এবং রাজার সর্বময় প্রভুত্ব জনসাধারণ কী দৃষ্টিতে দেখিত তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি-সংকীর্ণতার অন্য প্রমাণ সেন আমলে দেখা যাইতেছে, শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। অনেক শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সৎশূদ্র বলিয়াও গণ্য হইতেন না; বর্ণবিন্যাসের নিম্নতর স্তরে ছিল তাঁহাদের স্থান।

এই দৃষ্টিসংকীর্ণতার কারণ বলিতে হইলে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। বর্মণ ও সেন বংশের প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পূজার্চনার জয়জয়কার, যত ভূমিদান সমস্তই লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা। এই যুগের একটি লিপিতেও এমন প্রমাণ নাই যেখানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কেহ বা কোন বৌদ্ধ বিহার বা সংঘ কোন প্রকার রাজানুগ্রহ লাভ করিতেছেন। পট্টিকেরা রাজ্যের এক রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব ছাড়া এই যুগে আর কোন বৌদ্ধ-নরপতির খোঁজ পাওয়া কঠিন। বর্মণ- ও সেন -বংশীয় রাজারা কেহ

শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সৌর, কিন্তু প্রত্যেকেরই আশ্রয় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কার, এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই এই স্মৃতি ও সংস্কার প্রচার ও বিস্তারে সদা উৎসুক। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিরোধিতাও বোধহয় আরম্ভ হইয়াছিল, এবং রাষ্ট্রের সমর্থনও এই বিরোধিতার পশ্চাতে ছিল। বর্মণরাজ জাতবর্মার রাজত্বকালেই সম্ভবত বর্মণরাষ্ট্রের বঙ্গাল সৈন্যদল সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহারের অন্তত একাংশ পুড়াইয়া দিয়াছিল। এই আক্রমণ শুধু কৈবর্তনায়ক দিব্যর বিরুদ্ধে নয়, বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে। ভট্ট-ভবদেব ছিলেন রাজা হরিবর্মার সান্ধিবিগ্রহিক, এই ভবদেব-ভট্ট অগস্ত্যের মতো বৌদ্ধধর্মরূপ সমুদ্রকে গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন এবং তিনি পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের যুক্তিতর্কখণ্ডনে দক্ষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিলিপিতে দাবি করা হইয়াছে। পাষণ্ডবৈতণ্ডিকেরা যে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে, এই যুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতির বিরোধী। বর্মণবংশের রাষ্ট্রে ভবদেব যেমন সামাজিক আদর্শের প্রতিনিধি, সেনরাষ্ট্রে তেমনই হলায়ুধ। হলায়ুধ নিজে ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এইসব তথ্য হইতে মনে হয়, এ যুগের রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি-আশ্রয়ী। বস্তুত, বাংলাদেশ আজও যে স্মৃতিশাসনে শাসিত, যে বর্ণবিন্যাসে বিন্যস্ত সেই স্মৃতি- ও বর্ণ -বিন্যাস দুই-ই এই সেন-বর্মণ যুগের সৃষ্টি। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া জিতেন্দ্রিয়, বালক, ভবদেব, হলায়ুধ এবং বোধহয় জীমূতবাহন, ইঁহারা প্রত্যেকেই সেন-বর্মণ আমলের লোক; এবং হারলতা-পিতৃদয়িতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবহার মাতৃকা-দায়ভাগ-কালবিবেক পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতি- ব্যবহার ও মীমাংসা -গ্রন্থ এই যুগের রচনা। এই স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসাই শূলপাণি-রঘুনন্দন কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া আজও বাংলার সমাজ শাসন করিতেছে। এই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন না থাকিলে একশত-দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের এমন সমৃদ্ধ রূপ কিছুতেই দেখা যাইত না।

সমাজনিয়ন্ত্রণ রাজার কর্তব্য বলিয়া ভারতবর্ষে বরাবরই স্বীকৃত হইয়াছে: পালরাজারাও বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালন করিয়াছেন; কিন্তু সেন আমলে রাষ্ট্র ও রাজবংশ যেমন করিয়া দেশের সকলের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ক্রিয়াকর্তব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ধর্ম- ও সমাজ -গত আচার ও আচরণ, পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন সজ্ঞান সচেতন এবং সর্বব্যাপী কর্তৃত্বমূলক চেষ্টা বাংলাদেশে ইহার আগে বা পরে কখনো হয় নাই। কুলজী গ্রন্থমালার সাক্ষ্য, বাংলার কৌলীন্যপ্রথার সাক্ষ্য হয়তো ইতিহাসে প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য নয়; কিন্তু লোকস্মৃতি ও লোকেতিহাসের যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যও থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শ্যামলবর্মা এবং বল্লালসেনের সঙ্গেই বাংলার প্রচলিত বর্ণবিন্যাস ও সামাজিক স্তর-বিভাগের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী জড়িত। বল্লালসেন বণিকদের উপর অত্যাচার এবং সুবর্ণবণিকদের পতিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কৈবর্ত, মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকারদের সৎশূদ্রস্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন বলিয়া আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিত-গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইতে পারে, কিন্তু সেন- রাষ্ট্র ও -রাজবংশের আমলে এইভাবে

বিভিন্ন স্তরনির্ণয় এবং কোন্ স্তরে কোন্ সম্প্রদায়ের স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করা হইতেছিল তাহা অস্বীকার করা চলে না। হয়তো তাহার পশ্চাতে রাজকীয় নির্দেশও কিছু ছিল।

এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী ও রাঢ়দেশ, এবং পরবর্তীকালে বিক্রমপুর অঞ্চল। কিন্তু বিক্রমপুর বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল থাকাতে সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতাপ রাঢ়-বরেন্দ্রীর মতন এতটা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। বোধহয়, এইজন্যই মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে আজও ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির শাসন অপেক্ষাকৃত শিথিল।

সেন-বর্মণ উভয় বংশই দক্ষিণাগত। এ তথ্য সুবিদিত যে, আন্ধ্র-সাতবাহন আমল হইতেই দাক্ষিণদেশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির খুব বড় কেন্দ্র। পল্লব, চোল, চালুক্য ইত্যাদি সকল রাজবংশই এই ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, ধারক ও সমর্থক। বস্তুত, উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারত এই বিষয়ে অধিকতর গোঁড়া, কলিঙ্গ-কর্ণাট হইতে বর্মণ ও সেনেরা সেই আদর্শ লইয়াই বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, এবং রাষ্ট্রের বিপুল ও সক্রিয় সহায়তায় সেই আদর্শ এবং তদনুযায়ী স্মৃতি- ও ব্যবহার -শাসন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত উচ্চতর বর্ণ ও সমাজ সেই যুগেরই স্মৃতি- ও ব্যবহার -শাসন মানিয়া চলিতেছে; নিম্নতর বর্ণেরও তাহাই আদর্শ ও মাপকাঠি।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সমসাময়িক বাংলাদেশের পক্ষে কি তাহা সার্থক ও কল্যাণ-কর হইয়াছিল?

আগের পর্বে দেখিয়াছি, পালযুগের সামাজিক আদর্শ ছিল বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ। ইতিহাসের চক্রাবর্তে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে স্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতেছিল সেই স্রোতকে ব্রাহ্মণেতর ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাঠামো ও আদর্শ অনুযায়ী একটি বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় গড়িয়া তোলাই ছিল পাল-চন্দ্র পর্বের সাধনা। পালযুগে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ দেবদেবীদের মধ্যেও একটা বৃহৎ সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণ-ক্রিয়া চলিতেছিল, বৌদ্ধ ও শৈব তন্ত্রধর্ম ও চিন্তা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের একটি বৃহৎ সমন্বয়সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছিল, বৌদ্ধেরা অসংখ্য ব্রাহ্মণেতর সংস্কৃতির দেবদেবীদের কিছু কিছু মানিয়া লইতেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণ-ক্রিয়া সমভাবে চলিতেছিল। বর্ণবিন্যাস ও সামাজিক স্তরভেদের ব্যাপারেও তাহা দৃষ্টিগোচর। পাল-আমলে চণ্ডাল পর্যন্ত সকল শ্রেণী ও বর্ণের লোকেরাই রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আছেন। পালরাজারা চতুর্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা ও ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেন ও বর্মণ রাজারা ইচ্ছামতো এবং স্মৃতি-নির্দেশমত চতুর্বর্ণের বিভিন্ন স্তর ঢালিয়া সাজিয়াছেন। বস্তুত, পাল আমলের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের আদর্শ এই যুগে যেন একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কুলজী-গ্রন্থধৃত লোকস্মৃতির যদি কিছু মাত্র মূল্যও থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন-বর্মণ আমলে পালযুগগঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছিল। এই গড়ার মূলে

কোন সমন্বয় বা-স্বাঙ্গীকরণের আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বর্ণবিন্যাসের দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে, সমাজ বিভিন্ন স্তরে স্তরে বিভক্ত, প্রত্যেকটি স্তর সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত, এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের মিলন ও আদানপ্রদানের বাধা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য, অনতিক্রম্য। এক-একটি স্তরের মধ্যেও আবার নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ উপস্তর, এবং সেখানেও বিভিন্ন বিচিত্র উপস্তরের মধ্যে বিচিত্র বাধা-নিষেধের প্রাচীর। সমাজের এই স্তরভেদ এবং স্তরে স্তরে আদানপ্রদানের বিচিত্র বিধিনিষেধ নবগঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে দুর্বল ও পঙ্গু করে নাই, তাহা কে বলিবে? পরবর্তী কালে যে করিয়াছে তাহা তো অনস্বীকার্য।

বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও তাহাই। কৃষক-ক্ষেত্রকর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্যন্ত লোকেরা তো রাষ্ট্রের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তই ছিল না, আর ব্রাহ্মণেরা যে রাষ্ট্রে ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ধর্মানুষ্ঠানের কর্তারা যে ক্রমশ রাজপাদোপজীবী হইতেছিলেন, তাহা তো আগেই বলিয়াছি। ভবদেব-ভট্টের মতন একজন পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনায়ক ব্রাহ্মণদের কৃষিকার্য সমর্থন করিয়াছেন; লিপিমালায় প্রমাণ পাইতেছি ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রকার্যে, সামরিক ও অন্যান্য ব্যাপারে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত আছেন, অথচ ভবদেবই ব্রাহ্মণদের পক্ষে অন্য প্রায় সকল বৃত্তিই নিষিদ্ধ বলিয়া বলিতেছেন, এমন কি অব্রাহ্মণকে শিক্ষাদান, এবং অব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ-পূজা-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য পর্যন্ত। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদসৃষ্টির প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কী থাকিতে পারে! ব্রাহ্মণদের পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা, চিত্রবিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল; যাঁহারা তাহা করিতেন তাঁহারা "পতিত" হইতেন। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল! দেবল ব্রাহ্মণরা তো এইজন্যই পতিত হইয়াছিলেন। অথচ, ভবদেব-ভট্ট, বল্লালসেন প্রভৃতিরা স্বয়ং এবং আরও অনেক সমসাময়িক প্রধান প্রধান পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ, ফলসংহিতা, হোরাশাস্ত্র ইত্যাদির চর্চা করিতেন। তাঁহারা তো 'পতিত' হন নাই। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পৌরোহিত্য যাঁহারা করিতেন তাঁহারা ঐসব নিম্নবর্ণের বর্ণভুক্ত হইতেন। শ্রেণীভেদবুদ্ধির আর কী প্রমাণ প্রয়োজন? ইহার উপর বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বল্লালের সেনরাষ্ট্র কোন না কোন কারণে বণিকদের সমর্থন হারাইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে সমাজে সুবর্ণবণিকদের 'পতিত' হইতে হইয়াছিল। বল্লালসেন যে মালাকার, কর্মকার, কুম্ভকার এবং কৈবর্তদের উন্নীত করিয়াছিলেন, এইখানেও তো শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধির প্রমাণ সুস্পষ্ট। বর্ণভেদবুদ্ধি এবং এই শ্রেণীভেদবুদ্ধি একত্র জড়িত হইয়া নবগঠিত বাংলাদেশ ও জাতিকে, সেনরাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দেয় নাই, এ কথাই বা কে বলিবে? সামন্ততন্ত্র এবং অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত আমলাতন্ত্র-বিন্যস্ত সেন-বর্মণরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শে ভেদবুদ্ধির দুর্বলতা, স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের দুর্বলতা তো ছিলই; তাহার উপর বর্ণ- ও শ্রেণী -গত এই ভেদবুদ্ধি বৈদেশিক আক্রমণকে সহজ করিয়া দেয় নাই, তাহা কে বলিবে?

শুধু তো এইখানেই শেষ নয়। আর্যেতর ধর্মের আচারানুষ্ঠান এবং তন্ত্রধর্মের বিকৃতি এই সময় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্ম ও সমাজকেই স্পর্শ করিয়াছিল, এবং উভয় ধর্মেরই আচারানুষ্ঠানকে নানা প্রকার যৌনাতিশয্যে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই ফলে উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীগুলিতে নানাপ্রকারের কাম- ও যৌন

-বিলাস দেখা দিয়াছিল। বস্তুত, যৌন আচার-ব্যবহারে কোনপ্রকার শীলতাজ্ঞান এই সময় সমাজে ছিল বলিয়া মনে হয় না। নাগর সমাজের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য দাসী রাখা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। জীমূত-বাহন এবং টীকাকার মহেশ্বরের সাক্ষ্য এ সম্বন্ধে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। আর, সেন আমলেই বোধ হয় দেবদাসীপ্রথা বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। বিজয়সেন ও ভট্ট ভবদেব দুইজনই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গ করিবার গৌরব দাবি করিয়াছেন। মন্দিরে দেবদাসীর (বার-রামা) উল্লেখ ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্যে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতেও দেববারবনিতার উল্লেখ সুস্পষ্ট। সেন-বর্মণরা বোধ হয় দক্ষিণদেশ হইতে এই দেবদাসীপ্রথার প্রবাহ নূতন করিয়া বাংলাদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। সমসাময়িক বাংলার নাগর সমাজের যুবক-যুবতীদের যে কামলীলার বিবরণ ধোয়ী কবির পবনদূতে পাওয়া যায় তাহাও খুব প্রশংসনীয় নয়, অথচ, কবি তাহাকে সাধারণ সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শূদ্রনারীকে বিবাহ করিতে পারিত না, কিন্তু শূদ্রনারীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোনো বাধা ছিল না, নামমাত্র শাস্তিতেই সে অপরাধ কাটিয়া যাইত— ইহাই সমসাময়িক বাংলার স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান! বিলাস ও আড়ম্বরাতিশয্যও এই সময় নাগর সমাজকে গ্রাস করিয়াছিল। পল্লবিত বাক্য, ভাবোচ্ছ্বাসবিলাসময় কল্পনা, আড়ম্বরময় অতিশয়োক্তি, অলংকারপ্রাচুর্য এবং লালসাবিলাসময় শৃঙ্গাররসাবিষ্ট দৃষ্টি তো এই যুগেরই সাহিত্য ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য! সদ্যোক্ত যৌনাতিশয্য ও কাম-বিলাস জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠানগুলিকেও স্পর্শ করিয়াছিল। শারদীয়া দুর্গা-পূজার সময় দশমী তিথিতে শাবরোৎসব, বসন্তে হোলক (হোলী) এবং চৈত্র মাসে কাম-মহোৎসবেও যৌন-অধোগতিসূচক নানারূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। কাল-বিবেক-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, কামমহোৎসবে নানাপ্রকার যৌন অঙ্গভঙ্গী এবং জুগুপ্সিতোক্তি করিয়া নৃত্যগীত করিলে কামদেবতা প্রীত হন, এবং তাহার ফলে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়। ইহাই ছিল সমসাময়িক কালের বিবেক!

এইখানেই শেষ নয়। সেনরাজসভায় কবি ও পণ্ডিতের সমাদর ছিল খুব। আর বল্লাল, লক্ষ্মণ, এবং তাঁহার একপুত্র তো নিজেরাও ছিলেন কবি ও পণ্ডিত। বস্তুত, সেন আমল বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। কিন্তু, এই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যও সমসাময়িক ঐশ্বর্য-বিলাস এবং কামবাসনার আতিশয্য দ্বারা স্পৃষ্ট। জয়দেব স্বয়ং বলিতেছেন, ত্রুটিবিহীন শৃঙ্গার কাব্য রচনায় গোবর্ধন কবির তুলনা ছিল না। আর্যা সপ্তশতীই তাহার সাক্ষ্য। আর, জয়দেবের গীতগোবিন্দও তো এক হিসাবে শৃঙ্গারকাব্যই; রাজসভায় বসিয়া রাজা ও পাত্রমিত্র সভাসদ সকলে এইসব মদির-মধুর কাব্য উপভোগ করিতেন। এই পরিবেশ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে দেব-বারবনিতা ও দেবদাসীদের যে উচ্ছ্বাসময় স্তব সমসাময়িক কবিরা করিয়াছেন তাহার কোথাও কোন অমিল নাই। এই বিলাসলালসাময় ভাবকল্পনা কি রাজসভার বাহিরেও বিস্তার লাভ করে নাই, বৃহত্তর সমাজদেহের নাড়ীতে প্রবেশ করে নাই? এই প্রসঙ্গে সভাকবি উমাপতিধরের শ্লোক রাজার সাধুবাদ সম্বন্ধে শ্লোকটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেক-শুভোদয়ায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনের রাজসভার অন্যতম অলংকার, কবি, স্মৃতি পণ্ডিত, মহাধর্মাধ্যক্ষ

হলায়ুধ মিশ্র শেখ্ জালাল্-উদ্-দীন তাব্রিজির খুব পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ তথ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেনরাষ্ট্র ও সেনরাজসভার চরিত্র বলিয়া কিছু ছিল না। সভাকবি উমাপতি-ধর এবং মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র এই চরিত্রহীনতার দুইটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থাটাও এই ফাঁকে একটু দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। বখ্ত্-ইয়ার কর্তৃক বিহার-লুণ্ঠনের মিন্হাজ-কথিত কাহিনী আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ লামা তারনাথও কিছু বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। তারনাথের বিবরণী হইতে মনে হয়, একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু বখ্ত্-ইয়ারের গুপ্তচরের কাজ করিয়াছিলেন, এবং বাংলার সঙ্গে তাহার যোগাযোগের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। মিন্হাজ ও তারনাথের বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, বিহার-বাংলারই একদল লোক বিভীষণ-বাহিনীর কাজ করিয়াছিল। মগধে তখন পরিপূর্ণ নৈরাজ্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অবস্থাটা যে অচিরেই কী হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছিল। মিন্হাজও লক্ষ্মণসেনের রাজ-জ্যোতিষীদের মুখে যে-ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার অর্থও এই যে, সকলেই অবস্থাটা জানিত, এবং তুরস্কজাতীয় মুসলমান শত্রুরাই যে আক্রমণকর্তা তাহাও জানিত। অথচ, প্রতিরোধের ব্যবস্থা তেমন কিছু হইয়াছিল, বলা যায় না। মুহম্মদ বখ্ত্-ইয়ারের আক্রমণের আগেই উত্তর-ভারতের বিহার পর্যন্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরস্ক-কেন্দ্র কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল তারনাথের বিবরণ হইতেও তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কি এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরস্ক-কেন্দ্রের সঙ্গেই বখ্ত্-ইয়ারের যোগসাধন করিয়া দিয়াছিলেন?

একদিকে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাংলাদেশের রাজ্য ও সমাজ ভেদবুদ্ধিধারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত; রাজসভা চরিত্র- ও আত্মশক্তি -হীন; ধর্ম ও সমাজ বিলাসলালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত; শিল্প ও সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধবিচ্যুত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলংকারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত; জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুক্তাকে পঙ্গু; উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ। বখ্ত্-ইয়ারের নবদ্বীপ-জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম মাত্র।

একাদশ অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবন

এক

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব প্রভৃতি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। কিন্তু কোন দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয়, জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্যাই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে। চর্যার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় এই আচরণ যতটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেইহেতু মানুষের মানস-সংস্কৃতির পরিচয়, এবং বোধ-হয় তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে।

প্রাচীন বাংলার মানস-সংস্কৃতির কথা বলিতে বসিয়া সেইজন্য দৈনন্দিন জীবন-চর্যার কথাই সর্বাগ্রে বলিতেছি। কিন্তু, এই দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্তরূপ ফুটাইয়া তুলিবার উপায় তথ্যগত ইতিহাস-রচনায় নাই। সেই চলমান মানবপ্রবাহের জীবনরূপ সমসাময়িক কোন সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই; আহার-বিহার, বসন-ভূষণ, খেলাধুলা, আমোদ-উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য শুধু বর্তমান। যেসব তথ্য আমরা পাইতেছি তাহা সমস্তই প্রায় পরোক্ষ, অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয়ে যতটুকু উল্লিখিত ততটুকুই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অস্ট্রিক- ও দ্রাবিড় -ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে। সেইহেতু আমাদের জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে যেসব শব্দ ও শব্দনির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোন না কোনরূপে বর্তমান। আমাদের আহার-বিহার, বসন-ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এই সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে এই শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন-সাহিত্যেও কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়, কিন্তু এইসব উপাদান কতটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থেও কিছু কিছু সংবাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; বাংলার নাগর সভ্যতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য এই শেষোক্ত গ্রন্থেই জানা যায় এই দুইটি গ্রন্থ ছাড়া গুপ্তপূর্ব ও গুপ্ত পর্বের বাংলার দৈনন্দিন জীবনের কোন খবর আর কোথাও দেখিতেছি না।

গুপ্তপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লিপিমালায় আমাদের আহার্য ও পরিধেয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে সাংসারিক জীবনের মান,

সাংসারিক আদর্শ সম্বন্ধে টুকরা-টুকরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংবাদ একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মূর্তিগুলিতে এবং পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে। দেবদেবীর মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত; সেইহেতু দেবদেবীদের বেশভূষা, অলংকরণ, দেহসজ্জা প্রভৃতিতে জীবনের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহা কতকটা প্রথাবদ্ধ মনন-কল্পনা দ্বারা রঞ্জিত ও প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পাহাড়পুরের অথবা ময়নামতীর বিহার-মন্দিরগাত্রের অগণিত পোড়ামাটির ফলকগুলি সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। এই ফলকগুলিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তাহার অকৃত্রিম সারল্য ও বস্তুময়তায় প্রতিফলিত; ফলকগুলির লোকায়ত শিল্পই সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের ইঙ্গিত আমাদের দুয়ারে বহন করিয়া আনিয়াছে। গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজের জীবনযাত্রার এমন সুস্পষ্ট ছবি আর কোথাও পাইবার উপায় নাই।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু খবর বাংলার সুদীর্ঘ লিপিমালায়ও পাওয়া যায়। আহার-বিহার, বসন-ভূষণ এবং গ্রাম্য ও নাগর জীবন সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কবিকল্পনায়, নানা আলংকারিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন। বসন-ভূষণ এবং সাধারণ সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমাপ্রমাণ হইতেও আহরণ করা সম্ভব।

সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে। বাংলার সুবিস্তৃত স্মৃতি-সাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম- ও ব্রহ্মবৈবর্ত -পুরাণ, চর্যাগীতিমালা, দোহাকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকৃতপৈঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মতন কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষে ধরা পড়িয়াছে। সদ্যোক্ত সমস্ত গ্রন্থেরই দেশকাল মোটামুটি সুনির্ধারিত, অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশই বাংলাদেশে, এবং দশম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার বাঙালীত্ব সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তবে নৈষধচরিতের বিবরণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

অন্যান্য অধ্যায়ের মতো এ অধ্যায়ে কালপর্বানুযায়ী তথ্য সন্নিবেশ করিয়া ধারাবাহিক একটা বর্ণনা দাঁড় করানো কঠিন। এই অধ্যায়ের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র মোটামুটিভাবে প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তবে, সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া গ্রাম্য জীবনযাত্রার এমন পরিবর্তন কিছু হয় নাই।

দুই

মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার যে সূক্ষ্ম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে পরিচয় ধরা পড়ে নাই।

ইতিহাসের ঊষাকাল হইতেই ধান্য যে দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, সে দেশে প্রধান খাদ্যই হইবে ভাত তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিকভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর দান। উচ্চ-কোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত, এবং 'হাঁড়িত ভাত নাহি, নিতি আবেশী', ইহাই বাঙালী জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ! ভাত রাঁধার প্রক্রিয়ার তারতম্য তো ছিলই। গরম ধূমায়িত ভাত ঘৃতসহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বোধ হয় সাধারণ রীতি। প্রাকৃতপৈঙ্গল-গ্রন্থেও (চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি?) প্রাকৃত বাঙালীর আহার্য দেখিতেছি, কলাপাতায় 'ওগ্‌গরা ভত্তা গাইক ঘিত্তা', গোঘৃতসহকারে সফেন গরম ভাত। নৈষধচরিতের বর্ণনা বিস্তৃততর : পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি হইতে আর-একটি বিচ্ছিন্ন (ঝরঝরে ভাত), সে অন্ন সুসিদ্ধ, সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সৌরভময় (১৬/৬৪)। দুগ্ধ ও অন্নপক্ক পায়সও উচ্চকোটির লোকদের এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল (১৬/৭০)।

ভাত সাধারণত খাওয়া হইত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র এবং গ্রাম্য লোকদের প্রধান উপাদানই ছিল বোধ হয় শাক ও অন্যান্য সবজি তরকারি। নানা শাকের মধ্যে নালিতা- (পাট)শাকের উল্লেখ প্রাকৃতপৈঙ্গলে দেখিতেছি। বস্তুত, এই গ্রন্থে প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্যতালিকাটি উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়াঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করিতে পারেন তাঁহার স্বামী পুণ্যবান। কিন্তু সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহ-ভোজে বরযাত্রীরা শাকসব্জির তরকারি পছন্দ করিতেন না। এক বিবাহভোজে যেসব ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যাইতেছে, ব্যঞ্জন তরকারি প্রভৃতির বাহুল্য সেই যুগেও উচ্চকোটির বাঙালী সমাজে যথেষ্টই ছিল, এবং এত বেশি আয়োজন হইত যে, লোকেরা সব খাইয়া, এমন কি গণনাও করিয়া উঠিতে পারিত না। এই ধরনের বৃহৎ ভোজে সামাজিক অপচয়ের কথা ই-ৎসিঙ্‌ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যেসব ব্যঞ্জনাদি দময়ন্তীর বিবাহভোজে পরিবেশিত হইয়াছিল তাহা তালিকাগত করা যাইতে পারে : দই, ও রাইসরিষার প্রস্তুত শ্বেতবর্ণ কিন্তু বেশ ঝালযুক্ত কোন ব্যঞ্জন (খাইতে খাইতে লোকদের মাথা ঝাঁকিতে এবং তালু চাপড়াইতে হইয়াছিল); হরিণ, ছাগ এবং পক্ষিমাংসের নানা রকমের ব্যঞ্জন; মাংসের নয় কিন্তু দৃশ্যত মাংসোপম, বিবিধ উপাদানযুক্ত কোন ব্যঞ্জন; মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য আরো নানা প্রকারের সুগন্ধি ও প্রচুর-মসলাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি, নানাপ্রকারের সুমিষ্ট পিষ্টক, এবং দই ইত্যাদি। পানীয় পরিবেশিত হইয়াছিল কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পর দেওয়া হইয়াছিল নানা-মসলাযুক্ত পানের খিলি। বৌদ্ধ গান ও দোহায় দেখিতেছি পানের সঙ্গে মসলা হিসাবে কর্পূরের ব্যবহার করা হইত।

দই, পায়স, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানাপ্রকারের খাদ্যের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে পাইতেছি। এগুলি চিরকালই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভবদেব-ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই স্বাস্থ্যগত কারণে।

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষভাবে শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকদের মধ্যে এবং সমাজের অভিজাত স্তরে। ছাগমাংসও বহুল

প্রচলিত ছিল সমাজের সকল স্তরেই। কোন কোন প্রান্তে ও লোকস্তরে শুকনো মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভবদেব-ভট্ট শুকনো মাংস খাওয়া অনুমোদন করেন নাই, বরং নিষিদ্ধই বলিয়াছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক, অথবা নিরামিষই হোক, বাঙালীর রান্নার প্রক্রিয়া যে জটিল এবং নানা উপাদানবহুল ছিল তাহা নৈষধচরিতের ভোজের বিবরণেই সুস্পষ্ট।

নদনদী-খালবিলবহুল, প্রশান্ত-সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি-অস্ট্রেলীয়মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না। মাংসের প্রতিও বাঙালীর বিরাগ কোনদিনই ছিল না, কিন্তু আর্য-ভারতে ছিল: বিশেষভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই খাদ্যের জন্য প্রাণি-হত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে তো বটেই, একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বাঁধিতেছিল এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিষ আহার্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল। বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্ট ভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুত, মাংস ও মৎস্য আহার বাংলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও গভীরাভ্যস্ত যে, এই সমর্থন ছাড়া ভবদেবের আর কোন উপায় ছিল না। বাংলার অন্যতম স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও তাহাই করিয়াছেন: বিষ্ণুপুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কয়েকটি পর্বদিবস ছাড়া আর কোন দিনেই মৎস্য বা মাংস আহার গর্হিত কাজ কিছু নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে রোহিত, শফর (পুঁটি বা শফরী মাছ), সকুল (শোল) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়া জীমূতবাহন ইল্লিস (ইলিশ বা ইলশা) মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মনে হয়, আজিকার দিনের মতো প্রাচীন কালেও ইলিশ মাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল এবং ইলিশের তৈল নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। সব মাছ কিন্তু ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল না; যেসব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাহাদের মুখ ও মাথা সাপের মতো (যেমন, বাণ মাছ), যাহাদের আঁশ নাই সেসব মাছ, ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচা ও শুকনো মাছ খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বলিতেছেন, বঙ্গালদেশের লোকেরা শুকনো মাছ খাইতে ভালোবাসিত। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস-বক, হাঁস, দাত্যূহ পক্ষী, উট, গোরু, শূকর প্রভৃতির মাংস একেবারেই ছিল অভক্ষ্য, অন্তত ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিশাসিত সমাজে। তবে, নিম্নতর সমাজস্তরে এবং আদিবাসী কোমের লোকদের মধ্যে নানাপ্রকারের অকুলীন মৎস্য, নানাপ্রকারের পক্ষিমাংস সমস্তই ভক্ষ্য ছিল। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে গোধা, শশক, সজারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধানিষেধ কাহারও পক্ষে কিছু ছিল না। বাঙালীর মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়; মাছকোটা এবং ঝুড়িতে ভরিয়া মাছ হাটে লইয়া যাওয়ার দুটি অতি বাস্তব চিত্র কয়েকটি ফলকেই উৎকীর্ণ। শবর পুরুষ হরিণ শিকার করিয়া কাঁধে ফেলিয়া বাড়ি লইয়া যাইতেছে, সে চিত্রও বিদ্যমান। শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাধদের প্রধান বৃত্তিই তো ছিল শিকার। জালের সাহায্যেও হরিণ ধরা

হইত, এই ধরনের ইংগিত আছে ভুসুকুর একটি চর্যাগীতিতে। তরঙ্গসংকুল মাঝ-নদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার ইংগিতও আছে একটি চর্যাগীতে।

যেসব উদ্ভিদ্ তরকারি আজও আমরা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই, যেমন বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, কাঁকরুল, কচু (কন্দ) প্রভৃতি আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এসব তরকারি বাঙালী খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আদিপর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না। নানা-প্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যাসও বাঙালীর সুপ্রাচীন।

ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ও ইক্ষুর উল্লেখই পাইতেছি বারবার। আম ও কাঁঠালের উল্লেখ তো লিপিমালায় সুপ্রচুর। কলা আদি-অস্ট্রেলীয়-অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের দান; প্রাচীন বাংলার চিত্রে ও ভাস্কর্যে কদলীভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র সুপ্রচুর। পূজা, বিবাহ, মংগলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস আজিকার মতো তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল; ইক্ষুরস জাল দিয়া একপ্রকার গুড় (এবং বোধ হয় শর্করাখণ্ড জাতীয় একপ্রকার 'খণ্ড' চিনিও) প্রস্তুত হইত। হেমন্তে নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত বাংলার গ্রামের বর্ণনা সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে দীপ্যমান। তেঁতুলের উল্লেখ আছে একটি চর্যাগীতিতে।

কালবিবেক ও কৃত্যতত্ত্বার্ণব-গ্রন্থে আশ্বিন মাসে কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে আত্মীয়বান্ধবদের চিড়া এবং নারিকেলের প্রস্তুত নানাপ্রকারের সন্দেশে পরিতৃপ্ত করিতে হইত, এবং সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটিত পাশাখেলায়। খই-মুড়ি (লাজ) খাওয়ার রীতিও বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল; খই বা লাজ যে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ বিবাহোৎসবে সুপ্রচুর খই-বর্ষণের বর্ণনায় এবং লাজহোমের অনুষ্ঠানে।

দুধ, নারিকেলের জল, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ্যজাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার গৌড়ীয় মদ্যের খ্যাতি ছিল সর্বভারতব্যাপী। ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু ও তালরস প্রভৃতি গাঁজাইয়া নানাপ্রকারের মদ্য প্রস্তুত হইত। ভবদেবভট্ট তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকার মদ্য-পানীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কালে স্বর্ণ, মদ্য, রক্ত, মৎস্য ও মাংস উপচারে এবং নরবলি সহকারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শিবপূজা নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিবপূজার পক্ষে এই নিষেধ প্রযোজ্য হইলেও শক্তি পূজায় এইসব উপচার ও নরবলি নিষিদ্ধ ছিল না, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাল ছাড়া অন্য সময়ে কোন পূজায়ই তেমন নিষেধ কিছু ছিল না। চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে যেভাবে শুঁড়িখানার উল্লেখ পাইতেছি, মনে হয়, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভিতর মদ্যপান খুব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। বেলের খোলা করিয়া মদ্যপানের উল্লেখ আছে সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে; বিরুবাপাদের একটি চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, মদ্য ঢালা হইত ঘড়ায় ঘড়ায়।

প্রাচীন বাঙালীর খাদ্যতালিকায় ডালের উল্লেখ কোথাও দেখিতেছি না। ইহাতে

আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বাংলা, আসাম ও ওড়িষ্যায় যত ডাল আজও ব্যবহৃত হয় তাহার খুব স্বল্পাংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায়। পূর্বে বোধ হয় উৎপাদন আরও কম ছিল। নিম্নকোটি স্তরে বাংলার সর্বত্রই আজও অনেকে ডাল ব্যবহারই করেন না; প্রাচীন কালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না। বস্তুত, ডালের চাষ ও ডাল খাওয়ার রীতিটা বোধ হয় আর্য-ভারতের দান, এবং তাহা মধ্যযুগে।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই মৎস্যভোজী বাঙালীর আহার্য অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না; আজও নয়। তীর্থংকর মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে শিষ্যদল লইয়া পথহীন রাঢ়- ও বজ্র -ভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহাদের অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সন্দেহ নাই যে, সমসাময়িক সাধারণ বাঙালীর ব্যঞ্জনাদি জৈন আচার্যদের নিরামিষ রুচি ও রসনায় অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল।

রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা মৃগয়া। আর, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কোমদের শিকারই ছিল প্রধান উপজীব্য। ইঁহাদের কিছু কিছু শিকারচিত্র পাহাড়-পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে দেখা যায়। এই ফলকগুলিতেই দেখিতেছি কুস্তী বা মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকারের দুঃসাধ্য শারীরক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির লোকদের অন্যতম বিহার। পবনদূতে নারীদের জলক্রীড়া এবং উদ্যানরচনার উল্লেখ আছে; এই দুইটিই বোধ হয় ছিল তাঁহাদের প্রধান শারীরক্রিয়া। দ্যূত বা পাশাখেলা এবং দাবাখেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি। পাশাখেলাটা তো বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। দাবাখেলার প্রচলন যে বাংলাদেশে কবে হইয়াছিল বলা কঠিন; তবে চর্যাগীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ 'রাজা'), 'মন্ত্রী', 'গজবর' এবং 'বড়ে', এই চারি গুটি, খেলার 'দান', এবং ছকের চৌষট্টি কোঠার বা ঘরের উল্লেখ এমন সহজভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেলা বাংলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। নিম্নকোটিস্তরে এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা, যথা, গুটি বা ঘুঁটি খেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপঁচিশ, আডাইঘর প্রভৃতি তখন হইতেই সুপ্রচলিত ছিল, এমন অনুমানে কিছু-মাত্র বাধা নাই। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের অনুসন্ধানে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে যে, এই সমস্ত খেলা সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষ দেশ ও দ্বীপগুলির সুপ্রাচীন কৌম-সমাজের মৌলিক গৃহক্রীড়া।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থ হইতে জানা যায়, বাজি রাখিয়া তখনকার দিনের লোকেরাও জুয়া খেলিতে অভ্যস্ত ছিল। লোকেরা বাজি রাখিয়া ভেড়া ও মুরগীর লড়াই খেলিত ও খেলাইত।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থ হইতে জানা যায়, বাজি রাখিয়া তখনকার দিনের অভিজাতবর্গের পুরুষদের মধ্যে হস্তী- ও অশ্ব -ক্রীড়া সুপ্রচলিত ছিল।

নৃত্যগীতবাদ্যের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্রচুর। রামচরিত, পবন-দূত প্রভৃতি কাব্যে, নানা লিপিতে, সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকে, চর্যাগীতি ও দোহাকোষের নানা জায়গায় নানা সূত্রে নৃত্যগীতবাদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় উচ্চ ও নিম্নকোটি উভয় স্তরেই এই দুই বিদ্যা ও ব্যসনের সমাদর ছিল যথেষ্ট। বাররামা ও দেবদাসীদের সকলকেই নৃত্যগীতবাদ্যপটীয়সী হইতে

হইত। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে দেখিতেছি, পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরে যে নৃত্য-গীত হইত তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তর মূর্তিতে নানা ভঙ্গিতে নৃত্যপর পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতি সুপ্রচুর। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত উভয় পুরাণেই নট পৃথক বর্ণ হিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন, সমাজের নিম্নতর স্তরে। কিন্তু উচ্চকোটির কেহ কেহও বোধ হয় নটনটীর বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। জয়দেবগৃহিণী পদ্মাবতী প্রাগ্‌বিবাহ-জীবনে কুশলী নটী ছিলেন এবং সংগীতে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে, কোন কোন প্রস্তরচিত্রে নানা-প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, যেমন, কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি। রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীতে বিশেষ এক ধরনের মুরজ (মৃদঙ্গ) বাদ্য প্রচলিত ছিল; বাংলার অন্যত্র বোধ হয় অন্য প্রকারের মুরজের প্রচলন ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে আছে, তুম্বীবীণার উল্লেখ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাইতেছি চর্যাগীতিতে—কণ্ঠ- ও যন্ত্র -সংগীত উভয়েরই, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং বোধ হয় গীতাভিনয়েরও। চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, ডোম্বীরা সাধারণত খুব নৃত্যগীতপরায়ণা হইতেন। লাউ-এর খোলা আর বাঁশের ডাঁট বা দণ্ডে তন্ত্রী (তার) লাগাইয়া বীণা-জাতীয় এক-প্রকার যন্ত্র ইঁহারা প্রস্তুত করিতেন, আর গান গাহিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। চর্যাগীতির একটি পদে বুদ্ধ-নাটকের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মতন। নৃত্য এবং গীতের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় বোধ হয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল, এবং এই নাচ-গানের ভিতর দিয়াই বোধ হয় কোন বিশেষ ঘটনাকে রূপদান করা হইত। নৃত্যগীতপরায়ণা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ডোম্বী ও অন্যান্য তথাকথিত নীচজাতীয় রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন কিছুটা শিথিল হইত, এবং সেইহেতু তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকোটির পুরুষদেরও মনোহরণে সমর্থ হইতেন। তাহা ছাড়া জাতি- ও শ্রেণীসংস্কার -মুক্ত সহজযানী ও কাপালিকদের যোগের সঙ্গিনী হইতেও কোন বাধা তাঁহাদের বা যোগীদের কাহারও হইত না।

লোকায়ত সমাজে এবং সামাজিক ও ধর্মগত উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে নানা ক্রিয়া-কর্মে নৃত্যগীতের প্রমাণ সমসাময়িক শিল্পসাহিত্যে সুস্পষ্ট। চর্যাগীতির কাহ্নুপাদের একটি গীতে সমসাময়িক বিবাহযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা আছে এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। তখনকার দিনেও বাংলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করিত, এবং যৌতুকের লোভে নীচকুল হইতে কন্যাগ্রহণেও খুব আপত্তি ছিল না।

সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদব্রজে এবং জলপথে ভেলা বা ডিঙা এবং নৌকা-যোগেই যাতায়াত করিত। ভেলা, ডিঙা-ডিঙ্গী-ডোঙ্গা, প্রত্যেকটি শব্দই অস্ট্রিক ভাষার দান, এবং মনে হয়, আদিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। নৌকার ব্যবহার, নৌ-বন্দর, নৌ-ঘাট, নৌবাণিজ্য, নৌদণ্ডক প্রভৃতির কথা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি; কিন্তু নৌকার সঙ্গে বাঙালী জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগের কথা ধরা পড়িয়াছে চর্যাগীতিতে। রূপকছলে নৌকা, *নৌকার হাল, গুণ, কেড়ুয়াল, পুলিন্দা, খোলা, চক্র বা চাকা, খুঁটি, কাছি, সেঁউতি*, পাল প্রভৃতি এমন সহজভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, মনে হয়, এই যানটির সঙ্গে

বাঙালীর হৃদয়ের একটি গভীর যোগ ছিল। নৌকায় খেয়া-পারাপারের ইঙ্গিতও আছে। পারের মাশুল আদায় হইত কড়িতে বা বোড়িতে। খেয়া-পারাপারের কাজ অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর নারীরাও করিতেন। নদ-নদী-খাল-বিলের বাংলাদেশে নৌকা ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্মজীবনের রূপ-রূপক গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। চর্যাগীতির একটি পদে বলা হইয়াছে,

'ভবনদী গভীর, গম্ভীর বেগে বহিয়া চলে; দুই তীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নাই।'

এ ছবি তো একান্তই বাংলার নদনদীগুলির—দুই তীর পলিমাটির কাদায় ভরা; আর নদীর গভীর গম্ভীর বেগ, সেও তো গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-লৌহিত্যেরই। সরহ-পাদের একটি গীতে আছে,

পথে বামে দক্ষিণে অনেক খাল-বিখাল; সরহ বলেন, সোজা পথ ধরিয়া চলো।
অর্থাৎ খালবিখালের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িও না, সোজা চলিয়া যাও।

এই ছবিও তো একান্তই বাংলাদেশের।

স্থলপথে গ্রাম হইতে দূরে গ্রামান্তরে বা নগরে যাইবার লোকায়ত যান ছিল গোরুর গাড়ি। মহিষের গাড়ির উল্লেখ দেখিতেছি না; কিন্তু নৈষধচরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালী প্রাচীন কালে মহিষের দধি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের রাজাদের চতুরশ্ববাহিত রথ ছিল। অশ্ববাহিত যান উচ্চকোটির লোকেরা ব্যবহার করিতেন, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন, যুদ্ধে গঙ্গারাষ্ট্রের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান বলই ছিল হস্তিবল। অসংখ্য লিপিতেও হস্তিসৈন্যের উল্লেখ সুপ্রচুর। সুপ্রাচীন কাল হইতেই পূর্বভারতে হস্তী অন্যতম প্রধান বাহন বলিয়াও গণ্য হইত। এই পূর্ব-ভারতেই, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ও কামরূপে, হাতি ধরা ও হাতির চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি বিশেষ শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তো বলেন, হস্তী-আয়ুর্বেদ বাংলার অন্যতম প্রধান গৌরব। চর্যাগীতি ও দোহাকোষে হাতির রূপক আশ্রিত অনেকগুলি গীত স্থান পাইয়াছে এবং রূপকগুলি এমন, মনে হয়, এই প্রাণীটির সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের গভীর পরিচয় ছিল। খেদা পাতিয়া আজিকার দিনে যেমন করিয়া হাতি ধরা হয় তখনও তেমন করিয়াই হাতি এবং হাতি-শিশু (করভ) ধরা হইত। উত্তর ও পূর্ব-বাংলার পার্বত্য নদীর তীরে হাতিরা ঘুরিয়া বেড়াইত যথেচ্ছভাবে। হাতি ধরিবার আগে সারিগান গাহিয়া হাতির মনকে বশ করিতে হইত এইরূপ উল্লেখ বীণাপাদের একটি গানে আছে।

গোরুর গাড়ির চেহারা এখনও যেরূপ প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল; বাংলা ও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রস্তর- ও মৃৎ -ফলকই তাহার প্রমাণ। বরযাত্রায়ও গোরুর গাড়ি ব্যবহার করা হইত, চর্যাগীতির একটি গীতে এইরূপ ইঙ্গিত আছে। পাহাড়পুরের একটি মৃৎফলকে সুসজ্জিত অশ্বের একটি চিত্র আছে; এই ধরনের সজ্জিত অশ্বে চড়িয়াই সংগতিসম্পন্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেন।

পালকির ব্যবহারও ছিল বলিয়াই মনে হয়। কেশবসেনের ইদিলপুরলিপিতে দেখিতেছি, একটু প্রচ্ছন্নভাবে হস্তিদন্ত নির্মিত বাহদণ্ডযুক্ত পালকির উল্লেখ। বল্লালসেন নাকি তাঁহার শত্রুদের রাজলক্ষ্মীদিগকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই ধরনের পালকি চড়াইয়া।

রামচরিত ও পবনদূতে রামাবতী ও বিজয়পুরের বর্ণনা এবং বাণগড়, রামপাল, মহাস্থান, দেওপাড়া প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয়, সমৃদ্ধ নগরবাসীরা ইটকাঠের তৈরি ক্ষুদ্র বৃহৎ হর্ম্যে বাস করিতেন; রাজপ্রাসাদও তৈরি হইত ইটকাঠেই। কিন্তু এইসব ভবনের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রামে ইটকাঠের বাড়ি বড় একটা ছিল বলিয়া মনে হয় না; দরিদ্র নিম্নকোটির লোকেরা তো বটেই, এমন কি সম্পন্ন মহত্তর-কুটুম্ব-গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির তৈরি বাড়িতে বাস করিতেন; মৃৎফলকের সাক্ষ্যে মনে হয়, চাল হইত খড়ের, বাঁশের চাঁচারি বুনিয়া তৈরি হইত বেড়া, আর খুঁটি হইত বাঁশের বা কাঠের। চর্যাগীতিতে বাঁশের চাঁচারি দিয়া বেড়া বাঁধিবার কথা আছে (চারিপাসে ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী)। মাটির দেয়ালও ছিল; রাঢ়াঞ্চলে ও উত্তর-বঙ্গে মাটির দেয়াল; পূর্বাঞ্চলে চাঁচারির বেড়া। প্রস্তর- ও মৃৎ -ফলকের চিত্র এবং পাণ্ডুলিপিচিত্র হইতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাঁশের বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকাকৃতি বা দুই-তিন স্তরে পিরামিডাকৃতির চাল বা ছাউনি তৈরি হইত। একান্ত গরিব গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকেরা কুঁড়েঘরে বাস করিতেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে এই ধরনের কুঁড়েঘরের একটি বাস্তব বর্ণনা আছে; 'প্রচুরপয়সি' প্রাচ্য দেশে এবং বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশে বর্ষায় দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণগৃহের দুর্দশার এমন বস্তুনির্ভর অথচ কাব্যময় বর্ণনা বিরল:

> 'কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।'

নদ-নদী-খাল-বিখালের বাংলাদেশে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়া যাইতে সাঁকোর প্রয়োজন ছিলই; এবং এই কারণেই বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ও ছিল প্রাচীন কাল হইতেই। চর্যাগীতির একটি গীতে বলা হইয়াছে, পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে পারাপার করিতে পারে সেজন্য চাটিলপাদ বেশ একটি দৃঢ় সাঁকো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বড় গাছ চিড়িয়া সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হইত এবং টাঙ্গিদ্বারা ইহাকে শক্ত করা হইত।

গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্যাগীতি, রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, এবং তাহাদের প্রতিকৃতি প্রস্তর- ও মৃৎ -ফলকে দেখিতেছি। সমৃদ্ধ, বিত্তবান্ লোকেরা সোনার ও রূপার তৈরি থালা-বাসন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থেরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা সাধারণত মাটির ভোজন- ও পান -পাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎ-ফলকে এবং নানা প্রস্তরফলকে মাটির খেলনা, ফুলদানি, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান- ও ভোজন -পাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকি, পুস্তকাধার প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এসব তৈজসপত্রের বহুল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই। নানা সুদৃশ্য মণ্ডনালংকারযুক্ত এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা রামচরিতে উল্লিখিত আছে। তবকাত্-ই-নাসীরী-গ্রন্থে আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদে সোনা ও রূপার ভোজনপাত্র ব্যবহৃত হইত। কেশবসেনের ইদিলপুরলিপিতে লোহার জলপাত্রের উল্লেখ আছে।

তিন

পূর্বে দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকপ্রকৃতির কথা বলিয়াছি। এখানে শুধু কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। দশম-একাদশ শতকে প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইঁহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং অমার্জিত। ইঁহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী; ইঁহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার, এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙিয়া পড়িবেন, এই আশংকায় সকলেই ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দর্পিত মাথাটি এদিক-সেদিক দোলান। হাঁটিবার সময় তাঁহার ময়ূরপংখী জুতায় মচমচ শব্দ হয়; মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটির দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার ক্ষীণ কটিতে লাল কটিবন্ধ। কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেত দন্ত-পঙ্‌ক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাঁহার দুই কর্ণলতিকায় তিন-তিনটি করিয়া স্বর্ণকর্ণভূষণ, হাতে যষ্টি, দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন।

বিদেশে বাঙালী বিদ্যার্থীর বসনভূষণ সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার বিস্তৃত পরিচয় লইতে হইলে বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্য-গ্রন্থের এবং প্রত্নবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইসব সাক্ষ্য হইতে বসনভূষণের মোটামুটি একটি ছবি দাঁড় করানো কঠিন নয়।

গ্রন্থারম্ভে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই-করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে ছিল না; সেলাই-বিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিল পুরারীতি। সেলাই-করা জামা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পরবর্তী কালে আমদানি করা হইয়াছিল; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী-তামিল-গুজরাতী-মারাঠীরা ধুতি পরিত্যাগ করিয়া ঢিলা বা চুড়িদার পাজামা গ্রহণ করেন নাই। পুরুষের অধোবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনই শাড়ি। ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয়, তবে একটু সংগতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভদ্র বেশ ছিল উত্তরবাসরূপে আর-এক খণ্ড সেলাই-বিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যাহা ছিল পুরুষের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজনমত অবগুণ্ঠনের কাজ করিত। দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের একবস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।

আজকাল আমরা যেমন পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঝুলাইয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরি, প্রাচীন কালের বাঙালী তাহা করিতেন না। তখনকার ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক ছোট ছিল; সাধারণত হাঁটুর উপর পর্যন্তই ছিল কাপড়ের প্রস্থ। ধুতির মাঝখানটা কোমরে জড়াইয়া দুই প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্দিকে কচ্ছ বা কাছা। ঠিক নাভির নীচেই দুই-তিন প্যাঁচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টিকে কোমরে আটকানো; কটিবন্ধের গাঁটটি ঠিক নাভির নীচেই দুল্যমান। কেহ কেহ ধুতির একটি প্রান্ত পিছনের দিকে টানিয়া কাছা দিতেন, অন্য প্রান্তটি ভাঁজ করিয়া সম্মুখ দিকে কোঁচার মতো ঝুলাইয়া দিতেন। নারীদের শাড়ি পরিবার ধরনও প্রায় একই রকম, তবে শাড়ি

ধুতির মতো এত খাটো নয়, পায়ের কবজি পর্যন্ত ঝুলানো, এবং বস্ত্রপ্রান্ত পশ্চাদ্দিকে টানিয়া কচ্ছে রূপান্তরিতও নয়। আজিকার দিনের বাঙালী নারীরা যেভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়া অধোবাস রচনা করেন প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুরূপ, তবে আজিকার মতন প্রাচীন বাঙালী নারী শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করিয়া দেহ আবৃত করিতেন না; তাঁহাদের উত্তর-দেহাংশ অনাবৃত রাখাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে সংগতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্তরে এবং নগরে—হয়তো কতকটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রেরণায়—কেহ কেহ উত্তরী বা ওড়নার সাহায্যে উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখিতেন, বা স্তনযুগলকে রক্ষা করিতেন চোলি বা স্তনপট্রের সাহায্যে। কেহ কেহ আবার উত্তরবাসরূপে সেলাই-করা 'বডিস' জাতীয় একপ্রকার জামার সাহায্যে স্তননিম্ন ও বাহু-ঊর্ধ্ব পর্যন্ত দেহাংশ ঢাকিয়া রাখিতেন। নারীর সদ্যোক্ত উত্তরবাস ও তাহার শাড়ি এবং পুরুষের ধুতি প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে—সমসাময়িক পাণ্ডুলিপিচিত্রের সাক্ষ্যে এ তথ্য সুস্পষ্ট—নানাপ্রকার লতাপাতা, ফুল এবং জ্যামিতিক নকশাদ্বারা মুদ্রিত হইত। এই নকশা-মুদ্রিত বস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে ভারত-ইরান-মধ্যএশিয়ার ঘনিষ্ঠ শিল্প- ও অলংকরণ -গত সম্বন্ধের ইতিহাস লুক্কায়িত। নারীদের দেহের উত্তরার্ধ অনাবৃত রাখার ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়; বস্তুত সমগ্র প্রাচীন আদি অস্ট্রেলীয়-পলিনেশীয়-মেলানেশীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ইহাই ছিল প্রচলিত নিয়ম।

সভা-সমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। জীমূতবাহন দায়ভাগ-গ্রন্থে সভা-সমিতির জন্য পৃথক পোশাকের কথা বলিয়াছেন। নর্তকী নারীরা পরিতেন পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পাজামা; দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দিতেন একটি দীর্ঘ ওড়না; সন্ন্যাসী-তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্র সমাজ-শ্রমিকেরা পরিতেন ন্যাঙোটি। সৈনিক ও মল্লবীরেরা পরিতেন উরু পর্যন্ত লম্বিত খাটো আঁট পাজামা; সাধারণ মজুরেরাও বোধ হয় কখনো কখনো এই ধরনের পোশাক পরিতেন; অন্তত পাহাড়পুরের ফলক-চিত্রের সাক্ষ্য তাহাই। শিশুদের পরিধেয় ছিল হয় হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত ধুতি না হয় আঁট পাজামা, আর কটিতলে জড়ানো ধটি।

আজিকার মতো প্রাচীন কালেও বাঙালীর মস্তকাবরণ কিছু ছিল না। নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশ ছিল তাহাদের শিরোভূষণ। পুরুষেরাও লম্বা বাবড়ির মতন চুল রাখিতেন; নারীদেরও লম্বমান কেশগুচ্ছ ঘাড়ের উপর খোঁপা করিয়া বাঁধা; কাহারও কাহারও বা মাথার পশ্চাদ্দিকে এলানো। সন্ন্যাসী-তপস্বীদের লম্বা জটা দুই ধাপে মাথার উপরে জড়ানো। শিশুদের চুল তিনটি 'কাকপক্ষ' গুচ্ছে মাথার উপরে বাঁধা।

ময়নামতী ও পাহাড়পুরের মৃৎফলক-সাক্ষ্যে মনে হয়, যোদ্ধারা পাদুকা ব্যবহার করিতেন; প্রহরী দ্বারবানেরাও করিতেন; এবং সে পাদুকা চামড়ার দ্বারা তৈরি হইত এমনভাবে যাহাতে পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। ব্যাদিতমুখ সেই জুতো ছিল ফিতাবিহীন। সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোন চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না, যদিও কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পিতৃদয়িত-গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষে কাষ্ঠ- এবং চর্ম-পাদুকা উভয়ের ব্যবহারেরই ইঙ্গিত বর্তমান। সংগতিসম্পন্ন লোকেদের মধ্যেও

কাষ্ঠপাদুকার চলন খুব বেশি ছিল। বাঁশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। প্রহরী, দ্বারবান্, মল্লবীরেরা সকলেই সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি ব্যবহার করিতেন।

সধবা নারীরা কপালে পরিতেন কাজলের টিপ এবং সীমন্তে সিঁদুরের রেখা; পায়ে পরিতেন লাক্ষারস অলক্তক। দেহ ও মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন চন্দনের গুঁড়া ও চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভি, জাফরান প্রভৃতি। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, গৌড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন, বোধ হয় যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য। নারীরাও নখে রং লাগাইতেন কিনা, এ বিষয়ে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। তবে চোখে যে কাজল তাঁহারা লাগাইতেন, তাহার ইঙ্গিত আছে দামোদরদেবের চট্টগ্রামলিপিতে। প্রসাধনক্রিয়ায় কর্পূর ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে মদনপালের মনহলিলিপিতে, এবং রং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপিতে। ঠোঁটে লাক্ষারস (অলক্ত-রাগ) এবং খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া দেওয়া যে তরুণীদের বিলাস-প্রসাধনের অঙ্গ, এ কথা সমসাময়িক বাঙালী কবি বলিয়াছেন। বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সীমন্তের সিঁদুর যাইত ঘুচিয়া, এ কথার ইঙ্গিত পাইতেছি দেবপালের নালন্দালিপিতে, মদনপালের মনহলিলিপিতে, বল্লালসেনের অদ্ভুত-সাগর গ্রন্থে, গোবর্ধনাচার্যের শ্লোকে।

নারীরা গলায় ফুলের মালা পরিতেন এবং মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজিতেন, এ সাক্ষ্য দিতেছে নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুরলিপি। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয় নাগর সমাজস্তরের নারীরা, বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা, প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে অবগাহনান্তর প্রসাধনে-অলংকারে সজ্জিত শোভিত হইয়া আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিমা হইয়া বিরাজ করিতেন। বক্ষোযুগলে কর্পূর ও মৃগনাভি রচনার সংবাদ পাওয়া যায় বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে। নাগর পরিবারের নারীরা বেশভূষা, প্রসাধন, অলংকার ইত্যাদিতে উত্তরাপথের আদর্শই মানিয়া চলিতেন; রাজমহিষীরা তো ভারতবর্ষের নানা জায়গা হইতেই আসিতেন, আর নাগর সমাজে রাজপরিবারের আদর্শটাই সাধারণত সক্রিয় হয়।

চন্দ্রকলার মতো কোমল কচি তালপাতার কর্ণভূষণের কথা পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ীও বলিয়াছেন : 'রসময় সুহ্মদেশে' নূতন চন্দ্রকলার মতো কোমল তালীপত্র ব্রাহ্মণ-মহিলাদের কর্ণাভরণ হইবার দাবি করিয়া থাকে।

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্যজনপদবাসীদের প্রসাধনের বর্ণনা দিতে গিয়া শুধু গৌড়রমণীর বেশ-প্রসাধনের বর্ণনাই করিয়াছেন; বোধ হয় ইহাই ছিল মানদণ্ড।

অন্যদিকে সরল স্বভাবসুন্দর পল্লীবাসিনী নারীর চিত্রও আছে। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নগরবাসিনী বিলাসিনীদের বেশভূষা চালচলন পছন্দ করিত না।

পল্লী-সুন্দরীদের প্রসাধন-অলংকরণের কথা বলিয়াছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র : 'কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী সাদা পদ্ম-মৃণালের বালা, কানে কচি রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধকেশ কবরীতে তিলপল্লব—অনাগর (অর্থাৎ, পল্লী-বাসী) বধূদের এই বেশ স্বভাবতই পথিকদের গতি মন্থর করিয়া আনে।' সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্মাদি তো করিতেনই, মাঠে-ঘাটেও

তাঁহাদের খাটিতে হইত সংসারজীবন নির্বাহের জন্য, হাটবাজারেও যাইতে হইত, সওদা কেনাবেচা করিতে হইত, আবার স্বামিপুত্রকন্যা-পরিজনদের পরিচর্যাও করিতে হইত। এইরূপে কর্মব্যস্ত মেয়েদের একটি সুন্দর বস্তুময়, কাব্যময় চিত্র আঁকিয়াছেন কবি শরণ। তাঁহারা যে একবস্ত্রপরিহিতা সে কথাও শরণের ওই শ্লোকটিতে জানা যায়।

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে নানাপ্রকার ক্ষৌমবস্ত্রের একটু ইঙ্গিত আছে; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছিলিপিতে পড়িতেছি, রত্নদ্যুতি খচিত অংশুকবস্ত্রের কথা। সূক্ষ্ম কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের কথা তো নানাসূত্রেই পাওয়া যাইতেছে। বাংলাদেশ যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে সুবিখ্যাত ছিল, এ কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গ্রীক্ পেরিপ্লাস-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব বণিক সুলেমান (নবম শতক), ভিনিসীয় মার্কো পোলো (ত্রয়োদশ শতক), চীন পরিব্রাজক ম্যা-হুয়ান (পঞ্চদশ শতক) পর্যন্ত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তি বা তিরহুতবাসী কবি শেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর নানাপ্রকারের পট্টাম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের মেঘ-উদুম্বর, গঙ্গাসাগর, গাঙ্গোর, লক্ষ্মীবিলাস, দ্বারবাসিনী, এবং শিল্‌হটী পট্টাম্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পট্টবস্ত্র: সাধারণ দরিদ্র লোকদের এসব বস্ত্র পরিবার সুযোগ ও সংগতি কিছুই ছিল না; তাহাদের ভাগ্যে জুটিত মোটা নির্ভূষণ কার্পাসবস্ত্র মাত্র, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ছিন্ন ও জীর্ণ। সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র শুধু মেয়েরাই বোধ হয় পরিতেন;. অনেকে নিজেরাই যে সে কাপড়ের সুতা কাটিয়া পাকাইয়া লইতেন, বিশেষভাবে নির্ধন ব্রাহ্মণগৃহের নারীরা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শুভাংকের শ্লোকে।

সমসাময়িক সাহিত্য ও প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন বাঙালী নারী ও পুরুষ এমন কতকগুলি অলংকার ব্যবহার করিতেন যাহা উভয় ক্ষেত্রেই এক। কর্ণকুন্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ূর, মেখলা ইত্যাদি নরনারীনির্বিশেষে ব্যবহৃত হইত। নারীরা, সম্ভবত বিবাহিতা নারীরা, বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেন শঙ্খবলয়। মুক্তাখচিত হারের কথা, মহানীলরক্তাক্ষমালার কথা বিজয়সেনের নৈহাটিলিপিতে পাইতেছি এবং দেওপাড়া-প্রশস্তিতেই শুনিতেছি, রাজবাড়ির ভৃত্যের স্ত্রীরাও নাকি হার, কর্ণাঙ্গুরী, মালা, মল এবং সুবর্ণবলয় ইত্যাদি পরিতেন। মুক্তাখচিত হার পরিতেন রাজপরিবারের মেয়েরা (নৈহাটিলিপি)। রামচরিতে পড়া যায়, হীরাখচিত নানা সুন্দর অলংকার এবং রত্নখচিত ঘুঙুরের কথা, মুক্তা, মরকত, নীলকান্তমণি, চুনি প্রভৃতি রত্নাদি ব্যবহারের কথা। আর সোনা ও রূপার গহনা তো ছিলই। বলা বাহুল্য, এইসব অলংকরণবিলাস ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে; বড়জোর শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণাভরণ, এবং ফুলের মালাতেই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

উচ্চকোটিস্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে কিভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত করা হইত, তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে। প্রথমেই কুলাচার অনুসারে সধবা ও পুত্রবতী গৃহিণীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে কন্যাকে স্নান করাইতেন এবং পরে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাইতেন। তারপর সখীরা দময়ন্তীকে কপালে পরাইলেন মনঃশিলার তিলক, সোনার টিপ, কাজল আঁকিয়া দিলেন চোখে, কর্ণযুগলে পরাইলেন দুইটি

মণিকুণ্ডল, ঠোঁটে আলতা, কণ্ঠে সাতলহর মুক্তার মালা, দুই হাতে শঙ্খ- ও স্বর্ণ-বলয়, চরণে আলতা। বিবাহের মাঙ্গলিকানুষ্ঠানে অভ্যস্তা অন্তঃপুরিকারা স্ত্রী-আচারগুলি পালন করিতেন, আর পুরুষেরা ও ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত কার্যগুলি সম্পাদনা করিতেন। বিবাহস্থানে আলপনা আঁকা হইত এবং কাজটি করিতেন মেয়েরা। শিল্পীরা নানাপ্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়া তৈরী ফুলে নগরের পথ-ঘাট সাজাইতেন, বাড়ির দেয়ালে নানা ছবি আঁকিতেন। নানাপ্রকার বাদ্যের মধ্যে বাঁশি, বীণা, করতাল, মৃদঙ্গ ছিল প্রধান। মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহতোরণের দুইপাশে কদলীস্তম্ভ রোপণ করা হইত; বাসরঘরে আজিকার মতন তখনও চুরি করিয়া চুপি দেওয়া এবং আড়ি পাতা হইত; এবং বরকন্যার গাঁটছড়াও বাঁধা হইত। নল-দয়মন্তীর বিবাহবর্ণনা-সাক্ষ্যে মনে হয়, বিবাহের পরও বর ও বরযাত্রীরা বিবাহ-বাড়িতে চার-পাঁচ দিন বাস করিতেন।

বসন-ভূষণ-প্রসাধন-অলংকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা টুকরা-টুকরা খবর নানাদিক হইতে পাওয়া যায়। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে (আনুমানিক তৃতীয় শতক) বলিতেছেন, গৌড়ীয় নারীদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ, এবং তাঁহাদের চুলের বেণীর শেষাংশ থাকিত শিখার মতো মুক্ত।

প্রাচীন বাঙালীর দেহবর্ণ কিরূপ ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ভরত-নাট্যের একটি শ্লোক হইতে। তাহাতে বলা হইয়াছে,

'(নাটকের) শক-যবন-পহ্লব-বাহ্লিক প্রভৃতি যেসব (পাত্রপাত্রী) উত্তরদেশবাসী তাহাদের দেহের বর্ণ করিতে হইবে সাধারণত গৌর; পঞ্চাল, শূরসেন, উড্র, মগধ এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গবাসীদের বর্ণ করিতে হইবে শ্যাম।'

এইসব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গৌড়বাসীদের তথা প্রাচ্যবাসীদের দেহবর্ণ সাধারণত ছিল শ্যাম, তবে রাজপরিবার এবং অন্যান্য অভিজাত পরিবারের নর-নারীদের দেহবর্ণ যে অনেক সময় হইত গৌর, তাহাও রাজশেখর বলিয়াছেন।

চার

প্রাচীন বাঙালী সমাজের নানা কামনাবাসনা ও ব্যসনের কথা নানা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এখানে সমস্ত সাক্ষ্য একত্র করিয়া সার সংকলন করা অনুচিত হইবে না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই বাংলাদেশ স্বল্পাংশে হইলেও উত্তর-ভারতীয় সদাগরী ধনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তর-ভারতের নাগর সভ্যতার স্পর্শও তাহার অঙ্গে লাগিয়াছিল। বাৎস্যায়নীয় নাগরাদর্শ বাংলার নাগর সমাজেরও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা, এবং গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুরের মহিলারা যে নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে কাম-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন তাহার বিবরণ বাৎস্যায়নই রাখিয়া গিয়াছেন। সে বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ভিন্-প্রদেশীরা গৌড়-বঙ্গের যুবক-যুবতীদের এই ধরনের কাম-বাসনাকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। স্মৃতিকার বৃহস্পতির কয়েকটি শ্লোক দেবলভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা-গ্রন্থে ও ভট্ট নীলকণ্ঠের ব্যবহার-ময়ূখ-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা হইতে জানা যায়, বৃহস্পতি দুই কারণে বাঙালী দ্বিজবর্ণকে

লোকদের নিন্দা করিয়াছেন; প্রথম কারণ, তাঁহাদের মৎস্য ভক্ষণ; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহাদের সমাজের নারীরা দুর্নীতিপরায়ণা! শুধু বাৎস্যায়নের কালেই নয়, তাহার পরেও প্রাচীন বাঙালী বোধ হয় কামবাসনার সংযম অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় নাই। ধোয়ীর পবনদূতেও দেখিতেছি, কামচরিতার্থতার অবাধ লীলা কবি সোৎসাহে এবং সাড়ম্বরে বিবৃত করিয়াছেন।

কেশবসেনের ইদিলপুরলিপি ও বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপিতে আছে, প্রতি সন্ধ্যায় সভা-নন্দিনীদের নূপুরঝংকারে সভা ও আমোদগৃহগুলি পরিপূরিত হইত। তাহা ছাড়া নগরে ও গ্রামে বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখার প্রথা যে প্রায় সর্বব্যাপী ছিল তাহা তো জীমূতবাহনই দায়ভাগ-গ্রন্থে বলিয়াছেন; এবং টীকাকার মহেশ্বর বলিতেছেন, দাসী রাখা হইত শুধু কামচরিতার্থতার জন্য। এই ধরনের দাসী রাখার প্রথা বাংলাদেশে বহুদিন প্রচলিত। বাৎস্যায়নও ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দাসীরা অস্থাবর সম্পত্তির মতো যথেচ্ছ ক্রীত ও বিক্রীত হইতেন।

এর উপর ছিল আবার দেবদাসীপ্রথা। বাংলাদেশে এই প্রথার প্রথম উল্লেখ অষ্টম শতকে, এবং তাহা কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে নর্তকী কমলা প্রসঙ্গে। দেবদাসীরা সাধারণত প্রায় সকলেই নানাকলানিপুণা হইতেন এবং বিত্তবান্ ও প্রভাবশালী সমাজের কামবাসনা পরিপূরণের সঙ্গিনী হইতেন। এই হিসাবে বাররামাদের সঙ্গে তাঁহাদের পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না। রামচরিত-কাব্যে তো ইঁহাদের স্পষ্টত দেব-বারবনিতাই বলা হইয়াছে; পবনদূতে বলা হইয়াছে বাররামা। পাল আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিল না; পরে দক্ষিণী প্রভাব ও সংস্পর্শের ফলে ক্রমশ দেবদাসী প্রথা দেশে বিস্তার লাভ করে এবং সেন-বর্মণ আমলে দেবদাসীরা সমাজের উচ্চস্তরের মন ও কল্পনা, কামনা ও বাসনাকে একান্তভাবে অধিকার করিয়া বসেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি এবং ভট্টভবদেবের লিপিতে ইহাদের বিলাস-লাস্য ও সৌন্দর্যলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে।

অথচ, অন্যদিকে সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-গ্রন্থাদি পড়িলে মনে হয়, সমাজের নৈতিক আদর্শ উচ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সমসাময়িক লিপি-মালা পাঠ করিলে স্বতই মনে হয়, তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে যেসব নৈতিক আদর্শ তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন তাহা চিরাচরিত ঔপনিষদিক, পৌরাণিক নৈতিক আদর্শেরই সমষ্টি; সে আদর্শ পাতিব্রত্যের, শুভ্র-শুচিতার, স্থৈর্য ও সংযমের। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থে সর্বপ্রকারের দুর্নীতি, কামাতুরতা, মদ্যাসক্তি, চৌর্য এবং পরনারী ও পরপুরুষ-গমনের নিন্দা করা হইয়াছে, এবং এই সব অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডের এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে।

আংশিকত এই ধরনের আদর্শ প্রচারের ফলে, আংশিকত বৃহত্তর পল্লীসমাজের ধনোৎপাদনব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনবিন্যাসের ফলে সাধারণভাবে প্রাচীন বাঙালী জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইতে পারে নাই। যেসব বিলাস-ব্যসন ও অসংযত কামনা-বাসনার কথা আগে বলিয়াছি, তাহা সাধারণত নাগর সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; পল্লীবাসীরা এইসব নাগরাচার পছন্দ করিতেন না, এবং ইহাদের বিরুদ্ধে পল্লী-পতিদের দৃষ্টি সদাজাগ্রত ছিল। বৃহত্তর পল্লীসমাজে জীবনের একটি সরল শান্ত সহজ আদর্শ ছিল সক্রিয়।

দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে বাঙালীর সনাতন দুঃখকষ্ট লাগিয়াই ছিল; 'হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে', 'ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মতো শীর্ণ', 'ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে', 'পরিধানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার সূচও নাই ঘরে', 'ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে'—এইসব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়। দারিদ্র্যাভিশাপক্লিষ্ট নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ বোধ হয় ছিল গ্রামের বিত্তশালী সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ির পার্বণব্রত, সম্পন্নতর গৃহের পূজা-উৎসব, এবং দরিদ্রতর স্তরের নানা আদিম কৌমগত যৌথ নৃত্য, গীত ও পূজা। এইসব আশ্রয় করিয়াই মাঝে মাঝে তাঁহারা তাঁহাদের দৈনন্দিন দারিদ্র্য দুঃখ মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

দশম-একাদশ শতকের বাঙালীর নানা টুকরা টুকরা জীবনচিত্র কল্পনায় আঁকিয়া তোলা যায় বাঙালী কবিকুলরচিত সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত নানা প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি হইতে। সাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য, ঋতুচর্যা, যুদ্ধ, শৌর্য, কীর্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বাংলার জনসাধারণের যে-সব চিত্র এই শ্লোকগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যে শুধু সুন্দর, বস্তুময় এবং কাব্যময় তাহাই নয়, অন্যত্র, অন্য উপাদান, অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণে তাহা দুর্লভ।

চর্যাগীতির অনেকগুলি গীতেও বাঙালীর সমসাময়িক গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র দৃষ্টিগোচর। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বোধ হয় বেশ ছিল, শক্ত প্রহরীর প্রয়োজন হইত, দরজায় তালা লাগাইতে হইত। আয়না ব্যবহারের কথাও আছে।

তখনকার দিনেও গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর একত্র বসিয়া খাওয়া নিন্দনীয় ছিল, দেশাচারে অসিদ্ধ ছিল। বিবাহে বরপক্ষ কর্তৃক যৌতুক-গ্রহণের কথা আগেই বলিয়াছি। যৌতুকের লোভে অনেকেই নিম্ন জাতের ভিতর হইতে কন্যাগ্রহণেও আপত্তি করিতেন না। বঙ্গাল দেশের সঙ্গে বোধ হয় তখনও পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের বিবাহাদি সম্পর্ক প্রচলিত ছিল না। তাহা ছাড়া, পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গবাসীরা বোধ হয় বঙ্গালবাসীদের খুব প্রীতির চক্ষেও দেখিতেন না। চর্যাগীতির একাধিক গীতে শবরদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। ইঁহারা বাস করিতেন বড় বড় পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরচূড়ায়। শবরী গুঞ্জার মালা পরেন গলায়, কটিতে জড়ান ময়ূরের পাখ, কানে পরেন কুণ্ডল। উন্মত্ত শবর নেশার ঝোঁকে শবরীকে যান ভুলিয়া; তখন শবরী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার ঘর সামলান। তাম্বুল (পান) আর কর্পূর তাঁহাদের পূর্বরাগের উপাদান। শরধনু লইয়া শিকার তাঁহাদের জীবিকা। ডোম, নিষাদ প্রভৃতিরা গ্রামের বাহিরে উঁচু জায়গায় বাস করিতেন; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা ইঁহাদের ছুঁইতেন না। নৌকায় ছিল ইঁহাদের যাওয়া-আসা; বাঁশের তাঁত, চাঙারি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রয় ছিল ইঁহাদের বৃত্তি। নলের তৈরি পেটিকা ছাড়ি়া লোকেরা বাঁশের এইসব জিনিস কিনিত। মৎস্যজীবী, তন্তুবায়, ধুনুরী, সূত্রধর প্রভৃতি বৃত্তির লোকদের সাক্ষাৎও চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির টুকরা টুকরা ছবিও দৃষ্টিগোচর হয়।

অন্ত্যজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ-নিষাদ-বেদে প্রভৃতিদের অন্যতম বৃত্তি

ছিল সাপ-খেলানো, জাদুবিদ্যার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উপদ্রব খুবই ছিল; মনসাপূজাই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য। রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষবৈদ্য অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন; জাঙ্গুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হইত; সেইজন্য ওঝা বা বিষবৈদ্যদের সমাজে একটা স্থান ছিল।

পাঁচ

বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী এবং কোমলাঙ্গী বলিয়া তৃতীয়-চতুর্থ শতকে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও মোটামুটি সত্য বলিলে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না। কিন্তু বাৎস্যায়নের উক্তির ভিতর প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি যে পাইতেছি না তাহা না বলিলে ঐতিহাসিকের কর্তব্য করা হইবে না।

গোড়াতেই বলা চলে, বৃহত্তর হিন্দু সমাজের গভীরে—শিক্ষিত নাগর সমাজের কথা বলিতেছি না—আজও যেসব আদর্শ, আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয় প্রাচীন বাঙালী সমাজেও তাহাই ছিল: যেসব সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করিয়া থাকেন, যেসব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ পোষণ করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই ছিল সক্রিয়। বাংলার লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। যে অসবর্ণ বিবাহ আজও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে সুপ্রচলিত এবং সুআদৃত নয়, অথচ মাঝে মাঝে তেমন ঘটিয়াও থাকে, প্রাচীন বাংলায়ও অবস্থাটা ঠিক তাহাই ছিল। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাঙালীরচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের কোন বিধান নাই, সবর্ণে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ যে প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিল না তাহার প্রমাণ সমতটরাজ লোকনাথের মাতামহ পারশব কেশব। কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু মাতা বোধ হয় ছিলেন শূদ্রকন্যা; কেশবের পারশব পরিচয়ের ইহাই কারণ। কিন্তু তাহাতে কেশবকে সমাজে কিছু হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই। কেবল সপ্তম শতকেই বোধ হয় নয়, পরেও এই ধরনের অসবর্ণ বিবাহ কিছু কিছু সংঘটিত হইত: নহিলে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় সুলতান জালাল্-উদ্-দীন বা যদুর সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী বাঙালী বৃহস্পতি মিশ্র যে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য নিম্নতর বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণে কোন বাধা নাই, এ বিধান দিবার কোন প্রয়োজন হইত না।

বাংলার পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি পড়িলে মনে হয় লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুধার মত সর্বংসহা, স্বামিব্রতনিরতা নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিত্তাদর্শ; এবং বিশ্বস্তা, সহৃদয়া, বন্ধুসমা এবং স্থৈর্য, শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপা স্ত্রী হওয়াই ছিল তাঁহাদের একান্ত কামনা। স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী হওয়াই তাঁহাদের বাসনা; এবং বীর ও গুণী পুত্রের প্রসবিনী হওয়াই সকল বাসনার চরম বাসনা। বন্ধ্যা নারীর জীবন কেহই কামনা করিতেন না। উচ্চকোটি শিক্ষিত সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্যাদা এই জনাই বেশ উচ্চই ছিল। লিপিগুলিতে উভয়েরই সসম্মান উল্লেখ তাহার সাক্ষ্য।

সমসাময়িক নারীজীবনের আদর্শ ও কামনা লিপিমালায় আরও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক বিচিত্র নারীচরিত্রের সঙ্গে সমসাময়িক নারীদের তুলনায় এবং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের ভিতর দিয়া।

মাতার কামনা ছিল শুভ্র নিষ্কলংক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া; প্রসবাবস্থায় কামনানুরূপ সন্তান জন্মলাভ করে এই বিশ্বাসও জননীর মধ্যে সক্রিয় ছিল। শ্রীচন্দ্রের রামপাললিপিতে সুবর্ণচন্দ্রের নামকরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। বাংলা-দেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ বিশ্বাস আজও সক্রিয় যে, শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ গোলকরেখা প্রত্যক্ষ করিলে প্রসূতি চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ সুন্দর সন্তান প্রসব করেন।

সংক্রান্তি ও একাদশী তিথিতে এবং সূর্য- ও চন্দ্র-গ্রহণে তীর্থস্নান, উপবাস এবং দানে অনেক নারীই অভ্যস্তা ছিলেন; রাজান্তঃপুরিকারাও করিতেন। স্বামী ও স্ত্রী একই সঙ্গে দানধ্যান করিতেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়; স্ত্রী ও মাতারা একক অনেক মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, দান-ধ্যান করিতেছেন এ রকম সাক্ষ্যও সুপ্রচুর। রামায়ণ-মহাভারতের কথা প্রাচীন বাংলায় সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল, এমন কি নারীদের মধ্যেও।

নারীরা বোধ হয় কখনও কখনও সম্পন্ন অভিজাত গৃহে শিশুধাত্রীর কাজও করিতেন। তৃতীয় গোপালদেব শৈশবে ধাত্রীর ক্রোড়ে শুইয়া খেলিয়া মানুষ হইয়া-ছিলেন মদনপালের মনহলিলিপিতে এইরকম ইঙ্গিত আছে। জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, নারীরা প্রয়োজন হইলে সুতা কাটিয়া, তাঁত বুনিয়া অথবা অন্য কোন শিল্পকর্ম করিয়া স্বামীদের উপার্জনে সাহায্য করিতেন; কখনও কখনও অর্থলোভে প্ররোচিত হইয়া স্ত্রীরা স্বামীদের শ্রমিকের কাজ করিতে পাঠাইতেন; এ ব্যাপারে স্ত্রীরা নিয়োগ-কর্তাদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না!

একটিমাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম; তবে, রাজরাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তদের মধ্যে, অভিজাত সমাজে, সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, এবং সপত্নী-বিদ্বেষও অজ্ঞাত ছিল না। দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে, মহীপালের বাণগড়লিপিতে সপত্নী বিদ্বেষের ইঙ্গিত আছে; প্রাচীন বাংলার লিপিমালায় বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর; তবে একপত্নীত্বই যে সুখী পরিবারের আদর্শ তাহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে।

প্রাচীন বাংলায়ও বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রথমেই মুছিয়া যাইত সীমন্তের সিঁদুর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন-অলংকার। প্রাচীন বাংলায় নারীদের ধনসম্পত্তিতে কোন বিধিবিধানগত ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। কিন্তু স্মৃতিকার জীমূতবাহন বিধান দিতেছেন, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারের দাবি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন অন্যান্য স্মৃতিকারদের বিরুদ্ধ মতামত সব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বিধান দিতেছেন যে, বিধবা স্ত্রী শুধু খোরাক-পোশাকের দাবি ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না, কিংবা মৃত স্বামীর ভ্রাতা এবং নিকট আত্মীয়বর্গের দাবি বিধবা স্ত্রী-র দাবি অপেক্ষা অধিকতর

বিধিসংগত তাঁহাদের বিধান সজোরে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য এ কথা বলিয়াছেন, সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা দানে বিধবার কোন অধিকার নাই, এবং তিনি যদি যথার্থ বৈধব্যজীবন যাপন করেন তবেই স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থ মতে বিধবাদের মৎস্য, মাংস প্রভৃতি যে কোনরূপ উত্তেজক পদার্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিধানও তাহাই। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গলসূচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত, এবং তাঁহারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিতেন না। স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইবার জন্য তখনও ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিধবাদের উৎসাহিত করিতেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণের উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা প্রাচীন বাংলায়, অন্তত আদিপর্বের শেষ দিকে, অজ্ঞাত ছিল না।

নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছেন এবং সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল। তৎসত্ত্বেও বিত্তবান্ নাগর সমাজে তাহার ব্যতিক্রমও কম ছিল না। আর পল্লীসমাজের যে স্তরে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরোপুরি স্বীকৃত ছিল না, আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর, সে স্তরে যৌনজীবনের আদর্শই ছিল অন্য মাপের, রীতিনীতিও ছিল অন্যতর। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শদ্বারা তাহার বিচার চলিতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দ্বারা শাসিত সমাজেও অনিচ্ছায়, বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী তখনকার দিনেও সমাজে পতিত্ বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইতেন না; বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই তাঁহার শুদ্ধি হইয়া যাইত—এ সাক্ষ্য আমরা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে বিধবা-বিবাহও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

নাগর সমাজের উচ্চকোটি স্তরের নারীরা লেখাপড়া শিখিতেন বলিয়া মনে হয়; পবনদূত-কাব্যে নারীদের প্রেমপত্র-রচনায় ইঙ্গিত আছে। নানা কলাবিদ্যায় নিপুণতাও তাঁহাদের অর্জন করিতে হইত, বিশেষভাবে নৃত্যগীতে।

বাৎস্যায়নের সাক্ষ্যে মনে হয়, প্রাচীন বাংলায় অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনময়ীর জীবনই সমাজের উচ্চকোটি স্তরে সাধারণ নিয়ম ছিল। সম্ভ্রান্ত মহিলারা পথে-ঘাটে যাতায়াতকালে পথযাত্রীদের দৃষ্টি হইতে নিজেদের আড়াল করিয়াই চলিতেন। সম্ভ্রান্ত স্তরে যাহাই হউক, সমাজের যে স্তরে নারীদের হাটে-মাঠে-ঘাটে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত, নানা কাজে কর্মে শারীরিক শ্রম করিতে হইত তাঁহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠিত জীবনযাপনের কোন সুযোগই ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না, সে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল না। মধ্যবিত্ত কুলমহিলারা অবগুণ্ঠন দিতেন; বস্তুত, অবগুণ্ঠন ছিল তাঁহাদের কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অন্যতম অভিজ্ঞান। এই মধ্যবিত্ত কুলমহিলাদের জীবনচর্যার একটি সুন্দর ছবি রাখিয়া গিয়াছেন কবি লক্ষ্মীধর।

বাংলার কবি উমাপতিধর বাঙালী নারীর সুন্দর একটি প্রাকৃত অথচ অনন্য সাধারণ ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্মকর্ম : ধ্যান-ধারণা

এক

প্রাচীন বাঙালীর ধর্মকর্মগত জীবনের সুস্পষ্ট চিত্ররচনা দুরূহ। স্বভাবতই ধর্মকর্মগত মানসজীবন ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা জটিল। তাহার উপর, বর্ণ, কোমবিন্যস্ত সমাজে সে জীবন জটিলতর হইতে বাধ্য। ধর্মকর্মভাবনা ও সংস্কার বর্ণ-, শ্রেণী ও কোম-ভেদে পৃথক; একই কালে একই বিশ্বাস সমাজের সকল স্তরে এক নয়, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশখণ্ডে তো নয়ই। তা ছাড়া, নূতন কোন বিশ্বাস বা সংস্কার বা পূজানুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজে সহসা প্রচার লাভ করে না; তাহার প্রত্যেকটির পশ্চাতে বহুদিনের ধ্যান ও ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার লুকানো থাকে এবং সমাজের ভিতরে ও বাহিরে নানা গোষ্ঠী, নানা স্তর, নানা কোমের ভক্তি-বিশ্বাস-পূজাচার প্রভৃতির যোগাযোগের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাসও আত্মগোপন করিয়া থাকে; কালে কালে সেই ইতিহাস বিবর্তিত হইয়া সমসাময়িক কালের রূপ গ্রহণ করে মাত্র, এবং তাহাও একান্তই সমসাময়িক সমাজভাবনা ও চেতনানুযায়ী। সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণী ও স্তরবিশেষ অনুযায়ী। কোন শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কারই আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকে না; অন্যান্য শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং সেই যোগাযোগের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী এক শ্রেণী ও কোমের, স্তর ও অংশের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও কোমে, স্তর ও অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং মিলন-বিরোধের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠান-উপচার প্রভৃতি সৃষ্টি লাভ করিতে থাকে। যে শ্রেণী বা কোমের আত্মিক ও ব্যবহারিক শক্তি বেশি সেই শ্রেণী বা কোমের ধর্মকর্মগত জীবন অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহারা যেমন অন্য শ্রেণী বা কোমের ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করে, তেমনই নিজেরাও সে জীবন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় একটা জটিল সমন্বয় সমানেই চলিতে থাকে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সমন্বয়ের গতিপ্রকৃতি সমাজবিজ্ঞানীর চোখে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে, এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলাপ-আলোচনা যত অগ্রসর হইতেছে ততই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি যে, আজ আমরা যাকে হিন্দু ধর্মকর্মসাধনা বলিয়া জানি তাহা একদিকে আর্য ও অন্যদিকে প্রাক্-আর্য বা অনার্য ধর্মকর্মসাধনার সমন্বিত রূপ মাত্র। বস্তুত, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্যপ্রবাহ মূলত ক্ষীণ; ক্রমে ক্রমে কালে কালে নানা বিচিত্র প্রবাহ সে প্রবাহে সমন্বিত হওয়ার ফলে আজ সে প্রবাহ প্রশস্ত ও বেগবান। সচেতন সক্রিয়তায় সমন্বয়ের এই কাজটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ নায়কেরা, এ কথা যেমন সত্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিরোধটাও তাঁহাদের দিক হইতেই দেখা দিয়াছিল, এ কথাও তেমন সত্য। অন্যদিকে, প্রাক্-আর্য বা অনার্য আদি-

বাসীরা যে বিনা বাধায় বা বিনা বিরোধে আর্য বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের আদর্শ বা অনুষ্ঠান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা চলমান প্রবাহে নিজেদের ধারা মিশাইয়াছিলেন, তাহাও নয়। বাংলাদেশে মোটামুটি খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্যধর্মের প্রবাহ প্রবলতর হওয়ার সময় হইতেই সমন্বয়ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে; মধ্যযুগে এই সমন্বয়সাধনা সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আজও তাহা চলিতেছে লোকচক্ষুর অগোচরে।

বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে এই সমন্বয়সাধনার সাক্ষ্য খুব বেশি উপস্থিত নাই। বস্তুত, বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদেরই প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান।

গ্রন্থারম্ভে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি, ভারতীয় আদিবাসীরা, অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীদের মতো, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসীগাছ, সেওড়াগাছ ও বটগাছ। অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লবের ঘটের প্রয়োজন হয়, যে কলাবৌর পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ সমস্তই সেই আদিবাসীদের দান। আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যেসব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচারানুষ্ঠানই বাংলার আদিমতম জন ও কোমের ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, ধানদুর্বার আশীর্বাদ, কলা, হলুদ, সুপারি, পান, নারিকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, ঘট, ঘটের উপর আঁকা প্রতীকচিহ্ন, নানাপ্রকার আলপনা, গোবর, কড়ি প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বস্তুত, আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যাহা কিছু শিল্প-সুষমাময় তাহার অনেকখানিই এই আদিবাসীদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ব-বাংলায়, এক বিবাহ-ব্যাপারেই পানখিলি, গাত্রহরিদ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী-আচার, খই ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, দধিমংগল প্রভৃতি সমস্তই আদিবাসীদের দান বলিয়া অনুমিত। বস্তুত, বিবাহ-ব্যাপারে সম্প্রদান, যজ্ঞ, এবং সপ্তপদী অর্থাৎ মন্ত্র অংশ

ছাড়া আর সবটাই অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ্য। পূজার্চনার মধ্যে ঘটলক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা, লিঙ্গ-যোনি পূজা, শ্মশান-শিব ও ভৈরবের পূজা, শ্মশান-কালীপূজা প্রভৃতির প্রায় সব বা অধিকাংশই মূলত এইসব আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠান হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, অল্পবিস্তর রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটাইয়া। এইসব আচারানুষ্ঠানের অনেকগুলিই মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের প্রধানতম ও আদিমতম ভয়-বিস্ময়-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া না দিলে বাঙালীর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝা যাইবে না।

দুই

এই ইঙ্গিত ধরিবার উপাদান-উপকরণ সুপ্রচুর, এবং তাহা বাঙালীর জীবনচর্যার নানাক্ষেত্রে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে।

আজিকার দিনে কিংবা আদি ও মধ্য যুগে 'ভদ্র' উচ্চস্তরের বাঙালী জীবনে আমাদের যে ধর্মকর্মের জীবন তাহা একান্তই আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্ম-কর্মের চন্দনানুলেপনমাত্র এবং তাহা সংস্কৃতির গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক হইতে একান্তই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীর গভীরে বিস্তৃত, যে জীবন গ্রামে কুটিরের কোণে, চাষীর মাঠে, গৃহস্থের আঙিনায়, ফসলের ক্ষেতে, গ্রাম্য-সমাজের চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায় বিস্তৃত, সেই ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্য-মনের, আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে। এই চাপা পড়ার ফলে কোথাও কোথাও তাহা কণ্ঠ- ও নিশ্বাস -রোধে একেবারে মরিয়া গিয়াছে, তাহার নিষ্প্রাণ কঙ্কাল শুধু বর্তমান; আবার কোথাও কোথাও নিজেরই প্রাণশক্তির জোরে সে তাহার নিজের একটু স্থান করিয়া লইয়াছে আর্য ধর্মকর্মের একটি প্রান্তে; আবার অন্যত্র হয়তো প্রাণশক্তিরই প্রাবল্যে আর্য ধর্মকর্মের ভাব ও রূপ উভয়ই দিয়াছে বদলাইয়া।

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কৃষিজীবনের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, মাঠে হল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াইবার, শালিধান বুনিবার, ফসল কাটিবার বা ঘরে গোলায় তুলিবার আগে নানাপ্রকারের আচারানুষ্ঠান বাংলার নানা জায়গায় আজও প্রচলিত। এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্পসুষমায় এবং জীবনের সুসম আনন্দে মণ্ডিত; কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, ইহার একটিতেও কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই এইসব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী। নবান্ন উৎসব বা নূতন গাছের বা নূতন ঋতুর প্রথম ফল ও ফসলকে কেন্দ্র করিয়া যেসব পূজানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রচলিত তাহার মূলেও একই চিত্ত-ধর্মের বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়। শুধু কৃষিজীবনকে আশ্রয় করিয়াই নয়, শিল্প-জীবনেও দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাপর, কুমোরের চাকা, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙল, ছুতোর-রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এক ধরনের ধর্মকর্মানুষ্ঠান আজও প্রচলিত; তাহারই কিছুটা আর্যীকৃত সংস্কৃত রূপ আমরা বিশ্বকর্মাপূজার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু মূলত এই ধরনের পূজাচারেও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোন প্রয়োজন হয় না। উৎপাদনযন্ত্রের এই পূজাচারের সঙ্গে

আদিবাসীদের প্রজননশক্তির পূজাচারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যাহাই হউক, এইসব গ্রাম্য কৃষি- ও কারু -জীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য।

বাংলার পাড়াগাঁয়ে আজও জনপদসীমার বাহিরে 'থান' বা স্থান বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে; কোথাও কোথাও এই 'থান' উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায়, কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা তাহার উপর একটা আচ্ছাদনও গড়িয়া দেয়। এই 'থান' বা স্থানে মূর্তিরূপী কোন দেবতা অধিষ্ঠিত থাকুন বা নাই থাকুন, সর্বত্রই তিনি পশু ও পক্ষী বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার নামে 'মানত' করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ভয়ভক্তি করেন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, গ্রামের ভিতরে বা লোকালয়ে তাঁহার স্থান নাই। 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাংলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোন স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, সর্বত্রই তিনি প্রাক্-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এইসব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব প্রসন্নচিত্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো বারবার এইসব দেবতার পূজারীদের পতিতই বলিয়াছেন। কিন্তু কোন বিধান, কোন বিধিনিষেধই ইঁহাদের পূজা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এই-ভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, গরুড়ধ্বজা, মীনধ্বজা, ইন্দ্রধ্বজা, ময়ূরধ্বজা, কপিধ্বজা প্রভৃতি নানাপ্রকারের ধ্বজাপূজা ও উৎসব এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না; শক্রধ্বজ বা ইন্দ্রধ্বজের পূজা যে একাদশ শতকের আগে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ তো গোবর্ধন আচার্যই রাখিয়া গিয়াছেন। শক্রোত্থান বা শক্রধ্বজা পূজার কথা জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি নাম প্রাচীন কালের রাজরাজড়ার ভিতর অপ্রতুল নয়। এক-এক কোম বা গোষ্ঠীর এক-এক পশু- বা পক্ষী -লাঞ্ছিত ধ্বজা; সেই ধ্বজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং তাহাই তাঁহাদের পরিচয়। এই ধরনের পশু- বা পক্ষী -লাঞ্ছিত পতাকার পূজা আদিম পশুপক্ষিপূজা হইতেই উদ্ভূত; বহু পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপকল্পনায় তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন; দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেচক, সরস্বতীর বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম, সমস্তই সেই আদিম পশুপক্ষিপূজার অবশেষ। আদিম কোমগত পূজার উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের সঙ্গে এইসব পশুপক্ষীরাও আজও আমাদের পূজা লাভ করে, সন্দেহ কী? দেবদেবীর মূর্তিপূজার সঙ্গে এইসব পশুপক্ষিলাঞ্ছিত ধ্বজা-

পূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ জনসাধারণের মধ্যে কোন ধর্ম-কর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজা পূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে।

গাছপূজা, নানাপ্রকারের মাতৃতন্ত্রীয় দেবীর পূজা, ক্ষেত্রপালের পূজা, নানা লৌকিক দেবতা-উপদেবতার পূজার কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রামের উপান্তে বসতির বাহিরে যেসব জায়গায় এইসব অনুষ্ঠান হইত সেইসব পূজাস্থানকে আশ্রয় করিয়া বাংলার নানা জায়গায় নানা তীর্থস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধরনের গাছ বা অন্যান্য গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার কিছু কিছু বিবরণ বাঙালীর প্রাচীনতম সাহিত্যে বিধৃত হইয়া আছে। কৃষিকর্মসংক্রান্ত নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজার কথাও আগেই বলিয়াছি। আখমাড়াই ঘরের (বা যন্ত্রের?) যিনি ছিলেন দেবতা তিনি পণ্ডাসুর (পুণ্ড্রাসুর) নামে খ্যাত, আর পুণ্ড্র বা পুঁড় যে একপ্রকারের আখ তাহা তো অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে এই পণ্ডাসুরের পূজা এখনও প্রচলিত; সেখানে তিনি পড়াসর (সংস্কৃতীকরণ, পরাশর) নামে খ্যাত।

ধ্বজা- বা কেতন -পূজার মতো নানাপ্রকারের যাত্রাও বাংলার আদিবাসী কোম-গুলির অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব মূলত তাঁহাদেরই; পরে ক্রমশ ইহাদের আর্যীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে। লৌকিক ধর্মোৎসবে এই ধরনের যাত্রা বা সচল নৃত্যগীতসহ সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংযুত্তনিকায়-গ্রন্থে জানা যায়। আর্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উচ্চ কোটির লোকেরা এই ধরনের সমাজোৎসব ও যাত্রা খুব পছন্দ করিতেন না; সেইজন্যই অশোক সমাজোৎসবের বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচার করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কোন রাজকীয় অনুশাসনই লোকায়ত ধর্মের এই লৌকিক প্রকাশকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত স্নানযাত্রা প্রভৃতির কথা কালবিবেক-গ্রন্থে জানা যায়।

যাত্রা, ধ্বজাপূজা প্রভৃতির মতো ব্রতোৎসবও বাঙালীর দৈনন্দিন ধর্মজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন, তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা পতিত, তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন?* অন্তত সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনায় ক্রমশ এই তথ্যই সুস্পষ্ট হইতেছে যে, আমাদের গ্রাম্য সমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতর, যেসব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক

* ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোন অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। ঋগ্বেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী; যজ্ঞধর্মীদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য জাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়তো ছিলেন ব্রাত্য। এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত তাহা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাংলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশি। ব্রত কথাটির অর্থই বোধ হয় আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা;

ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য জাদু ও প্রজননশক্তির পূজা, যে পূজা গ্রাম্য কৃষি-সমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র কোথাও কোন প্রচলিত ব্রতের কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই; আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যে এই ধর্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করিত না এ তথ্য পরিষ্কার। বিষ্ণু-পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি যখন সংকলিত হইতেছিল তখন, এবং বোধ হয় তাহার কিছুকাল আগে হইতেই ব্রতানুষ্ঠানের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাবের পরিবর্তন হইতেছিল; কারণ, এইসব পুরাণে দেখিতেছি, লৌকিক অনেক ব্রতানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণেরা সেইসব অবৈদিক, অস্মার্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করিতেছেন। বাংলাদেশে সমস্ত আদি ও মধ্য যুগ ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভিতর দিয়া বহু অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান এইভাবে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। যেসব ব্রত এই ধরনের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়, যেসব করে নাই সেসব ক্ষেত্রে কোন পুরোহিতেরই প্রয়োজন হয় না, গৃহস্থ মেয়েরাই সেসব পূজা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। সম্বৎসর ব্যাপিয়া মাসে মাসে এইসব বিচিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান আমাদের গ্রাম্য সমাজ-জীবনকে এখনও কতকটা সচল ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাঙালীর ধর্মকর্মে এইসব ব্রতানুষ্ঠান খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। অগণিত এইসব ব্রতের মধ্যে কয়েকটি তালিকাবদ্ধ করিতেছিঃ

বৈশাখে—পুণ্যপুকুর ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), শিব-পূজা ব্রত (প্রজননশক্তির পূজা), চম্পা-চন্দন ব্রত (ঐ), পৃথ্বীপূজা ব্রত (ঐ এবং গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), গোকাল ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), অশ্বত্থপট ব্রত (ঐ), হরিচরণ ব্রত (গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), মধুসংক্রান্তি ব্রত (ঐ), গুপ্তধন ব্রত (ঐ), ধান-গোছানো ব্রত (ঐ), ধাচা পান ব্রত (ঐ), থোয়াথুয়ি ব্রত (ঐ), রূপে এয়োব্রত (ঐ), দশ পুতুলের ব্রত (ঐ), সন্ধ্যামণি ব্রত (ঐ), তেজোদর্পণ ব্রত (ঐ), বসুন্ধরা ব্রত (বারিবর্ষণের জন্য প্রজননশক্তির পূজা)।

নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য; বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমারেখা টানিয়া দিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়; এই সীমারেখা টানা, স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে জাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে বরণ করার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত —যেমন নূতন বরের মুখের সম্মুখে হাত ও হাতের আঙুল নানা ভঙ্গীতে ঘুরানো, কুলার উপর প্রদীপ ইত্যাদি সাজাইয়া বরের দুই বাহুতে, বুকে কপালে ঠেকানো ও সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারণ—তাহার ভিতরও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুক্কায়িত। এই বরণের অর্থও অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা। ব্রত এবং বরণের স্ত্রী-আচারগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের সমগোত্রীয়তা ধরা পড়িয়া যায়, এবং গোড়ায় যে ইহাদের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়। ব্রত এবং বরণ উভয় অনুষ্ঠানেই শুধু মেয়েদেরই যে অধিকার এ তথ্যও লক্ষণীয়।

জ্যৈষ্ঠে—জয়মঙ্গলের ব্রত (প্রজননশক্তির পূজা)।

ভাদ্রে—ভাদুলি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), তিলকুজারি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা)।

কার্তিকে—কুলকুলটি ব্রত (গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), ইতুপূজা ব্রত (প্রজনন-শক্তির পূজা)।

অগ্রহায়ণে—যমপুকুর ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), সেঁজুতি ব্রত (গুহ্য জাদুশক্তির পূজা), তুষতুষলি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা)।

মাঘে—তারণ ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজননশক্তির পূজা), মাঘমণ্ডল ব্রত (ঐ)।

ফাল্গুনে—ইতুকুমার ব্রত (ঐ), বসন্ত রায় ও উত্তম ঠাকুরের ব্রত (ঐ), সসপাতা ব্রত (ঐ)।

চৈত্রে—নখছুটের ব্রত (গুহ্য জাদুশক্তির পূজা)।

এগুলি ছাড়াও বাঙালীর অন্তঃপুরে আরও অনেক ব্রত আছে যাহা মূলত গুহ্য জাদুশক্তি ও প্রজননশক্তির পূজারূপে আদিবাসী কোমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তেমন অনেক ব্রত ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ্যধর্মকর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আমাদের শুভ কর্ম-পঞ্জিকাতেও স্থান পাইয়া গিয়াছে, যেমন ষষ্ঠী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, সুবচনী ব্রত ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ্যধর্মকর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতের একটি তালিকা প্রাচীন বাংলার স্মৃতিগুলি হইতেই ছাঁকিয়া বাহির করা যায় : সুখরাত্রি ব্রত (কার্তিক মাস), পাষাণ চতুর্দশী ব্রত (অগ্রহায়ণ), দ্যূত-প্রতিপদ ব্রত (কার্তিকের শুক্ল প্রতিপদ), কোজাগর পূর্ণিমা ব্রত (আশ্বিনের পূর্ণিমা), ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রত (কার্তিক), আকাশ-প্রদীপ ব্রত (কার্তিক), অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত, অশোকাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি। এই সব-কটি ব্রতের উল্লেখ জীমূতবাহনের কালবিবেক-গ্রন্থে পাওয়া যায়। জন্মাষ্টমী পূজা ও স্নানের কথাও জীমূতবাহন বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের কতক-গুলি ব্রত একান্তই আদিম কোমসমাজের ব্রতগুলির পরিবর্তিত, পরিমার্জিত রূপ; আবার কতকগুলি আদিম কোম সমাজের ব্রতের আদর্শ এবং ভাবানুযায়ী নূতন ব্রতের সৃষ্টি। তিথি-নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া যেসব ব্রতোৎসব আছে তাহার মূলে বহিরাগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের কিছুটা প্রভাব বিদ্যমান। পুরাণগুলির ভিতর হইতেও ব্রাহ্মণ্যধর্মকর্তৃক স্বীকৃত ব্রতের একটি তালিকা পাওয়া যায়, যেমন, শিবরাত্রি ব্রত, অখণ্ড দ্বাদশী ব্রত, পূর্ণিমা ব্রত, নক্ষত্র ব্রত, দীপদান ব্রত, ঋতু ব্রত, কৌমুদী ব্রত, মদন বা অনঙ্গ ত্রয়োদশী ব্রত, রম্ভাতৃতীয়া ব্রত, মহানবমী ব্রত, বুধাষ্টমী ব্রত, একাদশী ব্রত, নক্ষত্রপুরুষ ব্রত, আদিত্যশয়ান ব্রত, অনঙ্গদান ব্রত, ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এইসব ব্রতের কোন্‌-কোন্‌টি প্রচলিত ছিল বলিবার কোন উপায় নাই।

ব্রতোৎসবের বাহিরে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে অন্তত দুইটি ধর্মানুষ্ঠান আছে যাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাব সুবিস্তৃত এবং যাহা মূলত অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য। একটি ধর্মঠাকুরের পূজা ও আর-একটি চৈত্র মাসে নীল-বা চড়ক -পূজা। মালদহ অঞ্চলে যে গম্ভীরার পূজা বা বাংলার অন্যত্র যে শিবের গাজন হয় তাহা এই চড়কপূজারই ভিন্নরূপ। শিবের গাজন যেমন, ধর্মঠাকুরেরও তেমনই গাজন আছে এবং এই গাজন-উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ, একটি ঘরভরা বা গৃহাভরণ এবং অন্যটি 'কালিকা পাতা' বা 'কালি-কাচ' নৃত্য।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমরা ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধমতের 'ধর্ম' বলিয়া মনে

করিতাম কিন্তু সম্প্রতি নানা গবেষণার ফলে আমরা জানিয়াছি ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্‌আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা; পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্ম-ঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকাচিহ্ন এবং ধর্মপূজার পুরোহিতেরা তাঁহাদের গলায় ঝুলাইয়া রাখেন এক খণ্ড পাদুকা বা পাদুকার মালা। আজও ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ডোমেরা, যদিও এখন কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগদী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতরও ধর্মপূজার পুরোহিত বিরল নয়। রাঢ়দেশেই ধর্মপূজার প্রচলন ছিল বেশি, এখনও তাহাই; তবে এখন কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ছাড়া অন্য কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না। স্তূপীকৃত পিষ্টক আর প্রচুর মদ্য দিয়া ("মদোর পুষ্করিণী দিব পিষ্টের জাঙ্গাল") ধর্মঠাকুরের পূজা হইত। মৃতদেহ ও নরমুণ্ড লইয়া ছিল ধর্মের গাজনের নাচ। শূন্যপুরাণে বলা হইয়াছে ধর্মঠাকুর ছিলেন শূন্য মূর্তি, তিনি 'নিরঞ্জন'। যে প্রতীকের পূজা করা হইত তাহা কূর্মাকৃতি পাষাণখণ্ড বা পাষাণনির্মিত কূর্মবিগ্রহ; তাঁহার উপর আঁকা থাকিত পাদুকাচিহ্ন। আদিতে যে তিনি প্রাক্-আর্য বা অনার্য দেবতা এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পরে তিনি একে একে বৈদিক বরুণ, অশ্বরথবাহিত সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কল্কি অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া বর্তমান ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়া প্রধানত রাঢ় অঞ্চলেই পূজালাভ করিতেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন, 'ধর্ম' শব্দটিই বোধহয় প্রাচীন কোন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর এবং বৌদ্ধ ত্রয়ীর মধ্যম শব্দ অর্থাৎ 'ধর্ম' এবং তাহার পূজা মূলত আদিবাসী কোমের ধর্মপূজা হইতেই গৃহীত।

ধর্মপূজা সম্বন্ধে যাহা সত্য নীল- বা চড়ক -পূজা সম্বন্ধেও তাহাই। এই চড়ক পূজা এখন শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে জড়িত। জলভরা একটি পাত্রে প্রতিষ্ঠিত যে প্রতীকটি এই পূজার কেন্দ্র, সেই প্রতীক শিবলিঙ্গ, এবং ইহাই পূজারীদের নিকট 'বুড়া শিব' নামে আখ্যাত। এই পূজার পুরোহিত সাধারণত আচার্য-ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র, এবং গ্রহবিপ্রেরা যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি অনুযায়ী পতিতব্রাহ্মণ, এ তথ্য সর্বজনবিদিত। কুমিরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দোলা, কাঁটা ও ছুরির উপর ঝম্প, বাণফোঁড়, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ হইতে দোলা এবং দানো (ভূত) বারাণো বা হাজরা পূজা চড়কপূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। এই শেষোক্ত 'দানো বারাণো' বা 'হাজরা পূজা'র স্থান সাধারণত শ্মশানে এবং এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গেই পোড়া শোলমাছ এবং তাহার পুনর্জন্মের কাহিনী (মহাভারতের শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান তুলনীয়), চড়কের সং (কলিকাতার জেলেপাড়ার সং তুলনীয়) প্রভৃতি জড়িত। চড়কপূজার পূজারীরা আজও আমাদের সমাজে সাধারণত জল-অনাচরণীয় স্তরের। সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম- ও চড়ক -পূজা দুইই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাহা ছাড়া, বাণফোঁড় এবং দৈহিক যন্ত্রণা-গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যেসব অনুষ্ঠান চড়কপূজার সঙ্গে জড়িত তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোম সমাজের নরবলিপ্রথার স্মৃতি বিদ্যমান।

ধর্মপূজার মূলেও তাহাই; এ ক্ষেত্রেও যে অজাশিশুটিকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করা হয়, সেটি প্রাচীন নরবলিরই আর্য-ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর। রামাইপণ্ডিতের শূন্য-পুরাণ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, ধর্মপূজার প্রচলন সেন আমলের তুর্কী বিজয়ের আগেই দেখা গিয়াছিল।

ধর্মপূজা ও চড়কের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত আমাদের হোলী বা হোলাক ধর্মোৎসব। হোলাক বা হোলক উৎসবের কথা জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থে আছে; দ্বাদশ শতকের আগেই যে এই উৎসব বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রমাণ। এই হোলী উৎসবের বিবর্তন লক্ষণীয়। বাংলাদেশে ফাল্গুনী শুক্লাচতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে হোলীর সঙ্গে যেসব আচারানুষ্ঠান জড়িত সংস্কৃতিগত জনতত্ত্বের দিক হইতে তাহার কিছু কিছু আলোচনা-গবেষণা হইয়াছে। এ তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলী ছিল কৃষিসমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন-কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অংগ; তার পরের স্তরে কোন সময়ে নরবলির স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অংগীভূত হইল। কিন্তু হোলীর সঙ্গে প্রধানত যে উৎসবানুষ্ঠানের যোগ তাহা বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের, রাধাকৃষ্ণ-ঝুলনের এবং কোথাও কোথাও মূর্খতম এক রাজাকে লইয়া নানাপ্রকারের ছল-চাতুরী ও তামাসার। তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সর্বত্রই বসন্ত বা মদন বা কাম-মহোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র, (তৃতীয়-চতুর্থ শতক), শ্রীকৃষ্ণের রত্নাবলী (সপ্তম শতক), মালতীমাধব নাটক (অষ্টম শতক), অল্-বেরুণী (একাদশ শতক), জীমূতবাহনের কালবিবেক (দ্বাদশ শতক) এবং রঘুনন্দন (ষোড়শ শতক), সকলেই এই উৎসবের কথা বলিয়াছেন। মনে হয়, ষোড়শ শতকের পর কোন সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলী বা হোলক উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। মুসলমান রাজা-ওমরাহ্‌রা এবং হারেমের মহিলারা হোলী-উৎসবের খুব বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে হোলী ক্রমশ মদনোৎসবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু হোলীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন এবং আবীর-কুমকুমের খেলার ইতিহাসের যোগ আবার অন্য পথে। রামগড়গুহার এক লিপিতে (খ্রীষ্টপূর্ব ২য়-৩য় শতক) এক ঝুলন উৎসবের কথা আমরা প্রথম শুনি। কিন্তু সে ঝুলন কোন দেবদেবীর নয়, বোধ হয় নেহাতই মানুষের ঝুলন। ঝুলনায় মানুষেরা—নরনারী উভয়েই—দোলা খাইত, বেশি করিয়া দোলা দিত মানবশিশুকে। বালকৃষ্ণ বা বালগোপালকে দোলাইতেন মাতা যশোদা। তার পরের পর্বে আর শুধু বালগোপাল নহেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলার সহচরী রাধাও আসিয়া উঠিলেন সেই ঝুলনায়, এবং একাদশ শতকের আগেই কৃষ্ণরাধার ঝুলনলীলা ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্মোৎসবে পরিগণিত হইয়া গেল। অল্-বেরুণীর সাক্ষ্যে মনে হয়, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত চৈত্র মাসে; গরুড়পুরাণ এবং পদ্মপুরাণের সাক্ষ্যও তাহাই। পরবর্তী কোন সময়ে এই উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আগাইয়া আসে (পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড এবং স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড) এবং হোলীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। প্রাক্-বৈদিক আদিম কৃষিসমাজের বলি ও নৃত্যগীতোৎসব এইভাবেই বর্তমান হোলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের নানা জায়গায় এখনও হোলী বা হোলাক

উৎসবকে বলা হয় শূদ্রোৎসব; হোলীর আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের ঘর হইতেই আনিতে হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই বর্ষাঋতুতে বিধবা নারীদের ভিতর অম্বুবাচী নামে এক পারণ পালনের রীতি প্রচলিত। এই পারণের তিন দিন বা সাত দিন তাঁহারা কোন অগ্নিপক্ক খাদ্য গ্রহণ করেন না, মাটি খুঁড়েন না, আগুন জ্বালেন না, রন্ধনাদি করেন না, এমন কিছু করেন না যাহাতে পৃথিবীর, মাতা বসুধার অঙ্গে কোন আঘাত লাগে। কারণ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, এই কদিন মাতা বসুধার ঋতুপর্ব, এবং যতদিন তিনি ঋতুমতী থাকেন ততদিন তাঁহার অঙ্গে কোন আঘাত লাগে, এমন কিছু করিতে নাই। এই বিশ্বাস এবং অম্বুবাচীর পারণ দুইই আদিম কৌম সমাজের প্রজননশক্তির পূজা এবং তৎসংপৃক্ত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জড়িত।

বাঙালী হিন্দুর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের যেসব স্তরে ও অংশে আদিবাসী কৌম সমাজের অনার্য অব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণা ও উৎসবানুষ্ঠান সক্রিয় তাহার মাত্র কয়েকটির ইঙ্গিত ধরিতে চেষ্টা করিলাম। এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে এমন দুইচারিটি বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথা বলিতে হয় যাহাদের জন্মই হইতেছে এই আদিবাসী কৌম সমাজের ধ্যান-ধারণা এবং অভ্যাস হইতে। এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিব ও শিবলিঙ্গ, দুর্গা, কালী বা করালী, অর্থাৎ মাতৃকাতন্ত্রের দেবী, নারায়ণ-শিলা, গণেশ, ভৈরব, বৌদ্ধ জম্ভল, হারীতী, একজটা, নৈরাত্মা, ভৃকুটি প্রভৃতি দেবদেবীর কথা উল্লেখ করিতেছি না কারণ, ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই জানেন এইসব এবং আরও অনেক দেবদেবীর ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আদিবাসী কৌম-সমাজের বিশ্বাস ও অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। আমি শুধু এমন দুই চারিটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি যাঁহাদের পূজা বিশেষভাবে পূর্ব-ভারতেই প্রচলিত এবং যাহাদের জন্মেতিহাস সুস্পষ্টভাবেই এই কৌম সমাজের ধ্যান- ধারণা ও অভ্যাস- গত।

বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় মনসাদেবীর পূজা সুপ্রচলিত। এই পূজা এখন যেভাবে সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক প্রতিমাপূজা নয়, ঘট-মনসা বা পট-মনসার পূজা এবং মধ্যযুগীয় বাংলার মনসামঙ্গলের সঙ্গে এই ঘট-মনসা বা পট-মনসার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। ধনাপূজা মাটির ঘটের উপর সর্পধারিণী বা সর্পালংকৃতা মনসার ছবি আঁকিয়া তাঁহার পূজা, অথবা শোলা বা কাপড়ের পটের উপর মনসার কাহিনী আঁকিয়া টাঙানো পটের সম্মুখে পূজাই সাধারণ রীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-শতকপূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমাপূজা হইত, তাহার কয়েকটি মূর্তিপ্রমাণ বিদ্যমান। মনসাদেবী যে কী করিয়া উচ্চতর সামাজিক স্তরে উন্নীত হইলেন তাহার বিস্তৃত পুরাণকাহিনী বাংলাদেশে সুবিদিত। সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজননশক্তির পূজা হইতেই যে মনসাপূজার উদ্ভব, এ তথ্য নিঃসন্দেহ। বাংলাদেশে যেসব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি কলসের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজননশক্তির প্রতীক। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এ তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল আমলের প্রথম পর্বেই মনসাদেবী ব্রাহ্মণ্যধর্মে পূজিতা ও স্বীকৃতা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনী হইতেই প্রমাণ হয় মনসাদেবীর

প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক কোনো ঐতিহ্যই ছিল না। তেলুগু- ও কানাড়ী -ভাষী লোকদের মধ্যে 'মঞ্চাম্মা' নামে এক সর্পদেবীর পূজা আজও প্রচলিত এবং সেখানেও অম্বাবরু-নাম্নীর এক সর্পদেবী সম্বন্ধে মনসাদেবীর অনুরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মঞ্চাম্মাই আমাদের মনসা, এবং অম্বাবরুর কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসাপূজার প্রচলন হয় দক্ষিণী সেন-বর্মণ রাজাদের আমলেই।

মনসার সঙ্গেই নাম করিতে হয় জঙ্গলবাসী, শবরকুমারীরূপিণী বৌদ্ধ জাঙ্গুলী দেবীর। এই দেবী বীণাবাদায়ন্ত্রী এবং মনসার মতো তিনিও সর্পবিষমোচয়িত্রী। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৈদিক সরস্বতীও অন্যতম রূপে সর্পবিষমোচয়িত্রী এবং সেক্ষেত্রে তিনিও শবরকন্যা। এই গুণসাম্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তী কালে মনসাকে যেমন তেমনই জাঙ্গুলীকেও কোথাও বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ্য মনসা এবং জাঙ্গুলী যে একই দেবী তাহাও বলা হইয়াছে। মনসাদেবীর পূজা প্রসারের প্রমাণ কালবিবেকগ্রন্থে সুস্পষ্ট।

প্রাক্-আর্যব্রাহ্মণ্য শবরদের সঙ্গে আর-একটি বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; ইঁহার নাম পর্ণশবরী। ইনি ব্যাঘ্রচর্ম - ও বৃক্ষপত্র - পরিহিতা, যৌবনরূপিণী, বজ্রকুণ্ডলধারিণী। ধ্যানেই বলা হইয়াছে যে তিনি ডাকিনী, - পিশাচী ও মারী - সংহারিকা। সন্দেহ নাই যে, আদিতে তিনি শবরদেরই আরাধ্যা দেবী ছিলেন ; পরে কালক্রমে যখন আর্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন তখন তাঁহার পরিচয় হইল "সর্বশবরানাম্ ভগবতী"। বজ্রযানী বৌদ্ধসাধনায় শবরদের যে একটা বিশেষ স্থান ছিল, চর্যাগীতির একাধিক গানই তাহার প্রমাণ।

পূর্ব-ভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবনযাত্রার নানাক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। পাহাড়পুর মন্দিরের অসংখ্য মাটির ফলকে শবর নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যেভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বাংলার নানা স্থানে, যেমন উত্তর বঙ্গে ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে, এই শবররা কালক্রমে আমাদের হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। নীলাচলক্ষেত্র পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাঁহার পূজার সঙ্গে শবরদের ধর্ম ও পূজানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আজ আর অবিদিত নাই। কালবিবেক-গ্রন্থ ও পরবর্তী কালিকাপুরাণে শারদীয়া দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে এক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই উৎসবে লোকেরা শবরদের মতো নগ্ন অঙ্গে গাছের পাতা জড়াইয়া, সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া তালে-বেতালে পূর্ণ উদ্দাম যৌনলীলার নানা গান গাহিত, নাচিত এবং ঢাক বাজাইত।

মনসাদেবীর ক্ষেত্রে যেমন দুই রকমের পূজা (এক, মনসার মূর্তির পূজা এবং আর-এক, তাঁহারই চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা), বাংলার অন্যান্য দুই-একটি দেবীমূর্তির ক্ষেত্রেও তাহাই। আমাদের দেশে লক্ষ্মীর প্রথম মূর্তিপূজা খুব সুপ্রচলিত নয় ; বিষ্ণু-নারায়ণের শক্তি হিসাবে তাঁহার যাহা কিছু প্রতিপত্তি। কিন্তু আমাদের লোকধর্মে লক্ষ্মীর আর-একটি পরিচয় আমরা জানি এবং তাঁহার পূজা বাঙালী সমাজে নারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। এই লক্ষ্মী কৃষিসমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি শস্যপ্রাচুর্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী। এই লক্ষ্মীর পূজা ঘটলক্ষ্মী বা

ধান্যশীর্ষপূর্ণ চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা, এবং এই পূজাব্রতের সঙ্গে যেসব ব্রতকথা এবং যেসব পৌরাণিক কাহিনী জড়িত তাহা একত্র বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরি হয় না যে, লক্ষ্মীর এই লৌকিক মানস-কল্পনাই ক্রমশ পৌরাণিক লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আর শারদীয়া পূর্ণিমাতে কোজাগর-লক্ষ্মীর যে পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও আদিতে এই কৌম সমাজেরই পূজা বলিলে অন্যায় হয় না। বস্তুত, দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শারদীয়া কোজাগর উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজার কোন সম্পর্কই ছিল না।

ষষ্ঠীপূজা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। ষষ্ঠীদেবীর কোন মূর্তি-পূজার প্রচলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নাই; বৌদ্ধ প্রতিমাশাস্ত্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানে ষষ্ঠীদেবীর মানস-কল্পনাই বোধ হয় হারীতীদেবীর রূপকল্পনায় বিবর্তিত হইয়াছে। ষষ্ঠী-পূজার ব্রতকথা, এবং মহাবস্তু, সর্বাস্তিবাদী বিনয়পিটক, চীনা সূত্রপিটক-গ্রন্থের সংযুক্তরত্নসূত্রে ও ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা-গ্রন্থে হারীতীর জন্মকাহিনী অনুসরণ করিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ষষ্ঠী এবং হারীতীর জন্ম একই মানস-কল্পনায়, এবং দুয়েরই মূলে প্রজননশক্তিতে এবং মারীনিবারক জাদুশক্তিতে বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। বৌদ্ধ ধর্মাচারে হারীতীদেবীর মূর্তিপূজা সুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু ষষ্ঠী-পূজায় আজও কোন মূর্তিপূজা নাই এবং শেষোক্ত পূজা এখনও নারীসমাজেই সীমাবদ্ধ; সন্তানকামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় আজ এই পূজা বিবর্তিত। ষষ্ঠী-হারীতীর মারীনিবারক জাদুশক্তির পূজা এখন আশ্রয় করিয়াছে গর্দভবাহিনী শীতলাদেবীকে।

এইখানেই যে প্রাক্-আর্য বাঙালী সমাজের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের বিবরণ শেষ হইল তাহা বলা চলে না। বরং বলা উচিত, ইহা সূচনা মাত্র। বস্তুত, এ সম্বন্ধে আলোচনা গবেষণা এত কম হইয়াছে যে, ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া বিস্তৃত কিছু বলিবার উপায় নাই। তবু, এ কথা নিসংশয়ে বলা যায় যে, বাঙালী সমাজে নারীদের মধ্যে এবং সাধারণ আর্য-ব্রাহ্মণ্য পূজাচারের মধ্যে যেসব লৌকিক স্থানীয় অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত তাহা প্রায় সমস্তই প্রাক্-আর্য কৌম সমাজের দান। ভূতপ্রেতবাদে বিশ্বাস, পুনর্জন্ম-বাদে বিশ্বাস, প্রজননশক্তি, জাদুশক্তি প্রভৃতির প্রতীকের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তাহাদের শুভ অশুভ নিয়ন্ত্রণক্ষমতায় বিশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণার অন্তর্গত ছিল। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃপুরুষের তর্পণ প্রভৃতি ব্যাপারে যে ধ্যান আমাদের মনন-কল্পনায় তাহার মূলে প্রাক্-আর্য কৌম সমাজের বিশ্বাস সক্রিয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িত বৃষকাষ্ঠ ও তাহার বিসর্জন, রান্নার পর কাক ডাকিয়া হবিষ্যান্ন খাওয়ানো, পিণ্ডদান প্রভৃতি সমস্তই আমরা আহরণ করিয়াছি আমাদেরই প্রতিবেশী শবর-পুলিন্দ-কিরাত-সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোল-ভীলদের নিকট হইতে। মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রারম্ভে আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাঁহাদের পূজাও ইঁহাদের ধ্যান-ধারণা হইতেই আহৃত।

এই আদিমতম ধর্মকর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপরই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য এবং অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

তিন

জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বাভিযানকে আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাংলায় আর্য-ধর্মকর্মের প্রাথমিক সূচনা ও বিস্তার। এই তিন ধর্মমতই বেদবিরোধী, বেদের অপৌরুষেয়ত্বে অবিশ্বাসী, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই মূলত আর্যধর্মাশ্রয়ী। এই তিন ধর্মের মধ্যে আবার জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গেই কৌম বাঙালীর প্রথম আর্যধর্মপরিচয়।

জৈন-পুরাণের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয়, মানভূম, সিংভূম, বীরভূম ও বর্ধমান, এই চারিটি স্থান-নাম জৈন তীর্থংকর মহাবীর বা বর্ধমানের সঙ্গে জড়িত। জৈন-পুরাণমতে ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে বিশ জনেরই নির্বাণ-স্থান হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ পাহাড়ের সমাধিশিখরে। আচারাঙ্গ-সূত্রকথিত মহাবীর ও তাঁহার শিষ্যবর্গের রাঢ়দেশ (বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমি) পরিভ্রমণের গল্প সুবিদিত। এই গল্পেই সুপ্রমাণ যে প্রাক্-আর্য কৌমসমাজবদ্ধ রাঢ়দেশে আর্যধর্মের প্রসার খুব সহজ হয় নাই। হরিসষেণের বৃহৎকথাকোষ-গ্রন্থে (৯৩১ খ্রী) বর্ণিত আছে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু প্রখ্যাত জৈনসূরী ভদ্রবাহু ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনান্তর্গত দেবকোটের এক ব্রাহ্মণের সন্তান; দিব্যাবদানের একটি গল্পে জানা যায়, অশোক একবার পুণ্ড্রবর্ধনের নির্গ্রন্থদের (জৈনদের) অপরাধে (ভুল করিয়া?) পাটলীপুত্রের ১৮,০০০ হাজার আজীবিকদের (চীনা অনুবাদ মতে, নির্গ্রন্থপুত্রদের) হত্যা করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থের উক্তি প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকেই পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনরা যে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বেশি খবরাখবর রাখিত তাহা জৈন ভগবতী-সূত্রের সাক্ষ্যেই সুপ্রমাণ। ষোড়শ মহাদেশের তালিকায় বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়-গ্রন্থে প্রাচ্যদেশের দুটি মাত্র জনপদের নামোল্লেখ পাইতেছি—অঙ্গ এবং মগধ। জৈন ভগবতী-সূত্রে পাইতেছি তিনটির উল্লেখ—অঙ্গ, বঙ্গ এবং লাঢ় (রাঢ়)। জৈন সূত্র-গ্রন্থগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বারবারই পাওয়া যায়। আরও সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাস্য তথ্য পাওয়া যাইতেছে জৈন কল্পসূত্র-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তাম্রলিত্তিয়, কোডিবর্ষীয়া, পোণ্ড-বর্ধনীয়া এবং (দাসী) খব্বডিয়া নামে জৈন গোদাস-গণীয় ভিক্ষুদের চারিটি শাখার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শাখার নামকরণ স্থান-নাম হইতে এবং এই স্থান-নামগুলি যথাক্রমে তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর), কোটিবর্ষ (দিনাজপুর), পুণ্ড্র-বর্ধন (বগুড়া) এবং খর্বাট বা কর্বাট (পশ্চিমবঙ্গেরই কোন স্থান)। জৈন ধর্মের বহুল বিস্তৃতি না থাকিলে এতগুলি শাখা বাংলাদেশে কেন্দ্রীকৃত হওয়ার কোন সুযোগ থাকিত না।

জৈনদের মতো এতটা না হোক, আজীবিকেরাও সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে কিছুটা প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আজীবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মখলিপুত্র গোসাল ও মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক (খ্রী পূ ষষ্ঠ শতক) এবং পরস্পর পরম-বন্ধু; ভগবতী-গ্রন্থমতে তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে ছয় বৎসর কাটাইয়াছিলেন বজ্র-ভূমির অন্তর্গত পণিত ভূমিতে। রাঢ়দেশ-পরিব্রজ্যায় আসিয়া মহাবীর এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের দীর্ঘবংশদণ্ডধারী অনেক ভিক্ষুর দেখা পাইয়াছিলেন। পাণিনি রাঢ়-

দেশে মস্করী-সম্প্রদায়ের যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে এই ভিক্ষু-বিবরণ বেশ মিলিয়া যায় এবং মনে হয়, তিনি যেন আজীবিকদের কথাই বলিয়াছেন। আর, আজীবিকেরা যে প্রাচ্যদেশে বেশ প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিলেন তাহা তো বিহারের নাগার্জুন ও বরাবর পাহাড়ের গুহাবলী এবং মৌর্যসম্রাট অশোক ও দশরথের একাধিক শিলালিপিসাক্ষ্যেই সপ্রমাণ। ভগবতী-গ্রন্থের মতে পুণ্ডরাজ মহাপৌম আজীবিকদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এই পুণ্ড বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু আমার তো মনে হয়, ভগবতী-গ্রন্থকার পুণ্ড বলিতে পুণ্ড্রই বুঝিয়াছেন।

বৌদ্ধ জনশ্রুতির ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয়, জৈন ও আজীবিকদের সমসাময়িক কালে বৌদ্ধধর্মও প্রাচীন বাংলায় বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। সংযুত্তনিকায়-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেব একবার সুম্ভ ভূমির (সুহ্ম ভূমি ?) অন্তর্গত শেতকনগরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন; অঙ্গুত্তর নিকায়-গ্রন্থে বঙ্গান্তপুত্ত নামে এক বৌদ্ধ আচার্যের উল্লেখ পাইতেছি; বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতাগ্রন্থের অনাথপিণ্ডকসুতা সুমাগধার কাহিনীতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং একবার ধর্মপ্রচারোদ্দেশে পুণ্ড্রবর্ধনে আসিয়া ছয়মাস বাস করিয়া গিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ্ও বলিতেছেন, বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এতগুলি উল্লেখ সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের বাংলাদেশে আসা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয় না; তবে মৌর্য সম্রাট অশোকের আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাংলার কোন কোন স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আর অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচার যে অন্তত কিছুটা বাংলাদেশের চিত্তজয় করিয়াছিল তাহার প্রমাণ তো দিব্যাবদান-গ্রন্থ এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেই পাইতেছি। এবং অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল মহাস্থান শিলাখণ্ড-লিপিতে তো তাহার পাথুরে প্রমাণও বিদ্যমান। এই লিপিতে ছবগ্গীয় বা ষড়্বর্গীয় থেরবাদী ভিক্ষুদের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁচী স্তূপের দুইটি দানলিপি হইতে। তিব্বতী জনশ্রুতি মতে নাগার্জুন বাংলাদেশে—বঙ্গাল ও পুণ্ড্রবর্ধনে—অনেকগুলি বিহার তৈরি করাইয়াছিলেন। বাংলাদেশে (এক্ষেত্রে বঙ্গে, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আরও নির্ভর-যোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইতেছি খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের নাগার্জুনী-কোণ্ডর একটি শিলালিপিতে। মহাযান সাহিত্যের মতে বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন বাঙালী, তিনি তাম্রলিপ্তিবাসী স্থবির কালিক। মনে হয়, তিনি প্রাক্-গুপ্ত পর্বের লোক।

প্রাক্-গুপ্ত পর্বে বাংলায় জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের অল্প-বিস্তর প্রমাণ যদি বা পাওয়া যায়, আর্য বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নাই। বেদ-সংহিতায় বাংলাদেশের তো কোন উল্লেখই নাই; ঐতরেয় আরণ্যক-গ্রন্থে যদি বা আছে (?) তাহাও নিন্দাচ্ছলে। এমন কি বোধায়নের ধর্মসূত্র রচনাকালেও বাংলাদেশ আর্য বৈদিক সংস্কৃতির বহির্ভূত। অথচ মিথিলা পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার তো উপনিষদ্-যুগেই হইয়া গিয়াছিল, এবং বাংলাদেশে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসারের পথে কোন ভৌগোলিক

বাধা ছিল না। ভাষাগত ও জনগত তথ্যপ্রমাণ হইতে মনে হয়, খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয় শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য বৈদিক ধর্মের সংস্কৃতির প্রসার কিছু হয় নাই; জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিকেরা আর্যধর্ম প্রসারের চেষ্টা কিছু করিয়াছিলেন এবং অল্পবিস্তর সার্থকতাও লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈদিক ধর্মের দিক হইতে সে চেষ্টা বিশেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য উন্নাসিকতা বাংলাদেশকে বহুদিন অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিত।

তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে কোথাও কোথাও আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় ধ্যান-ধারণার সংঘর্ষের কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। হরিবংশ-গ্রন্থে যাদব কৃষ্ণের সঙ্গে পুণ্ড্র-বাসুদেবের এক সংঘর্ষের কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতে ভীমের পূর্বাভিযান প্রসঙ্গে এক পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পরাজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই পৌণ্ড্রক বাসুদেবই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী পুণ্ড্র-বাসুদেব। স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, বাসুদেব কি পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন? তাঁহার ধর্মমত ও বিশ্বাস কী ছিল? ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় এই জাতীয় কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুত, প্রাক্-গুপ্ত পর্বের বাংলায় আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসারের নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণই নাই। অবৈদিক ব্রাত্যধর্মের প্রসার ছিল প্রাচ্যদেশে এ তথ্য সুবিদিত। অথর্ববেদের একটি ব্রাত্যস্তোত্রের ব্যাখ্যায় মনে হয়, ব্রাত্যধর্মের সঙ্গে যোগধর্মের সম্বন্ধ বোধহয় ছিল ঘনিষ্ঠ এবং এই যোগধর্মের অভ্যাস ও আচরণ প্রাচীন বাংলায়ও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু যোগধর্মের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই; বরং সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারে পণ্ডিতেরা মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যোগধর্ম প্রাক্-বৈদিক, এবং শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে যোগের সম্বন্ধ ঐতিহাসিক পর্বের।

চার

বাংলাদেশের সর্বতোভদ্র আর্যীকরণ আরম্ভ হইল গুপ্তপর্বেই। এই আরম্ভের মূলে সর্বভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রেরণা সক্রিয় ছিল।

খ্রীষ্ট শতকের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দেড়শত দুইশত বৎসর ধরিয়া ভূমধ্যীয় যাবনিক এবং মধ্য-এশীয় শক-কুষাণ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ ভারতীয় প্রবাহে নূতন নূতন ধারা সঞ্চার করিতেছিল। সূচনাতেই এইসব বিচিত্র ধারাগুলিকে সংহত ও সমন্বিত করিয়া মূল প্রবাহের সঙ্গে একই খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হয় নাই; তাহা ছাড়া, গ্রামীণ কৃষিসভ্যতার ধীর মন্থর জীবনে এই সমন্বয়ের গতিও ধীর মন্থর হইতে বাধ্য। বৌদ্ধ ধর্মে মহাযানবাদের উদ্ভব, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যানে অনেক নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি ও রূপকল্পনা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে কিছু কিছু নূতন ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি এই কালে দেখা দেয়। ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনেও এই সময় একটি গুরুতর রূপান্তর দেখা দেয়। প্রথম খ্রীষ্ট শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই, ভূমধ্যীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। যে দেশ ছিল প্রধানত কৃষি-

নির্ভর সেই দেশ, রোম সাম্রাজ্যের সকল প্রান্ত হইতে প্রচুর সোনা আগমের ফলে, ক্রমশ শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভরতায় রূপান্তরিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্বত্র সমৃদ্ধ নগর, বন্দর, হাট বাজার ইত্যাদি গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। বিদেশী নানা ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির তরঙ্গাভিঘাত, নানা জাতি ও জনের সংঘাত এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর এই বিবর্তন, এই দুইয়ে মিলিয়া ভারতীয় জীবনপ্রবাহে এক গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই চাঞ্চল্য শুধু জীবনের উপরের স্তরেই নয়, ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত ছিল চিন্তার ও কল্পনার গভীরতর স্তরে। সংহতি ও সমন্বয়ের সজাগ প্রয়াস দেখা দেয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই; ঐ শতকেই দেখিতেছি সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী চতুর্বর্ণ্য সাংকর্য নিবারণ করিয়া তদানীন্তন বর্ণব্যবস্থাকে একটা সমন্বিত রূপের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নব রূপান্তর ঘটাইতে পারিল শুধু তখনই যখন ভারতবর্ষের এক সুবৃহৎ অংশ গুপ্ত-বংশীয় সম্রাটদের রাষ্ট্রবন্ধনে এবং তাঁহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঁধা পড়িল। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের এই সংহতিই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সংহতিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিল। উপরোক্ত সমন্বয় ও সংহতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান হইতেছে ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণ। এগুলির সংকলনকাল গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ।

ভারতীয় ইতিহাসের এই গভীর বিবর্তনের সঙ্গে সমসাময়িক বাংলার ইতিহাস ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। গুপ্তসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংহতির মধ্যে ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে এবং এই দেশ ক্রমশ নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রত্যন্ত অংশীদার হইয়া উঠে।

প্রথমেই চোখে পড়ে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। একটির পর একটি তাম্রপট্টে দেখিতেছি, বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যাইতেছেন। ভূমিদান যাহা হইতেছে তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণদের. দানের উদ্দেশ্য দেবমন্দির নির্মাণ, মন্দির সংস্কার, বিগ্রহের নিত্য নিয়মিত সেবা ও পূজার ব্যয়সংস্থান। ষষ্ঠ শতকে এই বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ভাস্করবর্মার নিধনপুরলিপিতে দেখি, ভূতিবর্মার রাজত্বকালেই শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে দুই শতেরও উপর ব্রাহ্মণ পরিবার আনিয়া বসানো হইতেছে। সপ্তম শতকের লোকনাথ-পট্টোলীতে দেখিতেছি, সমতট দেশে (বর্তমান ত্রিপুরা জেলায়) জঙ্গল কাটিয়া নূতন বসতির পত্তন হইতেছে এবং সেই পত্তনে যাঁহাদের বসানো হইতেছে তাঁহারা সকলেই চতুর্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ। সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, এই পর্বে বাংলার সর্বত্র বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছে।

কিন্তু বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাও লোকায়ত জীবনের দিক হইতে অধিকতর অর্থবহ পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার। ইহারও বিশেষ কিছু অস্তিত্ব প্রাক্-গুপ্ত বাংলায় দেখিতেছি না। অথচ, চতুর্থ শতকেই দেখিতেছি, বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের এক গুহার প্রাচীরগাত্রে একটি বিষ্ণুচক্র উৎকীর্ণ, এবং চক্রের নীচেই যাঁহার লিপিটি বিদ্যমান সেই রাজা চন্দ্রবর্মা নিজের পরিচয়

দিতেছেন চক্রস্বামীর পূজক বলিয়া। পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে বগুড়া জেলার বালিগ্রামে এক গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাইতেছে। বৈগ্রাম-লিপিতে, এবং ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর-বঙ্গে, দুর্গম হিমবচ্ছিখরে শ্বেতবরাহ-স্বামী ও কোকামুখস্বামী নামে দুই দেবতার দুই মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাইতেছে ৪নং ও ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে। গোবিন্দস্বামী বিষ্ণুরই অন্যতম নাম সন্দেহ নাই; শ্বেতবরাহস্বামীও বরাহ-অবতার বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ বলিয়া মনে হয়। কোকামুখস্বামীকে কেহ মনে করেন বিষ্ণুর অন্যতম রূপ, কেহ মনে করেন শিবের। ইহার কিছুদিন পরই ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর পট্টোলীতে এক প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের খবর পাইতেছি। প্রদ্যুম্নেশ্বরও বিষ্ণুর অন্যতম রূপ। সপ্তম শতকের লোকনাথ পট্টোলীতে ত্রিপুরা জেলায় ভগবান অনন্তনারায়ণের পূজার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই সপ্তম শতকেরই কৈলান পট্টোলীতে দেখিতেছি, শ্রীধারণরাত ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং পুরুষোত্তমের ভক্ত উপাসক। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পৌরাণিক বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপ ও ধ্যানের সঙ্গে সমসাময়িক বাঙালীর পরিচয় ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। কারণ, লিপিগত উল্লেখই শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন বৈষ্ণবপ্রতিমার সাক্ষ্যও বিদ্যমান। এই প্রতিমাগুলির রূপকল্পনা ও লক্ষণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৌরাণিক বিষ্ণু তাঁহার নিজস্ব মর্যাদায় এবং সপরিবারে, সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্ছন লইয়া বাংলাদেশে আসিয়া আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন গুপ্তপর্বেই

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বাংলায় বিষ্ণুর যে কয়েকটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় (গোবিন্দস্বামী, কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, প্রদ্যুম্নেশ্বর, অনন্ত-নারায়ণ, পুরুষোত্তম) তাহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। পঞ্চরাত্রীয় চতুর্ব্যূহবাদের কোন আভাসও এই পর্বের লিপিগুলিতে কোথাও দেখিতেছি না। গুপ্তপর্বের রাজা-মহারাজেরা নিজেদের পরিচয়ে সাধারণত 'পরমভাগবত' পদটি ব্যবহার করিতেন; মনে হয়, তাঁহারা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব ভাগবধর্মে দীক্ষিত। আদিতে যাহাই হউক, অন্তত গুপ্তপর্বে এই ভাগবধর্মের সঙ্গে পঞ্চরাত্রীয় ব্যূহবাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। বস্তুত, এই পর্বের ভাগবধর্ম ঋগ্বেদীয় বিষ্ণু, পঞ্চরাত্রীয় নারায়ণ, মথুরা অঞ্চলের সাত্বত-বৃষ্ণিদের বাসুদেব-কৃষ্ণ, পশুপালক আভীর প্রভৃতি কোমের গোপাল ইত্যাদির সমন্বিত একক রূপ বলিয়াই মনে হয়। এই ভাগবধর্মই গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে বাংলাদেশে প্রচার লাভ করে এবং পালপর্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত কৃষ্ণায়ণ- ও রামায়ণ -কাহিনী যে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই বাংলাদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুর মন্দিরের পোড়ামাটির ও পাথরের ফলকগুলিতে। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ, গোপীলীলা, কৃষ্ণকে লইয়া বাসুদেবের গোকুলগমন, রাখাল বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম, গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যজীবনলীলা প্রভৃতি কৃষ্ণায়ণের অনেক গল্প এই ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে। একটি ফলকে প্রভামণ্ডলযুক্ত, লাস্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান একজোড়া মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ—দক্ষিণে নারীমূর্তি, বামে নরমূর্তি। কেহ কেহ এই মূর্তি দুইটিকে রাধা-কৃষ্ণের লাস্যরূপ বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন; কিন্তু রাধা কল্পনার ঐতিহ্য এত প্রাচীন নয়। হালের গাথা সপ্তশতীতে রাধার

উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে উল্লেখের প্রাচীনত্ব নিশ্চয় করিয়া নির্ধারণ কঠিন। তবে, জয়দেবের (দ্বাদশ শতক) পূর্বেই কোন সময়ে, এই বাংলাদেশেই রাধাতত্ত্ব ও রাধার রূপকল্পনা সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল। বস্তুত, বৈষ্ণব ধর্মের রাধা শাক্তধর্মের শক্তিরই বৈষ্ণব রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। শিবের মতো কৃষ্ণ বা বিষ্ণুই বৈষ্ণব ধর্মে পরম পুরুষ, এবং এই পুরুষের প্রকৃতি বা শক্তি হইতেছেন রাধা। এই পৃথিবী বা প্রকৃতি যে বিষ্ণুর শক্তি বা বৈষ্ণবী, এই ধ্যান ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছিল; হয়তো এই ধ্যানেরই বিবর্তিত রূপ হইতেছেন রাধা। পাহাড়পুরের যুগলমূর্তি কৃষ্ণ ও রুক্মিণী বা সত্যভামার শিল্পরূপ বলিয়াই মনে হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পাহাড়পুরে কৃষ্ণায়ণের গল্পগুলি মন্দিরের অলংকরণ উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পূজার জন্য নহে। রামায়ণের কয়েকটি গল্পের যে প্রতিকৃতি আছে (যেমন, বানরসেনা কর্তৃক সেতু নির্মাণ, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ ইত্যাদি) সে সম্বন্ধেও এ-উক্তি প্রযোজ্য।

এই পর্বের বাংলায় শৈব ধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা কিন্তু দেখা যাইতেছে না, যদিও যে শৈবধর্মের দেখা পাইতেছি তাহা পুরাপুরি সমৃদ্ধ পৌরাণিক শৈবধর্ম। শিবের বিভিন্ন নাম ও রূপকল্পনার সঙ্গে পরিচয় সূচনাতেই ঘটিতেছে, এবং বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গ, শিবলিঙ্গের এই দুই রূপের পরিচয়ই বাংলাদেশে পাওয়া যাইতেছে। ৪নং দামোদরপুরলিপিতে দেখিতেছি, পঞ্চম শতকে উত্তর বঙ্গের এক দুর্গমপ্রান্তে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় শৈবধর্ম মহারাজ বৈন্যগুপ্তের রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া পূর্ব-বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা দুইজনই পরম শৈব। শশাঙ্কের মুদ্রায় মহাদেবের এবং নন্দীবৃষের প্রতিকৃতি। ষষ্ঠ শতকের সমাচারদেবের মুদ্রায়ও নন্দীবৃষের শৈবলাঞ্ছন। আস্রফপুর পট্টোলীর সাক্ষ্যে মনে হয়, খড়্গবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ হইলেও শৈবধর্মের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; তাঁহাদের রাজকীয় মুদ্রায়ই বৃষলাঞ্ছন। এই শতকেরই অন্যতম ব্রাহ্মণ নরপতি ভরদ্বাজগোত্রীয় করণ লোকনাথও বোধহয় ছিলেন শৈব। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এতগুলি রাজা ও রাজবংশের পোষকতায় বাংলাদেশে শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভে বেগ পাইতে হয় নাই।

শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তির কিছু প্রমাণ পাহাড়পুরের ফলকগুলিতেও পাইতেছি: বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গরূপী শিব দুই-ই বিদ্যমান, এবং যে দুইটি ফলকে নিঃসন্দেহে শিবলিঙ্গের প্রতিকৃতি সে দুইটিতেই ব্রহ্মসূত্রের বেষ্টনও সুস্পষ্ট। পাহাড়পুর মন্দিরের পীঠপ্রাচীরগাত্রের ফলকে কয়েকটি চন্দ্রশেখর শিবের প্রতিকৃতিও আছে। তৃতীয় নেত্র, উর্ধ্বলিঙ্গ, জটামুকুট, কোন কোন ক্ষেত্রে বৃষবাহন, ত্রিশূল অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে সন্দেহ করিবার উপায় থাকে না যে, এই ধরনের প্রতিমা হইতেই ক্রমশ পাল ও সেন পর্বের পূর্ণতর শিবপ্রতিমার উদ্ভব।

শৈব গাণপত্য ধর্মের প্রসারের কোন প্রমাণ অন্তত এই পর্বের বাংলাদেশে দেখা যায় না; কিন্তু গণপতি বা গণেশের প্রতিকৃতি এই পর্বেও সুপ্রচুর। এক পাহাড়পুরেই পাথরের, পোড়ামাটির ও ধাতব কয়েকটি উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান গণেশপ্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি নৃত্যপর গণেশের প্রতিমা, এবং এই প্রতিমাটিতে

লোকায়ত মনের সরল সরস কৌতুকের শিল্পময় প্রকাশ সুস্পষ্ট। গণেশের যাহা কিছু প্রধান লক্ষণ ও লাঞ্ছন তাহা তো এই প্রতিমাগুলিতে আছেই, একটি উপবিষ্ট গণেশের এক হাতে প্রচুর পত্রসহ একটি মূলার লক্ষণ বিশেষ লক্ষণীয়।

শৈব কার্তিকেয়ের কোন লিপিপ্রমাণ বা মূর্তিপ্রমাণ এই পর্বে কিছু দেখা যাইতেছে না। তবে, অষ্টম শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়ের এক মন্দিরের উল্লেখ পাইতেছি কহ্লনের রাজতরঙ্গিনীতে। কিন্তু গণেশ বা কার্তিকেয় বা পরবর্তী বাংলার ইন্দ্র, অগ্নি, রেবন্ত, বৃহস্পতি, কুবের, গঙ্গা, যমুনা বা মাতৃকাদেবী যাঁহাদের লিপি- মূর্তি বা গ্রন্থ -প্রমাণ বিদ্যমান তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের বাংলাদেশে কখনও গড়িয়া উঠে নাই।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সূর্যমূর্তি ও সূর্যপূজার পরিচয় আমরা পাই তাহা একান্তই উদীচ্য সংস্কৃতির দান; এই দান বহন করিয়া আনিয়াছিলেন ইরানী ও শক অভিযাত্রীরা। বৈদিক সূর্যধ্যানকল্পনার সঙ্গে যেমন এই সূর্যের কোন যোগ নাই, তেমনই নাই লোকায়ত জীবনের সূর্যধ্যান ও ব্রতাচারের সঙ্গে। এই উদীচ্যদেশী সূর্যের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিচয় ঘটে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই। মনে হয়, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই বাংলাদেশে সৌরধর্ম কিছুটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং বিশিষ্ট একটি সৌর সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার আদিতম আর্যধর্মই হইতেছে জৈনধর্ম এবং গুপ্ত-পর্বের আগেই বাংলাদেশে, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গে জৈনধর্ম বিশেষ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু গুপ্তপর্বে জৈনধর্মের উল্লেখ বা জৈন মূর্তিপ্রমাণ বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। একটি মাত্র অভিজ্ঞান পাইতেছি পাহাড়পুর পট্টোলীতে; এই পট্টোলীতে দেখা যাইতেছে পঞ্চম শতকের বটগোহালীতে (পাহাড়পুর-সংলগ্ন বর্তমান গোয়ালভিটা) একটি জৈন বিহার ছিল। অথচ, প্রায় দেড়শত বৎসর পরই (সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদ) য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, (বৈশালী, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কলিঙ্গে) দিগম্বর নির্গ্রন্থ জৈনদের সংখ্যা ছিল সুপ্রচুর। দিগম্বর নির্গ্রন্থদের এই সুপ্রাচুর্য ব্যাখ্যা করা কঠিন। বাংলাদেশ এক সময় আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল, এবং এ তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে, বৌদ্ধদের চক্ষে আজীবিকদের সঙ্গে নির্গ্রন্থদের অশন-বসন-আচারানুষ্ঠানের পার্থক্য বিশেষ ছিল না। সেই হেতু, দিব্যাবদানগ্রন্থে দেখিতেছি, নির্গ্রন্থ ও আজীবিকদের নির্বিচারে একে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া তালগোল পাকানো হইয়াছে। হয়তো দিব্যাবদানের মতো য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ও আজীবিক ও নির্গ্রন্থের পার্থক্য ধরিতে না পারিয়া সকলকেই নির্গ্রন্থ বলিয়াছেন। অবশ্য এ কথাও স্মর্তব্য যে, প্রাচীন বাংলায় আজীবিকদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। নির্গ্রন্থ জৈন সম্প্রদায়ের, স্বল্পসংখ্যক হইলেও কিছু লোক নিশ্চয়ই ছিলেন; তাহা না হইলে বাংলার নানা জায়গায় প্রাপ্ত জৈন-মূর্তির ব্যাখ্যা করা যায় না।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার না হউক প্রভাব ও প্রতিপত্তি সকলের চেয়ে বেশি। চতুর্থ শতকের সূচনাতেই দেখিতেছি চীনা বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশে, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করিতেছেন। ই-ৎসিঙ্ বলিতেছেন চীনা শ্রমণদের ব্যবহারের জন্য মহারাজ শ্রীগুপ্ত একটি 'চীন মন্দির' নির্মাণ করাইয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; মন্দিরটি ছিল মৃগস্থাপন

(মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো) স্তূপের সন্নিকটেই। এই শ্রীগুপ্ত খুব সম্ভব গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুপ্ত বা গুপ্ত; এবং মৃগস্থাপন স্তূপ সম্ভবত বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গের কোন স্থানে। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনা বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন এবং তাম্রলিপ্তি বন্দরে দুই বৎসর বৌদ্ধ সূত্র ও বৌদ্ধ প্রতিমাচিত্র নকল করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্তিতে অসংখ্য-ভিক্ষু-অধ্যুষিত বাইশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধিও ছিল খুব। এই সমৃদ্ধির কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তিতে। পূর্ব-ভারতীয় গুপ্তশৈলীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন রাজসাহী জেলার বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটি; এই মূর্তিটি মহাযানী যোগাচারের শিল্পময় রূপ। বগুড়া জেলার মহাস্থানে বলাই-ধাপ-স্তূপের নিকট প্রাপ্ত ধাতব মঞ্জুশ্রী মূর্তিটিও এই যুগেরই এবং ইহাও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রমাণ আরও দৃঢ়তর হইতেছে ষষ্ঠ শতকের প্রথম দশকে উৎকীর্ণ মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীর সাহায্যে: সামন্ত-মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন মহাযানী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্রদত্তনির্মিত ও আর্য-অবলোকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত আশ্রম-বিহারের সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে। ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই বাংলার পূর্বতম প্রান্তে ত্রিপুরা জেলায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গুণাইঘরলিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নিজে ছিলেন শৈব। ত্রিপুরা জেলারই কৈলান পট্টোলীতে দেখিতেছি, শ্রীধারণরাতের মহাসান্ধিবিগ্রহিক জয়নাথ কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন একটি বৌদ্ধ-বিহারে। অথচ, শ্রীধারণরাত নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

চীনা শ্রমণদের কৃপায় সপ্তম শতকে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আমাদের আয়ত্তে। এঁদের মধ্যে য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং তথ্যবহুল। তিনি বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্রীষ্ট শতকে, এবং বৌদ্ধধর্মসাধনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি, এই কয়টি জনপদ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। কজঙ্গলে তিনি ছয়-সাতটি বৌদ্ধ সংঘারাম দেখিয়াছিলেন। কজঙ্গলের উত্তর অংশে গঙ্গার অনতিদূরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমাসম্বলিত, নানা কারুকার্যখচিত একটি বৃহৎ মন্দিরের কথাও তিনি বলিয়াছেন। পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিশটি বিহার এবং মহাযান ও হীনযান উভয়পন্থী তিন হাজারেরও উপর ভিক্ষু এই বিহারগুলিতে বাস করিতেন। সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন বিহারটি ছিল পুণ্ড্র-বর্ধন-রাজধানীর তিন মাইল পশ্চিমে এবং তাহার নাম ছিল পো-সি-পো বিহার। পো-সি-পো বিহার বোধহয় মহাস্থান-সংলগ্ন ভাসু-বিহার। য়ুয়ান-চোয়াঙ সমতটে দুই হাজার স্থবিরবাদী শ্রমণাধ্যুষিত ত্রিশটি বিহার দেখিয়াছিলেন। যথার্থত ইঁহারা বোধহয় ছিলেন মহাযানী। কর্ণসুবর্ণে দশাধিক বিহারে সম্মতীয় শাখার দুই হাজার শ্রমণ বাস করিতেন। সম্মতীয় বৌদ্ধরা সর্বাস্তিবাদী। কর্ণসুবর্ণ-রাজধানীর অনতিদূরে ছিল সুবিখ্যাত লো-টো-মো-চিহ বা রক্তমৃত্তিকা বিহার, বহু কৃতী পণ্ডিত শ্রমণ ছিলেন এই বিহারের অধিবাসী। তাম্রলিপ্তিতেও দশাধিক বিহার ছিল অথচ, তাম্রলিপ্তিতে ফা-হিয়েনের কালে বিহার ছিল বাইশটি। প্রায়

পঞ্চাশ বৎসর পর ই-ৎসিঙ যখন তাম্রলিপ্ত আসেন তখন সেখানে সর্বাস্তিবাদের প্রবল প্রতাপ; য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ও বোধহয় তাহাই ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যে মনে হয়, তাঁহার সময়ে অধিকাংশ বাঙালী শ্রমণই ছিলেন হীনযানপন্থী, এক-চতুর্থাংশের কিছু উপর ছিলেন মহাযানপন্থী। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আজ আমরা হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্মে যেভাবে পার্থক্য বিচার করিয়া থাকি, য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ে যে ধরনের বিচার ছিল না। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদে আজিকার দিনের মতপার্থক্য কিছুই করা হয় নাই; তাহাদের মতে শ্রাবকযান বা হীনযান মহাযানেরই নিম্নতর স্তরমাত্র। প্রাচীন চীনা ও জাপানী বৌদ্ধদের মতও তাহাই। আজ পণ্ডিতমহলে এ তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে, বৌদ্ধ মহাযান-পন্থী সর্বাস্তিবাদী, ধর্মগুপ্তবাদী, মহাসাংঘিকবাদী প্রভৃতি শ্রমণেরা যথার্থত হীনযানবাদের বিনয়-শাসন মানিয়া চলিতেন। পঞ্চাশ বৎসর পর ই-ৎসিঙ্ বলিতে-ছেন, পূর্ব-ভারতে মহাসাংঘিক, স্থবিরবাদী, সম্মতীয়বাদী এবং সর্বাস্তিবাদী এই চারি বর্গের বৌদ্ধরাই অন্যান্য শাখার বৌদ্ধদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিতেন। কিন্তু, মহাযানী বৌদ্ধরা ছাড়া অন্য কোন শাখাপন্থী বৌদ্ধ তাম্রলিপ্ততে ছিলেন না। সপ্তম শতকের তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু চীনা সাক্ষ্য বিদ্যমান। তা-চেং-টেং নামে এক বৌদ্ধ শ্রমণ সুদীর্ঘ বারো বৎসর তাম্রলিপ্ততে বসিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন; চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি নিদানশাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। তও-লিন নামে আর-এক বৌদ্ধ শ্রমণ তাম্রলিপ্তিতেই সর্বাস্তিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিখিয়া-ছিলেন। ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্ত আসিয়াছিলেন ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে। তিনিও তাম্র-লিপ্ততে কিছুকাল বাস করিয়া সংস্কৃত ও শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুন-বোধিসত্ত্ব-সুহৃল্লেখ নামে অন্তত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পো-লো-হো বা বরাহ-বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার একটি ছবি ই-ৎসিঙ্ রাখিয়া গিয়াছেন। কঠোর নিয়ম-সংযমে তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ছিল। ইহার তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর পরই বৌদ্ধ সংঘে-বিহারে—এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মানুষ্ঠানেও—যে নৈতিক অনাচার এবং শিথিলতা দেখা দিয়াছিল তাহার আভাস-মাত্রও এই পর্বে কোথাও দেখা যাইতেছে না।

ই-ৎসিঙ্ই সংবাদ দিতেছেন, ৬৪৪ খ্রীষ্ট শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙের ভারত ত্যাগ এবং ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে ই-ৎসিঙের ভারত আগমন, এই দুই তারিখের মধ্যে বহু চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে ছাপ্পান্ন জনের উল্লেখ ই-ৎসিঙ্ নিজেই করিয়াছেন।

এই ছাপ্পান্ন জনের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হইতেছেন সেঙ্-চি। সেঙ্-চি সমতটে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই প্রবাসের বিবরণও রাখিয়া গিয়াছেন। সেঙ্-চি বলিতেছেন, সে সময় সিংহাসনাসীন রাজার নাম ছিল রাজভট। ঐতিহাসিকেরা অনেকেই মনে করেন, এই রাজভট আর খড়্গবংশীয় তৃতীয় রাজা দেবখড়্গপুত্র রাজরাজভট্ট একই ব্যক্তি। রাজভট ছিলেন পরমোপাসক এবং ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তিমান; দানধ্যানও ছিল তাঁহার প্রচুর। মাঝে মাঝে তিনি বুদ্ধের সম্মানার্থ শোভাযাত্রা বাহির করিতেন; সমতটের রাজধানীতে তখন চার হাজার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির দিক হইতে সেঙ্-চির

সমতট য়ুয়ান-চোয়াঙের সমতট অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, এবং মহাযানের প্রভাব উত্তরোত্তর বর্ধমান। তাহার কারণ খড়্গরাজবংশের সকল রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের পরম পৃষ্ঠপোষক। সমতটে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির আর-একটি প্রমাণ রাতবংশীয় রাজা শ্রীধারণরাতের মহাসান্ধিবিগ্রহাধিকারী বৌদ্ধ জয়নাথ কর্তৃক ভূমিদান।

চীনা শ্রমণদের বিবরণ পড়িলে মনে হয়, অন্তত তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। ফা-হিয়েনের কালে তাম্রলিপ্তিতে বিহার ছিল বাইশটি; য়ুয়ান-চোয়াঙের সময় দশটি; ই-ৎসিঙের কালে মাত্র পাঁচ-ছয়টি। বোধ হয়, বাংলার অন্যত্রও তাহাই হইতেছিল একমাত্র সমতট ছাড়া। মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সময় হইতেই সমতটে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যেখানে দেখিয়াছিলেন ত্রিশটি বিহার ও মাত্র দুই হাজার শ্রমণ, সেঙ্-চি'র কালে সেখানে শ্রমণের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল চার হাজার। সমতটে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের এই বর্ধমান প্রতিপত্তির প্রধান কারণ মহাযানী বৌদ্ধ খড়্গবংশীয় রাজাদের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন। এই খড়্গবংশ ছাড়া পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের বাংলাদেশে আর কোন রাজবংশই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। সমতটে মহাযানের প্রতিপত্তি ত্রয়োদশ শতকের রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

আগে দেখিয়াছি, বৌদ্ধ জয়নাথ পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী; তিনি ভূমিদান বৌদ্ধসংঘে যেমন করিতেছেন, ব্রাহ্মণদেরও তেমনই। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেও দেখিতেছি, বৌদ্ধ শ্রমণ ও গৃহস্থোপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সকলেই একই সঙ্গে বাস করিতেছেন নির্বিবাদে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ হয়তো শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন নিদারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বৌদ্ধবিদ্বেষী শশাঙ্কের প্রতি বৌদ্ধ লেখকদের বিরাগ স্বাভাবিক, সুতরাং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ অতিরঞ্জিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁহার বিবরণ সর্বথা মিথ্যা এবং শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ কিছু ছিল না, এ কথা বলিয়া শশাঙ্কের কলঙ্কমুক্তির চেষ্টাও আধুনিক ব্রাহ্মণ্য-মানসের অসার্থক প্রয়াস। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের যে ক'টি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৌদ্ধবিদ্বেষ অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহা দ্বিগুণিত হইলেও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত ধর্মের উচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধ অবস্থা শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের বিপক্ষ যুক্তি বলিয়া উপস্থিত করা যায় না। বস্তুত, শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ অপ্রমাণ করিতে হইলে অন্য যুক্তির প্রয়োজন। অন্য দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সমসাময়িক পূর্ব-ভারতে নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম যেমন নববলে বলীয়ান হইয়া সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তারে প্রাগ্রসর, বৌদ্ধধর্মও তেমনই যোগাচারে সমৃদ্ধ হইয়া সমান প্রাগ্রসর। এই দুই ধর্মই তখন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী—জনসাধারণের মধ্যে সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তার উভয়েরই লক্ষ্য। কাজেই এমন অবস্থায় কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ী রাজা বা রাজবংশের পক্ষে অন্য ধর্মের উপর বিদ্বেষী হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিদ্বেষের কারণ সক্রিয়। বৌদ্ধ ধর্মের রাজকীয় মুখপাত্র তখন হর্ষবর্ধন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শশাঙ্ক; রাষ্ট্রক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উভয়েই সংগ্রামরত। এই

অবস্থায় শশাঙ্কের পক্ষে গয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা, বুদ্ধপ্রতিমাকে অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত করা, এবং সেই স্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, কুসিনারার এক বিহার হইতে ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা, পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ডকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা প্রভৃতি কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী হউন বা না হউন, জনসাধারণের ধর্মগত আচরণ-ব্যবহারের মধ্যে পরধর্মবিদ্বেষের কোন প্রমাণ অন্তত এই পর্বে নাই। ইতিহাস আলোচনায় সর্বত্রই দেখা যায়, পরধর্মবিদ্বেষ বা পরমত-অসহিষ্ণুতা শ্রেণীস্বার্থ-ভোগী উচ্চকোটি লোকদের শ্রেণীস্তরেই সৃষ্টিলাভ এবং পুষ্টিলাভ করে এবং তাঁহারাই নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ক্রমশ তাহা অজ্ঞ নিরক্ষর নিম্নতর লোকস্তরে সংক্রামিত করিতে চেষ্টা করেন। সর্বদাই এ ধরনের বিদ্বেষের পশ্চাতে সক্রিয় থাকে অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ। আমাদের দেশে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই। শ্রেণীস্বার্থ বা অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ যেখানে সক্রিয় নয় সেখানে বিদ্বেষের কোন কারণও নাই। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা পাশাপাশি একই জায়গায় বাস করিতেছেন, একে অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত এবং প্রয়োজন হইলে পোষকতাও করিতেছেন, কোথাও কাহারও ধর্মমতে কিংবা বিশ্বাসে বাধিতেছে না—ইহাই পারস্পরসম্বন্ধের মোটামুটি চিত্র। কিন্তু ব্যতিক্রম একেবারে ছিল না, এ কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত ধর্মের বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ছবগ্‌গীয় বা ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুদের কথা মহাস্থান-শিলাখণ্ডলিপি হইতেই জানা যায়। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুণ্ড্রনগরে ইঁহাদের কিছুটা প্রতিপত্তিও ছিল বলিয়া মনে হয়। ষড়্‌বর্গীয় সম্প্রদায় বুদ্ধ-প্রবর্তিত বিনয়-শাসন স্বীকার করিতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালের বাংলা-দেশে কোথাও কোন সূত্রেই এই ষড়্‌বর্গীয়দের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরিবর্তে আর-একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিতেছে গুপ্তোত্তর পর্বে; এই সম্প্রদায় দেবদত্ত-সম্প্রদায় নামে খ্যাত। ইঁহারা শাক্যমুনির বুদ্ধত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্তু গৌতম-পূর্ববর্তী তিনজন বুদ্ধের পূজা করিতেন। ৪০৫ খ্রীষ্ট শতকে ফা-হিয়েন শ্রাবস্তীতে এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের দেখা পাইয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কর্ণসুবর্ণে এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের তিনটি সংঘারাম দেখিয়াছিলেন। পরে বোধহয়, ইঁহারাও ষড়বর্গীয়দের মতোই বৌদ্ধদের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন।

য়ুয়ান-চোয়াঙের কালে বাংলায় নির্গ্রন্থ জৈন ধর্মের প্রসার ছিল যথেষ্ট, অথচ পরবর্তী কালে এই ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা লিপিমালায় বা সাহিত্যে আর শোনাই যাইতেছে না। কিন্তু পালপর্বে কিছু মূর্তিপ্রমাণ বিদ্যমান; স্বল্পসংখ্যক হইলেও পালপর্বে জৈন ধর্ম ও সংঘের অস্তিত্ব ছিল, সন্দেহ নাই। কিছুসংখ্যক জৈন ভিক্ষু ও উপাসক বোধহয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের কুক্ষিগত হইয়া থাকিবেন; পালপর্বের পর বাকী যাঁহারা রহিলেন তাঁহারাও বোধহয় পরে ক্রমশ কাপালিক-অবধূতদের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন।

পাঁচ

সপ্তম শতকের শেষার্ধ ও অষ্টম শতকের একপাদেরও অধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে এক জটিল ও গভীর আবর্ত। স্থানে স্থানে ছোট ছোট রাজবংশের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব, ভিন্‌প্রদেশী সমরাভিযান, যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি হিমালয়ক্রোড়স্থিত দেশগুলির সঙ্গে নূতন যোগাযোগ, মাৎস্যন্যায় প্রভৃতির সম্মিলিত ক্রিয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জটিল ও গভীর আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

সর্বভারতীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর প্রত্যেক ভৌগোলিক সীমায় এক-একটি স্থানীয় ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, এক কথায় স্থানীয় সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা—ইহাই যেন হইল অষ্টম-শতক-পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিত! সর্ব-ভারতীয় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে বাংলার যে বৈশিষ্ট্য ও দান তাহা যেন এই সময় হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান প্রযোজ্য।

যুয়ান-চোয়াঙের সময়ই ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। কিপলবাস্তু, কুসিনারা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থগুলির সেই অতীত সমৃদ্ধি আর ছিল না। বহুসংখ্যক বৌদ্ধ দেবপূজক ও তীর্থিকদের প্রভাব স্বীকার করিয়া লন। হর্ষবর্ধনের সক্রিয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা কনৌজে তথা মধ্যদেশে সদ্ধর্মের কিছু সমৃদ্ধির কারণ হইলেও ভারতের অন্যত্র তাহা এই অবনতির স্রোত ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। সর্বত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ; বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তারনাথ বলিতেছেন, পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের অব্যবহিত আগে এবং তাঁহার কালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত দুরবস্থা; যুয়ান-চোয়াঙের সময়েই তো বাংলাদেশে বৌদ্ধদের যেখানে ছিল মাত্র সত্তরটি বিহার-সংঘারাম, সেখানে ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল তিনশত। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের অস্তিত্বের সংবাদ ও মূর্তিনিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অতীত ইতিহাসের অর্ধলুপ্ত অবশেষ মাত্র! বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু, সুদীর্ঘ তিন-চার শত বৎসর ধরিয়া একাধিক বৌদ্ধ রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পূর্ব-ভারত—বিশেষভাবে বঙ্গ, গৌড়, মগধ—ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল হইয়া এই ধর্মের পরমায়ু আরও চার-পাঁচ শত বৎসর বাড়াইয়া দিল; এবং তাহারই ফলে মহাযান-যোগাচার বৌদ্ধধর্মের নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিল। এই নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান একান্তই পূর্বভারতের, বিশেষ-ভাবে বাংলাদেশের সৃষ্টি।

বৌদ্ধ ধর্মে যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও তেমনই সর্বভারতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বাংলাদেশ যাহা পাইয়াছিল সে মূলধন তো ছিলই; এই মূলধনের উপর বাংলাদেশ নূতন কিছু কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও করিয়াছে, বিশেষভাবে বৈষ্ণব ধর্মে এবং শাক্ত ধর্মে।

আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূলকথা বৈদিক ধর্ম ও শ্রৌত সংস্কার। এই ধর্ম ও

সংস্কারের প্রসার ও প্রতিপত্তির সূচনা গুপ্তপর্বেই দেখিয়াছি। পাল-চন্দ্রপর্বে প্রাচীন প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ তো ছিলই, বরং পালপর্বের শেষের দিকে এবং সেন-বর্মণ-পর্বে তাহা আরও প্রসারিত হইয়াছিল।

পালপর্বের অনেকগুলি ভূমিদানপট্টোলীতে দেখিতেছি, যেসব ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদ-বেদাঙ্গ-মীমাংসা-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মে পারদর্শী। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেবপালের মুঙ্গের-লিপি, নারায়ণপালের বাদলস্তম্ভলিপি, এবং মহীপালের বাণগড়লিপির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক হোম, যাগযজ্ঞের কথাও অনেক লিপিতেই আছে। মহীপালের বাণগড়লিপিতে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা, মীমাংসা, ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র চর্চার উল্লেখ আছে। বেদ, বেদান্ত, প্রমাণ এবং সামবেদের কৌঠুমশাখার চর্চার উল্লেখ আছে দেবপালের মুঙ্গেরলিপি, বিগ্রহপালের আমগাছিলিপি এবং মদনপালের মনহলিলিপিতে।

বৈদিক ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞের এই আবহাওয়া চন্দ্রপর্বেও সমান সক্রিয়। বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের কথা, বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞের কথা একাধিক চন্দ্রলিপিতে সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রে ঋত্বিক নামে যে রাজপুরুষটির দেখা মিলিতেছে তিনি তো একান্তই বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মের কান্ডারী বলিয়া মনে হইতেছে।

পাল-চন্দ্রপর্বের কয়েকটি লিপিতেই (খালিমপুরলিপি; দ্বিতীয় গোপালদেবের জাজিলপুরলিপি; প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপি; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপি; কম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দালিপি ইত্যাদি) দেখিতেছি, ভারতবর্ষের নানা জায়গা (যেমন লাটদেশ, মধ্যদেশ, ক্রোড়ঞ্জ, মুক্তাবাস্তু প্রভৃতি) বিশেষভাবে মধ্যদেশ হইতে বিভিন্ন গোত্র-প্রবরাশ্রয়ী, বিভিন্ন বৈদিক শাখাধ্যায়ী, বিভিন্ন শ্রৌতসংস্কারানু-সারী ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ইঁহাদের আশ্রয় করিয়া পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে বৈদিক ধর্মের স্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বে সেই স্রোত ক্রমশ আরও প্রবল হয়।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজপর্বের লিপিমালা আগাগোড়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, ভাবকল্পনা এবং উপমালঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহাদের রচিত ভাবাকাশ একান্তই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের আকাশ। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণপাঠ বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল এবং তাঁহাদের বোধ হয় বলা হইত নীতিপাঠক। এই পর্বে পৌরাণিক মহিমাই যেন বৈদিক ধর্ম ও শ্রৌত সংস্কারের মহিমাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

সমসাময়িক উচ্চকোটির বাঙালীর এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রনায়কদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত এবং শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতেন পৃথু, ধনঞ্জয়, অম্বরীশ, সগর, নল, যযাতি প্রভৃতি পৌরাণিক বীরেরা (ধর্মপালের বুদ্ধগয়ালিপি, দেবপালের মুঙ্গেরলিপি, কোটালিপাড়ালিপি); সত্যযুগের দৈত্যরাজ বলি, ত্রেতাযুগের ভার্গব এবং দ্বাপর-যুগের কর্ণের মতন দাতারা (দেবপালের মুঙ্গেরলিপি); দেবরাজ বৃহস্পতির মতন জ্ঞানীরা (বাদলস্তম্ভলিপি; বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপি)। অগস্ত্যের এক গণ্ডূষে সমুদ্রপান (বাদলস্তম্ভলিপি), পরশুরামের ক্ষত্রিয়াভিযান (বাদলস্তম্ভলিপি), রামেশ্বরে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন (দেবপালের মুঙ্গেরলিপি), প্রভৃতি এই পর্বের

সুপরিচিত ও সু-আদৃত পুরাণ- ও কাব্য -কাহিনী। এই পর্বের ইন্দ্র হইতেছেন দেবরাজ এবং তাঁহার পত্নী পৌলোমী পাতিব্রত্যের আদর্শ (খালিমপুরলিপি, নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ও বাদলস্তম্ভলিপি); ইন্দ্রের আর-এক নাম পুরন্দর এবং তিনি দৈত্যরাজ বলির নিকট পরাজিত (মুঙ্গের- ও ভাগলপুর -লিপি)। পৌরাণিক শিবকাহিনীও অজ্ঞাত নয়। পতির অপমানে দক্ষযজ্ঞে অপুত্রক সতীর অকালে প্রাণত্যাগ (বাদলস্তম্ভলিপি) ও শিবপত্নী উমা বা সর্বাণীর পাতিব্রত্যও সে কাহিনী হইতে বাদ পড়ে নাই। বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপিতে সপ্তাশ্বরথবাহিত সূর্য-দেবতাকে বলা হইয়াছে হরির দক্ষিণ চক্ষু। শশধরলাঞ্ছন চন্দ্রের উল্লেখও পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাকে কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে মিতাংশু, এবং কান্তি ও রোহিণী যে তাঁহার দুই পত্নী, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্মপালের খালিমপুরলিপি এবং বাদলস্তম্ভলিপিতে চন্দ্রকে বলা হইয়াছে অত্রির বংশধর।

পুরাণকথার ঐশ্বর্য সকলের চেয়ে বেশি আশ্রয় করিয়াছে বিষ্ণু-কৃষ্ণকথাকে। বিষ্ণু এখন আর ভাগবতধর্মের বাসুদেব নহেন, এখন তিনি কৃষ্ণ; এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারি প্রভৃতি তাঁহার নাম। এইসব নামের প্রত্যেকটির সংগেই কাব্য- ও পুরাণ -কাহিনী জড়িত। কৃষ্ণের অন্যান্য অবতার রূপের (যেমন, নরসিংহ, পরশুরাম, বামন) সঙ্গেও এই পর্বের পরিচয় ঘনিষ্ঠ।

উপরোক্ত পৌরাণিক দেবদেবীরা এবং তাঁহাদের কাহিনী যে শুধু লিপিমালায় উল্লিখিত তাহাই নয়: ইঁহাদের প্রতিমারূপ আশ্রয় করিয়া নানা ধর্মসম্প্রদায় এবং নানা ধর্মানুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই প্রতিমাগুলির স্বরূপ জানা প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক ধর্মের বিশিষ্ট ধ্যান ও কল্পনা ইহাদের সঙ্গে জড়িত।

ধর্মপালের খালিমপুরলিপিতে নন্ন-নারায়ণের এক দেউলের (দেবকুলের) উল্লেখ আছে। এই নন্ন-নারায়ণ বোধহয় নন্দ-নারায়ণেরই অপভ্রংশ। নারায়ণপালের রাজত্ব-কালে একটি গরুড়স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল বর্তমান দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামে: এই স্তম্ভগাত্রেই বাদলপ্রশস্তিটি উৎকীর্ণ। খালিমপুরলিপিতে একটি কাদম্বরী দেবকুলিকা বা সরস্বতীমন্দিরের উল্লেখ আছে। স্থানক অর্থাৎ সমপদ দণ্ডায়মান বিষ্ণুর দুইপার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর (শ্রী ও পুষ্টি) অধিষ্ঠান; সেই-ভাবে তাঁহাদের সম্মিলিত পূজা তো হইতই; এই ধরনের প্রতিমা বাংলার নানা অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু সরস্বতী স্বাধীন স্বতন্ত্র মর্যাদায়ও পূজিতা হইতেন, খালিমপুরলিপিই তাহার প্রমাণ। সরস্বতীর স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে: ইঁহাদের প্রতিমা-লক্ষণ সরস্বতীর সাধারণ লক্ষণ; সরস্বতীর বাহন অন্যত্র যেমন বাংলাদেশেও তাহাই, অর্থাৎ হংস; কিন্তু একটি প্রতিমায় তাঁহার বাহন দেখিতেছি ভেড়া। সরস্বতীর সঙ্গে ভেড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত প্রাচীন এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাও রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশের কোথাও কোথাও সরস্বতীপূজার দিনে এখনও ভেড়া বলি এবং ভেড়ার লড়াই সুপরিচিত। বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে একটি করিয়া গরুড়স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করা ছিল সাধারণ রীতি। স্তম্ভের শীর্ষে থাকিত বদ্ধাঞ্জলিমুদ্রা গরুড়ের একটি মূর্তি। এই ধরনের স্তম্ভশীর্ষ গরুড়প্রতিমা বাংলাদেশের নানা জায়গায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজপর্বের বাংলাদেশে যত প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে

বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি. এবং পরিবারটিও সুবৃহৎ। পরিবারের প্রধান হইতেছেন বিষ্ণু স্বয়ং; তাঁহার দুই পত্নী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; কোথাও কোথাও দেবী বসুমতী; নিম্নে বাহন গরুড়: বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠলোকের দুই দ্বারী, জয় এবং বিজয়; বিষ্ণু-কৃষ্ণের দ্বাদশ অবতার: এবং ব্রহ্মা স্বয়ং। এই বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকটি দেবদেবীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গ ও ভঙ্গী, লক্ষণ ও লাঞ্ছন ভারতের অন্যত্র যেমন বাংলাদেশেও মোটামুটি তাহাই; তবু বাংলাদেশ তাহাদের মধ্যেই কিছু বর্জন-নির্বাচন-সংযোজনও করিয়াছে।

আসন, শয়ান ও (সমপদ) স্থানক, এই তিন ভঙ্গীর বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষপাত যেন, অন্তত এই পর্বে, স্থানকমূর্তির উপরই বেশি। বস্তুত, এই পর্বের অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্তিই স্থানক অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্তি; গরুড়াসীন এবং যোগাসীন, সাধারণত এই দুই প্রকারের আসনমূর্তিই এ যাবৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। স্থানক-বিষ্ণুমূর্তিগুলি সাধারণত সপরিবার বিষ্ণু। বিষ্ণু মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান; তাঁহার দক্ষিণে ও বামে, উপরে ও নীচে পরিবারস্থ অন্যান্য দেবদেবী, বাহন, প্রহরী ইত্যাদি। বাংলার বিষ্ণুমূর্তি সাধারণত দুই প্রকরণের। ত্রিবিক্রম প্রকরণের মূর্তিই বেশি, বাসুদেব প্রকরণের প্রতিমাও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকরণপার্থক্য নির্ভর করে বিষ্ণুর চারিহস্তের শঙ্খচক্রগদাপদ্ম এই চারিটি লক্ষণের সন্নিবেশের উপর। এই চারি লক্ষণের বিভিন্ন রীতির সন্নিবেশ বাংলাদেশের প্রতিমাগুলিতেও দেখা যায়, কিন্তু বাঙালী শিল্পী ও পুরোহিতেরা সর্বত্রই প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রের এবং পঞ্চরাত্রীয় ব্যূহবাদের এই প্রকরণনির্দেশ মানিয়া চলিতেন, নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। কোন কোন মূর্তিতে দেখা যায়, শঙ্খ, চক্র ও গদা যথাক্রমে শঙ্খ-পুরুষ, চক্র-পুরুষ ও গদা-দেবীতে রূপায়িত। এ ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় প্রতিমানির্দেশ সক্রিয়।

বিষ্ণুর অন্যান্য বিচিত্র রূপের মধ্যে অভিচারিক স্থানক-বিষ্ণুর একটি নিদর্শন বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি কালো পাথরের, পাওয়া গিয়াছিল বর্ধমান জেলার চৈতনপুর গ্রামে। লক্ষণ ও লাঞ্ছন মিলাইলে দেখা যায়, প্রতিমাটি দক্ষিণ-ভারতীয় প্রতিমাশাস্ত্র বৈখানসাগম-কথিত অভিচারিক স্থানক বিষ্ণুর প্রতিকৃতি। রংপুর জেলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা চিত্রশালা) ধাতুনির্মিত স্থানক-বিষ্ণুর একটি প্রতিমায় বিষ্ণুর বামে যেখানে পুষ্টি বা সরস্বতীর স্থান সেখানে দেখিতেছি দেবী বসুমতীকে। কোন কোন বিষ্ণুপ্রতিমার পৃষ্ঠফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; রাজসাহী-চিত্রশালায় বিশহস্ত সমপদস্থানক একটি বিষ্ণু-মূর্তি আছে: মূর্তিটি বোধহয় রূপমণ্ডন-গ্রন্থোক্ত বিশ্বরূপ-বিষ্ণুর। রংপুরের টেপা-সংগ্রহে একটি চতুর্মুখ বিষ্ণুর প্রতিমা আছে: ইঁহার সম্মুখের মুখটি মানুষের মুখের অনুরূপ, দক্ষিণে বরাহের, বামে সিংহের এবং পশ্চাতে ভৈরবের। কলিকাতা চিত্রশালায় ব্রহ্মা-বিষ্ণুর একটি যুগ্ম-মূর্তি আছে; প্রতিমাটিতে উভয় দেবতারই লক্ষণ ও লাঞ্ছন বিদ্যমান। ব্রহ্মার স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে: এই ব্রহ্মা স্ফীতোদর, চতুর্মুখ, চতুর্হস্ত, ললিতাসনোপবিষ্ট; তাঁহার বাহন হংস।

সরস্বতীর কথা আগেই বলিয়াছি। লক্ষ্মীরও স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তি বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যে দেবীর গজলক্ষ্মী রূপেই প্রধান। কিন্তু বিশুদ্ধ লক্ষ্মীপ্রতিমা নাই,

এমন নয়। বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) একটি চতুর্হস্ত স্থানক-লক্ষ্মীপ্রতিমা একাদশ শতকের তক্ষণশিল্পের এবং এই ধরনের প্রতিমার চমৎকার নিদর্শন। বগুড়ার চতুর্হস্ত লক্ষ্মীর এক হস্তে বাংলাদেশে সুপরিচিত লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি লোকায়ত ধর্মের ক্ষীণ একটি প্রতিধ্বনি রূপে বিদ্যমান।

অবতাররূপী বিষ্ণুর প্রতিমা এই পর্বের বাংলাদেশে সুপ্রচুর। প্রস্তর ও ধাতব বিষ্ণুপট্টের পশ্চাদ্ভাগে অথবা প্রস্তরফলকে বিষ্ণুর দশাবতার প্রতিকৃতি প্রাচীন বাংলার নানা স্থান হইতেই পাওয়া গিয়াছে। এই পর্বের বাংলাদেশে বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নরসিংহ এবং বামন বা ত্রিবিক্রম এই তিনজনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পূজা লাভ করিতেন। মৎস্য ও পরশুরামাবতারের স্বতন্ত্র মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য তিনটির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ইঁহারা বোধ-হয় লাভ করিতে পারেন নাই। অষ্টমাবতার হলধর বা বলরামের কয়েকটি প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং তাহার দেবায়তন বাংলাদেশে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাহার প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সু-অভ্যস্ত। এই পর্বের কয়েকটি বিষ্ণুপ্রতিমায় তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য। বরিশাল জেলার লক্ষণকাটির সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুপ্রতিমার পশ্চাতের দুই হাতের উপর আসীনা শ্রী ও পুষ্টির প্রতিকৃতি এবং মুকুটে চতুর্হস্ত ধ্যানী বুদ্ধপ্রতিম প্রতিমাটি মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। উভয় লক্ষণেই মহাযানী বৌদ্ধপ্রতিমার রূপকল্পনা নিঃসন্দেহে সক্রিয়। কালন্দরপুরে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণু প্রতিমাতেও মহাযানী লক্ষণ উপস্থিত। সাগরদীঘির আসন-বিষ্ণু প্রতিমাটিতে শঙ্খ, চক্র ও গদা সনাল পদ্মের উপর স্থিত; এ ক্ষেত্রেও সমসাময়িক মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সক্রিয়, সন্দেহ নাই।

শৈবধর্মেরও লিপি এবং মূর্তিপ্রমাণ সুপ্রচুর, যদিও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে উহা তুলনীয় নয়। খালিমপুরলিপিতে এক চতুর্মুখ মহাদেবের প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সংবাদ আছে। নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপিতে রাজা কর্তৃক শিব ভট্টারক ও তাঁহার পূজক ও সেবক পাশুপতদের উদ্দেশ্যে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ দেখা যায়। রাম-পাল রামাবতীতেও শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি মন্দির এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই পর্বের বাংলায় শৈবধর্ম বোধহয় শিব-শ্রীকণ্ঠ ও তাঁহার শিষ্য লাকুলীশ (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক)-প্রবর্তিত পাশুপত ধর্ম, এবং এ তথ্য আজ সুবিদিত যে, উত্তর-ভারতে পাশুপত ধর্মই আদি শৈবধর্ম। আগমান্ত শৈবধর্ম গুপ্তপর্বেই পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং পাশুপত ধর্মের ধ্যানকল্পনার মধ্যেই এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গিয়াছিল। আঠারটি আগম এবং তাহাদের কিছু পরবর্তী কালে রচিত ছয়টি যামল ও ছয়টির অন্যতম ব্রহ্মযামলের পরিশিষ্টরূপী পিঙ্গলামত-গ্রন্থে এই ধর্মের ধ্যানকল্পনার বিস্তৃত পরিচয় নিবন্ধ। সন্দেহ নাই যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে আর্যাবর্তের পাশুপতধর্মী ব্রাহ্মণ গুরু ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ক্রমাগতই বাংলাদেশে আসিতেছিলেন এবং তাঁহারাই এই দেশে পাশুপতধর্ম প্রচার করিতেছিলেন।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজপর্বেও লিঙ্গরূপী শিবের পূজাই সমধিক প্রচলিত এবং এই লিঙ্গ সাধারণত একমুখলিঙ্গ। একমুখলিঙ্গ শিবপ্রতিমা বাংলার নানা স্থান হইতে

আবিষ্কৃত হইয়াছে। চতুর্মুখলিঙ্গও বিরল নয়। এই ধরনের লিঙ্গপ্রতিমার চারিদিকে চারিটি উপবিষ্ট শক্তিমূর্তি রূপায়িত। লক্ষণীয় যে, এই ধরনের প্রতিমা-গুলি সবই উত্তর-বঙ্গের নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিবের অন্যান্য রূপকল্পনার প্রতিকৃতি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে চন্দ্র-শেখর, নৃত্যপর, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, এবং কল্যাণ-সুন্দর বা শিব-বিবাহ এই কয়টি সৌম্যমূর্তি শিবপ্রতিমাই প্রধান। রুদ্র রূপকল্পনার প্রতিকৃতির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে অঘোররুদ্রের প্রতিমা। শিবের দ্বিহস্ত ও চতুর্হস্ত ঈশান মূর্তির উভয় রূপই বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিল। নটরাজ শিবের প্রতিমা বাংলা-দেশে সুপ্রচুর; কিন্তু বাংলার নটরাজের রূপকল্পনা যেন দাক্ষিণী রূপকল্পনাকে অনুসরণ করে নাই। দশ ও দ্বাদশ হস্ত এই ধরনের নটরাজ-শিবের প্রতিমা এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাহিরে আর কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় নাই, অথচ বাংলা-দেশে নৃত্যমূর্তি-শিবের দ্বিতীয় রূপকল্পনা আর কিছু দেখা যায় না। পূর্ব-দক্ষিণ বাংলায় নৃত্যপর-শিবের যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সবই দশহস্ত এবং তাহার লক্ষণ ও লাঞ্ছনসন্নিবেশ পুরাপুরি মৎস্যপুরাণের বর্ণনানুযায়ী; দক্ষিণভারতীয় চতুর্হস্ত নটরাজ শিবপ্রতিমায় শিবের পদতলে যে অপস্মার-পুরুষটিকে দেখা যায়, বাংলাদেশে তাহার চিহ্নও নাই। এই ধরনের দশহস্ত, মৎস্যপুরাণ-অনুসারী নটরাজ-শিবের মূর্তিগুলির একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে মূর্তিটিকে বলা হইয়াছে 'নটেশ্বর'। তাঁহাদের হস্তধৃত লক্ষণ ও লাঞ্ছন একটু পৃথক এবং সন্নিবেশও ভিন্ন প্রকারের; এই ধরনের মূর্তিগুলিতে এক হাতে বীণা, এবং দুই হাতে করতালে নৃত্যের তাল রাখা হইতেছে। শিব যে নৃত্য- ও সংগীত -রাজ ইহা দেখানোই যেন এই প্রতিমাগুলির উদ্দেশ্য।

শিবের সদাশিব-মূর্তিও বাংলাদেশে সুপ্রচুর। রুদ্র-যামল গ্রন্থের মতে শিবের ছয়রূপের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরাশিব) মধ্যে একরূপ সদাশিব। সদাশিবের রূপকল্পনা মহানির্বাণতন্ত্র, উত্তর-কামিকাগম এবং গরুড়পুরাণ-গ্রন্থে বিধৃত, এবং শেষের দুটি গ্রন্থ বাংলাদেশে অধিকতর প্রচলিত। বাংলাদেশে যে কটি সদাশিব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, প্রতিমালক্ষণের দিক হইতে তাহারা প্রায় পুরাপুরি এই দুটি গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী। দক্ষিণ-ভারতের সদাশিব-মূর্তির সঙ্গে বাংলার সদাশিব মূর্তির রূপকল্পনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। দক্ষিণাগত সেনবংশীয় রাজারাও ছিলেন সদাশিবের পরমভক্ত। এইসব কারণে কেহ কেহ মনে করেন, কর্ণাটাগত সেনবংশ এবং দক্ষিণাগত সৈন্যসামন্তরাই সদা-শিবের এই রূপকল্পনা বাংলাদেশে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, সদাশিব রূপকল্পনা একান্তই উত্তরভারতীয় আগমান্ত শৈবধর্মের সৃষ্টি। তবে, মনে হয় উত্তরভারতীয় সদাশিব দক্ষিণভারতে যেরূপ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন তাহাই পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্য রাজবংশ ও সৈন্যসামন্তেরা বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

পালপর্বে বাংলাদেশে উমা-মহেশ্বরের আলিঙ্গনমূর্তিরূপ বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রপরায়ণ শাক্ত বাঙালীর চিত্তে শিব-উমার আলিঙ্গন-মূর্তি আনন্দ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ রূপ বলিয়া মনে হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। শিবক্রোড়োপবিষ্টা, সুখাসীনা, আলিঙ্গনবদ্ধা, হাস্যানন্দময়ী উমাই তো শিব-

শাক্তর তান্ত্রিক সাধকদের ত্রিপুর-সুন্দরী এবং তাঁহার রূপধ্যানই ধ্যানযোগের শ্রেষ্ঠ ধ্যান।

উমা-মহেশ্বরমূর্তিতে উমা এবং মহেশ্বর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেও উভয়েই পৃথক পৃথক রূপকল্পিত, কিন্তু অর্ধনারীশ্বর কল্পনায় তাঁহারা দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন: দক্ষিণার্ধে শিব, বামার্ধে উমা। বাংলাদেশে অর্ধনারীশ্বরপ্রতিমা সুপ্রচুর নয়, বরং তাহার নিদর্শন কমই পাওয়া গিয়াছে।

শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণ-সুন্দর যুগলমূর্তিও বাংলাদেশে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে; দক্ষিণ ভারতের সুপরিচিত বৈবাহিক রূপের সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য স্বল্প। বাংলার প্রতিমাগুলিতে বিবাহব্যাপারে বাঙালীর রীতি ও আচারপদ্ধতির কয়েকটি সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান বিদ্যমান; সপ্তপদী গমন, বরের হাতে কর্ত্রি বহন প্রভৃতি দক্ষিণী প্রতিমাতে দেখা যায় না, কিন্তু বাংলার প্রতিমাগুলিতে এইসব স্থানীয় আচার ও রীতিগুলি রূপায়িত হইয়াছে।

রুদ্র-শিবের বটুক-ভৈরব এবং অঘোর-রুদ্র রূপের সঙ্গেও এই পর্বের বাঙালীর পরিচয় ছিল। শৈবাগম অনুসারে রুদ্র-শিবের পঞ্চরূপের (বামদেব, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও ঈশান পঞ্চব্রহ্ম) মধ্যে অঘোর রূপ অন্যতম, এবং এই রূপের একটি বিশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায় বোধ হয় পাল-সেনপর্বেই গড়িয়া উঠিয়াছিল; অন্তত কিছু পরবর্তী কালের বাংলায় অঘোর-পন্থী নামে একটি শৈবসম্প্রদায়ের পরিচয় সমসাময়িক সাহিত্যে নিবদ্ধ। বটুক-ভৈরবের কয়েকটি মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। নগ্ন সর্বাঙ্গ, কাষ্ঠপাদুকা, কুকুরসঙ্গী, অগ্নিপ্রভা, নরমুণ্ড ও নর-মুণ্ডমালা, বিকট হাস্যব্যাদিত মুখ প্রভৃতি দেখিলে ভুল করিবার কারণ নাই যে, এই ধরনের প্রতিমা আগমান্ত তান্ত্রিক শৈবধর্মের ধ্যান ও কল্পনার সৃষ্টি।

শিবপুত্র গণপতি এবং কার্তিকেয়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রতিমাও বাংলাদেশে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। তবে গণপতি বা গণেশের তুলনায় কার্তিকেয়ের প্রসার বোধ হয় তত বেশি ছিল না। এই পর্বে গণেশের সব প্রতিমাই মূষিক-বাহনোপরি নৃত্যপরায়ণ। তাঁহার একটি হাতে একটি ফল; এই ফল সিদ্ধির প্রতীক, এবং গণেশ বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের, বিশেষভাবে বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীতে, সিদ্ধ-ফলদাতা বলিয়াই পূজিত ও আদৃত। শৈব গাণপত্য সম্প্রদায়ের অন্তত একটি গণেশপ্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, রামপাল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ হইতে। মূর্তিটির লক্ষণ ও লাঞ্ছন একান্তই দক্ষিণভারতীয় প্রতিমাশাস্ত্র অনুযায়ী। কার্তিকেয়ের স্বতন্ত্র প্রতিমা যে দু-একটি এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ময়ূরবাহনের উপর মহারাজলীলায় উপবিষ্ট কার্তিকেয়ের মূর্তিটি দ্বাদশশতকীয় ভাস্করশিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

পার্বত্য ত্রিপুরার উনকোটি এবং রাজসাহী জেলার দেওপাড়া, পালপর্বের এই শৈব তীর্থ দুইটির কথা না বলিয়া পালপর্বের শিবায়ন শেষ করা যায় না। পূর্ব-ভারতে বোধহয় বারাণসীর কোটিতীর্থের পরই ছিল উনকোটির স্থান। বস্তুত, এখনও উনকোটী পাহাড়ের গায়ে ইতস্তত যত মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে তাহাতে উনকোটী নামের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। পাহাড়ের গায়ে একাধিক বৃহদাকৃতি শৈবপ্রতিমা ও প্রতিমার শির এখনও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া

যায়। শিব ও গণেশ ছাড়া পরিবার-দেবতাদের মধ্যে হর, গৌরী, হরিহর, নরসিংহ, হনুমান, একমুখ ও চতুর্মুখলিঙ্গ প্রভৃতিও আছেন।

দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের দুটি লিপিপ্রমাণ হইতে বাংলার বাহিরে বাঙালী শৈবগুরুদের সমসাময়িক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির কতকটা ধারণা করা যায়। ত্রিলোচন শিবাচার্যের সিদ্ধান্তসারবলী-গ্রন্থের একটি টীকায় আরও বলা হইয়াছে যে, রাজেন্দ্র-চোল গঙ্গাতীর হইতে শৈব আচার্যদের চোলদেশে লইয়া যাইতেন। পরকেশরীবর্মা রাজাধিরাজ-চোলের একটি লিপিতে জানা যায়, গৌড়দেশান্তর্গত দক্ষিণ রাঢ়ের শৈবাচার্য উমাপতিদেব বা জ্ঞান-শিবদেবের পূজাপুণ্যের বলেই সিংহলী এক অভিযাত্রী সৈন্যদলকে রাজাধিরাজ যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শৈব ধর্ম ও শৈব দেবতাদের সঙ্গেই শাক্ত ধর্ম ও শক্তিদেবীপ্রতিমার কথা বলিতে হয়। দেবীপুরাণে (খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতক) বলা হইয়াছে, রাঢ়-বরেন্দ্র-কামরূপ-কামাখ্যা-ভোট্টদেশে (তিব্বতে) বামাচারী শাক্তমতে দেবীর পূজা হইত। খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতকের পূর্বেই বাংলাদেশের নানা জায়গায় শক্তিপূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তোত্তর পর্বে এবং মধ্য-ভারতে রচিত জয়দ্রথ-যামল গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ঈশান-কালী, রক্ষা-কালী বীর্য-কালী, প্রজ্ঞা-কালী প্রভৃতি কালীর নানা রূপের সাধনা বর্ণিত আছে। আর্যাবর্তে শক্তিধর্ম যে গুপ্ত-গুপ্তোত্তর পর্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল আগম ও যামল গ্রন্থ-গুলিই তাহার প্রমাণ। খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ্য অন্যান্য ধর্মের স্রোতঃপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিধর্মের স্রোতও বাংলাদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এই দেশ পরবর্তী শক্তিধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব আগম ও যামল গ্রন্থের ধ্যান ও কল্পনাই, অন্তত আংশিকত, পরবর্তী কালে সুবিস্তৃত তন্ত্রসাহিত্যের ও তন্ত্রধর্মের মূলে; এবং এই তন্ত্রসাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল বাংলাদেশে। তন্ত্রধর্মের পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত বিকাশও এই দেশেই। দ্বাদশ শতকের আগেকার রচিত কোন তন্ত্র-গ্রন্থ আজও আমরা জানি না, কিন্তু পালপর্বের শাক্ত-দেবীদের রূপকল্পনায়, এক কথায় শক্তিধর্মের ধ্যানধারণায় তান্ত্রিক ব্যঞ্জনা নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। জয়পালের গয়ালিপিতে মহানীল-সরস্বতী নামে যে দেবীটির উল্লেখ আছে তাঁহাকে তো তান্ত্রিক দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে। তবু, স্বীকার করিতেই হয় যে, পালপর্বের অসংখ্য দেবীমূর্তিতে শাক্তধর্মের যে রূপকল্পনার পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহা আগম ও যামল-গ্রন্থ-বিধৃত ও ব্যাখ্যাত শৈবধর্ম হইতেই উদ্ভূত, এবং শক্তিধর্মের প্রাক্-তান্ত্রিক রূপ।

বাংলাদেশে যত দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে চতুর্ভুজা ও দণ্ডায়মানা মূর্তির সংখ্যাই বেশি। কোন কোন প্রতিমায় তিনি একক, কোথাও কোথাও তিনি সপরিবারে ও সমণ্ডলে বিদ্যমানা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উপস্থিত; অন্যত্র গণেশ, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। বিভিন্ন প্রতিমায় দেবীর চারি-হস্তের লক্ষণ বিভিন্ন; পার্শ্ব-দেবতারাও বিভিন্ন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অধিকাংশ প্রতিমার পাদপীঠে উৎকীর্ণ একটি গোধিকার মূর্তি এবং কোন কোন প্রতিমায় দুই পাশে দুইটি কদলীবৃক্ষ। এই দুইটি লক্ষণই লোকায়ত ধর্মের প্রতিধ্বনি হিসাবে বিদ্যমান। গোধিকাটি তো অনিবার্যভাবে মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের চণ্ডী ও কালকেতুর উপাখ্যান এবং কদলীবৃক্ষ দুইটি হয়তো পরবর্তী-

কালের দুর্গাপ্রতিমার কলা-বউর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ধরনের চতুর্ভুজা ও পাদপীঠোপরি দণ্ডায়মানা দেবীমূর্তিগুলিকে কেহ বলিয়াছেন চণ্ডী, কেহ বলিয়াছেন গৌরী-পার্বতী। নাম যাহাই হউক, এইজাতীয় দেবীপ্রতিমা বাংলাদেশের নানা জায়গা হইতে সুপ্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে তাহাদের মর্যাদাও কম নয়।

দেবীর উপবিষ্ট মূর্তি অপেক্ষাকৃত বিরল। আসীনা দেবীর যে ক'টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চার হাত, কাহারও ছয়, কাহারও বিশ; কাহারও পরিচয় সর্বমঙ্গলা, কাহারও অপরাজিতা, কাহারও পার্বতী বা ভুবনেশ্বরী, কাহারও বা মহালক্ষ্মী। হাতের সংখ্যা, হস্তধৃত লক্ষণ ও মুদ্রা, আসনভঙ্গী, বাহন, পরিবার-দেবতা প্রভৃতির উপরই এইসব পরিচয়ের নির্ভর।

রুদ্র বা উগ্রতন্ত্রের দেবীমূর্তির মধ্যে সুপরিচিতা মহিষমর্দিনী-দুর্গাই প্রধান এবং তাঁহার প্রতিমা ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো বাংলাদেশেও সুপ্রতুল। বাংলার প্রাচীনতম মহিষমর্দিনী প্রতিমাগুলি অষ্টভুজা বা দশভুজা। ভবিষ্যপুরাণ-কথিত মহিষমর্দিনীর নবদুর্গা-রূপও বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল না। এই ধরনের নবদুর্গা প্রতিমার মধ্যস্থলে বৃহদাকৃতি মহিষমর্দিনী এবং বাকী চারিদিক ঘিরিয়া আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি অনুরূপ মূর্তি। ভবিষ্যপুরাণে মধ্য মূর্তিটির নামকরণ উগ্রচণ্ডী, অন্যগুলির কাহারও নাম চণ্ডা, কাহারও চণ্ডনায়িকা, কাহারও চণ্ডবতী বা চণ্ডরূপা ইত্যাদি। বরিশাল জেলার শিকারপুর গ্রামের মন্দিরে একটি দেবীমূর্তি শবোপরি দণ্ডায়মান এবং তাঁহার চারহাতে খেটক, খড়্গ, নীলপদ্ম এবং নরমুণ্ডের কঙ্কাল; মাথার উপর ক্ষুদ্রাকৃতি কার্তিকেয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও গণপতি। প্রতিমাশাস্ত্রমতে মূর্তিটি খুব সম্ভব উগ্রতারার। এই উগ্রতারার মূর্তিটিকে এবং মহিষমর্দিনীর একাধিক প্রতিমায় মধ্যমূর্তির উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি পঞ্চমূর্তির সন্নিবেশ নিঃসংশয়ে মহাযানী প্রতিমার পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের সন্নিবেশ স্মরণ করাইয়া দেয়। নবদুর্গাপ্রতিমার কেন্দ্রমূর্তির চারপাশে যে বাকী আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি পুনরুক্তি তাহাও অরপচন-মঞ্জুশ্রীর প্রতিমাবিন্যাসের কথা স্মরণ না করাইয়া পারে না। এইসব মূর্তিকল্পনায় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাব অনস্বীকার্য।

এই পর্বের বাংলাদেশে অন্তত দুই-তিনটি চতুর্ভুজা ও ষড়্‌ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বাগীশ্বরী ছাড়া আরও কয়েকটি মাতৃকামূর্তির সঙ্গে এই পর্বের বাংলার পরিচয় ছিল। মাতৃকামূর্তি সাতটি : ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বরাহী ও চামুণ্ডী, এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন ব্রাহ্মণ্য দেবতার শক্তিরূপে কল্পিতা। ইঁহাদের মধ্যে চামুণ্ডা বা চামুণ্ডীই ছিলেন বাঙালীর প্রিয়; এবং তাঁহার সিদ্ধ-যোগেশ্বরী, দন্তুরা, রূপবিদ্যা, ক্ষমা, রুদ্রচর্চিকা রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যানকল্পনার প্রতিকৃতি বাংলার নানা জায়গা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

মন্দিরদ্বারের দুইপাশে গঙ্গা ও যমুনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা তো গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের স্থাপত্যরীতির অন্যতম লক্ষণ। যমুনার স্বতন্ত্র মূর্তি বাংলা-দেশে বড় একটা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু মকরবাহিনী গঙ্গার একাধিক মূর্তি বিদ্যমান।

সাম্প্রতিক বাংলায়, এমনকি মধ্যযুগীয় বাংলায়ও, সূর্যপ্রতিমার স্বাধীন-স্বতন্ত্র

পূজার প্রমাণ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ গুপ্তপর্ব হইতেই উদীচ্যবেশী ইরানী ধ্যানকল্পনার সূর্যপূজা বাংলাদেশে সুপ্রচারিত হইয়াছিল এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত তাহার প্রচার ও প্রসার বাড়িয়াই গিয়াছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য সূর্যপ্রতিমাই তাহার প্রমাণ। সেনপর্বে তো এই ধর্ম রাজবংশের পোষকতাই লাভ করিয়াছিল; বিশ্বরূপ ও কেশবসেন ছিলেন পরমসৌর। সূর্য-প্রতিমা পূজার এত প্রসারের কারণ বোধহয়, সূর্যদেব সকল প্রকার রোগের আরোগ্য-কর্তা বলিয়া গণ্য হইতেন। পাল- ও সেন -পর্বের সূর্যপ্রতিমায় উদীচ্য-ইরানী ধ্যানকল্পনা অবিচল, কিন্তু সূর্যদেবতার ধ্যানে ও ব্যাখ্যায় বোধহয় বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যানকল্পনা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। পালপর্বের সকল সূর্যপ্রতিমা সপরিবারে বিদ্যমান, এবং সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্ছন সুপরিস্ফুট। আসীন সূর্যমূর্তি দুর্লভ; বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত সূর্যমূর্তিই স্থানক বা দণ্ডায়মান মূর্তি। বাংলার সমস্ত সূর্যমূর্তিই উদীচ্য-পদাবরণ-পরিহিত; কিন্তু মালদহ-চিত্রশালায় দুইটি প্রস্তরফলকে যে সূর্যমূর্তি উৎকীর্ণ তাঁহাদের কোন পদাবরণ নাই। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণী প্রতিমাশাস্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য।

পুরাণকাহিনী অনুসারে অশ্বারূঢ় এবং পরিজনসহ মৃগয়াবিহারী রেবন্ত-দেবতার সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই রেবন্ত-দেবতার কয়েকটি মূর্তি বাংলার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) রেবন্ত মূর্তিটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই ফলকটির সমগ্র রূপ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, রেবন্ত আদিতে পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন, এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাঁহার সম্বন্ধ। কিন্তু পর-বর্তী কালে কোন সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অশ্বারূঢ় বলিয়া সূর্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধ হন।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত অসংখ্য নবগ্রহ প্রতিমাগুলিও সৌরধর্মের সঙ্গেই যুক্ত। বাংলার শিল্পে নয়টি গ্রহের প্রতিকৃতি সর্বদাই একত্র পাশাপাশি রূপায়িত হইয়াছে, হয় কোন মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের উপরে, না হয় কোন প্রতিমাফলকের ঊর্ধ্বভাগে। নবগ্রহের কোন একটি গ্রহের পৃথক স্বতন্ত্র মূর্তি সুদুর্লভ। এ পর্যন্ত যে দুইটি মূর্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রের দুইটি ফলকে; একটি চন্দ্রের ও অপরটি বৃহস্পতির।

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের দেবদেবী ছাড়া আরও নানাপ্রকারের এমন দেবদেবী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যানকল্পনার সৃষ্টি নহেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহারা লোকায়ত ধর্মেরই সৃষ্টি, কিন্তু পরবর্তী কালে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। গঙ্গা-যমুনার রূপকল্পনার মূলেও লোকায়ত ধর্মের প্রভাব সক্রিয়। বৌদ্ধ হারীতী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠী সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য।

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিক্‌পাল দেবতাদের স্বাধীন মূর্তিও বাংলাদেশে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। আদিতে ইঁহারা অনেকেই ছিলেন মর্যাদা-সম্পন্ন বৈদিক দেবতা, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা কমিতে আরম্ভ করে এবং স্বতন্ত্র পূজা প্রায় উঠিয়াই যায়। পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ এবং কুবেরের একাধিক প্রতিমা-

প্রমাণ বিদ্যমান। বৃষবাহন যম, নরবাহন সিদ্ধেশ্বর, এবং মকরবাহন, ললিতাসনোপবিষ্ট বরুণের তিনটি সুন্দর প্রতিমা রাজসাহী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বাংলার নানা জায়গা হইতেই এই ধরনের দিক্‌পালপ্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ছয়

পাল-চন্দ্রপর্বের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অর্থবহ তথ্য এই যে, এই পর্বের প্রত্যেকটি রাজবংশ মহাযানী বৌদ্ধ। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতি বাংলার অনুরাগ কিছুদিন আগে হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সপ্তম শতকের খড়্গবংশীয় রাজারা ছিলেন ভগবান সুগত এবং তাঁহার শান্ত, ভববিভবভেদকারী যোগিগণের বিবিধ গুণসম্পন্ন সঙ্ঘের পরম ভক্তিমান উপাসক। মহাযানী বৌদ্ধ অর্হৎদের বাহন বৃষ ছিল এই বংশের রাজাদের লাঞ্ছন। পালরাজারা সকলেই ছিলেন পরম সৌগত। অধিকাংশ পাললিপির প্রারম্ভেই যে বন্দনাশ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এইরূপ : "যিনি কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমা রূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞানতরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞানপঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক অরির পরাক্রমসঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের জয় হোক।" দশম শতকের পূর্বার্ধে পূর্ববঙ্গে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামে এক নরপতির রাজত্বের খবর পাওয়া যায়; তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ। এই শতকেরই শেষার্ধে পূর্ববঙ্গেই আর-একটি বৌদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই চন্দ্রবংশীয় নৃপতিরাও সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ পরমসৌগত। পালরাজাদের মতো ইঁহাদেরও শাসনাবলীতে যুগল মৃগমূর্তি এবং ধর্মচক্রলাঞ্ছন উৎকীর্ণ। এই শতকেরই কাম্বোজান্বয় গৌড়পতিরাও ছিলেন পরমসৌগত এবং ইঁহাদেরও রাজকীয় পট্টে মৃগমূর্তিলাঞ্ছিত ধর্মচক্র। বস্তুত, অষ্টম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার এবং তাহার প্রভাব শুধু বাংলা-বিহারেই সীমাবদ্ধ নয়; সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা এইসব রাজবংশের সক্রিয় পোষকতার ফলেই।

এই পর্বের বাংলাদেশে মহাযানধর্ম ধ্যান-ধারণায় ও আচারানুষ্ঠানে কী রূপ প্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাহার দৃষ্টি ও মনোভাব কিরূপ ছিল সে পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় সমসাময়িক বৌদ্ধ রাজাদের সামাজিক ও ধর্মকর্মগত ব্যবহারে, অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে, বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান প্রভৃতি মতবাদে, সিদ্ধাচার্যদের গানে ও দোহায়, বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থাদিতে।

পালবংশীয় নরপতিরা অনেকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্যরাজবংশীয়া রাজকুমারীদের। ইঁহাদের অনেকে নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্য ধর্মচক্রমুদ্রা দ্বারা পট্টীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দেবখড়্গের মহিষী রাণী প্রভাবতী একটি সর্বাণীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পারস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিত এইসব দৃষ্টান্তের মধ্যে পাওয়া যাইবে। পালরাজারা তো সকলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক

ছিলেন; রাজা কর্তৃক ভূমিদান সব তো ইঁহাদের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রাম-চরিতে মদনপালকে বলা হইয়াছে "চণ্ডীচরণ-সরোজ-প্রসাদ-সম্পন্ন বিগ্রহশ্রী।" ধর্ম-পালের ভ্রাতা বাক্‌পালের মৃত্যুর পর পুত্র জয়পাল যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা তো ব্রাহ্মণ্যধর্মানুমোদিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলিয়াই মনে হইতেছে। মাতুল মথনের মৃত্যু-সংবাদে রামপাল ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনৈশ্বর্য দান করিয়া গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করিয়া-ছিলেন। এইসব ক্রিয়াকর্মের পশ্চাতে যে ধ্যানকল্পনার আকাশ বিস্তৃত তাহা তো ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই আকাশ। ধর্মপাল এবং পরবর্তী আর-একজন পালরাজ শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত বর্ণসমূহকে নিজ নিজ ধর্ম- ও বর্ণ -সীমায় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্কারেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কাম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহার এক পুত্র নারায়ণপাল ছিলেন বাসুদেবভক্ত, এবং আর-এক পুত্র নয়পাল ছিলেন শৈব।

অথচ, পাল- চন্দ্র ও কাম্বোজ -বংশীয় নরপতিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একাগ্রচিত্তে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের সেবায় ও প্রভাববিস্তারে যে পরম প্রচেষ্টা করিয়া-ছিলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ধর্মপালের সময়ে তাঁহারই চেষ্টায় প্রাচীন নালন্দা-মহাবিহারের নূতনতর সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। সোমপুর-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা তাঁহারই সক্রিয় আনুকূল্যে এবং এই মহাবিহারের নামই ছিল শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহার। ধর্মপালেরই আনুকূল্যে ত্রৈকূটক-বিহারের নিভৃত কক্ষে বসিয়া আচার্য হরিভদ্র তাঁহার অভিসময়ালংকারের সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে শৈলেন্দ্রবংশসম্ভূত বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে পালসম্রাট দেবপাল ঐ বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। বোধহয়, দেবপালের রাজত্বকালেই (৮৫১ খ্রীঃ শঃ) গোমিন্ অবিঘ্নাকর নামে গৌড়ের একজন বৌদ্ধ শিলাহাররাজ কপর্দিনের রাজত্বে কঙ্কনদেশে গিয়া সেখানে কৃষ্ণগিরি-মহাবিহারের ভিক্ষুদের জন্য একটি বিরাট উপাসনাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মহীপাল ও জয়পালের কালে বিক্রমশীল ও সোমপুর-মহাবিহার ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে জ্ঞানমর্যাদায় বৌদ্ধ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধ শ্রমণ ও অন্যান্য জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা এই সময়ই এই দুই মহাবিহারে বসিয়া বহু গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতীশ-দীপঙ্কর, রত্নাকর শান্তি প্রভৃতি আচার্যদের আবির্ভাবও এই সময়েই। ১০২৬ খ্রীষ্ট শতকে পৌ-সি বা কো-লিন-নৈ নামে জনৈক বাঙালী শ্রমণ অনেক সংস্কৃত পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন চীনদেশে। বরেন্দ্রীর জগদ্দল মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন রামপাল নিজেই।

এই বিহারগুলির বিস্তৃত সংবাদ তিব্বতী সাহিত্যে এবং কিছু কিছু তথ্য সমসাময়িক লিপিতে বিধৃত। তিব্বতী ঐতিহ্যে বিক্রমশীল-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল। মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরবর্তী এবং সীমাপ্রাচীরবদ্ধ এই বিহারে ১০৮টি মন্দির ছিল, ছয়টি ছিল বিদ্যায়তন এবং ১১৪ জন ছিলেন জ্ঞান ও বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রের আচার্য। তিব্বত হইতে অগণিত বৌদ্ধ জ্ঞানপিপাসুরা আসিতেন এই মহাবিহারে। এখানে যত সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচিত হইয়াছিল তাহার তালিকা সুদীর্ঘ। ধর্মপালের অন্য একটি নামই ছিল শ্রীবিক্রম-

শীলদেব এবং এই নাম হইতে বিহারটির নামকরণ হইয়াছিল শ্রীমদ্‌বিক্রমশীলদেব-মহাবিহার। তিব্বতী ঐতিহ্যে ওদন্তপুরী-বিহারও ধর্মপালেরই সৃষ্টি, যদিও তারনাথ বলেন, এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবপাল। এই বিহার ছিল নালন্দার সন্নিকটেই।

সোমপুর (পাহাড়পুর)-মহাবিহারের কথা তো আগেই বলিয়াছি। মহা-পণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র (অন্য দুই নাম : ভিক্ষু আরণ্যক এবং কালম্বলপাদ এই বিহারেই বাস করিতেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হইয়াছিল' আচার্য অতীশ-দীপঙ্করও কিছুকাল এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন এবং ভাব-বিবেকের মধ্যমকরত্নপ্রদীপ নামে একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সোমপুর মহাবিহারের পরিণতির কিছু উল্লেখ একটি লিপিতে আছে। একাদশ শতকের শেষপাদ বা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ, নালন্দায় প্রাপ্ত, বৌদ্ধযতি বিপুলশ্রীমিত্রের একটি প্রশস্তিলিপি হইতে জানা যায়, তাহার আচার্য করুণাশ্রীমিত্র সোমপুর-বিহারে বাস করিতেন, কিন্তু বঙ্গাল সৈন্যরা আসিয়া সোমপুর অগ্নিদগ্ধ করে এবং সেই আগুনে করুণাশ্রীমিত্র জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করেন। জগতের অষ্টমহাভয় নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে বিপুলশ্রীমিত্র সোমপুরে এক তারা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অগ্নিদাহে বিনষ্ট মহাবিহারের সংস্কার সাধন করাইয়া দিয়াছিলেন।

তারনাথের মতে ধর্মপাল পঞ্চাশটি ধর্মবিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই পর্বের বাংলাদেশে আরও অনেকগুলি বৌদ্ধবিহারের সংবাদ জানা যায়। ত্রৈকুটক-বিহার, দেবীকোট-বিহার, পণ্ডিত-বিহার, সন্নগর-বিহার, ফুল্লহরি-বিহার, পট্টিকেরক-বিহার, বিক্রমপুরী-বিহার ও জগদ্দল-মহাবিহার প্রভৃতির সম্বন্ধে সংবাদ তিব্বতী প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ত্রৈকুটক-বিহার বোধ হয় ছিল পশ্চিমবঙ্গে। দেবীকোট-বিহার নিশ্চয়ই ছিল উত্তরবঙ্গে, দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ের অদূরবর্তী। আচার্য অন্বয়বজ্র, উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখলা প্রভৃতি এই বিহারেই বাস করিতেন। পণ্ডিত-বিহার ছিল চট্টগ্রামে। ফুল্লহরি-বিহার ছিল বোধ হয় বিহারে; পট্টিকেরক ও সন্নগর মহাবিহার দুইই ছিল পূর্ববঙ্গে এবং বোধ হয় উভয়ই ত্রিপুরা জেলায়। ময়নামতী পাহাড়ের উপর পট্টিকেরক-বিহারের ধ্বংসা-বশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের (১২২০ খ্রীষ্ট শতক) লিপিতে দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত যে বিহারের উল্লেখ আছে তাহারও অবস্থান ছিল পট্টিকেরক নগরীতে। বনরত্ন নামে জনৈক বৌদ্ধ আচার্য বাস করিতেন সন্নগর-বিহারে এবং সেইখানে বসিয়া তিনি অনেক তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরী-বিহার তো বিক্রমপুরেই ছিল; এই বিহারে বসিয়া অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র একটি তান্ত্রিক টীকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জগদ্দল-মহাবিহার ছিল উত্তর-বঙ্গের বরেন্দ্রীতে এবং বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন অবলোকিতেশ্বর, অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন মহত্তারা। এই বিহারে বসিয়াই বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভাকর গুপ্ত, মোক্ষাকরগুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি আচার্যরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এইসব প্রসিদ্ধ মহাবিহার ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট বিহার বাংলা ও বিহারের ইতস্তত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিব্বতী গ্রন্থাদি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে

এইজাতীয় দু-চারিটি বিহারের নামও জানা যায়। পাহাড়পুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে দীপগঞ্জে হলুদ-বিহার নামে একটি স্তূপ এখনও বর্তমান। পট্টিকেরক নগরীতে আর একটি বিহারের নাম ছিল কনকস্তূপ-বিহার; এই বিহারে আচার্য বিনয়শ্রীমিত্র এবং আরও কয়েকজন কাশ্মীরী ভিক্ষু বাস করিতেন। ইঁহাদেরই অনুরোধে সিদ্ধাচার্য নাড়পাদ বজ্রপাদ-সার-সংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নাড়পাদের গুরু ছিলেন প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ; তিনি বাস করিতেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের পণ্ডিত-বিহারে। এই বিহার ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক জ্ঞান ও সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বগুড়ার নিকটে শীলবর্ষে একটি বিহারের এবং নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটে সুবর্ণ-বিহারের ধ্বংসাবশেষও হয়তো এই পর্বেরই বৌদ্ধসাধনার কেন্দ্র। বালাণ্ডা নামক স্থানে অনুলিখিত একটি অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে এখনও রক্ষিত; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বালাণ্ডায় একটি বৌদ্ধবিহার ছিল।

এইসব মহাবিহারে বসিয়া অগণিত খ্যাত ও বিস্মৃতিনামা আচার্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে অক্লান্ত জ্ঞানসাধনা করিয়াছিলেন, তাহার কিছু আভাস পরবর্তী এক অধ্যায়ে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ধর্মের যে সাধনা ছিল এই জ্ঞানসাধনার আশ্রয়, তাহার স্বরূপের পরিচয় পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ লিপিমালায় ধরিতে পারা যায় না; তাহা বিধৃত হইয়া আছে সদ্যোক্ত গ্রন্থরাজির মধ্যে এবং এই পর্বের অসংখ্য নয়নাভিরাম প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীমূর্তির অবহেলিত আয়তনে। এইসব গ্রন্থের সংস্কৃত মূল কমই পাওয়া গিয়াছে; অধিকাংশই তিব্বতী অনুবাদ। তিব্বতী পণ্ডিতেরা ও ভারতীয় গুরুরা যেসব গ্রন্থের অনুলিপি ও অনুবাদ তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারই কিছু কিছু অংশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইসব গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান আজও খুব সুস্পষ্ট নয়। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের যে বৈপ্লবিক বিবর্তন এবং বিভিন্ন ধারায় তাহার যে বিস্তার এই গ্রন্থরাজির মধ্যে অনুসরণ করা যায় তাহা লইয়া আলোচনা-গবেষণা কিছু কিছু হইয়াছে এবং বাঙালী পণ্ডিতেরাই তাহা করিয়াছেন। এই আলোচনা-গবেষণার সার-সংগ্রহ ছাড়া এখানে আর কিছু করা সম্ভব নয়।

সম্মতীয়বাদ, সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিকবাদ প্রভৃতি লইয়া যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার সপ্তম শতকীয় বাংলায় য়ুয়ান-চোয়াঙ্, ই-ৎসিঙ্ প্রভৃতি চীনা শ্রমণেরা দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারি শত বৎসরের বাংলার বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ ও শিথিল। অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মে নূতনতর তান্ত্রিক ধ্যানকল্পনার স্পর্শ লাগিয়াছিল এবং তাহার ফলে দশম শতক হইতেই বৌদ্ধধর্মে গুহ্য সাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও পূজাচারের প্রসার দেখা দিয়াছিল। এই গুহ্য সাধনার ধ্যানকল্পনা কোথা হইতে কী করিয়া মহাযানদেহে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ঘটাইল এবং বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করিল, বলা কঠিন; বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আচার্য অসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পর্বতকান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌমসমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিচাশ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবী প্রভৃতিকে অসঙ্গ মহাযানদেবায়তনে স্থান দান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এইসব গুহ্য, রহস্যময়, গূঢ়ার্থক মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী, বীজ, মণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই আদিম কৌমসমাজের জাদু-

শক্তিতে বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত। সহজ সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়েরই ভাবকল্পনায় ও ধর্মগত আচারানুষ্ঠানে ইহাদের প্রবেশলাভ কিছু অস্বাভাবিক নয়। উভয়কেই নিজ নিজ প্রভাবের সীমা বিস্তৃত করিবার চেষ্টায় আদিম কৌমসমাজের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; তাহা ছাড়া উভয় ধর্মসম্প্রদায়েরই নিম্নতর স্তরগুলিতে যে সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠী ক্রমশ আসিয়া ভিড় করিতেছিলেন তাঁহারা তো ক্রমচুম্বায়মান আদিবাসী সমাজেরই জনসাধারণ। তাঁহারা তো নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যানধারণা, দেবদেবী লইয়াই বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আসিয়া আশ্রয় লইতেছিলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও চেষ্টা ছিল নিজ নিজ ধ্যানধারণা ও ভাবকল্পনা অনুযায়ী, নিজ নিজ শক্তি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সদ্যোক্ত আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যানধারণা, দেবদেবী ইত্যাদির রূপ ও মর্ম কিছু রাখিয়া কিছু ছাড়িয়া, শোধিত ও রূপান্তরিত করিয়া লওয়া। অসঙ্গের সময় হইতেই হয়তো বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়াছিল। সন্দেহ নাই যে, পূর্বভারতের বৌদ্ধধর্মে এই ধরনের রূপান্তরের একটা গতি অষ্টম-নবম শতকেই ধরা পড়িয়াছিল এবং ইহার মূলে ঐতিহাসিক একটা কার্যকারণসম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল।

খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই হিমালয়ক্রোড়স্থিত পার্বত্য দেশগুলির সঙ্গে গাঙ্গেয় প্রদেশের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদান-প্রদান বাড়িয়া যায়। সপ্তম শতকের পূর্ববাংলার খড়্গরাজবংশ বোধহয় এই স্রোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। পরবর্তী কালে আমরা যাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক ধর্ম তাহার একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

যাহাই হউক, এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার ও মধ্যমিকবাদ প্রভৃতি প্রাচীনতর মহাযানী ধ্যান ও চিন্তা একেবারে বিদায় না লইলেও স্বল্পসংখ্যক পণ্ডিতদের চর্চার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; সর্বাস্তিবাদ বা মহাসাংঘিক-বাদের বিনয়-শাসনের স্থান ও সুযোগ দীক্ষা-গ্রহণের সময় ছাড়া আর কোথাও ছিল না। বৌদ্ধ জনসাধারণ শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, যোগচর্চার বা মাধ্যমিক-বাদের গভীর পরমার্থিক তত্ত্ব ও সাধনমার্গের বিচিত্র স্তরের কিছুই বুঝিত না, তাহাদের কাছে জাদুশক্তিমূলে মন্ত্র ও মণ্ডল, ধারণী ও বীজ অনেক বেশি সস্তা ও সহজ বলিয়া ধরা দিল এবং সেই ক্রমবর্ধমান ধর্মসমাজের জন্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মহাযানের নূতন ধ্যানকল্পনা গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। মন্ত্রই হইল তাঁহাদের মূল প্রেরণা এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ধারণী ও বীজ। এই মন্ত্রযানই মহাযানের বিবর্তনের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় স্তরে বজ্রযান। বজ্রযানের ধ্যানকল্পনা গভীর ও জটিল। বজ্রযানীদের মতে নির্বাণের পর তিন অবস্থা : শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতত্ত্বের সৃষ্টি-কর্তা নাগার্জুন; তাঁহার মতে দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, সংসার সমস্তই শূন্য, শূন্যতার এই পরম জ্ঞানই নির্বাণ। বজ্রযানীরা এই নির্বিকল্প-জ্ঞানের নামকরণ করিলেন নিরাত্মা; বলিলেন, জীবের আত্মা নির্বাণ লাভ করিলে এই নিরাত্মাতেই বিলীন হয়। নিরাত্মা কল্পিতা হইলেন দেবীরূপে, এবং বল্পা হইল, বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া নিরাত্মাতেই বিলীন হন তখনই উৎপত্তি হয় মহাসুখের। বোধি-

চিত্তের অর্থ হইতেছে চিত্তের এক বিশেষ অবস্থা যাহাতে সম্যক জ্ঞান লাভের সংকল্প বর্তমান। বজ্রযানীরা বলেন, মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরম আনন্দময় ভাব, যে একর্কেন্দ্রিক ধ্যান তাহাই বোধিচিত্ত। এই বোধিচিত্তই বজ্র; কারণ কঠোর যোগ-সাধনার ফলে ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পূর্ণ দমিত হইয়া বজ্রের মতো দৃঢ় ও কঠিন হয়। বোধিচিত্তের বজ্রভাব লাভ ঘটিলে তবে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বজ্রভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধনার যে পথ তাহাই বজ্রযান। বলা বাহুল্য, বজ্রযানের এই সমস্ত সাধনপদ্ধতিটাই অত্যন্ত গুহ্য, এবং যে ভাষায় ও শব্দে এই পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয় তাহাও গুহ্য। গুরুদীক্ষিত সাধক ছাড়া সে শব্দ ও ভাষার গূঢ়ার্থ আর কেহ বুঝিতে পারে না, বজ্রযানে গুরু তাই অপরিহার্য। বজ্রযানে প্রজ্ঞার সার যে বোধিচিত্ত, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভাষায় তাহাই শক্তি।

বজ্রযান গুহ্যসাধনারই সূক্ষ্মতর স্তর সহজযান নামে খ্যাত। বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তিরূপের ছড়াছড়ি, সুতরাং তাহার দেবায়তনও সুপ্রশস্ত; মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে বজ্রযানের সাধনমার্গ আকীর্ণ। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নাই, তেমনই নাই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি। বাহ্যানুষ্ঠানের কোন মূল্যই তাঁহাদের কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নিন্দা তো তাঁহারা করিতেনই; যেসব বৌদ্ধ মন্ত্রজপ, পূজোর্চনা, কৃচ্ছ্রসাধন, প্রব্রজ্যা ইত্যাদি করিতেন তাঁহাদেরও নিন্দা করিতেন। বলিতেন, সিদ্ধিলাভ, বৌদ্ধত্বলাভ তাঁহাদের ঘটে না। সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ দোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। একটি দোহায় বলা হইয়াছেঃ কী (হইবে) তোর দীপে, কী (হইবে) তোর নৈবেদ্যে, কী করা হইবে তোর মন্ত্রের সেবায়, কী তোর (হইবে) তীর্থ-তপোবনে যাইয়া! জলে নাহিলেই কি মোক্ষলাভ হয়?

সহজযানীরা বলেন, বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, বুদ্ধদেবও জানিতেন না। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায়? সকলেই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে। কোথায় কতদূরে গেল শূন্যতাবাদ, কতদূরে সরিয়া গেল বিজ্ঞানবাদ! জাগিয়া রহিল শুধু দেহবাদ, শুধু কায়াসাধন। সহজিয়াদের মতে শূন্যতা হইল প্রকৃতি, করুণা হইল পুরুষ; শূন্যতা ও করুণা অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে, অর্থাৎ নারী ও নরের মিথুনমিলনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি লাভ হয় তাহাই মহাসুখ। এই মহাসুখই ধ্রুবসত্য; এই ধ্রুবসত্যের উপলব্ধি ঘটিলে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হইয়া যায়, সংসারজ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মপরভেদ লোপ পায়, সংস্কার বিনষ্ট হয়। ইহাই সহজ অবস্থা।

বজ্রযানেরই অপর আর-এক সাধনপন্থার নাম কালচক্রযান্। কালচক্রযানীদের মতে শূন্যতা ও কালচক্র এক এবং অভিন্ন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ লইয়া অবিরাম প্রবহমান কালস্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণমান। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ ও সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জন্মদানকার্যটি সম্পন্ন করেন। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্যই হইতেছে কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ত করা অর্থাৎ নিজদেরকে সেই কালপ্রভাবের ঊর্ধ্বে উন্নীত করা। কিন্তু কালকে নিরস্ত করা যায় কিরূপে? ব্যক্তির ক্ষেত্রে কালের ধারণা মূলত প্রাণক্রিয়ার পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ

করিতে পারিলেই কালকে নিরস্ত করা যায়। কালচক্রযানীরা বলেন, যোগসাধনার বলে দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও নাড়ীকেন্দ্র ও পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ করা যায়, এবং তাহাতেই কাল নিরস্ত হয়। কাল নিরস্ত করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কালচক্রযানীদের সাধনপদ্ধতিতে তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, যোগ প্রভৃতি একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। এই জন্যই কালচক্রযানীদের মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ছিল খুব বেশি। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে কালচক্রযানের উদ্ভব ভারতবর্ষের বাহিরে সম্ভল নামক কোন স্থানে; পালপর্বের কোন সময়ে নাকি অহা বাংলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকরগুপ্ত এই মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন; তিনি ছিলেন রামপালের সমসাময়িক।

বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান—সকলেরই নির্ভর যোগসাধনার উপর। ইহাদের সকলেরই মূল যোগাচার ও মধ্যমিক দর্শনে। এই তিন যান একই ধ্যানকল্পনা হইতে উদ্ভূত এবং ব্যবহারিক সাধনার ক্ষেত্রে এই তিন যানের মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশি ছিল না। একই সিদ্ধাচার্য একাধিক যানের উপর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। এই তিন যানের উদ্ভব যেখানেই হউক, বাংলাদেশেই ইহারা লালিত ও বর্ধিত হইয়াছিল। বস্তুত, এই তিন যানের ইতিহাসই পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ-পর্বের বাংলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস।

যে যোগের উপর এই তিন যানের নির্ভর সেই যোগ হঠযোগ নামে পরিচিত এবং তাহা মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীরজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীরের নাড়ী-প্রবাহ ও তাহাদের ঊর্ধ্বমুখী গতি, বিভিন্ন নাড়ীর সংযোগকেন্দ্র, তাহাদের উৎপত্তি-স্থল, নাড়ীচক্র প্রভৃতি সমস্তই এই শারীরজ্ঞানের অন্তর্গত। ললনা, রসনা ও অবধূতী এই তিনটিই প্রধান নাড়ীপ্রবাহ; ইহাদের মধ্যে অবধূতীর ঊর্ধ্বমুখী গতি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। নাড়ীপ্রবাহের গতিকে সাধক স্বেচ্ছায় চালনা করিতে পারেন এবং সেই চালনার শক্তি অনুযায়ী বোধিচিত্তের ধ্যানদৃষ্টি উন্মীলিত ও প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের যোগসাধনায় উপরোক্ত ললনা-রসনা-অবধূতীই ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নাতে বিবর্তিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, বজ্রযান সাধনপদ্ধতিতে গুরু অপরিহার্য। কিন্তু গুরুর পক্ষে শিষ্য নির্বাচন এবং তাহাকে যথার্থ সাধনপন্থায় চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া খুব সহজ ছিল না। সাধনমার্গের কোন্ পথে শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবণতা গভীর বিচার করিয়া তাহা স্থির করিতে হইত। এই বিচারবিশ্লেষণের অভিনব একটি পদ্ধতি তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এই পদ্ধতির নাম ছিল কুল নির্ণয়পদ্ধতি। ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী, এই পাঁচ রকমের কুল। এই পাঁচটি কুল প্রজ্ঞার পাঁচটি রূপ। বৈষ্ণব পদকর্তা ও সাধক চণ্ডীদাসের রজকী বা রজকিনী বজ্রযান-সহজযান মতে চণ্ডীদাসের কুলেরই সূচক, আর কিছুর নহে।

মহাযান ধর্মের যে বিবর্তনের কথা এতক্ষণ বলিলাম এই বিবর্তনের নেতৃত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাঁহাদের বলা হইয়াছে সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। চৌরাশি জন সিদ্ধাচার্যের সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন; তবে ইঁহাদের অনেকেই যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ইঁহারা জীবিত ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

অনেকে অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের তিব্বতী অনুবাদ আজও বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যে সরহপাদ বা সরহবজ্র, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অম্বরবজ্র, কাহ্নুপাদ, ভুসুকু, কুক্কুরিপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যেরাই প্রধান।

বজ্রযান ও কালচক্রযানে ব্যবহারিক ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্র ক্ষীণ হইলেও শ্রাবকযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের কিছু আভাস তবু বিদ্যমান ছিল কিন্তু ক্রমশ ধর্মের এই ব্যবহারিক অনুষ্ঠান কমিয়া গুহ্যসাধনাটাই প্রবল ও প্রধান হইয়া দেখা দিল। তাহার উপর, সহজযান আবার লৌকিক বা লোকোত্তর কোন বন্ধকেই স্বীকার করিল না প্রব্রজ্যা, বিনয়-শাসন, বজ্রযানের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্ত কিছুই হইল নিন্দিত ও পরিত্যক্ত। রহিল শুধু কায়াসাধন এবং দেহাশ্রয়ী হঠযোগ। বাংলার ব্রাহ্মণ্য শক্তি-ধর্মেও অনুরূপ এক বিবর্তন ঘটিতেছিল, এবং সেখানেও ক্রমশ শক্তিধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়া সূক্ষ্ম মিথুনযোগের গুহ্য সাধনপন্থাই প্রধান হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গুহ্য সাধনপন্থার সঙ্গে শাক্ত বা ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহ্য সাধনপন্থার পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রহিল না, দুয়ের মিলনও খুব সহজ হইয়া উঠিল। এই মিলন পালপর্বের শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম একেবারে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও শক্তিধর্মের কুক্ষিগত হইয়া গেল।

তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তিধর্ম এবং নব বৌদ্ধধর্মের গুহ্য সাধনবাদের একত্র মিলনে শক্তিধর্মের যেসব নূতন রূপ দেখা দিল তাহার মধ্যে কৌলধর্মই প্রধান। কৌলধর্মের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ নেপাল রাজকীয় গ্রন্থ-সংগ্রহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৌলধর্মীরা বলেন, তাঁহাদের ধর্মের মূলসূত্রগুলি গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা হইতে পাওয়া। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেকে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম লুইপাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কৌলধর্ম নব বৌদ্ধ গুহ্য সাধনবাদ হইতেই উদ্ভূত এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কৌলমার্গীদের মতে কুল হইতেছেন শক্তি কুলের বিপরীত অকুল হইতেছেন শিব, এবং দেহের অভ্যন্তরে যে শক্তি কুণ্ডলাকারে সুপ্ত তিনি হইতেছেন কুলকুণ্ডলিনী। এই কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া শিবের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক করাই কৌলমার্গীর সাধনা।

কৌলমার্গীরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন; কিন্তু একই গুহ্য সাধনবাদ হইতে উদ্ভূত নাথ ধর্ম, অবধূত ধর্ম ও সহজিয়া ধর্ম বৌদ্ধ সহজযানীদের মতো বর্ণাশ্রমকে একেবারে অস্বীকার করিত। প্রথমোক্ত দুইটি ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পালপর্বেই জানা যায়. সহজিয়া ধর্মের প্রথম সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ত্রয়োদশ শতকে রাজা হরিকালদেবের একটি লিপিতে। এইসব ধর্ম ও সম্প্রদায় কখন কিভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল আজ তাহা বলা কঠিন। তবে মনে হয়, দ্বাদশ শতকের মধ্যেই নিজস্ব মতামত ধ্যানধারণা লইয়া প্রত্যেকটি ধর্ম ও সম্প্রদায় নিজস্ব সীমারেখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল।

নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। কৌলমার্গীরাও মৎস্যেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া মানিতেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ যদি এক এবং অভিন্ন হন তাহা হইলে নাথ ধর্মও সিদ্ধাচার্যদেরই প্রবর্তিত ধর্মের অন্যতম। নাথধর্মীদের গুরুদের মধ্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরীপাদ প্রভৃতি নাথযোগীরা প্রসিদ্ধ।

ত্যাঙ্গুরে-গ্রন্থ অনুযায়ী মীননাথ ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের পিতা; মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের একজন ধীবর। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে পাঁচখানি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। তাহারই একখানির নাম কৌলজ্ঞাননির্ণয়। এই গ্রন্থের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধ বা সিদ্ধামৃত সম্প্রদায়ভুক্ত। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন ময়নামতীর রাজা গোপীচন্দ্রের সমসাময়িক। গোপীচন্দ্রের মাতা গোরক্ষনাথের শিষ্যা ময়নামতীর যোগশক্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী আজও বাংলাদেশে প্রচলিত। ত্যাঙ্গুরে জালন্ধরীপাদকে বলা হইয়াছে আদিনাথ। এই জালন্ধরীপাদই বোধ হয় রাজা গোপীচাঁদের গুরু হাড়িপা বা হাড়িপাদ; হাড়িপাদ ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য। নাথপন্থা যে সূচনায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুত, কোন কোন সিদ্ধাচার্যকে নাথপন্থীরা নিজেদের আচার্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। নানাপ্রকার যোগে, বিশেষভাবে হঠযোগে নাথপন্থীদেব প্রসিদ্ধি ছিল। উত্তর- ও পূর্ব -বঙ্গে নাথপন্থীদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট; ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিব কাবণে নাথ ধর্ম ও সম্প্রদায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। ক্রমশ ব্রাহ্মণসমাজেব নিম্নস্তরে কোন রকমে তাঁহারা নিজের স্থান করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অবধূত-মার্গীদের সাধনপন্থাও সিদ্ধাচার্যদের গুহ্যসাধনা হইতে উদ্ভূত। যে তিনটি প্রধান নাড়ীর উপর যোগসাধনপ্রক্রিয়ার নির্ভর, তাহার প্রধানতমটির নাম অবধূতী। অবধূত-যোগ এই অবধূতী নাড়ীর গতিপ্রকৃতির সম্যক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিত। অবধূত-মার্গীরা সকলেই কঠোর সন্ন্যাসজীবন যাপন করিতেন; নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের যেসব ধুতাঙ্গ আচরণ করিবার কথা, অবধূতরাও তাহাই করিতেন। এই ধুত বা ধুতাঙ্গ আচরণের জন্যও হয়তো তাহাদের নাম হইয়াছিল অবধূত। তাঁহারা বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন না শাস্ত্র, তীর্থ, কিছুই মানিতেন না, কোন বস্তুতেই তাঁহাদের কোন আসক্তি ছিল না। প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য অদ্বয়বজ্রের আর-এক নাম ছিল অবধূতী-পাদ; চৈতন্যসহচর নিত্যানন্দও ছিলেন অবধূত; চৈতন্য-ভাগবতে অবধূতদের জীবনাচারণের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে।

বাংলার সহজিয়া-ধর্ম সিদ্ধাচার্যের সহজযান হইতেই উদ্ভূত। মধ্যযুগীয় বাংলার সহজিয়া ধর্মের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক হইতেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের মূল সূত্রগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, বাংলার বাউলরা নাথধর্মী বা অবধূতমার্গী বা সহজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধ্যানকল্পনা ও সাধনপন্থা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। বাউলরা উপরোক্ত কোন ধর্মেরই প্রভাবে পড়েন নাই, কিংবা শাক্ত প্রকৃতি-পুরুষকল্পনা বা বৈষ্ণব কৃষ্ণ-রাধাকল্পনা তাঁহাদের নিকট কোন অর্থই বহন করে না। অথচ, বজ্রযানী-সহজযানীদের নাড়ী, শক্তি প্রভৃতি বাউল ধর্মে অপরিহার্য। সহজযানীদের মত সহজসুখ মহাসুখ ইঁহাদেরও উদ্দেশ্য।

বজ্রযানের দেবদেবীর আয়তন বহু বিস্তৃত, এ কথা আগেই বলিয়াছি। নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বহু দেবদেবীর স্তুতি ও অর্চনা করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বজ্রসত্ত্ব, হেবজ্র, হেরুক, মহামায়া, ত্রৈলোক্যবশংকর, নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি, যমারি, কৃষ্ণযমারি,

জম্ভল, হয়গ্রীব, সম্বর, চক্রসম্বর, চক্রেশ্বরালী কালী, মহামায়া, বজ্রযোগিনী, সিদ্ধ-বজ্রযোগিনী; কুরুকুল্লা, বজ্রভৈরব, বজ্রধর, হেবজ্রোদ্ভব কুরুকুল্লা, সিতাতপত্রা-অপরাজিতা, উষ্ণীষ-বিজয়া প্রভৃতিরাই প্রধান। উল্লিখিত সকল দেবদেবীর মূর্তি-প্রমাণ যেমন বাংলাদেশে পাওয়া যায় নাই তেমনই আবার এমন অনেক বজ্রযানী দেব-দেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহাদের উল্লেখ এই সব গ্রন্থে দেখিতেছি না।

এই পর্বের প্রায় সব বৌদ্ধ প্রতিমাই মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের, সন্দেহ নাই; তবে সাধারণ বুদ্ধযানী প্রতিমাও কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধরনের প্রতিমার কেন্দ্রে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া শাক্যসিংহ বা বোধিসত্ত্ব গৌতম বা বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ বা ধ্যান বা ধর্মচক্র-প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট; এবং তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বুদ্ধায়নের (অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনের) প্রধান প্রধান কয়েকটি কাহিনীর প্রতিকৃতি রূপায়িত। আরও কয়েকটি কাহিনীর স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতি সম্বলিত বুদ্ধায়নী প্রতিমাও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের মূর্তির প্রচলন খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না। যতগুলি বুদ্ধমূর্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অভয়, ব্যাখ্যান, ভূমিস্পর্শ ও ধর্মচক্র-মুদ্রায় উপবিষ্ট প্রতিমাই বেশি।

মহাযানী দেবায়তন আদি বুদ্ধ ও তাহার শক্তি(?) আদি প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যানকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি এই পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত এবং ষষ্ঠ আর-একটি দেবতা বজ্রসত্ত্ব এই আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত। ধ্যানীবুদ্ধেরা সকলেই যোগরত, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক-একজন সক্রিয় বোধিসত্ত্ব এবং এক-একজন মানুষী-বুদ্ধ বিরাজমান। মহাযানীদের মতে, বর্তমান কাল ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কাল; তাঁহার বোধিসত্ত্ব হইতেছেন অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথ এবং মানুষীবুদ্ধ হইতেছেন বুদ্ধ গৌতম। অবলোকিতেশ্বর ছাড়া মহাযান দেবায়তনে পঞ্চ বোধিসত্ত্বের মধ্যে আরও দুইটি বোধিসত্ত্বের—মঞ্জুশ্রী এবং মৈত্রেয়ের—প্রতিপত্তি প্রবল। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক-একটি শক্তি; এই শক্তিময়ীরা সকলেই তারা নামে খ্যাত এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি।

ধ্যানীবুদ্ধদের দুই-একটি মূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। আদিবুদ্ধের কোন প্রতিমা এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দুই-একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাহাদের আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমা বলা যাইতে পারে।

বাংলাদেশে যত মহাযানী-বজ্রযানী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে নানা রূপের অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথের প্রতিমাই সবচেয়ে বেশি। প্রতিমাপ্রমাণ হইতে মনে হয়, বৌদ্ধ বাঙালীর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের এবং সূর্যের রূপ ও গুণ লইয়া বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথ, এবং তাঁহার বিচিত্র রূপ ও গুণাবলী লইয়া অসংখ্য বিচিত্র তাঁহার প্রতিমারূপ। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁহার যত রূপ দেখিতেছি তাহার মধ্যে পদ্মপাণি, সিংহনাদ, ষড়ক্ষরী ও খসর্পণ রূপই প্রধান। আসন ও স্থানক দুই রকমের পদ্মপাণিমূর্তিই গোচর। কুষ্ঠব্যাধি-আরোগ্যকর্তা সিংহনাদ-লোকেশ্বরের কয়েকটি প্রতিমা বিদ্যমান। সপ্তরথ পাদপীঠের উপর ললিতাসনোপবিষ্ট সনালপদ্মধৃত সপরিবার খসর্পণ-লোকনাথের দেবপ্রতিমাটি পালশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। খসর্পণ-লোকনাথের আদি রূপকল্পনা না হোক, অন্তত খসর্পণ-লোকনাথ এই নামকরণটি বোধ হয় হইয়াছিল

দক্ষিণ বঙ্গে, চব্বিশ-পরগনা জেলায় খসর্পণ নামক স্থান হইতে; অথবা এমন হইতে পারে যে, খসর্পণ-লোকনাথের পূজায় সমধিক প্রচলন এই স্থানে ছিল বলিয়াই স্থানটির নাম হইয়াছিল খসর্পণ। মালদহ জেলায় একটি একাদশ-শতকীয় ষড়ক্ষরী-লোকেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যে ধরনের মূর্তি অত্যন্ত বিরল। রাজশাহী চিত্রশালায় আর-একটি বিরলরূপ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রক্ষিত আছে; মূর্তি-তাত্ত্বিকেরা মনে করেন এই রূপটি সংগীতসন্দর্শনরূপী অবলোকিতেশ্বরের। দ্বাদশ-ভুজ লোকনাথ-অবলোকিতেশ্বরের আসন ও স্থানক উভয় রূপের প্রতিমার একাধিক দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়াছে। একটি মূর্তি বিস্তৃত এক সর্পফণাছত্রের নীচে সমপদ-স্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার দ্বাদশ হস্তের সাতটিতে গরুড়, মূষিক, লাঙ্গল শঙ্খ, পুস্তক, বৃষ এবং পাত্র লক্ষণ এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই সনাল নীলোৎপলের উপর স্থাপিত; মূর্তিটির কণ্ঠে জানু পর্যন্ত বিলম্বিত বৈজয়ন্তী বা বনমালা। অন্য দুইটি হাত বিষ্ণুর আয়ুধপুরুষের মতো দুইটি মূর্তির উপর স্থাপিত। অন্য একটি মূর্তিতে ইহার পাদপীঠে অবলোকিতেশ্বরের অনুচর প্রেত সূচীমুখের মূর্তি উৎকীর্ণ। সন্দেহ নাই যে, ইহা অবলোকিতেশ্বরের বিশিষ্ট এক রূপ, সঙ্গে সঙ্গে এ তথ্যও অনস্বীকার্য যে এই মূর্তিতে ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর ধ্যান-কল্পনাও সক্রিয়; কয়েকটি লক্ষণই স্থানক বিষ্ণুমূর্তির লক্ষণ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, এই প্রতিমাগুলিতেই ভাগবত বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে মহাযানী লোকেশ্বরের ধ্যানকল্পনার একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

অবলোকিশ্বরের পরেই যে বোধিসত্ত্ব বাঙালীর প্রিয় ছিলেন তিনি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের অধ্যাত্মপুত্র জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রীরও বিচিত্র রূপ। তাঁহার মঞ্জুবর রূপের গর্জমান সিংহের উপর ললিতা-সনোপবিষ্ট কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। যে কোন রূপের মঞ্জুশ্রী-প্রতিমায় প্রধান লক্ষণ হস্তধৃত পুস্তক ও তরবারি। শক্তি ও বৃষ্টির দেবতা বজ্রপাণির মূর্তি বাংলাদেশে বড় একটা পাওয়া যায় নাই। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্তিও পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে।

মহাযান-বজ্রযানের আরও যে কয়েকটি নিম্নস্তরের দেবতা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জম্ভল, হেরুক ও হেবজ্রই প্রধান। জম্ভল ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের সঙ্গে যুক্ত, হেরুক অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত এবং হেবজ্র স্পষ্টতই তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা। জম্ভল ব্রাহ্মণ্য কুবেরের বৌদ্ধ প্রতিরূপ এবং তাঁহার প্রতিমা বাংলাদেশের, বিশেষত পূর্ব ও উত্তর বাংলার নানা জায়গা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধন ও ঐশ্বর্যের এই দেবতা যে জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিলেন, অসংখ্য মূর্তিপ্রমাণেই তাহা স্পষ্ট। জম্ভলের তুলনায় হেরুকের মূর্তি কমই পাওয়া গিয়াছে। শক্তির দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধ হেবজ্রের মূর্তি একাধিক পাওয়া গিয়াছে। শক্তিবিরহিত হেবজ্রের একটি মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। বজ্রযানী কৃষ্ণ-যমারির এবং ত্রিমুখ, চতুর্ভুজ, করালদর্শন ত্রৈলোক্যবশংকরের অন্তত একটি করিয়া মূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত মূর্তিটি দেখিলে স্বতই মনে হয়, বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যবশংকর এবং ব্রাহ্মণ্য ভৈরব একই ধ্যানকল্পনার সৃষ্টি।

মহাযান-বজ্রযান আয়তনের দেবীদের মধ্যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠা। তারারও অনেক রূপ-

ভেদ; বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। বাংলাদেশে যত প্রকারের তারামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে খদিরবনী-তারা (খয়ের বনের তারা), বজ্র-তারা এবং ভৃকুটী-তারাই প্রধান। খদিরবনী-তারার অপর নাম শ্যাম-তারা, তাঁহার ধ্যানীবুদ্ধ হইতেছেন অমোঘসিদ্ধি; বজ্র-তারার ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব এবং ভৃকুটী-তারার অমিতাভ অশোককান্তা (মারীচী) ও একজটাসহ খদিরবনী বা শ্যাম-তারার মূর্তিই সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়াছে। নীলোৎপলধৃতা এই দেবী কখনও উপবিষ্টা, কখনও দণ্ডায়মানা।

বজ্রযানী অন্যান্য দেবীমূর্তির মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী এবং চুণ্ডাই প্রধান। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনসম্ভূত মারীচীর কয়েকটি প্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিমুখ (বাম মুখ শূকরীর), সপ্তশূকরবাহিত এবং রাহুসারথি, রথে, প্রত্যালীঢ়ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা এই দেবীটি ব্রাহ্মণ্য সূর্যের বৌদ্ধ প্রতিরূপ। পর্ণশবরী তাঁহার অন্যতম অনুচর। পর্ণশবরীর ধ্যানীবুদ্ধ বোধহয় অমোঘসিদ্ধি। অষ্টাদশভুজা চুণ্ডা দেবীর একটি নবমশতকীয় প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরক রাজ্যে চুণ্ডাবর-ভবনে একটি ষোড়শভুজা চণ্ডীদেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। বজ্রযানী দেবী উষ্ণীষ-বিজয়ার একটি ভগ্ন মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। হারীতী জম্ভলের শক্তি; তিনি ধনৈশ্বর্যের দেবী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠীর বৌদ্ধ প্রতিরূপ। তাঁহার কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে।

এইসব অসংখ্য মহাযানী দেবদেবীদের পূজার্চনার জন্য মন্দিরও অবশ্যই অসংখ্য রচিত হইয়াছিল বাংলার নানা জায়গায়। বিভিন্ন বিহারগুলির সঙ্গে সঙ্গেও মন্দির নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। একাদশ শতকের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে বাংলাদেশের কয়েকটি মহাযানী বজ্রযানী বৌদ্ধ মন্দিরের এবং কোন্ মন্দিরে কাহার পূজা হইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্রদ্বীপে (নিম্নবঙ্গের খুলনা বরিশাল অঞ্চল) ভগবতী-তারার একটি মন্দির, সমতটে লোকনাথের দুইটি এবং বুদ্ধার্ধ-তারার একটি, পট্টিকেরক রাজ্যে চুণ্ডা-দেবীর একটি; এবং হরিকেলদেশে লোকনাথের একটি মন্দির ছিল।

এ পর্যন্ত যত মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদির কথা বলিলাম সেগুলির প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উত্তর ও পূর্ব-বাংলা (গঙ্গার পূর্বতীর হইতে), বিশেষভাবে রাজসাহী-দিনাজপুর-বগুড়া জেলায় এবং ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরা জেলায় যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বাংলার অন্যত্র কোথাও তেমন নয়। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বজ্রযানী-তন্ত্রের প্রতিমা পাওয়া প্রায় যায় নাই বলিলেই চলে, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া। মনে হয়, মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি উত্তর ও পূর্ব বাংলায় যতটা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে ততটা ছিল না, দক্ষিণ রাঢ়ে তো নয়ই। প্রায় দশম শতক হইতেই নালন্দার প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে থাকে এবং বিক্রমশীল-সোমপুর প্রভৃতি তাহার স্থান অধিকার করে। বিহারগুলির অধিকাংশ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে। সিদ্ধাচার্যদের জন্মস্থান ও আদি পরিবেশ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, তাঁহারা অধিকাংশই উত্তর ও পূর্ববঙ্গের লোক। অথচ, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমা মিলিতেছে প্রচুর। মনে হয়, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া রাঢ়ের অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। এই

তথ্য সমসাময়িক ও মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক হইতে গভীর অর্থবহ। ইহাও লক্ষণীয় যে, বাঁকুড়া-বীরভূমের যে-অংশে মহাযান-বজ্রযান সক্রিয় সেই অংশেই পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

লিপিপ্রমাণ ও শৈলীপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমাগুলির তারিখ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পালপূর্ব যুগের বৌদ্ধমূর্তি খুব বেশি পাওয়া যায় নাই; যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই—দুই-চারিটি বিক্ষিপ্ত মূর্তি ছাড়া—মোটামুটি নবম হইতে একাদশ শতকের, এবং এই তিনশত বৎসরই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ। মহাযানী-বজ্রযানী দেবদেবীর যে পরিচয় মূর্তিপ্রমাণের সাহায্যে পাওয়া যায় সে তুলনায় সমসাময়িক সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থমালায় উল্লিখিত দেবদেবীর পরিচয় অনেক বিস্তৃত। এমন অনেক দেবদেবীর পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় যাঁহাদের একটি প্রতিমাপ্রমাণও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহার কারণ হয়তো এই যে, বজ্রযানীদের সাধনপন্থা ছিল গুহ্য এবং সেই গুহ্যসাধনার ধ্যানকল্পনায় যে মূর্তিমণ্ডল রচিত হইত তাঁহাদের সকলেরই মূর্তিরূপে প্রতিমায় রূপায়িত করার প্রয়োজন হইত না।

ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সংখ্যা ছিল এই পর্বে বৌদ্ধপ্রতিমার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মগত ধ্যানকল্পনায় বোধ হয় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাবই ছিল অধিকতর সক্রিয়; এবং তাহার কারণ বোধ হয় মহাযান-বজ্রযানের সাধনদর্শন। এই সাধনদর্শন সমসাময়িক ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে—বৈষ্ণব ও শৈব উভয় ধর্মকেই—গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

য়ুয়ান্-চোয়াঙের পর বাংলায় জৈন বা নিগ্রন্থ ধর্মের অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার মতো মূর্তিপ্রমাণ কিছু আছে, এবং তাহা সমস্ত পালপর্বের। য়ুয়ান্-চোয়াঙের পর নিগ্রন্থ ধর্ম যে বাংলাদেশে হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, এই জৈন প্রতিমাগুলিই তাহার প্রমাণ। মূর্তিগুলি সাধারণত ঋষভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ, এবং পার্শ্বনাথের; পার্শ্বনাথের প্রতিমাই সকলের চেয়ে বেশি। মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। মনে হয়, ত্রয়োদশ শতকেও গৌড়ে এবং বঙ্গে নিগ্রন্থ সংঘের কিছু অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তবে পাল পর্বেই তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছিল।

সহজযান ধর্ম এবং মহাযানী সিদ্ধাচার্যদের ধর্মগত ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মানবিক আবেদনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অন্তত একটি ধারার আত্মীয়তা অত্যন্ত গভীর। একাদশ-দ্বাদশ শতকের সহজযানী সাহিত্যে, অর্থাৎ চর্যাগীতি ও দোহাকোষের অনেক গান ও শ্লোকে, সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মমত ও পথ সম্বন্ধে খবরাখবর যেমন পাওয়া যায়, তেমনই সিদ্ধাচার্যদের স্বকীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পাঠকের ধারণাও স্পষ্টতর হয়। আগেই বলিয়াছি, ইঁহারা বেদবিরোধী ছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে বেদ-আগমের কথা বলিয়াছিলেন তাহা শুধু বেদ বা আগম মাত্র নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রামাণিক শাস্ত্রমাত্রই ইঁহাদের দৃষ্টিতে বেদ, আগম প্রভৃতি। বাংলাদেশে যে যথার্থ বেদচর্চা, বৈদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি খুব বেশি প্রচলিত ছিল না সে কথা খুব বিশদভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। সেন-বর্মণ আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার যখন খুব বেশি, তখনও হলায়ুধ, জীমূতবাহন প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা বেদচর্চার

অবহেলা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তবু উচ্চকোটির বর্ণহিন্দুরা বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিছু কিছু করাইতেন, বেদপাঠ করাইতেন সন্দেহ নাই, এবং তাহা প্রধানত পশ্চিমাগত ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণদেরই সাহায্যে ও প্রেরণায়। ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা তো যথার্থ ভেদ জানে না; চতুর্বেদ এইভাবেই পড়া হয়। তাঁহারা মাটি, জল, কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া আগুনে আহুতি দেয়; কার্যবিরহিত (অর্থাৎ ফলহীন) অগ্নিহোমের কটু ধোঁয়ার চোখ শুধু পীড়িত হয়। দোহাকোষে শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রাভিমানী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবপূজক ব্রাহ্মণদের উল্লেখ সুপ্রচুর, কিন্তু সহজযানী সিদ্ধাচার্যেরা ইঁহাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না।

সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মের ভিতর থেরবাদী, মহাযানী, কালচক্রযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, দিগম্বর জৈনধর্ম, কাপালিকধর্ম, রসসিদ্ধ তথা নাথসিদ্ধ ধর্ম প্রভৃতির কিছু কিছু উল্লেখ চর্যাগীতি ও দোহাকোষে পাওয়া যায়। সহজযানীরা প্রাচীনতর থেরবাদ বা সমসাময়িক বাংলাদেশে সুপ্রচলিত মহাযান ও তদোদ্ভূত অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও খুব শ্রদ্ধিত ছিলেন না, অন্যান্য ধর্মের প্রতি তো নয়ই। চর্যাগীতিতে মহাযানীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সরল (ধ্যান) সমাধি দ্বারা কী করিবে? সুখ দুঃখের হাত হইতে তাহাতে মুক্তি পাওয়া যায় না। মহাযানী-বজ্রযানী-কালচক্রযানী প্রভৃতিদের সম্বন্ধে দোহাকোষে আছে, অন্যেরা ধাবিত হইতেছে মহাযানের দিকে, সেখানে আছে সূত্রান্ত ও তর্কশাস্ত্র। কেহ কেহ ভাবিতেছে মণ্ডল ও চক্র; দিশা দিতেছে চতুর্থ তত্ত্বে। দোহাকোষে জৈন সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে সরহপাদ বলিতেছেন: নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হইত তাহা হইলে কুকুর-শেয়ালেরও হইত; লোম উপড়াইলেই যদি সিদ্ধি আসিত তাহা হইলে যুবতীর নিতম্বেরও সিদ্ধিলাভ ঘটিত; পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যাইত, তাহা হইলে ময়ূরচামরেরও মোক্ষ দেখা হইত; উচ্ছিষ্ট ভোজনে যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে হাতিঘোড়ারও হইত।

চর্যাগীতিতে সমসাময়িক কাপালিকদের কথাও আছে; ইঁহাদের সঙ্গে সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের একটু আত্মিক যোগও ছিল। সহজিয়ারা কেহ কেহ কাপালী যোগী হইতে চাহিয়াছেন: কাহ্নপাদ তো নিজেকেই কাপালী যোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাপালী যোগীরা নগ্ন থাকিতেন, হাড়ের মালা পরিতেন; কানে পরিতেন কুণ্ডল, গায়ে মাখিতেন ছাই; পুরুষ ও নারী উভয়েই কাপালী যোগী হইতে পারিতেন।

প্রাচীন বাংলায় দশম-একাদশ শতকে এক শ্রেণীর সাধক ছিলেন যাঁহারা মৃত্যুর পর মুক্তিলাভে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারা ছিলেন জীবন্মুক্তির সাধক। রস-রসায়নের সাহায্যে কায়সিদ্ধি লাভ করিয়া এই স্থূল জড়দেহকেই সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধ-দেহকে দিব্যদেহে রূপান্তরিত করা সম্ভব, এবং তাহা হইলে শিবত্বলাভ ঘটে—এই মতে ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন। ইঁহাদের বলা হইত রসসিদ্ধ যোগী। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে এই রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ই পরবর্তী নাথসিদ্ধ-যোগী সম্প্রদায়ের প্রাচীনতর রূপ। ইঁহাদের সম্বন্ধেও সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিলেন না, বরং কঠোর সমালোচনাই করিতেন। সরহপাদ বলিতেছেন, অচিন্ত্যযোগী আমরা জানি না জন্ম মরণ সংসার কিরূপে হয়। জন্ম যেমন মরণও তেমনই; জীবিতে ও মৃতে বিশেষ (কোন) পার্থক্য নাই। এখানে (এই সংসারে) যাহারা জন্ম-মরণে বিশঙ্কিত (ভীত) তাহারাই রস-রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক।

সাধারণ যোগী-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধেও সহজযানীদের ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা। সরহপাদের একটি দোহায় আছে : আর্য যোগীরা ছাই মাখে দেহে, শিরে বহন করে জটাভার, ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, চোখ বুজিয়া আসন বাঁধে, আর কাণ খুসখুসে করিয়া জনসাধারণকে ধাঁধা লাগায়।

সহজ সমরস, অর্থাৎ সাম্যভাবনা, আর 'খসম' অর্থাৎ আকাশের মতো শূন্য চিত্ত, ইহাই সহজযানের আদর্শ। তীর্থ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পূজা, আশ্রম সমস্তই ব্যর্থ। ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নাই, সহজ ছাড়া নির্বাণ নাই, কায়াসাধন ছাড়া পথ নাই। আগম, বেদ, পুরাণ সবই বৃথা, নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ হইতেছে সহজের রূপ, তাহার মধ্যে পাপ-পুণ্যের প্রবেশ নাই। সহজে মন নিশ্চল করিয়া যে সমরসিদ্ধ হইয়াছে সেই তো একমাত্র সিদ্ধ; তাঁহার জরামরণ দূর হইয়াছে। শূন্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ, যেখানে না আছে পাপ, না আছে পুণ্য। সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি আচার্যরা দোহার পর দোহায় এইসব মত কীর্তন করিয়াছেন। বৈরাগ্য তাঁহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন, বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য কিছু নাই।

এইসব গীত ও দোহাগুলি হইতে সহজযানী সাধকদের ধর্মমতের যে আভাস পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ্য ও অন্যান্য ধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠানের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইতে একটি তথ্য সুস্পষ্ট। সে-তথ্যটি এই যে, মধ্যযুগে উত্তর ভারতে ও বাংলাদেশে যে মানবধর্মী মরমীয়া সাধক-কবিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই —বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবীর, দাদু, রজ্জব, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ, হরিদাস প্রভৃতি—ইঁহারা সকলেই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই সহজযানী সাধক কবিদের বংশধর। প্রাচীন সহজযানী সাধকেরা এবং মধ্যযুগীয় মরমীয়া সাধকেরা তাঁহাদের ধ্যান-ধারণাগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচার করিবার জন্য যে মাধ্যম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও এক; সে মাধ্যম হইতেছে গীত ও দোহার মাধ্যম।

সাত

পালপর্বের অব্যবহিত আগেকার সমতটের খড়্গবংশ বা চট্টগ্রামের কান্তিদেবের বংশ, পালপর্বে পাল, চন্দ্র ও কাম্বোজ রাজবংশ—ইঁহারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ; আর সেনপর্বে সেন, বর্মণ ও দেববংশ—ইঁহারা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী। এই দুই তথ্যের মধ্যে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীরতর অর্থ নিহিত। সেনপর্বে ধর্ম ও সমাজচক্র কোনদিকে ঘুরিতেছে, এই দুই তথ্যের মধ্যে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। এই পর্বে বাংলার সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী ধর্মই হইতেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেদ ও পুরাণ, শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং তন্ত্র দ্বারা স্পৃষ্ট। জৈনধর্মের কোন চিহ্নমাত্র কোথায় দেখা যাইতেছে না। বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধদের কণ্ঠ ক্ষীণ, শিথিল এবং কোথাও কোথাও নিরুদ্ধ-প্রায়। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বিরল; সিদ্ধাচার্যদের গুহ্যসাধনা গুহ্যতর পথ অনুসন্ধান করিতেছে অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্মের গুহ্য সাম্প্রদায়িক সাধনায় আত্মগোপন করিতেছে।

বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদির সেই অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নাই। অন্যদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞের আকাশ বিস্তৃত হইতেছে, পৌরাণিক দেবদেবী ও বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির ভিড় বাড়িতেছে, মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণাভিযান বাড়িতেছে, রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে।

এই বিবর্তনের সূচনা পালবংশের এবং কাম্বোজবংশের শেষের দিকেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক তো সমস্ত বাঙালী বৌদ্ধরাজারাই ছিলেন; লক্ষণীয় হইল এই যে, বৌদ্ধ রাজার বংশধরেরাও (একাদশ শতকের শেষার্ধ হইতেই) ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইতেছেন।

বর্মণ, - সেন ও দেব -বংশের ধর্মগত আদর্শের কিছু ইঙ্গিত এখানে রাখা যাইতে পারে। বর্মণবংশের রাজারা সকলেই পরমবিষ্ণুভক্ত। এই রাজবংশের যে বংশাবলী ভোজবর্মার বেলাবলিপিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার গোড়াতেই ঋষি অত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি; এই বর্মণরাষ্ট্রেরই অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট ভবদেব অগস্ত্যের মতো বৌদ্ধসমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের যুক্তিতর্ক খণ্ডনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন। ভট্ট ভবদেবের লিপিতে সাবর্ণগোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাধ্যুষিত একশত গ্রামের খবর পাওয়া যাইতেছে। ভোজবর্মার বেলাবলিপিতে বলা হইয়াছে, মানুষের অজ্ঞতার উলঙ্গতাকে ঢাকিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ত্রি-বেদের চর্চা: এই চর্চার প্রসারের জন্য বর্মণপরিবারের চেষ্টার সীমা ছিল না। বর্মণরাষ্ট্রে যাহার সূচনা, সেনরাষ্ট্রে তাহার বিস্তার। বস্তুত বাংলার স্মৃতি- ও ব্যবহার -শাসন সেনপর্বেরই সৃষ্টি। এই যুগে রচিত অসংখ্য স্মৃতি- ও ব্যবহার - গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ সক্রিয়। বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরম-মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব, পরম নারসিংহ, লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশবসেন উভয়েই নারায়ণ- এবং সূর্য -ভক্ত। বিভিন্ন লিপিতে দেখিতেছি অজস্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেনরাজপরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন—উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, জন্মতিথি ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

ত্রিপুরা নোয়াখালি চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেববংশের লিপিতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এবং বিষ্ণুভক্ত।

বস্তুত এই তিন রাজবংশের সচেতন চেষ্টাই যেন ছিল বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের আকাশ বাংলাদেশে বিস্তৃত করা। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কালিদাস যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সমাজ- ও ধর্ম -জীবনে সঞ্চার করিবার প্রয়াস লিপিগুলিতে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে সুস্পষ্ট। লিপিগুলিতে কনকতুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান, শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ প্রভৃতিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি হলায়ুধ সন্দেহ নাই। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থে সেনপর্বের ভাবপরিমণ্ডলের যে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট

তাহা ঔপনিষদিক তপোবনাদর্শ। সামন্তসেনের বানপ্রস্থ যে আশ্রমে কাটিয়াছিল সে আশ্রমের আকাশ-পরিবেশও ঔপনিষদিক। তদুপরি বর্মণ- ও সেন -রাজাদের লিপিগুলিতে সমানেই দেখিতেছি চতুর্বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরাই হোম যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করাইতেছেন এবং ভূমিদক্ষিণা লাভ করিতেছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ সামবেদ এবং অথর্ববেদ এই চারিবেদই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল, এবং ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়নশাখার ষড়ঙ্গ, যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা, সামবেদীয় কৌথুমশাখা, এবং অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদশাখার চর্চাই ছিল বেশি, বিশেষভাবে যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা এবং সামবেদীয় কৌথুমশাখা। ভট্ট ভবদেব ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্; ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য-রচয়িতা গুণবিষ্ণুও তো এই যুগেরই লোক। বিজয়সেনের অজস্র কৃপা বর্ষিত হইয়াছিল যাঁহাদের উপর তাঁহারা তো অনেকেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

অথচ, হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন (ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থ), রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যথার্থ বেদবিদ্ ছিলেন না; তাঁহার মতে, ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল নাকি উৎকল ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে। হলায়ুধের আগে বল্লাল-গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টও তাঁহার পিতৃদয়িতা-গ্রন্থে বাংলাদেশে বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। এই অবস্থারই বোধহয় দূর প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে কুলজী-গ্রন্থমালা-কথিত পাশ্চাত্ত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাংলায় আগমন-কাহিনীতে। সেন-বর্মণপর্বে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কারের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখিয়া মনে হয় বাহির হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া বেদচর্চা, বৈদিকানুষ্ঠান প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একটা সচেতন চেষ্টা বোধ হয় হইয়াছিল।

আগেই বলিয়াছি, বাংলার শ্রৌত- ও স্মৃতি -শাসন এই পর্বের সৃষ্টি; ভট্ট ভবদেব, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ ভট্ট, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেই এই পর্বেরই লোক এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য শ্রৌত- ও স্মৃতি -পণ্ডিত। এই পর্বেই বাংলার ব্রাহ্মণ্য জীবন সর্বভারতীয় শ্রৌত- ও স্মৃতি -বন্ধনে সম্পূর্ণ বাঁধা পড়িল। সদ্যোক্ত শ্রৌত- ও স্মৃতি -কারদের গ্রন্থে শ্রৌত ও গৃহ্য সংস্কারগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া কঠিন নয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, শোষ্যন্তীহোম, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্ম, অন্নপ্রাশন, নৈমিত্তিক-পুত্র-মূর্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সাবিত্র-চরু-হোম, সমাবর্তন, বিবাহ, শালাকর্ম (গৃহপ্রবেশ) প্রভৃতি দ্বিজবর্ণের যত কিছু সংস্কার প্রত্যেকটি এইসব গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইসব সংস্কার পালনের অপরিহার্য অঙ্গ হইতেছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশণ্ডিকানুষ্ঠান এবং মহাব্যাহৃতি বা শাট্যায়ন বা সমিধ্‌হোম বা অন্য কোন হোমানুষ্ঠান পূর্বক গৃহাগ্নি শোধন বা প্রতিষ্ঠা। অনিরুদ্ধ ভট্টের পিতৃদয়িতা ও হারলতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মেরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। রাষ্ট্রের সহায়তায় এই সব শ্রৌত- ও স্মার্ত -সংস্কার বাঙালী ব্রাহ্মণসমাজে সুবিস্তার লাভ করিয়াছিল।

পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার তো পালপর্বেই দেখিয়াছি। এই পর্বে তাহা বর্ধমান।। পুরাণকাহিনীর পরিচয় এই পর্বের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ ও পূজা, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ভূমিদানের কল্যাকাঙ্ক্ষা, সূর্যাস্তগমন জলাসিক্ত করিয়া দানকার্য সমাপন, নীতিপাঠের অনুষ্ঠান, লিপি-উল্লিখিত এইসব

ক্রিয়াকর্ম সমস্তই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জয় ঘোষণা করে। সুখরাত্রি ব্রত, শক্রোত্থান পূজা, কামমহোৎসব, হোলক উৎসব, পাষাণ-চতুর্দশী, দ্যূতপ্রতিপদ, কোজাগর-পূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশপ্রদীপ, দীপান্বিতা, জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, অক্ষয়তৃতীয়া, অগস্ত্যার্ঘ্য, মাঘীসপ্তমীস্নান প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মানুমোদিত যেসব ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃত উল্লেখ ও বিবরণ এই পর্বের কালবিবেক, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যেও একই ইঙ্গিত।

এই পর্বের বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিবার কিছু নাই। পাল-চন্দ্রপর্বে এইসব ধর্ম ও দেবায়তনের যে রূপ ও প্রকৃতি আমরা দেখিয়াছি, এ পর্বে তাহা আরও বিস্তৃত হইয়াছে এই মাত্র।

পালপর্বের কোন কোন স্থানক বিষ্ণুমূর্তিতে মহাযানী মূর্তিকল্পনার প্রভাবের কথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু বিষ্ণুর লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপই বোধ হয় এই পর্বে বৈষ্ণব দেবদেবী রূপকল্পনার অন্যতম প্রধান দান। পূর্ব বাংলা ও উত্তর বাংলার কোন কোন স্থান হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; বিষ্ণুর বাম উরুর উপর উপবিষ্টা লক্ষ্মীকে দেখিলে সহজেই সমসাময়িক শৈব উমা-মহেশ্বরের প্রতিমার কথা মনে পড়ে। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা ও রূপকল্পনার প্রসার দক্ষিণ ভারতেই ছিল বেশি, এবং খুব সম্ভব সেন-বর্মণ পর্বে দক্ষিণ দেশ হইতেই এই পূজা ও রূপকল্পনা বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কবি ধোয়ী তাঁহার পবনদূত-কাব্যে যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন সেনরাজাদের কুল-দেবতা এবং বাররামাদের নৃত্যগীত সহযোগে তাঁহার অর্চনা হইত। এই পর্বের কয়েকটি অবতার-মূর্তিও বংলাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের মধ্যে বরাহ ও নরসিংহ অবতারই প্রধান। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, লক্ষ্মণসেন নিজের পরিচয় দিতেন পরমনারসিংহ বলিয়া। কামদেবের একাধিক প্রতিমা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহা উত্তরবঙ্গ হইতে। তাঁহার হাতে ইক্ষুদণ্ডের ধনু এবং বাণ, মুখে চতুর হাসি, গলায় ফুলের মালা; ত্রিভঙ্গ হইয়া তিনি দণ্ডায়মান।

সেন-বর্মণপর্বের বাংলাদেশ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকে দুইটি দিক সমৃদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়; একটি বিষ্ণুর দশাবতারের সমন্বিত ও রীতিবদ্ধ রূপ, আর-একটি রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও রূপকল্পনা। পুরাণমালার এবং মহাভারতেও বিষ্ণুর নানা অবতাররূপের পরিচয় বিধৃত। কিন্তু বিধিবদ্ধ সমন্বিত রূপের চেষ্টা বোধহয় প্রথম দেখিতেছি ভাগবত পুরাণে। এই পুরাণে অবতাররূপের তিনটি তালিকা আছে, একটিতে বিষ্ণুর তেইশটি অবতার, একটিতে বাইশটি, একটিতে ষোলোটি; দেখা যাইতেছে, তখনও দশাবতাররূপ সমন্বিত ও বিধিবদ্ধ হয় নাই। পালপর্ব ও সেনপর্বের লিপিমালায়ও কয়েকজন অবতারের খবর পাইতেছি। কিন্তু মধ্যযুগের এবং আজিকার ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যে দশাবতারের ঐতিহ্য সুপরিচিত, সেই দশাবতারের (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি) প্রথম বিধিবদ্ধ সমন্বিত উল্লেখ পাইতেছি কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থেও অবতারবিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে দশাবতারের উল্লেখই প্রধান। পরবর্তী কালে চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বাংলায় বিষ্ণু-কৃষ্ণধর্মের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহার আদি সংস্কৃতিগত রূপ এই শ্লোকগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ। এই শ্লোকাবলীর অধিকাংশই লক্ষ্মণসেনের সভায় রচিত ও গীত হইয়া-

ছিল। শেষোক্ত অবতার দুইটি—বুদ্ধ ও কল্কি—তো বৌদ্ধদের ঐতিহ্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণের ধ্যানকল্পনাও বোধহয় এই পর্বের বাংলাদেশেরই সৃষ্টি, এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ-গ্রন্থেই বোধ হয় প্রথম এই ধ্যানকল্পনার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত রূপ আমরা দেখিতেছি। হালের সপ্তশতীর একটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার তারিখ সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভাসের বালচরিতে, ব্রহ্ম-, বিষ্ণু ও ভাগবত -পুরাণে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে রাধার উল্লেখ কোথাও নাই। ভোজবর্মার বেলাবলিপিতেও শত গোপিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিচিত্র লীলার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সেখানেও রাধা নাই। সেনপর্বের কোন সময়ে বোধ হয় অন্যতমা গোপিনীরূপে রাধা কল্পিতা হইয়া থাকিবেন, এবং খুব সম্ভব তাহা ক্রমবর্ধমান শক্তিধর্মের প্রভাবে। এই শক্তিধর্মের প্রভাব বৈষ্ণবধর্মেও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শাক্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আরও শিথিলভাবে বলা যায়, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র; আর রাধা হইতেছেন শাক্তের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিথিলভাবে বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। সমসাময়িক কালের এই চেতনার স্পর্শ বৈষ্ণবধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়।

সেনবংশের পারিবারিক দেবতা বোধহয় ছিলেন সদাশিব। বিজয়সেন শিবের আবাহন করিয়াছিলেন শম্ভু নামে, বল্লালসেন করিয়াছেন ধূর্জটী এবং অর্ধনারীশ্বর নামে। লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানাইতে ভোলেন নাই। সেন-বর্মণ লিপিমালায় তন্ত্রোক্ত শিবশক্তিধ্যান-কল্পনার পরিচয় কিছু নাই, আগমান্ত শৈব-শাক্ত ধর্মেরও নয়। মধ্যযুগে যে সুবিস্তৃত তন্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সেই তন্ত্রসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বোধহয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই; তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ তন্ত্রগ্রন্থই রচিত হইয়াছিল বাংলাদেশে এবং এই দেশেই তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার এক সমন্বিত রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বস্তুত, সেন-বর্মণপর্বের লিপিতে ও সমসাময়িক সাহিত্যে আগম- ও তন্ত্র -শাস্ত্রের চর্চার কিছু কিছু উল্লেখ বর্তমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভবদেব ভট্ট দাবি করিয়াছেন, অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের সঙ্গে তিনি তন্ত্র- ও আগম -শাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। আগমশাস্ত্রের প্রচলন পালপর্বেই দেখিতেছি; কেদারমিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গুরবমিশ্র আগমশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্ত্রের উল্লেখ এ ক্ষেত্রে দেখিতেছি না। আগম-শাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয়; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তী কালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় পূর্ব-ভারত, বিশেষভাবে বাংলাদেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। দেবীপুরাণমতে বামাচারী দেবীপূজার প্রচলন ছিল রাঢ়, কামরূপ, কামাখ্যা ও ভোট্টদেশে। তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর লিপি-উল্লেখ বোধ হয় দুইটি ক্ষেত্রে আমরা পাইতেছি; একটি নয়পালের গয়ালিপিতে মহানীল-সরস্বতীর, আর-একটি হরিকালদেবের লিপিতে দুর্গোত্তারা নামে এক দেবীর উল্লেখ। বৌদ্ধ বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী সাধনার মতো তন্ত্রোক্ত বামাসাধনা একান্ত গুহ্য ব্যক্তিগত সাধনা; সেই জন্যই লিপিমালায় তাহার উল্লেখ না থাকা কিছু বিচিত্র

নয়। তবে, পালপর্বের বৌদ্ধ গুহ্যসাধনা এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তিসাধনা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং উভয়েই তান্ত্রিক ধ্যানকল্পনার গভীর স্পর্শ লাভ করিয়াছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

নৃত্যপর শিবের যে দুই রূপকল্পনার প্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি নিঃসন্দেহে এই পর্বের সৃষ্টি এবং তাহা দক্ষিণভারতীয় প্রভাবের ফল। পাল-পর্বের রূপটি অবিকল মৎস্যপুরাণের ধ্যানকল্পনানুযায়ী; এই রূপটি দশভুজ। আর-একটি রূপ দ্বাদশভুজ, দুই ভুজে একটি বীণা ধৃত, দুই ভুজে একটি নাগফণা-ছত্র এবং দুই ভুজে করতাল লক্ষণ। এই নটরাজ শিব যথার্থ নৃত্যগীতপটু এবং প্রতিমায় তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দক্ষিণভারতে বীণাধরা দাক্ষিণ্যমূর্তি শিবের যে ধ্যানকল্পনা সুপরিচিত তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাগুলির আত্মীয়তা সুস্পষ্ট।

শিবের সদাশিব রূপকল্পনাও বোধ হয় দক্ষিণ ভারতের দান। এই রূপকল্পনা মোটামুটি সেনপর্বেরই রচনা এবং তাহাও কতকটা দক্ষিণভারতীয় প্রভাবে। বাংলার সদাশিব প্রতিমাগুলির সঙ্গে দক্ষিণভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সদাশিব রূপকল্পনার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। সেনবংশের পারিবারিক দেবতা ছিলেন সদাশিব, এবং তাঁহারা হয়তো উত্তরভারতীয় আগমান্ত সদাশিব ধ্যানকল্পনার দক্ষিণভারতীয় রূপ বাংলাদেশে প্রবর্তিত করিয়া থাকিবেন। শিবের উমা-মহেশ্বরের মূর্তিও এই পর্বে সুপ্রচুর। তন্ত্রধর্মের কেন্দ্র বাংলাদেশে মহেশ্বরের যুগলমূর্তির ধ্যানকল্পনা সমাদৃত হইবে, বিচিত্র কী!

বাংলাদেশে গাণপত্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রসারের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই; তবে, রামপালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি মূর্তি বোধহয় গাণপত্য-সম্প্রদায়-কল্পিত ধ্যানানুযায়ী রচিত এবং ইহার রূপ একান্তই দক্ষিণভারতীয় প্রতিমাশাস্ত্রের অনুমোদিত। প্রতিমাটির প্রভাবলীতে ছয়টি ছোট ছোট মূর্তি রূপায়িত, এই ছয়টি মূর্তি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখার প্রতীক।

কার্তিকেয়ের স্বতন্ত্র-মূর্তি দুর্লভ, কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত এই পর্বের একটি স্বতন্ত্র কার্তিকেয় প্রতিমা দ্বাদশ-শতকীয় ভাস্করশিল্পের সুন্দর অভিজ্ঞান।

শক্তিপ্রতিমার মধ্যে এই পর্বের কয়েকটি প্রতিমা খুব উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি চতুর্ভুজা দেবীপ্রতিমার এক হাতে পদ্ম, এক হাতে দর্পণ; তাঁহার দক্ষিণে গণেশ, বামে পদ্মকলিধৃতা একটি নারী; প্রতিমার পাদপীঠে গোধিকার প্রতিকৃতি। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিতা একটি দেবীপ্রতিমাকে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হইয়াছে চণ্ডী। দেবী চতুর্ভুজা এবং সিংহবাহিনী। প্রতিমাটিকে চণ্ডী যে কেন বলা হইয়াছে, বলা কঠিন, কারণ চণ্ডীর যে রূপবর্ণনা প্রতিমাশাস্ত্রে সচরাচর দেখা যায় তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাটির কোন মিল নাই। শারদাতিলকতন্ত্রে এই ধরনের প্রতিমার নামকরণ করা হইয়াছে ভুবনেশ্বরী। এই যুগে সব দেবীমূর্তিকেই কি চণ্ডী বলা হইত? দেবীর চামুণ্ডারূপের দুই-চারিটি প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে এই পর্বের বাংলাদেশে।

একাধিকবার বলিয়াছি, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ছিলেন সূর্যভক্ত, পরমসৌর। সূর্যদেবের পূজা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল এই পর্বে। কুলজীগ্রন্থমালার ঐতিহ্য স্বীকার করিলে মানিতে হয় বাংলাদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা সপ্তাদশ

আমলেই আসিয়া আবিভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু গয়া জেলার গোবিন্দপুরলিপি এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণের সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সেন-বর্মণপর্বেই। কিন্তু যখনই হউক, এ তথ্য সুবিদিত যে, শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণেরাই উদীচ্যবেশী সূর্যপ্রতিমা ও তাহার পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং ক্রমশ পূর্বভারতে তাহা প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছিল। এই পর্বের একাধিক সূর্যপ্রতিমা বিদ্যমান। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই উদীচ্যবেশী সূর্যপ্রতিমা ও তাহার পূজা বোধহয় সেন-বর্মণপর্বের পর বেশি দিন আর প্রচলিত থাকে নাই; অন্তত মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত সাহিত্যে তাহার পরিচয় কিছু পাইতেছি না। পদ্মোপরি স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ সূর্যদেব, দুইপাশে উষা ও প্রত্যুষা নামে দুই স্ত্রী, এবং পায়ের কাছে সম্মুখেই অরুণ-সারথি, রূপকল্পনার দিক হইতে এই প্রতিমার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রতিমার পার্থক্য কিছু বিশেষ নাই। তাহা ছাড়া, বিষ্ণুর সঙ্গে সূর্যের একটা সুপ্রাচীন বৈদিক সম্পর্ক তো ছিলই। কাজেই, অন্তত বাংলাদেশে বিষ্ণুর পক্ষে সূর্যকে গ্রাস করিয়া ফেলা কঠিন হয় নাই।

অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমার মধ্যে মনসা, হারীতী ও ষষ্ঠী দেবীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দিকপালদের দুই-চারিটি প্রতিমার খবরও পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি ও সংগীতকার জয়দেবের বিষ্ণু- বা হরিভক্তি-বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে উদ্ধার করা হইয়াছে; কবি শরণদেব রচিত শ্লোকও আছে। কিন্তু জয়দেব শুধু রাধামাধবস্তুতিই রচনা করেন নাই; সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত মহাদেবস্তুতি বিষয়ক শ্লোকও রচনা করিয়াছেন। তিনি নিজে একান্তভাবে বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। সদুক্তিকর্ণামৃতে কালী সম্বন্ধেও কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং ইহাদের কয়েকটি বাঙালী কবিদের বিরচিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইসব শ্লোকে কালীর যে চিত্র বা ধ্যান, তাহা আমাদের মধ্যযুগীয় বা বর্তমান ধ্যানকল্পনা হইতে পৃথক। মুসলমানাধিকারের পর বাঙালীর কালী ধ্যানকল্পনায় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে; কিন্তু কী কারণে কী উপায়ে তাহা হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বস্তু।

উমাপতি-ধরের একটি শ্লোকে ও জলচন্দ্র নামে আর-একজন কবির শ্লোকে কার্তিকের শিশুলীলার বর্ণনা আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতের অনেকগুলি শ্লোকে দরিদ্র ভিখারী শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা আছে। এইসব ছবি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এত সুপ্রচুর এবং সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থ বাঙালীর চিত্তের এত নিকট যে, মনে হয়, ইহাদের রচয়িতারা বুঝি বাঙালীই ছিলেন। যাহা হউক, এ তথ্য নিঃসংশয় যে, এই ধরনের কার্তিক- বা শিব -কল্পনার সূচনা মুসলমানাধিকারের আগেই দেখা গিয়াছিল।

বাঙালীর গঙ্গাভক্তি সুপ্রাচীন; সদুক্তিকর্ণামৃতে গঙ্গা সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে একটি বাঙালী কেবট ব কেওট কবি পপীদের রচনা; আর-একজন বঙ্গালদেশীয় অজ্ঞাতনামা কবি নিজের বাণী ব ভাষাকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

আট

সেন-বর্মণপর্বের বাংলায় বৌদ্ধ দেবদেবীপ্রতিমাও যে দুই-চারিটি পাওয়া যায় নাই, এমন নয়; তবে এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, সেন-বর্মণপর্বে বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কমিয়া আসিতেছিল। দুই-চারিটি বিহার ছিল, অভয়াকরগুপ্তের মতো দুই-চারিজন ধর্মাচার্যও ছিলেন; কিন্তু এইসব বিহার ও আচার্যদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ছিল না। পশ্চিম বঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিলেও, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে যেখানে সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া সর্বত্র নব বৌদ্ধধর্মের নিঃসংশয় প্রভাব সক্রিয় ছিল সেখানেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকীয় বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমা বিরল। বস্তুত, রামপালের পর বৌদ্ধ ধর্মে উৎসাহী কোন নরপতির নামও শুনা যাইতেছে না। সাধারণভাবে সেন ও বর্মণ রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উপর শ্রদ্ধিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, এবং প্রত্যক্ষ অত্যাচারে না হউক পরোক্ষ নিন্দায় এবং অশ্রদ্ধায় বৌদ্ধদের উৎপীড়িত করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। বেদ-বাহ্য বৌদ্ধদের পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত করা যেন এই পর্ব হইতে ক্রমশ রীতি হইয়া দাঁড়াইল; বল্লালসেনের দানসাগরগ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষের লক্ষণ সুস্পষ্ট। লক্ষ্মণসেন হয়তো বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এতটা বিদ্বিষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তর্পণ-দীঘি-শাসনে এক বৌদ্ধবিহারের খবর পাওয়া যাইতেছে এবং তাঁহারই আদেশে বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করিয়া লঘুবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে সেন-বর্মণ রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধিত ছিলেন না, এমন অনুমান কঠিন নয়; বৌদ্ধ দেবদেবীর বিরলতাই তাহার অকাট্য যুক্তি।

জীবজগতের বিবর্তনের নিয়ম মানবসমাজের ইতিহাসেও সক্রিয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে একটা সংঘর্ষ যেমন বহু যুগ হইতে চলিতেছিল তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে নানা স্তরে নানা উপায়ে একটা সমন্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। পাল-চন্দ্রপর্বে রাষ্ট্রের আনুকূল্যের ফলে এবং নানা সাময়িক ও রাষ্ট্রীয় কারণে মহাযানী-বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা গিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী লোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং সেই ধর্মের দেবদেবীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও কিছু কম ছিল না। দুই ধর্মের লোকেদের সাধারণ লোকায়ত স্তরে ধর্ম লইয়া দ্বন্দ্ব কোলাহল খুব যে ছিল মনে হয় না, কিন্তু উপরের স্তরে ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়কদের মধ্যে একদিকে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যেমন ছিল তেমনই অন্য দিকে একটা সমন্বয়ের চেষ্টাও ছিল। নিম্নস্তরে ক্রিয়াকর্মের অবিরাম সাযুজ্য ও সারূপ্য এই সমন্বয়ের কাজটা সহজও করিয়া দিয়াছিল।

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান। চীনা শ্রমণ-পরিব্রাজকদের বিবরণীতে, শীলভদ্রের জীবনকাহিনীতে, তিব্বতী ঐতিহ্যে, ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে এইসব প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নায়কদের তর্ক-বিতর্কের ইতিহাসই তো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস, এক কথায় ভারতীয় ধারণার ইতিহাস। আলোচ্য পর্বের বাংলাদেশে সহজযানী সরহপাদ সহজযান মতবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া অন্য সকল ধর্মমতকেই কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন; ভট্ট ভবদেবের কথা আগেই বলিয়াছি; তিনি তো সমগ্র বৌদ্ধ-

জ্ঞানসমুদ্র অগস্ত্যের মতো নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের মত ও যুক্তি খণ্ডনে সিদ্ধ ছিলেন; আর বল্লালসেনের জন্মই তো হইয়াছিল বৌদ্ধ-জৈনদের মতো নাস্তিকদের পদোচ্ছেদের জন্য। অন্যদিকে মহাযানী-বজ্রযানী সকল বৌদ্ধরা, নাথপন্থীরা, জৈনরা সকলেই বেদের নিন্দা করিতেন; এমন বৌদ্ধ রাজাও ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সমসাময়িক কালের বাতাসে এই ধরনের পারস্পরিক অশ্রদ্ধার বিষ ছড়ানো না থাকিলে কিছুতেই এরূপ সম্ভব হইত না।

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কিছু প্রমাণ এক ধরনের বজ্রযানী দেবদেবীকল্পনার মধ্যেও আছে। বজ্রযানী প্রসন্নতারা, বজ্রজ্বালানলার্ক, বিদ্যুজ্জ্বালাকরালী প্রভৃতি দেবতার সাধনমন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতিকে বলা হইয়াছে মার। শিব দশভুজা মারীচীর পদতলে পিষ্ট; তাঁহাকে এবং গৌরীকে একত্র পদদলিত করিতেছেন ত্রৈলোক্যবিজয়। ইন্দ্র অপরাজিতার ছত্রধর, ইন্দ্রাণী পরমাশ্বম্বারা অপদস্থ। ইন্দ্র আবার উভয়বরাহাননা-মারীচীর কৃপাপ্রার্থী, তিনি আবার অষ্টভুজা মারীচী, পরমাশ্ব ও প্রসন্নতারার পদতলে পিষ্ট। সিদ্ধিদাতা গণেশ অপরাজিতা, পর্ণশবরী এবং মহাপ্রতিসরার পদদলিত। অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম রূপ হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব-অবলোকিতেশ্বর গরুড়োপরি আসীন বিষ্ণুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর জয়ঘোষণা করিয়াছেন। সন্দেহ নাই, ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীদের কিছুটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছিল। অবশ্য বাংলায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলিতে সে প্রমাণ নাই বলিলেই চলে; এখানে বজ্রযানী বৌদ্ধরা এতটা সম্মুখ সমরে বোধ হয় সাহসী হন নাই। বাংলার পর্ণশবরীর পদতলে গণেশ দলিত হইতেছেন না; বাংলার সম্বরও ব্রহ্মাকে পদতলে পিষ্ট না করিয়া তাঁহাকে হস্তে ধারণ করিয়াছেন।

কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথা যদি বলিলাম মিলন-সমন্বয়ের কথাটাও বলি। আগে, গুপ্ত- ও পাল -পর্বে একাধিক প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, উচ্চকোটির স্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যাহাই থাকুক, লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনের স্তরে একটা মিলন-সমন্বয় ধীরে ধীরে চলিতেছিল। খড়্গ, পাল ও চন্দ্রবংশের রাজারা তো সজ্ঞানে ও সচেতন-ভাবেই এই মিলন-সমন্বয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের রূপকল্পনায়ও তাহা প্রতিফলিত হইতেছিল। বৌদ্ধ দেবায়তনে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা যেমন স্থান পাইতেছিলেন তেমনই ব্রাহ্মণ্য আয়তনে বৌদ্ধ দেবদেবীরাও ঢুকিয়া পড়িতেছিলেন। বৌদ্ধ আয়তনের সরস্বতী, বিঘ্নান্তক প্রভৃতি তো স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য আয়তন হইতে গৃহীত; চর্চিকা ও মহাকাল দুই আয়তনেই বিদ্যমান। যোগাসন এবং লোকেশ্বর বিষ্ণু ও ধ্যানী শিব তো ধ্যানীবুদ্ধের আদর্শেই পরি-কল্পিত। ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণু ও শিবের প্রভামণ্ডলের উপরিভাগে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি দেবমূর্তির পরিকল্পনা একান্তই বৌদ্ধপ্রতিমার ধ্যানীবুদ্ধের রূপকল্পনানুযায়ী। বৌদ্ধ তারাদেবী তো ব্রাহ্মণ্য আয়তনে কালী এবং দুর্গার অন্য নাম। রুদ্রযামল ও ব্রহ্মযামল-গ্রন্থের একটি কাহিনীতে বশিষ্ঠকে আদেশ করা হইয়াছে চীনদেশে গিয়া তারা ও তারাদেবীর সাধনার গুহ্য রহস্য শিখিয়া আসিবার জন্য। সাধনমালার একটি স্তোত্রে দেখা যায় তারাদেবী, উমা, পদ্মাবতী এবং বেদমাতা সকলে একই দেবী-

রূপে কল্পিতা হইয়াছেন। বস্তুত, লোকায়ত স্তরে ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু আর ছিল না।

কিন্তু, এই মিলন-সমন্বয় সত্ত্বেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের দেবায়তন ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল। নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে-মন্দিরে দেখিতেছি শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রভৃতিরা বৌদ্ধ দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই পূজা পাইতেছেন। ইহার পশ্চাতে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের ঔদার্য এবং বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয়ভাবনা কতকটা সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা ক্রমশ বৌদ্ধ দেবায়তন গ্রাস করিতে-ছিলেন। সংখ্যাগণনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোকায়তন চিরকালই অনেক সমৃদ্ধতর। অন্য দিকে পাল-আমলের শেষের দিকে হইতেই নালন্দা-মহাবিহারের অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল; জনসাধারণের ভিতর, বিশেষভাবে উচ্চ ও মধ্য স্তরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। সেন-বর্মণ আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজকীয় বিরাগ ও উচ্চ ও মধ্য কোটির লোকদের অনুদার দৃষ্টি, এই দুইয়ের ফলে বৌদ্ধ-ধর্মের ক্রমসংকুচীয়মান অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। সংঘে বিহারে সিদ্ধাচার্য ও তাঁহাদের ভক্ত-শিষ্য প্রভৃতি যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদের সাধনা-আরাধনা ক্রমশ গুহ্য হইতে গুহ্যতর পথে বিবর্তিত হইতে লাগিল। পূজা, প্রতিমা ও অনুষ্ঠানের দিকটায় অন্তত দৃশ্যত, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতে-ছিল। লৌকিক মনের প্রতিমাতৃকা মিটাইবার পক্ষে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের কোন বাধা ছিল না; বস্তুত লোকায়ত মনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমার রূপ ও অর্থের পার্থক্য ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তত্ত্বের দিক হইতেও তান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আদর্শ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাধনা উভয়কেই একই পর্যায়ে আনিয়া দাঁড় করাইতেছিল। কাজেই লোকায়ত সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনার প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

অন্যদিকে, সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবায়তনের প্রতি ব্রাহ্মণ্য জনসমাজের বিরাগানুরাগ যাহাই থাকুক, বুদ্ধদেবের প্রতি কিন্তু প্রাগ্রসর ব্রাহ্মণ্য চিন্তার প্রীতি ও অনুরাগ ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। বুদ্ধদেব বহুদিন আগেই বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন; এই স্বীকৃতি ক্রমশ অনুরক্তিতে পরিণত হইতে খুব দেরি হয় নাই। এক সময়ে মৎস্য, বিষ্ণু, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার জন্মই হইয়াছিল অসুরগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া দেবমার্গ হইতে তাহাদিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। কিন্তু পদ্মপুরাণের ক্রিয়া-যোগসারে দশাবতারস্তুতিতে বুদ্ধাবতার বেদবিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে নমস্কার জানানো হইয়াছে। 'তুমি পশুহত্যা অবলোকন করিয়া কৃপাযুক্ত হইয়া বুদ্ধশরীর গ্রহণপূর্বক বেদসকলের নিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞনিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার।' বাংলাদেশের কবি জয়দেবের কণ্ঠে গীতগোবিন্দের দশাবতারস্তোত্রেও তাহার প্রতিধ্বনিই যেন শুনিতেছি। আর, নৈষধ-রচয়িতা শ্রীহর্ষ যদি বাঙালী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনিও সমসাময়িক বাঙালীর মনকেই ব্যক্ত করিতেছেন যখন তিনি নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছেন মারজয়ী জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধের কথা, তাঁহার ক্ষমতাশীলতা ও সৌন্দর্যের কথা। এইভাবে ধীরে ধীরে বেদ-বিরোধী যজ্ঞবিরোধী বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য ধ্যানের স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গেলেন; বৌদ্ধ-

ধর্মের তন্ত্রমার্গী সাধনা ব্রাহ্মণ্য সাধনার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রায় এক হইয়া গেল; বৌদ্ধ দেবায়তন আর ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিমার রূপকল্পনার পার্থক্য প্রায় রহিল না। ইহার পর লোকায়ত সমাজে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম সক্রিয় সচেতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতে বেশি দেরি হইল না।

সেন-বর্মণপর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের যত বিরাগই থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ ছিল বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। বরং এক সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে আর-এক ধর্মের একটা নিরন্তর অথচ গভীর সহৃদয় চেতনা বোধহয় এই পর্বে বেশ সক্রিয় ছিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও হরি-হরের যুগলমূর্তি এই সহৃদয় চেতনার প্রকাশ বলিয়া মনে হইতেছে; এবং পাল-চন্দ্র ও সেন-বর্মণ পর্বে এই ধরনের বহু যুগল মূর্তি বিদ্যমান। এই দুই পর্বেই বিষ্ণু-মূর্তির প্রাচুর্য অন্য যে কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিমার চেয়ে বেশি এবং বিষ্ণুভক্তরাই যে সংখ্যায় বেশি ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষ্ণুভক্তের পক্ষেও শিব- বা সূর্য-পূজার কোন বাধা ছিল না, অথবা শৈব বা সৌর হইলেও যে কেহ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন না, এমনও নয়। উনকোটি এবং দেওপাড়া দুইই পরম শৈবতীর্থ, কিন্তু সেখানেও বিষ্ণু বিদ্যমান, এবং তিনিও শিবের সঙ্গে সঙ্গেই পূজা লাভ করিতেন। কমৌলিলিপির বৈদ্যদেবের সম্প্রদায়গত পরিচয় পরম-মাহেশ্বর ও পরম-বৈষ্ণব উভয়ই রূপেই: ডোম্মনপাল পরম-মাহেশ্বর, কিন্তু ভগবান নারায়ণকে শ্রদ্ধা জানাইতে তাঁহার কিছুমাত্র দ্বিধা জাগে নাই; লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন তিনজনই পরম বৈষ্ণব, তাঁহাদের লিপি আরম্ভ করিয়াছেন নারায়ণকে প্রণতি জানাইয়া, কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকেরই রাজকীয় শীলমোহরে যাঁহার প্রতিমা উৎকীর্ণ তিনি সদাশিব। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন আবার সূর্যভক্তও। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব সর্ব-সাধারণ্যে পরিচিত পরম-বৈষ্ণব বলিয়া, কিন্তু যথার্থত তিনি ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ; বস্তুত, জয়দেব যে যোগমার্গী পদও রচনা করিয়াছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য হরপ্রসাদ দেখাইয়াছেন যে, কবি বিদ্যাপতি বৈষ্ণব মহাজন বলিতে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা মোটেই ছিলেন না, সহজিয়া সাধকও ছিলেন না, তিনি পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং শিবের, গঙ্গার ও উমার উপাসক ছিলেন। বস্তুত সাম্প্রদায়িক ধর্মের এই পারস্পর সম্বন্ধই বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ্য বাঙালী আজও একই সঙ্গে সমান উৎসাহে ও উদ্দীপনায় বিষ্ণু ও শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সূর্য ও কার্তিক এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, অসংগতি কোথাও কিছু আছে বলিয়া মনে করে না। সেন-বর্মণ আমলেও অবস্থাটা প্রায় আজিকার দিনের মতোই ছিল, এবং এইসব স্মার্ত, পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমান প্রচলিত ছিল নানা লৌকিক ব্রত, নানা লৌকিক, অস্মার্ত অপৌরাণিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা।

অন্ত্য

সেন-রাজবংশের অবশেষ যখন পূর্ববঙ্গে অধিষ্ঠিত তখনও বৌদ্ধধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ১২২০ খ্রীষ্ট শতকের পট্টিকেরা-রাজ্যাধিপ মহারাজ রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের রাজত্বকালে তাঁহার সহজধর্মী প্রধানমন্ত্রী

দুর্গোত্তারার এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাধবকরের নিদানের মধুকোষ নামীয় টীকার রচয়িতা বিজয়-রক্ষিতের উপাধি ছিল আরোগ্যশালীয়। আরোগ্য-শালী ছিল বুদ্ধদেব এবং অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম উপাধি, সেই হিসাবে বিজয়-রক্ষিতের বৌদ্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। বিজয়-রক্ষিতের কাল ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ। ইহার কিছুকাল পরই বিশ্রুতকীর্তি গৌড়ীয় কবিভারতী রামচন্দ্রের আবির্ভাব। শ্রুতি, স্মৃতি, আগম, জ্যোতিষ, তর্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত রামচন্দ্র ক্রমে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন, এবং তাহার ফলে নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১২৪৫ খ্রীষ্ট শতকের কিছু আগে তিনি সিংহলে চলিয়া যান। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃত্তরত্নাকরের একটি টীকা (বৃত্তরত্নাকর-পঞ্জিকা) রচনা করেন। ১২৮৯ খ্রীষ্ট শতকে অনুলিখিত পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডু-লিপিতে গৌড়েশ্বর পরমরাজাধিরাজ মধুসেন নামে এক নরপতির উল্লেখ আছে। এই মধুসেন ছিলেন পরমসৌগত বা বৌদ্ধ। সমগর বা বড়নগরীর অধিবাসী মহা-পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বনরত্নও (১৩৮৪-১৪৬৮) নেপালের ললিতপত্তনের গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহারে বসিয়া অনেক বৌদ্ধ-তন্ত্রগ্রন্থ, স্তোত্র ও টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া-ছিলেন, অনেক গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদও করিয়াছিলেন। ১৪৩৬ খ্রীষ্ট শতকে জনৈক সদ্বৌদ্ধ করণ-কায়স্থ ঠক্কুর শ্রীঅমিতাভ বেণুগ্রামে বসিয়া সমসাময়িক বাংলা অক্ষরে (শান্তিদেব রচিত) বোধিচর্যাবতার-পুঁথিটি নকল করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতকেও তাহা হইলে বাংলাদেশে ইতস্তত দুই-চারিজন বৌদ্ধ ছিলেন এবং শান্তি-দেবের পুঁথির চাহিদাও ছিল। তারনাথ বলিতেছেন, এই শতকেরই দ্বিতীয় পাদে ছগল বা চঙ্গলরাজ নামে জনৈক বাঙালী নরপতি রানীর প্রভাবে পড়িয়া বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধগয়ার মঠগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। এই শতকে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু লোক নবদ্বীপ অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় জনৈক চূড়ামণি-দাস লিখিত একখানা চৈতন্য-চরিতে এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের উক্তি সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, বৌদ্ধদের প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অত্যন্ত বিদ্বিষ্টই ছিলেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে ত্রিপতি (তিরুপাতি) ও বেঙ্কটগিরিতে যেসব বৌদ্ধদের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের কথা বলিতে গিয়া বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃতে সেইসব বৌদ্ধদের বলিয়াছেন পাষণ্ডী, এবং এই গ্রন্থেরই অন্যত্র বৌদ্ধদিগকে শবর, ম্লেচ্ছ ও পুলিন্দদের সঙ্গে এক পর্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্যত্রও আছে। বস্তুত, যুগমনোভাবটাই ছিল এইরূপ। কবি কর্ণপূরও চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধদিগকে পাষণ্ডিনঃ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বুদ্ধাবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'ধরিয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ'। বেশ বুঝা যাইতেছে, পঞ্চদশ শতক নাগাদ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্নই হইয়া গিয়াছিল।

বস্তুত, বৌদ্ধধর্ম তাহার স্ব-স্বতন্ত্র রূপে আর বাংলাদেশে বাঁচিয়া নাই। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান বৌদ্ধধর্ম যথার্থত বহুদিন বাঁচিয়া ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে, নাথপন্থী ধর্মে, অবধূতমার্গীদের ধ্যানধারণায় ও

অভ্যাসে, কৌলমার্গীদের ধর্মে ও ধ্যানধারণায়, এবং আজও বহুলাংশে বাঁচিয়া আছে আউল-বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।

আর, বৌদ্ধধর্মের কথঞ্চিৎ অবশেষ যে লুকাইয়া আছে বাংলার ও বাঙালীর কিছু কিছু স্থান-নাম ও লোক-নামের মধ্যে, তাহা আচার্য সুনীতিকুমার সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বুদ্ধ' চলিত বাংলায় 'বুদ্ধু'তে রূপান্তরিত এবং 'বুদ্ধু' বলিতে আমরা বোকা বা মূর্খই বুঝি; বাংলা রূপকথার 'বুদ্ধুভুতুম' আমাদের মনেরই পরিচয়! 'সংঘ' বর্তমান বাংলার 'সাঙাত' বা হিন্দী সংঘত (অর্থ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বা সংঘাতিতে রূপান্তরিত। 'ধর্ম' কথাটির অর্থরূপান্তর ঘটিয়াছে প্রচুর; কিন্তু বর্তমান বাংলার ধামরাই (ঢাকা জেলা), পাঁচথুপী, বাজাসন, নবাসন, উয়ারী প্রভৃতি স্থান-নাম যথাক্রমে প্রাচীন ধর্মরথ, পঞ্চস্তূপী, বজ্রাসন, নবাসন, উপকারিকা (=সুসজ্জিত অস্থায়ী মণ্ডপ) প্রভৃতি বৌদ্ধস্মৃতিবহ। 'নেড়ানেড়ী' কথাটিও ইসলামোত্তর বাংলায় প্রথমত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেরই বুঝাইত; আর বৈষ্ণবের 'ভেক' কথাটি এখন আমরা বিদ্রূপার্থে ব্যবহার করিলেও মূলত তাহা বৌদ্ধ 'ভিক্ষু' শব্দেরই ভ্রষ্ট রূপ। বাঙালীর পালিত, ধর, রক্ষিত, কর, ভূতি, গুই, দাম বা দাঁ, পান বা পাইন প্রভৃতি অন্ত্যনামও বোধহয় বৌদ্ধস্মৃতিবহ, যেমন চন্দ, চন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিবহ।

আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ে স্মার্ত ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই জয়জয়কার। লোক-স্তরে লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ সদাবহমান, সন্দেহ নাই; কিন্তু উচ্চ ও মধ্যকোটি স্তরে সুবিস্তৃত পৌরাণিক দেবায়তনের অসংখ্য দেবদেবীদেরই অপ্রতিহত প্রভাব। স্মৃতিশাসিত বর্ণসমাজ সেই প্রভাবকে আরও সংহত ও সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৈদিক যাগযজ্ঞের এবং ধ্যানকল্পনার কিছুটা প্রভাব যে নাই, এমন নয়, কিন্তু তাহা একান্তই কতকগুলি ব্রাহ্মণবংশে সীমাবদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিলীয়মান; তাহার সমস্ত সাধনপন্থাটাই গুহ্য এবং দেহযোগাশ্রয়ী। ব্রাহ্মণ্য শৈব এবং শাক্ত ধর্মও তান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও অভ্যাসাচরণ দ্বারা স্পৃষ্ট। বস্তুত, জ্যোতিষ-আগম-নিগম-তন্ত্রবিধৃত ধ্যান-ধারণা-কল্পনাই এই যুগের প্রধান মানসাশ্রয়। তিথি-গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করিয়া স্নানাহার, বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রোপলক্ষে তীর্থস্থান, হোম, যজ্ঞ, ব্রতাচরণ, এই সব তো ছিলই; তাহারই পাশে পাশে ছিল নানা ভয়-বিশ্বাসের লৌকিক দেব-দেবীর পূজা, প্রতীকের পূজা, ব্রতোৎসব, পার্বণ, নানাপ্রকারের যাত্রা উৎসব, ইত্যাদি। এক প্রান্তে এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের ধ্যান, আর-এক প্রান্তে গাছ-পাথর সাপ-কুমিরের ধ্যানে বিশ্বাস; এক প্রান্তে দেহকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে নিপীড়িত করিয়া একমাত্র আত্মার শক্তি ও মহিমা প্রচার, আর-এক প্রান্তে একান্ত দেহগত সাধনার জয়জয়কার। এক প্রান্তে বেদের অপৌরুষেয়ত্বে এবং অমোঘত্বে বিশ্বাস, আর-এক প্রান্তে বেদ বেদাঙ্গ একেবারে অগ্রাহ্য; এক প্রান্তে বেদ-স্মৃতি-পুরাণ, আর-এক প্রান্তে প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানবমনের ধ্যানকল্পনা। মাঝখানে বিচিত্র জীবনোপায় লইয়া বিচিত্রতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর। প্রত্যেকটি স্তরের অসংখ্য লোকের চিত্তে সদ্যোক্ত ধ্যান ও ধারণাসমূহের বিচিত্র জটিল লীলা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাষা-সাহিত্য : জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা

এক

প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস সাধারণত আমরা আরম্ভ করিয়া থাকি বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ লইয়া। উপাদানের অভাবে প্রাক্-বৈদিক কাল সম্বন্ধে আজও কিছু বলিবার উপায় নাই। কিন্তু বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, এমনকি ধর্মশাস্ত্র-ধর্মসূত্রে যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা প্রতিফলিত, বাংলাদেশ বহুদিন তাহার স্পর্শও পায় নাই। কিন্তু তাহারও আগে এদেশে সমাজবদ্ধ জনমানুষ বাস করিত: এবং তাহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের এবং শিক্ষাদীক্ষার একটা সংস্কারও ছিল, শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের একটা সংস্কৃতিও ছিল। এই সংস্কার ও সংস্কৃতিকে অনাগত কালের জন্য ধারণ করিয়া রাখে প্রত্যেক জন ও গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লিপিবদ্ধ ভাষা। কিন্তু সেই প্রাক্-আর্য নরনারীদের ভাষার লিপি এ পর্যন্ত আমাদের জানা নাই: কাজেই তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য আমাদের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছে নাই। তবে, তাঁহাদের শিল্প-সাহিত্য-নৃত্যগীতের, অর্থাৎ চলমান সংস্কৃতির চেহারা কিছুটা ধরিতে পারা সম্ভব আদিম কৌমসমাজের যেসব নরগোষ্ঠী আজও আমাদের মধ্যে বিচরমাণ তাঁহাদের জীবনচর্যায়।

প্রাক্-আর্য প্রাচ্য ভারতীয় নরনারীর ভাষা লইয়া ভাষাতাত্ত্বিকদের সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ আমরা জানি, বাংলার সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল (যতটুকু নির্ণয় করা যায়) অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা, এবং সেই ভাষার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা ছিল মন্‌খ্‌মের ভাষাপরিবারের সঙ্গে; কিছুটা আত্মীয়তা কোল-মুণ্ডা ভাষাপরিবারের সঙ্গেও ছিল। এই মুণ্ডা- মন্‌খ্‌মের ভাষাভিত্তির উপর নূতন পলি রচনা করিয়াছিল দ্রবিড় ভাষাপরিবারের স্রোত, বিশেষভাবে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে এবং কিছুটা মধ্য বাংলায়ও। পূর্ব ও উত্তর বাংলায় দ্রবিড় ভাষার পলি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। পশ্চিম ও মধ্য বাংলায়ও দ্রবিড় ভাষার প্রভাবের বিস্তৃতি ও গভীরতা কতটা ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। পূর্ব ও উত্তর বাংলার প্রাচীনতর মুণ্ডা- মন্‌খ্‌মের মূল ভাষার উপর তৃতীয় একটি ভাষাস্রোত আপন প্রবাহ মিশাইয়াছিল, সে ভাষা ভোটব্রহ্ম নরগোষ্ঠীর ভাষা, প্রাচীন কিরাতদের ভাষা। নানা নরগোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া নানা ভাষার এই জটিল সংমিশ্রণের সূচনা বাংলাদেশে আরম্ভ হইয়াছিল খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী আগে হইতেই।

বেদ-ব্রাহ্মণের আর্য ঋষিরা যে প্রাচ্য-ভারতকে খুব সুনজরে দেখিতেন না, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ প্রাচ্য নরনারীর ভাষা ছিল তাঁহাদের নিকট দুর্বোধ্য। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে প্রাচ্য ভারতে আর্যভাষার প্রসার ঘটিতে আরম্ভ করিল এবং বোধহয় কিছু কিছু আর্য সংস্কৃতিরও; তবে যতটুকু জানা যায়, এই আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি দীর্ঘমুণ্ড ঋগ্বেদীয় আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি নয়, হ্রস্বমুণ্ড অ্যালপীয়

আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি—গ্রিয়ার্সন যাঁহাদের বলিয়াছেন 'বহিরার্য'। এই অ্যালপীয় (বা অ্যালপো-দীনারীয়) আর্যরা ছিলেন অবৈদিক এবং যজ্ঞবিরোধী। অথর্ববেদের এবং পাণিনি-ব্যাকরণের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, প্রাচ্যভারতীয় ব্রাত্যদের ভাষা আর্যপরিবারের হইলেও সে ভাষা ঋগ্বেদীয় আর্যভাষা হইতে পৃথক এবং তাহার 'প্রাকৃত'-লক্ষণ সুস্পষ্ট। অনুমান করা চলে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের আর্য ভাষা উত্তরভারতীয় আর্যভাষা হইতে ছিল পৃথক, এবং তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু ছিল। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী পাণিনি সেইজন্যই তাঁহার ব্যাকরণে বিশেষভাবে প্রাচ্য 'সংস্কৃত' ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গীর বিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। প্রসংগত এ কথা বলা উচিত, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে গৌড় এবং গণপাঠে বঙ্গের উল্লেখ আছে। এ তথ্য সুস্পষ্ট যে, পাণিনি উদীচ্য বা উত্তরা-খণ্ডের ভাষাকেই আর্যভাষার মাপকাঠি বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রাচ্য ভাষার বিচারও সেই মানদণ্ডেই করিয়াছেন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণেও সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে, উদীচ্যখণ্ডের ভাষাই শুদ্ধ ও মার্জিততর। উত্তর- ও মধ্য -ভারতীয় আর্যভাষার সংগে প্রাচ্য ভারতের ভাষার পার্থক্য পতঞ্জলিরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা বিশেষ অর্থে কতকগুলি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, এবং 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার করা তাহাদের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; সংগে সংগে তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, এই উচ্চারণবৈশিষ্ট্য 'আসুর' বা অসুর নরগোষ্ঠীর। আমরা জানি 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার পরবর্তী মাগধী প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং আচার্য লেভি প্রমাণ করিয়াছেন, এই বৈশিষ্ট্য মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মের ভাষাপরিবারের। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পগ্রন্থে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে, (আর্যদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে) অসুরদের ভাষা ছিল 'র'- ও 'ল' কার -বহুল, অব্যক্ত, অস্পষ্ট। আগেই দেখিয়াছি শতপদব্রাহ্মণে প্রাচ্যভারতের লোকেদের বলা হইয়াছে 'আসুর্য' এবং পতঞ্জলি যখন 'র' স্থানে 'ল' বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন 'আসুর', তখন বুঝিতে আর দেরি হয় না যে, বাংলা ও প্রাচ্যখণ্ডের প্রাক-আর্য আদিভাষা ছিল মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মের পরিবারের ভাষা।

পাণিনি প্রাচ্যখণ্ডের বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামতের কথা বলিয়াছেন। এই-সব বৈয়াকরণিকদের মতামত যথেষ্ট শক্তি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন না করিলে পাণিনি তাহা উল্লেখ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সাহিত্য রচিত ও গ্রথিত না হইলে ব্যাকরণ রচিত হয় না, বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামতও গড়িয়া উঠে না। সুতরাং অনুমান করা চলে, প্রাচ্য অ-বৈদিক আর্যভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য রচিত ও গ্রথিত হইয়াছিল, ভাষার রীতিপদ্ধতি লইয়া আলোচনা-গবেষণাও হইয়াছিল।

প্রাচ্য প্রাকৃত ও উত্তর- ও মধ্য -ভারতীয় সংস্কৃতের স্রোত বাংলাদেশে সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল খ্রীষ্টীয় শতকের কিছু আগে হইতেই, বোধহয়, মৌর্য আমল হইতে—গোড়ার দিকে বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলেও। এই স্রোতের বাহক হইলেন মধ্যভারতীয় নানাধর্মী যতি-সন্ন্যাসীরা, বণিক-সার্থবাহরা, সৈনিক-রাজপুরুষেরা। প্রাক-আর্য ও অনার্য নরনারীরা ক্রমশ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আশ্রয়লাভের সংগে সংগে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইলেন; উত্তর-বাংলা (এবং সম্ভবত পশ্চিম-বাংলাও) মৌর্য-সাম্রাজ্যান্তর্গত হওয়ার সংগে সংগে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার প্রতিপত্তি বিস্তার আরও সহজ হইয়া গেল। মহাস্থানের ব্রাহ্মী লিপিখণ্ডই সমসাময়িক বাংলায়

প্রচলিত আর্যভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান। বলা বাহুল্য, এই ভাষা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। এইভাবে বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর্যভাষা অনার্য ও প্রাক্-আর্য ভাষাকে গ্রাস করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে ক্রিয়া আজও চলিতেছে এবং যতদিন মুণ্ডা-কোল-মন্‌খ্মের, দ্রবিড় ও ভোট-ব্রহ্ম ভাষা ও বুলিগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটিবে ততদিন চলিতেই থাকিবে।

দুই

মহাস্থানলিপির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলায় গুপ্তাধিকার বিস্তৃতির কাল পর্যন্ত আর্যভাষার রূপ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, এবং সে ভাষার জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার কিরূপ হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। অনুমান করা চলে, আর্যভাষার প্রাচ্য-মাগধী প্রাকৃত রূপই ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল; এ কথাও বোধহয় সত্য যে, পোশাকী ভাষা হিসাবে অর্থাৎ পণ্ডিতসমাজে এবং রাজকীয় ক্রিয়াকর্মে সেই ভাষা স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে যে কয়টি গুপ্তবংশীয় রাজকীয় পট্টোলী আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার একটিরও ভাষা প্রাচ্য-প্রাকৃত নয়, মধ্যভারতীয় বিশুদ্ধ সংস্কৃত। চতুর্থ শতকের চন্দ্রবর্মার লিপির ভাষাও সংস্কৃত। লক্ষণীয় এই যে, এই প্রত্যেকটি লিপিই গদ্যে রচিত এবং সাহিত্যরসের কোন আভাসও এই রচনাগুলিতে নাই। বস্তুত, সপ্তমশতকীয় লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী বা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর পট্টোলীর আগে সমসাময়িক মধ্য-ভারতীয় অলংকারবহুল কাব্যরীতির কোন পরিচয়ই বাংলা-দেশে পাইতেছি না। মনে হয়, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগে বাঙালী পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণধারার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারেন নাই। চেষ্টাটা আরম্ভ হইয়াছিল আরও কয়েক শতাব্দী আগে হইতেই, এবং বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ শিক্ষায়তন হইয়া গড়িয়াও উঠিতেছিল। নহিলে পঞ্চম শতকে তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া অধ্যয়ন ও পুঁথি নকল করিয়া চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাটাইতেন না। সপ্তম শতকে যখন য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন বৌদ্ধ, নির্গ্রন্থ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাদীক্ষার প্রসার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এইসব জনপদের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কজঙ্গলে তখন ছয়-সাতটি বৌদ্ধ বিহারে তিন শতের উপর বৌদ্ধ শ্রমণ; পুণ্ড্রবর্ধনের বিশটি বিহারে শ্রমণসংখ্যা তিন হাজারের উপর, সম-তটের ত্রিশটি বিহারে শ্রমণসংখ্যা দুই হাজারের উপর, কর্ণসুবর্ণের দশটি বিহারে দুই হাজারের উপর এবং তাম্রলিপ্তির দশটি বিহারেও প্রায় একই সংখ্যক শ্রমণের বাস। পুণ্ড্রবর্ধনের পো-সি-পো (মহাস্থানের সন্নিকটে ভাসু বিহার?) বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা (লো-টো-মো-চি) বিহার যে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। নালন্দা মহাবিহারের সঙ্গেও ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় বাংলার জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এবং বাংলার শিক্ষার্থী, আচার্য ও রাজবংশ নালন্দা মহাবিহারের সংবর্ধনের জন্য

যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা তুচ্ছ করিবার মতো নয়। এই মহাবিহারের মহাচার্য বিশ্রুতকীর্তি শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের অন্যতম সন্তান, এবং তিনিই ছিলেন য়ুয়ান-চোয়াঙের গুরু। শীলভদ্র ভারতের নানাস্থানে জ্ঞানান্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে নালন্দায় আসিয়া স্থিতিলাভ করেন, এবং আচার্য ধর্মপালকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লন। দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাধারায় তাঁহার গভীর জ্ঞানলাভ ঘটে, এবং তাঁহার জ্ঞান ও জীবনচর্যার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। কালক্রমে শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের মহাচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন; মহাবিহারে তখন প্রায় ১০,০০০ শ্রমণের বাস। তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শীলভদ্রই সমস্ত শাস্ত্র ও সূত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিনীত শ্রদ্ধায় মহাবিহারের সকল শ্রমণেরা তাঁহাকে 'সদ্ধর্মের ভাণ্ডার' বলিয়া সম্ভাষণ করিত। শীলভদ্রের নিকট য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; শীলভদ্র-রচিত অন্তত একটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি; সে গ্রন্থটি হইতেছে আর্য-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান; এই গ্রন্থটি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

সমসাময়িক তাম্রলিপ্তির শিক্ষাদীক্ষার সংবাদ আরও একাধিক চীনা শ্রমণের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। তা চেং-তেঙ্ নামে এক চীনা শ্রমণ বারো বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্মে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাও-লিন নামে আর-একজন চীনা শ্রমণ তিন বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং সর্বাস্তিবাদ-নিকায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্তি আসিয়াছিলেন ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে; তিনি এই বিহারে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা এবং শব্দবিদ্যার চর্চা করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুন গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অন্য এক চীনা পরিব্রাজক সেং-চি বলিতেছেন, সমতটের তদানীন্তন রাজা প্রতিদিন মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করিতেন।

বৌদ্ধ বিহার-সংঘারামগুলি ছিল বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র, এবং য়ুয়ান-চোয়াঙ্ এবং অন্যান্য চীনা সাক্ষ্যেই সপ্রমাণ যে, এই কেন্দ্রগুলিতে শুধু যে বৌদ্ধধর্মের চর্চা হইত এবং বৌদ্ধশাস্ত্রই পঠিত হইত তাহা নয়, ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সংগীত ও চিত্রকলা, মহাযানশাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকায়বাদ, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যে অসংখ্য দেবমন্দিরের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ-আচার্য-উপাধ্যায় ইত্যাদিও কম ছিলেন না; এবং তাঁহারা যে শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রেরই চর্চা করিতেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই। নানা পার্থিব, দৈনন্দিনসমস্যাগত জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষার চর্চাও নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাহাই হউক, এ তথ্য সুস্পষ্ট যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের মধ্যে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা বাংলাদেশে প্রোথিতমূল হয় এবং শতাব্দীকালের মধ্যেই ফসল ফলাইতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতকের লিপিগুলির অলংকারময় কাব্যরীতিই তাহার প্রমাণ। এই কাব্যরীতি একান্তই মধ্য-ভারতীয় রচনারীতি ও আদর্শের প্রেরণা ও অনুকরণে সৃষ্ট। কিন্তু এই লিপিগুলি ছাড়া কাব্যসাহিত্য চর্চার আর কোন প্রমাণ আমাদের সম্মুখে অনুপস্থিত।

জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাদিক সম্বন্ধে অনুশীলনের কিছু কিছু পরিচয় এ পর্বে বিদ্যমান। ব্যাকরণের চর্চায় বাংলাদেশ অতি প্রাচীন কালেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; পাণিনির সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। সপ্তম শতকে ই-ৎসিঙ্‌ যেসব বিদ্যা অনুশীলন করিবার জন্য তাম্রলিপ্ত আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শব্দবিদ্যা অন্যতম। প্রাচীন বাংলার এই ব্যাকরণপ্রসিদ্ধি যাঁহাদের জ্ঞান ও খ্যাতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের মধ্যে চান্দ্র-ব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা চন্দ্রগোমী অন্যতম। চান্দ্র-ব্যাকরণ ও তাঁহার টীকা চন্দ্রগোমীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই ব্যাকরণ মুখ্যত পাণিনি-অনুসারী, এবং এক সময়ে কাশ্মীর-নেপাল-তিব্বত-সিংহলে ইহার প্রচলনও ছিল প্রচুর। পাগ্‌-সাম্‌-জোন-জাং-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রগোমী ছিলেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য-রীতিপদ্ধতির বিরোধী। ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়-গ্রন্থে জনৈক বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্যের নাম করিয়াছেন এবং তিনি যে মহাভাষ্য-মতবিরোধী ছিলেন এরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছেন; কহ্লনও তাঁহার রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে চন্দ্রাচার্য ও তাঁহার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন চন্দ্রগোমী ও চন্দ্রাচার্য একই ব্যক্তি। মোটামুটি বলা চলে, জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকা-গ্রন্থের (পাণিনি-টীকা) আগেই চান্দ্র-ব্যাকরণ রচিত ও সুপ্রচলিত হইয়াছিল; কারণ এই টীকায় চন্দ্রগোমীর মূল ৩৫টি সূত্র বিনা স্বীকৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ৩৫টি সূত্র পাণিনি-ব্যাকরণে কোথাও নাই। চন্দ্রগোমী সপ্তম শতক বা সপ্তম শতকের আগেই কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। চন্দ্রগোমী ছিলেন বৌদ্ধ, তাঁহার জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে; কিন্তু পাগ-সাম-জোন্‌-জাং-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, তিনি পরবর্তী জীবনে কোন কারণে বরেন্দ্রী হইতে নির্বাসিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে চন্দ্রগোমী যে শুধু বৈয়াকরণিক ছিলেন, তাহাই নয়। তর্কবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং ন্যায়সিদ্ধলোক নামে তর্কশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান সাধনাগত ৩৬টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন, তারা এবং মঞ্জুশ্রীর উপর কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, লোকানন্দ নামে একটি নাটক এবং শিষ্যের নিকট গুরুর পত্র হিসাবে রচিত শিষ্যলেখধর্ম নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে চন্দ্রগোমী নালন্দা-মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্মপিটক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং নানা কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য অশোক তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদান করেন, এবং তিনি তারা ও অবলোকিতেশ্বরের পরম ভক্ত হন। চন্দ্রগোমী যোগাচারী ছিলেন এবং যোগাচার দর্শন লইয়া বিচারালোচনা করিতেন।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমী, তিব্বতী ঐতিহ্যের নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী, এবং একই ঐতিহ্যের বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক চন্দ্রগোমী কি একই ব্যক্তি? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী এক ব্যক্তি হইলেও বজ্রযানী চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে।

এই পর্বে ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দর্শনের আলোচনায়ও বাংলাদেশের কিছু প্রসিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। গৌড়পাদকারিকা নামে সুপরিচিত একটি আগম-শাস্ত্র-

গ্রন্থ এই যুগে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল, এ তথ্য নিঃসংশয়; তবে ইহার রচয়িতা কে ছিলেন তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে নানা মতামত বিদ্যমান। গ্রন্থকারের নাম বা উপাধি ছিল গৌড়পাদ, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে; তাঁহার বাড়ি ছিল গৌড়দেশে, এই অনুমানেও সংশয় কিছু নাই। গৌড়পাদ ছিলেন শুকের শিষ্য এবং আচার্য শংকরের গুরুর গুরু। শংকরাচার্যের শিষ্য সুরেশ্বর তাঁহার নৈষ্কর্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থে গৌড়পাদকারিকা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শংকরের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে গৌড়পাদের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কারিকার উদ্ধৃতি আছে; গৌড়পাদ-কারিকার দার্শনিক মতবাদ প্রাক্-শংকর বৈদান্তিক মত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদের সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ ও স্বাংগীকরণ। শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি পরবর্তী কালের মাধ্যমিক মতবাদী একাধিক বৌদ্ধ আচার্য গৌড়পাদের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌড়পাদ আরও দুইটি কারিকা রচনা করিয়াছিলেন, একটির নাম সাংখ্য-কারিকা, আর-একটির উত্তরগীতা। অল্-বেরুণী জনৈক গৌড়-সন্ন্যাসী রচিত এক সাংখ্য-কারিকার কথা জানিতেন; গৌড়পাদের গ্রন্থ এবং অল্-বেরুণী-উদ্দিষ্ট গ্রন্থ বোধহয় একই গ্রন্থ।

আর-একটি বিদ্যায়ও বাংলাদেশের কিছু প্রসিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; সে বিদ্যার নাম হস্তী-আয়ুর্বেদবিদ্যা। কৌটিল্য ও গ্রীক ঐতিহাসিকবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুয়ান-চোয়াঙ পর্যন্ত সকলেই প্রাচ্যদেশকে হস্তীর লীলাভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন: কৌটিল্য তো হস্তী-চিকিৎসকদের কথাও বলিয়াছেন। কাজেই এদেশে হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে এক বিশেষ শাস্ত্র গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। চম্পার রাজা রোমপাদের সঙ্গে এক ঋষি পালকাপ্য বা পালকাপ্যের সুদীর্ঘ বাক্যালাপ হইয়াছিল হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে। গ্রন্থাকারে গ্রথিত এই সুদীর্ঘ কথোপকথনই হস্ত্যায়ুর্বেদ গ্রন্থ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। গ্রন্থটি যে অন্তত দশম-একাদশ শতকের আগেই রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ একাধিক। অগ্নিপুরাণের গজ-চিকিৎসা অধ্যায় পালকাপ্য-রোমপাদের কথোপকথনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল, এবং অগ্নিপুরাণের শাস্ত্রীয় অংশ দশম শতকের আগেই রচিত হইয়াছিল। একাদশ শতকে ক্ষীরস্বামী-রচিত অমরকোষ-টীকায় একাধিক-বার পালকাপ্যের উদ্ধৃতি আছে। যাহাই হউক, এ তথ্য প্রায় নিঃসংশয় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই হস্তী-চিকিৎসার একটি ঐতিহ্য প্রাচ্যদেশে বর্তমান ছিল, কিছু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পালকাপ্যের হস্তী-আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ যে ভাবে ও রূপে আমরা পাইয়াছি তাহা সুপ্রাচীন কালের নয়; বর্তমান গ্রন্থটি খুব সম্ভব খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে, ব্রহ্মপুত্র তীরে কোথাও সংকলিত হইয়াছিল—প্রাচীনতর গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিয়া।

এ পর্যন্ত যে ক'টি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল তাহার প্রত্যেকটিই জ্ঞানবিজ্ঞান-গত। এইগুলি ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ এই পর্বে রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যে দেশে এই পর্বে চান্দ্র-ব্যাকরণ ও গৌড়-পাদকারিকার মতো গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সে দেশে সেই পর্বে অন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়া ভূমি ও পশ্চাৎপট রচনা করে নাই, এমন হইতে পারে না। চন্দ্রগোমী তো কাব্য ও নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-রচনার একটা ধারাও প্রবহমান ছিল সন্দেহ নাই।

সাহিত্যরচনার একটি বেগবান্ প্রবাহ যে বাংলাদেশের পলিভূমির উপর দিয়া

বাহিয়া যাইত তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় এই পর্বে গোড়ী রীতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসিদ্ধির মধ্যে।' সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হর্ষচরিত-গ্রন্থের মুখবন্ধে বাণভট্ট সমসাময়িক ভারতবর্ষে প্রচলিত সাহিত্যরচনারীতি সম্বন্ধে বলিতেছেন, উত্তর-ভারতের রচনারীতিতে শ্লেষই (অর্থাৎ শব্দব্যবহারের চাতুর্য) সমধিক, পশ্চিমে কেবল অর্থগৌরব; দক্ষিণে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের প্রাবল্য (অর্থাৎ, কবিকল্পনার অবাধ সঞ্চরণ) এবং গোড়জনদের মধ্যে অক্ষর-ডম্বর (অর্থাৎ, মাত্রার আড়ম্বর)। গৌড়ীয় কবিদের নিন্দাচ্ছলে বাণভট্ট অক্ষরাড়ম্বরের কথা বলিয়াছেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই। অক্ষরাড়ম্বরের অর্থ হইতেছে শব্দপ্রয়োগগত ধ্বনিসমারোহ; এই সাহিত্যিক গুণটিকেই বলা হইয়াছে বিকটাক্ষরবন্ধ (বিকট=উদারতা লক্ষণযুক্ত)।

সপ্তম-অষ্টম শতকে গৌড-বঙ্গে যে একটি বিশেষ কাব্যরচনারীতির প্রবর্তনা হইয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে সেই রীতি সুপরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ আলংকারিক ভামহ ও দণ্ডীর (সপ্তম-অষ্টম শতক) সাক্ষ্য। এই দুইজনই গোড়ীরীতির কথা বলিতেছেন বৈদর্ভী রীতির সঙ্গে সঙ্গে। দণ্ডীর পক্ষপাত ছিল বৈদর্ভী রীতির প্রতি; তাঁহার মতে এই মানদণ্ডের বিচারে গৌড়ী রীতি 'বিপর্যয়'-লক্ষণাক্রান্ত। বৈদর্ভী বিশুদ্ধ মার্গপদ্ধতির অনুসারী, গৌড়ী একটু অলংকার- ও আড়ম্বর -বহুল, পল্লবিত। গৌড়ী রীতির প্রধান লক্ষণই হইতেছে 'অর্থ-ডম্বর' এবং 'অলংকার-ডম্বর', অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং বন্ধগৌরব বা রচনার গাঢ়তা। ভামহ কিন্তু বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন; বরং সুপ্রযোজিত গৌড়ী রীতির প্রতি তাঁহার কিছুটা পক্ষপাত সুস্পষ্ট। বৈদর্ভী রীতির প্রধন গুণ ছিল শ্লেষ, প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্য ইত্যাদি।

বাণভট্ট, ভামহ এবং দণ্ডীর সাক্ষ্যে এ তথ্য পরিষ্কার যে, গৌড়জনেরা সপ্তম শতকের আগেই সুস্পষ্টলক্ষণাক্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই রীতি সর্বভারতগ্রাহ্য বৈদর্ভী রীতিমানের পাশেই আপন আসন এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, বাণভট্ট, ভামহ বা দণ্ডী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দশম-একাদশ শতকে গৌড়ী রীতির যখন পূর্ণবিকশিত অবস্থা, তখন রাজশেখর (দশম শতক) তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। বোধহয়, সেই জন্যই কর্পূরমঞ্জরী-গ্রন্থে বিভিন্ন রীতির তালিকা দিতে গিয়া তিনি গৌড়ী রীতির উল্লেখই করেন নাই, তাহার স্থানে মাগধী রীতির কথা বলিয়াছেন। মাগধী রীতিকে যথার্থত কোন বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র রীতি রাজশেখর ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। একাদশ শতকে ভোজদেব গৌড়ী ও মাগধী, এই দুই রীতির কথাই বলিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু মাগধীকে বলিয়াছেন খণ্ডরীতি, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, অস্বতন্ত্র, অপ্রস্ফুটিত রীতি। নাটকেও বোধহয় অন্যান্য প্রাচ্যদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ একটি বিশিষ্ট রূপ ও রীতির প্রচলন করিয়াছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে চারিটি বিশিষ্ট নাটকীয় রীতির উল্লেখ আছে; অবন্তী, পঞ্চাল-মধ্যমা, দাক্ষিণাত্যা এবং ওড্র-মাগধী। ওড্র, বঙ্গ, পৌণ্ড্র এবং নেপালে ওড্র-মাগধী রীতি প্রচলিত ছিল।

এই গৌড়ী রীতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক হইতে গভীর অর্থবহ। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-কথিত 'গৌড়তন্ত্র' কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতেই গৌড়জনেরা নিজেদের

স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করেন, ঈশানবর্মার হড়াহালিপি তাহার প্রথম প্রমাণ। শশাঙ্কে আসিয়া এই স্বাতন্ত্র্যের ধারণা একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই গৌড়তন্ত্র রূপ লাভ করিল গৌড়ীরীতিতে—সর্বভারতীয় বৈদর্ভী রীতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির উদ্ভবে ও বিকাশে। সন্দেহ নাই, এই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল গৌড়জনের নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী।

তিন

পালবংশ ও পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এবং তাহার দুই-এক শতাব্দী আগে হইতেই বাংলাদেশে সংস্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা পরম উৎসাহে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে কিংবা ভাস্করবর্মার নিধনপুর-লিপিতে যে অলংকৃত কাব্যরীতির সূচনা দেখা গিয়াছিল সপ্তম শতকে, পালবংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই রীতিরই পরিপূর্ণ বিকাশ ধরা পড়িল। দশম-একাদশ শতকের অগণিত প্রশস্তিলিপিমালায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা ও রচনারীতির যে সাক্ষ্য উপস্থিত তাহা মধ্য-ভারতীয় প্রশস্তিকাব্যরীতির ধারানুযায়ী হইলেও একেবারে উপেক্ষা করিবার মতো নয়। তাহা ছাড়া, এই লিপিগুলিতে সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদীক্ষার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাসের দিক হইতে তাহা মূল্যহীন নয়। এই লিপিগুলি এবং চতুর্ভুজের হরিচরিত-কাব্য হইতে জানা যায়, বাংলাদেশে যে সকল বিদ্যার চর্চা হইত, বেদ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি সমস্তই তাহার অন্তর্গত ছিল। চারি বেদেরই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, তবে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখার প্রসারই ছিল বেশি। এইসব বিচিত্র বিদ্যার চর্চা যে শুধু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জন সমাজেই আবদ্ধ ছিল তাহাই নয়: মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও এইসব শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। এই বিদ্যানুশীলনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কী কী ছিল, পাঠক্রম কী ছিল, তাহার বিবরণ কিছু পাইতেছি না; তবে, অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ক্ষুদ্র-বৃহৎ চতুষ্পাঠী গড়িয়া তুলিতেন এবং সাধ্যানুযায়ী বিদ্যার্থী-সংখ্যা গ্রহণ করিতেন। একজন আচার্যই যে সমস্ত বিদ্যার অধিকারী হইতেন এমন নয়; বিদ্যার্থীরা এক বা একাধিক শাস্ত্রে একজনের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্য শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য অন্য বিশেষজ্ঞ আচার্যের দুয়ারে উপস্থিত হইতেন। প্রয়োজন হইলে বিদ্যা ও শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য বিদ্যার্থীরা প্রবাস-জীবনও যাপন করিতেন। ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশ-গ্রন্থের সাক্ষ্যে মনে হয়, বাঙালী বিদ্যার্থীরা কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য, এবং তর্ক, মীমাংসা, পাতঞ্জল-ভাষ্য প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন। বাঙালী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ আচার্যরাও যে আমন্ত্রিত হইয়া বাংলার বাহিরে নানাস্থানে যাইতেন বিদ্যাদান ও ধর্মপ্রচারোদ্দেশে, তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাঁহারা করিতেন, রাজা-মহারাজ ও সামন্ত-মহাসামন্তরা, সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য অর্থদান ভূমিদান

ইত্যাদি করিতেন, পণ্ডিত, কবি, আচার্য প্রভৃতিদের মাঝে মাঝে তাঁহারা পুরস্কৃতও করিতেন, সে সাক্ষ্যও বিদ্যমান।

এই পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ৮০০—১১০০র মধ্যে এবং তাহার পরেও বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাংলাদেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ—এই তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল। শিল্পে ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও বিচারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় সকলেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। প্রাকৃতের চর্চা বাংলাদেশে বড় একটা হইত না; অন্তত বাংলাদেশে প্রাকৃতে সাহিত্যরচনার কোন ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; এ দেশের মহাযানী-বজ্রযানী প্রভৃতি বৌদ্ধরাও যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহাও হয় শুদ্ধ সংস্কৃত না হয় প্রাকৃতাশ্রয়ী মিশ্র সংস্কৃত। দশম শতকে গৌড়জনের সাহিত্যরুচির পরিচয় দিতে গিয়া সেইজন্যই কাব্যমীমাংসার লেখক রাজশেখর বাঙালীর কুণ্ঠিত প্রাকৃত উচ্চারণ লইয়া একটু বিদ্রূপই করিয়াছেন।

যাহা হউক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া এবং প্রাকৃতের চেয়ে অনেক বেশি প্রচলিত ছিল পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ, যে ভাষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ছিল সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া, এবং মহারাষ্ট্র ও সিন্ধুদেশেও। বাংলাদেশের সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা এবং ব্রাহ্মণ্য কবিরাও কেহ কেহ শৌরসেনী অপভ্রংশে কিছু কিছু কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি সাধকেরা এই ভাষাতেই তাঁহাদের দোহাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, আর পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এই শৌরসেনী অপভ্রংশেই তাঁহার কীর্তিলতা কাব্য রচনা করেন।

এই পর্বে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপ, যে রূপ ক্রমশ প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হইতেছিল। এই মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় একটা পার্থক্য কিছু ছিল না; বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাদের ধর্মের তত্ত্বকথা লোকায়ত ভাষায় জনসাধারণের চিত্তদুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা, এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা, এই দুই ভাষাই বেশি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মাগধী অপভ্রংশ যখন প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল তখন সৃজ্যমান এই নূতন ভাষাকেও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা সানন্দে গ্রহণ করিলেন। প্রাচীন বাংলার চর্যাগীতিগুলিই এই নূতন সৃজ্যমান ভাষার একমাত্র পরিচয়। কিন্তু, এই ভাষা তখনও সূক্ষ্ম ও গভীর ভাব প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিতে পারে নাই; ধর্ম ও তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র ইহার বিস্তার ও গভীরতা। বস্তুত, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশে শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং নূতন বাংলা ভাষা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে মাত্র। এ পর্বে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় এবং সেই কারণেই এই জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার শিক্ষিত, পণ্ডিত ও উচ্চকোটি সমাজেই আবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চা এবং বিশেষ-ভাবে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য চর্চার প্রাবল্য এর আগের পর্বেই দেখা দিয়াছিল, নহিলে গৌড়ী রীতির উদ্ভব এবং বিকাশই সম্ভব হইত না। এই পর্বে তাহা আরও সমৃদ্ধি, আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নতুবা এই পর্বের অগণিত বাঙালী কবির পক্ষে এত প্রকীর্ণ শ্লোক ও কাব্য রচনা সম্ভব হইত না। এই অনুমানও বোধহয়

সংগত যে, পণ্ডিতসমাজের বাহিরে একটি বৃহত্তর সাধারণ সংস্কৃত-শিক্ষিত সমাজও ছিল যাহার লোকেরা এইসব সংস্কৃত শ্লোক ও কাব্য পড়িয়া তাহাদের রস গ্রহণ করিতে পারিত। এই হিসাবে কাব্য ও নাটকের সামাজিক বিস্তার বেশি ছিল, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত এখন আর শুধু কোনপ্রকারে নিজকে ব্যক্ত করিবার ভাষামাত্র নয়; এই পর্বে তাহা মানসজীবনের সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবকল্পনা প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু নানা বিদ্যা ও শাস্ত্রে যে পরিমাণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-অনুশীলনের সংবাদ লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে পাইতেছি, সেই অনুপাতে গ্রন্থ-রচনা ও গ্রন্থ-রচয়িতাদের সংবাদ—বৌদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থের ছাড়া—কমই পাওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন বাংলায় বেদচর্চা যে খুব বেশি হইত, এমন নয়, তবে উচ্চ পণ্ডিতসমাজে কিছু কিছু নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে এই পর্বে মাত্র একখানা পুঁথির খবর পাইতেছি। কেশব মিশ্রের ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট গ্রন্থের উপর প্রকাশ নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন নারায়ণ নামে জনৈক বেদজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি ছিলেন উত্তর-রাঢ়ের অধিবাসী এবং দেবপালের সমসাময়িক।

গৌড়পাদ বা গৌড়াচার্যের পর অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্রীধর ভট্ট। ন্যায়কন্দলী ছাড়া শ্রীধর অদ্বয়সিদ্ধি, তত্ত্বপ্রবোধ, তত্ত্বসংবাদিনী এবং সংগ্রহটীকা নামে অন্তত আরও চারখানি বেদান্ত ও মীমাংসা বিষয়ের পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের একটিও আজ বাঁচিয়া নাই। প্রশস্তপাদের পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ নামে বৈশেষিক সূত্রের যে ভাষ্য আছে ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থ তাহারই টীকা। শ্রীধর ভট্টই বোধহয় সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে ন্যায়বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা দান করেন, এবং সেই হিসাবেই ন্যায়কন্দলীর সবিশেষ মূল্য। ন্যায়কন্দলী বাংলাদেশে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ এই গ্রন্থের একটি টীকাও বাংলাদেশে রচিত হয় নাই। যে দুইটি মূল্যবান টীকার কথা আমরা জানি তাহার একটির রচয়িতা মৈথিলী পণ্ডিত পদ্মনাভ এবং আর-একটির পশ্চিম-ভারতীয় জৈনাচার্য রাজশেখর। শ্রীধর ভট্টের জন্ম দক্ষিণ-রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে, এবং ন্যায়-কন্দলী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ৯১৩ বা ৯১০ শকে।

শ্রীধর ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন লক্ষণাবলী, কিরণাবলী (দুইটিই প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের টীকা), কুসুমাঞ্জলি এবং আত্মতত্ত্ববিবেক-গ্রন্থের রচয়িতা উদয়ন। উদয়ন তাঁহার রচনার এক স্থানে বলিয়াছেন, গৌড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞানবিরহিত ছিলেন। এই গৌড়মীমাংসক বলিতে তিনি কি শ্রীধর ভট্টকে বুঝাইতেছেন, না গৌড়ীয় মীমাংসা-শাস্ত্রজ্ঞ সকল পণ্ডিতকেই বুঝাইতেছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। উদয়ন বাঙালী হইলে এই উক্তি করিতেন কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য এই, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে বাঙালী গঙ্গেশ-উপাধ্যায়ও গৌড়মীমাংসক সম্বন্ধে একই উক্তি করিয়াছেন।

বেদান্ত দর্শন-চর্চা বাংলাদেশে বোধহয় খুব বেশি ছিল না; ন্যায়-বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনের আদরই ছিল বেশি। গৌড়নিবাসী এক অভিনন্দ নামীয় লেখকের যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ নামে একটি গ্রন্থের সংবাদ আমরা জানি। অভিনন্দ ন্যায়শাস্ত্র এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

এই পর্বে ব্যাকরণ-রচনায় চন্দ্রগোমীর ধারা রক্ষা করিয়াছেন দুই বৌদ্ধ

বৈয়াকরণিক মৈত্রেয়-রক্ষিত এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধি। জিনেন্দ্রবুদ্ধি 'বোধিসত্ত্ব-দেশীয়াচার্য' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তিনি বিবরণ-পঞ্জিকা (বা 'ন্যাস' নামে পরিচিত) নামে কাশিকার উপর একটি সুবিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়-রক্ষিত জিনেন্দ্রবুদ্ধির বিবরণ-পঞ্জিকার উপর তন্ত্রপ্রদীপ নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভীমসেন-রচিত ধাতুপাঠ অবলম্বন করিয়া ধাতুপ্রদীপ নামে আর-একটি ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। টীকাসর্বস্ব রচয়িতা সর্বানন্দ, শরণদেব, উজ্জ্বলদত্ত, বৃহস্পতি রায়মুকুট, ভট্টোজি দীক্ষিত প্রভৃতি অনেক ব্যাকরণ- ও অভিধান -কার মৈত্রেয়-রক্ষিতের তন্ত্রপ্রদীপ-গ্রন্থ নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন।

সুভূতিচন্দ্র নামে একজন বৌদ্ধ অভিধানকার কামধেনু নামে অমরকোষের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন; গ্রন্থটি আজ বিলুপ্ত, কিন্তু তাহার তিব্বতী অনুবাদের কথা ত্যাঙ্গুরে তালিকাবদ্ধ করা হইয়াছে।

এ পর্বের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় রোগনিদানবিদদের অন্যতম চক্রপাণি-দত্ত নিঃসন্দেহে বাঙালী. তাঁহার পিতা নারায়ণ জনৈক গৌড়রাজের কর্মচারী ছিলেন। মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যমতে ইঁহাদের বাড়ি ছিল বীরভূমে। চক্রপাণির এক ভ্রাতা ভানুও ছিলেন রোগনিদানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক। চক্রপাণি-দত্ত চরকের যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার নাম আয়ুর্বেদ-দীপিকা বা চরক-তাৎপর্য-দীপিকা, এবং তদ্রচিত সুশ্রুত-টীকার নাম ভানুমতী। তাঁহার অন্য দুইটি ক্ষুদ্রতর গ্রন্থের নাম যথাক্রমে শব্দচন্দ্রিকা ও দ্রব্যগুণসংগ্রহ। শব্দচন্দ্রিকা ভেষজ গাছ-গাছড়া এবং আকর দ্রব্যাদির তালিকা, এবং দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ পথ্যাদি-নিরূপণ সংক্রান্ত পুঁথি। কিন্তু চক্রপাণির শ্রেষ্ঠ মৌলিকগ্রন্থ হইতেছে চিকিৎসা-সংগ্রহ; এই গ্রন্থ রুগবিনিশ্চয়-প্রণেতা মাধবের এবং সিদ্ধযোগ-প্রণেতা বৃন্দের আলোচনা-গবেষণার ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই: কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিকিৎসা-সংগ্রহ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ, এবং ধাতবদ্রব্য-প্রকরণে চক্রপাণি যে মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়ে আরও দুইজন নিদানশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের কথা জানা যায়. একজন সুরেশ্বর বা সুরপাল, আর-একজন বঙ্গসেন। সুরেশ্বরের শব্দপ্রদীপ এবং বৃক্ষায়ুর্বেদ দুই-ই ভেষজ গাছ-গাছড়ার তালিকা ও গুণাগুণ বিচার; কিন্তু তাঁহার লোহপদ্ধতি বা লোহসর্বস্ব লোহার ভেষজ ব্যবহার এবং লৌহঘটিত ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বঙ্গসেনের রচিত গ্রন্থের নাম চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ। বঙ্গসেন সুশ্রুতপন্থী, কিন্তু মাধব-রচিত রুগবিনিশ্চয় গ্রন্থের প্রতি তাঁহার ঋণ সামান্য নয়।

লিপিসাক্ষ্যে মনে হয়, মীমাংসার চর্চা বাংলাদেশে হইত না এমন নয়; কিন্তু মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র লইয়া এই পর্বে কেহ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিছু রচনা করিয়াছিলেন. এমন নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। জিতেন্দ্রিয় ও বালক নামে দুইজন ধর্মশাস্ত্ররচয়িতার উল্লেখ ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মৃতিকারেরা। সেইজন্য মনে হয়, ইঁহারা দুইজনই ছিলেন বাঙালী, এবং একাদশ শতকের কোন সময়ে ইঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বালক ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকিবেন, কারণ

জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন তিনজনেই এই দুই বিষয়ে বালকের মতামত সমালোচনা করিয়াছেন।

যোগ্লোক নামে ইঁহাদের চেয়েও প্রাচীন একজন স্মৃতিকারের মতামত আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি লইয়া বাঙালী স্মৃতিকারদের যে উৎসাহ পরবর্তী সেন-বর্মণপর্বে দেখা যাইবে, সে উৎসাহের সূত্রপাত এই পর্বে এখনও হয় নাই।

এই পর্বে একটিমাত্র জ্যোতিষ-গ্রন্থের খবর আমরা জানি; গ্রন্থটি জনৈক কল্যাণ-বর্মা রচিত সারাবলী। মল্লিনাথ (শিশুপালবধ টীকা), উৎপল এবং অল্-বেরুণী এই তিনজনেই সারাবলী হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন।

এই পর্বের প্রশস্তিলিপিমালায় সমসাময়িক বাংলার কাব্যসাহিত্যের এবং কাব্য-চর্চার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব প্রশস্তি উপমায়-রূপকে, অনুপ্রাসে-অলংকারে সর্বভারতীয় কাব্যৈতিহ্যের অনুগামী। কোন মৌলিক কল্পনা, রীতি বা ভঙ্গি এই প্রশস্তিরচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে গতানুগতিক ধারার কাব্যরচনাশক্তিতে সমসাময়িক বাঙালী কিছু হীন ছিল না। ভট্ট গুরবমিশ্রের প্রশস্তি, ভোজবর্মার বেলাবপ্রশস্তি, সমস্তই এ যুগের কাব্যচর্চার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপিটির রচয়িতা কবি মনোরথ; এই লিপিটিতে সেকালের নৌযুদ্ধের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে।

সংকলয়িতা শার্ঙ্গধর তাঁহার শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি (১৩৬৩ খ্রী) নামক গ্রন্থে গৌড়-অভিনন্দ নামে এক কবির দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন; এই দুইটির একটি শ্লোক শ্রীধরদাস তাঁহার সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেও উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধরের মতে তাহার রচয়িতা কবি শুভাঙ্গ বা শুভাংক। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি-গ্রন্থে আরও দুইটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে (কবি) অভিনন্দর রচনা বলিয়া; এই অভিনন্দের গৌড় অভিধা অনুপস্থিত। গৌড় অভিধাবিহীন অভিনন্দর ৫টি শ্লোক কবীন্দ্র-বচন-গ্রন্থে, ২২টি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে, ৬টি শ্লোক জলহনের শক্তিমুক্তা-বলীতে এবং একটি পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অভিনন্দরই দুইটি শ্লোক রামচরিতে উদ্ধার করা হইয়াছে; ইনি এবং গৌড়-অভিনন্দ একই ব্যক্তি কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। গৌড়-অভিনন্দ কাদম্বরী-কথাসার নামেও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন পদ্যে।

সোঢ্ঢলের উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থে আর-এক সুপ্রসিদ্ধ কবি অভিনন্দর কথা আছে। এই অভিনন্দ এক পালবংশীয় যুবরাজ হারবর্ষের সভাকবি ছিলেন এবং রামচরিত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মনে হয়, যুবরাজ হারবর্ষ এবং দেবপাল একই ব্যক্তি। এ অনুমান সত্য হইলে রামচরিতের কবি অভিনন্দকে বাঙালী বলিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশে বাঙালী কবি কর্তৃক রচিত এই প্রাচীনতম রামায়ণ-কাব্যের একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে; তাহা দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তন, যদিও এই মাহাত্ম্যবর্ণনা হনুমানের মুখে, শ্রীরামচন্দ্রের মুখে নয়।

পাল-চন্দ্রপর্বে বাংলাদেশে রামায়ণ-কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল, এবং অভিনন্দ-রচিত রামচরিতই প্রাচীন বাংলার একমাত্র রাম-কাব্য নয়; সন্ধ্যাকর-নন্দী নামে প্রসিদ্ধতর আর-একজন কবি রামচরিত নামেই আর-একখানা ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কাব্য বলিতেছি এই অর্থে যে সন্ধ্যাকরের কাব্যটি

দ্ব্যর্থব্যঞ্জক: এক অর্থে রামচন্দ্রের কাহিনী, অপর অর্থে পালরাজ রামপাল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে যে কবিপ্রশস্তি আছে তাহা হইতে জানা যায়, সন্ধ্যাকরের পিতার নাম ছিল প্রজাপতি-নন্দী, জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রান্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনপুরে। প্রজাপতি-নন্দী ছিলেন রামপালের সান্ধি-বিগ্রহিক। গ্রন্থরচনা আরম্ভ কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে কৈবর্ত-বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা হইতে মনে হয়, মদনপালের রাজত্বকালে গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর-নন্দী সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী; সেই হিসাবে তাঁহার কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য; কিন্তু যথার্থ সাহিত্যমূল্য স্বল্প এবং মৌলিকত্বও তেমন কিছু নাই। কাব্যটি সুপ্রসিদ্ধ রাঘবপাণ্ডবীয়-কাব্যের ধারার অনুকরণ। অলংকারপ্রিয়তায়, শ্লেষোক্তিতে এবং কাব্যের অন্যান্য লক্ষণে সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত অষ্টম-নবম-দশক-একাদশ শতকীয় সংস্কৃত কাব্যের সমগোত্রীয়।

অবান্তর হইলেও এ প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, রঘুপতি রামের পূজা পরবর্তী সেন-বর্মণপর্বে বোধহয় বাড়িয়াই গিয়াছিল, এবং হয়তো রামের মূর্তিপূজাও প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ধোয়ী-কবি তাঁহার পবনদূতে যেভাবে ভাগরথীতীরে রঘুকুলগুরু দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, মনে হয়, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মতো বাংলাদেশেও রাম-সীতার পূজা প্রচলিত ছিল। পরে কোন সময়ে তাহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়া থাকিবে।

চণ্ডকৌশিক-প্রণেতা নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হইলেও হইতে পারেন। নাটকটির নান্দী অংশের একটি শ্লোক হইতে জানা যায়, গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল মহীপালের রাজসভায়। এই মহীপাল পালরাজ মহীপাল হইতে পারেন, আবার গুর্জর-প্রতীহার-রাজ মহীপাল হইতেও বাধা কিছু নাই। চণ্ডকৌশিক-নাটকের সর্বপ্রাচীন যে দুইটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান (১২৫০ ও ১৩৮৭ খ্রীষ্টশতকে অনুলিখিত) দুইটিই পাওয়া গিয়াছে নেপালে; সন্দেহ নাই যে, বিহার-বাংলাদেশ হইতেই সেগুলি নেপালে গিয়া থাকিবে। সেইজন্যই মনে হয়, ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হউন বা না হউন তাঁহার কর্মক্ষেত্র বোধহয় ছিল বিহার-বাংলাদেশ, এবং চণ্ডকৌশিক-নাটকের প্রচলনও বেশি ছিল এই দুই দেশেই। মার্কণ্ডেয়-পুরাণবর্ণিত বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া পঞ্চাঙ্ক চণ্ডকৌশিক নাটক। সমস্ত কাহিনীটি নাটকীয় গুণে দুর্বল, এবং ক্ষেমীশ্বরের কবিকল্পনা ও কাব্যকৌশলও খুব উচ্চস্তরের নয়। মহাভারতীয় নল-কাহিনী লইয়া ক্ষেমীশ্বর নৈষধানন্দ নামে আর-একটি সপ্তাঙ্ক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন।

অলংকারবহুল কাব্য হিসাবে নীতিবর্মার কীচকবধ উল্লেখযোগ্য। মহাভারতীয় বিরাটপর্বের সুপরিচিত কীচকবধ উপাখ্যানটি ১৭৭টি শ্লোকে পাঁচটি সর্গে বর্ণিত, কিন্তু মহাভারতের সবল সারল্য নীতিবর্মার রচনায় অনুপস্থিত। তাহার পরিবর্তে আছে শ্লেষ ও যমকালঙ্কার ব্যবহারের নৈপুণ্য, শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গির চাতুর্য। সেইজন্যই পরবর্তী বৈয়াকরণিক-আভিধানিক-আলংকারিকেরা নীতিবর্মার কীচকবধ হইতে প্রয়োজন হইলেই দৃষ্টান্ত আহরণ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। বাংলা অক্ষরের পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কোন অক্ষরে কীচকবধের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই; তাহা ছাড়া, কাব্যটির প্রত্যেকটি টীকাকারই বাঙালী। সেইজন্যই মনে হয়, নীতিবর্মার কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ, এবং কাব্যটির প্রচলনও এই দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

একাদশ-দ্বাদশ শতকের আদি বঙ্গাক্ষরে লেখা একটি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে নেপালে; পুঁথিটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, নাম কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়। সংকলয়িতার নাম জানিবার উপায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। বইখানি যে বাংলাদেশেই সংকলিত হইয়া পরে নেপালে নীত হইয়াছিল, এই অনুমান অযৌক্তিক নয়। বইটিতে ১১১ জন বিভিন্ন কবি-বিরচিত ৫২৫টি শ্লোক আছে, এবং এই ১১১ জনের মধ্যে কালিদাস, অমরু, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি সর্বভারত-প্রসিদ্ধ কবিদের রচনা যেমন আছে তেমনই এমন অনেকের রচনা আছে যাঁহাদের বাঙালী বলিয়া মনে করিবার কারণ বিদ্যমান। নাম হইতে বুঝিতে পারা যায় ইঁহারা অনেকে বাঙালী ছিলেন, এবং অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের কবিতা-সংগ্রহের উদ্ভব বোধহয় এই পর্বের বাংলাদেশেই, এবং কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়ই এইজাতীয় সর্বপ্রথম সংকলন-গ্রন্থ। ইহার পরের পর্বের সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলয়িতাও একজন বাঙালী।

মনে হয়, মহাকাব্য, এমন কি ছোট ছোট পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য বোধহয় সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর খুব বেশি রুচিকর ছিল না; বরং বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত পদ ও ছড়া, ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক। এইসব সংস্কৃত শ্লোক ও পদের মধ্যে শুধু যে সমসাময়িক সংস্কৃত কাব্যরীতির পরিচয় আছে তাহাই নয়, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ এবং সমসাময়িক বাঙালীর কল্পনা এবং মানস-প্রকৃতিও সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। দুই-একজন মহিলা কবির পরিচয়ও পাইতেছি— ভাবাক বা ভাব-দেবী ও নারায়ণ-লক্ষ্মী।

নবম শতকের মধ্যভাগে কামরূপাধিপতি বনমালবর্মদেবের একটি লিপিতে বোধহয় সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার সুস্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ভোজবর্মার বেলাবলিপিতেও সে উল্লেখ সুস্পষ্ট। কিন্তু কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থে উদ্ধৃত বাঙালী কবি-রচিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে এই ব্রজলীলার যে চিত্র দৃষ্টিগোচর, গীত-গোবিন্দের আগে সে চিত্র আর কোথাও দেখা যায় না।

চার

পাল-চন্দ্রপর্বে বাংলাদেশের যথার্থ গৌরব ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তত নয় যত তাহার বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি অসংখ্য মহাযানী-বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা প্রকাশ করিয়াছিলেন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত অগণিত গ্রন্থে। মূল গ্রন্থ অধিকাংশই বিলুপ্ত, কিন্তু ইহাদের তিব্বতী অনুবাদ কিছু কিছু বর্তমান এবং তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকায় তাহা তালিকাবদ্ধ। তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকা, তিব্বতী লামা তারনাথের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, সুম্-পা রচিত পাগ্-সাম্-জোন্-জাং প্রভৃতি গ্রন্থই এ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র উপাদান।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তদুদ্ভূত অন্যান্য বৌদ্ধযান ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও অনূদিত ও আলোচিতই হয় নাই। অনুবাদ এবং আলোচনার বাধাও বিস্তর। প্রথমত, যে সংস্কৃত ভাষায় মূলগ্রন্থ-সমূহ রচিত হইয়াছিল, সে সংস্কৃত অত্যন্ত ব্যাকরণদোষদুষ্ট। বস্তুত, কালচক্রযানের

বিমলপ্রভা নামে একটি টীকায় বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ আচার্যরা স্বেচ্ছাপূর্বক সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিপদ্ধতি, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি অমান্য করিতেন; ঠিক এই কারণেই তিব্বতী অনুবাদও বহুক্ষেত্রে দুর্বোধ্য এবং তাহা হইতে সংস্কৃতে পুনরনুবাদ খুব সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, এইসব প্রত্যেকটি ধর্মই গুরুনির্ভর ধর্ম, গুরু ছাড়া এই ধর্মের গুহ্য সাধনপ্রক্রিয়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেই চলে। গুরুরা দীক্ষিতদের নিকট এবং দীক্ষিতরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের গুহ্যসাধনা সম্বন্ধে যে ভাষায় কথা বলিতেন সে-ভাষাও ছিল গুহ্যভাষা। সে ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা (সন্ধিভাষা)। সে ভাষার মৌলিক উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে পারা সহজ নয়। তৃতীয়ত, ইঁহাদের সাধনপন্থা এবং প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত গুহ্য। সে জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত সাধন-রীতিপদ্ধতি, নীতি ও প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ কমই। চতুর্থত, যেসব রূপক, উপমা, প্রতীক এবং যোগরূঢ় শব্দ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের সাধন-নীতি ও আদর্শ, রীতি ও প্রক্রিয়া এবং অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি সমসাময়িক সাধারণ নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, যৌনজীবন এবং যৌনপ্রক্রিয়া হইতেই আহৃত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই জীবন ও প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে তাহারা যে অর্থ ও ইঙ্গিত বহন করে তাহা একান্তই আপাত অর্থ ও ইঙ্গিত, অথচ আপাত অর্থের পশ্চাতে যে নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান তাহা সহজে ধরা পড়ে না।

মহাযানোদ্ভূত মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও বজ্রযানে সীমানির্দিষ্ট পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না। একই বৌদ্ধাচার্য বিভিন্ন যানসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং একাধিক যানকর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত, দীপংকর প্রভৃতি আচার্যরা মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি সকল যানেই স্বীকৃত, এবং বজ্রযানী-মন্ত্রযানীরা ইঁহাদের আপন গুরু বলিয়া দাবিও করিয়াছেন। ঠিক একই কথা বলা চলে সহজযান, নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে এইসব ধর্মমত ও সম্প্রদায় সমস্তই সমসাময়িক, এবং এক সম্প্রদায়ের আচার্যরা অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছেন। বজ্রযান ও মন্ত্রযানের অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠাবান আচার্যরা তো সকলেই সহজযান, নাথধর্ম এবং কৌলধর্মের আদি গুরু বলিয়া স্বীকৃত। সরহ বা সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ-মীননাথ ইঁহারা প্রত্যেকেই বজ্রযানে যেমন স্বীকৃত, তেমনই সহজযানী-নাথপন্থী-কৌলমার্গী প্রভৃতিরাও ইঁহাদের আচার্য বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তেমনই নাথপন্থী বা কৌল-মার্গীদের গুরু লুইপাদ-মীননাথ এবং সহজযানীদের লুইপাদ দুই ব্যক্তি, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। বজ্রযানোদ্ভূত এইসব ধর্মমার্গ ও সম্প্রদায় গোড়ায়ই আপনাপন বৈশিষ্ট্য লইয়া সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত হয় নাই; সেসব বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরে গড়িয়া উঠিয়াছে। বরং, সূচনায় ইহাদের একই ছিল ধ্যান ও আদর্শ, একই ছিল ভাবপরিমণ্ডল, এবং যাঁহারা সেই ধ্যান, আদর্শ ও ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন তাঁহারা পরে প্রত্যেক স্ব-স্বতন্ত্র মত ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এইসব আচার্যদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে এবং ইঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকায় অনেকের জন্ম ও কর্মভূমি উল্লিখিত আছে, কিন্তু অনেকের নাইও; কিন্তু যাঁহাদের আছে তাঁহাদের জন্মকর্মভূমির স্থান-নাম সনাক্ত করা সহজ নয়; এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের

মধ্যে মতভেদ বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যাঁহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান এবং যেসব স্থান-নামের সনাক্তকরণ সুনির্ধারিত, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলা চলে, এইসব আচার্যরা অধিকাংশই ছিলেন বাংলাদেশের অধিবাসী, স্বল্পসংখ্যক কয়েকজনের জন্মভূমি ছিল কামরূপ, ওড্রদেশ, বিহার এবং কাশ্মীর। যেসব মহাবিহারে বসিয়া বৌদ্ধ আচার্যরা অগণিত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল ছাড়া অন্য প্রত্যেকটি মহাবিহারই ছিল বাংলাদেশে। সমসাময়িক বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্য সুবৃহৎ কেন্দ্র ছিল জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকূটক, বিক্রম-পুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পণ্ডিত, পট্টিকেরক প্রভৃতি বিহারে; এবং এ সংবাদও পাইতেছি তিব্বতী বৌদ্ধ গ্রন্থ-তালিকা হইতেই। এই পর্বের নালন্দা, ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশীল মহাবিহারও বাঙালী ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়- ও সংস্কৃতি -সীমার অন্তর্গত। বিক্রমশীলের প্রতিষ্ঠাতাই তো ছিলেন পালরাজ ধর্মপাল স্বয়ং এবং ওদন্তপুরী ও নালন্দায় এপর্বের বিদ্যার্থী ও আচার্যদের অধিকাংশই বাঙালী। নালন্দা ও ওদন্তপুরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও বাংলার পালবংশ। এইসব বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যদের স্থিতিকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সন-তারিখ নির্ণয় কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কোন কোন গ্রন্থে রচনার তারিখ উল্লিখিত আছে; সেইসব তারিখ, সমসাময়িক বা পূর্বতন আচার্যদের ও রাজা-রাজবংশের উল্লেখের এবং গুরুপরম্পরা-নির্ধারণের সাহায্যে মোটামুটি ইঁহাদের কালনির্ণয়ের একাধিক চেষ্টা হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে, উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যদের স্থিতিকাল এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থাদির রচনাকাল মোটামুটি অষ্টম শতক হইতে একাদশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষভাবে পালপর্বই যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের উদ্ভব,- প্রসার ও প্রভাব -কাল তাহা তিব্বতী গ্রন্থতালিকা, তারনাথের ইতিহাস এবং সুম্‌পার পাগ্‌-সাম্‌-জোন্‌-জাং-গ্রন্থের সাক্ষ্যেও সুপ্রমাণিত।

উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যরা যে শুধু অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, লোকনাথ, হেরুক, হেবজ্র প্রভৃতি বিচিত্র দেবদেবীর সাধনমন্ত্র, স্তোত্র, সংগীত, মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, যোগ, ধারণী, সমাধি প্রভৃতি লইয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাই নয়, যোগ ও দর্শন, হেতু বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্দবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই, এইসব গ্রন্থের মধ্যেই সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষাও প্রতিফলিত।

মহাযান-বজ্রযান-মন্ত্রযান প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ মাত্র তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। এই অনুদিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত হইয়াছিল তিব্বতী লামা বু-তোন কর্তৃক; তালিকা-গ্রন্থটির নাম ত্যাঙ্গুর। এই অনুদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই কালের প্রভাব এড়াইয়া আজও বাঁচিয়া আছে; মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলিরও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে নেপালে এবং অন্যত্র। গ্রন্থ-গুলির অধিকাংশই বজ্রযানী সাধন-সম্পর্কিত; এইসব গ্রন্থ-লেখকদের কাহারও কাহারও জন্মভূমি ছিল জাহোরে বা সাহোরে এবং উড্ডীয়ানে, এবং লোকায়ত ঐতিহ্য-মতে উড্ডীয়ানেই বজ্রযানের উদ্ভব। উড্ডীয়ান যে কোন্ স্থান তাহা লইয়া পণ্ডিত-

মহলে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। তবে একটি তথ্যের দিকে পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়। ত্যাঙ্গুরে সরোহ (বজ্র) বা সরহকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ান-বিনির্গত, কিন্তু পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থে আবার সেই সরহকে বলা হইয়াছে বঙ্গালের অধিবাসী। ত্যাঙ্গুরের এক অংশে যে অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্রকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ান্‌বাসী, সেই ত্যাঙ্গুরেরই অন্য অংশে সেই অদ্বয়বজ্রকেই বলা হইয়াছে বাঙালী। পাগ-সাম-জোন্-জাং-গ্রন্থে যে লুইপাদকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ান-বিনির্গত, ত্যাঙ্গুরে সেই লুইপাদকেই বলা হইয়াছে বাংলার অধিবাসী ইত্যাদি। এই সাক্ষ্যের পর উড্ডীয়ান্ যে বাংলাদেশের কোন স্থান নয়, এ কথা বলিতে একটু দ্বিধা হয় বই কি!

জাহোর বা সাহোর সম্বন্ধেও একই সংশয়। তিব্বতী সাক্ষ্যে মনে হয় জাহোর বা সাহোরও বাংলাদেশেরই কোন স্থান।

প্রাচীনতম বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে শান্তিরক্ষিত অন্যতম। গোপালের রাজত্বকালে তাঁহার জন্ম, ধর্মপালের রাজত্বকালে মৃত্যু। ত্যাঙ্গুর গ্রন্থতালিকায় দেখা যায়, তিনি অন্তত তিনখানা বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন : অষ্ট-তথাগতস্তোত্র, বজ্রধর-সঙ্গীত ভাগবত-স্তোত্রটীকা এবং পঞ্চমহোপদেশ। তাঁহার অন্য নাম ছিল আচার্য বোধিসত্ত্ব, এবং সেই নামেও সপ্ততথাগত সম্বন্ধে আরও চার-খানি বই লিখিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্য শান্তি-রক্ষিত এবং মহাযানী নৈয়ায়িক ও দার্শনিক শান্তরক্ষিত একই ব্যক্তি। নৈয়ায়িক শান্তরক্ষিত ছিলেন স্বতন্ত্র মধ্যমক মতের অনুগামী এবং নালন্দা-মহাবিহারের অন্যতম আচার্য। তিনি সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসংগ্রহ, বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ এবং মধ্যমক-অলঙ্কারকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক; তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও মনীষা এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অধ্যাত্মচিন্তায় সুগভীর জ্ঞান সদ্যোক্ত তিনটি গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। তাঁহার শিষ্য কমলশীল প্রথমোক্ত গ্রন্থটির একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই কমলশীল ছিলেন লুই-পা বা লুইপাদের সমসাময়িক।

তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিতের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আনুমানিক অষ্টম শতকের মাঝামাঝি তিব্বতের রাজা বৌদ্ধধর্মানুরক্ত খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্‌ৎসানের আমন্ত্রণে শান্তিরক্ষিত ও তাঁহার ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভব দুইজনে মিলিয়া সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন; তিব্বতে লামা শ্রেণীর সৃষ্টি হইল, এবং সংকৃতজ্ঞ খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্‌ৎসান মগধের ওদন্তপুরী বিহারের আদর্শে ব্‌সম্-য়া বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, শান্তিরক্ষিত হইলেন তাহার প্রথম সংঘাচার্য।

শান্তিরক্ষিত-শান্তরক্ষিতের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে যে সমস্যা, সে সমস্যা বজ্রযানী গ্রন্থের লেখক তান্ত্রিক শান্তিদেব এবং শিক্ষা-সমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার-রচয়িতা প্রসিদ্ধ মহাযানী আচার্য শান্তিদেব সম্বন্ধেও বিদ্যমান। তারনাথের মতে মহাযানী শান্তিদেব ছিলেন সৌরাষ্ট্রের রাজপরিবারসম্ভূত। পরে তিনি নালন্দা-বিহারে আসিয়া আচার্য জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাগ-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থের মতে মহাযানী শান্তিদেবের বাল্যনাম ছিল শান্তিবর্মা, পিতা ছিলেন কল্যাণবর্মা। এই মহাযানী আচার্য খুব সম্ভব সপ্তম-অষ্টম শতকের লোক। ত্যাঙ্গুর-গ্রন্থে বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেবের তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় : শ্রীগুহ্যসমাজ-মহাযোগ-তন্ত্রবলিবিধি, সহজগীতি ও চিত্তচৈতন্য-শমনোপায়। তাঁহার বাড়ি ছিল জাহোরে।

সুম্পা বলিতেছেন, তান্ত্রিক শান্তিদেবের অন্য নাম ছিল ভুসুকু বা রাউত। চর্যা-গীতি-গ্রন্থের কয়েকটি গীতির রচয়িতা ছিলেন সহজ-সিদ্ধাচার্য জনৈক ভুসুকু; সন্দেহ নাই, এই ভুসুকু ছিলেন বাঙালী। কিন্তু বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেব ও বাঙালী সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একই ব্যক্তি কিনা সে সন্দেহ থাকিয়াই যায়। চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, শান্তি-পা বা শান্তিপাদ নামে আর-একজন বাঙালী গীতরচয়িতা সিদ্ধাচার্য ছিলেন। এই শান্তিপাদের অন্য নাম ছিল রত্নাকর-শান্তি এবং ত্যাঙ্গুরের গ্রন্থ-তালিকায় দেখিতেছি, তিনি সুখদুঃখদ্বয়-পরিত্যাগদৃষ্টি নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া আরও আঠারোটি তান্ত্রিক গ্রন্থেরও তিনি ছিলেন লেখক। তারনাথ বলিতেছেন, রত্নাকর-শান্তির বাড়ি ছিল মগধে, বিক্রমশীল-বিহারের তিনি ছিলেন অন্যতম আচার্য। যাহাই হউক, মহাযানী শান্তিদেব ও বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেব যে দুই ভিন্ন ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ কম। তবে, তান্ত্রিক শান্তিদেব ও ভুসুক একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন; উভয়েই একাদশ শতকের লোক। চর্যাগীতির শান্তিপাদ ও ত্যাঙ্গুরের রত্নাকরশান্তিও বোধহয় একই ব্যক্তি।

সরোরুহবজ্র, কমলশীল, শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক, আনুমানিক অষ্টম শতকের লোক। সরোরুহবজ্রের অন্য নাম ছিল পদ্ম-বজ্র; তিনি ছিলেন হেবজ্রতন্ত্রের অন্যতম পুরোগামী আচার্য। এই সরোরুহবজ্রকে পরবর্তীকালের সরহ-সরহপাদের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুত, ত্যাঙ্গুর, পাগ-সাম্-জোন্-জাং, তারনাথ প্রভৃতির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন, তাঁহারা সকলেই কিছু সমসাময়িক ছিলেন না। তারনাথ তো পরিষ্কারই দুই সরহের ইঙ্গিত দিতেছেন, একজন সরহ-রাহুলভদ্র, আর একজন সরহ-শাবরি। তবে দোহাকার এবং বজ্রযানী-সাধন রচয়িতা সিদ্ধাচার্য সরহ-সরহপাদ এবং তারনাথ-কথিত সরহ-রাহুলভদ্র এক এবং অভিন্ন; তিনি কিছুদিন নালন্দায় মহাচার্যও ছিলেন। দীক্ষাদানকালে তিনি দোহাগান করিতেন; বস্তুত ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তাঁহার কয়েকটি দোহা ও চর্যাগীতির উল্লেখও আছে। অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সংস্কৃত টীকাযুক্ত তদ্রচিত একটি দোহাসংগ্রহ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশও করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, প্রাচীন বাংলায় রচিত চারিটি গানও চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; এইসব গানের ভণিতায় তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে সরহপাদ। সরোরুহবজ্র-পদ্মবজ্র অষ্টম শতকের লোক, কিন্তু সরহ-রাহুলভদ্র বোধহয় একাদশ শতকের আগেকার লোক নহেন।

তারনাথের মতে সরোরুহবজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুক্কুরিপাদ ও কম্বলপাদ। কুক্কুরিপাদ বাংলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চুরাশি সিদ্ধার তালিকায় কুক্কুরিপাদের উল্লেখ আছে। তিনিই বোধহয় তন্ত্রসাধনায় মহামায়া-সাধনের সূচনা করেন। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় দেখিতেছি, তিনি অন্তত ছয়খানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে কয়েকটি মহামায়া-সাধন সম্পর্কিত। ত্যাঙ্গুর-তালিকার বজ্রযানসাধনসম্পর্কিত আরও আটটি তন্ত্রগ্রন্থ (বজ্রসত্ত্ব, হেরুক, বৈরোচন প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধীয়) তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয়। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থের অন্তত দুইটি প্রাচীন বাংলা গীতি কুক্কুরিপাদের রচনা, ভণিতায় তাহা সুস্পষ্ট বলা আছে।

কম্বলপাদ বা কম্বলাম্বরপাদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় কম্বল-গীতিকা নামে একটি দোহা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; এবং চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থের একটি গীতির তিনি ছিলেন লেখক। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে তিনি হেরুক-সাধন সম্বন্ধে অন্তত ছয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের সমসাময়িক (অষ্টম শতকের শেষ, নবম শতকের প্রথমার্ধ) এবং চুরাশি সিদ্ধার অন্যতম ছিলেন শবরীপাদ বা শবরপাদ। সুম্‌পা বলিতেছেন, তিনি বঙ্গাল দেশের পর্বতবাসী শবর ছিলেন। রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন বাংলাদেশে ছিলেন (ইনি প্রথম খ্রীষ্টশতকীয় শূন্যবাদী নাগার্জুন নহেন) তখন তিনিই শবরপাদ এবং তাঁহার দুই স্ত্রীকে তন্ত্রধর্মে দীক্ষাদান করেন। ত্যাঙ্গুর তালিকানুযায়ী তিনি প্রায় দশখানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থে শবরীপাদের রচিত দুইখানা বাংলা গান আছে। বজ্রযোগিনী-সাধন সম্বন্ধেও তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি ও তাঁহার ভগিনী বা কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, বাংলাদেশে বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন করেন। মহাচার্য ইন্দ্রভূতি সিদ্ধ-বজ্রযোগিনী-সাধন, জ্ঞানসিদ্ধি এবং অন্যান্য আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীঙ্করাও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িত্রী ছিলেন; তাহার মধ্যে অদ্বয়সিদ্ধি মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব শবরীপাদই বৌদ্ধ শবর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। এই শবর সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য ছিলেন পরবর্তী কালের অদ্বয়বজ্র।

লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য লীলাবজ্র আচার্য-অবধূত-মহাপণ্ডিত কুমারচন্দ্র-রচিত কৃষ্ণ-যমারীতন্ত্রের টীকা রত্নাবলীর একটি তিব্বতী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কুমারচন্দ্র রত্নাবলী টীকাটি রচনা করিয়াছিলেন বিক্রমপুরী-বিহারে বসিয়া; সেইজন্যই অনুমান হয়, কুমারচন্দ্র অষ্টম-নবম শতকীয় বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। তিনি তিনটি তান্ত্রিক টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের সমসাময়িক বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্কদাস বা ডঙ্কদাস সুবিশদসম্পুট নামে হেবজ্রতন্ত্রের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন পুণ্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণায় নিরত তখন তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন জনৈক নাগবোধি। সুম্‌পা বলিতেছেন, এই নাগ-বোধির বাড়ি ছিল বরেন্দ্রান্তর্গত শিবসের গ্রামে; যমারিসিদ্ধচক্রসাধন নামে তিনি অন্তত একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ত্যাঙ্গুর-তালিকামতে তিনি তেরোখানা তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা।

এই পর্যন্ত যেসব বৌদ্ধ আচার্যদের কথা বলা হইল তাঁহারা সকলেই আনুমানিক অষ্টম-নবম শতকের লোক। ইহার পর বেশ কিছুদিন উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ আচার্য-পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ পাইতেছি না। ইহার কারণ বলা কঠিন; তাহা ছাড়া ইঁহাদের দেশ-সম্বন্ধে যেমন কাল সম্বন্ধেও তেমনই আমাদের তথ্য নিঃসন্দিগ্ধও নয়। দশম শতকের তৃতীয় পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত আবার সেই স্রোত সবেগে বহমান। দ্বাদশ শতকে সেন-বর্মণপর্বে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে রাজা ও রাষ্ট্রের পোষকতা আর ছিল না, কিন্তু নিজ নিজ নিভৃত বিহারকক্ষে বৌদ্ধ আচার্যদের নিরলস সাধনা অব্যাহতই ছিল।

বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযানের বাহিরে অথচ ইহাদের সঙ্গে গভীরভাবে সংপৃক্ত

নাথধর্ম, কৌলধর্ম, সহজধর্ম, অবধূতধর্ম প্রভৃতির আচার্যরা প্রায় সকলেই একে অন্য ধর্ম কর্তৃক আচার্য বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইয়াছেন। শেষোক্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলির প্রধান প্রধান আচার্য ছিলেন চুরাশি জন, এবং ইঁহারা তিব্বতী ঐতিহ্যে চুরাশি সিদ্ধা বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার বজ্রযান সাধনা ও বজ্রযানী দেবদেবী সম্বন্ধে গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন, মহাযানী ন্যায়ের পুঁথিও লিখিয়াছেন। কাজেই ইঁহাদের একান্ত করিয়া পৃথকভাবে বিবেচনা করিবার যুক্তি-সংগত কিছু কারণ নাই। বস্তুত, এই কয় শত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মের একটা সুবৃহৎ এবং সুগভীর সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া চলিতেছিল। এই সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণই পাল-চন্দ্রপর্বের বাংলার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেন-বর্মণপর্বের উচ্চস্তরের সংস্কৃত স্মৃতি-দর্শন-কাব্য প্রভৃতি সাধনার কথা বাদ দিলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যত্র এই সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া খুব বাধা পায় নাই।

প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহাযান-বজ্রযান প্রভৃতি মতাবলম্বী তান্ত্রিক আচার্যরা যেসব রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই হয় দর্শন ও যোগসাধন সম্বন্ধীয় অথবা বিভিন্ন দেবদেবীর সাধনা, স্তব ও পূজো বিষয়ক শ্লোকাবলী। শেষোক্ত পর্যায়ের রচনায় যাঁহাদের কবিকল্পনা ও কবিপ্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় ধরা পড়িয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালী। সংস্কৃত কাব্যের রীতিপ্রকৃতিতেও ইঁহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন, মনে হয়। ধর্মাকর-মতি, শবরপাদ, কৃষ্ণপাদ, রত্নাকর, শুভাকর, কুলদত্ত, অদ্বয়বজ্র, ললিত-গুপ্ত, কুমুদাকর-মতি, পদ্মাকর, অভয়াকর-গুপ্ত, গুণাকর-গুপ্ত, করুণাচল, কোকদত্ত, অনুপম-রক্ষিত, চিন্তামণি-দত্ত, সুমতি-ভদ্র, মঙ্গল-সেন, অজিত-মিত্র প্রভৃতি যাঁহাদের নাম সাধনমালা-গ্রন্থে পাইতেছি, তাঁহাদের বাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে।

তারনাথ ও সুম্‌পার সাক্ষ্যে মনে হয়, জেতারি নামেও দুইজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠ জেতারির বাড়ি ছিল বরেন্দ্রভূমে; এই জেতারি বিক্রমশীল বিহারের অন্যতম আচার্য এবং শ্রীজ্ঞান-দীপঙ্কর বা অতীশের অন্যতম গুরু ছিলেন। সেই-জন্য অনুমান হয়, তিনি দশম শতকের শেষার্ধের লোক। হেতুতত্ত্বোপদেশ, ধর্মা-ধর্মবিনিশ্চয় এবং বাল্যাবতারতর্ক নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের তিনটি গ্রন্থ বোধহয় তাঁহারই রচনা। ইহা ছাড়া তিনি আরও দুইখানা সূত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সুগতমতবিভঙ্গকারিকা অন্যতম; এই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন বাঙালী বলিয়া। কনিষ্ঠ জেতারিও ছিলেন বাঙালী, এবং বোধিভাগ্য লাবণ্যবজ্রের গুরু। তিনি এগারোখানা বজ্রযানী-সাধনের রচয়িতা। তাঁহার কাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন।

বাঙালী বৌদ্ধ মহাচার্যদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অন্য নাম অতীশ) শ্রেষ্ঠতম, এবং দীপঙ্কর-চরিতকথা বাংলাদেশে সুপরিচিত। ত্যাঙ্গুরের তিব্বতী ঐতিহ্যে একাধিক দীপঙ্করস্মৃতি বিধৃত—দীপঙ্কর, দীপঙ্কর-ভদ্র, দীপঙ্কর-রক্ষিত, দীপঙ্কর-চন্দ্র, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান। ইঁহাদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান যে বাঙালী ছিলেন এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গাল-দেশের বিক্রমপুরে; আনু-মানিক ৯৮০ খ্রীষ্ট-বৎসরে গৌড়রাজ-পরিবারে তাঁহার জন্ম; পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী। যৌবনে তিনি জেতারির শিষ্য ছিলেন; তিনি রাহুল-গুপ্তের

নিকট বৌদ্ধ ধ্যানে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন; সেইখানেই তাঁহার নামকরণ হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। ঊনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরী-বিহারে মহাসংঘিক আচার্য শীল-রক্ষিতের নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং সেই সময় তাঁহার নামকরণ হয় দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান। পরে তিনি আচার্য ধর্মরক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্বব্রতে দীক্ষিত হন এবং সুবর্ণদ্বীপে আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্রপাঠে বারো বছর অতি-বাহিত করেন। কিছুদিন পর তিনি মহীপাল কর্তৃক আহূত হন বিক্রমশীল-মহাবিহারের মহাচার্যপদে। এই বিহারে বাসকালেই তিব্বতের বৌদ্ধ রাজা লাহ্-লামা-যে-শেস্ দূত পাঠাইয়া দীপঙ্করকে সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন তিব্বতে যাইবার জন্য। নির্লোভ নিরহঙ্কার দীপঙ্কর সবিনয়ে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময় আচার্য রত্নাকর ছিলেন বিক্রমশীল-বিহারের অধিনায়ক। বিহারের ভিক্ষুসংঘ তখন নানাপ্রকার নৈতিক ও মানসিক শৈথিল্যে ভারগ্রস্ত, দীপঙ্কর ছাড়া ভিক্ষুদের নৈতিক শাসন অব্যাহত রাখার শক্তি আর কাহারও নাই। মগধ জনপদের নানা বিহারে-সংঘে দীপঙ্করের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব তখন অপরিসীম। এসব বিবেচনা করিয়া রত্নাকর দীপঙ্করকে তিব্বতে যাইতে দিতে রাজি হন নাই। কিন্তু পরে যখন ক্রমশ জানিলেন দীপঙ্কর তিব্বতী আচার্য বিনয়ধরকে কথা দিয়াছেন, তখন অনুমতি দেওয়া ছাড়া আর উপায় রহিল না। কিন্তু এই শর্তে যে, তিন বৎসরের ভিতর দীপঙ্কর বিক্রম-শীল-বিহারে ফিরিয়া আসিবেন। এই উপলক্ষে তিনি বিনয়ধরের নিকট যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য : "অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার।" দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করিলেন নেপালের ও হিমালয়ের সুদুর্গম পথে। পথে নেপাল-রাজ অনন্তকীর্তির সঙ্গে দীপঙ্করের সাক্ষাৎকার ঘটিল, এবং অনন্তকীর্তির পুত্র পদ্মপ্রভ দীপঙ্করের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিব্বতের পথে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। তিব্বতে পৌঁছিয়া দীপঙ্কর রাজসমারোহে অভ্যর্থিত হইলেন এবং তিব্বতের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। থো-লিং বিহার হইল তাঁহার কর্মকেন্দ্র। দীপঙ্কর প্রায় তেরো বৎসর কাল তিব্বতে বাস করিয়া তিয়াত্তর বৎসর বয়সে আনুমানিক ১০৫৩ খ্রীষ্ট বৎসরে সেইখানেই পরলোকগমন করেন।

সুম্-পা-রচিত পাগ-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থের মতে দীপঙ্কর বিক্রমশীল ও ওদন্ত-পুরী উভয় বিহারেরই মহাচার্য ছিলেন; বোধহয় সোমপুরী-বিহারের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ, এবং সেখানে বসিয়াই তিনি ভাববিবেকের মধ্যমক-রত্ন-প্রদীপ গ্রন্থের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। ত্যাঙ্গুর-ঐতিহ্যমতে তিনি প্রায় ১৭৫ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই বজ্রযানী সাধন, কিন্তু কিছু কিছু মহাযানী সূত্রগ্রন্থও ত্যাঙ্গুর-তালিকায় বিদ্যমান।

চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, মনীষায় ও অধ্যাত্মগরিমায় দীপঙ্কর সমসাময়িক বাংলার ও ভারতবর্ষের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পূর্বভারত ও তিব্বতের মধ্যে যাঁহারা মিলনসেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্করের নাম সর্বাগ্রে এবং সকলের পুরোভাগে স্মর্তব্য।

বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান আচার্য ছিলেন জ্ঞানশ্রী-মিত্র; তাঁহার বাড়ি ছিল গৌড়ে; গোড়ায় তিনি ছিলেন হীনযানী বৌদ্ধ, পরে মহাযানে দীক্ষা গ্রহণ

করেন। তাঁহার বৌদ্ধন্যায়সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি চতুর্দশ শতকে আচার্য মাধব-রচিত সর্বদর্শনসংগ্রহে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অভয়াকর-গুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন রামপালের সমসাময়িক, বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত, এবং বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম আচার্য। তারনাথের মতে অভয়াকর তীর্থিক সম্প্রদায়ের তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, পরে বাংলার বৌদ্ধ তন্ত্রেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঙ্গুর-ঐতিহ্যমতে তিনি প্রায় বিশখানা বজ্রযানী গ্রন্থের রচয়িতা- এবং ইঁহাদের অন্তত চারিখানার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান।

দিবাকর-চন্দ্র নামে আর একজন আচার্য ছিলেন নয়পালের সমসাময়িক। তাঙ্গুর ঐতিহ্যমতে তিনি হেরুক-সাধন নামে একটি গ্রন্থ এবং আরো দুইটি অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত জেতারির সমসাময়িক এবং দীপঙ্কর-অতীশের অন্যতম শিক্ষাগুরু রাজাচার্য মহাগুরু রত্নাকরশান্তি অথবা শান্তিপাদ বাঙালী ছিলেন কিনা, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

তবে মহীপালেরই সমসাময়িক কুমারবজ্র নিশ্চয়ই বাঙালী ছিলেন। হেরুক-সাধন নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এবং দারিকপাদের চক্র-সম্বরসাধনতত্ত্বসংগ্রহ-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

রামপাল-প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল-বিহারের দুইজন স্বনামধন্য পণ্ডিত হইতেছেন দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র। বিভূতিচন্দ্র একাধারে ছিলেন গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক। বিভূতিচন্দ্র তিব্বতীতে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, কয়েকখানি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ও অনেক গ্রন্থের টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। লুই-পা'র দুইটি গ্রন্থের এবং অভয়াকরের দুই বা তদধিক গ্রন্থের অনুবাদ তাঁহারই রচনা। জগদ্দল বিহার ছিল তাঁহার কর্মভূমি।

অভয়াকর-গুপ্ত ও শুভাকর-গুপ্তের খানকয়েক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন আচার্য দানশীল। প্রায় ষাটখানা তন্ত্র-গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ তাঁহার রচনা: নিজে তিনি পুস্তক পাঠোপায় নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেই তাহার তিব্বতী রূপান্তরও করিয়াছিলেন। শুভাকর ছিলেন অভয়াকরের সমসাময়িক মগধের একজন বৌদ্ধ আচার্য।

প্রজ্ঞাবর্মা নামে একজন বাঙালী কাপট্য-বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের উপর দুইটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দুপ্রকরণ নামক ন্যায়গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞাবর্মার গুরু বোধিভদ্র সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী ছিলেন। এই বোধিভদ্র এবং তারনাথ-কথিত বিক্রমশীল-বিহারের আচার্য বোধিভদ্র বোধহয় এক এবং অভিন্ন। বোধিভদ্র প্রায় আট-দশখানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ছিলেন মহামতি।

জগদ্দল-বিহারের আর-একজন আচার্য ছিলেন মোক্ষাকর-গুপ্ত। তিনি তর্ক-ভাষা নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অপভ্রংশ দোহাকোষের উপর টীকাও বোধহয় তাঁহারই রচনা।

পুণ্ডরীক নামে একজন রাজা আর্যমঞ্জুনামসংগীতি-টীকার উপর বিমলপ্রভা

নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই পুণ্ডরীক বোধহয় বাঙালী ছিলেন তাঁহার অন্য আর-একটি নাম ছিল জ্ঞানবজ্র।

সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম সেই লুই-পা বা লুইপাদ খুব সম্ভব রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। তারনাথের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আচার্য লেভি, শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতিরা লুই-পাকে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লুই-পা রচিত অভিসময়বিভঙ্গ-গ্রন্থের পুষ্পিকায় স্পষ্টতই বলা আছে যে, আচার্য দীপংকর তাঁহাকে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তদ্রচিত কয়েকখানা বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে, এবং তিব্বতী ঐতিহ্যমতে তিনিই আদিসিদ্ধ। চর্যাগীতি-গ্রন্থে তাঁহার প্রাচীন বাংলায় রচিত দুইটি দোহা আছে, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, লুইপাদ-গীতিকা নামে তাঁহার একখানা পৃথক গ্রন্থই ছিল।

অনেকের মতে তিব্বতী ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ লুই-পাদ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ মীননাথ বা মৎসেন্দ্রনাথ এক এবং অভিন্ন। এরূপ মনে করিবার কারণও আছে। প্রথমত, তিব্বতী ভাষায় লুই-পা'র রূপান্তর মৎস্যোদর বা মৎস্যান্ত্রাদ। দ্বিতীয়ত, তিব্বতী ঐতিহ্যে লুই-পা বাংলাদেশের ধীবর শ্রেণীর লোক; ভারতীয় ঐতিহ্যেও মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথ ধীবরশ্রেণীসম্ভূত। তৃতীয়ত, যোগিনী কৌল-সম্প্রদায়ের যে কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি আমাদের জানা আছে, যেমন কৌলজ্ঞাননির্ণয় এবং নেপালে প্রাপ্ত আরো তিন-চারখানা পুঁথি, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথকে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; অন্যদিকে তারনাথ বলিতেছেন, লুইপাদই যোগিনী ধর্মমতের স্রষ্টা। লুইপাদ-মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্মমতই সহজসিদ্ধি নামে খ্যাত। এই সহজসিদ্ধির সঙ্গে একদিকে যেমন বজ্রযান-মন্ত্রযানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তেমনই অন্যদিকে কৌলধর্ম, নাথধর্ম প্রভৃতি এই সহজসিদ্ধি হইতেই উদ্ভূত। বস্তুত, যোগিনী কৌলের কুল বৌদ্ধ তন্ত্রেরই পঞ্চকুল এবং এই পঞ্চকুল পঞ্চধ্যানী বুদ্ধেরই প্রতীক; আর সহজসিদ্ধির সহজ এবং বজ্রযানের বজ্র প্রায় একই বস্তুর দুই ভিন্ন নাম মাত্র।

মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথের অন্যতম পূর্বপুরুষ ছিলেন মীনপাদ; তিনি বোধিচিত্তের উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ। বাংলাদেশে গোরক্ষনাথ-কথা সুপরিজ্ঞাত। গোরক্ষনাথের রচিত কোন পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই; তবে ত্যাঙ্গুর-তালিকায় এক গোরক্ষের নামে একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, জ্ঞানকারিকা নামে একটি গ্রন্থ গোরক্ষনাথের নামের সঙ্গে জড়িত। গোরক্ষনাথ-কাহিনী নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া উত্তর-ভারতের সর্বত্র—নেপালে, তিব্বতে, মধ্যদেশে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পঞ্জাবে—ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নাথপন্থীরা সকলেই গোরক্ষনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। পরবর্তী কালের গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে গোরক্ষনাথের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায়ের মতামত বিধৃত হইয়া আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী গোরক্ষনাথ রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন জালন্ধরীপাদ বা জালন্ধরপাদ। বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে গোপীচাঁদের গল্পের হাড়ি-পা এবং জালন্ধরীপাদকে অনেকে এক

এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তারনাথের মতে জালন্ধরীর শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণাচার্য এবং তাঁহার সঙ্গে হাড়ি-পা'র একটা সম্বন্ধও ছিল। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় এক মহাপণ্ডিত, সিদ্ধাচার্য জালন্ধরীপাদের উল্লেখ আছে; এই মহাচার্য জালন্ধরী-পাদ আর গোপীচাঁদগুরু জালন্ধরীপাদ বোধহয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। জালন্ধরের নামে ত্যাঙ্গুর-তালিকায় চারিখানা বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

জালন্ধরীপাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন বিরূ-পা বা বিরূপাদ। তারনাথ বলিতেছেন, এই বিরূ-পা ছিলেন সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সুম্‌পার মতে, এই বিরূপার জন্ম হইয়াছিল ত্রিপুরের (ত্রিপুরা) পূর্বদিকে, এবং দেবপালের রাজত্বকালে। ত্যাঙ্গুর তালিকায় দেখিতেছি, মহাচার্য বিরূ-পা প্রায় দশখানা বজ্রযানী পুঁথি, এবং বিরূপ-পাদ-চতুরশীতি এবং দোহাকোষ নামে দুইখানা পদ ও দোহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাগীতিতে বিরূপার একটি গীতি স্থান পাইয়াছে; এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বিরূপ-গীতিকা ও বিরূপ-বজ্র-গীতিকা নামক দুইটি গীতি গ্রন্থেরও লেখক ছিলেন বিরূপা। বিরূপা মহাসিদ্ধ ডোম্বি-হেরুকের অন্যতম গুরু ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে ডোম্বি-হেরুক ছিলেন মগধের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা।

তৈলপ, তিল্লপ, তিল্লিপা, তিলিপা, তৈলিকপাদ বা তেলিযোগী নামে একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন মহীপালের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞাবর্মা বা প্রজ্ঞাভদ্র নামে পরিচিত হন। তিনি চারখানা বজ্রযানী গ্রন্থ, একখানা দোহাকোষ, এবং একখানা সহজগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে আর-এক সিদ্ধাচার্য তৈলিকপাদের কথা আছে, যাঁহার বাড়ি ছিল ওদ্যানে। এই দুই সিদ্ধাচার্য এক এবং অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

তৈলিকপাদের প্রধান শিষ্য ছিলেন নারো, নারো-পা প্রভৃতি নামে পরিচিত জনৈক সিদ্ধাচার্য। তাঁহার অন্য দুইটি নাম বা উপাধি ছিল জ্ঞানসিদ্ধি ও যশোভদ্র। ত্যাঙ্গুরে তাঁহাকে মহাচার্য, মহাযোগী উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। আচার্য জেতারির পশ্চাদগামী হিসাবে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের উত্তরদ্বারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ আগমে ছিল তাঁহার পরম পাণ্ডিত্য; হেরুক, হেবজ্র এবং অন্যান্য বজ্রযানী দেবদেবীর উপর তিনি প্রায় দশখানা সাধনগ্রন্থ, সেকোদ্দেশটীকা নামে কালচক্রযানী দীক্ষা সম্বন্ধে অন্তত একখানা গ্রন্থ, দুইখানি বজ্রগীতি, একটি নাড়-পণ্ডিত গীতিকা এবং বজ্রপদসারসংগ্রহ গ্রন্থের উপর একটি টীকা রচনা করেন।

লুইপা-মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথের পরই যে সিদ্ধাচার্যের প্রসিদ্ধি তাঁহার নাম কাহ্ন-পা বা কাহ্নপাদ। কাহ্ন-পা ছিলেন জালন্ধরীপাদের শিষ্য, এবং নাথপন্থী ও সহজপন্থীদের অন্যতম প্রধান আচার্য। তিব্বতী ঐতিহ্য মতে কাহ্ন-পা ছিলেন দেবপালের সমসাময়িক জনৈক কায়স্থ। জালন্ধর-শিষ্য কাহ্ন-কাহ্নপা-কৃষ্ণাচার্য-কৃষ্ণপাদ ছিলেন সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী, তান্ত্রিক ও বজ্রযানী সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-রচয়িতা। কাহ্ন-কাহ্নপা-কৃষ্ণাচার্য পঞ্চাশখানারও উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অধিকাংশই বজ্রযান সাধন-সম্পর্কিত। তাহা ছাড়া চর্যাগীতি-গ্রন্থে কাহ্নপাদের দশখানা গীতি আছে এবং কৃষ্ণাচার্য-রচিত একখানা দোহাকোষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতাচার্য কৃষ্ণপাদ-বিরচিত,

গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হেবজ্রপঞ্জিকা নামে একখানা পুঁথি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

বাংলার সিদ্ধাচার্যদের তালিকা সুদীর্ঘ। সকলের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কয়েকজনের কথা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। লুই-পা ও নারো-পা'র এক শিষ্য ছিলেন দারিক বা দারিপাদ; ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তদ্রচিত বারোখানা বজ্রযানী-গ্রন্থের উল্লেখ আছে; চর্যাগীতিতে একটি গীতিও স্থান পাইয়াছে। লুই-পা'র এক বংশধর ছিলেন কিল-পা বা কিলপাদ; দোহাচার্যগীতিকাদৃষ্টি নামে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিরু-পা'র এক বংশধর কর্মার বা কর্মারি একখানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বীণাপাদ বা বীণা-পাও ছিলেন বিরু-পার অন্যতম বংশধর। তিনি খুব ভাল বীণা বাজাইতেন; বজ্রডাকিনী এবং গুহ্যসমাজের উপর তিনি অন্তত দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; চর্যাগীতিতে তদ্রচিত একটি গীতি স্থানলাভ করিয়াছে। কৃষ্ণপাদের এক বংশধর ছিলেন ধর্মপাদ বা গুণ্ডারীপাদ। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তদ্রচিত বারোখানা গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে এবং চর্যাগীতিতে আছে দুইটি গীত। কম্বলপাদের এক বংশধর ছিলেন কঙ্কণ; চর্যাগীতিতে তদ্রচিত একটি গীত আছে; তাহা ছাড়া চর্যাদোহাকোষগীতিকা নামে তিনি একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। গর্ভরী-পা বা গর্ভপাদ বা গাড়ুরিসিদ্ধ হেবজ্রের উপর একখানা গ্রন্থ এবং একখানা বজ্রযান টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

এইসব আচার্যরা শুধু কেবল বজ্রযানী সাধন, দোহা এবং গীতিই রচনা করেন নাই, অথবা শুধু তন্ত্রধর্মেরই অনুশীলন করেন নাই, মহাযানী ন্যায়শাস্ত্র, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শন প্রভৃতির আলোচনাও করিয়াছেন এবং কিছু কিছু মৌলিক চিন্তার প্রমাণও দিয়াছেন। ধর্মপালের সময় হইতেই সে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার উপর আচার্য হরিভদ্র-রচিত অভিসময়ালঙ্কারালোক নামীয় টীকায় হরিভদ্র নাগার্জুন-প্রবর্তিত মধ্যমক চিন্তা ও মৈত্রেয়নাথের যোগাচার-চিন্তার যে সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। টীকাখানি লেখা হইয়াছিল ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়, ত্রৈকূটক-বিহারে। একাদশ শতকের গোড়ায় আচার্য রত্নভদ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হয়। হরিভদ্র এই সুপ্রসিদ্ধ টীকাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার একটি সংক্ষিপ্তসার, সঞ্চয়টীকা-সুবোধিনী, স্ফুটার্থনামক টীকা এবং প্রজ্ঞাপারমিতা-ভাবনাই উল্লেখযোগ্য। আচার্য অসঙ্গ ও বিমুক্তসেনের মতামত ও গ্রন্থাদির উপরও তিনি কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন।

হরিভদ্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন আচার্য বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তিব্বতী জনশ্রুতি মতে তিনি ছিলেন ধর্মপালের সমসাময়িক এবং বিক্রমশীল-মহাবিহারের অধ্যক্ষ; তিনি মহাযান-লক্ষণসমুচ্চয় নামক একখানা মৌলিক গ্রন্থ এবং প্রজ্ঞা-প্রদীপাবলী নামে অভিসময়ালঙ্কারের একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন।

জিনমিত্র নামে আর-একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন রাজা ধর্মপাল, আচার্য দানশীল ও শীলেন্দ্রবোধির সমসাময়িক। শেষোক্ত দুইজন আচার্যের সঙ্গে একযোগে জিনমিত্র একখানি সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধান রচনা করিয়াছিলেন। এই তিনজন একযোগে নাগার্জুনের প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়কারিকা-গ্রন্থখানি তিব্বতীতে অনুবাদও

করিয়াছিলেন। জিনমিত্র আর-একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তিব্বতী পণ্ডিত জ্ঞানসেনের সহযোগিতায়; গ্রন্থটির নাম অভিধর্মসমুচ্চয়ব্যাখ্যা।

শান্তিরক্ষিতের মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা ও তাহার বৃত্তি এবং সত্যদ্বয়বিভঙ্গ-পঞ্জিকাও মহাযানী গ্রন্থ। দশম শতকের শেষে বা একাদশ শতকের গোড়ায় রত্নাকর শান্তি মৈত্রেয়নাথের অভিসময়ালঙ্কার-গ্রন্থের উপর শুদ্ধিমতী নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত সারোত্তমা, প্রজ্ঞাপারমিতাভাবনোপদেশ এবং প্রজ্ঞাপারমিতোপদেশ এই তিনখানি গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা। দীপঙ্করগুরু জেতারির বোধিচিত্তোৎপাদসমাদানবিধি এবং বোধিসত্ত্বশিক্ষাক্রম দুইই মহাযানী গ্রন্থ।

তিব্বতী ঐতিহ্য মতে দীপঙ্কর মহাযানের উপর প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময়, সূত্রার্থসমুচ্চয়োপদেশ, প্রজ্ঞা-পারমিতাপিণ্ডার্থপ্রদীপ, মধ্যমোপদেশ সত্যদ্বয়বার, সংগ্রহগর্ভ, বোধিসত্ত্বমণ্যাবলী, মহাযানপথ-সাধনবর্ণসংগ্রহ এবং বোধিমার্গপ্রদীপ উল্লেখযোগ্য।

রামপালের রাজত্বকালে অভয়াকর-গুপ্ত যোগাবলী, মর্মকৌমুদী, এবং বোধি-পদ্ধতি নামে তিনখানা মহাযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কুলদত্ত-রচিত মহাযানের ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষ্য ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোমপুর-বিহারবাসী বোধিভদ্রের জ্ঞানসারসমুচ্চয়ও মহাযান-গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। জগদ্দলের বিভূতিচন্দ্র শান্তিদেব-রচিত বোধিচর্যাবতারের একখানি টীকা লিখিয়া-ছিলেন; আর-একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন দীপঙ্কর স্বয়ং।

এতক্ষণ যেসব বৌদ্ধ আচার্য ও তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানসাধনার কথা বলা হইল তাহার কেন্দ্র ছিল বাংলার বৌদ্ধ-বিহারগুলি। সমসাময়িক বাংলার সংস্কৃতি-প্রচেষ্টায় ইহাদের দানের পরিমাপ করিতে হইলে সমগ্রভবে ইহাদের একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

পাল-চন্দ্রপর্বের আগেও বাংলাদেশে বিহার-সংঘারামের কিছু যে অপ্রতুলতা ছিল না তাহার সাক্ষ্য রাজকীয় লিপিমালা, ফা-হিয়ান, য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ও ই-ৎসিঙের বিবরণ। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টে তিনটি বিহারের উল্লেখ আছে—রুদ্রদত্তের আশ্রম-বিহার, রাজবিহার ও জিনসেন-বিহার। ফা-হিয়ানের সময় এক তাম্রলিপ্তিতেই বাইশটি বিহার ছিল। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কালে পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিশটি বিহার, সমতটে ত্রিশটি, তাম্রলিপ্তিতে দশটি, কজঙ্গলে ছয়-সাতটি এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি। পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে ছিল পো-চি-পো বিহার; সাতশত মহাযানী শ্রমণ এবং পূর্ব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্যের অধিষ্ঠান ছিল এই সংঘারাম। মহাস্থান-সমীপবর্তী ভাসু-বিহারের ধ্বংসাবশেষই বোধহয় য়ুয়ান্-চোয়াঙ্-বর্ণিত পো-চি-পো বিহার। কর্ণসুবর্ণের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল লো-টো-মো-চি বা রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি)-বিহার। কজঙ্গলের উত্তরাংশে গঙ্গার অনতিদূরে একটি সুউচ্চ সুগঠিত বিহার ছিল; ই-ৎসিঙের কালে তাম্রলিপ্তির শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল পো-লো-হো বা বরাহ-বিহার। এই বিহারের ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, তাঁহাদের দৈনন্দিন নিয়ম-সংযম, খ্যাতি ও সমৃদ্ধি, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পারস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু বিবরণ ই-ৎসিঙ্ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বিহারের ব্যয়ভার কিভাবে নির্বাহ হইত ফা-হিয়ান ও ই-ৎসিঙ্ তাহারও কিছু আভাস রাখিয়া গিয়াছেন।

এইসব বিহারের আচার্যরা তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তো করিতেনই, তাহা ছাড়া মহাযান ন্যায় ও দর্শন, ব্রাহ্মণ্য তৌর্থিক শাস্ত্রাদি, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র, শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও হইত। পুঁথি নকল ও অনুবাদ করা, বৌদ্ধ বজ্রযানী-তান্ত্রিক দেবদেবীর ছবি আঁকা (ফা-হিয়ান এই ধরনের ছবি আঁকাও অভ্যাস করিয়াছিলেন তাম্রলিপ্তির বিহারে) প্রভৃতিও বিহারের ভিক্ষুদের অন্যতম অনুশীলনের বিষয় ছিল। প্রত্যেক বিহারের ছোট বড় গ্রন্থাগারও ছিল, নালন্দা-মহাবিহারের ইতিহাস এবং প্রত্নসাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ।

ই-ৎসিঙের প্রায় সমসাময়িক ত্রিপুরায় আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্রের একটি বিহার ছিল, এ খবর পাওয়া যায় দেবখড়্গের আস্রফপুরলিপিতে।

অষ্টমশতকীয় বাংলার প্রসিদ্ধতম বৌদ্ধ বিহার সোমপুরী-মহাবিহার; এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ লোকলোচনের গোচর হইয়াছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে। গোড়ায় বোধ হয় এখানে একটি জৈন-বিহার ছিল। অষ্টম শতকের শেষার্ধে ধর্মপাল নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তৃত অঙ্গন ব্যাপিয়া সুপ্রশস্ত সুসমৃদ্ধ বিহার-মন্দির গড়িয়া ওঠে। একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত এই মহাবিহার সমসাময়িক বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্ররূপে বিরাজমান ছিল। ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত বলিয়া বিহারটির অন্যতম নামই ছিল শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার: সুপ্রসিদ্ধ আচার্য ও মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র, আচার্য কালপাদ বা কালমহাপাদ, স্বনামধন্য দীপঙ্কর, স্থবিরবৃদ্ধ বীর্যেন্দ্র আচার্য, করুণাশ্রীমিত্র প্রভৃতিরা কোন না কোন সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন। এই বিহারের অন্তর্বাসী মহাযানযায়ী বিজয়াচার্য স্থবিরবৃদ্ধ বীর্যেন্দ্র বুদ্ধগয়ায় একটি স্থানক বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একাদশ শতকের শেষাশেষি বা দ্বাদশ শতকের গোড়ায় সোমপুরের এই বিহারে যতি করুণাশ্রীমিত্র বাস করিতেন: তখন একদিন বঙ্গাল-সৈন্যদল আসিয়া বিহারে অগ্নিসংযোগ করে; প্রজ্বলমান আলয়ে দেবতার পদাশ্রয় করিয়া করুণাশ্রী পড়িয়া ছিলেন, তবুও সেই গৃহ পরিত্যাগ করেন নাই; সেইভাবেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বিপুলশ্রীমিত্র অগ্নিদাহে বিনষ্ট প্রকোষ্ঠগুলির সংস্কার সাধন করেন, বিহারপ্রাঙ্গণে একটি তারামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সোমপুরীর পরই বাংলার প্রসিদ্ধ বিহার ছিল জগদ্দল-মহাবিহার। এই বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল একাদশ শতকের শেষে না হয় দ্বাদশ শতকের গোড়ায়, নরপতি রামপালের আনুকূল্যে। রামাবতীতে রামপালের রাজধানীর সন্নিকটেই ছিল বোধ হয় ইহার অবস্থিতি। জগদ্দলের আয়ু স্বল্পকাল, কিন্তু সেই স্বল্পকালের মধ্যেই সমসাময়িক বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র জগদ্দলের প্রতিষ্ঠা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকর-গুপ্ত, শুভাকর-গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি মনীষী আচার্যরা কোন না কোন সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন।

পূর্ববঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ বিহার ছিল বিক্রমপুরী-বিহার, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর-পরগনায়। এই বিক্রমপুরী-বিহারও বোধ হয় বিক্রমশীল-ধর্মপালের আনুকূল্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিক্রমপুরী-বিহারই কিছুদিনের জন্য অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র এবং লক্ষ্মীঙ্করা-শিষ্য লীলাবজ্রের কর্মভূমি ছিল।

ধর্মপালের সমসাময়িক আর-একটি বিহার ছিল বাংলাদেশে, কিন্তু কোন্ স্থানে

তাহা বলা কঠিন। এই বিহারটির নাম ত্রৈকূটক-বিহার এবং এই বিহারে বসিয়াই আচার্য হরিভদ্র অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার উপর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ টীকাটি রচনা করিয়াছিলেন। সুমপা রাঢ়দেশের এক ত্রৈকূটক-দেবালয়ের কথা বলিয়াছেন; ত্রৈকূটক দেবালয় এবং ত্রৈকূটক-বিহার এক এবং অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলেও একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল, তাহার নাম পণ্ডিত-বিহার। এই বিহার ছিল সিদ্ধাচার্য তৈলপাদের কর্মভূমি। বর্তমান ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরক নামক স্থানে একটি বিহার ছিল, তাহার নাম কনকস্তূপ-বিহার; কাশ্মীরী ভিক্ষু বিনয়শ্রীমিত্র এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর স্মৃতি এই বিহারের সঙ্গে জড়িত। ১২২০ খ্রীষ্ট বৎসরের রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের তাম্রপট্টোলীতেও পট্টিকের নগরীতে দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত একটি বিহারের উল্লেখ আছে। পট্টিকেরকের কনকস্তূপ-বিহার এবং পট্টিকেরার দুর্গোত্তারা-বিহার একই বিহার কিনা বলা কঠিন। উত্তর-বঙ্গে আর-একটি বিহার ছিল, তাহার নাম দেবীকোট-বিহার; আচার্য অদ্বয়বজ্র, ভিক্ষুণী মেখলা প্রভৃতির নাম এই বিহারের সঙ্গে জড়িত। ফুল্লহরি ও সন্নগর-বিহার নামে আরও দুইটি বিহার ছিল প্রাচ্যভারতে। ফুল্লহরির অবস্থিতি ছিল উত্তর-বিহারে, বোধ হয় মুঙ্গেরের নিকটে। সন্নগর-বিহারও বৌদ্ধ জ্ঞানসাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল, এবং আচার্য বনরত্ন সেই বিহারে বাস করিতেন; এই বিহারটির অবস্থিতিও বোধহয় ছিল প্রাচীন বাংলাদেশের বাহিরে।

পাঁচ

পাল-চন্দ্রপর্বে প্রধানত সংস্কৃতের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া যে সুবিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কিছুটা পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য লোকায়ত স্তরে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপ এবং উত্তর-ভারতের সর্বজনবোধ্য শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রচলনই ছিল বেশি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা কেহ কেহ এই শেষোক্ত ভাষায় কিছু কিছু গান এবং পদ রচনাও করিয়াছেন। মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়-বঙ্গীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় কিছু পার্থক্যও ছিল না। নবসজ্জামান (প্রাচীনতম) বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতিগুলিতে যে-ভাষা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা সদ্যোক্ত মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপেরই সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবও কিছু কিছু পড়িয়াছে।

শিক্ষিত বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে বাদ দিলে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপই ছিল এই পর্বে রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতট-চট্টলের লোকায়ত ভাষা। মূলত এই আর্যভাষায় আর্যেতর অস্ট্রিক, দ্রবিড় ও ভোটব্রহ্ম ভাষাগোষ্ঠীর নানা স্থানীয় বুলিরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল, শুধু শব্দ ও উচ্চারণভঙ্গীতেই নয়, কিছুটা বাগ্‌ভঙ্গী ও পদবিন্যাসরীতিতেও।

সুবিস্তৃত আলোচনা-গবেষণার ফলে আজ এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আনুমানিক নবম-দশম শতকে বাংলাদেশে সংস্কৃত ছাড়া আরও দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল, একটি শৌরসেনী অপভ্রংশ, আর-একটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপ—যাহাকে বলা যায় প্রাচীনতম বাংলা। একই লেখক এই দুই ভাষায়ই পদ, দোহা ও গীত প্রভৃতি রচনা করিতেন; শ্রোতা ও পাঠকেরাও দুই ভাষাই বুঝিতে পারিতেন। সংস্কৃতের মর্যাদা ও প্রভাব শিক্ষিত সমাজে ও উচ্চ বর্ণস্তরে ছিল সর্বব্যাপী: তাঁহারা সকলে

সংস্কৃতের চর্চাই করিতেন, এবং মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের কালেও অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক যখন যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন—জ্ঞানবিজ্ঞানে, সাহিত্যদর্শনে—সাধারণত সংস্কৃতের মাধ্যমেই করিয়াছেন। লোকায়ত ভাষার কৌলীন্যমর্যাদা তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এমন কি, পাল-চন্দ্রপর্বে তান্ত্রিক ও বজ্রযানী আচার্যরা যে এক ধরনের প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতের' প্রচলন করিয়াছিলেন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহারাও বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে, এক শ্রেণীর লোকেরা—যাঁহারা সাধারণত ইস্‌লাম প্রভাবে প্রভাবান্বিত—বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বোধহয় সেই প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতের ধারা বহমান রাখিয়াছিলেন; শেক-শুভোদয়া-গ্রন্থে সেই ভাষার কিছুটা আভাস ধরিতে পারা কঠিন নয়।

বলিয়াছি, সুজ্ঞামান প্রাচীনতম বাংলায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। সাহিত্য- বা জ্ঞানবিজ্ঞান -সাধনার দিক হইতে তাহার উল্লেখযোগ্য মূল্য না থাকিলেও বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতির দিক হইতে লোকায়ত ভাষার এই প্রাচীনতম নমুনাগুলির মূল্য অপরিসীম।

আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে চারিখানা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। প্রথমটিতে ছিল বিভিন্ন পদকর্তার রচিত ৪৬৷৷টি ছোট ছোট গান; বইটির নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি। গানগুলির সুবিস্তৃত সংস্কৃত টীকাও গ্রন্থটিতে আছে। বহুদিন পর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মূল-গ্রন্থের একটি তিব্বতী অনুবাদও নেপালেই আবিষ্কার করেন। তিব্বতী অনুবাদে গীত কিন্তু ৫১টি; মূল সংখ্যা বোধহয় ছিল তাহাই। এই গানগুলি প্রত্যেকটিই প্রাচীনতম বাংলায় রচিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুঁথি যথাক্রমে সিদ্ধাচার্য সরহ এবং কাহ্ন-রচিত দুইটি দোহা-সংগ্রহ। তৃতীয়টি ডাকার্ণব বা ডাক-রচিত দোহা-সংগ্রহ। এই শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থই শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এবং সংস্কৃত-টীকাযুক্ত।

আচার্য সুনীতিকুমার চর্যাগীতিগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাদের ভাষা প্রাচীনতম বাংলা ভাষার লক্ষণাক্রান্ত। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের ব্যাকরণরীতি ও বাগ্‌ভঙ্গী একান্তই বাংলা। গীতগুলিতে এমন অনেক প্রবাদ আছে যাহা আজও বাংলাদেশে সুপ্রচলিত; তাহা ছাড়া, ইহাদের মধ্যে নৌকা, নদনদী প্রভৃতি লইয়া ছবিতে উপমায় যে পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুপরিস্ফুট তাহা একান্তই নদীমাতৃক বাংলাদেশের।

৪৬৷৷টি চর্যাগীতির ২২ জন কবি সকলেই সিদ্ধাচার্য, এবং চুরাশি সিদ্ধার নামের তালিকায় ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে, ইঁহাদের প্রত্যেকের দেশ- ও কাল -নির্ণয় কঠিন। আচার্য সুনীতিকুমার, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতিরা নানাদিক হইতে কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন; এক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ছাড়া, আর সকলেই মনে করেন, এই সিদ্ধাচার্য কবিরা মোটামুটি নবম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে লুই-পা, কাহ্ন-পা, জালন্ধরী-পা বা হাড়ি-পা, শবরী-পা, ভুসুকু, তন্ত্রীপাদ প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ; মনে হয়, এই গীতরচয়িতারা সকলেই প্রাচীন বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন; যাঁহারা তাহা ছিলেন না তাঁহাদেরও অন্তত বাংলাদেশ ও বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে এই গীতিগুলির মূল্য অপরিমেয়। প্রায় প্রত্যেকটি গীতই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এবং অন্ত্যমিলে বাঁধা; প্রত্যেকটি গীত এক-একটি বিশেষ বিশেষ রাগে গাওয়া হইত। বাংলা পয়ার বা লাচাড়ী ছন্দ এই গীতিগুলির ছন্দ হইতেই বিবর্তিত; এবং যত গুহ্য অধ্যাত্মসাধনার গুরুতর তত্ত্বই ইহাদের মধ্যে নিহিত থাকুক না কেন, স্থানে স্থানে এমন পদ দুই-চারিটি আছে যাহার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও চিত্রগৌরব এক মুহূর্তে মন ও কল্পনাকে অধিকার করে। অথচ, এ কথাও সত্য যে, সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীতিগুলি রচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজসাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী জীবনাচরণের (চর্যার) আনন্দকে ব্যক্ত করিবার জন্য। সহজসাধনার এই গীতিগুলি কর্তৃক প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, আউল-বাউল-মারফতী-মুর্শিদ্যা গানের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে।

আগেই বলিয়াছি, পশ্চিম- ও উত্তর -ভারতীয় শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল সরহ ও কাহ্নের দোহাগুলি। এই দোহাগুলিও সহজসিদ্ধির গুহ্যতত্ত্ব ও আচরণ সম্বন্ধীয় এবং ইহাদেরও অর্থনিরূপণ অত্যন্ত কঠিন, তবে চর্যাগীতি অপেক্ষা সরলতর। ছন্দে ও ধ্বনিগৌরবে দোহাগুলি খুব সমৃদ্ধ, তবে অদীক্ষিতের পক্ষে ইহাদের সৌন্দর্যের অনেকখানি গুহানিহিত। ঠিক বাংলা ভাষা বা বাংলা সাহিত্য না হইলেও প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ নিবিড়; দুইই একই ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি। পরবর্তী কালের বাংলা বৈষ্ণবপদাবলীর সংগে ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণবপদাবলীর যে সম্বন্ধ, ভাষা ও ভাবপরিমণ্ডলের দিক হইতে চর্যাগীতির সঙ্গে দোহাকোষের সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। প্রাচীন বাংলায় শৌরসেনীর এই প্রভাব উত্তর-ভারতের দান, এবং এ দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেই হয়।

চর্যাগীতিগুলির পাঠ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়, গুহ্য অর্থ তাহাকে আরও যেন অস্পষ্ট করিয়া দেয়। সংস্কৃত টীকাটির ভাষা এবং অর্থও দুর্বোধ্য। দোহাকোষ সম্বন্ধেও বক্তব্য একই। চর্যার ভাষায় কোথাও শৌরসেনী অপভ্রংশের এবং কোথাও কোথাও মৈথিলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। ঠিক তেমনই দোহাগুলির অপভ্রংশে কিছু কিছু স্থানীয় বাংলা ও মৈথিলী প্রভাব ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীনতম বাংলা ভাষা যেমন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভাবের ও তত্ত্বের বাহন হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও যে সে ভাষা একেবারে ব্যবহৃত হয় নাই, এমন নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণকাহিনীর কয়েকটি নাম যে বিবর্তিত রূপে আমাদের গোচর তাহাদের ভাষাতত্ত্বগত ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। কৃষ্ণ-কাহ্ন-কানু বা কানাই, রাধিকা-রাহী-রাই, কংস-কাংস, নন্দ-নান্দ, অভিমন্যু-অহিবন্নু বা আঁহিমন্নু-আইহণ-আইমন-আয়ান প্রভৃতি নামের বিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশের মারফত প্রাচীন বাংলায় রূপান্তরের মধ্যে বোধহয় এ তথ্য লুক্কায়িত যে কৃষ্ণ-রাধিকার কাহিনী কোন না কোন সাহিত্যরূপ আশ্রয় করিয়া কামরূপে ও বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের বহু আগেই। এই সাহিত্যরূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। কামরূপরাজ বনমালদেবের একটি লিপিতে, ভোজবর্মার বেলাবালিপিতে, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থের কয়েকটি প্রকীর্ণ শ্লোকে কৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা আছে।

তাহা ছাড়া, চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১০৫১ শকে

(১১২৯ খ্রীষ্ট বৎসরে) মানসোল্লাস বা অভিলষিতার্থচিন্তামণি নামে একটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থের গীতবিনোদ অংশে ভারতবর্ষের সমসাময়িক সমস্ত স্থানীয় ভাষায় রচিত কিছু কিছু গানের দৃষ্টান্ত সংকলিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীনতম বাংলায় রচিত গানও আছে। এই বাংলা গানগুলির বিষয়বস্তু গোপীদের লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-বর্ণনা।

আচার্য সুনীতিকুমার দেখাইয়া দিয়াছেন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ-গ্রন্থে এমন কতগুলি পদ বা গান আছে যেগুলি আগেও সুরে গাওয়া হইত, এখনও হয়। গীতগোবিন্দের ভাষা শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে সংস্কৃত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ছন্দ, রীতি ও ভঙ্গী, ইহার অনুভব, ইহার প্রাণবায়ু সমস্তই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাষার, সে ভাষা প্রাচীনতম বাংলাই হোক বা বাংলাদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশই হোক। এমন কথাও কেহ কেহ বলেন, মূল গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল শৌরসেনী অপভ্রংশে বা প্রাচীনতম বাংলায়, পরে তাহার উপর একটা সংস্কৃত পোশাক পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। একদিকে চর্যাগীতি ও অন্যদিকে গীতগোবিন্দের ধারায়ই পরবর্তী কালের বৈষ্ণবপদাবলীর সৃষ্টি।

চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি প্রাকৃত-পৈঙ্গল নামে অবহট্ঠ (অপভ্রষ্ট) বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত গীতি-কবিতার একটি সংকলনগ্রন্থ রচিত হয়; প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত সংকলন করাই ছিল অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থে একাদশ-চতুর্দশশতকীয় শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এমন কয়েকটি পদ আছে যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু বাংলা শব্দ, বাংলা ধরন-ধারন প্রত্যক্ষগোচর; ভাষার দিক হইতে গীতগোবিন্দের পদগুলির সঙ্গেও কয়েকটি পদের আত্মীয়তা দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। খুব সম্ভব এই অপভ্রংশ পদগুলি বাংলাদেশেই রচিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পরিসরে ঘনীভূত ভাব ও রসের, ধ্বনি ও ছন্দের এমন সুন্দর প্রকাশ প্রাচীন কাব্যে খুব কমই দেখা যায়। আমার ধারণা, প্রাকৃত-পৈঙ্গলের অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতায় বাংলাদেশের যেটুকু পরিচয় পাইতেছি তাহা প্রাক্-তুর্কী বাংলার।

শুধু প্রেমের কবিতা বা ভক্তিরসের কবিতাই নয়, বীররসের কবিতাও প্রাকৃত-পৈঙ্গলে মিলিতেছে, এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙালীর বীরত্বের গৌণ প্রশংসাও আছে। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণরাধাকাহিনী, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি লইয়াও দুই-চারিটি ছোট ছোট কবিতা আছে। একটি শ্লোকে দেখিতেছি, কয়েকটি বিশিষ্ট মাত্রা-সংস্থানের নামকরণই হইয়াছে বাংলাদেশে পূজিতা চারিজন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবীর নামানুসারে—লক্ষ্মী, গৌরী, চুন্দা ও মহামায়া। আর-একটি শ্লোকে শিবজায়া পার্বতীর দারিদ্র্যময় সংসারের গার্হস্থ্যদুঃখ বর্ণনা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিবগৃহিণী পার্বতীর গার্হস্থ্য-বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়; সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেরও একাধিক প্রকীর্ণ শ্লোকে একই চিত্র সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর। সন্দেহ নাই, এ চিত্র একান্তই বাঙালীর এবং বাংলার আবহে-পরিবেশে আম্লাত।

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব অপভ্রংশ ভাষায়ও গীতিকবিতা রচনা করিতেন। গুর্জরী ও মারু রাগে গেয় জয়দেবের দুটি গান শিখদের শ্রীগুরুগ্রন্থে বা আদি-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, কিছুটা বিকৃত রূপে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উদ্ধার করিয়াছেন।

ধর্মাশ্রয়ী বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য গীতিকবিতা ছাড়া অপভ্রংশে কিছু কিছু প্রেমের কবিতাও যে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের আগেই, তাহার পরিচয় তো প্রাকৃত-পৈঙ্গলের কতকগুলি শ্লোকেই দেখা যাইতেছে।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মদাসের বিদগ্ধমুখমণ্ডল-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। সুকুমার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন, এই গ্রন্থের কোন কোন শ্লোক ও শ্লোকাংশ প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত; প্রাচীনতম বাংলা ভাষারও দুই-একটি ছত্র বিদ্যমান।

সুনীতিবাবু দেখাইয়াছেন, শেক-শুভোদয়ার ঊনবিংশ অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় রচিত একটি প্রেমের কবিতা আছে; কবিতাটি প্রাক্‌তুর্কী আমলের রচনা বলিয়াই মনে হয়; পরে শেক-শুভোদয়া রচনাকালে সমসাময়িক ভাষায় রূপান্তরিত করা হইয়াছিল।

ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাংলাদেশে আজও প্রচলিত তাহাও বোধহয় প্রাক্‌-তুর্কী আমলের চলতি প্রবাদসংগ্রহ; কালে কালে তাহাদের ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে মাত্র। শুভঙ্করের নামে প্রচলিত গণিত-আর্যার শ্লোকগুলিতেও অপভ্রংশের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।

লক্ষণীয় এই যে, এই পর্বে প্রাচীনতম বাংলায় এবং অপভ্রংশে রচিত সাহিত্যের অল্পস্বল্প যেসব দৃষ্টান্ত আমাদের গোচর তাহা সমস্তই গীতিকবিতা, এবং তাহার অধিকাংশ সুরে-তালে গেয়। বাংলাদেশের এই সুপ্রাচীন গীতিকাব্যের ধারার সঙ্গেই মধ্যযুগীয় বাংলা গীতিকাব্যের প্রবাহ যুক্ত, তাহা বৈষ্ণবপদাবলীর ধারাই হোক, আর মঙ্গলকাব্যের ধারাই হোক।

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল-কাব্যে চাঁদসদাগর-লখীন্দর-বেহুলা-ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্ত-কালকেতুর যে কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, গোপীচাঁদের গানে রাজা গোপীচন্দ্র-লাউসেন-ময়নামতী বা মদনাবতী-অদুনা-পদুনার যে গল্প আমরা পাইতেছি, এইসব গল্প খুব সম্ভব প্রাক্‌-তুর্কী বাংলার লোকায়ত স্তরে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, এবং অসম্ভব নয়, কিছু কিছু রচনাও হয়তো হইয়া থাকিবে। মনসামঙ্গলের গল্পে অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে ছবি তাহা মধ্যযুগীয় বাংলার ছবি নয়; সে যুগে বাংলার এই সামুদ্রিক বাণিজ্যসমৃদ্ধি আর ছিল না। মনে হয়, এই চিত্র প্রাচীনতর কালের দূরাগত স্মৃতিমাত্র; তাহারই উপর সমসাময়িক কালের প্রলেপ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্যধর্মে মনসার প্রতিষ্ঠা নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকেই; কাহিনীটিতে মনসার যে প্রতাপ দৃষ্টিগোচর তাহা প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে হওয়াই স্বাভাবিক। আর, গোপীচাঁদের গল্পে তো একাদশ-দ্বাদশশতকীয় সহজিয়া তান্ত্রিকধর্মের স্রোত সবেগে বহমান।

ছয়

দ্বাদশ শতকের সেন-বর্মণপর্ব বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। এই দুই রাজবংশই বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক, এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের স্মৃতি ও সংস্কারানুযায়ী সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়াসী। এই প্রয়াসের স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিগ্রন্থাদির অধিকতর আলোচনা ও রচনা, ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকতর প্রচার, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জীবনাদর্শের অধিকতর প্রসার। এই পর্বে বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান, বৌদ্ধ তান্ত্রিক

ধর্ম ও জীবনাদর্শ অনাদৃত; এইসব বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীগুলির প্রভাব ক্রমশই সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃত', সৃজ্যমান প্রাচীনতম বাংলা এবং শৌরসেনী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপের চর্চা যাহা এই পর্বে ছিল তাহা সাধারণত বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের মধ্যে এবং লোকায়ত স্তরের স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই পর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরভ্যুত্থান শুধু যে বাংলাদেশেই আবদ্ধ ছিল তাহা নয়। সমগ্র উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষ জুড়িয়াই তখন নূতনতর এক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টির এবং সৃষ্টির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—কাশ্মীরে, কল্যাণে (মহারাষ্ট্র), কলিঙ্গে, কনৌজে, ধারায়, মিথিলায়। লক্ষণীয় এই যে, এই পর্বের বাংলায় সমস্ত গ্রন্থরচনাই তিনটি রাজার রাজত্বকালে—হরিবর্মা, বল্লালসেন, লক্ষ্মণ-সেন; এবং সমস্ত গ্রন্থই হয় জ্যোতিষ-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্র সম্পর্কিত, অথবা কাব্য-নাটক, এবং সে কাব্য-নাটকও ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যে ভরপুর। ব্যাকরণে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে, বৌধ বিজ্ঞানবাদের আলোচনায়, তান্ত্রিক দর্শনে, নূতন সাহিত্য রীতির প্রবর্তন ও প্রচলনে যে বাংলাদেশ গুপ্তোত্তর ও পাল পর্বে প্রায় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, এই পর্বে সেসব দিকে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও যে ছিল এমন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। আসল কথা, এই পর্বে বাঙালীর মনন ও অন্বেষণের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছিল, গভীরতর এবং বহুমুখী জ্ঞানসাধনা আর ছিল না, স্বাধীন চর্চার ক্ষেত্রে স্বকীয়ত্ব প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র কবি-কল্পনার ক্ষেত্রে কিছুটা সরস প্রাণপ্রবাহ ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্তও অব্যাহত ছিল, কিন্তু সে প্রাণেরও বিস্তার বা গভীরতা স্বল্প।

এই পর্বে বাংলাদেশে যে মীমাংসার চর্চা হইত তাহার লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। তাহা ছাড়া, অনিরুদ্ধ ও ভবদেব-ভট্ট দুইজনই ছিলেন মীমাংসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তাঁহারা দুজনই কুমারিল ভট্টের মীমাংসাসম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত। হলায়ুধও বলিতেছেন, বাংলাদেশে বৈদিক শাস্ত্রাদির আলোচনা হইত না বটে, কিন্তু মীমাংসার চর্চা ছিল। এই পর্বে রচিত মীমাংসাশাস্ত্রের মাত্র দুইটি গ্রন্থের খবর আমরা জানি। একটি ভবদেব-ভট্টকৃত তৌতাতিতমততিলক অর্থাৎ তৌতাতিত বা কুমারিল-ভট্টের তন্ত্র-বার্তিক গ্রন্থের টীকা, আর-একটি হলায়ুধের মীমাংসাসর্বস্ব। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিলুপ্ত; আর, তৌতাতিতমততিলক পূর্বমীমাংসাসূত্রের একাংশের মাত্র টীকা।

এই পর্বে ধর্মশাস্ত্রের প্রসিদ্ধতম লেখক হইতেছেন রাঢ়ান্তর্গত সিদ্ধল গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ভট্ট-ভবদেব। ভবদেব নিজে বর্মণরাজ হরিবর্মা এবং সম্ভবত তাঁহার পুত্রেরও মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মন্ত্রী ছিলেন। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ভবদেব রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বেরও অধিকারী হইয়াছিলেন; সমসাময়িক কালে তাঁহার চেয়ে দুগ্ধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা, কুমারিল-ভট্টের মীমাংসাবিষয়ক মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত, বৌদ্ধদের পরম শত্রু এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের তর্কখণ্ডনে পটু, অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আয়ুর্বেদ-অস্ত্রবেদ-তন্ত্র-গণিত-সিদ্ধান্তে সুদক্ষ, জ্যোতিষে-ফলসংহিতায় দ্বিতীয় বরাহ। বাচস্পতি-রচিত ভবদেবপ্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, তিনি হোরাশাস্ত্র এবং

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এক-একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভট্টোক্ত (অর্থাৎ কুমারিলোক্ত) নীতি অনুসরণ করিয়া এক সহস্র ন্যায়ে মীমাংসাসম্বন্ধীয় আরও একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

ভবদেব-রচিত হোরাশাস্ত্রের কোন পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই। মীমাংসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি পূর্বোক্ত তৌতাতিতমততিলক, সন্দেহ নাই। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তিনখানা গ্রন্থের সংবাদ এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে—ব্যবহারতিলক, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ এবং ছন্দোগ্যকর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি (বা দশ-কর্মদীপিকা)। ব্যবহারতিলক-গ্রন্থের কোন পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই, তবে রঘুনন্দন, মিত্রমিশ্র এবং বর্ধমান প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিকর্তারা এই গ্রন্থের নানা মতামত উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহাদের রচনায়। প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে ভবদেব প্রায় ষাটজন পূর্বগামীদের মতামত উদ্ধার করিয়া ছয় প্রকারের অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল; পরবর্তী কালের বেদাচার্য, নারায়ণভট্ট এবং গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতারাও ভবদেবের মতামত উদ্ধার করিয়াছেন। ছান্দোগ্যকর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি সামবেদীয় দ্বিজবর্ণের সংস্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া ষোলো প্রকারের সংস্কারের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের মধ্যে ভবদেব-ভট্টের পরেই নাম করিতে হয় পারিভদ্রীয় মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহনের। তাঁহার বাড়ি ছিল খুব সম্ভব রাঢ়দেশে। জীমূত-বাহনের কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। খুব সম্ভব তিনি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে জীবিত ছিলেন। জীমূতবাহন অন্তত তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন—কালবিবেক, ব্যবহারমাতৃকা এবং দায়ভাগ। কালবিবেক-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পূজানুষ্ঠান, শুভকর্ম, আচার, ধর্মোৎসব প্রভৃতি পালনের শুভাশুভ কাল, সৌরমাস, চান্দ্রমাস প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা। এ গ্রন্থ সমসাময়িক কালে প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং রঘুনন্দন, শূলপাণি, বাচস্পতি, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি সকলেই সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার যুক্তি ও মতামত উদ্ধার ও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবহার-মাতৃকা-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী বিচারপদ্ধতির আলোচনা; গ্রন্থের পাঁচটি বিভাগ—ব্যবহারমুখ, ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ, এবং নির্ণয়পাদ। ব্যবহারের সংজ্ঞা বিচারকের গুণাগুণ ও কর্তব্য, নানাপ্রকার ও স্তরের ধর্মাধিকরণ, ধর্মাধিকরণ-সভ্যদের কর্তব্য, বিচারার্থীর আবেদন বা পূর্বপক্ষ; প্রতিভূ বা জামীন, প্রত্যর্থীদের চারপ্রকারের উত্তর বা জবাব, প্রমাণ বা ক্রিয়া, মানুষী ও দৈবী নানাপ্রকারের সাক্ষ্য, বিচার ও বিচারফল প্রভৃতি সমস্তই আলোচিত হইয়াছে। জীমূতবাহনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দায়ভাগ, এবং এই গ্রন্থ আজও মিতাক্ষরা-বহির্ভূত হিন্দুসমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পত্তিবিভাগ এবং স্ত্রীধন সম্পর্কে একতম সুবিখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। দায়ভাগের টীকাকার অনেক; রঘুনন্দন বারবার তাঁহার গ্রন্থে দায়ভাগের যুক্তি ও মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলাদেশে তো আজও দায়ভাগ আলোচ্য বিষয়ে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। জীমূতবাহন যে অদ্ভুত মনীষা- ও পাণ্ডিত্য -সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সুকুশলী নৈয়ায়িক ছিলেন, প্রখর ছিল তাঁহার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব, এ তথ্য অনস্বীকার্য।

ধর্মাধ্যক্ষ বরেন্দ্রান্তর্গত চম্পাহট্টীয় মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ, এবং বল্লাল-গুরু, বেদ-, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র -বিদ্ অনিরুদ্ধ একই ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। বল্লাল-সেনের দানসাগর-গ্রন্থে ইঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ বর্তমান। অনিরুদ্ধের হারলতা এবং পিতৃদয়িত উভয়ই সুবিখ্যাত গ্রন্থ। কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা-সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। হারলতা অশৌচ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা। পিতৃদয়িত সামবেদী গোভিল-পন্থীদের শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে নানা ক্রিয়া-কর্মের বর্ণনা। রঘুনন্দন এই দুই গ্রন্থেরই বিস্তৃত ব্যবহার করিয়াছেন।

অনিরুদ্ধ-শিষ্য সেনরাজ বল্লালসেন অন্তত চারখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর। দানসাগরে প্রথম দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; আচারসাগরের কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে বেদাচার্যের স্মৃতি-রত্নাকর এবং বিশ্বেশ্বর-ভট্টের মদনপারিজাত গ্রন্থদ্বয়ে। কিন্তু আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর গ্রন্থ আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। দানসাগর রচিত হইয়াছিল গুরু অনিরুদ্ধের শিক্ষার অনুপ্রেরণায়। কিন্তু রঘুনন্দন বলিতেছেন, গ্রন্থটি অনিরুদ্ধ-ভট্টের নিজের রচনা। গ্রন্থটিতে সত্তরটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের দান, দানপুণ্য, দানের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, স্থান-কাল-পাত্র, কুদান, ক্ষুদ্রদান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে; অদ্ভুতসাগর নানা শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; অদ্ভুতসাগর বল্লালসেন সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি সমাপন করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন। গ্রন্থটির রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ১০৮৯ শকে (১১৬৮ খ্রীষ্ট বৎসরে)।

দামুক-পুত্র গুণবিষ্ণু হয় বাঙালী ছিলেন না হয় মৈথিলী। হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থে গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য-গ্রন্থ প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন; কাজেই গুণবিষ্ণু হলায়ুধের পূর্বগামী। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রের প্রায় ৪০০ মন্ত্রের সুবিস্তৃত টীকা। আটটি ভাগে গুণবিষ্ণু গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্তন, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির আলোচনা করিয়াছেন। গুণবিষ্ণু ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ গ্রন্থের একটি টীকা এবং পারস্কর-গৃহ্য-সূত্রের একটি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকে সায়নাচার্য গুণবিষ্ণুর নাম করেন নাই, কিন্তু ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধও ছিলেন এ যুগের অন্যতম যুগন্ধর পণ্ডিত। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন ধর্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ঈশান ও পশুপতি যথাক্রমে আহ্নিক-পদ্ধতি এবং শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও পাকযজ্ঞ নামে দুইখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঈশান এবং পশুপতির তিনটি গ্রন্থই বিলুপ্ত; তবে জনৈক রাজপণ্ডিত পশুপতি-রচিত দশকর্ম-পদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। ধনঞ্জয়পুত্র পশুপতি এবং রাজপণ্ডিত পশুপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব নামে অন্তত পাঁচখানা গ্রন্থ হলায়ুধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব ছাড়া আর বাকি চারিটি গ্রন্থই বিলুপ্ত। শেষোক্ত দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ ও কিছু আলোচনা রঘুনন্দন করিয়াছেন। হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন, প্রধানত শুক্ল-যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম ও গৃহ্যসূত্রীয়

সংস্কারাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য। বৈদিক মন্ত্রভাষ্য রচনাই এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কাজে কাত্যায়নের ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট এবং পারস্করের গৃহ্যসূত্র তিনি প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; এবং প্রকাশ্যে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন উবট এবং গুণবিষ্ণুর।

আগেই বলিয়াছি, এই পর্বে গভীর মননের কোন নিদর্শন বাংলাদেশে নাই, সেই হেতু দর্শনগ্রন্থ রচনার চেষ্টাও নাই। তবে ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ রচনার কিছুটা চেষ্টা হইয়াছিল। বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব এবং কোষকার পুরুষোত্তম এক এবং অভিন্ন কিনা, নিঃসংশয়ে কিছু বলা কঠিন। ইঁহাদের দুইজনই বৌদ্ধ ছিলেন, নাম ছিল এক, এবং সমসাময়িক কালে জীবিত ছিলেন। সপ্তদশ শতকে সৃষ্টিধর নামে জনৈক বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব-রচিত ভাষাবৃত্তি-গ্রন্থের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকায় সৃষ্টিধর বলিতেছেন, পুরুষোত্তমদেব রাজা লক্ষ্মণসেনের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই নির্দেশে ও অনুরোধে পুরুষোত্তম তাঁহার গ্রন্থে বৈদিক ব্যাকরণ আলোচনা করেন নাই। বেদানুরক্ত, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেন কেন যে বৈদিক ব্যাকরণসূত্রগুলি বাদ দিতে বলিবেন, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ পুরুষোত্তম বৈদিক ব্যাকরণ বাদ দিতে গিয়া বৌদ্ধরীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। কাজেই লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে তথা বাংলাদেশের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম্বন্ধ সন্দেহাতীত নয়।

কোষকার পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ত্রিকাণ্ডশেষ বিখ্যাত অমরকোষের সম্পূরক; অমর যাহা বাদ দিয়া গিয়াছেন পুরুষোত্তম তাহাই পূরণ করিয়াছেন। তিনি আরও অন্তত তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—হারাবলি, বর্ণদেশনা ও দ্বিরূপকোষ। হারাবলি সাধারণত অব্যবহৃত প্রতিশব্দ ও সমশব্দের সংগ্রহ। বর্ণদেশনা গদ্য রচনা; যেসব শব্দের বানানের রূপ নানাপ্রকারের সেইসব শব্দের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। দ্বিরূপকোষে এমন সব শব্দের একটি তালিকা আছে যাহাদের বানানের দুইটি রূপ।

একাদশ শতকের শেষভাগে বৈয়াকরণিক ক্ষীরস্বামী তাঁহার অমরকোষের টীকায় অনেকবারই জনৈক গৌড়ীয় বৈয়াকরণিকের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈয়াকরণিকটি যে কে, বলিবার উপায় নাই।

আর্তিহরপুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের প্রতিষ্ঠা টীকাসর্বস্ব নামক অমরকোষের টীকার জন্য। এই গ্রন্থ বাংলার গৌরব, এবং বাংলা দেশী শব্দের সর্বপ্রাচীন সংগ্রহ। বৃহস্পতি রায়মুকুটের পদচন্দ্রিকা (১৪৩১ খ্রীষ্ট বৎসর) নামক অমরকোষের টীকায় টীকাসর্বস্ব হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে; কিন্তু এ পর্যন্ত টীকাসর্বস্ব গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপিও বাংলাদেশে পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ-ভারতে। সর্বানন্দ নিজেই বলিতেছেন, ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্ট শতকে তাঁহার গ্রন্থরচনা চলিতেছিল।

লক্ষণীয় এই, এই পর্বের জ্ঞানবিজ্ঞানসাধনা একান্তভাবেই শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরে আবদ্ধ। ধর্মশাস্ত্রগুলির দৃষ্টিপরিধির মধ্যে তো দ্বিজবর্ণ ছাড়া আর কাহারও স্থান নাই। ব্যাকরণ এবং কোষগ্রন্থগুলিতে মোটামুটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাদীক্ষারই প্রতি ফলন। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ সংঘ ও বিহার এবং সেখানে শিক্ষাটা হইত সংঘবদ্ধভাবে; ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল একক ও ব্যক্তিক এবং সে শিক্ষার কেন্দ্র ছিল গুরুগৃহ। সেই গৃহে দ্বিজবর্ণ এবং উচ্চতর বর্ণস্তরের শিক্ষার্থী ছাড়া আর কাহারও স্থান ছিল না। তাহা ছাড়া, এই পর্বের গুরুগৃহে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয়ও ছিল

সংকীর্ণ; মীমাংসা, স্মৃতি, গৃহ্যসূত্র, ব্যাকরণ ও কল্পসংহিতা-জ্যোতিষেই যেন সীমাবদ্ধ। যে ন্যায়শাস্ত্রে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা তাহাও এই পর্বে গড়িয়া ওঠে নাই। শস্ত্রবেদ, আয়ুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ কোথাও দেখিতেছি না। দর্শনশাস্ত্রের গভীর গহনে আকৃষ্ট হইবার সাহস তো নাইই। এইসব কারণেই বোধ হয় সমসাময়িক জ্ঞানবিজ্ঞানের দৃষ্টিপরিধিই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

এইরূপ অবস্থায় শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরের চিত্ত মুক্তি পাইতে চায় কবিকল্পনার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর ক্ষেত্রে। এই পর্বের শিক্ষিত সমাজে তাহাই হইয়াছিল, এবং তাহা প্রধানত রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া। সেনরাজারা সকলেই, বিশেষভাবে বল্লাল-সেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন নিজেরা কবি ছিলেন এবং কবিজনের সমাদরও করিতেন। কবি ধোয়ী লক্ষ্মণসেনকে বলিয়াছেন বাংলার বিক্রমাদিত্য। তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন অন্তত পাঁচজন সৃষ্টিধর কবি—গোবর্ধন বা গোবর্ধনাচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতি-ধর এবং কবিরাজ। কবিরাজ বোধ হয় বলা হইত ধোয়ী কবিকে, কারণ জয়দেব ধোয়ীকেই বলিয়াছেন কবি ক্ষমাপতি, এবং ধোয়ী নিজেও তাঁহার পবনদূত-কাব্যে নিজেকে ঐ বিশেষণে বিশেষিত এবং কবিরাজ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। এই পাঁচজন ছাড়াও সমসাময়িক কাব্য সংকলনগ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃতে আরও অনেক বাঙালী কবির সংবাদ এবং তাঁহাদের কাব্যনিদর্শন পাওয়া যায়। তবু, স্বীকার করিতেই হয়, এ পর্বের সমস্ত কাব্যই, এমনকি গীতগোবিন্দও ক্ষীণাত্মা ও অল্পপ্রাণ; ইহাদের মাধুর্য আছে শক্তি নাই, সুর আছে তেজ নাই, দাহ আছে দীপ্তি নাই, সহজ সৌন্দর্য আছে, ভাবের ও দৃষ্টির গভীরতা নাই।

সদ্যোক্ত কবিদের কথা বলিবার আগে নৈষধচরিত-রচয়িতা শ্রীহর্ষ, বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্ট-নারায়ণ এবং অনর্ঘরাঘব-রচয়িতা মুরারি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হয়।

নৈষধচরিত-রচয়িতা শ্রীহর্ষ বাঙালী কিনা এই লইয়া পণ্ডিতমহলে প্রচুর বিতণ্ডা বিদ্যমান। বাঙালী কুলপঞ্জিকাকারদের মতে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি বা তিথিমেধা, কিন্তু যথার্থত তাঁহার পিতা ছিলেন শ্রীহীর এবং মাতা ছিলেন মামল্লদেবী। কাব্যটি আগাগোড়া গৌড়ী রীতিতে রচিত; সর্ব অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি; শ-ষ-স লইয়া ধ্বনিসাম্য-অর্থবৈষম্যের খেলা, বাঙালীসুলভ দন্ত্য 'ন' এবং মূর্ধণ্য 'ণ', বর্গীয় 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব', বর্গীয় 'জ' এবং অন্তঃস্থ 'য' প্রভৃতির একই মূল্য দান, সামাজিক বিবাহভোজে ভাত এবং মাছ খাওয়া; ব্যঞ্জনে দই ও সরিষার ব্যবহার, দুগ্ধপক্ব বটক (বা বড়া পিঠে) খাওয়া, ভোজে বসিয়া বরযাত্রীদের ব্যবহারের নানা খুঁটিনাটি, বিবাহে উলুলু ধ্বনি, শঙ্খবলয় ও সীমন্তে সিন্দুর ব্যবহার, মঙ্গলানুষ্ঠানে আলপনা আঁকা, বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলগীত গাওয়া, দরজার দুই ধারে কদলীবৃক্ষ রোপণ, বিবাহে গাঁটছড়া বাঁধা, বিবাহসংক্রান্ত নানা স্ত্রী-আচার, বাসরঘরে আড়ি পাতিয়া শোনা, প্রভৃতি যুক্তি একত্র করিলে শ্রীহর্ষকে বাঙালী বলিয়াই মনে হয়। টীকাকারেরা সকলেই তাঁহাকে গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙালী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু বাঙালী হইলেও তাহার নৈষধ-চরিত কাব্য লইয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। মহাভারতের নল-দময়ন্তীর মধুর কাহিনীটির একাংশ মাত্র নানা অবান্তর বর্ণনায় অলংকৃত করিয়া বাইশটি সুদীর্ঘ সর্গে এমন একটি জটিল মহাকাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন যাহা ছন্দ, অলংকার এবং পাণ্ডিত্যের গৌরবে ভারাক্রান্ত, কিন্তু

যথার্থ কাব্যমূল্যে দরিদ্র ও দুর্বল।

নৈষধ-চরিত ছাড়া শ্রীহর্ষ আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার উল্লেখ নৈষধ-চরিতেই আছে: নবসাহসাংক-চরিত, স্থৈর্যবিচার-প্রকরণ, অর্ণব-বর্ণনা, শিবশক্তিসিদ্ধি, ছিন্দ-প্রশস্তি ও শ্রীবিজয়-প্রশস্তি। খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামে দর্শনের উপরও তিনি একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙালীর ঐতিহ্য বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্ট-নারায়ণকেও বাঙালী বলিয়া দাবি করে; আদিশূর-প্রবর্তিত এবং কনৌজাগত পঞ্চব্রাহ্মণের তিনি নাকি অন্যতম। এ তথ্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই। অনর্ঘরাঘব-রচয়িতা মুরারি-মিশ্রকেও অনেকে বাঙালী বলিয়া মনে করেন; টীকাকার প্রেমচন্দ্র-তর্কবাগীশ ত' তাহাই বলিতেছেন। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে উৎসবাভিনয়ের জন্য অনর্ঘরাঘব রচিত হইয়াছিল।

একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশে নাট্য-রচনার যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এবং ইহাদের অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছিল। ১৪৩১ খ্রীষ্ট বৎসরের আগে সাগরনন্দী-রচিত নাটকলক্ষণরত্নকোষ-গ্রন্থে বহু বাঙালী নাট্যকারের নাট্যরচনার উল্লেখ আছে।

সমসাময়িক বাংলাদেশের কবিমনের সম্পূর্ণ পরিচয় নৈষধ-চরিতে নাই, এমন কি ধোয়ী কবি রচিত পবনদূতেও নয়। তাহা পাওয়া যায় বাংলার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্য-রচনার মধ্যে, এবং বিশেষভাবে যে কাব্য রচিত হইয়াছিল রাজসভার আলোকমালার আড়ালে।

ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতসমাজের বাহিরেও কাব্য-সাহিত্যের রসিক একটি শ্রেণী ছিল এবং পুরা একখানা কাব্য বা প্রকীর্ণ শ্লোক যে সংস্কৃতে রচিত হইত তাহা শুধু পণ্ডিতসমাজের জন্যই নয়, বরং এই বৃহত্তর রসিক শ্রেণীটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই। প্রধানত এই শিক্ষিত রসিক শ্রেণীটির জন্যই বোধহয় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবিতা-চয়নিকা সংকলন করিবার একটা সজাগ প্রয়াস দেখা দেয়। অন্তত, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে কয়েকটি কবিতা-সংগ্রহ সুপরিচিত তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন দুইটি সংগ্রহই বাংলাদেশে বাঙালী সংকলন-কর্তাদ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত—সে দুইটি কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং সদুক্তিকর্ণামৃত। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কথা আগের পর্বে বলিয়াছি; বইখানা বোধহয় একাদশ শতকের শেষ পর্বের সংকলন।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থখানা সংকলিত হয় ১২০৬ খ্রীষ্ট বৎসরে (১১২৭ শকাব্দ), বোধহয় কেশবসেনের রাজত্বকালে। সংকলয়িতা শ্রীধরদাসের পিতা শ্রীবটুদাস লক্ষ্মণ-সেনের অন্যতম মহাসামন্ত ছিলেন। শ্রীধরদাস নিজে কবি ছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার সংকলিত শ্লোক-সংগ্রহ এবং শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করিলে এ তথ্য অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি একজন বিদগ্ধ কাব্যরসিক ও সাহিত্যবোদ্ধা ছিলেন। এই গ্রন্থ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করিয়া তরঙ্গ এবং প্রত্যেক তরঙ্গে পাঁচটি করিয়া শ্লোক; প্রত্যেক শ্লোকের শেষে সংকলয়িতার নাম দেওয়া আছে; যেসব ক্ষেত্রে নাম শ্রীধরদাসের অজ্ঞাত ছিল সেসব ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে 'কস্যাচিৎ'। গ্রন্থটিতে সর্বসমেত ৪৮৫ জন বিভিন্ন কবির রচনার নমুনা আছে; ইহাদের মধ্যে পাণিনি, ভাস, ভারবি, কালিদাস, ভামহ, অমরু, বাণভট্ট, বিহ্লন, ভর্তৃহরি, মুঞ্জ, রাজশেখর, বাক্‌পতিরাজ, বিশাখদত্ত প্রভৃতি সর্বভারতীয় কবির রচনা যেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য বাঙালী কবির রচনা। বস্তুত,

কবিদের নামের রূপ দেখিয়া মনে হয়, অনেকেরও উপর বোধহয় শ্রীধরদাসের সম-সাময়িক অথবা কিছু আগেকার গৌড়-বঙ্গীয় কবিকুলের রচনা। সুকুমার সেন মহাশয় এই বাঙালী কবিকুলের সুদীর্ঘ নামতালিকা চয়ন করিয়াছেন।

সমসাময়িক বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার চমৎকার নিদর্শন এই গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি। এই আবহাওয়া রাজসভায় রচিত স্তুতি-প্রশস্তিতে নাই। জয়দেব যে যুদ্ধ ও বীররসের কবিতা এবং মহাদেবের বন্দনাশ্লোক রচনা করিতেন গীতগোবিন্দে সে পরিচয় পাইবার সুযোগ নাই, অথচ সদুক্তিকর্ণামৃতে সে পরিচয় পাইতেছি। সেন রাজসভায় যে নানা সমস্যাপূরণ লইয়া শ্লোকরচনার প্রতিযোগিতা খেলা চলিত এ ইঙ্গিতও পাইতেছি এই গ্রন্থের কিছু প্রকীর্ণ শ্লোকে, এবং এইসব শ্লোকাশ্রয়েই জানিতেছি যে, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, শরণ ও জয়দেব পাল্লা দিয়া রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করিতেন। কবি শরণ বা উমাপতি-ধরও শুধু বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি ও স্তুতিশ্লোক লিখিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই; রাজসভার বাহিরে বসিয়া লোকায়ত জীবনের নানা প্রকীর্ণ শ্লোকও রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের এগারোটি, কেশবসেনের দশটি এবং হলায়ুধেরও পাঁচটি শ্লোক আছে।

ভবিষ্যৎ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু আভাসও সদুক্তিকর্ণামৃতের নানা শ্লোকের মধ্যে নিহিত। একটি শ্লোকে পার্বতীর বিবাহের যে বর্ণনা এবং শিবের প্রতি যে মনোভাব তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, বিশেষভাবে ভারতচন্দ্রে। কয়েকটি শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালী বর্ণনা, শিশু কার্তিকেয়ের বেশভূষায় শিবের অনুকরণ, শিবের জটাজুট লইয়া খেলার বর্ণনা প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে স্বতই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অনুরূপ ছবিগুলি মনে পড়িয়া যায়। কবি কুলশেখরের চারিটি হরিভক্তিসম্বন্ধীয় শ্লোকে এবং অজ্ঞাতনামা কোন কবির একটি শ্লোকে চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হৃদয়ধ্বনি যেন কানে আসিয়া প্রবেশ করে। এই গ্রন্থে জয়দেবের একত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে বেশির ভাগই যুদ্ধ, শৌর্য-বীর্য, তূর্যনিনাদ, সংগ্রাম, কীর্তি প্রভৃতি সম্বন্ধীয়। সন্দেহ হয়, জয়দেব বীররসেরও একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এই সংকলনে শরণ, উমাপতি-ধর, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী-কবিরাজ, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন প্রভৃতিরা তো আছেনই, কিন্তু ইঁহাদের ছাড়া অগণিত গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের সাক্ষাৎও পাইতেছি। জলচন্দ্র, যোগেশ্বর, বৈদ্য গঙ্গাধর, সাঙ্গাধর, বেতাল, ব্যাস-কবিরাজ, কেবট, পপীপ, (জনৈক) বঙ্গাল, চন্দ্রচন্দ্র, গাঙ্গোক, বিম্বোক, শুভাঙ্গোক, অনেক অজ্ঞাতনামা কবি, ইঁহারা সকলেই ছিলেন সমসাময়িক বাংলার কবি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার খুব কারণ নাই।

আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে অমরকোষের যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বাঙালী কবির রচনা হইতেও কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যকল্পতরু, দেবীশতক, বিদগ্ধমুখমণ্ডন, বৃন্দাবনযমক, বাসনামঞ্জরী (শ্রীগোবোোক রচিত) প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালী কবির রচনা বলিয়াই মনে হয়। সর্বানন্দ নিজেও ছিলেন কবি।

এইবার সেনরাজসভার পঞ্চরত্ন অর্থাৎ শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি-ধর এবং জয়দেবের কথা একটু বিশদভাবে বলা যাইতে পারে।

শরণ বা শরণদেবের কুড়িটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধার করা হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি শ্লোকে শরণ জনৈক সেন-বংশতিলকের রাজত্বে বাসের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন; অপর একটি শ্লোকে গৌড়লক্ষ্মী-প্রসঙ্গে চেদি, কলিঙ্গ, কামরূপ এবং ম্লেচ্ছ রাজের পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে। জয়দেব বলিতেছেন, কবি শরণ দুরূহ ও দ্রুত শ্লোকবন্ধনে শ্লাঘ্য ও প্রশংসনীয়।

ধোয়ী (বা ধোই, ধোয়ীক, ধূয়ী) কবিরাজ সম্বন্ধে জয়দেব বলিতেছেন, "বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি-ক্ষমাপতিঃ"। ধোয়ী পবনদূত-কাব্যের রচয়িতা হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে যত দূতকাব্য পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে ধোয়ী সুকৌশলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেনের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। কাব্যটির মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু নাই; ভাবগভীরতার পরিচয়ও স্বল্পই, তবে কোন কোন শ্লোকের চিত্রগরিমা এবং কল্পনার মাধুর্য চিত্তকে স্পর্শ করে। ধোয়ী নিজেই বলিতেছেন, পবনদূত ছাড়াও তিনি অন্য একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেসব কাব্য আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। তবে, সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁহার রচিত কুড়িটি শ্লোক আছে, এবং জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলীতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে।

কবি উমাপতি-ধর বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তির রচয়িতা, এই প্রশস্তির চারিটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সংকলনে উমাপতি-ধরের নামেই আর-একটি শ্লোক আছে যাহা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-পট্টোলীতেও হুবহু একই রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এই কারণে মনে হয়, মাধাইনগর-লিপিটিরও রচয়িতা ছিলেন উমাপতি-ধর। মেরুতুঙ্গ তাঁহার প্রবন্ধ-চিন্তামণি-গ্রন্থে বলিতেছেন, উমাপতি-ধর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। মনে হয়, বিজয়সেন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরিয়া উমাপতি সেনরাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ ছাড়িয়া পূর্ব-বঙ্গে পলায়নের পরও উমাপতি-ধর জীবিত ছিলেন এবং বিজয়ী ম্লেচ্ছ রাজের সাধুবাদ করিয়া স্তুতিশ্লোকও রচনা করিয়াছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতি-ধরের নামে ৯১টি শ্লোক আছে। এই সংকলন গ্রন্থেই আর-এক উমাপতির নামেও কয়েকটি শ্লোক আছে; এই উমাপতি চন্দ্রচূড়-চরিত নাম একটি কাব্য রচনা করিয়া-ছিলেন। এই দুই উমাপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। দেওপাড়ালিপিতে উমাপতি-ধর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, শব্দজ্ঞান ও শব্দার্থবোধ দ্বারা এই কবি পরিশুদ্ধবুদ্ধি ছিলনে; আর জয়দেব বলিতেছেন, উমাপতি-ধরের লেখনীতে বাক্য যেন পল্লবিত হইত।

গোবর্ধনাচার্য আর্যা-সপ্তশতীর কবি বলিয়াই সর্বভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই শৃঙ্গারকাব্যটি জনৈক সেনকুলতিলক ভূপতির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল। গোবর্ধন যে সুদক্ষ কবি এবং সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার আচার্য উপাধিতেই প্রমাণ; আর্যা ছন্দে রচিত সপ্তশতীর কিঞ্চিদধিক সাতশত শৃঙ্গার শ্লোকও সে সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবি হালের সরল [illegible] এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় সহজ প্রকাশের সঙ্গে গোবর্ধনাচার্যের সুচতুর [illegible] কষ্টকল্পিত কাব্যভঙ্গীর আত্মীয়তা সুদূর। জয়দেব অবশ্য বলিয়াছেন, ত্রুটিবিহীন শৃঙ্গারকাব্য

রচনায় গোবর্ধনাচার্যের কোন তুলনা ছিল না; কিন্তু ইহাও লক্ষণীয় যে, সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার প্রবাহে আর্যা-সপ্তশতীর একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। গোবর্ধনাচার্যের নামে শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে একটি এবং সূক্তিমুক্তাবলীতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে; পদ্যাবলীতে গোবর্ধনাচার্যের নামে চারিটি শ্লোক আছে। মনে হয়, সংকলয়িতা শ্রীধরদাস আর্যা-সপ্তশতীর খুব অনুরক্ত পাঠক ছিলেন না। বস্তুত, সপ্তশতীর শ্লোকগুলির শৃঙ্গার রস যেন একটু বেশি দেহতাপে তপ্ত।

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের দিক হইতে স্বল্পসংখ্যক সর্বভারতীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। ষোড়শ শতকে সন্ত কবি নাভাজী দাস তাঁহার ভক্তমাল-গ্রন্থে জয়দেবের প্রশস্তি গাহিয়া বলিতেছেন, কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র।

এই পর্বে এবং পরবর্তী কালেও জয়দেবের কবি-চক্রবর্তিত্বে প্রতিযোগিতার স্পর্ধা রাখেন, সত্যই এমন কেহ নাই। অবশ্য নাভাজীর উক্তি বৈষ্ণব সন্তের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি ও প্রেমে অনুপ্রাণিত, কাব্য- ও সাহিত্য -বোধার উক্তি বোধ হয় নয়। বস্তুত, সর্বভারত জুড়িয়া জয়দেবের খ্যাতি ভক্ত বৈষ্ণব সাধক কবিরূপে, এবং গীতগোবিন্দ যেন সেই সাধকের দৃষ্টিতে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কামমধুর ভক্তিরসময় উপায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপর শ্রুতিমধুর, রসাবেশময় গানের রচয়িতা হিসাবে জয়দেবের পক্ষে রসিক বৈষ্ণবসমাজে এবং জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ সহজেই সম্ভব হইয়াছিল; এবং পরে একবার যখন গীতগোবিন্দ চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম মূল প্রেরণা বলিয়া স্বীকৃত হইল তখন গীতগোবিন্দ হইয়া উঠিল ধর্মগ্রন্থ এবং জয়দেব হইলেন দিব্যোন্মাদ সাধক। অথচ, জয়দেব একান্তই তাহা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাধারণভাবে পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ; কল্কি এবং মহাদেবও তাঁহার অকুণ্ঠ স্তুতিপূজা লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগমার্গ সাধনার উপর কবিতা লিখিয়াছেন, শৌর্য-বীর্য-যুদ্ধ-তূর্য-সংগ্রামের উপরও কাব্য রচনা করিয়াছেন। সেই জয়দেব গীতগোবিন্দও রচনা করিয়াছিলেন, এবং সন্দেহ নাই, এ রচনা একান্তভাবে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার জন্য, যে রাজসভায় রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা এবং নানা প্রকারের কামকল্পনাভাবনাকে আশ্রয় করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় বাররামাদের নৃত্যগীত হইত। গীতগোবিন্দ, আর্যা-সপ্তশতীর শৃঙ্গার রসসমৃদ্ধ শ্লোক, পবনদূত সমস্তই সেই রাজসভার বিলাসলালসাময় সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। বাংলাদেশ যখন অর্ধেক মুসলমানদের করতলগত তখনও বিক্রমপুরে কেশবসেনের রাজসভায় একই বৃন্দাবনলীলা অব্যাহত। ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্যের মতো প্রতিভাও সেই ইন্ধনে আহুতি দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই; অথচ সেই রাজসভার বাহিরে অন্য রসের কাব্যও তাঁহারা রচনা করিয়াছেন।

আসল কথা, এই পর্বের বাংলাদেশে রাজসভায়, সামন্তসভায়, উচ্চতর সম্প্রদায়গুলির বহির্বাটীতে, এক কথায় উচ্চকোটি সমাজের সামাজিক আবহাওয়াটাই ছিল এই ধরনের। ধোয়ীই হউন আর শ্রীধরদাসই হউন, জয়দেবই হউন আর উমাপতি-ধরই হউন, সকলেই লক্ষ্মণসেনের তুলনা যেন করিয়াছেন কৃষ্ণের সঙ্গে, এবং সে কৃষ্ণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, মথুরা বৃন্দাবনের রাধালীলাসহচর কৃষ্ণ। যেখানে লক্ষ্মণসেন সেখানেই 'কেলি', তাহা রাজকীয় লিপিতেই হউক বা কবির স্তুতিতেই হউক। এ তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার বস্তু নয়। দ্বিতীয়ত, শ্রীহর্ষের নৈষধ

চরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী সর্বত্রই যেন শৃঙ্গার রসের প্রাবল্য একটু বেশি। সাহিত্যের এই চিত্র সাধারণভাবে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন, এবং এই সমাজ রাজসভাপুষ্ট অভিজাত সমাজ। তৃতীয়ত, এ যুগের কাব্যসাহিত্যে ধ্বনিতত্ত্বের প্রভাব আর নাই; এ যুগ দণ্ডী-ভামহের যুগ নয়, মম্মট-ভট্টের রসতত্ত্বের যুগ; রসই এ যুগের কাব্যে প্রধান গুণ বলিয়া কীর্তিত। সেন-রাজসভায় এবং সমসাময়িক অভিজাত স্তরে সেই রসই কামদহনে মদ্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। গীতগোবিন্দেও কিছুটা পরিমাণে সেই মদ্যই পরিবেশিত হইয়াছে, অন্তত শেষতম সর্গে।

শুধু জয়দেবের গীতগোবিন্দই নয়। প্রায় সমসাময়িক কাল বা কিছু পরবর্তী কালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও কামনাবাসনাময় আবহের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে আশ্রয় করিয়া একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়-কামনা ও প্রেমভক্তির জয়ঘোষণার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রেও সামাজিক আবহাওয়ার প্রতিফলন অনস্বীকার্য।

পরবর্তী কালে রূপ-গোস্বামীর রস-ব্যাখ্যায় প্রভাবান্বিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ গীতগোবিন্দের মধ্যে নূতন অর্থসন্ধান লাভ করিলেন; গীতগোবিন্দ অন্যতম ধর্মগ্রন্থ পর্যায়ে উন্নীত হইল। তাহার আগেই ভক্ত বৈষ্ণবসমাজ এই গ্রন্থকে কিছুটা ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দান করিয়াছিল। তাহারই ফলে জয়দেব সহজিয়া সম্প্রদায়েরও আদিগুরু, নবরসিকের অন্যতম রসিক। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ও গীতগোবিন্দকে অন্যতম ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্ঠলেশ্বর গীত-গোবিন্দের অনুকরণেই তাঁহার শৃঙ্গাররসমণ্ডন-গ্রন্থ রচনা করেন। প্রধানত এই কারণেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে গীতগোবিন্দের চল্লিশখানারও উপর টীকা রচিত হইয়াছে, অনুকরণে দশ-বারোখানা কাব্য রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে বারবার গীতগোবিন্দ হইতে অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গীত-গোবিন্দের অন্যতম প্রসিদ্ধতম টীকা মেবাড়পতি মহারানা কুম্ভের নামে প্রচলিত রসিকপ্রিয়া (১৪৩৩-১৪৬৮ খ্রীঃ)। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের একটি ওড়িয়া শিলা-লেখ হইতে (১৪৯৯) জানা যায়, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে ঐ সময় হইতে গীতগোবিন্দের গান ও শ্লোক ছাড়া জগন্নাথ-মন্দিরে অন্য কোন গান ও শ্লোক গীত হইতে পারিত না।

গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ, গীতগুলির ভাষা। এই কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা এবং সমসাময়িক কালের অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ভাষা এক উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ। আখ্যায়িকা বা বর্ণনামূলক অংশ সংস্কৃত কাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে—ভাবে, ভাষায় ও শব্দে; কিন্তু গীতগুলির সমস্ত আবহাওয়াটা অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্যের; ছন্দ ও মিলও সেই কাব্যেরই। ছন্দ তো পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত, সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরবৃত্ত নয়। ছত্রের অন্ত্য এবং আভ্যন্তর অক্ষরের মিলও অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের রীতি অনুসরণ করিয়াছে। শ্লোকগুলি একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; অন্ত্যমিল এবং ধুয়া মিলিয়া প্রত্যেকটি গীতাংশের একটি সমগ্র রূপ খুব সুস্পষ্ট। এই সমগ্র রূপ একান্তই ভাষা-কাব্যের বৈশিষ্ট্য; সংস্কৃতে এই রূপ অনুপস্থিত। মনে হয়, কাব্যের এই রূপ জয়দেব গ্রহণ করিয়া-ছিলেন লোকায়ত চলিত ভাষা-সাহিত্য হইতে। জয়দেবের কালে সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য -সাহিত্যের অবস্থা বদ্ধ জলাশয়ের মতো; জয়দেবই সর্বপ্রথম সেই সাহিত্যে

নূতন স্রোত সঞ্চার করিলেন, লোকায়ত চলিত সাহিত্যের গান ও গীতিনাট্যের খাত কাটিয়া।

জয়দেব যে যুগন্ধর ও সৃষ্টিধর কবি ছিলেন এবং তাঁহার গীতগোবিন্দ যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। প্রথমত, তাঁহার লেখনীতে সংস্কৃত কাব্যভাষার অপভ্রংশ ও ভাষাধর্মী সদ্যোক্ত রূপান্তর প্রায় বৈপ্লবিক বলিলেও চলে। দ্বিতীয়ত, অলৌকিক দেবকাহিনী ও লৌকিক প্রেম-গাথার এরূপ সমন্বয় ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই; গীত-গোবিন্দের এই সমন্বয়ের ধারায়ই পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর উদ্ভব। এই সমন্বয়ই মধ্যযুগের হিন্দু সাংস্কৃতিক নবজাগরণের, মধ্যযুগীয় হিউম্যানিজমের মূলে। অলৌকিক দেববাদের এইরূপ মানবীকরণের ইঙ্গিত বহুলভাবে জয়দেবই প্রথম সূচনা করিলেন। অন্য কবিদের রচিত সদুক্তিকর্ণামৃতের দু-চারিটি শ্লোকেও সে ইঙ্গিত কিছু কিছু পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, লোকায়ত নাট্যাভিনয়ের (যাত্রার?) নাটকীয় লক্ষণও কিছুটা এই কাব্যে বর্তমান, বিশেষত রাধার সখীদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের কথোপকথনাত্মক গীতাংশে। বস্তুত, গীতগোবিন্দে বর্ণনা-বিবৃতি, আলাপ বা কথোপকথন, এবং গীত এই তিনটি একসঙ্গে একই কাব্যরূপের মধ্যে সমন্বিত। এই রূপও একান্তই অভিনব এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত। চতুর্থত, কাব্যটির বিষয়বস্তু ধর্মগত, কিন্তু এমন লৌকিক রসাবেশময় ব্যঞ্জনা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল; ইন্দ্রিয়কামনার এমন অপূর্ব ভক্তিরসময় রূপান্তর মধ্যযুগীয় বাংলার পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। পঞ্চমত, গীতগোবিন্দ একাধারে পদ-কাব্য এবং মঙ্গলকাব্য; এবং এই হিসাবে পরবর্তী বাংলা পদাবলী-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য—এই দুই সাহিত্যধারার আদিতে গীতগোবিন্দের স্থান।

অনুমান হয়, জয়দেব অন্য এক বা একাধিক কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। জয়-দেবের রচিত দুইটি কবিতা শিখদের শ্রীগুরুগ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেবে (ষোড়শ শতক) স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে একটি যোগমার্গের পদ। সদুক্তিকর্ণামৃতে কল্কির উপরও জয়দেব-রচিত একটি পদ আছে।

জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতা রামাদেবী (পাঠান্তরে, বামাদেবী, রাধাদেবী); তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব (অজয়-নদের তীরে কেঁদুলি গ্রাম)। স্ত্রীর নাম বোধ হয় ছিল পদ্মাবতী। গীতগোবিন্দের দুইটি পদে পত্নী পদ্মাবতীর নামোল্লেখ আছে; জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন এবং পদ্মাবতী সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এই জনশ্রুতি ষোড়শ শতকেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। শেকশুভোদয়া-গ্রন্থেও জয়দেব-পদ্মাবতী সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। পদ্মাবতী যে গীতনৃত্যনিপুণা ছিলেন তাহা তাঁহার পিতার দেবদাসীরূপে কন্যাকে সমর্পণের বাসনায়, গীতগোবিন্দের শ্লোকে 'পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী' ও নাভাজী দাসের 'পদ্মাবতীসুখজনকরবি' এই আখ্যায় এবং শেক-শুভোদয়ার গল্প হইতেই অনুমান করা যায়।

এইসব সুবিস্তৃত কাব্য-সাহিত্য এবং প্রকীর্ণ শ্লোকাবলী ছাড়াও সেন-বর্মণ-রাজসভায় অলংকারবহুল উচ্ছ্বসিত কাব্য-রচনার পরিচয় পাওয়া যায় রাজকীয় লিপিগুলির প্রশস্তি শ্লোকাবলীতে, এবং এইসব শ্লোক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাজ-সভাকবিদের দ্বারা রচিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

শিল্পকলা

এক

ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত তাহার পশ্চাতে সচেতন বুদ্ধির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ। কিন্তু যেখানে বুদ্ধির লীলা সক্রিয় থাকিলেও অপ্রত্যক্ষ, কিংবা বুদ্ধিই যেখানে একমাত্র নিয়ামক নয় সংস্কৃতির সেই প্রকাশ ধরা পড়ে চারুকলায় ও সংগীতে। এ বিষয়ে ভাষা-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অপেক্ষা চারুকলা ও সংগীতের আবেদন একদিকে যেমন সূক্ষ্মতর, অন্যদিকে তেমনই প্রত্যক্ষতর এবং পরিধি হিসাবে বিস্তৃততর।

কিন্তু আদিম লোকায়ত বাঙালীর চারুকলা বা সংগীত সম্বন্ধে উপাদানের অভাবে কিছু বলিবার উপায় নাই। সাংস্কৃতিক নরতত্ত্বের গবেষণার কাজও এমন কিছু অগ্রসর হয় নাই যে, সেদিক হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। চারু-কলার কিছু কিছু উপাদান যদিও বা পাওয়া যায়, একেবারে শেষপর্বের আগে সংগীত সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যায় না। অথচ, গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষেরও প্রাথমিক সাংস্কৃতিক প্রকাশ তো গানেই। আদিম কৌম বাঙালীও নিশ্চয়ই গানের ভিতর দিয়াই তাহার আনন্দবেদনা ব্যক্ত করিত। কিন্তু সেইসব গানের কী ছিল রাগ-রাগিণী, কী ছিল সুর, তাল, লয়, মান—কিছুই আমরা জানি না। পরবর্তী কালে, একেবারে দশম-দ্বাদশ শতকে যেসব রাগ-রাগিণী, তাল-লয়ের পরিচয় পাইতেছি তাহা প্রধানত আর্যমানসের প্রকাশ, যে আর্যমানসে অন্তত কিছুটা পরিমাণে বহির্ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শও লাগিয়াছে। কিন্তু, তাহাতে কৌম বাঙালীর লোকায়ত সংগীতের প্রভাবও পড়ে নাই, এ কথাও বলা যায় না। আজিকার দিনেও বাঙালীর বাউল, ভাটিয়াল, ঝুমুর গানে যে সংস্কৃতির প্রকাশ এবং যাহা আজও বিশুদ্ধ মার্গ সংগীতের পর্যায়ে স্থান লাভ করে নাই, সেইসব গান যে কৌম বাঙালীর লোকায়ত সংগীতের ধারাই বহমান, এ কথা কোন তথ্যগত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা, শবর, গারো, খাসিয়া, কোচ প্রভৃতিদের মধ্যে যেসব সুর ও তালের গান শোনা যায়, নাচ দেখা যায়, সেইসব সুর ও তাল, নাচের ভঙ্গী প্রভৃতির মধ্যেও সুপ্রাচীন কৌম বাঙালীর নৃত্যগীতের ধারা বহমান, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। গ্রামে নিম্নস্তরের মেয়েদের মধ্যে যেসব গীত ও নৃত্য প্রচলিত, বীরভূমে রায়বেঁশেদের মধ্যে, অন্যান্য জেলায় লাঠিয়ালদের মধ্যে যে ধরনের নৃত্য আজও অভ্যস্ত তাহা সমস্তই সেই আদিম ধারার খাতে প্রবাহিত। লোকায়ত সেইসব নাচ ও গান উচ্চস্তরের কৌলীন্যকীর্তি লাভ করে নাই। তবু, সকল উপেক্ষা সহ্য করিয়া ইহারা বাঁচিয়া আছে, এবং কালে কালে ইহাদের অনেক রূপ ও ভঙ্গী মার্গস্তরে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইয়াছে।

চারুকলার ক্ষেত্রে আমাদের ব্রত ও মঙ্গলানুষ্ঠানের আলপনায়, কাঁচা ও পোড়া মাটির তৈরী পুতুল ও খেলনায়, মনসা বা গাজীর পাটচিত্রে, মাটিলেপা বেড়ার উপর

অথবা সরা ও ঘরের উপর নানা রঙীন চিত্র ও নক্‌শায়, কাঁথার উপর বিচিত্র সূচী কার্যে, ঝুলানো শিকার পরিকল্পনায়, খুঁটি ও খড়ের তৈরী ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা ঘরে, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে, এবং আরও নানাপ্রকারের গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান। এসব বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা-গবেষণা আজও আরম্ভ হয় নাই। তবু, স্বীকার করিতে বাধা নাই, এইসব বিচিত্র প্রকাশের ভিতর দিয়াই বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের কৌম লোকায়ত মানস নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু আদিপর্বের লোকায়ত বাঙালীর এইসব রচনার একটি নিদর্শনও আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই।

ইহার অন্যতম কারণ সহজভঙ্গুর উপাদানের ব্যবহার। সাধারণ লোকেরা বস-বাসের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করিত বাঁশ, কাঠ, নল, খাগড়া, খড়, পাতা প্রভৃতির সাহায্যে। কাল জয় করিবার মতন শক্তি ইহাদের ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহারও ছিল না এমন নয়; কিন্তু ইটও কালজয়ী নয়, বিশেষত বাংলার উষ্ণ, জলীয় আবহাওয়ায়। ছোটখাট মন্দিরগুলিও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চালাঘর ছাড়া কিছু ছিল না; তবে রাজ-রাজড়া এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা যেসব দেব-মন্দির, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করাইতেন সেগুলিতে প্রধানত ইট এবং খুব স্বল্প পরিমাণে পাথর—যেমন, দরজায়, জানালায়, খিলানে, সিঁড়িতে, কোণে কোণে—ব্যবহৃত হইত। বাংলাদেশ পাথরের দেশ নয়; কাজেই বহুল পরিমাণে পাথর ব্যবহারের সুযোগই ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইটের তৈরী মন্দির-বিহার ইত্যাদি ধ্বংস হইয়া মাটির ধুলায় মিশিয়া গিয়াছে। তবু যে প্রাচীন বাংলার ছোটবড় মন্দিরগুলির আকৃতি-প্রকৃতির কতকটা ধারণা আমরা করিতে পারি তাহা সম্ভব হইয়াছে পাথরের তৈরী সমসাময়িক দেবমূর্তির ফলকগুলির এবং রঙে-রেখায় আঁকা কয়েকটি পাণ্ডু-লিপি-চিত্রের সহায়তায়। এই ফলক এবং চিত্রগুলিতে সমসাময়িক মন্দিরাদির কিছু কিছু নকশা সহজেই ধরিতে পারা যায়।

মূর্তিশিল্পে পাথরের খোদাই মূর্তি ইত্যাদি যাহা নির্মিত হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু নমুনা আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে নানা খনন ও অনুসন্ধানের ফলে। কিন্তু রাজমহল পাহাড় অথবা ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে পাথর আনাইয়া ভাস্করকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া মূর্তি নির্মাণ করাইবার মতো সামর্থ্য খুব বেশি লোকের ছিল না; সেই জন্যই প্রস্তরভাস্কর্যনিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি অথবা বিহার-মন্দিরসংপৃক্ত অলংকরণ-ফলক, স্থাপত্যাংশ বা ধর্মগত পুরাণকাহিনীর প্রস্তরীকৃত প্রতিকৃতি। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব গতিভঙ্গীর এবং লোকায়ত প্রাণপ্রবাহের পরিচয় ইহাদের মধ্যে ধরা পড়িবার সুযোগ কম; ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বা আনন্দ-বেদনার প্রকাশও সেখানে সহসা ধরা পড়ে না। প্রাচীন বাংলার প্রস্তর-ভাস্কর্যে বাঙালী মনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাহার সংস্কৃতিপূত চিত্তের সমষ্টিগত গভীরতর ধ্যান-কল্পনার এবং সূক্ষ্মতর দৃষ্টির, যে-দৃষ্টি ও ধ্যানকল্পনার যোগ সর্বভারতীয় দৃষ্টি ও ধ্যানকল্পনার সঙ্গে। কাঠেও প্রচুর তক্ষণ- ও মণ্ডন -কার্য হইত, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের ভিতরও একই ভাস্কর্য-লক্ষণ সুপরিস্ফুট। কাজেই, না প্রস্তর-শিল্পে না কাষ্ঠশিল্পে সমসাময়িক লোকায়ত মানসের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। সেই পরিচয় স্বভাবতই ধরা পড়িবার কথা মৃৎশিল্পে, বিশেষত গঙ্গা-মেঘনা-

ব্রহ্মপুত্রের পলিবিস্তৃত বাংলাদেশে। দৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনায়, আনন্দ-বেদনায়, বিচিত্র গতি ও স্থিতির নানারূপে—মাটির নরম তাল লইয়া খেলার ইহাই তো প্রকৃতি। কিন্তু এইসব বিচিত্র রূপের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কোন উপাদানই আজ আর আমাদের হাতে নাই। তবু, এইসব রূপ কালজয়ী কালাতীত; কালপ্রবাহকে অতিক্রম করিয়া তাহারা আজও আমাদের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে—বাঁচিয়া আছে আমাদের ব্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নানা মূর্তিতে; গ্রামের কুমোরের তৈরী নানা মাটির পুতুল ও খেলনায়।

কিন্তু আর-এক ধরনের মাটির শিল্পরূপও লোকেরা গড়িত। সেগুলি লোকে ব্যবহার করিত ঘরের কুলুঙ্গি, মঞ্চ, দেয়াল প্রভৃতি সাজাইবার জন্য, আবার সেগুলির সাহায্যে, প্রয়োজন হইলে, বড় বড় মন্দির, বিহার প্রভৃতির বহিরঙ্গসজ্জাও হইত। বড় বড় মন্দির-বিহারের সুবিস্তৃত বহির্গাত্র শিল্পরূপে ঢাকিয়া দিবার মতো পাথরের প্রাচুর্য বাংলাদেশে ছিল না; কাজেই তখন ডাক পড়িত গ্রামের কুমোর-শিল্পীদের। এই ধরনের অন্তত কিছুটা স্থায়িত্বের প্রশ্ন যেখানে ছিল সেখানে মাটির গড়া এইসব শিল্পফলক আগুনে পোড়ানো হইত। এই ধরনের পোড়া মাটির ছোট বড় শিল্প-ফলক বাংলার নানা প্রত্নস্থান হইতে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে—খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ হইতে একেবারে অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ত; সুপ্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে। এইসব পোড়ামাটির ফলকগুলি ঠিক পূর্বোক্ত কালাতীত বা কালজয়ী প্রকৃতির নয়; বরং ইহাদের উপর কালের ছাপ সুস্পষ্ট এবং সমসাময়িক পাথরের তক্ষণশিল্পের শিল্পরূপ ও ধারার প্রভাবও ইহারা একেবারে এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু বিষয়বস্তু এবং লোকায়ত জীবনের প্রাণ-প্রবাহের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। পোড়ামাটির শিল্প সাধারণত দেবদেবীর মূর্তি নয়, কাজেই কোন শাস্ত্র বা নিয়মবন্ধন দ্বারা নিয়মিতও নয়। ইহাদের বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবনের চলমান প্রবাহের, লোকায়ত কথা ও কাহিনীর, ক্ষণস্থায়ী জীবনরূপের; বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর লোকায়ত শিল্পের প্রধান অভিজ্ঞান এই মাটির ফলকগুলিই।

প্রাচীন বাংলার লোকায়ত চিত্রশিল্পের কোন নিদর্শনই আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই; অথচ তাহা যে ছিল না, এমন নয়। ধর্মানুশাসিত উচ্চকোটি-স্তরের যে চিত্রনিদর্শনের কথা আমরা কিছু কিছু জানি তাহা সমস্তই পুঁথিচিত্র; পুঁথি-সজ্জা, পুঁথিবর্ণিত দেবদেবীর মূর্তি-পরিচয়ের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি.

দুই

আগেই বলিয়াছি, দশম-একাদশ শতকের আগে নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার মতো উপাদান আমাদের নাই। কিন্তু দশম-দ্বাদশ-শতকীয় চর্যাগীতিগুলিতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থে এমন সব রাগের ও তালের নামোল্লেখ পাইতেছি যাহাতে মনে হয়, এই সময়ের বহু আগে হইতেই প্রাচীন বাংলাদেশ ভারতীয় সংগীতের ধারাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

চর্যাগীতির পদগুলি যে সুরে তালে গাওয়া হইত তাহা গীতারম্ভের রাগের নামেই প্রমাণ; কিন্তু এসব রাগের ঠাট্ বা কাঠামো কী ছিল, যা এগুলি প্রায়

সমসাময়িক লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণীর বা কিছু পরবর্তী কালের শার্ঙ্গদেবের সংগীত-রত্নাকরের (১২১০—১২৪৭) পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত কিনা, বলা কঠিন। চর্যাগীতির ৫০টি গীত যেসব রাগে গাওয়া হইত তাহাদের সংখ্যা ১৩টি। ১; ৬-৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ এবং ৪৮ নং গীতের রাগ পটমঞ্জরী, এবং বারংবার ব্যবহারে মনে হয়, এই রাগটিই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়; ২-৩ ও ১৮নং—গবড়া বা গউড়া; ৪ অরু; ৫, ২২, ৪১, ৪৭—গুর্জরী, গুঞ্জরী, কাহ্ন-গুর্জরী; ৮—দেবক্রী; ১০, ৩২—দেশাখ; ১৩, ২৭, ৩৭, ৪২—কামোদ; ১৪—ধনসী, ধানশ্রী; ১৫, ৫০—রামক্রী; ২১, ২৩, ২৮, ৩৪—বলাড্ডী, বরাড়ী; ২৬, ৪৬—শবরী; ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯—মল্লারী; ৩৯—মালসী; ৪০—মালসী-গবড়া; ৪৩—বঙ্গাল; ১২, ১৬, ১৯, ৩৯—ভৈরবী। গবড়া ও গউড়া একই রাগ, সন্দেহ নাই, এবং খুব সম্ভব কাব্যে যেমন গৌড়ীরীতি রাগের মধ্যেও তেমনই একটি ছিল গউড়া বা গৌড়ী-রাগ, এবং তাহারই সঙ্গে মালসী বা মালশ্রী (মালব-শ্রী ?) মিশাইয়া যে মিশ্র রাগ তাহার নাম মালসী-গবড়া (৪০)। লোচন-পণ্ডিত কিন্তু এক গৌরী-রাগের নাম করিয়াছেন; গৌরী কি গৌড়ী রাগ? গুঞ্জরী গুর্জরী-রাগেরই লিপিকরপ্রমাদ, এবং কাহ্ন-গুর্জরী গুর্জরী-রাগেরই বিশেষ একপ্রকার মিশ্রিত রূপ; অসম্ভব নয়, মার্গ গুর্জরীর সঙ্গে দেশী কাহ্ন-রাগ বা সুরের মিশ্রণেই কাহ্ন-গুর্জরীর সৃষ্টি। রামক্রী-রাগ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের রামকেলি, গীতগোবিন্দের রামকিরী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রামগিরি রাগ। কিন্তু দেবক্রীর পরবর্তী ভগ্নরূপ দেবকিরী-দেবকেলী বা দেবগিরির উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বস্তুত, পরবর্তী সংগীতশাস্ত্রে বা বিভিন্ন ঘরানায় দেবক্রীরাগের কোন স্থান যেন আর নাই। দেশাখ নিঃসন্দেহে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেশাগ; কিন্তু দেশাখ কি দৈশাখ্য, অর্থাৎ কোন দেশী রাগের মার্গীকরণ? ধানসী, ধানশ্রী পরবর্তী (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন) কালের ধানুষী. এবং মল্লারী সুপরিচিত মল্লার। কিন্তু সংগীতেতিহাসের দিক হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল-রাগ। শবরী রাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গী-করণ কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগীতিতেই পাইতেছি, আগে বা পরে সে উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কী ধ্বনের আজ আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে একসময় গুর্জরী, মালবশ্রী বা মালসী, শবরী প্রভৃতি রাগের মতো স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল, সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গসংগীতে বঙ্গাল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্রনিদর্শনে বঙ্গাল-রাগের চিত্রও দুর্লভ নয়। পরে কখন কীভাবে যে এই রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যাইতেছে না। বস্তুত, চর্যাগীতির দেবক্রী, গউড়া বা গবড়া, মালসী-গবড়া, শবরী, বঙ্গাল, কাহ্নগুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত। দেশাখ-রাগ তো বোধ হয় আজিকার দেশ-রাগে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অরু-রাগ যে কী তাহাও আজ আর বুঝিবার উপায় নাই।

সমসাময়িক সংগীতপদ্ধতির একটি সংকেত চর্যাগীতে খুব সুস্পষ্ট। এই গীতগুলির মূল পুঁথিতে এবং শাস্ত্রী-মহাশয়ের সংস্করণেও প্রতি পদের প্রত্যেক দুই লাইনের শেষে "ধ্রু" এই শব্দটির উল্লেখ আছে। "ধ্রু" আসলে ধ্রুবপদের

সংকেত। বুঝিতে কিছু অসুবিধা নাই যে, প্রথম পদের পর যে পদ তাহাই ধ্রুবপদ বা বাংলা ধুয়া। প্রত্যেকটি পদ গাহিবার পরই এই ধ্রুবপদটি গাহিতে হইত। এই পদটিই বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতির 'স্থায়ী' পদ। চর্যাপদগুলির ভাব-বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায় এই ধ্রুবপদটিতেই সহজ-সাধনের সূত্রটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্যই প্রত্যেক পদ গাহিবার পরে বারবার এই পদটি গাহিবার নির্দেশ ছিল—গায়কের এবং শ্রোতার বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে বারবার ঐ দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য। উত্তর-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতিতে 'স্থায়ী'র কাজও একই; স্থায়ীতেই বিশিষ্ট রাগটির প্রধান স্বরসন্নিবেশ, এবং এই সন্নিবেশই রাগটির মনঃসত্তার কেন্দ্রবিন্দু।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলিও রাগে-তালে গাওয়া হইত। গ্রন্থটির সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই রাগ ও তালের উল্লেখও আছে। এই গানগুলিতে ব্যবহৃত রাগের ও তালের সংখ্যা যথাক্রমে ১১ ও ৫ : মালব-রাগ—রূপকতাল, যতিতাল; গুর্জরীরাগ—নিঃসারতাল, যতিতাল, একতালী, বসন্ত-রাগ—যতিতাল; রামকিরী—যতিতাল, কর্ণাট-রাগ—যতিতাল; দেশাগ-রাগ (দেশাখ) একতালী; দেশ-বরাড়ী-রাগ—রূপকতাল, অষ্টতালী, বরাড়ী-রাগ—রূপকতাল; গোণ্ডাকরী-রাগ—রূপকতাল; ভৈরবী-রাগ—যতিতাল; বিভাস-রাগ—একতালী। মালব নিঃসন্দেহে মালবশ্রী-মালসী-মালশ্রী, এবং গোড়ায় ছিল স্থানীয় লোকায়ত গানের রাগ, পরবর্তী কালে মার্গসংগীতে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। গুর্জরী-রাগের কথা চর্যাগীতি-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি; বসন্ত-ভৈরবী-বিভাস প্রভৃতি রাগ তো আজও সুপ্রসিদ্ধ ও সুঅভ্যস্ত। রামকিরী, রামক্রী রামগিরি একই রাগের বিভিন্ন নামরূপ। বরাড়ী ও দেশাখ (দেশাগ) বা দেশ-রাগের মিশ্রিত রূপে দেশ-বরাড়ী, এরূপ অনুমানে বাধা দেখিতেছি না। রামকিরী রাগের সমানুসরণে গোণ্ডাকরী খুব সম্ভব প্রাচীনতর গোণ্ডক্রী নামের অপভ্রংশ এবং মনে হয়, আদিম গোণ্ড বা গোণ্ডজনদের স্থানীয় লোকায়ত গানের রাগ। বাংলাদেশে কর্ণাট-রাগের ব্যবহারের ইঙ্গিত জয়দেবের মতো লোচন-পণ্ডিতও দিতেছেন; ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণ-সেনের অন্যতম সভাকবি, আর সেনবংশীয় রাজারা তো আদিতে কর্ণাটদেশবাসীই ছিলেন। দক্ষিণী কর্ণাটী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ক্ষীণধারার পরিচয় প্রাচীন বাংলাদেশে আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। গীতগোবিন্দের গানের তাল-গুলির মধ্যে অন্তত নিঃসার-তালের কথা পরবর্তী কালে কোথাও শুনিতেছি না। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলিতেছেন, "যেসব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে গীতগোবিন্দের গান শিখিতে গিয়া বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সংগীতাধ্যাপক মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী তাহার স্বরলিপি ও তালের খাঁট লইয়া আসেন। সেই খাঁট দেখিয়া আচার্য ভাতখণ্ডে বলেন, 'এ কী! এসব যে মালাবারের জিনিস!'" বস্তুত সমসাময়িক বাংলার সংগীতসাধনায় দক্ষিণী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। হয়তো নৃত্যেও সে প্রভাব ছিল, বিশেষত দেবদাসী নৃত্যে।

চর্যাগীতির রাগতালিকা এবং গীতগোবিন্দের রাগ- ও তাল -তালিকা বিশ্লেষণ করিলে সহজেই মনে হয়, সমসাময়িক বাংলাদেশে সংগীতচর্চার অপ্রাচুর্য ছিল না, এবং সর্বভারতীয় মার্গসংগীতপ্রবাহের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ। সংগীতশাস্ত্র লইয়াও কিছু না কিছু আলোচনা নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে। লোচন-

পণ্ডিত রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থে প্রাচীনতর তুম্বুরু নাটক-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই; তবে মনে হয়, কোন বিশেষ নাট্য-শাস্ত্র-সম্পর্কিত গ্রন্থ ছিল এই তুম্বুরু নাটক। লোচন এই গ্রন্থ হইতে কিছু মতামত উদ্ধার করিয়াছেন। সংগীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে দেশভাষা যেমন স্বল্প বিভেদে অনন্ত, তেমনই রাগের সংখ্যাও অনন্ত; রাগ ও তালের অন্ত কোথাও দেখা যায় না। ইহাই প্রাচ্যদেশীয় মত। মার্গপন্থীরা আজও এই মত স্বীকার করেন না, আগেও করিতেন বলিয়া মনে হয় না। সংগীতের দিক হইতে তুম্বুরু নাটক-গ্রন্থের মতামত অন্য কারণেও উল্লেখযোগ্য। মার্গসংগীতের ধারায় বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর জন্য বিশেষ বিশেষ কাল শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট। তুম্বুরুনাটকের রচয়িতা এই মত স্বীকার করিতেন না; তাঁহার মতে, রাগের কাল স্থিরীকৃত হয় স্বরবৈচিত্র্যের রঞ্জকতা অনুযায়ী। নাট্যরঙ্গমঞ্চে বা রাজসভায়ও কালদোষ থাকিতে পারে না। কারণ, রঙ্গভূমিতে গান গাহিতে হয় নাটকের প্রকরণ বা কালানুযায়ী এবং রাজসভায় রাজার আজ্ঞায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে চর্যাগীতিতে বুদ্ধনাটকের কথা। কিন্তু এই নাটকের কী ছিল রূপ এবং নৃত্যগীতের কী ছিল স্থান, বলিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে নৃত্য ছাড়া নাটক ছিল না; কাজেই বুদ্ধনাটকই হউক আর তুম্বুরুনাট্যই হউক, নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নাই। বিশেষত, আলোচ্য চর্যাগীতিটিতেই পাইতেছি, 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী বুদ্ধনাটক বিসমা হোই'।

প্রাচীন বাংলায় সংগীতশাস্ত্রালোচনার একমাত্র নিদর্শন যাহা আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী। এই গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, লোচন রাগতরঙ্গিণী ছাড়া আরও অন্তত একখানা সংগীত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার নাম ছিল রাগসংগীতসংগ্রহ, কিন্তু সে গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কালে অন্য পণ্ডিতদের রচিত আরও অনেক সংগীতশাস্ত্রের কথা লোচন ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্তু সেসব গ্রন্থের একটিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত, লোচনের রাগতরঙ্গিণী এবং শার্ঙ্গদেবের সংগীত-রত্নাকরের চেয়ে প্রাচীনতর কোন সংগীত-গ্রন্থের কথাই আমরা জানি না।

লোচনের রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থে দেশী ভাষার গানের নমুনা হিসাবে মৈথিল অপভ্রংশে রচিত বিদ্যাপতির মৈথিলগীতি উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থে আমীর খসরু (ত্রয়োদশ শতকের শেষ, চতুর্দশ শতকের গোড়ায়) বা তাঁহার কিছু পরে প্রচলিত ইমন্, ফিরদোস্ত্ প্রভৃতি রাগের নাম আছে। সেই হেতু পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন, লোচন চতুর্দশ শতকের আগের লোক হইতে পারেন না। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, ১০৮২ শকাব্দ=১১৬০ খ্রীষ্ট বৎসরে বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসরে লোচন-পণ্ডিত রাগ-তরঙ্গিণী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; বিদ্যাপতির গান বা ইমন্ ও ফিরদোস্ত্-রাগের কথা প্রভৃতি পরবর্তী কালে এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভেই লোচন স্বরসংস্থান সংজ্ঞার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুদ্ধ স্বর সাতটি এবং তাহা বাইশটি শ্রুতির মধ্যে যথাস্থানে অধিষ্ঠিত; বিকৃত স্বর হইল শুদ্ধ স্বরের তীব্র বা কোমল রূপ মাত্র; কাজেই সাতটি শুদ্ধ স্বরই তিনি

ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত বিকৃত স্বর হইতেছে কোমল ঋষভ, তীব্রতর গান্ধার, তীব্রতম মধ্যম, কোমল ধৈবত এবং তীব্রতর নিষাদ; বিকৃত স্বরকে তিনি বলিতেছেন কাকলী। পূরবী বা পূরবীতে লোচন নিজে তীব্র ধৈবত ব্যবহার করিয়াছেন। আর যেসব তালের (চঞ্চৎপুট, চাচপুট ইত্যাদি) কথা তিনি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ বা অভ্যাস পরবর্তী কালে দেখা যাইতেছে না।

লোচনের মতে প্রাচ্যদেশে প্রচলিত রাগ বারোটি মাত্র; ইহাদের প্রত্যেকটিরই নাম ও লক্ষণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। এই বারোটি রাগই [ভৈরবী, গৌরী (গৌড়ী ?), কর্ণাট, কেদার, ইমন্, সারঙ্গ, মেঘ, ধানশ্রী বা ধনাশ্রী, টোড়ী, পূর্বা, মুখারী ও দীপক] জনক-রাগ, এবং এই জনক-রাগ কয়টি হইতেই অন্যান্য অনেক রাগের উৎপত্তি—সেগুলি হইতেছে জন্য-রাগ, যেমন ভৈরবী হইতে দুইটি কর্ণাট হইতে কুড়িটি, গৌরী হইতে সাতাশটি, ইমন্ হইতে চারিটি, কেদার হইতে তেরোটি, সারঙ্গ হইতে পাঁচটি, মেঘ হইতে দশটি, ধনাশ্রী বা ধানশ্রী হইতে দুইটি এবং টোড়ী, পূর্বা, মুখারী ও দীপক এই চারিটির প্রত্যেকটি হইতে এক-একটি এই মোট ৮৬টি জন্য-রাগ। পূরবী বা পূর্বা=পূরবী, সন্দেহ নাই; কিন্তু মুখারী রাগ আজ অপ্রচলিত। এই জন্য-রাগগুলির লক্ষণ অর্থাৎ আরোহ-অবরোহ সম্বন্ধে লোচন কিছু আলোচনা করেন নাই।

লোচনের জনক- ও জন্য -রাগের প্রকরণটি পড়িলে পরিষ্কার বুঝা যায়, নানা রাগের মিশ্রণে নূতন নূতন রাগ সৃষ্ট হইত; আবার সেইসব মিশ্ররাগের মিশ্রণেও নূতন নূতন সংকর-রাগের উদ্ভব ঘটিত। লোচন তাহা জানিতেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকরণ হইল সকল দেশে গুণীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ৭৩ মিশ্র ও সংকর রাগ তাহাদের নামোল্লেখ এবং তাহাদের জনক-রাগের নির্দেশ।

লোচনের সময়ই বিভিন্ন রাগের ঠাট্-কাঠামো লইয়া কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লোচন মনে করিতেন, ভৈরবীতে শুদ্ধ সপ্তস্বর ব্যবহার করাই সংগত, কিন্তু তখনই কেহ কেহ ভৈরবী-রাগে কোমল ধৈবত ব্যবহার করিতেন। কোন্ কোন্ রাগ কখন গাওয়া হইবে সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু মতভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। লোচন তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তুম্বুরুনাটক গ্রন্থের মতামত উদ্ধার করিয়া তাহাই সমর্থন করিয়াছেন।

চর্যাগীতি-লোচন-জয়দেবের পর বহুদিন বাংলাদেশে প্রচলিত মার্গবদ্ধ রাগ-রাগিণীগুলির পরিচয় আর পাইতেছি না। প্রায় আড়াই-শত তিন শত বৎসর পর বড়ু চণ্ডীদাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি যেসব রাগে ও তালে গাওয়া হইত তাহার সংকেত উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিতে। তুলনার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া রাগগুলির নামোল্লেখ এখানে করিতেছি : কোড়া, কোড়া-দেশাগ বরাড়ী, দেশ-বরাড়ী, কহু (কহ্ন)-গুজ্জরী (গুর্জরী) বিভাস, বিভাস-কহু, বঙ্গাল, বঙ্গাল-বরাড়ী, গুজ্জরী (গুর্জরী), পাহাড়িয়া (নিঃসন্দেহে লোকায়ত রাগ), দেশাগ (দেশাখ), আহের (আহীরী, অর্থাৎ আভীর বা আহীর কৌমের লোকায়ত সংগীতের রাগ ?), রামগিরি (রামক্রী=রামকেলী), ধানুষী (ধানশ্রী), মালব (মালবশ্রী=আলশ্রী=আলসী), বেলবলী, কেদার, মল্লার, ভাটিয়ালী (নিঃসন্দেহে লোকায়ত সংগীতের রাগ), ললিত, মাহারঠা (মহারাষ্ট্র-প্রান্তের স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?), শৌরী (শৌরসেনী অর্থাৎ শূরসেন অঞ্চলের স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?), বসন্ত, ভৈরবী, শ্রী, সিন্ধোড়া

(পরবর্তী হিন্দোলা; গোড়ায় কি সিন্ধু-প্রান্তের স্থানীয় লোকায়ত রাগ?); পঠ (পট) মঞ্জরী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির তাল-মান-লয়ের পরিচয়ও সবিস্তারেই পাইতেছি। তালের মধ্যে যতি, একতাল, অষ্টতাল, রূপক, আঠ্ কক, কুড়্কক, লঘুশেখর, ক্রীড়া প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। রাগের তালিকাটি বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, বাংলাদেশের উচ্চস্তরের গানে ভারতের নানা প্রান্তের লোকায়ত সংগীতের সুর ইত্যাদি যেমন স্থান লাভ করিতেছিল, তেমনই ভারতীয় মার্গসংগীতের সঙ্গেও ক্রমশ লোকায়ত সংগীতের ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। প্রাচীন বাংলাদেশও এই সমন্বয়ক্রিয়া হইতে বাদ পড়ে নাই।

বাদ্যযন্ত্রাদির কথা আগে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি; তবে নৃত্যগীতবাদ্য সম্বন্ধে চর্যাগীতিতে পটমঞ্জরী রাগে গেয় একটি গান আছে; লাউ-এর খোলের সাহায্যে তারের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন, সপ্তস্বর, সুরের বিলাস, বত্রিশটি তার, সনৃত্য গান— সমস্তই এই গীতিটিতে সুস্পষ্ট। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীও তো স্বামীর গীতগোবিন্দ গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এমন জনশ্রুতি বিদ্যমান। নৃত্যের নানা লোকায়ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলিতে; আর উচ্চকোটি-লোকসমাজে যে ধরনের নৃত্য প্রচলিত ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ নৃত্যপর ও নৃত্যপরা নানা দেবদেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব-নারী, মন্দির-নর্তকী প্রভৃতিদের নৃত্যের গতিতে ও ভঙ্গিমায়।

তিন

পাথরে বা কাঠে তক্ষণশিল্পের যেসব দৃষ্টান্ত বাংলার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, নানা চিত্রশালায় সংগৃহীত, তাহার প্রায় অধিকাংশই এক সময় ছিল কোন না কোন মন্দির বা বিহারের অংশ—গর্ভগৃহের দেবদেবী, প্রাচীরগাত্র, কুলুঙ্গি বা দরজার অলংকরণ। স্বাভাবিক ও মৌলিক উদ্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে আজ আর ইহাদের সাক্ষাৎ পাইবার উপায় নাই, এবং সেই হেতু ইহাদের যথার্থ শিল্পরূপও আর আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়! ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা সাধারণ চিত্রশালায় ইহাদের পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি, এমন কি, রূপবোধও কিছুতেই সম্ভব নয়: ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল একটা বিশেষ প্রেরণায়, বিশেষ পরিবেশে বিশিষ্ট একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সে প্রেরণা ধর্মবোধগত—আমাদের প্রচলিত অর্থে নন্দনবোধগত নয়। সে পরিবেশ বিশিষ্ট সমাজের ও সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ঐক্য- ও মিলন -বোধগত, কারণ, পূজামন্দির বা তীর্থস্থানগুলিই ছিল সেই ঐক্য ও মিলনের কেন্দ্র, এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজ- ও সম্প্রদায় -গত ধর্ম- ও ঐক্য -বোধে ব্যক্তি ও সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা। এই প্রেরণা, পরিবেশ বা উদ্দেশ্য কিছুই আজ আর উপস্থিত নাই; কাজেই সাম্প্রতিক মানুষের পক্ষে ইহাদের যথার্থ মূল্য ও আবেদনের পরিমাপ করা কঠিন। তবু, সবিনয়ে এ কথা স্বীকার করা ভাল যে, যে শৈলী- ও রীতি -বিবর্তনের দিক হইতে আমরা সাধারণত ইহাদের মূল্য বিচার করিয়া থাকি তাহাই ইহাদের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় নয়, এমন কি প্রধান পরিচয়ও নয়। শিল্প সম্বন্ধে এই একান্ত রূপগত ও ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি একেবারেই সাম্প্রতিক কালের, এবং ভারতীয় চিন্তাধারা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী অপ্রত্যাশিত।

তাহা ছাড়া, ঘরে বসিয়া বা চিত্রশালায় ঘুরিয়া আমরা ইহাদের যে রূপ প্রত্যক্ষ করি তাহা ইহাদের উদ্দিষ্ট রূপও তো নয়। ধর্মগত ও সামাজিক, স্থানগত ও কালগত, অর্থ- ও উদ্দেশ্য -গত সমস্ত পরিবেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ ইহাদের মূল্য শুধু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হয় ইহাদের নন্দনত্ব গুণে, না হয় প্রতিমালক্ষণের অভিজ্ঞানে। অথচ, নন্দনত্বও সবটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়িতেছে না।

সাধারণভাবে এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া প্রাচীন বাংলার তক্ষণ-শিল্পালোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগেকার নির্দশন যাহা পাওয়া গিয়াছে, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তাহা স্বল্পই। স্বল্পতার প্রধান কারণ, দেশের মাটি ও জলবায়ু, পাথরের অপ্রাচুর্য যথাযথ খননা-বিষ্কারের অভাব, কিন্তু সর্বোপরি যে কারণ সক্রিয় ছিল তাহা ঐতিহাসিক। প্রাচীন বাংলাদেশে আর্য সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে ভাল করিয়া লাগেই নাই, এবং সেই সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মধ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগও খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে নাই। তাহার আগে আদিম-কোম-সন্নিবিষ্ট রাঢ়-পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজেদের সমাজসংস্থা, নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতি, নিজেদের জীবনযাত্রা লইয়া ভারতবর্ষের একধারে পড়িয়া ছিল আর্যমনের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতায়। এইসব কোম নরনারীর নিজেদের শিল্প কিছু ছিল না, এমন নয়; কিন্তু আগেই বলিয়াছি, সেসব শিল্পের উপাদান উপকরণ ছিল ক্ষীণজীবী—মাটি, খড়, বাঁশ, বড়জোর কাঠ। কাজেই সেসব নিদর্শন কালের ও প্রকৃতির হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই, যদিও তাহাদের ঐতিহ্য ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আজও অব্যাহত। ভারতবর্ষে আমরা পাথর কুঁদিতে শিখিয়াছি মাত্র মৌর্য আমলে বা তাহার কিছু আগে, কিন্তু সেই শিক্ষা বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছিতে এবং বহুল প্রচলিত হইতে আরও অনেক শত বৎসর লাগিয়াছিল। গুপ্তপর্বের আগে কিছু কিছু নির্দশন বাংলাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার বেশির ভাগই পোড়ামাটির অথবা ছোট ছোট টুকরো পাথরের। ইহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই এবং সমসাময়িক কালের মধ্যভারতীয় শিল্প শৈলীর প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বস্তুত, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনই, এই নির্দশনগুলিই বাংলাদেশে মধ্যভারতীয় আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির প্রথম পদচিহ্ন।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্যভারত জুড়িয়া পোড়ামাটির এক ধরনের শিল্পশৈলী প্রচলিত ছিল। পাটলীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্যন্ত নানা জায়গায় অল্পবিস্তর পরিমাণে এই শিল্পশৈলীর নির্দশন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ যৌবনসমৃদ্ধ নরনারীর মূর্তি, বিশেষভাবে নারীমূর্তি, কিছু কিছু শিশুমূর্তিও আছে, কিছু কিছু আছে শুধু শিশুমুণ্ড ও নরনারী-মুণ্ড। অনেকগুলি মুণ্ডের আকৃতি ও মুখাবয়বে, কেশবিন্যাসে এবং মস্তকাভরণে সমসাময়িক যাবনিক (গ্রীক ও রোম্যান) বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। তাহা ছাড়া, মাটি দ্বারা প্রতিকৃতি রচনার প্রচলনও নিঃসন্দেহে ছিল। নানা চলিত কথা ও কাহিনীর রূপায়ণও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশে পোখরনা (বাঁকুড়া জেলা), তমলুক, মহাস্থান প্রভৃতি প্রত্নভূমি হইতে যে কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহা ঠিক

এইজাতীয় বর্ণনাগত ফলক নহে; বরং তাহাদের আত্মীয়তা পূর্বোক্ত যৌবনগর্বিতা অলংকারভারগ্রস্তা, আত্মসচেতনা নারীমূর্তিগুলির সঙ্গে। ইহাদের সর্বাঙ্গে স্থূল অথচ বিচিত্র আয়তন ও আকৃতির অলংকার; কেশভার সুপ্রচুর এবং নানা আকারে ও ভঙ্গীতে সেই কেশের বিন্যাস; যৌন- ও যৌবন -লক্ষণ আয়ত ও উচ্চারিত; স্থিতি- ও গতি -ভঙ্গী সচেতন, বসন স্থূল অথচ সমৃদ্ধ এবং সমসাময়িক রুচি অনুযায়ী সুবিন্যস্ত। এই নারীমূর্তিগুলি উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ একটা স্তরের প্রতীক। রুচি, সংস্কৃতি ও অভ্যাসের দিক হইতে আদিম কৌমমানসের স্থূলত্ব ইহাদের এখনও ঘুচে নাই, অথচ ইহারা যে সমাজের প্রতিনিধি সেই সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবেশ ইহাদিগকে দেহগত যৌবন ও সৌন্দর্য, আলংকারিক ঐশ্বর্য এবং যৌন আবেদন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। সন্দেহ নাই যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য কৌমসমাজের কখনও হইতে পারে না—সে সমাজের সহজ সারল্য ও নিরলংকার সৌন্দর্য ইহাদের মধ্যে কোথাও নাই। এমন কি, বরহুতের প্রস্তরস্তূপবেষ্টনীর ফলকগুলির নারীমূর্তির মধ্যে বসনভূষণের প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ কেশবিন্যাস সত্ত্বেও যে সলজ্জ আড়ষ্টতা, যে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব, যে ভীত মন্থরতার আভাস বর্তমান, এই নারীমূর্তিগুলি সেই স্তর বহুদিন পার হইয়া আসিয়াছে; সেই জন্যই, বহিরবয়ব বা বসনভূষণভঙ্গিমার দিক হইতে শুঙ্গ আমলের বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত ইহারা আরও কিছু পরবর্তী কালের। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যে নাগরজীবনের আভাস আমরা পাইতেছি সেই সূক্ষ্ম, সুরুচিসম্পন্ন, সচেতন ও বাণিজ্যসমৃদ্ধ অভিজাত নাগরসমাজ এখনও গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু তাহার সূচনা কেবল দেখা দিতেছে; অর্থাৎ স্থূল কৌমসমাজ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ও সচেতন নাগরসমাজে বিবর্তিত হইতেছে মাত্র। সমাজবিবর্তনের এই স্তরের ছবিই ধরা পড়িয়াছে পোড়ামাটির এই অসংখ্য ফলকগুলিতে, বিশেষভাবে নারীমূর্তিগুলিতে। এই সামাজিক অবস্থার কিছু কিছু স্বাক্ষর পড়িয়াছে সাঁচীস্তূপের প্রস্তরতোরণের ফলকগুলিতে,-স্বল্পাংশে বুদ্ধগয়ার বেষ্টনীর উপর, কিন্তু আরও উচ্চারিতরূপে মথুরার কয়েকটি প্রস্তরবেষ্টনীর গাত্রে। কিন্তু এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রুচিবোধ আরও একটু সূক্ষ্ম ও অভিজাত, এবং কারুকলার আঙ্গিক আরও সুনিপুণ। বাংলাদেশে যে কয়টি এই ধরনের মৃৎফলক পাওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে কৌশাম্বী-পাটলীপুত্র-বসাঢ় প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত খ্রীস্টপূর্ব প্রথম ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের ফলকগুলির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ।

পোড়ামাটির এই ফলকগুলি ছাড়া কতকটা কুষাণ শিল্পশৈলীর স্বল্পায়তন কয়েকটি পাথরের মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। লক্ষণীয় এই যে, সব কয়টিই উত্তর-বঙ্গীয়, এবং কুষাণ শিল্পশৈলীর কেন্দ্র মথুরার স্থানীয় লাল বালি-পাথরে তৈরি নয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি সূর্যমূর্তি এবং একটি বিষ্ণুমূর্তি। তিনটি মূর্তিরই অঙ্গরচনা ও বিন্যাস, রেখা ও ডৌল, গতি ও গড়ন একই প্রকার। রচনার ও শিল্পদৃষ্টির আপেক্ষিক স্থূলতা সত্ত্বেও মথুরার কুষাণ ও শক (?)-রাজাদের মর্মর প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে আত্মীয়তা মূর্তি তিনটির অঙ্গরাধার আকৃতি-প্রকৃতি এবং গড়নেও সুস্পষ্ট। অথচ, ইহারা শক-কুষাণ শিল্পীদের রচনা এ কথা কিছুতেই বলা চলে না; বরং ইহাদের অঙ্গভঙ্গীর আড়ষ্টতা এবং গ্রাম্য অনাড়ম্বর প্রকাশ

একান্তই আঞ্চলিক। আসল কথা, মধ্যদেশে উচ্চকোটি স্তরে যখন যে শিল্পশৈলীর প্রসার ও প্রচলন তাহার অন্তত কিছুটা তরঙ্গাভিঘাত স্তিমিতবেগে বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছে। এই মূর্তিগুলিতে তাহারই স্বাক্ষর কতকটা স্থানীয় রূপ ও রুচিদ্বারা প্রভাবিত হইয়া দেখা দিতেছে। বাংলাদেশে কিছু কিছু কুষাণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; কাজেই বাংলার শিল্পের এই পর্বে শক-কুষাণ শিল্পরীতির কিছুটা প্রভাব দেখা যাইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি পোড়ামাটির ফলকে গুপ্তপূর্ব মথুরার, সাধারণভাবে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার শিল্পশৈলীর লক্ষণও সুপরিস্ফুট। মথুরার নারীমূর্তিগুলির দেহবিলাসের সচেতনতা ও অভিজাত সংবেদন বাণগড় ফলকের নারীমূর্তিগুলিতে নাই, কিন্তু প্রশস্তমেখলা, পীনপয়োধরা এবং অলংকারবহুলা এই নারীদের অঙ্গবিন্যাস একান্তই সেই মধ্যদেশীয় ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, এবং এই হিসাবে ইহারা পূর্বোক্ত মহাস্থান-পোখরনা-তাম্রলিপ্তির ফলক-চিত্রিত নারীদেরই বংশধর। তবে বাণগড়ের নারীমূর্তিগুলিতে সমসাময়িক ও ভাবীকালের ইঙ্গিতও সমান প্রত্যক্ষ। সে ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে ইহাদের ঈষদানত পয়োধরের মসৃণ ডৌলে, সুভৌল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, গড়নের আপেক্ষিক মসৃণতায় এবং সৌকুমার্যে। ইহাদের মধ্যে যেন গুপ্ত আমলের রুচি ও রূপাদর্শের দূরাগত ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা যাইতেছে।

মথুরার শক-কুষাণ তক্ষণশৈলীর কালগত স্বাভাবিক পরিণতি গুপ্তপর্বের তক্ষণশৈলীতে। গুপ্তশিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সারনাথ। মথুরার ভারী, দৃঢ়, স্থূল, একান্ত ইহগত এবং সূক্ষ্মানুভূতিবিহীন বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বই ক্রমশ গুপ্ত আমলের সূক্ষ্ম, মার্জিত, পেলব, ধ্যানকেন্দ্রিক, যোগগর্ভ বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব মূর্তিতে, বিষ্ণু-মূর্তিতে রূপান্তর লাভ করে। এই রূপান্তরের মধ্যে সমগ্র ভারতীয় বুদ্ধি ও কল্পনার, মনন ও সাধনার সুগভীর ও সুবিস্তৃত ইতিহাস বিধৃত।

সারনাথের প্রভাব পূর্বাঞ্চলে আসামের তেজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই প্রভাবের ধারাস্রোত বাংলাদেশের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমসাময়িক মূর্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত চুনারের বালি-পাথরে রচিত একটি বুদ্ধপ্রতিমায় পঞ্চম-ষষ্ঠশতকীয় সারনাথের প্রতিধ্বনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই মূর্তিটির মসৃণ, মার্জিত, রমণীয় ডৌল, সুকুমার অঙ্গবিন্যাস ও সৌষ্ঠব, শান্ত সৌম্য ধ্যানগম্ভীর দৃষ্টি একান্তই সমসাময়িক মধ্যগাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। গভীর ধ্যানলব্ধ আনন্দের, চরম জ্ঞান ও উপলব্ধির, পরম পরিতৃপ্তির সহজ, সংযত ও মার্জিত প্রকাশই সারনাথ-শৈলীর বৈশিষ্ট্য। বিহারৈল প্রতিমাটি এই হিসাবে যেন সারনাথ-শৈলীরই একটি স্থানীয় রূপ—একটু কম সূক্ষ্ম, একটু কম পেলব।

সুলতানগঞ্জের ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তিতে অথবা রাজগীর মণিয়ার-মঠের প্রতিমা-গুলিতে সারনাথ-শৈলীর যে পূর্বাঞ্চলিক ভাষা প্রত্যক্ষ, সেই ভাষারূপ কতকটা ধরা পড়িয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিটিতে। আনুমানিক ষষ্ঠশতকীয় এই প্রতিমাটির বলিষ্ঠ ত্রিবলীচিহ্ন, অলংকারবিরলতা, কাঠামোর দৃঢ় সংযত সারল্য, চক্রাকৃতি প্রভামণ্ডল গুপ্ত ঐতিহ্য ও লক্ষণের দ্যোতক, কিন্তু ইহার মাংসল দেহের কবোষ্ণ সংবেদনের মধ্যে পূর্বাঞ্চলিক দেহমাধুর্যবেদনও সমান প্রত্যক্ষ

সুন্দরবন-কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্যপ্রতিমাটিতেও মার্জিত রসবোধ ও অধ্যাত্ম-চেতনার আভাস দৃষ্টিগোচর। এই প্রতিমাটিতে গুপ্তশৈলীর পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যতটা ধরা পড়িয়াছে, বাংলায় প্রাপ্ত আর কোন প্রতিমাতেই এমন সুস্পষ্ট হইয়া তাহা ধরা পড়ে নাই। কালবিচারে কাশীপুরের প্রতিমাটি হয়তো দেওড়ার প্রতিমাপেক্ষা প্রাচীনতর, কিন্তু গঠনসৌষ্ঠবে কাশীপুর-সূর্য অনেক বেশি মার্জিত, দৃষ্টি ও কল্পনায় গভীরতর, এবং অনুভব বেশি পেলব ও সংবৃত।

বলাইধাপ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতু-নির্মিত স্বর্ণপত্রমণ্ডিত মঞ্জুশ্রী-প্রতিমাটিতেও পূর্বাঞ্চলিক আবেগময়তা এবং ডৌল ও গঠনরীতির উক্ত সংবেদনশীলতা সমান প্রত্যক্ষ। দেহডৌলের সঙ্গে বসনের ঘনিষ্ঠতা, অলংকারবিরলতা, সহজ ও নিরাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গী—সমস্তই পূর্বাঞ্চলিক গুপ্তশৈলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ।

মুর্শিদাবাদ-মালার গ্রামে প্রাপ্ত চক্রপুরুষের একটি মূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। এই মূর্তিটির ডৌলে, গড়নে এবং রচনাবিন্যাসে গুপ্তশৈলীর পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকীয় বাংলার তক্ষণশিল্পের সাধারণ লক্ষণ ও প্রকৃতি সমসাময়িক উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের শিল্পলক্ষণ ও প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যসূত্রে গাঁথা। সারনাথ-শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলিক আবেগপ্রাধান্য এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও সমান প্রত্যক্ষ। লক্ষণীয় যে, এই পর্বে গুপ্তশৈলীর যে-কয়টি স্থানীয় রূপের নিদর্শন বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই উত্তর-বঙ্গ বা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন হইতে।

তৃতীয়-চতুর্থ শতকে উত্তর-ভারতীয় মনন ও কল্পনা মথুরা-বুদ্ধগয়ার যে রূপপ্রচেষ্টায় স্বপ্রকাশ, পঞ্চম শতকে সারনাথ-উদয়গিরি-মথুরাতে তাহার পূর্ণ পরিণতি। সূক্ষ্মতম বোধ, গভীরতম ধ্যান ও চরমতম জ্ঞানের এমন সুনিপুণ অঙ্গসৌষ্ঠবময় সুকুশলী প্রকাশ শুধু ভারতীয় শিল্পে কেন, পৃথিবীর তক্ষণশিল্পেই বিরল। সমসাময়িক সারনাথ ক্ল্যাসিকাল শিল্পের শিখরচূড়ায় আসীন। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ হইতেই উত্তর-ভারতীয় তক্ষণশিল্পে বিবশতা দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং সমগ্র সপ্তম শতক জুড়িয়া তাহার আভাস সুস্পষ্ট। অন্যদিকে এই সময়েই আবার নবতর শিল্পপ্রেরণাও ধীরে ধীরে রূপগ্রহণ করে। এই নবতর রীতি বা আদর্শের প্রেরণা কোন্ মূলে, কোন্ উপাদান হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলা কঠিন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতেই মধ্য-এশিয়ার নানা যাযাবর জাতি ভারতবর্ষের বুকে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে—প্রথম তরঙ্গে য়ুয়ে-চি-শক-কুষাণ, দ্বিতীয় তরঙ্গে আভীর (দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক), তৃতীয় তরঙ্গে হূণ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক)। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক-একটি বিশেষ সংস্কৃতির বাহক ছিলেন। কিন্তু বহুদিন সেই সংস্কৃতির কোন সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই। তবে ভিতরে ভিতরে তাহা যে পুরাতন ভারতীয় রীতি ও আদর্শকে রূপান্তরিত করিতেছিল, অন্তত শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম শতক হইতে ভারতীয় ভাস্কর্যে, প্রাচীরচিত্রে ও অন্যান্য শিল্পে তাহার স্বাক্ষরও ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। তাহা ছাড়া, সপ্তম শতক হইতে নেপাল ও ভোটদেশ বা তিব্বতের সঙ্গেও বঙ্গ ও প্রাচ্য-ভারতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং

প্রাচীন কিরাত বা বোড়ো সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাবও অষ্টম শতক হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে আবার সপ্তম-অষ্টম শতক হইতেই ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতির অবসাদের ফলে স্থানীয় লোকায়ত সংস্কৃতি উচ্চকোটির সংস্কৃতি ছাপাইয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবার সুযোগ লাভ করে। এই রূপান্তরের আর এক অর্থ, ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূচনা। কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় ঘটনা মধ্যযুগের সূচনা করে নাই, কোন নির্দিষ্ট সন-তারিখও নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির, রাষ্ট্র ও সমাজের যে প্রকৃতি ও আদর্শ দ্বারা মধ্যযুগ চিহ্নিত, জনসংঘাতের ফলে সেই প্রকৃতি ও আদর্শ কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেখা দিতেছিল, এবং জৈব নিয়মের বশেই তাহা ধীরে ধীরে লালিত ও বর্ধিত হইতেছিল।

সদ্যোক্ত রূপান্তরের একেবারে সূচনার মুখে (আনুমানিক সপ্তম শতক) কয়েকটি প্রতিমা বাংলাদেশেও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি ধাতুমূর্তি উল্লেখযোগ্য একটি দেবখড়্গ-মহিষী প্রভাবতীর লিপি-উৎকীর্ণ অষ্টধাতুনির্মিত সর্বাণী-দেবীমূর্তি প্রাপ্তিস্থান ত্রিপুরা জেলার দেউলবাড়ি গ্রাম। দ্বিতীয়টি স্বল্পায়তন, ইহারও প্রাপ্তিস্থান দেউলবাড়ি গ্রাম· শিল্পবিষয় রথোপরি উপবিষ্ট সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য। তৃতীয়টি ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত একটি দণ্ডায়মান শিবপ্রতিমা প্রাপ্তিস্থান ২৪-পরগনা জেলার মণিরহাট গ্রাম। পঞ্চম-ষষ্ঠশতকীয় গুপ্ত-তক্ষণশিল্পে প্রতিমা-রূপের যে রূপান্তর পরবর্তী কালে দেখা দেয় তাহা এই তিনটি নিদর্শনেই সুস্পষ্ট। সর্বাণী মূর্তিটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণ, ইহার ঋজু ও আড়ষ্ট দেহভঙ্গী, এবং কাঠামোর বিন্যাস তো স্পষ্টতই পরবর্তী পালশিল্পের পূর্বধ্বনিমাত্র। স্বল্পায়তন সূর্যপ্রতিমাটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। শিবমূর্তিটির গড়ন ও ডৌলে গুপ্তবৈশিষ্ট্য এখনও তাহার কিছু স্বাক্ষর রাখিয়াছে, কিন্তু সেই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম দীপ্তি আর নাই। গুপ্তমূর্তিকলার সুবর্ণযুগ অস্তমিত পরবর্তী পাল আমলের নবতর রীতি ও রূপাদর্শের সূচনা যেন দেখা যাইতেছে।

প্রাচ্য-ভারতীয় মূর্তিকলার এই পর্যায়ের কয়েকটি নিদর্শন এবং তাহার প্রভাবযুক্ত কয়েকটি প্রতিমা পাহাড়পুরমন্দিরের ভিত্তিগাত্রেও দেখা যায়। কিন্তু পাহাড়পুর-মন্দিরের শিল্পকলা আরও নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাংলার অন্তত সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক মানসের পূর্ণতর অভিব্যক্তি এই বিহার-মন্দিরের তক্ষণ-রূপায়ণে ভাষালাভ করিয়াছে।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহার-মন্দির নির্মিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে নরপতি ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু তাহার আগেও এখানে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মণ্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহার কিছু কিছু প্রতিমানিদর্শনও পরবর্তী বিহার-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রসজ্জায় ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। বিহার-মন্দিরটির বিভিন্ন স্তরের চারিদিকের প্রাচীরগাত্র অগণিত মৃৎফলকে ঢাকা; তাহা ছাড়া ভিত্তিগাত্র-সজ্জায় উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকও ব্যবহার করা হইয়াছে প্রচুর। প্রস্তরফলক সবই এক যুগের যেমন নয়, তেমনই সব একই শিল্পরীতি ও আদর্শের।

এই প্রস্তরফলকগুলির মধ্যে একধরনের ফলক দেখিতেছি যাহাদের ভঙ্গী, বিষয়-বস্তু ও শিল্পদৃষ্টি একান্তই প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত, ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর রূপায়ণই তাহাদের উদ্দেশ্য। ভঙ্গী-মর্যাদায়, সৌষ্ঠবে এবং রুচিবোধে ইহারা যে-পরিবেশ বহন করে তাহা অভিজাততান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তর ও

শ্রেণীস্তরের। ইহাদের মধ্যে ষষ্ঠ-সপ্তমশতকীয় পূর্বী গুপ্ত-শিল্পদৃষ্টি ও রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। নির্মাণকলার কোমল সংবেদনশীল রূপায়ণ তো আছেই; তাহা ছাড়া, ইহাদের বসনভূষণের সৌষ্ঠব, গড়ন এবং বিন্যাসেও গুপ্তাদর্শের মার্জিত রুচি ও সুষমাবোধ প্রত্যক্ষ। কিন্তু তাহার চেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ পূর্বাঞ্চলিক ঐতিহ্যের ভাবলুতা এবং ইন্দ্রিয়পরতা। বস্তুত, রাজগীর-মণিয়ার মঠের মূর্তিগুলির সঙ্গে এবং মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত মঞ্জুশ্রীমূর্তির শিল্পদৃষ্টি ও রীতির সঙ্গে এই ফলকগুলির আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমার বিশ্বাস, এই ফলকগুলি ষষ্ঠ-শতকীয় এবং সমসাময়িক কোন মন্দিরসজ্জায় ইহারা ব্যবহৃত হইয়াছিল; পরবর্তী কালে আহরণ করিয়া অষ্টমশতকীয় পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রসজ্জায় আবার ইহাদের ব্যবহার করা হয়।

এই দৃষ্টির স্থূল, রূঢ়, শিথিল, গুরুভার, প্রাকৃত রূপায়ণ দেখিতেছি প্রায় পনেরো-ষোলটি ফলকে। ইহাদেরও বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী, এবং ইহাদের শিল্পরূপও প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত। স্থূল, গুরুভার গড়নই ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুই একটি মূর্তিতে একটু গতিময়তার আভাস থাকিলেও একটা রূঢ় আড়ষ্টতা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। গুপ্তশৈলীর অপরূপ সূক্ষ্ম রেখা-প্রবাহের এবং স্বচ্ছ নমনীয় ডৌলের কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নাই। অর্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রশস্ত ও গুরুভার মুখমণ্ডলে দীপ্তি ও ভাবলাবণ্য যোজনার বিশেষ কোন লক্ষণ প্রায় অনুপস্থিত। রূপসৃষ্টির আনন্দের কোন চিহ্নই যেন এই ফলকগুলিতে নাই। কালের দিক হইতে ইহারাও ষষ্ঠ-সপ্তমশতকীয়, এবং লক্ষণীয় এই যে, এই ফলক-গুলিতে পরবর্তী পাল আমলের ফলকরচনাবিন্যাসের পূর্বাভাস যেমন সুস্পষ্ট তেমনি গুপ্তশৈলীর মার্জিত সংস্কৃত রূপের সঙ্গে ইহাদের দূরত্বও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

সংখ্যায় ইহাদের চেয়ে বেশি একধরনের অনেকগুলি ফলক আছে যাহার বালি-পাথর সাদাটে ধূসরবর্ণের এবং দানাদার দাগবহুল। এই ফলকগুলি সবই একই আয়তনের; এই ফলকগুলিতে নানা কাহিনীর রূপায়ণ। অনেকগুলিতে কৃষ্ণায়ণের চিত্ররূপ; কিন্তু এই কৃষ্ণ একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রানুমোদিত কৃষ্ণ নহেন; তাঁহার রূপ যেন লোকায়ত জীবনের। কতকগুলিতে রামায়ণ-মহাভারতের নানা গল্পের রূপ, এবং সেইসব গল্পের—লোকায়ত জীবনে যাহাদের আবেদন প্রত্যক্ষ। তাহা ছাড়া দৈনন্দিন লৌকিক-জীবনের নানারূপও অনেকগুলি ফলকে উৎকীর্ণ—নৃত্যপরা নারী, প্রেমচর্চারত নরনারী, যষ্ঠিতে হেলান দিয়া দাঁড়ানো বিশ্রামরত দ্বারপাল ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই বসনভূষণ স্বল্প ও নিরাভরণ; প্রকাশভঙ্গিমায় অন্তর্লোকের কোন গভীর চিন্তা বা ভাবের অভিব্যক্তি নাই। ইহাদের চালচলন ও মুখাবয়ব স্থূল এবং ক্ষেত্রবিশেষে অমার্জিত; দণ্ডায়মান ভঙ্গী বলিষ্ঠ, কিন্তু আড়ষ্ট। বৃহৎবিস্ফারিত নয়নযুগলে সহজ সারল্যময় লোকায়ত জীবনের আনন্দোজ্জ্বল হাসির স্বাক্ষর। প্রাণের প্রাচুর্য এবং স্বাভাবিক গতিময়তা, সহজ অথচ পরিপূর্ণ ও অপরূপ প্রকাশমহিমাই এই ফলকগুলির শিল্পবৈশিষ্ট্য। শিল্পশাস্ত্র এবং প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রের নিয়মবন্ধন হইতে মুক্ত এই শিল্পদৃষ্টি গভীর বস্তুচেতনাবলে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন হইতে সমস্ত রস আহরণ করিয়াছে; সাধারণ মানুষের লৌকিক ঘটনাবলী এবং তাহাদের অভিজ্ঞতাই এই শিল্পের উপজীব্য। আঙ্গিকের দিক হইতে এই শিল্পরূপ যেমন স্থূল,

অমার্জিত ও অসম্পূর্ণ, তেমনই মানবিকবোধে গভীর, জীবনের অভিব্যক্তিতে বিস্তারিত এবং শিল্পরসে তাৎপর্যময়।

এই প্রস্তরফলকগুলির সঙ্গে পূর্বোক্ত অন্য দুইটি শিল্পরূপ ও দৃষ্টির কোথাও কোন মিল নাই; কিন্তু প্রাচীরগাত্রের অসংখ্য ও বিচিত্র মৃৎফলকগুলির রূপ ও দৃষ্টির সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমসাময়িক শিল্পেতিহাসে পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রের এই ফলকগুলি এক অপরূপ বিস্ময়। শুধু পাহাড়পুরেই নয়, ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতেও ঠিক একই ধরনের অসংখ্য মৃৎফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সন্দেহ নাই, অন্যান্য বৃহদায়তন ও সমসাময়িক প্রাচীন মন্দির-বিহারের প্রাচীরগাত্রও এইভাবে মৃৎফলকের আস্তরণে শোভিত ও অলংকৃত ছিল।

পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলক-কলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক, এবং সাধারণ লোকায়ত কৃষিজীবনের মানসকল্পনাই ইহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহারা রস আহরণ করিয়াছে লোকায়ত দৈনন্দিন জীবন হইতে, এই অসংখ্য ফলকগুলিকে সারি সারিভাবে সাজাইয়া দেখিলে মনে হয়, লোকায়ত জীবন যেন এক বিচিত্র শোভাযাত্রায় চলিয়াছে, যেন এই মৃৎশিল্পীরা অনুভূতি ও সচেতন বস্তু-অভিজ্ঞতার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবিরত আন্দোলিত হইয়াছেন, এবং সেই আন্দোলন ফলকগুলির উপর প্রত্যক্ষ। ধর্মগত, উচ্চকোটিস্তরের ঐতিহ্যগত শিল্পের কোন স্তরে এমন সুবিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ, মানবিক কল্পনা ও অনুভূতির এমন বৈচিত্র্য, প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন গভীর সংযোগ, এমন স্বতোচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমা ও চলাচলন, প্রকাশের এমন সজীব ও পরিপাটি ছন্দের পরিচয় সুদুর্লভ। মানুষ ও প্রকৃতির বিস্তৃত লীলাক্ষেত্রের ক্ষুদ্রতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই দরিদ্র গ্রাম্য মৃৎশিল্পীদের গভীর চেতনা এবং জীবন সম্পর্কে তাহাদের শ্রদ্ধাশীল অভিনিবেশ এই ফলকগুলিতে সুস্পষ্ট। সমসাময়িক বাংলার লোকায়ত সামাজিক জীবনের যথার্থ বস্তুময় স্পন্দিত পরিচয় এই ফলকগুলিতে যতটা পাওয়া যায়, প্রস্তরপ্রতিমাশিল্পে ততটা কিছুতেই নয়।

আগেই বলিয়াছি, এই ফলকগুলির গড়নে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম রুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার পরিচয় সামান্যই; কিন্তু লক্ষণীয় ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা, জীব- ও মানব -দেহের গঠন, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়জগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষবোধ। এমন অপূর্ব বস্তুময়তা দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, এই শিল্প একান্তই লৌকিক শিল্প, প্রথাবদ্ধ প্রতিমাশিল্পের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ নাই। মৃৎশিল্প প্রাকৃত স্তরের শিল্প; প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় এই শিল্প অপভ্রংশ পঙ্‌ক্তির শিল্প; অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে ইহার স্থান কোথাও নাই—শিল্পশাস্ত্রে যেমন নাই সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-বিহারেও তেমন নিদর্শন কোথাও নাই।

এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই লৌকিক মৃৎশিল্প পূর্বতন যুগেও সুঅভ্যস্ত ছিল। প্রাকৃত ভাবনাকল্পনার তাৎক্ষণিক যুগের ভাষাই তো এই মৃৎশিল্প। কিন্তু, মনে হয়, এই শিল্প আজও যেমন তখনও তেমনই গ্রামে গ্রাম্য জনসাধারণের লোকায়ত জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। পাহাড়পুরে এবং ময়নামতীতে

যে এই শিল্পকে পুরোভাগে দেখিতেছি তাহার প্রধান কারণ, বাংলাদেশে পাথরের অভাব এবং প্রাকৃত সংস্কৃতির আপেক্ষিক প্রাবল্য। অষ্টম-নবম শতকের পর বহু দিন এই লোকায়ত শিল্পের নিদর্শন আর কোথাও দেখিতেছি না। বহু শতাব্দী পর, বাংলাদেশে যখন কেন্দ্রীয় রাজশক্তি অন্যতর ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, রাষ্ট্র ও রাজপ্রাসাদের সংস্কৃতিবন্ধন শিথিল, প্রথাগত ও উচ্চকোটির সংস্কৃতে ধর্মের শাসন দুর্বল, লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন কিছুটা প্রসারিত তখন, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই লোকায়ত শিল্পের আপেক্ষিক প্রসার ও প্রতিপত্তি আবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

পালপর্বের আগে প্রস্তর-ভাস্কর্যের নিদর্শন যে বাংলাদেশে খুব বেশি নাই, তাহার প্রধান কারণ সুলভ মৃৎশিল্পের প্রসার। নমনীয় মাটির নিজস্ব একটা গুণ ও প্রকৃতি তো আছেই; সহজ দ্রুত অঙ্গুলি ও করতালু চালনার ফলে নানা বিচিত্র দ্রুত ভঙ্গ ও ভঙ্গী সহজেই রূপ গ্রহণ করে, ডৌলের মার্জনা সহজ হয়। এই মাধ্যমে কাজ করার ফলে বাংলার লোকায়ত শিল্পের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আপনি ধরা দিয়াছিল। তারপর যখন এইসব শিল্পীরা মধ্য-ভারতীয় প্রভাবে পড়িয়া পাথরের কাজে হাত দিলেন তখন প্রাথমিক বাধা কতকগুলি দেখা দিবে, তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু এই বাধাসংঘাতের ভিতর দিয়াই সৃষ্টিলাভ করিল নূতন শিল্পরীতি যে রীতিতে মৃৎশিল্পের গতিময়তা, প্রাণপ্রবাহ এবং মার্জিত ডৌল একদিকে যেমন পাথরে রূপান্তরিত হইল তেমনই পাথরে কাজ করার দরুন দেহরূপে এবং ভঙ্গীতে দেখা দিল একটা দৃঢ় কাঠিন্য। এই রীতি ও ধারাই ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া পাল-পর্বের মধ্যযুগীয় পূর্বী প্রতিমাশৈলীতে বিবর্তিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশে পাথরে তৈরী নানা পর্বের যেসব প্রতিমা বা মূর্তিনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার দুই-চারিটি ছাড়া কোনটিতেই কোন সন-তারিখ উৎকীর্ণ নাই। কাজেই গঠন ও রূপ বিশ্লেষণ ছাড়া ইহাদের কালনির্ণয়ের অন্য কোন উপায় নাই।

বাংলার নানা জায়গায় প্রাপ্ত সপ্তম-অষ্টমশতকীয় মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের প্রায় সবই পূজার্চনার জন্য তৈরী দেবদেবীমূর্তি, এবং ইহাদের নির্মাণ ও রচনাবিন্যাস একান্তই প্রতিমালক্ষণশাস্ত্র দ্বারা নিয়মিত। পাহাড়পুরের দেবদেবীর মূর্তিগুলি ঠিক অর্চনার জন্য তৈরী দেবদেবীপ্রতিমা নয়, বোধ হয় প্রাচীর- বা ভিত্তিগাত্র -সজ্জার জন্যই ইহাদের রচনা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিমাশাস্ত্রের নির্দেশ একেবারে অস্বীকৃতও হয় নাই। তবে, প্রাচীর- বা ভিত্তিগাত্র -সজ্জার জন্য যে মূর্তি রচিত হইত তাহার আর কোন পৃষ্ঠপট প্রয়োজন হইত না, সাধারণত তাহার শিরোভাগের পশ্চাতে কোন শিরশ্চক্র বা প্রভামণ্ডল থাকিত না। কিন্তু গর্ভ-গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত অর্চনার জন্য যেসব দেবদেবীর প্রতিমা রচিত হইত তাহাদের পৃষ্ঠপট ও শিরশ্চক্র দুইই প্রয়োজন হইত, কিছুটা শিল্পের প্রয়োজনে সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায়, কিছুটা শাস্ত্রনির্দেশে।

চার

পাল ও সেন আমলের (আ ৭৫০-১২৫০ খ্রী) তক্ষণশিল্পের কথা বলিবার আগে কিভাবে ক্ল্যাসিক্যাল পর্বের অবসান ঘটিয়া মধ্যযুগের আভাস ক্রমশ সুস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিল, সেই ইঙ্গিতটি একটু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে একটি মৌলিক ঐক্য সুস্পষ্ট। একটি সর্বভারতীয় সার্বভৌমত্বের আদর্শও এই কয়েক শত বৎসরের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত ছিল। ভারতীয় বোধ, বুদ্ধি এবং আত্মিক সাধনার কেন্দ্রে একটি সর্বভারতীয় ঐক্য ও মানেব, কল্পনা ও মননের, ভাব ও আদর্শের প্রভাব ছিল সচেতন ও সক্রিব। গুপ্তপর্বে কালিদাসের কাব্য, সারনাথের ভাস্কর্য, অজন্তাগুহার চিত্রাবলী সেই চেতনাব চরম অভিব্যক্তি; তাহাই সর্বভারতীয় মানদণ্ড। কিন্তু সপ্তম শতকেব শেষার্ধ হইতেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নূতন বাঁক নিতে আরম্ভ করে, শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতিব ক্ষেত্রেও। রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে স্থানীয় ছোট ছোট রাজ্য ও সামন্ত-রাষ্ট্র মানুষের চেতনাকে অধিকার করিল, এবং এই আঞ্চলিক মনোবৃত্তি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনুভূত হইতে দেরি হইল না। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রেও এই সময় সর্ব-ভারতীয় মানদণ্ড ছাড়িয়া অথচ সেই মান হইতেই বিবর্তিত হইয়া আঞ্চলিক রূপ ও রীতিকে আশ্রয় করিয়া এক-একটি আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। সর্ব-ভারতাদর্শ ও বোধের ক্ষেত্রে এই সর্বব্যাপী আঞ্চলিক আদর্শ এবং বোধই ভারত-বর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচক।

বাংলাদেশে, এবং সমগ্র বঙ্গ-বিহারে, পালবংশকে আশ্রয় করিয়াই এই মধ্য-যুগীয় লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। পালরাজবংশ বৌদ্ধ, কিন্তু রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিব প্রতিও যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দুইই তাঁহাদের পোষকতা লাভ কবিত। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী। পালপর্বেব শিল্পসাধনাব পশ্চাতে রাজানুকূল্য কতখানি ছিল বা না ছিল, বলা কঠিন; কিন্তু সমৃদ্ধ বিত্তশালী লোকদের পোষকতা যে সক্রিয় ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহেব অবকাশ কম। সেন আমলে রাজবংশ ও অভিজাতচক্রেব দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন ঘটে। সেনবংশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠ-পোষক, অভিজাতচক্রও তাহাই। এই আমলেব রাজসভাপুষ্ট সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাইলে মনে হয়, রাজসভা এবং অভিজাতচক্রের সমাজে অলংকরণ ও বিলাস-ব্যসনেব আতিশয্য, জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয়তা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। সেন আমলের তক্ষণশিল্পেও এই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর, রচনাবিন্যাসে এবং দেহভঙ্গীতে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতাব আবেদন, ডৌলে ও গড়নে ইন্দ্রিয়পর ইহমুখিতার আকর্ষণ। সেইজন্য মনে হয়, এই আমলের তক্ষণশিল্পে রাজপ্রাসাদ ও অভিজাত-চক্রের রুচি ও ভাবনাই ছিল একান্তভাবে সক্রিয়।

এই চার-পাঁচ শতাব্দীর শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত; বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের যৌথ সংহত বোধ ও অভিজ্ঞতাজাত ভাবকল্পনাই ছিল সক্রিয়। এই পর্বের বৌদ্ধ, জৈন ব্রাহ্মণ্য প্রত্যেক ধর্মেরই প্রতিমার স্বকীয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ। প্রতিমাশাস্ত্রের দিক হইতে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমায় যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, শিল্পের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই; শিল্পরীতি ও আদর্শ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক।

মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্মগত পুণ্যার্জনের সৌভাগ্য সকলের ছিল না। যাঁহারা এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারিতেন তাঁহারাই কেবল সেই সুযোগ-

সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রতিমানির্মাণের রীতিনিয়ম সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ব্যক্তিগত মতামত বা নির্দেশ বা রুচি কিছু ছিল না। শিল্পী চলিত প্রথা ও আদর্শ, শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং শিল্পরীতির সাধারণ ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া মূর্তি গঠন করিতেন; তাহারই চতুঃসীমার মধ্যে শিল্পীর যাহা কিছু ভাবদৃষ্টি ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়। শাস্ত্রীয় ধ্যানগত কল্পনার সঙ্গে শিল্পীর দৃষ্টি ও ভাবনা, ধ্যান ও কল্পনা সব সময় একাত্ম হইত তাহা নয়; যখন তাহা হইত না তখন শুধু প্রতিমাই হইত, শিল্পসৃষ্টি হইত না।

শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিম্নতর স্তরের লোক। তাঁহাদের পেশা বা বৃত্তিও নিম্নস্তরের বলিয়াই গণ্য হইত। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে ভবদেব-ভট্ট যেসকল বৃত্তি ব্রাহ্মণদের পক্ষে গ্রহণীয় নয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে নট, নর্তক, তক্ষক, চিত্রোপজীবী, শিল্পী, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার এবং কর্মকারের নাম উল্লিখিত আছে।

তারনাথ এই আমলের দুইজন শিল্পী, ধীমান এবং তাঁহার পুত্র বিটপালের নাম করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, এই পিতা ও পুত্র দুইজনে তক্ষণশিল্প, ধাতব মূর্তি-শিল্প এবং চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজকীয় দলিলপত্রে এবং ঐতিহ্যে আর কোন শিল্পীর নাম বা স্মৃতিমাত্রও রক্ষিত হয় নাই। পাথরের ফলকে ও তাম্রপট্টে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন এমন বহু তক্ষকের নাম জানা যায়; তাঁহাদের কেহ কেহ শিল্পী বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

এই চারি-পাঁচ শতাব্দীর বঙ্গীয় শিল্পধারার সামাজিক পোষকতা কাহারা করিতেন তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। এই প্রেরণা ও পোষকতার স্তর তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়; (১) রাজপ্রাসাদ, রাজদরবার, সামন্তচক্র ও অভিজাতচক্র; (২) বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদের ধ্যানধারণা, ভাবকল্পনা; (৩) বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের অনুশাসনাধীন শ্রেণী- ও বর্ণ -স্তর; এবং (৪) শ্রেণী গণ বা নিগমভুক্ত শিল্পীকুল। এ তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই চারি-পাঁচ শতাব্দীর শিল্পে বৃহৎ জনসাধারণের বিশেষ কোন স্থান নাই; যাঁহাদের আছে তাঁহারা পুরোহিত শ্রেণীর এবং অল্পবিস্তর বিত্তশালী সমৃদ্ধ শ্রেণীর সংকীর্ণায়তন গোষ্ঠীর লোক; তাঁহাদেরই সংহত সমন্বিত ঐতিহ্য ভাবকল্পনা এবং চিত্তাদর্শ এই শিল্পে প্রতিফলিত। এই কয় শতাব্দীর লোকায়ত শিল্পের স্বাক্ষর যে কী ছিল, কেমন ছিল তাহার রূপ তাহা বলিবার মতন কোন অভিজ্ঞান আমাদের জানা নাই।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে পাল- ও সেন -পর্বের সমস্ত মূর্তিই সূক্ষ্ম অথবা অপেক্ষাকৃত মোটা দানার কষ্টিপাথরে তৈরী; ধাতব মূর্তিগুলি পিতল অথবা অষ্ট-ধাতুতে গড়া। সোনা এবং রূপার তৈরী দুই-একটি মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। কাঠের মূর্তি এবং অলংকরণ রচনাও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু পাথরই হোক আর কাঠ বা ধাতুই হোক, ভাবকল্পনা ও শিল্পদৃষ্টির, ডৌল ও মণ্ডনের, কাঠামো বিন্যাসের কোন পার্থক্যই এ যুগে দৃষ্টিগোচর নয়।

এই যুগের প্রায় সমস্ত প্রস্তর ও ধাতব মূর্তিই পৃষ্ঠপটযুক্ত ফলকে উৎকীর্ণ। পাহাড়পুরের প্রস্তরফলকগুলিতে এবং দেউলবাড়ির সর্বাণীমূর্তিতে ইতিপূর্বেই পৃষ্ঠপট ব্যবহারের প্রচলন দেখা গিয়াছিল; অষ্টম শতকে তাহা পূর্ণরূপ গ্রহণ করে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফলকোৎকীর্ণ মূর্তি ক্রমশ পৃষ্ঠপট নিরপেক্ষ

হইতে থাকে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূর্তিগুলি কখনও একান্তভাবে সমতলবন্ধদৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। একেবারে দ্বাদশ শতকের দুই-চারিটি প্রতিমার পূর্ণ ত্রিভুজায়িত রূপ যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ। ফলকের উপর উৎকীর্ণ মূল প্রতিমার শিরোদেশের পশ্চাতে প্রভামণ্ডল; গোড়ার দিকে এই মণ্ডলটি অগ্নিশিখার রূপে সীমাবদ্ধ মাত্র, ক্রমশ তাহা অলংকরণবহুল হইতে হইতে পরিণামে প্রভামণ্ডলের অলংকরণসজ্জার ও বিন্যাসের পারিপাট্য মণ্ডলের অর্থ হরণ করিয়া লয়।

এই প্রতিমাগুলিতে দেবদেবীদের যে নরনারীদেহ রূপায়িত তাহাতে একাধারে পার্থিব এবং দৈবী উভয় ভাবকল্পনারই অপরূপ সমন্বয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। সাধনমালার বা প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রের যে কোন ধ্যান বা সাধন আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, অধ্যাত্ম নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রায় ইন্দ্রিয়স্পর্শক্ষম দৈহিক সৌকুমার্য ও সৌন্দর্য দুইই একই সঙ্গে এবং সমভাবে স্বীকৃত। বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম ভাবকল্পনা ও অভিব্যক্তির সঙ্গে সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহিতার এইরূপ অপরূপ সমন্বয় শিল্পের ক্ষেত্রে সুদুর্লভ। বলা বাহুল্য, ইহার মূলে সক্রিয় ছিল ইন্দ্রিয়ভোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আনন্দ এবং এই আনন্দ ও অভিজ্ঞতার প্রশস্ত অঙ্গন ছিল কামযোগ ও তান্ত্রিকসাধনার জগৎ। কিন্তু, এই প্রত্যক্ষ আনন্দ ও অভিজ্ঞতাকে যখন ধ্যানসূত্রানুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম ভাবনাকল্পনায় রূপান্তরিত করা হয়, তখন ইন্দ্রিয়-ভোগের ইঙ্গিত বা তাৎপর্য আর থাকে না, শুধু তাহার দূরাগত ধ্বনিটুকু থাকে মাত্র। সাধারণত, ধ্যানের সূত্র এবং দূরাগত এই ধ্বনি এই দুয়ের উপরই ছিল শিল্পীদের নির্ভর। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতাকে যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্মভাবনায় রূপান্তরের বিভিন্ন প্রয়াসকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধকগণ বিভিন্ন ধ্যানে ও সাধনে প্রায় কতকগুলি গাণিতিক সূত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। এই এক-একটি ধ্যান বা সাধন এক-একটি দেবদেবীর বিশিষ্ট রূপকল্পনা; তাহাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে বিশিষ্ট দেবদেবীর ও তাঁহার মণ্ডলের, তাঁহাদের রচনা ও বিন্যাসের, তাঁহাদের বিভিন্ন অংশের পরিমিতির, ভঙ্গীর ও রূপের, মাপ ও মানের। শিল্পীরা সাধারণত সকলেই এইসব নির্দেশ নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিতেন। সাধারণত, বাস্তব শারীরবিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, ভারতীয় শিল্পের অন্যান্য পর্বে যেমন, এ পর্বেও তেমনই কোথাও উৎকট হইয়া দেখা দেয় নাই; কিন্ত অন্যদিকে একই সঙ্গে প্রতিমাগুলির অলংকার ও অলংকরণে যে অপরিমেয় সূক্ষ্মতা দৃষ্টিগোচর তাহা বিস্ময়কর।

বলিয়াছি, শারীরবিজ্ঞানের বাস্তবতার প্রতি শিল্পীদের দৃষ্টি কখনো আকৃষ্ট হইত না কিন্তু বিশিষ্ট মানবদেহের যে বিশেষ ধর্ম, তাহার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার যাহা ব্যঞ্জনা, তাহার সুষ্ঠু সুমিত প্রকাশে কোথাও কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। সে প্রকাশ প্রতিমাগুলির বিশিষ্ট ভঙ্গ ও ভঙ্গীতে, বিশেষ চালচলনে, অর্থবহ স্থিতি বা গতিতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সাধকের ধ্যানদৃষ্টিই সক্রিয়, এবং সেই দৃষ্টি প্রায় গাণিতিক সূত্রাকারে গ্রথিত। পাল- ও সেন -পর্বের মূর্তিকলায় যে ভঙ্গ, ভঙ্গী এবং মুদ্রার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল গুপ্তপর্বের শিল্পকলায়; কিন্তু প্রাচ্য-ভারতের এই চারি-পাঁচশত বৎসরের শিল্প সেই বীজের সমস্ত ফলসম্ভাবনাকে একটি একটি করিয়া নিঃশেষ সার্থকতায় পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে।

মূর্তিগুলির প্রত্যেকটি ভঙ্গ ও ভঙ্গীই শাস্তসমাহিত অভিজ্ঞতা ও ধ্যানযোগ হইতে প্রাপ্ত। কোন দেব বা দেবীর ভাব ও ভঙ্গী কিরূপ হইবে তাহা যে ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানসূত্র দ্বারা নিয়মিত ছিল তাহাই শুধু নয়, সেই দেব বা দেবীর বিশেষ ভঙ্গী ও বিন্যাসের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা যে কী তাহাও সাধনসূত্রেই নির্ণীত। সুতরাং বিগ্রহ ও সাধনসূত্র উভয়ই উভয়ের ব্যাখ্যার সহায়ক।

ডৌল ও গড়নের বিবর্তনের দিক হইতে অষ্টমশতকীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এমন প্রতিমার সংখ্যা খুব বেশি নয়। বর্ধমান-বরাকরে প্রাপ্ত দুইটি দেবী-প্রতিমা, মানভূম-বোরামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, এবং দিনাজপুর-কাকদীঘিতে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমা, এই চারিটি মূর্তি অষ্টম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হ্রস্ব গুরুভার দেহে এবং মুখাবয়বের ভঙ্গীতে সমকালীন মাগধী তক্ষণশৈলীর লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিরলালংকার দেহসজ্জা এবং ডৌলের কমনীয়তাও পালপর্বের প্রথম পর্যায়ের শিল্পাদর্শ।

লিপিপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাংলার যে কয়টি প্রতিমাকে নিঃসংশয়ে পাল- ও সেন -পর্বের বলিয়া চিহ্নিত করা যায় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রথম-মহীপালের রাজ্যাঙ্কের তৃতীয় বৎসরে প্রতিষ্ঠিত এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুমূর্তি, এই রাজারই চতুর্থ সম্বৎসরে স্থাপিত একটি গণেশমূর্তি, চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে রচিত একটি বিষ্ণু- ও একটি সূর্য -প্রতিমা, তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে নির্মিত একটি সদাশিব-মূর্তি এবং লক্ষ্মণ-সেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে রচিত এবং ঢাকার ডালবাজারে প্রাপ্ত একটি চণ্ডীমূর্তি—এই কয়েকটি লিপি ও তারিখ-চিহ্নিত প্রতিমাই শৈলী-নির্দেশ ব্যাপারে আমাদের নির্ভর যোগ্য সাক্ষ্য। ইহাদের সাহায্যে অল্পবিস্তর নিশ্চয়তায় বাংলার সমসাময়িক শিল্পের গতিনির্দেশ করা সম্ভব; বিহারে আবিষ্কৃত প্রতিষ্ঠা-তারিখযুক্ত প্রতিমার সাহায্যেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

দেবপাল, শূরপাল, নারায়ণপাল এবং গুর্জর-প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের রাজত্ব-কালে রচিত কয়েকটি প্রস্তর- ও ধাতব -প্রতিমা বিহারে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মাংসল দেহরূপে গুপ্ত-ঐতিহ্যের আপেক্ষিক কমনীয় ডৌল সুস্পষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতায় প্রকাশিত; মুখের ভাব প্রশান্ত, কিন্তু দেহের মাংসল গড়নে ইন্দ্রিয়স্পর্শালুতার স্বাক্ষর। দেহভঙ্গী আড়ষ্ট; দেহের বহিঃরেখা দৃঢ়। এই দৃঢ় বহিঃরেখার মধ্যে কোমল মাংসলতার আভাস ফুটাইয়া তোলাই নবমশতকীয় শিল্পাদর্শ। খুব কম নিদর্শনেই উন্নত ও গভীর মানসকল্পনার কোন স্বাক্ষর আছে।

পৃষ্ঠপটটি সাধারণত শিরোদেশে প্রায় অর্ধগোলাকৃতি; কিন্তু দুই-একটি ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ কোণায়িত অগ্রভাগও দৃষ্টিগোচর। সিক্তবসনের মতো পরিধেয়ের ভাঁজ দেহ-ডৌলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং ভাঁজগুলি সমান্তরাল তরঙ্গায়িত রেখায় চিহ্নিত। দাঁড়াইবার ভঙ্গী হয় সমপদস্থানক না হয় আভঙ্গ বা ত্রিভঙ্গ; কিন্তু বসিবার ভঙ্গী প্রায় সর্বত্রই ললিতাসন; হস্ত, পদ, অঙ্গুলি ইত্যাদির বিন্যাস একান্তই শাস্ত্র-নির্দিষ্ট; কিন্তু দেহের অলংকরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষীণতা অথবা মাংসলতা ব্যক্তিগত-রুচিনির্ভর, আর রেখার গতি ও মণ্ডনের দৃঢ়তা বা কমনীয়তা যৌথশিল্পদৃষ্টি- ও রীতি -নির্ভর। অলংকারগুলি ভারী এবং কারুকার্যবিহীন; পৃষ্ঠপটে আলংকারিক সাজসজ্জাও অপেক্ষাকৃত স্বল্প।

দৃঢ়, সুনির্দিষ্ট বহিঃরেখার মধ্যে মাংসল কমনীয়তার আদর্শ অতিক্রম করিয়া দশমশতকে দৃঢ়শক্তিগর্ভ স্থূলদেহ নির্মাণের আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিল। এই শতকের মানবদেহ কল্পনায় আত্মসচেতন অর্থাৎ সংযত শক্তিমত্তার ব্যঞ্জনা ডৌল ও গড়নের মধ্যে সুস্পষ্ট; সচেতন শক্তির দৃঢ় সংযত প্রবাহ যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া সমগ্র দেহটিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। দৃঢ় সংযত ডৌল ও মণ্ডনে সুকুমার মসৃণতার একটি উজ্জ্বল দীপ্তি ও প্রবাহ প্রত্যক্ষ; সমগ্র প্রতিমামণ্ডল ও পৃষ্ঠপটটির উপর যেন প্রাণের আনন্দ বিচ্ছুরিত, মুখমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত শক্তিগর্ভ দেহের প্রাণপ্রাচুর্য পরিব্যাপ্ত। এই উদার বিরাট প্রাণময়তাই নবম শতকের কোমল মাংসলতাকে দশম শতকে অপরিমেয় শক্তিমত্তায় রূপান্তরিত করিয়াছে। সমগ্র দশম শতক জুড়িয়া বাংলার তক্ষণশিল্পে এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ, বিশেষভাবে প্রস্তরশিল্পে। দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে প্রাপ্ত ঋষভনাথপ্রতিমা, ফরিদপুর জেলার উজানীগ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি, বগুড়া জেলার সিলিমপুরে প্রাপ্ত বরাহাবতারমূর্তি এই উক্তির সাক্ষ্য।

অন্যান্য বিষয়ে দশম শতক মোটামুটি নবম শতকের রূপ ও রীতিকেই বহন করিয়া চলিয়াছে। পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলের আকৃতি অবিকল এক; দেহ সামান্য একটু দীর্ঘায়ত, কিছু ক্ষীণায়তও বটে, এবং দেহের নমনীয়তা কিছুটা বর্ধমান। তাহার ফলে দেহের রূপায়ণে রেখার প্রয়োগ বাড়িয়াছে; এ পর্বে ললিতাসন ও অর্ধপর্যঙ্কাসন ভঙ্গী প্রিয়তর। পৃষ্ঠপটের বিন্যাস মোটামুটি এক, কিন্তু পটভূমির অলংকরণ সূক্ষ্মতর হইয়াছে। ওষ্ঠ ও নাসিকার, ভ্রূ ও চক্ষুদ্বয়ের, বসন ও অলংকারের রেখায় নবম-শতকীয় তীক্ষ্ণতা অন্তর্হিত; পৃষ্ঠপটের উপরিভাগ সূক্ষ্মাগ্র এবং ঠিক তাহার নীচেই 'কীর্তিমুখ' অলংকার।

দশম শতক বাংলা প্রতিমাশিল্পের সুবর্ণযুগ। অষ্টম শতকে প্রতিমাশৈলী কেন্দ্রবিচ্যুত, কর্দমশিথিল; নবম শতকেও মাংসল শৈথিল্য বিদ্যমান কিন্তু তাহাকে রেখার সীমানায় বাঁধিবার একটা চেষ্টা প্রত্যক্ষ। দশম শতকে কেন্দ্রচেতনায় সমগ্র দৃষ্টি জাগ্রত, শিথিল মাংসল দেহে শক্তির আবির্ভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত।

একাদশ শতকে দৃঢ়শক্তিগর্ভ দেহে লাগিল রসমাধুর্যের স্পর্শ, কিছু সৌষ্ঠবের চেতনা। দেহরূপের ক্ষীণতার দিকেও প্রবণতা বাড়িয়া গেল। প্রথম-মহীপালের রাজ্যাঙ্কের তৃতীয় বৎসরে যে বিষ্ণুমূর্তিটি বাঘাউড়ায় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এইসব লক্ষণ বিদ্যমান। দশম শতকে যে গভীর ও প্রশস্ত-গঠনসৌষ্ঠবের পরিচয় পাওয়া যায়, এই শতকে তাহা ক্রমশ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, এবং ক্ষীণদেহে কোমল পেলব গড়নের রীতি প্রাধান্য লাভ করিতেছে। পদযুগলের ঋজু কাঠিন্য ক্রমবর্ধমান; সাধারণভাবে দেহরেখার নমনীয়তাও ক্রমহ্রস্বায়মান। জানুর গড়ন ও মণ্ডনে নবম- ও দশম -শতকীয় মার্জিত নৈপুণ্য অন্তর্হিত। অন্যদিকে পৃষ্ঠপটের বৈচিত্র্য ও অলংকার ক্রমবর্ধমান। প্রতিমার অলংকরণ, সহচর দেবদেবীদের অলংকার-বৈচিত্র্য, বিচরমাণ গন্ধর্ব-কিন্নর, পটের অলংকার ও কারুকার্য ইত্যাদি ক্রমশ প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ। তবু, একাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিমা ও পার্শ্বদেবতা, প্রতিমা ও পৃষ্ঠপটের মধ্যে একটা ভারসাম্য ছিল কিন্তু শেষার্ধের দিকে মূল প্রতিমার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য ক্রমবর্ধমান অলংকারপ্রাচুর্যে প্রায় চাপা পড়িল।

কেশবিন্যাসে এবং উত্তরীয়ের রেখায় তরঙ্গায়িত ছন্দ গভীর বিভুজায়িত রেখায়

ও তির্যক বা আলম্ব গভীর রেখায় আলোছায়ার স্পন্দিত লীলা। দেহভঙ্গী যেন ছাঁচে ঢালাই করা, কিন্তু মুখভঙ্গী সংবেদনশীল এবং অতুল কোমল সুকুমার। মুখাকৃতি যাহাই হউক, চিবুকের রেখাটি সজীব, ওষ্ঠাধর প্রায় গোলাকৃতি, চক্ষুদ্বয় গভীর ও প্রশস্ত। বসন দেহের রেখা ও ডৌলের সঙ্গে একেবারে একাঙ্গীভূত, বস্ত্রাঞ্চল মনোরম তরঙ্গায়িত রেখায় খচিত। এই সংবেদনশীল মাধুর্য এবং দীর্ঘায়ত ক্ষীণ সৌষ্ঠবময় দেহই একাদশশতকীয় মূর্তিকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই ক্ষীণ দীর্ঘায়ত সৌষ্ঠবমাধুর্যময় দেহের মার্জিত শ্রী দ্বাদশ শতকে অলংকার ও পৃষ্ঠপটের অলংকরণের প্রাচুর্যে শুধু যে ভারগ্রস্তই হইয়া পড়িল তাহাই নয়, নবমশতকীয় মাংসল শৈথিল্যও পুনরাবর্তিত হইয়া দেহরূপকে ক্রমশ নির্জীব ভারগ্রস্ত জড়তায় মণ্ডিত করিয়া দিল। দেহডৌলের কোমল সজীবতা ও পেলব মাধুর্য ক্রমে বিদায় লইল।

প্রতিমা, পাদপীঠ, কাঠামো ও পৃষ্ঠপটের বিন্যাস এই শতকে অপরিবর্তিত; দেহকাণ্ডের ক্ষীণ দীর্ঘায়ত ধারাও গোড়ার দিকে অব্যাহত। কিন্তু মুখাবয়বের স্মিত সংবেদনশীলতা আর নাই, তাহার জায়গায় দেখা দিয়াছে অকারণ গাম্ভীর্যের ভার। পদযুগল তাহার সমস্ত কমনীয়তা হারাইয়া যেন দুইটি স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে। পৃষ্ঠপটের ত্রিকল্প বা চতুর্কল্প বিভাগে অসংখ্য গুরুভার পার্শ্বদেবতা, সুপ্রচুর অলংকরণ—অথচ সেই অলংকরণ সমগ্র মূর্তির রূপকল্পনার সঙ্গে কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত নয়, সর্বত্র অকারণ ঘনবিন্যস্ত বাহুল্য। ফলে, প্রতিমাপটটি ভারাক্রান্ত।

প্রতিমার দৈহিক গঠনে কমনীয়তার কোন অভাব নাই, কিন্তু সে কমনীয়তা যেন মদির, অবশ ও নির্জীব। বসনের বহুল রেখাবিন্যাস, পরিধেয় ও কেশবিন্যাসের অলংকরণপ্রাচুর্য, গভীর আলোছায়ার বৈচিত্র্যখচিত অলংকার ও পটদৃশ্য প্রভৃতি সত্ত্বেও জীবনের স্বতোদৃপ্ত ও সুস্পষ্ট উজ্জ্বল স্বাক্ষর এ পর্বের মূর্তিরচনায় অনুপস্থিত। সমস্ত মুখমণ্ডলে কোন গভীর আত্মিক ব্যঞ্জনার চিহ্নমাত্র নাই। দশম-একাদশ শতকের মূর্তিকলায় যে ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত শ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডলের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সে মুখ বিগত; ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তির স্থান লইয়াছে গভীর আনন্দসম্ভোগের মদির পরিতৃপ্তি। বস্তুত, এই পর্বের প্রতিমাকলায় সর্বত্র একান্ত ইহগত ভোগবাসনার মদির মাধুর্যের ব্যাপ্তি, দুর্বল কামনার মোহময় বিলাস। তাহা সত্ত্বেও এখানে সেখানে নবতর শিল্পপ্রেরণা ও শিল্পাদর্শের পরিচয় একেবারে নাই, এমন নয়। দুই-একটি নিদর্শনে পরিপূর্ণ মণ্ডলায়িত কাঠামোর মধ্যে অমার্জিত অথচ শক্তিগর্ভ শিল্পক্রিয়ার প্রয়াস সুস্পষ্ট। এই শক্তি, মর্যাদা ও সজীবতা বাংলার প্রতিমাকলাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে হয়তো বাঁচাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না; কারণ সমসাময়িক সামাজিক বাতাবরণে সেই শক্তি, মর্যাদা ও সজীবতা কোথাও ছিল না।

দ্বাদশ শতকের প্রতিমাকলা প্রধানত সেন-বর্মণপর্বের শিল্পাদর্শের এবং সমাজাদর্শের অনুপ্রেরণায় রচিত ও লালিত। এই আমলের প্রতিমাগুলিতে যে ইহগত, একান্ত পার্থিব সুখৈশ্বর্যের ব্যঞ্জনা, সেই একই ব্যঞ্জনা সেন-বর্মণরাজসভার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। ধর্মগত বিষয়বস্তু সত্ত্বেও শিল্প ও সাহিত্য উভয়ই পার্থিব ভোগ-চেতনা এবং জৈব কামনা-বাসনা দ্বারা মণ্ডিত।

এই আমলের প্রতিমাকলায় এই ঐহিক সমৃদ্ধির মূলে ভিন্‌প্রদেশী প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। সমসাময়িক দক্ষিণী প্রতিমাশিল্পেও একই ঐহিক ভোগসমৃদ্ধির

এবং পুরুভার অলংকরণের প্রাধান্য। অবশ্য, বাংলার প্রতিমাকলার যে কমনীয়তা, সজীবতা ও সংবেদনশীলতা প্রত্যক্ষ, দক্ষিণী শিল্পে তাহা নাই; স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বাংলার এই কমনীয়, সজীব ও সংবেদনশীল শিল্পাদর্শ পূর্বতন পাল-প্রতিমাকলার উত্তরাধিকার।

নবম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারিশত বৎসরে শিল্পশৈলীর যে ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা বলিলাম, প্রত্যেকটি প্রতিমাই যে সেই ধারা অনুসরণ করিয়াছে এমন নয়, ব্যতিক্রমও আছে প্রচুর। তবু, এই ধারাই সাধারণ প্রবহমান ধারা। অবশ্য একই যুগে, এমন কি একই রাজার স্বল্পস্থায়ী শাসনকালেও বিচিত্র মুখাবয়ব, বিভিন্ন নির্মাণরীতি, মণ্ডনকৌশল, এমন কি ভিন্নতর সৌন্দর্যবোধের সাক্ষাৎও পাওয়া যায়। কিছুটা কারণ ভৌগোলিক সন্দেহ নাই; স্থানভেদে রুচির ভেদ, রীতির ভেদ, এবং সেই হেতু উত্তর-বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গের, পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের প্রতিমাকলায় কিছুটা রূপপার্থক্য অনিবার্য। কিন্তু মোটামুটি মানদণ্ড এক এবং অভিন্ন। এই চারি শতকের বাংলাদেশে নানা বিভিন্ন জাতি ও জনের বাস, নানা ভিন্প্রদেশী লোকের; কোন কোন প্রতিমার মুখাকৃতি ও গঠনে বিশিষ্ট জনবৈশিষ্ট্যও সেইহেতু প্রত্যক্ষ। কোন কোন নিদর্শনে তীক্ষ্ণ মোঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট; এই ভোট-ব্রহ্ম বা মোঙ্গোলীয় মুখবৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেরণা সক্রিয়। শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি এবং গঠনরীতিও কিছুটা এই পার্থক্যের মূলে। বাংলার সমসাময়িক লোকায়ত শিল্পও পাশাপাশি বর্তমান ছিল; তাহার সঙ্গে উচ্চকোটি শিল্পাদর্শ ও রীতির একটা যোগাযোগ ছিল, এমনও অসম্ভব নয়, এবং দুইই একে অন্যের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিতও হয়তো হইয়াছিল। তবু মোটামুটি বলা যায়, উচ্চস্তরের প্রতিমাশিল্প শাস্ত্রবন্ধন হইতে কখনও একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই।

এই সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের শিল্পরূপের প্রবাহ গভীর বিরোধী ভাবতরঙ্গে আবর্তিত। এই প্রবাহের গতি কখনও সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়স্পর্শালু মাংসলতার দিকে, কখনও পরোক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ইন্দ্রিয়ব্যঞ্জনার দিকে; কিন্তু দুইটি গতিই একই শাস্ত্রশাসনদ্বারা নিয়মিত। একটি অপরূপ মানসম্বন্ধের ভিতর দিয়া এই শিল্পকলার বিকাশ; এই মানসম্বন্ধজনিত বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যই এই চারিশত বৎসরের শিল্পকলার প্রধান লক্ষণ। একদিকে তান্ত্রিক সাধনার দেহবাদ, অন্যদিকে আত্মধর্মী ব্রাহ্মণ্য সাধনা, এই দুই বিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাতাবর্তে এই চারি শতকের শিল্পপ্রবাহ আন্দোলিত। এই দুই ভাবাদর্শের সংঘাতের ভিতর দিয়া এই চারি শতকের প্রতিমাকলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। পরিণামে মাত্রাহীন আতিশয্য সমস্ত শিল্পাদর্শকে অবশ, নির্জীব মদিরতায়, পল্লবিত অলংকারাড়ম্বরে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সমসাময়িক সাহিত্যে কামনাবাসনার আতিশয্য, উচ্ছ্বসিত পল্লবিত বাক্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন লাস্যভঙ্গী সমসাময়িক শিল্পেরই প্রতিরূপ এবং দুইই ধ্বংসোন্মুখ ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ঘোষণা। এই ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির উপর যবনিকা টানিয়া দিল ইস্লামাভিযান।

পাঁচ

এ যাবৎ প্রাক্-পালযুগের চিত্রকলার কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ফা-হিয়ানের বিবরণীতে একটি ইঙ্গিত আছে যাহাতে মনে হয় খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ

শতকে তাম্রলিপ্তিতে (এবং বোধহয় বাংলার অন্যত্রও) চিত্রশিল্পচর্চার প্রচলন ছিল। তাহা ছাড়া, সমসাময়িক ভারতবর্ষে অন্যত্র যেমন, বাংলাদেশেও বোধ হয় তেমনই লোকায়ত সংস্কৃতিতে পটচিত্র, ধূলিচিত্র প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, বিহারমন্দিরের প্রাচীরগাত্র চিত্র-শোভিত করার শাস্ত্রীয় নির্দেশ একটা ছিল; কাজেই অনুমান করা কঠিন নয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো প্রাচীন বাংলার অনেক বিহার-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রই চিত্রদ্বারা শোভিত ছিল। কিন্তু প্রাচীরচিত্রের বা প্রাচীন পটচিত্র ও ধূলিচিত্রের কোন নিদর্শন আমরা জানি না।

বাংলার চিত্রকলার প্রাচীনতম যেসব নিদর্শন এপর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের, এবং প্রত্যেকটিই পাণ্ডুলিপিচিত্র, অর্থাৎ তালপাতায় বা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি অলংকরণোদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। স্বভাবতই ছবিগুলি স্বল্পায়তন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্পায়তন পাণ্ডুলিপিচিত্রের যাহা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সূক্ষ্ম রেখার ধীর অথচ তীক্ষ্ণ গতি, সূক্ষ্ম ও ঘন কারুকার্য বিন্যাসের ঘনত্ব ও গভীর ভাবনাকল্পনার অনুপস্থিতি প্রভৃতি এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলিতে নাই। আয়তন ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এই পাণ্ডুলিপিচিত্রগুলির ভাবনা-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত ও গভীর, পরিকল্পনা বৃহৎ, রেখার ডোল ও বিস্তার দীর্ঘায়ত, রঙের বিন্যাস ও মণ্ডন প্রশস্তায়িত। এই দীর্ঘ, প্রশস্ত ও বৃহৎ বিস্তার একান্তই বৃহদায়তন প্রাচীরচিত্রের। বস্তুত, প্রাচীরচিত্রের লক্ষণই এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির লক্ষণ, প্রাচীরচিত্রই যেন পাণ্ডুলিপিপত্রের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বল্পায়তনে অঙ্কিত। সমসাময়িক বাংলার পাণ্ডুলিপিচিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এ পর্যন্ত চিত্রসংবলিত পাণ্ডুলিপি প্রায় কুড়ি বাইশখানা পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের মধ্যে মাত্র একখানা কাগজের পাতায় লেখা এবং ছবিও কাগজের পাতায় আঁকা—লেখার মাঝখানে সমান্তরালে; অন্য সব কয়টিই তালপাতার পুঁথি। কাগজের পাতায় পুঁথিটি বাংলাদেশে কাগজ ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। এই পাণ্ডুলিপিগুলির অধিকাংশই পাওয়া গিয়াছে নেপালে, কয়েকটি বাংলাদেশে; এবং কয়েকটি বাংলার বাহিরে অন্যত্র। তবে ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই যে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পূর্ব-ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে, লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, চিত্রশৈলী এবং তারিখসংবলিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপিই তাহার প্রমাণ।

একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি ছাড়া প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপিই বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধীয় এবং প্রায় সকল চিত্রই মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্মমতসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি শৈবধর্মসম্পর্কিত এবং উহার চিত্রগুলি লিঙ্গ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিরূপ। এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি ছাড়া তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ স্বল্পায়তন তিনটি রেখাচিত্রের খবরও আমরা জানি; এই রেখাচিত্র তিনটিও একাদশ-দ্বাদশশতকীয় চিত্রশিল্পের নিদর্শন। ইহাদের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী।

বলিয়াছি, প্রায় সকল চিত্রই মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্মমতসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। কায়াসাধনের নির্দিষ্ট ধ্যানানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবদেবী, যথা, লোকনাথ, তারা, মহাকাল, অমিতাভ, অবলোকিত, মৈত্রেয়, বজ্রপাণি আকাশগর্ভ প্রভৃতি ও তাঁহাদের সহচর-সহচরীদের প্রতিমাই পাণ্ডুলিপিপত্রের সীমায়

মধ্যে রঙে ও রেখায় রূপায়িত। এই চিত্রগুলির সাহায্যে বজ্রযান-তন্ত্রযান কল্পনায় কল্পিত দেবদেবীদের অনেকের পরিচয় সহজতর হয়; ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন সমসাময়িক ভাস্কর্যে যাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কয়েকটি ছবিতে জাতকের কাহিনী বা বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনীও চিত্ররূপ লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক অভিজাত নায়ক, ধর্মযাজক এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই এইসব পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত ও চিত্রগুলি রূপায়িত হইত। সুতরাং সমসাময়িক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার যাহা সামাজিক প্রেরণা ও পরিবেশ, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাহাই।

বর্তমানে বাংলাভাষাভাষী লোকদের যে ভৌগোলিক সীমা, সব পাণ্ডুলিপিই যে সেই সীমার মধ্যেই লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু শৈলীপ্রমাণের দিক হইতে স্বীকার করিতে হয়, ভৌগোলিকসীমাগত পার্থক্য চিত্রশৈলীতে কোন পার্থক্য রচনা করে নাই। বস্তুত, বাংলা-বিহার-নেপালের সমসাময়িক চিত্রশিল্প একই শিল্পধারার সৃষ্টি বলিলে অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না।

এই চিত্রগুলিতে পাণ্ডুলিপিচিত্রণের বিশেষ স্বতন্ত্র কোন ভঙ্গীর পরিচয় নাই। চীন, ইরান, মধ্যযুগীয় য়ুরোপ বা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে স্বল্পায়তন পুঁথিচিত্রের যে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তাহার সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপিচিত্রগুলির কোথাও কোন মিল নাই। বস্তুত, এই চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাচীরচিত্র। আর একটি তথ্যও লক্ষণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর সঙ্গে চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন যোগ নাই; ইহাদের উদ্দেশ্য পুঁথির শোভাবর্ধন করা, বিষয়বস্তুকে উজ্জ্বল করা নয়।

ছবিগুলিতে যেসব রং ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে হরিতালের হলুদ, খড়িমাটির সাদা, গাঢ় নীল (অজন্তার পাথুরে নীল নয়), প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুরে লাল এবং সবুজ। এই সবুজ অজন্তা-চিত্রে ব্যবহৃত ঘন উজ্জ্বল সবুজ নয়; বোধ হয় হলুদ এবং নীলে মিশ্রিত সবুজ। প্রয়োজনানুযায়ী একই রঙের গাঢ়ত্বের তারতম্য আছে, ভিন্ন রঙের ব্যবহারও আছে; সর্বোচ্চ স্তরে সাদা, সর্বনিম্নে কালো। কিন্তু যত বৈচিত্র্যই থাকুক, দেবদেবীর রং সর্বত্রই সাধনসূত্রানুযায়ী নিয়মিত ও নির্ধারিত। সাধারণভাবে রঙের বিন্যাস অজন্তা-চিত্রের রীতি ও আদর্শ অনুযায়ী। অজন্তার মতো এ ক্ষেত্রেও রঙের ব্যবহারে ডৌলের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে; বস্তুত, মণ্ডনাশ্রিত ডৌল এই চিত্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে, অজন্তার রঙের পরিশীলিত সংগতির কোন পরিচয় এই চিত্রগুলিতে নাই।

চিত্রবিন্যাসের রীতি অনেকটা ভাস্কর্যবিন্যাসের রীতিই অনুসরণ করিয়াছে। মূল প্রতিমাটি পার্শ্বপ্রতিমাগুলির চেয়ে আকারে বড় এবং সাধারণত অলংকৃত পটভূমি-বা অর্ধগোলাকৃতি-প্রভামণ্ডলের পটে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট, অথবা মন্দিরের অলিন্দে স্থাপিত। মূল প্রতিমার দেহকাণ্ডের দুইপ্রান্তে এক বা দুই সারিতে, সরল রেখায় বা চক্রাকারে মণ্ডলের অন্যান্য দেবদেবীরা বিন্যস্ত। যে সব ক্ষেত্রে মূল প্রতিমা কাঠামোর এক পার্শ্বে সে সব ক্ষেত্রে পার্শ্বদেবতারা সারি সারিতে বা অর্ধচক্রাকারে অন্য পার্শ্বে বিন্যস্ত। শূন্যস্থান বড় একটা নাই; যেসব স্থানে আছে সেখানে উড্ডীয়মান সহচর-সহচরী, লতাপাতা, অলংকার প্রভৃতির সাহায্যে বৈচিত্র্য রূপায়িত।

তারিখ-সংবলিত পাণ্ডুলিপিগুলির সাহায্যে এই চিত্রগুলির একটা ধারাবাহিক বিচার চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে চিত্রশৈলীর বিবর্তনের কোন ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। মোটামুটিভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এই সৃষ্টি-প্রচেষ্টার মধ্যে শিল্পের যে-রূপ প্রত্যক্ষ তাহা অবিচল ও নির্দিষ্ট; বিবর্তমান কোন প্রবাহ ইহাদের মধ্যে ধরা প্রায় যায় না বলিলেই চলে। ছবিগুলি দেখিলে এবং একটু বিশ্লেষণ-করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই চিত্ররীতি ও শৈলী একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বিবর্তিত রূপ, এবং বহুদিন সুঅভ্যস্ত। যে রূপ ও রীতি বাঘ-অজন্তা-এলোরার গুহাগাত্রে স্বাক্ষর রচনা করিয়াছে তাহাই প্রাচীন বাংলার এই পাণ্ডুলিপিচিত্রগুলিতেও ধরা পড়িয়াছে। ইহারা চলমান ভারতীয় চিত্রশিল্পপ্রবাহেরই একটি অচ্ছেদ্য ধারা এবং সেই ধারারই অন্যতম নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। তবে, এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে পৌঁছিয়া সে ধারা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

এ তথ্য সুস্পষ্ট যে, প্রাচ্য-ভারতীয় এই চিত্রকলা বহিরঙ্গ এবং অন্তর্নিহিত সত্তার দিক হইতে সমসাময়িক প্রতিমাশিল্পের চিত্রিত প্রতিলিপি মাত্র। প্রস্তর- ও ব্রোঞ্জ-প্রতিমায় যেমন, এই যুগের চিত্রগুলিতেও তেমনই নির্দিষ্ট বঙ্কিমরেখার নিয়ন্ত্রণে মূর্তি মণ্ডনায়িত; রেখার প্রবাহমান তরঙ্গ দেহকাঠামো, নাভিবৃত্ত এবং করাঙ্গুলিতে সুস্পষ্ট। পাথরে এবং ধাতুতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করা হইয়াছে সুদৃঢ় বস্তুপদার্থের নমনীয় রূপান্তরের সাহায্যে, চিত্রে তাহাই সম্ভব হইয়াছে রঙের রঞ্জনের সাহায্যে। চিত্রের প্রতিমাগুলির মুখাবয়ব ও ভঙ্গী, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও ভঙ্গী প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই সমসাময়িক প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পের সহিত এই চিত্রশিল্পের পারিবারিক সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়।

মূলগত আদর্শের দিক হইতে এই চিত্রশিল্প বাঘ-অজন্তা-এলোরা গুহার প্রাচীরচিত্রৈতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই ঐতিহ্যের আশ্রয়েই রচিত। এই শিল্পাদর্শের দুইটি দিক; একটি ক্ল্যাসিক্যাল, অপরটি মধ্যযুগীয়। ক্ল্যাসিক আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য রং ও রেখার পরিপূর্ণ মণ্ডনায়িত ডৌলে সমৃদ্ধ রূপায়ণ; মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রধান নির্ভর তীক্ষ্ণ, ডৌলবিহীন রেখা এবং তরল সমতল রঙের প্রলেপ। এলোরায় এই দুই আদর্শই পাশাপাশি সক্রিয়; একাদশ-দ্বাদশশতকীয় প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পেও তাহাই। তাহার ফলে আদর্শ ও রীতির একটা সংমিশ্রণও ঘটিয়াছে।

এলোরার চিত্রে এবং সমসাময়িক রাজপুতানার ভাস্কর্যে রেখানির্ভর পরিকল্পনার প্রথম সূত্রপাত, এবং এই সংমিশ্রণের প্রকাশ দেখা গেল অষ্টম শতকে। কিন্তু মধ্যযুগীয় আদর্শের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রকাশ ধরা পড়ে পশ্চিম ভারতে, বিশেষ ভাবে গুজরাট অঞ্চলে, দশম-একাদশ শতক হইতেই। মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের এই গতি একান্তভাবে পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশে সুন্দরবনে ও চট্টগ্রামে দুই-তিনটি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ রেখাচিত্র পাওয়া গিয়াছে। এই চিত্রগুলি একান্তই তীক্ষ্ণ, ডৌলবিহীন রেখানির্ভর এবং রেখায় সঙ্গে রেখার যোজনা তীক্ষ্ণ কৌণিক। ইহাদের রেখার চরিত্র এবং বিন্যাসের সঙ্গে এলোরায় কোন কোন চিত্রের এবং গুজরাটী জৈন পুঁথিচিত্রের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। একাদশ-দ্বাদশ শতকের ভাস্কর্যেও কোথাও কোথাও এই ধরনের রেখা ও রেখার বিন্যাস দৃষ্টিগোচর, যেমন

উড়িষ্যায় ও মধ্যভারতে, রাজপুতানা ও গুজরাটে। পূর্বভারত হইতে এই প্রভাব নেপালে এবং ব্রহ্মদেশেও বিস্তার লাভ করে।

এই মধ্যযুগচিহ্নিত রেখানির্ভর চিত্র-পরিকল্পনা যে-তিনটি তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্রে পূর্ণ পরিণত রূপে দৃষ্টিগোচর, তাহার একটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন আচার্য কুমারস্বামী। ইহার তারিখ আনুমানিক একাদশ শতক। দ্বিতীয়টি রাজা ডোম্মনপালের সুন্দরবন-পট্টোলীর পশ্চাৎপটে উৎকীর্ণ; তৃতীয়টি চট্টগ্রাম জেলার মেহার গ্রামে প্রাপ্ত দেববংশীয় জনৈক রাজার পট্টোলীর উপরিভাগে উৎকীর্ণ। এই দুইটি আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে এবং ইহাদের তারিখ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। উভয় চিত্রেই তীক্ষ্ণ রেখার দ্রুত রূপায়ণ, এবং সে রূপায়ণে সজীব প্রবহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিন্ন গতিও অক্ষুণ্ণ। অকিঞ্চিৎকর বিষয়বস্তুতেও এমন একটা অহেতুক প্রাণময়তা ও রেখাপ্রাচুর্য পরিস্ফুট বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাহার কোন সংগতি দেখা যায় না। বস্তুত, এই রেখা পরিকল্পনা কোন গভীর উপলব্ধি বা প্রেরণা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, শিল্পী যেন তীক্ষ্ণ দ্রুত রেখার বিলাসে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কারণ রঙের মণ্ডনায়িত রূপায়ণ যেখানে নাই সেখানে শিল্পীর হাতে রেখাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। চঞ্চল ও দীর্ঘায়ত বঙ্কিম রেখা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় এই কামনা প্রত্যক্ষ।

প্রাচ্য-ভারতীয় এই রীতি ও আদর্শের সঙ্গে সমসাময়িক পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রাঙ্কন- রীতি ও -আদর্শের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তবে, পার্থক্যও সমান প্রত্যক্ষ। পশ্চিম-ভারতীয় অঙ্কনরীতিতে রেখা অত্যন্ত বেশি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, কোণগুলি প্রায় জ্যামিতিক চিত্রের মতো সূক্ষ্ম, ভগ্ন অথবা ভঙ্গুর রেখা একান্ত প্রাণহীন, আবেগহীন। প্রাচ্য-ভারতীয় পাণ্ডুলিপিচিত্রগুলির কিংবা তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্রগুলির লালিত্যময়, আবেগময় রেখার সংবেদনী ক্ষমতা পশ্চিমী রেখার নাই। পশ্চিমী রেখা কঠিন ও সমতল চিত্রভূমিকে তাহার নির্দিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে শুধু আবদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র; প্রাচ্য-ভারতের আবেগময় সংবেদনী রেখা বন্ধনীবদ্ধ চিত্রভূমির মণ্ডনায়িত রূপটিকে প্রকাশ করে। রেখাবিন্যাসের এই ঐতিহ্য বাংলা-আসাম-উড়িষ্যায় বাঘ-অজন্তার বিশুদ্ধ আদর্শের পাশাপাশি পূর্ণ গৌরবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। আধুনিক কালে কলিকাতার কালীঘাটের পটে অজন্তার রেখা রচনার রীতি ও আদর্শ উজ্জীবিত ছিল বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত; আর মধ্যযুগীয় আদর্শ বলবত্তর ছিল ফরিদপুর-যশোহর-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বীরভূমের জড়ানো পটে।

ছয়

প্রাচীন বাংলার কুটীর, প্রাসাদ, বিহার, মন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে উপাদানের অভাবে সবিস্তারে কিছু বলিবার উপায় নাই। অথচ, অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া লিপিমালায় ও সমসাময়িক সাহিত্যে নানাপ্রকারের সমৃদ্ধ ঘরবাড়ি, রাজপ্রাসাদ, স্তূপ, বিহার, মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ ও স্বল্পাধিকতর বিবরণ সুপ্রচুর। পঞ্চম শতকে ফা-হিয়ান এবং সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বাংলার সর্বত্র অসংখ্য স্তূপ, বিহার ও দেবমন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; লিপিমালায় ভূ-ভূষণ, স্বর্ণকলসশীর্ষ নানা মন্দিরের উল্লেখ বিদ্যমান; সমসাময়িক পাণ্ডুলিপিচিত্রে রঙে ও রেখায় নানা স্তূপ ও

মন্দিরের প্রতিচিহ্ন রূপায়িত; সমসাময়িক তক্ষণ-ফলকেও নানা আকৃতি-প্রকৃতির গৃহ, স্তূপ ও মন্দিরের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। অথচ, আজ আর এই সব ঘরবাড়ি, বিহার-মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট নাই। মাত্র দুই-চারিটি একাদশ-দ্বাদশশতকীয় মন্দির সকল বাধা-বিরোধ উপেক্ষা করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

ধ্বংসের কারণ সহজবোধ্য। কাঠ বাঁশ বা ইট যাহাই হোক, এই উষ্ণ জলীয় বৃষ্টিস্নাত পলিমাটির দেশে কিছুই কালের সঙ্গে সংগ্রামে বেশিদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। তাহার উপর আবার মানুষের লোভ ও লুণ্ঠনস্পৃহা প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলাইয়া ধ্বংসলীলায় মাতিয়াছে। পরধর্মদ্বেষী বিধর্মীরাও অনেক বিহার মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছেন। প্রাচীনতম হিন্দু- ও বৌদ্ধ -মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার কিছু কিছু অংশ পরবর্তী কালের মসজিদ, চবুতরা, দরবার-গৃহ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সাধারণ স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এমনকি সমৃদ্ধ লোকেরাও নিজেদের বসবাসের জন্য যে সব ঘরবাড়ি, প্রাসাদ ইত্যাদি রচনা করিতেন তাহারও উপাদান ছিল খড়, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি; পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু আয়তন ও অলংকরণের। বসবাসের জন্য তৈরী গৃহের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মতো উপাদান আমাদের নাই; তবে, কিছু কিছু উৎকীর্ণ মৃৎ- ও প্রস্তর - ফলকের সাক্ষ্যে কতকটা আভাস ধরিতে পারা যায়। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে আজও বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নকশায় ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচারির বেড়ায় ঘেরা যে ধরনের ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা. আটচালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধরনের বাংলা-ঘর রচনাই ছিল প্রাচীন রীতি। এই আকৃতি-প্রকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌড়ীয় বা বাংলা রীতি নামে খ্যাত এবং তাহাই পরবর্তী কালে মধ্যযুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যে বাংলার দান বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছিল। এই ধরনের গৌড়ীয় রীতির আবাসগৃহই গরিবের কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ছিল। দ্বিতল-ত্রিতল গৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হইত; উপরের চাল বিন্যস্ত হইত ক্রমহ্রস্বায়মান ধনুকাকৃতি রেখায়। কোন কোন মন্দিরও ঠিক এই গৌড়ীয় রীতিতেই নির্মিত হইত: বস্তুত একাধিক প্রস্তরফলকে এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাংলার ধর্মগত বাস্তু মোটামুটি তিন শ্রেণীর : স্তূপ, বিহার ও মন্দির। স্তূপ ও বিহার সাধরণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে জড়িত, বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। প্রাচীন বাংলায় জৈনস্তূপের একটিমাত্র সংশয়িত উল্লেখ জানা যায় এবং জৈন বিহারের একটিমাত্র নিঃসংশয় উল্লেখ। এই বিহারটি ছিল উত্তর-বঙ্গের পাহাড়পুরে; স্তূপটিও বোধ হয় উত্তর-বঙ্গেই; আর সমস্ত স্তূপ এবং বিহারই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে রচিত।

ধর্মগত স্থাপত্যের কথা বলিতে গেলে স্তূপের কথাই বলিতে হয় সর্বাগ্রে। স্তূপ প্রাক্‌বৌদ্ধ; বৈদিক আমলেও দেহাস্থি প্রোথিত করিবার জন্য শ্মশানের উপর মাটির স্তূপ তৈরী হইত। কিন্তু এই স্থাপত্যরূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বৌদ্ধরাই। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে স্তূপ তিন প্রকারের : ১ শারীর ধাতু স্তূপ—এই শ্রেণীর স্তূপে বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার অনুচর ও শিষ্যবর্গের শরীরাবশেষ রক্ষিত ও পূজিত হইত; ২ পারিভোগিক ধাতু স্তূপ—এই শ্রেণীর স্তূপে বুদ্ধদেব কর্তৃক ব্যবহৃত

প্রব্যাদি রক্ষিত ও পূজিত হইত; ৩ নির্দেশিক বা উদ্দেশিক স্তূপ—বুদ্ধের ও বৌদ্ধধর্মের জীবনেতিহাসের সঙ্গে জড়িত কোন স্থান বা ঘটনাকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাকে চিহ্নিত করিবার জন্য এই শ্রেণীর স্তূপ নির্মিত হইত। পরবর্তী কালে স্তূপমাত্রই বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে পূজা দিতে আসিয়া নৈবেদ্য বা নিবেদন রূপে ছোট বড় স্তূপ নির্মাণ করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও একটা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়ায়। এই স্তূপগুলিকে বলা হইত নিবেদন-স্তূপ।

কিন্তু যে-শ্রেণীর স্তূপই হোক, আকৃতি-প্রকৃতি ও গঠনপদ্ধতিতে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। একেবারে আদিতে স্তূপ বলিতে গোলাকার একটি বেদীর উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি অণ্ড ছাড়া কিছুই বুঝাইত না। অণ্ডটির ঠিক উপরেই থাকিত হর্মিকা; এই হর্মিকা-বেষ্টনীর মধ্যে একটি ভাণ্ডে রাখা হইত শারীর বা পরিভোগিক ধাতু; পর্বদিবসে ধাতুসহ এই ভাণ্ডটি নীচে নামাইয়া ভক্ত পূজারীদের দেখানো হইত, পুরোভাগে রাখিয়া গণযাত্রা করা হইত। এবং যেহেতু ধাতুগর্ভ এই ভাণ্ডটিই ছিল পূজা ও শ্রদ্ধার বস্তু সেইহেতু ইহাকে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য, হর্মিকার ঠিক উপরেই থাকিত একটি ছত্রাবরণ। কালক্রমে প্রত্যেকটি অঙ্গকে পৃথক পৃথকভাবে লম্বিত করিয়া সমগ্র স্তূপটিকেই লম্বিত, সুউচ্চ করিয়া গড়িয়া তুলিবার দিকে একটা ঝোঁক সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, এবং তোরণ, বেষ্টনী ও নানা অলংকরণ প্রভৃতি সংযোজিত হইতে আরম্ভ করে। সপ্তম-অষ্টম শতক নাগাদ নিম্ন ও গোলাকৃতি বেদীটি একটি গোল এবং লম্বিত মেধিতে পরিণতি লাভ করে; তাহার উপরকার অণ্ডটিও প্রমাণানুযায়ী ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। উচ্চতা আরও বাড়াইবার জন্য বেদীর নীচে আবার একটি সুউচ্চ চতুষ্কোণ ভিতও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা দিতে আরম্ভ করে; আর হর্মিকার উপর ক্রমহ্রস্বায়মান ছত্রের সংখ্যা একটি দুইটি করিয়া বাড়িতে বাড়িতে সমগ্রতায় একটি সূচ্যগ্র শিখরের আকৃতি লাভ করে। তাহার ফলে স্তূপের প্রাথমিক স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল; অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সমান মূল্য পাইয়া অণ্ডের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া গেল, এবং স্তূপ আর যথার্থত স্তূপ থাকিল না, বিভিন্ন অঙ্গ মিলিয়া লম্বিত এবং কৌণিক একটি শিখরের আকৃতি ধারণ করিল। বাংলাদেশে যে কয়েকটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে আমরা পরিচিত ইহাদের সমস্তই স্তূপস্থাপত্যের বিবর্তনের একেবারে শেষ স্তরের এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই নিবেদন-স্তূপ।

সংখ্যায় বা আকৃতি-প্রকৃতির বৈচিত্র্যে সমসাময়িক বিহার-প্রান্তের অসংখ্য নিবেদন-স্তূপের সঙ্গে বাংলার স্বল্পসংখ্যক নিবেদন-স্তূপের কোন তুলনাই হয় না। ব্রোঞ্জ-ধাতুতে ঢালাই করা কিংবা পাথর কুঁদিয়া গড়া কয়েকটি স্বল্পায়তন নিবেদন-স্তূপ বাংলার নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে; এগুলিকে ঠিক স্থাপত্যনিদর্শন বলা চলে না। ঢাকা জেলার আস্রফপুর-গ্রামে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের একটি স্বল্পায়তন নিবেদন-স্তূপ বোধহয় বাংলার সর্বপ্রাচীন (আ সপ্তম শতক) স্তূপনিদর্শন। পাথরে কুঁদিয়া তৈরী একটিমাত্র নিবেদন-স্তূপের খবর আমরা জানি; এই স্তূপটি যোগী-গুম্ফায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দর্শনে ইহাকে স্তূপ বলিয়াই মনে হয় না। ভিত্, বেদি, মেধি, অণ্ড, হর্মিকা, ছত্রাবলী প্রভৃতি সবকিছুরই গতি এমন ঊর্ধ্বগামী যে সমগ্র স্তূপটিকে মনে হয় যেন একটি ক্রমহ্রস্বায়মান গোলাকৃতি স্তম্ভ, এবং স্তম্ভটিরই অংশে অংশে

খাঁজ কাটিয়া স্তূপের বিভিন্ন অংশের রূপ দেওয়া হইয়াছে। সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রে কয়েকটি স্তূপের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অলংকরণসমৃদ্ধির কথা বাদ দিলে আকৃতি-প্রকৃতির দিক হইতে সব কয়টি স্তূপ প্রায় একই প্রকারের। খাঁজ-কাটা চতুষ্কোণ ভিত্, ধাপে ধাপে তৈরী বেদী, পদ্মাকৃতি মেধি, ক্রমহ্রস্বায়মান অণ্ড ও ছত্রাবলী প্রত্যেকটি স্তূপেরই বৈশিষ্ট্য।

স্তূপস্থাপত্যে বাংলাদেশ নূতন কোন বৈশিষ্ট্য রচনা করে নাই বলিয়াই মনে হয়; নূতন সমৃদ্ধির সংযোজনাও নাই; বৃহদাকৃতি স্তূপরচনার কোন চেষ্টাও বোধ হয় ছিল না। বস্তুত নিবেদন উদ্দেশ্য ছাড়া, স্ব-স্বতন্ত্র স্থাপত্যনিদর্শন হিসাবে স্তূপ গড়িয়া তুলিবার উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই বোধ হয় প্রাচীন বাংলা বা বিহারে ছিল না। স্থাপত্য হিসাবে স্তূপ প্রাচীন বাংলার চিত্ত আকর্ষণ করে নাই। অথচ, প্রায় সমসাময়িক কালে ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগাননগরে দেখিতেছি, স্তূপরচনার কী সমৃদ্ধি, কী ঐশ্বর্য! তাহার কারণ সহজবোধ্য। মহাযান-বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্তূপের সম্বন্ধ স্বল্পই; তাহা ছাড়া, নিবেদন-স্তূপ তো যথার্থত স্তূপই নয়, স্তূপের মৌলিক উদ্দেশ্যও বহন করে না।

স্তূপের পরই বিহারের কথা বলিতে হয়। স্তূপ যদি ছিল পূজার প্রতীক, শ্রদ্ধার বস্তু, বিহার ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার, নিয়ম-সংযম-পালনের আশ্রয়। আদিম বৌদ্ধ বা জৈন বিহার পাহাড় কুঁদিয়া তৈরী গুহা মাত্র। এই ধরনের বিহার-রচনা ঠিক স্থাপত্য নয়, নির্মাণগত কোন বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের কোন প্রেরণা এ ক্ষেত্রে সক্রিয় নয়। অবশ্য ইট বা পাথরের ভিত্ ও কাঠামোর উপর বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে বিহার-রচনার একটা চেষ্টাও ছিল, এবং সে ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটা বুদ্ধিও সক্রিয় ছিল। মাঝখানে সুবিস্তৃত অঙ্গন; সেই অঙ্গনের চারিদিকে ঘিরিয়া কক্ষশ্রেণী; এক একদিকের কেন্দ্র-কক্ষটি বৃহত্তর; অঙ্গনের এক কোণে কূপ ও স্নানাচমনস্থান; এবং বিহারের ঢুকিবার একটি মাত্র প্রবেশদ্বার।

বৌদ্ধ ও জৈন সংঘের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন বিহারের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ইটের সাহায্যে সেই বিহার-রচনার সূচনা হয়—সদ্যোক্ত বাঁশ-কাঠে নির্মিত বিহারের বিন্যাস অনুযায়ী। একতল বিহারেও যখন কুলাইল না তখন দ্বিতল, ত্রিতল, এমন কি নবতল পর্যন্ত বিহার নির্মিত হইতে আরম্ভ করিল, এবং গোড়ায় যে বিহার ছিল ভিক্ষুদের আবাসস্থল মাত্র সেই বিহারই হইয়া উঠিল বিরাট জ্ঞান-বিজ্ঞানসাধনার, ধর্মকর্মসাধনার কেন্দ্র।

প্রাচীন বাংলায়ও এই ধরনের ছোট বড় বিহার ছিল অনেক। এইসব বিহারের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙ-কথিত পুণ্ড্র-বর্ধনের পো-সি-পো বা ভাসু-বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের লো-টো-মো-চিহ্ বা রক্তমৃত্তিকা-বিহারের বর্ণনায়।

খননাবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে অন্তত দুইটি বিহার ছিল। ৪৭৮-৭৯ খৃষ্ট তারিখের একটি লিপিতে জানা যায়, এই স্থানের বট-গোহালী বা গোয়াল-ভিটায় আচার্য গুহনন্দীর একটি জৈন-বিহার ছিল। আর অষ্টম শতকের শেষার্ধে সোমপুরের শ্রীধর্মপাল-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জৈন-বিহারটির ভূমি-নকশা ও আকৃতি-প্রকৃতি কী ছিল তাহা জানিবার কোন উপায়

নাই। কিন্তু ধর্মপাল-বিহারটির নকশা ও আকৃতি-প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর। এত বৃহৎ ও সমৃদ্ধ বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহার মহাবিহার নাম যথার্থ এবং সার্থক।

প্রত্যেক দিকে প্রায় ৯০০ ফুট, এমন একটি সমচতুষ্কোণ জুড়িয়া বিহারটি বিস্তৃত, এবং দৃঢ় সুপ্রশস্ত বহিঃপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীর ঘেঁষিয়া ভিতরের দিকে সারি সারি প্রায় ১৮০টির উপর কক্ষ; প্রত্যেক দিকের কেন্দ্রের কক্ষটি বৃহত্তর। কক্ষসারির সম্মুখ দিয়া সুপ্রশস্ত বারান্দা লম্বমান হইয়া চলিয়া গিয়াছে চারিদিক ঘিরিয়া; কেন্দ্রের সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দা হইতে নামিলেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন, এবং অঙ্গনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে সুউচ্চ সুবৃহৎ মন্দির। বারান্দার প্রান্তে সিঁড়ির উপরেই স্তম্ভশ্রেণী; এই স্তম্ভশ্রেণী ও কক্ষের দেয়ালের উপর ছাদ। বহিঃপ্রাচীরের প্রশস্ততা এবং স্তম্ভশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দেখিয়া মনে হয় বিহারটির একাধিক ছিল তল, এবং কেন্দ্রীয় মন্দিরের উচ্চতা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে রক্ষা করিয়া সমগ্র বিহারটির উচ্চতা ও সমৃদ্ধি নিরূপিত হইয়াছিল।

এই চতুঃসংস্থান-সংস্থিত সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরটিকে বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা-লিপিতে বিশেষিত করা হইয়াছে বসুধার একতম নয়নানন্দ বলিয়া। এই সুবৃহৎ বিহার একদিনে নির্মিত হয় নাই, এবং ইহার প্রায় চারি শতাব্দীর সুদীর্ঘ জীবনে একাধিকবার সংস্কার ও সংযোজনের প্রয়োজনও হইয়াছিল। তবু, এ তথ্য অনস্বীকার্য বলিয়া মনে হয় যে, গোড়া হইতেই এই বিহারের নকশা, বিন্যাস ও আকৃতি-প্রকৃতি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনায় বিহারটির সামগ্রিক রূপের একটা সুস্পষ্ট ধারণা সক্রিয় ছিল এবং নির্মাণ, সংস্কার ও সংযোজনকালে সেই রূপটির কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। সূচনায় বিহারের কক্ষগুলি ভিক্ষুদের বাসগৃহ-রূপেই ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ কক্ষে সমুখে অলংকরণযুক্ত বেদী দেখিয়া মনে হয়, পরবর্তী কালে আবাসিক ভিক্ষুসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় সেই কক্ষগুলি বোধ হয় পূজাগৃহরূপেই ব্যবহৃত হইত।

এই সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরের ব্যবস্থা-কর্ম পরিচালনার জন্য একটি দপ্তর ছিল, এবং সে দপ্তর-গৃহটি ছিল প্রধান প্রবেশতোরণের পাশেই। তল হইতে তলে, কক্ষ হইতে কক্ষে, অঙ্গন হইতে অঙ্গনে জলনিঃসরণের একটি প্রণালী সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া বাহিয়া বিহার-মন্দিরটির সমস্ত জল নিষ্কাশিত করিত বিহারসীমার ভিতরেই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি দীর্ঘিকায়। কক্ষশ্রেণীর মাঝে মাঝে, সুপ্রশস্ত অঙ্গনেও নানা স্থানে ছোট ছোট মন্দির, নিবেদন স্তূপ, কূপ, স্নানাচমনাগার ইত্যাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

নালন্দা, শ্রাবস্তী প্রভৃতি স্থানের সুবৃহৎ বিহারগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে মনে হয়, সোমপুর-বিহারটির সাধারণ নকশা ও বিন্যাস ছিল প্রায় একই ধরনের। কিন্তু, সন্দেহ নাই, পাহাড়পুরের মতন সুসমৃদ্ধ, সুবৃহৎ ও সুবিন্যস্ত বিহার এ পর্যন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই।

সাত

লিপি- ও সাহিত্য -সাক্ষ্যে জানা যায়, প্রাচীন বাংলার মন্দির নির্মিত হইয়াছিল অসংখ্য; কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন, অর্ধভগ্ন মন্দির ছাড়া এই অসংখ্য মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট নাই। অথচ ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে

মন্দিরেই যাহা কিছু বাংলার বৈশিষ্ট্য। বাংলার মন্দিরই ধবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট মন্দিরস্থাপত্যের মূলে প্রেরণা। সমসাময়িক লিপিমালা ও সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার কোন কোন মন্দিরের সমৃদ্ধির-বর্ণনা দৃষ্টিগোচর; এমন দুই-একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা যায় সমসাময়িক পাণ্ডুলিপিচিত্রে এবং তক্ষণফলকে, যেমন রাঢ়া ও পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধমন্দির, বরেন্দ্রের তারামন্দির, সমতট, বরেন্দ্র, নালেন্দ্র, রাঢ়া এবং দণ্ডভুক্তির লোকনাথমন্দির। এইসব মন্দিরের প্রতিকৃতির আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলার মোটামুটি চারিটি বিভিন্ন শৈলীর মন্দিরনির্মাণ-রীতি প্রচলিত ছিল। রীতি ও শৈলীর এই বিভিন্নতা ভূমি-নকশানির্ভর নয়, বস্তুত, প্রত্যেকটি রীতিতেই ভূমি-নকশার মূর্তি ও বিন্যাস প্রায় একই ধরনের; এই বিভিন্নতা গর্ভগৃহের উপরিভাগ অর্থাৎ ছাদ বা চালের রূপ- ও আকৃতি -নির্ভর। উপরোক্ত চারিটি রীতি নিম্নলিখিতভাবে তালিকাগত করা যায়।

(১) ভদ্র- বা পীড় -দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি হইয়া ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ধাপ বা স্তর সংখ্যায় তিনটি, পাঁচটি বা সাতটি। সর্বোচ্চ এবং ক্ষুদ্রতম স্তরের উপরে আমলক ও চূড়া। এই ভদ্র- বা পীড় -দেউলই ওড়িষ্যার রেখ- বা শিখর -মন্দিরসমূহের সম্মুখভাগের জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ।

(২) রেখ- বা শিখর -দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ঈষদ্বক্র রেখায় শিখরাকৃতি হইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। শিখরের উপরি-ভাগে আমলক ও চূড়া। এই রেখ- বা শিখর -দেউল উত্তর-ভারতীয় এবং ওড়িষ্যার নাগর পদ্ধতির মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত।

(৩) স্তূপযুক্ত পীড়- বা ভদ্র -দেউল। এই ধরনের দেউলে চালের ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপরে একটি স্তূপ। স্তূপটির উপর চূড়া।

(৪) শিখরযুক্ত পীড়- বা ভদ্র -দেউল। এই ধরনের দেউলের চালের ক্রমহ্রস্বায়-মান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপর একটি শিখর। শিখরের উপর চূড়া।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই চার বিভিন্ন রীতির প্রত্যেকটির স্থাপত্য-নিদর্শন আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই।

(১) ভদ্র- বা পীড় -দেউল যে প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচুর ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় অগণিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতিগুলিতে। এই রীতির প্রাথমিক রূপটি দেখিতেছি ঢাকা আস্রফপুরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের রোঞ্জ-নির্মিত একটি ফলকে। চারিটি খাঁচকাটা কাঠের স্তম্ভের উপর ঢালু ক্রমহ্রস্বায়মান দুইটি চাল, তাহার উপর সুন্দর একটি চূড়া। ইহাই এই রীতির মন্দিরের মূল রূপ; এই রূপই ক্রমশ আরও সমৃদ্ধ এবং জটিল হইয়াছে। একটি একটি করিয়া ঢালু চালের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে; সর্বোচ্চ চালটির উপর চূড়ার নীচেই গ্রীবাদেশের গোলাকৃতি অণ্ডটি ক্রমশ আমলকশিলায় বিবর্তিত হইয়াছে, এবং গ্রীবানিম্নের চালটির (আড়চক্রের) চারিকোণে চারিটি ঝম্পসিংহমূর্তির অলংকরণ সংযোজিত হইয়াছে। ভূমি-নকশা সাধারণত চতুষ্কোণরথাকৃতি; প্রত্যেক দিকের বিলম্বিত রেখাটি কেন্দ্রীয় অংশটির সম্মুখ দিকে বাড়াইয়া দিয়া রথের আকৃতি দান করা হইয়াছে। এই ধরনের রথাকৃতি ভূমি-নকশার উপর দুই বা ততধিক ঢালু ক্রমহ্রস্বায়-মান চালের মন্দির মধ্যযুগের বাংলাদেশেও সুপ্রচলিত রীতি ছিল। লোকায়ত

বাংলার দ্বিতল বা ত্রিতল খড়ের চালের রূপ হইতেই যে এই রীতির উদ্ভব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) রেখ- বা শিখর -দেউলের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বর্ধমান-বরাকরের ৪নং মন্দিরটি। এই মন্দিরটি পাথরে তৈরী; নীচু ভিতের উপর গর্ভগৃহটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং গর্ভগৃহের উপর খর্বাকৃতি একটি রেখ বা শিখরের চাল। গোড়া হইতেই শিখরের ক্রমবক্র রেখাটি উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে, শিখরের উপর একটি বৃহৎ আমলকশিলা। শিখরের পগরেখাগুলি সুতীক্ষ্ণ ও সুকঠোর সারল্যে নিয়ন্ত্রিত। স্থাপত্যরূপের দিক হইতে এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সম-কালীন, অর্থাৎ অষ্টমশতকীয়।

এই রেখ-দেউলের বিবর্তনের পরবর্তী স্তরটি ধরা পড়িয়াছে তিনটি ক্ষুদ্রায়তন নিবেদন-মন্দিরে; এই তিনটির দুইটি পাথরে তৈরী (একটি দিনাজপুরে এবং আর একটি রাজসাহীর নিমদীঘিতে প্রাপ্ত), তৃতীয়টি ব্রোঞ্জে গড়া (চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারীতে পাওয়া)। রেখাকৃতি ভূমি-নকশার উপর গর্ভগৃহ; গর্ভগৃহের চারিদিকে চারিটি ত্রিবলীত তোরণ বা কুলুঙ্গি; চালে ক্রমবক্রাকৃতি শিখর এবং শিখরের শীর্ষে সংকীর্ণ গ্রীবার উপর আমলক। বিবর্তনের এই স্তরেও পগরেখা তীক্ষ্ণ ও সরল, তবে শিখরের অঙ্গে চৈত্যগবাক্ষের অলংকার।

বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে প্রায় চার-পাঁচটি ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন নিদর্শন বিদ্যমান। এই মন্দিরগুলির ভূমি-নকশা, গর্ভগৃহ, শিখর ও অলংকরণ প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ধরা পড়ে, সদ্যোক্ত শিখরাকৃতি নিবেদন-মন্দিরগুলির সঙ্গে ইহাদের মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই, তবে এই মন্দিরগুলি আয়তনে ও অলংকরণে সমৃদ্ধতর, আকৃতি-প্রকৃতিতে জটিলতর। মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে দেখিতেছি, শিখরের পগরেখাগুলির তীক্ষ্ণত্ব মার্জনা করিয়া একটু গোলাকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে সমগ্র শিখরটিরই আকৃতি হইয়া পড়িয়াছে খানিকটা গোলাকার। তাহা ছাড়া, মূল শিখরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকারের সজ্জা সংযোজিত হইয়াছে, এবং প্রবেশতোরণের দিকে একটি অলিন্দও যোগ করা হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলার রেখ- বা শিখর -দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের শত্রুঘ্নেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়, এবং কালের দিক হইতে যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝা যায়। স্পষ্টতই ইহারা লিঙ্গরাজমন্দিরের পূর্ববর্তী। তাহা ছাড়া, বাংলার মন্দিরগুলির আর-একটি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে; ওড়িষ্যার মন্দিরগুলির মতো এই মন্দিরগুলির কোন জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ নাই, আমলকসহ শিখরশীর্ষ গর্ভগৃহই দেউলের একমাত্র অঙ্গ অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে জগমোহনের পরিবর্তে সম্মুখদিকের দেয়ালে একটি অলিন্দের সংযোজন আছে। ওড়িষ্যার লিঙ্গরাজ ও পরবর্তী মন্দিরগুলির ভূমি-নকশায় ও অলংকরণে যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাও বাংলার মন্দিরগুলিতে নাই। বস্তুত, বাংলার মন্দিরগুলি ক্ষুদ্রকায় হইলেও খুব মার্জিত ও সংযত রুচির পরিচয় বহন করে।

(৩) স্তূপশীর্ষ ভদ্র- বা পীঢ় -দেউলের নিদর্শন প্রাচীন বাংলায় খুব বেশি দেখা যায় না। তবে কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিচিত্রে নয়লেন্দ্র নামক স্থানের লোকনাথমন্দিরের একটি প্রতিকৃতি আছে। এই প্রতিকৃতিতে

এই ধরনের মন্দিরের অন্তত একটি নিদর্শন দৃষ্টিগোচর। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর ক্রমহ্রস্বায়মান চাল; চালের কয়েকটি স্তরের চারিটি কোণে কোণে একটি একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপের অলংকরণ। ব্রহ্মদেশ-পাগানের অভয়দান এবং পাটোথাম্যা-মন্দির (একাদশ-শতক) দুইটির স্থাপত্য- রূপ ও -রীতির পশ্চাতে যে এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

(৪) শিখরশীর্ষ পীড়- বা ভদ্র -দেউলেরও নির্মাণ-নিদর্শন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; তবে একটি পাণ্ডুলিপিচিত্রে পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধমন্দিরের যে প্রতিকৃতি আছে, এবং কয়েকটি প্রস্তরফলকে যে ধরনের কয়েকটি মন্দির উৎকীর্ণ আছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, এই শিখরশীর্ষ পীড় বা ভদ্র-দেউলও বাংলাদেশে সুপ্রচলিত ও সুপরিচিত ছিল। এই ধরনের মন্দিরে চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর স্তরে স্তরে ক্রমহ্রস্বায়মান চাল এবং সর্বোচ্চ চালটির উপর বক্ররেখায় একটি শিখর, শিখরের উপর আমলকশিলা; এবং বৌদ্ধমন্দির হইলে আমলকশিলার উপর একটি অতি ক্ষুদ্রকায় স্তূপের প্রতীক। ব্রহ্মদেশের পাগান শহরে একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় থাট্‌বিঞ্ঞু, টিহ্‌-লো-মিন্‌হ্‌-লো, গোয়েগু-জি ও অন্যান্য অনেকগুলি মন্দিরের পশ্চাতে বাংলার এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান।

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ উন্মোচন করিয়া একটি বিপুলকায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহার গঠনরেখা ও রীতি অনুসরণ করিলে ইহার সামগ্রিক আকৃতি-প্রকৃতি ক্রমশ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। তখন স্বীকার করিতে বাধা থাকে না, এই মন্দির প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময়।

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে 'সর্বতোভদ্র' নামে একশ্রেণীর মন্দিরের উল্লেখ ও পরিচয় আছে। এই ধরনের মন্দির চতুষ্কোণ এবং চতুঃশালগৃহ, অর্থাৎ ইহার চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ, এবং সেই গৃহে প্রবেশের জন্য চারিদিকে চারিটি তোরণ। শাস্ত্রানুযায়ী এই ধরনের মন্দির হইত পঞ্চতল, প্রত্যেক তলের ষোলোটি কোণ। প্রত্যেক তল ঘিরিয়া প্রদক্ষিণপথ এবং প্রাচীর; সমগ্র মন্দিরটি অলংকৃত হইত অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ও চূড়ায়। পাহাড়পুরের সুবিস্তৃত মন্দিরটি এই সর্বতোভদ্র মন্দিরের উজ্জ্বল নিদর্শন। এক পাহাড়পুর ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বোধ হয় মন্দিরস্থাপত্যের এই রূপ ও রীতি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই; তবে এই রূপ ও রীতি যে বহির্ভারতে, অন্তত প্রাচীন যবদ্বীপ-ও ব্রহ্মদেশের মনোহরণ করিয়াছিল, এ সম্বন্ধে সুপ্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশে প্রাচীন পাগান শহরের চতুঃশাল থাট্‌বিঞ্ঞু বা সর্বজ্ঞ, গোয়েগু-জি, টিহ্‌-লো-মিন্‌হ্‌-লো প্রভৃতি মন্দির এবং যবদ্বীপে প্রাম্বানাম নগরীর প্রাচীন লোরো-জোংরাং মন্দির, শিবমন্দির একই অনুপ্রেরণায় কল্পিত ও গঠিত। কালের দিক হইতে অষ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির ইহাদের সকলের আদিতে।

স্বর্গত কাশীনাথ দীক্ষিত ও শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়দের আলোচনা গবেষণার ফলে পাহাড়পুর মন্দিরের মৌলিক রূপ, প্রকৃতি ও গঠন ধরিতে পারা সহজ হইয়াছে। মন্দিরটির ভূমি-নকশা চতুষ্কোণ; প্রত্যেক দিকের বাহু সম্মুখ দিকে তিনবার বিস্তৃত করিয়া অনেকগুলি কোণের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং সমগ্র নকশাটিকে

সমান্তরালে প্রসারিত করা হইয়াছে চারিদিকে। মূল চতুষ্কোণ নকশাটির মধ্য ভূমির উপর একটি শূন্যগর্ভ বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; ইহারই সর্বোচ্চে স্থাপিত ছিল মন্দিরের শীর্ষ; কিন্তু শীর্ষটি শিখরাকৃতি কি স্তূপাকৃতি ছিল তাহা নির্ণয়ের কোন উপায় নাই। শূন্যগর্ভ চৈত্যাকার স্তম্ভটির দেয়াল অতি প্রশস্ত; এই চতুঃসংস্থান-সংস্থিত স্তম্ভটিই সমগ্র মন্দিরটির কেন্দ্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেকটি ক্রমহ্রস্বায়মান স্তর এবং স্তরোপরি প্রদক্ষিণপথ ও প্রাচীর, চতুঃশালগৃহ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত ও প্রসারিত। মন্দিরটি চতুর্মুখী অর্থাৎ সর্বতোভদ্র হওয়া সত্ত্বেও ইহার প্রবেশতোরণ উত্তরদিকে। অঙ্গন হইতে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেই ভিত্তিস্তরের সমতলে একটি সুপ্রশস্ত চত্বর: এই চত্বর অতিক্রম করিলেই দক্ষিণতম প্রান্তে বেষ্টনীপ্রাচীরের তোরণ ভেদ করিয়া ভিত্তিস্তরের সর্বতোভদ্র প্রদক্ষিণপথে প্রবেশ। প্রদক্ষিণপথটি ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে মন্দিরের চারিদিকে, এবং পথটির প্রান্ত বাহিয়া বেষ্টনীপ্রাচীর। এই প্রদক্ষিণপথের যে কোন দিক হইতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া হ্রস্বায়িত প্রথম তলে আরোহণ করা যায়; এই স্তরেও একই প্রকারের প্রদক্ষিণপথ, বেষ্টনীপ্রাচীর, তদুপরি এক-একদিকে এক-একটি করিয়া মণ্ডপ। প্রথম তল হইতে সোপান বাহিয়া দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিলেই স্পষ্টত বুঝা যায়, এই তলই সর্বপ্রধান তল, কারণ এই তলই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, এই তলেই কেন্দ্রস্থিত শূন্যগর্ভ স্তম্ভটির চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ এবং প্রত্যেক গর্ভগৃহের সম্মুখে এক-একটি করিয়া বৃহৎ মণ্ডপ। সন্দেহ নাই, এই চারিটি গর্ভগৃহই ছিল প্রধান পূজাগৃহ।

কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, পাহাড়পুরে বোধ হয় একটি চতুর্মুখ জৈনমন্দির ছিল, এবং এই চতুর্মুখ জৈনমন্দিরটিই বোধ হয় ছিল পাহাড়পুর মন্দিরের মূল অনুপ্রেরণা। এ অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে।

পোড়ামাটির ইটে, কাদার গাঁথুনিতে পাহাড়পুর-মন্দির তৈরী। বহিঃপ্রাচীরের দেয়ালের স্কন্ধে কিছু কিছু অলংকরণ এবং অগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া ঐশ্বর্য প্রচারের আর কোন চেষ্টা নাই। পাহাড়পুরের ভিত্তিপ্রাচীরগাত্রে প্রস্তরফলকনিদর্শনও অপ্রচুর নয়। এই সুবৃহৎ মন্দির একদিনে নির্মিত হয় নাই, বলাই বাহুল্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমগ্র মন্দিরটির পরিকল্পনায় ও গঠনে এমন একটি সুসম সংহত সমগ্রতা আছে যে, মনে হয় মন্দিরটি আগাগোড়া একই ভাবনাকল্পনার সৃষ্টি, এবং মোটামুটি একই সময়ে নির্মিত। খুব সম্ভব, নরপতি ধর্মপালই ইহার পোষক এবং তাঁহারই রাজত্বকালে সোমপুরের এই মন্দির ও বিহার রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন বাংলার যে কয়েকটি রূপ ও রীতির মন্দিরের কথা আগে বলিয়াছি সে সব রূপ ও রীতির মন্দিরের সঙ্গে বহির্ভারতের বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশের এবং যবদ্বীপের অনেক মন্দিরের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে সব মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলির আকৃতি-প্রকৃতিও অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারে। যে ক্রমহ্রস্বায়মান চালু চালের ভদ্র বা পীড় রীতির মন্দিরের কথা আগে বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশে এই রীতি এক সময়ে সুপ্রচলিত ছিল, এবং পরেও সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া কাঠে ও ইটে, বেশির ভাগ কাঠে, এই ধরনের পায়াথাট বা প্রাসাদমন্দির প্রচুর নির্মিত হইত। পাথরে তৈরী এই ধরনের মন্দির যবদ্বীপের চণ্ডী-পানাতরমের প্রাঙ্গণে দুই চারিটি আজও বিদ্যমান। বলিদ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে

এই ধরনের ভদ্র - বা পীড় - দেউল আজও নির্মিত হয়। এই ভদ্র বা পীড় শ্রেণীর মন্দির ছাড়া চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর স্তূপ বা শিখরশীর্ষ ভদ্র- বা পীড় -দেউলও ব্রহ্মদেশের চিত্ত হরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহা প্রায় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতেই। যবদ্বীপের স্তূপশীর্ষ চণ্ডী-পাওন মন্দিরও এই রীতিরই অন্যতম নিদর্শন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন বাংলাদেশই এইসব বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টার মূলে অনুপ্রেরণা।

খননাবিষ্কারের ফলে প্রাচীন বাংলার আরও কয়েকটি এমন মন্দিরের অস্তিত্ব জানা যায় যাহা কোন শ্রেণীচিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না।

সমসাময়িক ওড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বা পুরী-কোনারকে, বা মধ্য-ভারতের খাজুরাহোতে, ব্রহ্মদেশের পাগানে বা যবদ্বীপের প্রাম্বানাম-পানাতরমে, কাম্বোজের অঙ্কোর-থোমে বা দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চীপুরে যে সুবিস্তৃত মন্দিরনগরীর কথা আমরা জানি, প্রাচীন বাংলার কোথাও সে ধরনের সুবিস্তৃত মন্দিরনগরীর পরিচয় পাইতেছি না। সমস্ত সাক্ষ্যেরই ইঙ্গিত যেন বিচ্ছিন্ন দুই-চারিটি মন্দিরের দিকে, এবং সে মন্দিরও খুব বৃহদায়তন নয়। মনে হয়, অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বল্পায়তন। বস্তুত প্রাচীন বাংলায় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠননৈপুণ্যের পরিচয় খুব বেশি নাই; গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে সে সুযোগও ছিল স্বল্পই। বাংলার কৃষিনির্ভর জীবনের অর্থসম্বল ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, এবং বৃহৎ দুঃসাহসী জীবনের গভীর ও ব্যাপক উল্লাসের কোন প্রশস্ত স্পর্শ সে জীবনে লাগে নাই। কাজেই শিল্পেও সে পরিচয় নাই। *

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইতিহাসের ইঙ্গিত

ইতিহাসের যুক্তি দিয়া এই গ্রন্থের সূচনা; সেই যুক্তিকেই বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি তেরোটি অধ্যায় জুড়িয়া। এই তথ্যবিবৃতি ও আলোচনার ভিতর হইতে ইতিহাসের কোন্ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে, গ্রন্থশেষে তাহার আলোচনা উপস্থিত করা হয়তো অসংগত নয়। এতক্ষণ ছিলাম ঘনবৃক্ষবিন্যস্ত গহন অরণ্যের মধ্যে, এখন দূরে দাঁড়াইয়া বাহির হইতে সমস্ত অরণ্যটির আকৃতি-প্রকৃতি এবং উহার সমগ্র জীবনপ্রবাহের ধারাটি সংক্ষেপে একটু ধরিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য প্রাচীন বাঙালীর জীবনপ্রবাহের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ ও বস্তুপুঞ্জকে সংহত করিয়া একটি গভীর ও সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা, প্রাচীন বাঙালী জীবনের মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে ধরিতে চেষ্টা করা।

এক

আজ আমরা যাহাদের বাঙালী বলিয়া জানি তাহারা সকলে একই নরগোষ্ঠীর লোক নহেন, এ তথ্য সর্বজনবিদিত; বিচিত্র নরগোষ্ঠীর লোক লইয়া বৃহত্তর বাঙালী জনের গঠন। বাংলাদেশে বহুদিন পর্যন্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কোমবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ জন, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহারা একান্ত কৌমজীবনেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। এক-একটি কোম এক-একটি বিশিষ্ট স্থান লইয়া মোটামুটি ভাবে স্ব-স্বতন্ত্রপরায়ণ স্ব-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করিত, অন্য কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা থাকিত না। তাহার ফলে এইসব বিচিত্র কোমের মধ্যে বৃহত্তর জনচেতনা বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠিবার সুযোগ বিশেষ ছিল না, সমাজ গঠনে তাহার প্রভাব তো দূরের কথা। পরবর্তী কালে নানাপ্রকারের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে এইসব বিচিত্র কোমের মধ্যে নানাপ্রকারের আদান-প্রদান চলিতে থাকে, এবং তাহারই ফলে বৃহত্তর অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ কোমের একত্র সমবায়ে বৃহত্তর কোমের (বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, সুহ্মাঃ ইত্যাদির) উদ্ভব ঘটে। কিন্তু কৌমসত্তা ও কৌমস্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এই কৌমচেতনা পূর্বাপর সর্বত্র সক্রিয়; সমাজের বর্ণ-, বৃত্তি ও শ্রেণী -বিন্যাসে, অর্থ উৎপাদন ও বণ্টনে, গ্রাম ও নগরের বিভিন্ন পল্লীর বিন্যাসে, রাষ্ট্রগত ক্রিয়াকর্মে, ধর্মকর্মে, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই কৌমচেতনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; ক্ষুদ্র বৃহৎ কোম এবং গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সমস্ত ভাবনা-কল্পনা, সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আবর্তিত হইত। প্রাচীন বাংলার শেষ পর্যন্ত এই কৌমচেতনা সমভাবে বিদ্যমান।

কৌমস্মৃতি ও কৌমচেতনার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী জড়িত আঞ্চলিক স্মৃতি ও আঞ্চলিক চেতনা। রাঢ়াঃ, সুহ্মাঃ, বঙ্গাঃ, গৌড়াঃ, পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি জনেরাই পরবর্তী কালে এক-একটি অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশ রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র

প্রভৃতি জনপদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব পৃথক-পৃথক ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদকে একটি বৃহত্তর দেশখণ্ডে একত্র ও সমন্বিত করিয়া তাহাকে একটা সমগ্র রূপ দিবার সজাগ চেষ্টা অন্তত শশাঙ্কের সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল, এবং পালপর্বে পালসম্রাটেরা ও পরবর্তী কালে সেনরাজারাও এ সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। পাল সম্রাটেরা তো বৃহদ্বঙ্গের স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে দেশের সামগ্রিক ঐক্যচেতনা জনসাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালী নিজেদের আঞ্চলিক জানপদ সত্তাকে বৃহত্তর দেশসত্তায় মিশাইয়া দিতে বা দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে শিখে নাই। স্থানীয় আঞ্চলিক সত্তা ও বৃহত্তর দেশসত্তার বিরোধ শুধু যে বাংলার ইতিহাসেই সক্রিয় এমন নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাহাই। একদিকে আমাদের চিন্তানায়ক, ধর্মগুরু এবং রাষ্ট্রবিধাতাদের কেহ কেহ সর্বভারতীয় চেতনাবোধটিকে সদাজাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন নানা উপায়ে; অন্যদিকে ইঁহাদেরই অনেকে আবার আমাদের আঞ্চলিক সংকীর্ণ বুদ্ধিটিকে নানাভাবে পরিতুষ্ট ও পরিপোষণ করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম- ও অধ্যাত্ম -জীবনে একদিকে যেমন ঐক্য ও সাম্যের জয়গান, তেমনই অন্যদিকে আবার নানা ভেদ-বৈষম্যের এবং অনৈক্যের সৃষ্টি। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসে আঞ্চলিক চেতনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং এই চেতনার ফলেই সেই ইতিহাসে দেশের সামগ্রিক বোধ কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

এই কৌমচেতনা ও আঞ্চলিক চেতনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে প্রধানত দুইটি কারণে—একটি কারণ ধনোৎপাদনপদ্ধতিগত, আর-একটি রাষ্ট্রবিন্যাসগত।

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের একেবারে আদিতে সামাজিক ধনের প্রধান উৎস ছিল শিকার, কৌম কৃষি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প; দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর কৃষি এবং গৃহশিল্প অর্থোপাদনের বড় উপায় ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রধানতম উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম শতক হইতে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন একান্তই ভূমি- ও কৃষি -নির্ভর। মোটামুটিভাবে বলা চলে, স্বল্প কয়েকটি শতাব্দী ছাড়া বাংলাদেশের ঐকান্তিক কৃষি- ও ভূমি -নির্ভরতা কখনও ঘুচে নাই। ভূমি স্থির ও অবিচল, এবং সেই ভূমিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহাদের জীবন ও জীবিকা, ভূমির অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের ভাবনা কল্পনা আবর্তিত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। কাজেই সেই জীবনে পরিবারের, কৌমের ও অঞ্চলের চেতনার প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িবার কোন সুযোগ-সম্ভাবনাই ছিল না; বরং তাহা আরও লালিত ও পুষ্ট হইবার সুযোগই ছিল বেশি।

রাষ্ট্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে কৌমতন্ত্র ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়াছিল কিন্ত এই বিবর্তন বাংলাদেশের সর্বত্র একই সময়ে একই সঙ্গে হয় নাই। পরাক্রমশালী রাজবংশের প্রভুত্ববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি কৌম ও জন ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রের সীমার মধ্যে আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। আবার রাজতন্ত্র গড়িয়া উঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের প্রায় অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সামন্ততন্ত্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সামন্তরা প্রায় সকলেই পৃথক পৃথক এক-একটি অঞ্চলের জননায়ক, এবং সেই

সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোকদের প্রাথমিক আনুগত্য আঞ্চলিক কৌমসামন্ত-নায়কটির প্রতি; দেশের রাজা বা সম্রাট তাহাদের কাছে দূরাগত ধ্বনি মাত্র। বাংলার ইতিহসের আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ফলে কৌমচেতনা ও আঞ্চলিক চেতনা পুষ্টিলাভ করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

দুই

বাংলার সকল কোমই একই সঙ্গে একই সময়ে সভ্যতার অধিকার লাভ করে নাই; অতি ধীরে ধীরে এক-একটি কোম সভ্যতার অধিকার পাইয়াছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক-একটি স্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাহার ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র এবং সমগ্র বাঙালী জীবন ব্যাপিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই স্তর বিস্তৃত নয়; এমন কি একই সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও নয়। সমাজের একটি অংশ যখন উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্যে নিরত, আর-একটি অংশ হয়তো তখনো নিতান্ত অনুন্নত ধরনে চাষ করিতেছে; একটি অংশ যখন বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত, উচ্চশ্রেণীর ধাতব মুদ্রায় কেনাবেচায় অভ্যস্ত, তখন হয়তো আর-একটি অংশে মুদ্রা প্রচলিতই নয়। একটি অংশে যখন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের প্রচলন, উচ্চশ্রেণীর মনন ও কল্পনার প্রসার, আর-একটি অংশে তখনও ভূতপ্রেতবাদ, জাদুশক্তিতে বিশ্বাস, গাছপূজা, পাথরপূজা নিরঙ্কুশভাবে চলিতেছে। অথচ এই দুটি অবস্থা এমন অব্যাহত ও সহজ ভাবে চলিয়াছে যেন ইহাদের মধ্যে বিরোধ কোথাও কিছু নাই!

ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন স্তরের প্রাক্-আর্য ও অনার্য, কিছু কিছু বৈদেশিক নরগোষ্ঠীর সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস বা আত্মসাৎ করিয়া করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যে প্রাক-আর্য বা অনার্য কোম যে সভ্যতা বা সংস্কৃতিস্তরের, সেই অনুযায়ী বৃহত্তর হিন্দু-সমাজে তাহার স্থান নির্ণীত হইয়াছে, এবং নানা বিধিবিধান দ্বারা সেই স্থানটিকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সজ্ঞানে সচেতনভাবে পারিপার্শ্বিকের সুযোগ লইয়া, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আবর্তের সাহায্যে সেইসব বিধিবিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহত্তর সমাজে স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে তাহারা ক্রমশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর তাহার সুযোগ-সুবিধা বেশি ছিল না; বিধিবিধানের প্রাচীর ছিল সুদৃঢ়। তাহার ফলে বৃহৎ হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিতর নানা স্তর, নানা আকৃতি-প্রকৃতি, নানা রূপ, নানা বৈচিত্র্য; কিন্তু সবকিছুই একটা বৃহত্তর সীমার মধ্যে একীকৃত ও বহুলাংশে সমন্বিত।

বাংলাদেশ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে, বরং আর্যস্থানবহির্ভূত পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ-বলিয়া একটু বেশিই বলা চলে। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী জীবনের সর্বত্র ইতিহাসের রথচক্র সমান গতিতে চলে নাই, ভূমিও সমতল নয়। তাহার ফলে আমাদের সমাজের ও জীবনের নানাস্থানে নানা অসমতা, অসংগতি। নানা স্তরের নানা অনুন্নত-সমাজাংশকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই স্তরে আনিয়া সমতলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইতিহাসের গতিকে সহজ, সুসম ও সরল করিয়া দিবার কোন বৈপ্লবিক চেষ্টা প্রাচীন বাংলায় হয় নাই।

বাংলাদেশ ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশগুলির অন্যতম, এবং এদেশে আদিবাসী

কৌমসমাজের প্রতাপ ও প্রাবল্যও ছিল বেশি। কাজেই, এদেশে মধ্য-ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধন কখনও আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই। যত নিম্নেই হোক, বিধিবিধানের বাধানিষেধের যত সুদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়াই হোক, হিন্দুসমাজ নিজের বৃহৎ সীমার মধ্যে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাহাকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছে, এবং তাহার ফলে একটা বৃহৎ সমন্বয়ও গড়িয়া তুলিয়াছে।

তবু স্বীকার করিতেই হয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের বৃহৎ মানব-গোষ্ঠীকে লইয়া যে বাঙালী-সমাজ, সে সমাজের নিম্ন ও পশ্চাতের স্তরগুলি প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর স্তরকে নিম্নে ও পশ্চাতে টানিয়াছে, সমাজদেহকে পঙ্গু ও রুগ্ন করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের এই অসম গতি পুষ্ট ও লালিত হইয়াছে প্রাচীন বাঙালীর বর্ণ- ও শ্রেণী -বিন্যাসের সহায়তায়। আমাদের প্রাচীন বর্ণবিন্যাস বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, উহার বিভিন্ন স্তর নির্ণীত হইয়াছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী, বৃত্তির স্তরচেতন্য অনুযায়ী। এই স্তরগুলি প্রত্যেকটি নানা বিধিবিধান বাধানিষেধের বেড়ায় ঘেরা, এবং সে বেড়া ডিঙাইয়া উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ নয়। কারণ, তাহার সঙ্গে আবার শ্রেণীচেতনাও জড়িত। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারের তারতম্যও আবার নির্ভর করিত এই বর্ণ-, বৃত্তি ও শ্রেণী -বিন্যাসের উপর। কাজেই একবার যাহার স্থান কোন একটা বিশেষ স্তরে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার স্থান ছাড়িয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই; ইতিহাসও সেখানে স্তব্ধ ও নিরস্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন বাংলায় তথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই শ্রেণীচেতনার চেয়ে বর্ণচেতনা, কৌমচেতনা ছিল প্রবল। আর, শ্রেণীর সঙ্গে তো বর্ণ ও বৃত্তি অঙ্গাঙ্গী জড়িতই ছিল। বর্ণ ও বৃত্তি যেখানে অনেকাংশে জন্মগত সে ক্ষেত্রে শ্রেণীও কতকাংশে অচল, অনড় হইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সক্রিয় বিরোধ এই অনড়, অচল অবস্থাকে ভাঙিয়া চুরিয়া বর্ণ- ও বৃত্তি -গত বাধানিষেধের প্রাচীর ধ্বসাইয়া দিতে পারিত, সেই সক্রিয় বিরোধের কোন প্রমাণ প্রাচীন বাংলায় উপস্থিত নাই। যখন যে-শ্রেণী সামাজিক ধন যে-পরিমাণে বেশি উৎপাদন করিয়াছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেই পরিমাণে তাহারা প্রভাব অর্জন ও বিস্তার করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই। আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব সত্ত্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহারা নিম্নে ও পশ্চাতেই থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, সেই স্থান তাহাদের বর্ণ ও বৃত্তি দ্বারা নির্দিষ্ট।

বর্ণ-, বৃত্তি ও শ্রেণী -গত যেসব বাধা ইতিহাসের গতিকে শ্লথ করিয়াছে সেসব বাধার প্রাচীর কিছুটা ভাঙিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন-পদ্ধতির উন্নত পরিবর্তন কিছু ঘটিত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। মাঝখানে কয়েকটি শতাব্দী বাংলাদেশ ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া একটা বৃহত্তর জীবনের আস্বাদন লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিছু বাধাবন্ধন তাহাতে কাটিয়াছিল, ইতিহাসের গতিও কিছুটা বেগ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্য যাঁহারা করিতেন তাঁহাদের শ্রেণীচেতনা ছিল বর্ণ- ও বৃত্তি -চেতনার অধীন। কাজেই জীবন ও সমাজের মৌলিক পরিবর্তন তাহাতে কিছু হয় নাই।

তিন

বাংলার ইতিহাসের আদিপর্বে—এবং শুধু আদিপর্বেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এবং বহুলাংশে এখনও—বাঙালী জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক, এবং বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন এবং তাহার সমস্ত ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইত।

ইহার প্রথম কারণ আমাদের কৌমবদ্ধ আদিম জীবনধারা—যে জীবনে প্রধান জীবনোপায় শিকার ও কৃষি এবং খুব ছোট ছোট গৃহশিল্প, এবং যাহার সমাজগঠনের প্রধান আশ্রয় গোষ্ঠী ও পরিবার। কৌমজীবনে পরিবার- ও গোষ্ঠী -বন্ধন স্বভাবতই প্রবল; সেই হেতু বৃহত্তর জনসমাজ গঠিত হওয়ার পরও বাঙালীর গ্রামকেন্দ্রিক ভাবনাকল্পনা এবং সমাজবন্ধন কখনও ঘুচে নাই। কারণ, কৌমচেতনার আশ্রয়ই হইতেছে গ্রাম।

এই গ্রামকেন্দ্রিকতার আর-এক কারণ আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদনপদ্ধতি। আমাদের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল কৃষি এবং ছোট ছোট গৃহশিল্প। কৃষি একান্তই ভূমিনির্ভর। কৃষিভূমি তো সমস্তই গ্রামে; অন্যদিকে এই ভূমিই আবার গোষ্ঠী- ও পরিবার -বন্ধনের আশ্রয়; এবং যেহেতু সেই ভূমি অনড়, অচল এবং সেই ভূমিই সকলের জীবিকাশ্রয়, সেইহেতু গোষ্ঠী এবং পরিবারও স্থির এবং গোষ্ঠী- ও পরিবার -বন্ধনও দৃঢ়। গ্রামগুলি সাধারণত ছিল স্ব-নির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ধরনের উৎপাদন- ও বণ্টন -পদ্ধতিতে জীবন গ্রামকেন্দ্রিক এবং সংস্কৃতিও গ্রামীণ হইবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

অবশ্য খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত, বিশেষভাবে চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত, বাংলাদেশ উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের প্রধান অংশীদার হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার ঐকান্তিক কৃষি- ও ভূমি -নির্ভরতায় কিছুটা ভাঁটা পড়িয়াছিল। ধীর মন্থর গ্রাম্য জীবনস্রোতে বাহির হইতে কিছু তরঙ্গাভিঘাত লাগিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গৃহশিল্পও নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিস্তৃত হইয়া থাকিবে, এবং বৃহত্তর যৌথশিল্পগুলি নগরগুলিতে স্থানান্তরিতও হইয়াছিল। প্রধানত এইসব প্রয়োজনেই, এবং কিছুটা রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে প্রাচীন বাংলায় কিছু কিছু নগরের পত্তন হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বাঙালীর কৃষিনির্ভরতা কখনও একেবারে ঘুচে নাই। অর্জিত ও সংগৃহীত ধন গ্রামেই ব্যয়িত ও বণ্টিত হইত—পরিবার ও গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া। নগরের যৌথশিল্পগুলিরও যোগান যাইত গ্রাম হইতেই এবং সে অর্থের একটা বৃহৎ অংশ গ্রামেই ফিরিয়া আসিত। এইসব কারণে বাংলায় যেসব নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলিকেও আকৃতি-প্রকৃতিতে বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর গ্রাম ছাড়া আর কিছু বলা চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলায় এবং উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যস্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যায়, এবং বাঙালী জীবন আবার একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে বাঙালীর ঐকান্তিক গ্রামকেন্দ্রিকতাও বাড়িয়া যায়, এবং আদিপর্বের শেষের দিকে ও মধ্যযুগে তাহা ক্রমবর্ধমান। বৃহতের, গভীরতার এবং ভাব- ও মনন -সমৃদ্ধির যেটুকু পরিচয় প্রাচীন বাঙালীর সংস্কৃতিতে

দৃষ্টিগোচর, তাহা সর্বভারতীয় সংস্কৃতি এবং বৃহত্তর শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যগত জীবনোপায়ের দান।

চার

মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতক পর্যন্ত গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য ভারতবর্ষের প্রধান ধনোৎপাদনউপায় ছিল কৃষি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ও যৌথ গৃহশিল্প এবং কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য। ধন কেন্দ্রীকৃত হইত বড় বড় গৃহপতিদের এবং শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহদের হাতে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের পুরাপুরি সুবিধাটা গাঙ্গেয় প্রাচ্য-ভারত অপেক্ষা বেশি পাইত উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য-ভারত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি, পাটলীপুত্র প্রভৃতি সত্ত্বেও প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরগুলি ছিল বেশির ভাগই উত্তর-পশ্চিমে, মধ্য-ভারতে এবং বিশেষভাবে পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রোপকূলে। বস্তুত, সমসাময়িক ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিজ্যপথগুলির গতি একান্তই পশ্চিম- ও উত্তর-পশ্চিম -মুখী। ফলে গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য-ভারতে জীবন ছিল একান্তই কৃষিকেন্দ্রিক। ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণত বোধ হয় বিনিময়েই চলিত; চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহার ভিতর স্বর্ণ- বা রৌপ্য -মুদ্রা প্রায় দেখিতেছি না। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সত্ত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা যাহাকে বলি বাণিজ্যসাম্য তাহা ভারতবর্ষের স্বপক্ষে ছিল না, অথবা থাকিলেও স্বর্ণ এবং রৌপ্য (মুদ্রার আকারেই হোক আর তালের আকারেই হোক) কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকিত মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ এবং রাষ্ট্রের হাতেই, অর্থাৎ সামাজিক ধন সমাজের সকল স্তরে বণ্টিত হইত না। উদ্বৃত্ত ধনের পরিমাণও বোধ হয় খুব বেশি ছিল না।

বাংলাদেশ গাঙ্গেয় ভারতের অন্যতম পূর্বপ্রত্যন্ত দেশ। পুণ্ড্রবর্ধনের মতো বাণিজ্য-নগর এবং তাম্রলিপ্তির মতন বন্দর-নগর তাহার ছিল সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উত্তর-ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলার এবং তদানীন্তন বাঙালীর স্থান খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না।

খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতেই ভারতবর্ষের সর্বত্র এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়, এবং সামাজিক ধন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া, জীবন-ধারণের মান উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষ যথার্থত সোনার ভারতে পরিণতি লাভ করে। এই বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রধান কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি: বস্তুত, এই কয়েক শতক ধরিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান, এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায়। খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত সুবিস্তৃত রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এবং দেশে ধনাগমের একটি স্বর্ণ-দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই বাণিজ্যব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে আমাদের দেশ এত লাভবান হইতে আরম্ভ করে, এত রোমক সোনা বহিয়া আসিতে আরম্ভ করে যে, দ্বিতীয় শতকে ঐতিহাসিক প্লিনি অত্যন্ত দুঃখে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেভাবে ভারত-বর্ষে সোনা বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এভাবে বেশিদিন চলিলে সমস্ত রোমক সাম্রাজ্য স্বর্ণহীন হইয়া পড়িবে! তখন সিন্ধুদেশের সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত সমস্ত উপকূল বাহিয়া কুড়িটিরও বেশি

ছোট-বড় সামুদ্রিক বন্দর, প্রতি বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্যোপনিবেশ। এইসব বন্দর আশ্রয় করিয়া জাহাজে জাহাজে রোমক সোনার স্রোত বহিয়া আসিত ভারতবর্ষের সর্বত্র। বস্তুত, পশ্চিম-ভারতের এই স্বর্ণদ্বারের অধিকার লইয়াই তো শক-সাতবাহন সংগ্রাম, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম-ভারত অভিযান, স্কন্দগুপ্তের বিনিদ্র রজনী যাপন। এই বৈদেশিক সামুদ্রিকবাণিজ্যলব্ধ স্বর্ণই গুপ্ত আমলের স্বর্ণযুগের ভিত্তি। এই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মনন ও কল্পনা, ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্যে ভারতীয় জীবনের যে বিস্তৃতি, বৃহত্তর গভীরতর জীবনের যে আস্বাদন তাহার মূলেও বহুলাংশে এই স্বর্ণ বা সামাজিক ধন।

শুধু এই সামুদ্রিক বাণিজ্যই নয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-পূর্ব চীনের পূর্বতম সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য এশিয়ার মরুভূমি পার হইয়া পামীরের উষ্ট্রপৃষ্ঠ বাহিয়া আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ইরান-দেশ অতিক্রম করিয়া একেবারে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ আন্তর্দেশীয় প্রান্তাতিপ্রান্ত পথ সেই পথ দিয়া একটা বৃহৎ বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রথম-চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পশ্চিমাভিযানের ফলে ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম এই পথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতকে শক-কুষাণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এই পথ বিস্তৃততর এবং বাণিজ্য ব্যাপকতর হয় এবং তাহার ফলে দেশে স্বর্ণপ্রবাহের আর-একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। পঞ্চম শতকে হূণেরা মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের এই সম্বন্ধ বিপর্যস্ত করিয়া দেয়।

এই লাভজনক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেশের শিল্পকে বিশেষ-ভাবে বস্ত্র- ও গন্ধ -শিল্পকে, দন্ত- ও কাষ্ঠ -শিল্পকে অগ্রসর করিয়া দেয়, কোন কোন কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইয়া কৃষিকেও অগ্রসর করে। এইসবের ফলে বাণিজ্যলব্ধ ধন সমাজের নানাস্তরে বণ্টিত হইতে আরম্ভ করে, এবং সাধারণ কৃষক এবং গ্রামবাসী গৃহস্থেরও জীবনের মান অনেকাংশে উন্নত হয়। সাধারণ গৃহস্থের ভাণ্ডারেও স্বর্ণমুদ্রা এই যুগেরই সামাজিক লক্ষণ।

এই সুবিস্তৃত বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, এই কয়েক শতাব্দী জুড়িয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন; বিশেষত তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই এই সুবর্ণমুদ্রা একেবারে নিকষোত্তীর্ণ খাঁটি সুবর্ণমুদ্রা। এই কয়েক শতকের রৌপ্য-মুদ্রা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। দুইই এই যুগের লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতীক। আর, এই যুগে নগরসভ্যতার বিস্তার ও সমৃদ্ধ নাগরিক আদর্শের যে পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে দেখিতেছি তাহা প্রত্যক্ষভাবে এই সামাজিক ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর-ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই সুবৃহৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ অন্যতম অংশীদার হইয়াছিল, এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ সামাজিক ধনের কিছুটা অধিকার লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ গুপ্তাধিকারে আসিবার পর হইতেই বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্রমশ আরও বাড়িয়াই চলে। বস্তুত, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দেখিতেছি উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে গ্রামের সাধারণ গৃহস্থও ভূমি কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমুদ্রায়। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের সর্বত্র এই যুগে দেখিতেছি, শাসনাধিকরণগুলিতে রাজপাদোপজীবী ছাড়া আর যে তিনজন থাকিতেন তাঁহাদের

একজন নগরশ্রেষ্ঠী, একজন প্রথম সার্থবাহ, একজন প্রথম কুলিক, অর্থাৎ প্রত্যেকেই শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি। সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যকে কতখানি মূল্য দিত তাহা এই তথ্যে সুস্পষ্ট।

বস্তুত, কিছুটা পরিমাণে কৃষিনির্ভরতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও বাংলার এই কয়েক শতকের সমাজ প্রধানত ব্যবসাবাণিজ্য- ও শিল্প -নির্ভর। তাহা ছাড়া, যেহেতু বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাই ছিল বেশি সেইহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থ শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহকুল এবং রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকৃত হওয়ার পরও ইহার একটা বৃহৎ অংশ শিল্পীকুলের হাতে গিয়া পৌঁছিত, কৃষকসমাজেও উৎপাদিত ধনের কিছু অংশ আসিয়া পড়িত। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল জীবনধারণের মানের উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি।

কিন্তু ৪৭৫ খ্রীষ্ট শতকে রোম সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল; পূর্ব-পৃথিবীর সঙ্গে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হইয়া গেল। তবু, যতদিন পর্যন্ত মিশর দেশ ও আফ্রিকার পূর্ব কূলে কূলে সাম্রাজ্যের কিছু অবশিষ্ট ছিল ততদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিগত পাঁচ শতাব্দীর সুবিস্তৃত বাণিজ্যের অবশেষ আরও কিছুদিন বাঁচিয়া রহিল। সমস্ত ষষ্ঠ-শতক এবং সপ্তম শতকের অর্ধাংশ প্রায় এইভাবেই চলিল; ৭১০ খ্রীষ্ট শতকে পশ্চিম ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম আশ্রয় সিন্ধুদেশ চলিয়া গেল আরব বণিকের হাতে, এবং সিন্ধু-গুজরাটের স্বর্ণদ্বার প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শিল্প- ও গন্ধ -দ্রব্যাদির চাহিদাও কমিয়া গেল। পূর্ব-ভারতে তাম্রলিপ্তির বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই দুই শত বৎসরের বাণিজ্যিক অবস্থার বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ছাপ পড়িয়াছে সমসাময়িক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার উপর। এই সময়ে মুদ্রার ক্রমাবনতি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। প্রথম দেখা যাইবে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও নিকষমূল্যে ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে; দ্বিতীয় স্তরে স্বর্ণমুদ্রা নকল ও জাল হইতেছে; তৃতীয় স্তরে রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে হটাইয়া দিতেছে; চতুর্থ স্তরে রৌপ্যমুদ্রা অবনত হইতেছে, পঞ্চম স্তরে রৌপ্যমুদ্রাও অন্তর্হিত। মুদ্রার এই ক্রমাবনতির প্রধান ও প্রথম কারণ বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি। সেই অবনতির হেতু একাধিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবনতিতে শিল্পপ্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই, ফলে সমাজে কৃষিনির্ভরতা বাড়িয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে গাঙ্গেয় ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ঐকান্তিক কৃষিনির্ভরতা ক্রমবর্ধমান, এবং আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশ একান্তই কৃষিনির্ভর।

অষ্টম শতকের গোড়া হইতেই পূর্ব ভূমধ্য-সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমগ্র বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারসিক বণিকদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সে প্রভাব ক্রমবর্ধমান। দক্ষিণ-ভারত বহুদিন পর্যন্ত এই আরব বণিকশক্তির সঙ্গে (এবং পূর্ব-সমুদ্রে চীনা বণিকশক্তির সঙ্গেও) কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিজেদের বাণিজ্যলব্ধ ধনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার ফলে বাংলাদেশ

এই বৃহৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু প্রাচ্যদেশের বাংলা-বিহার পালরাজাদের আমলে একটা সজ্ঞান সচেতন চেষ্টা করিয়াছিল স্থলপথে হিমালয়শায়ী কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে একটা বাণিজ্যসম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে, এবং কিছুদিনের জন্য অন্তত সে চেষ্টা সার্থকও হইয়াছিল। এই ধরনের একটা চেষ্টা পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতির সঙ্গেও হইয়াছিল। কিন্তু কোন চেষ্টাই যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়া এই পর্বের বাংলার ঐকান্তিক কৃষি-নির্ভরতা ঘুচাইতে পারে নাই। এই পর্বে যে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, এমন কি কোন প্রকার ধাতব মুদ্রার সাক্ষাৎই পাইতেছি না, ইহার ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়।

এই ঐকান্তিক ভূমি- ও কৃষি -নির্ভরতা প্রাচীন বাংলার সমাজ-জীবনকে একটা স্বনির্ভর স্বসম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহা সমগ্র জীবনকে বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করিতে পারে নাই, বৃহৎ জনসাধারণের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনমানকে উন্নত করিতে পারে নাই। আমাদের কৌম ও আঞ্চলিক চেতনার প্রাচীর যে আজও ভাঙে নাই তাহার অন্যতম কারণ এই একান্ত ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর জীবন। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিচিত্র ও গভীর সংগ্রামময়, বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতাময় এবং বৃহত্তর মানবজীবনের সঙ্গে সংযোগময় জীবনের যে ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, যে উল্লাস ও বিক্ষোভ, বৃহতের যে উদ্দীপনা তাহা স্বল্পপরিসর গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের আদিপর্বের শেষ অধ্যায় এই ভূমি- ও কৃষি -নির্ভর সমাজ-জীবনই মধ্যপর্বের হাতে উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া গেল; আর রাখিয়া গেল তাহার প্রাচীনতর পর্বের সমৃদ্ধ শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের সুউচ্চারিত স্মৃতি। সেই স্মৃতি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বহমান।

পাঁচ

প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত ও রাষ্ট্রজীবনের বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন, পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনই সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা যোগাযোগ সর্বদাই ছিল, এবং সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহার বড় একটা অংশও ছিল। মৌর্য সম্রাটদের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত সে সম্বন্ধ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বস্তুত, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মধ্য-ভারতের বাম বাহু প্রসারণের ইতিহাস, এবং তাহার ফলে বাংলার কৌম রাষ্ট্রীয় জীবনে কী পরিবর্তন-বিবর্তন হইতেছে তাহারই ইতিহাস। ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তম শতকের গোড়া হইতেই বাংলাদেশ দুই বাহু বাড়াইয়া উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্মুখর স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক জীবনে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লয়। অষ্টম ও নবম শতকের বহুলাংশ জুড়িয়া যে তিনটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি সর্ব-ভারতীয় প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের জন্য লড়িয়াছিল তাহার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল বাংলা-দেশে ও আশ্রয় ছিল পাল-রাজবংশ। খুব সম্ভব এই সময় কিংবা ইহার কিছু

আগে, মাৎস্যন্যায়ের কালে বাংলাদেশ নিজের সন্তানদের ক্রোড়বিচ্যুত করিয়া পাঠাইয়াছিল পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে নূতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। দশম শতকে বরেন্দ্রভূমির গদাধর রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়-কৃষ্ণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া দক্ষিণ-ভারতে বেলারি জেলায় একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শতকে প্রথম-মহীপালের রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি উত্তর-ভারতের অন্যতম শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। একাদশ শতক হইতে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্বন্ধ বাড়িয়া যায়, এবং ক্রমশ বাংলাদেশ দাক্ষিণী রাষ্ট্রীয় প্রভাবের কবলে জড়াইয়া পড়ে। তাহারই ফলে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা। যাহাই হউক, একদিকে বাংলার সীমা ডিঙাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করা যেমন বার বার বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জয়পরাজয়ের ভিতর দিয়া ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগরক্ষা করিতেও বাংলাদেশ পশ্চাৎপদ হয় নাই। শুধু রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্ম- ও সংস্কৃতি -গত সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াও বাংলাদেশ নিখিল ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত—কাশ্মীর হইতে সিংহল এবং গুজরাট হইতে কামরূপ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের বাহিরে—তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, সুবর্ণদ্বীপে, পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী অন্যান্য দেশ ও দ্বীপগুলিতেও—তাহার যোগাযোগ নানা-সূত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাজেই, প্রান্তীয় দেশ বলিয়া বাংলাদেশ শুধু আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করিত, এমন মনে করিবারও কারণ নাই।

খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ভাঙাগড়ার শেষ নাই। কিন্তু ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়া বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিল—সে তাহার রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বীকৃতি। গুপ্তপর্বে যখন এই দেশ উত্তর-ভারতীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত তখনও এই আদর্শ একেবারে বিস্মৃত নয়। কিন্তু শশাঙ্কের সময় হইতেই এ সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়িয়া যায়। পরবর্তী কালে তো স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার আদর্শ ক্রমশ আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষত পাল আমলে। এই পর্বেই শুনা যাইতেছে শুধু বাংলার কথা নয়, বৃহদ্বঙ্গের কথা। এই স্বাধীন-স্বতন্ত্র সত্তার চেতনাই বাংলার রাষ্ট্রীয় চেতনা। নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রীয় কলকোলাহল এই চেতনাকে বারবার বিপর্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু বারবারই বাংলাদেশ সেই আদর্শকে ফিরিয়া পাইতে চেষ্টাও করিয়াছে। প্রাচীন বাঙালীর এই আদর্শের, তথা রাষ্ট্রীয় সচেতনতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মাৎস্যন্যায়োৎ-পীড়িত বাঙালীর গোপালদেবকে রাজপদে নির্বাচন। এই ধরনের সচেতনতা এবং রাষ্ট্রীয় শুভবুদ্ধির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল।

অথচ এই আদর্শ খণ্ডিতও হইয়াছে বারবার নানা আঞ্চলিকচেতনাসঞ্জাত অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। এই অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বে মূলে যে শক্তি ছিল সক্রিয় তাহা সামন্ততন্ত্রের। বস্তুত আঞ্চলিক সামন্তরাই বাঙালীর অপরিমেয় রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনাকে বারবার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ড রাষ্ট্র গড়িতে দেয় নাই।

তবে প্রাচীন বাঙালীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তার চেতনা যত প্রবলই হউক না কেন, সে চেতনা তাহার সর্বভারতীয় চেতনাকে নিরস্ত করিয়া রাখে নাই; অন্তত শশাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মপাল-দেবপাল পর্যন্ত ভারতবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ। প্রান্তীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক দৃষ্টিটি ভারতব্যাপী। কিন্তু পালপর্বের দ্বিতীয় পর্যায় হইতেই যেন রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

প্রাক্-আর্য নানা কোম ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা ব্রত ও অনুষ্ঠান, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতির নানা আদর্শ ও আচার উচ্চকোটি ও লোকায়ত স্তরের বাঙালী জীবনে প্রচলিত ছিল। ধর্মমত ও পথ লইয়া বাদ-বিসংবাদ কলহ-কোলাহল ছিল না এমন বলা যায় না; কিন্তু রাজা এবং রাজবংশের লোকেরা, যে যাঁহার ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এক-এক ধর্মের অনুসরণ করিতেন, পোষকতাও করিতেন; হয়তো কখনো কখনো অন্যধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাও করিয়া থাকিবেন। অবশ্য তাহার পশ্চাতে অনুক্ত রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণও সক্রিয় থাকিত, সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে এ কথা বলা চলে যে, রাজা বা রাজবংশের ব্যক্তিগত ধর্ম যাহাই হউক না কেন, তাহাতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ ও সংস্কার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই; জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাও রাজার বা রাজবংশের ধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। অন্তত পালপর্ব পর্যন্ত এই আদর্শ অক্ষুন্ন। সেন-বর্মণপর্বে খুব সম্ভব এই আদর্শের ব্যত্যয় কিছু ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ধর্মগত সংকীর্ণতার কিছুটা স্পর্শ লাগিয়া থাকিবে।

বাংলাদেশে, তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র ও রাজত্বের অবসানের প্রধান কারণ ব্যক্তিগত সাহস বা শৌর্যবীর্যের অভাব নয়; সে কারণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং সংঘশক্তির অভাব, এবং তাহার হেতু একাধিক। কৌমচেতনা, আঞ্চলিক চেতনা, সামন্ততন্ত্র, বর্ণবিন্যাসের অসংখ্য স্তরভেদ, সংকীর্ণ স্থানীয় রাষ্ট্রবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই তাহার মূলে। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষে চিরা-চরিত চতুরঙ্গবল-রণপদ্ধতির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্দারের অভিযান ও রণপদ্ধতি হইতে যে উন্নততর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল, ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। তাহার ফলে দুর্ধর্ষ মুসলিম অভিযাত্রীরা যখন বিদ্যুদ্‌গামী অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া বর্শা ও তরবারি হাতে শ্লথগতি হস্ত্যশ্বরথপদাতিক-বাহিনীর ব্যূহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত তখন ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত শৌর্যবীর্য বিশেষ কোন কাজে লাগিত না, বিপর্যয় ঘটিত অতি সহজেই। তৃতীয়ত, বহুদিন একটি সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, সুবিন্যস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রবিন্যাসের মধ্যে জীবনযাপনের ফলে ভারতবাসীর দেহমনে এক ধরনের সনাতনী নিশ্চিন্ততা ও ভাগ্যনির্ভরতা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অন্যদিকে, যেসব মুসলিম অভিযাত্রীর দল ভারতবর্ষের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল তাহারা বয়সে নবীন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রায় আদিম বর্বর, মরু ও পাহাড়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনে তাহাদের দেহমন দৃঢ় ও কঠোর। পরধর্মের প্রতি তাহাদের অপরিমেয় বিদ্বেষ। দশম হইতে দ্বাদশ শতকে উত্তর-ভারতে যে নিরবসর সংগ্রাম তাহা দুই ভিন্নমুখী বিপরীত চরিত্রের জীবনপ্রবাহের সংগ্রাম। ভারতবর্ষের জীবন-প্রবাহ অন্যতর প্রবাহকে ঠেকাইতে পারিত যদি তাহার নেতৃত্ব থাকিত, সংঘশক্তি থাকিত, রণপদ্ধতি উন্নততর হইত, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি দূরপ্রসারী হইত, জাতীয় চরিত্র আত্মশক্তিনির্ভর হইত, সমাজবিন্যাসে ভেদবুদ্ধি না থাকিত, এবং দেহগত বিলাস-ব্যসনে সমাজ নীরক্ত নির্বীর্য না হইত। দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশে অন্তত কোন-প্রকার প্রতিরোধের মনোবৃত্তি যে ছিল না তাহা সুস্পষ্ট। জাতির মানসক্ষেত্র নানা-ভাবে আগে হইতেই এই বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। দূরদৃষ্টিহীন সংকীর্ণ-

বুদ্ধি ভাগ্যনির্ভর ধর্মোপদেষ্টারা আগে হইতেই দেশের লোকের চিত্তভূমি তৈরী করিয়াছিলেন। মুসলিম অভিযাত্রীদের কাছেও যে এই অবস্থা একেবারে অজ্ঞাত ছিল, এমন মনে হয় না। সোমনাথ-মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচ্য-ভারতের বিহার ধ্বংস ও লুণ্ঠন যে শুধু রক্তের নেশায় এবং ধনরত্নের লোভেই, হয়তো তাহা নয়, অন্য উদ্দেশ্যও হয়তো ছিল, এবং সে উদ্দেশ্য জাতির নিগূঢ় চেতনার গভীর স্থানটিতে আঘাত হানিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া।

শেষ পর্যায়ে সামাজিক দৃষ্টি যে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল তাহার প্রমাণ তো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পালপর্বের মাঝামাঝি পর্যন্তও দেখিতেছি বাংলাদেশ আন্ত-দেশিক বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া এবং কিছুটা ব্যবসা-বাণিজ্যকে আশ্রয় করিয়া দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল। তাহার ফলে রাষ্ট্রের দৃষ্টি কখনো একান্তভাবে স্থানীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে নাই, গ্রামের ও নগরের সমাজও একান্তভাবে কূপমণ্ডুকতাকে এবং ভাগ্যনির্ভরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া, পালপর্বের শেষ পর্যায়ে, বিশেষভাবে সেন-বর্মণ পর্যায়ে মধ্য-ভারতীয় স্মৃতিশাসন এবং দক্ষিণী রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ক্রমশ সমাজের ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। নানাদিক হইতে ব্যাহত এবং জীবন-যুদ্ধে পর্যুদস্ত হইয়া ভাগ্যনির্ভরতা তাহার প্রধান আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল। এই ভাগ্যনির্ভরতা এবং জীবনের স্তিমিত গতি প্রধানতম সমর্থন পাইয়াছিল সমসাময়িক সমাজের ঐকান্তিক ভূমি- ও কৃষি -নির্ভরতা হইতে। তাহা ছাড়া, কৃষিনির্ভর জীবন তো স্বাভাবিক কারণেই আঞ্চলিক ও রক্ষণশীল, এবং পরিবার-গোষ্ঠী-গ্রাম-প্রান্ত লইয়াই সে জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ: বৃহত্তর, পরিব্যাপ্ত এবং বৈচিত্র্যময় উন্মুখর জীবনের প্রয়োজনও তাহার কাছে স্বল্প। বাহির হইতে শক্তিমান ও প্রবল জীবনস্রোতের আঘাত না লাগিলে এই জীবনের স্থায়িত্ব এবং শক্তি কিছু কম নয়, কিন্তু তেমন আঘাত যখন লাগে তখন বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী; এবং বিপর্যয়ের ফলে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি দুয়েরই ভিতর ফাটলও অনিবার্য। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাঙালী-জীবনের বিপর্যয় এই কারণেই। কিন্তু বিপর্যয় যাহারা ঘটাইলেন সেই মুসলিম অভিযাত্রীরা সামরিক শক্তিতেই শুধু দুর্ধর্ষ ছিলেন; তাঁহারা যখন রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া বসিলেন তখন কিন্তু গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। কাজেই মধ্য-পর্বের শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালীর ভাগ্য- বা দৈব -নির্ভরতাও ঘুচিল না, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও ফিরিয়া আসিল না।

ছয়

নানা সূত্রে বলিয়াছি, আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের প্রবাহ বাংলাদেশে আসিয়া লাগিয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে, এবং প্রবাহটি কখনো খুব গভীরতা বা প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই; সাধারণত বর্ণসমাজের উচ্চতর স্তরে এবং অপেক্ষা-কৃত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহা আবদ্ধ ছিল, বিশেষত আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি। একমাত্র আর্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিই সদ্যোক্ত সীমার বাহিরে কিছুটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সপ্তম-অষ্টম শতকের পর হইতে। তাহা ছাড়া, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ পশ্চিমবঙ্গে যদি বা কিছুটা বেগবান

ছিল, গঙ্গার পূর্ব- ও উত্তর -তীরে সে প্রবাহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, বিস্তৃতি এবং গভীরতা উভয়ত।

ইহার কারণ একাধিক। প্রথমত, বাংলাদেশ প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ এত দূরে আসিয়া পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বহুদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি আর্যমানসের একটা উন্নাসিকতা ও অবজ্ঞার ভাব সক্রিয় ছিল। তৃতীয়ত, বাংলার স্থানীয় আদিম, কৌমবদ্ধ মানবসমাজও বহুদিন পর্যন্ত আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না, বরং যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে সে স্রোত ঠেকাইয়া রাখিতে। তাহার পর পরাভব যখন অনিবার্য হইয়াছে তখনও একেবারে স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই, বরং বুঝাপড়া করিয়া একটা সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মধ্য-গাঙ্গেয় ভারত যেভাবে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে বাংলাদেশ সেভাবে তাহা করে নাই। ভারতবর্ষের বুকে যে কয়টি অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই আর্যাবর্তের সীমার বাহিরে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রভৃতি যে বর্তমান বিহারের সীমার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে তন্ত্রধর্ম, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতির উদ্ভবও যে আর্যাবর্তের সীমার বাহিরে, ইতিহাসের এই ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়। চতুর্থত, বাংলাদেশে নানা নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে, প্রচুর রক্তমিশ্রণের ফলে এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে জাতভেদ-বর্ণভেদের বৈষম্য আর্যাবর্ত বা দক্ষিণ-ভারতের মতো এত কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই।

এইসব কারণে বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা আর্য-ভারত হইতে পৃথক। আর্য ভারতবর্ষ সনাতনত্বের আদর্শে স্থির ও অবিচল, সমস্ত আচারানুষ্ঠান, অধ্যাত্মসাধনা, সমাজ- ও পরিবার -বন্ধন প্রভৃতি সমস্তই সেখানে শাস্ত্রদ্বারা শাসিত; মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের মন তাই বহুলাংশে পরিবর্তনবিমুখ। বাংলাদেশে হইয়াছে তাহার বিপরীত। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-কালচক্রযানী ও সহজযানী রূপান্তর; সহজযানে সহজ মানবতার এবং প্রাণধর্মের আবেদন; ব্রাহ্মণ্য শক্তিধর্মের তান্ত্রিক রূপান্তর; বৈষ্ণবধর্মে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের সঞ্চার; শিব ও উমার ভাবকল্পনায় পারিবারিক জামাতা-কন্যার রূপ ও আবেগ সঞ্চার; দুর্গা, তারা, ষষ্ঠী, মারীচী, পর্ণশবরী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, আবেগ ও অনুরাগ; শিব ও বিষ্ণুর মতন দেবতাকেও ঘনিষ্ঠ মানবসম্বন্ধে বাঁধিয়া তাঁহাদের প্রতি পারিবারিক আত্মীয়তার এবং মানবী লীলার আবেগ সঞ্চার; তান্ত্রিক কায়াসাধনের প্রতি অনুরাগ এবং সেই সাধনের রীতিপদ্ধতি: শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য; বাংলার ব্যবহারশাস্ত্রে দায়াধিকারের আদর্শ ও ব্যবস্থা; বাংলার পরিবার ও সমাজবন্ধন প্রভৃতি সমস্তই আর্যমানসের দিক হইতে বৈপ্লবিক। সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাংলার ঐতিহ্যধারায়। ইহার মূল প্রধানত বাঙালীর জনগত ইতিহাসে, কিছুটা তাহার ভৌগোলিক পরিবেশে, তাহার নদনদীর ভাঙাগড়ায়, কিছুটা ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে।

বাংলার বিচিত্র ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গভীরে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এদেশে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা বেশি; আদিম-কৌমসমাজের মাতৃকাতন্ত্রের

দেবীদের প্রাধান্য কৌমসমাজে তো ছিলই; পরে যখন আর্যব্রাহ্মণ্য পুরুষ-প্রকৃতি ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি বা শক্তিরূপিণী বিভিন্ন দেবীর সংগে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন। এই ক্রমবর্ধমান মাতৃকা-তন্ত্রের প্রাধান্য, আদিম মাতৃতান্ত্রিক কৌমসমাজাদর্শের এবং কৌমমানসের পুনর্ঘোষণা, সন্দেহ কি ?

প্রাচীন বাংলার প্রতিমা-সাক্ষ্যে দেখা যায়, উমা-মহেশ্বরের যুগল মূর্তিরূপ এবং শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণসুন্দর রূপ সমসাময়িক বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে একদিকে যেমন সমসাময়িক বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও চিত্তের স্পর্শালুতা প্রত্যক্ষগোচর তেমনই অন্যদিকে বাঙালী চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারীভাবনার প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ। আর, বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতি ধর্মের কায়াসাধন তো নারী বা শক্তি ছাড়া সম্ভবই নয়। রাধাকৃষ্ণের রূপ ও ধ্যানকল্পনার মধ্যেও এই নারীভাবনা অনিবার্যভাবে সক্রিয়। নারীকে শক্তিস্বরূপিণী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টিরহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা এই ইংগিত বিশেষভাবে বাংলার সৃষ্টি এবং আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান। সাংখ্যধ্যান-কথিত পুরুষ-প্রকৃতিকল্পনার এই যে তান্ত্রিক রূপান্তর, সনাতন আর্য মানসে ইহার আবেদন স্বল্প, অথচ বাংলাদেশে এই ভাবনা অত্যন্ত সত্য ও ব্যাপক।

প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইংগিত তাহার প্রতিমাশিল্পে এবং দেবদেবীর রূপকল্পনায়ও ধরা পড়িয়াছে। মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে, সহজিয়া সাধনায়, বাউলদের সাধনায় যে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের প্রসার, তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল আদিপর্বেই, এবং তাহা শুধু বৌদ্ধ বজ্রযানী-সহজযানীদের মধ্যেই নয়, তান্ত্রিক শক্তিসাধনার মধ্যেই নয়, বৈষ্ণব সাধনায়ও বটে। এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা বহুলাংশে আদিম নরগোষ্ঠীর দান। আর্য-ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনাদর্শে কিন্তু এই ঐকান্তিক হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার এতটা স্থান নাই। সেখানে ইন্দ্রিয়ভাবনা বস্তুসম্পর্কবিচ্যুত, ভক্তি জ্ঞানানুগ, হৃদয়াবেগ বুদ্ধির অধীন। বস্তুত, বাংলার অধ্যাত্মসাধনার তীব্র আবেগ ও প্রাণবন্ত গতি সনাতন আর্যধর্মে অনুপস্থিত।

এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা প্রাচীন বাঙালী জীবনের অন্য দিকেও ধরা পড়িয়াছে। দেবই হউন আর দেবীই হউন, বাঙালী যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে তাঁহাদের মর্ত্যের ধূলায় নামাইয়া পরিবারবন্ধনের মধ্যে বাঁধিতে, হৃদয়াবেগের মধ্যে তাঁহাদের পাইতে ও ভোগ করিতে, দূরে রাখিয়া শুধু পূজা নিবেদন করিতে নয়।

বাংলার ব্যবহারশাস্ত্রে দায়াধিকারের যে আদর্শ ও ব্যবস্থা, বিশেষভাবে স্ত্রী-ধনের যে স্বীকৃতি ও বিধিব্যবস্থা জীমূতবাহনের দায়ভাগগ্রন্থে বর্ণিত এবং পরে রঘুনন্দন কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত, তাহার পশ্চাতেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের এবং সেই পরিবার-বন্ধনের স্মৃতি বহমান; আর্য সমাজ- ও পরিবার -ব্যবস্থায় দায়ভাগ ব্যবস্থার প্রচলন নাই, সেখানে মিতাক্ষরার রাজত্ব।

সাত

যে হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার কথা এইমাত্র বলিলাম তাহারই রূপান্তরে পাইতেছি মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। এই যে দেবদেবীদেরও মাটির

ধূলায় নামাইয়া পরিবারবন্ধনের মধ্যে বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে ইহগত মানবিক আবেগে দেখা ও পাওয়া, ইহার মধ্যে উক্ত মানবপ্রীতির আভাসই সুস্পষ্ট। সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালী কবিকুল রচিত হরিভক্তি, গঙ্গাস্তব ও শিবস্তোত্রে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগ একান্তই মানবিক রসে অভিসিঞ্চিত। এইসব গ্রন্থের বাঙালী কবি রচিত অসংখ্য প্রকীর্ণ শ্লোকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ও আনন্দবেদনার যে সূক্ষ্ম স্পর্শালু বোধ দৃষ্টিগোচর, চর্যা-গীতির পদগুলিতেও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের নানা মানবীলীলার যে পরিচয় তাহার মধ্যেও একই মানবিক আবেদন প্রত্যক্ষ। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলক-গুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বাংলার শাস্ত্রশাসিত প্রতিমাশিল্পেও মানবিক ইন্দ্রিয়ালুতা এবং হৃদয়াবেগ যতটা ধরা পড়িয়াছে এমন আর কোথাও নয়। ধর্মগত এবং শাস্ত্রশাসিত ব্যাপারেও একান্ত মানবিক রসের সঞ্চার, মানবিক আবেগ ও আবেদনের অভিসিঞ্চন প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মানবতার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উপনিষদ্ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব ভাগবদ্ধর্মেও এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ধারা বহমান। মহাভারতেও তাহাই; কিন্তু সাধারণভাবে আর্য ভারতের ধর্ম- ও সংস্কৃতি -সাধনায় মানুষের স্থান প্রধানত গৌণ। দেবতা ও শাস্ত্র সেখানে মানুষের প্রায় সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বিস্তৃত। কিন্তু বাঙালীই নূতন করিয়া ঘোষণা করিল : 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এই মানবতা ছিল প্রাচীন বাঙালীর চিত্তের গভীরে, তাহার সাধনায়, বিশেষভাবে সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের আদর্শ ও ভাবকল্পনায়। এই সিদ্ধাচার্যরা বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম ও আচারানুষ্ঠানের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে মানুষের যে মানবমহিমা তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণা জানাইয়াছেন। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, আগম কোন কিছুরই অভ্রান্ততায় ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন না; বলিতেন, মানবদেহেই মোক্ষের বাস, মানুষই সকল সাধনার পরমাদর্শ, পরমাশ্রয়।

আট

এই উদার মানবতারই অন্যতম দিক হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা, মানবদেহের প্রতি এবং দেহাশ্রয়ী কায়াসাধনার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ, সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের ও পরিবারবন্ধনের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ, রূপ ও রসের প্রতি তাহার গভীর আসক্তি। এই আসক্তি ও আবেগ হইতেই আসিয়াছে ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা এবং নীরস বৈরাগ্যের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা। নীরস বৈরাগ্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ বাঙালীর নাই, প্রাচীনকালেও ছিল না। বিশুদ্ধ স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। দিগম্বর জৈন-ধর্মও বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মণ্যধর্মী একদণ্ডী সন্ন্যাসীরাও যে খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। মহাযানী শ্রমণ ও আচার্যদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা তো নীরস বৈরাগী ছিলেন না, মানবজীবন ও মানবসংসারকে অস্বীকারও করিতেন না। সমস্ত প্রাণিজগতের প্রতি তাঁহাদের করুণা এবং মৈত্রীভাবনা তাঁহাদের জীবন ও ধর্মসাধনাকে একটি অপূর্ব স্নিগ্ধ রসে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আর বজ্রযানী, মন্ত্রযানী, কালচক্র-যানী এবং সহজযানীদের ধর্মসাধনার ভিত্তিই তো ছিল দেহযোগ বা কায়াসাধনা,

দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয়কুলকে আশ্রয় করিয়া দেহভাবনার ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়া। নাথধর্ম, কাপালিকধর্ম, অবধূতমার্গ, বাউলমার্গ প্রভৃতি সমস্তই মোটামুটি একই ভাব-কল্পনা ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহবন্ধনের মধ্যেই ইহাদের মোক্ষ বা বৈরাগ্যসাধনা, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি। সেইহেতু বাংলাদেশে বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান-নাথধর্ম প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং সেই জন্যই বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক কবিদের ধর্ম, আউল-বাউলদের ধর্ম এবং দেহাশ্রিত তন্ত্রধর্মের প্রতি বাঙালীর এত অনুরাগ।

বস্তুত, অপরূপের ধ্যান এবং বিশুষ্ক জ্ঞানময় অধ্যাত্মসাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্বল্প। বাঙালী তাঁহার ধ্যানের দেবতাকে পাইতে চাহিয়াছে রূপে ও রসে মণ্ডিত করিয়া; তাঁহার সন্ধান বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে ততটা নয়, যতটা রূপের ও রসের পথে অর্থাৎ বোধ ও অনুভবের পথে। বাঙালীর ভক্তি যে জ্ঞানানুগ নয়, হৃদয়ানুগ, আবেগপ্রধান তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে বাঙালী কবির দেবস্তুতিরচনায়। প্রাচীন বাংলার প্রতিমাশিল্পের ইন্দ্রিয়ালুতা এবং আবেগবাহুল্যেও তাহা একান্ত সুস্পষ্ট। লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে; সে ক্ষেত্রে তো অরূপ ও বিশুষ্ক জ্ঞানসাধনার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর মহাযান হইতে বিবর্তিত যত ধর্ম- মত ও -পথ তাহাদের সব কয়টির সাধনা তো একান্তই রূপ- ও -রসাশ্রয়ী। এ তথ্য লক্ষণীয় যে, বিশুদ্ধ মাহাযানী বিজ্ঞানবাদ বা মধ্যমক দর্শন বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ্য সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সেইসব মত ও পথই গ্রহণ করিয়াছে যাহার প্রধান আশ্রয় রূপ ও রস, অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ভাবকল্পনার ধারা। ঠিক এই কারণেই বেদান্তচর্চায় এবং বৈদান্তিক সাধনায় প্রাচীন বাঙালীর যেন অরুচি। গৌড়পাদকারিকা, সাংখ্যকারিকা, বা ন্যায়কন্দলী বাংলাদেশে সমাদর লাভ করে নাই। বস্তুত, শুধু ধর্মসাধনায় নয়, ব্যাপকভাবে অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে বিশুষ্ক, যুক্তিধর্মী বন্ধ্যা জ্ঞানচর্চা বাঙালীর চিত্তকে সমগ্রভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

অথচ, প্রাচীন বাঙালী নিছক জ্ঞানের চর্চা করে নাই, বুদ্ধির অস্ত্রে শাণ দেয় নাই, এ কথাও সত্য নয়। মহাযান বৌদ্ধন্যায়ের চর্চায় বাংলাদেশ সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; ব্যাকরণচর্চা, অভিধানচর্চা, চিকিৎসাবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রচর্চা ও রচনায় সর্বভারতীয় বিদ্যার ভাণ্ডারে প্রাচীন বাংলাদেশের দান তুচ্ছ করিবার মতো নয়। ন্যায়, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধানচর্চা তো একান্তই নিছক জ্ঞান ও যুক্তি ক্ষমতার চর্চা, এবং সেই ক্ষমতার বলে বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তিও লাভ করিয়াছিল—যে দীপ্তি ধরা পড়িয়াছে ন্যায়ের তর্কে, ধর্ম ও ব্যবহার-শাস্ত্রের যুক্তিতে, ব্যাকরণের ও অভিধানের নূতন ও মৌলিক সূত্র রচনায়। কিন্তু, আসল কথা হইতেছে, বাঙালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত করে নাই। যেখানে জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়া নবতর গভীরতর জীবন-সৃষ্টির আহ্বান সেখানে, অর্থাৎ শিল্প- ও সাহিত্য -সাধনায়, ধর্ম- ও অধ্যাত্ম -সাধনায় সে মননের উপর নির্ভর করে নাই। বরং আশ্রয় করিয়াছে তাহার সহজ প্রাণশক্তি, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাকে। এই প্রাণধর্ম, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাই বাঙালীর সৃষ্টিপ্রতিভার মূল; ইহারাই তাহার শক্তি, ইহারাই আবার তাহার দুর্বলতাও।

নয়

ভাবকল্পনা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগ জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার দিকে, দৈনন্দিন সংসারের বিচিত্র লীলার দিকে। এই অভিব্যক্তির রূপক্ষেত্র স্বল্পায়তন। ভারতবর্ষের অন্যত্র—বাঘ, অজন্তা, এলোরায়—বিস্তৃত গুহা-প্রাচীরগাত্রে দীর্ঘায়ত মণ্ডিত রেখায় ও গভীর রঙের মণ্ডিত প্রলেপে শিল্পীর গভীর ও প্রসারিত ভাবকল্পনা ও বুদ্ধি রূপায়িত; বাঙালী শিল্পী ছবি আঁকিয়াছেন স্বল্পায়তন পুঁথিপত্রের সীমার মধ্যে; সেই ছবিতে কলাকৌশলের কোন শৈথিল্য বা দুর্বলতা নাই, কিন্তু ভাবকল্পনার কোন সমৃদ্ধিও নাই, না মননের গভীরতায়, না বিস্তৃতিতে। প্রাচীন বাঙালী মন্দির-বিহার প্রভৃতি গড়িয়াছে, কিন্তু ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো বা দক্ষিণ-ভারতের মতো প্রসারিত, বিস্তৃতায়তন মন্দিরনগরী গড়ে নাই; স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙালী দুঃসাহসী মনন ও কল্পনাভাবনার দিকে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম কমনীয়তা, হৃদয়ের আবেগ এবং ইন্দ্রিয়ালুতার গভীরতায় তাহার তুলনা বিরল। বাংলার মৃৎফলকশিল্পও পরম্পরাবিচ্ছিন্ন; বিস্তৃতায়ত গভীর জীবনের পরিচয় সেখানে নাই। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাচীন বাঙালীর কৃষিনির্ভর জীবনের সমৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, এবং বৃহৎ, গভীর, মননসমৃদ্ধ দুঃসাহসী জীবনের প্রশস্ত কোন স্পর্শ সে জীবনে লাগে নাই। কাজেই বাংলার শিল্পেও সে পরিচয় নাই।

সৃষ্টিভাবনার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে ছোট ছোট গীতিকবিতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগের মধ্যেও। প্রাচীন বাঙালী কোন মহাকাব্য রচনা করে নাই, সার্থক, বৃহৎ ও গভীর ভাবকল্পনার কোন নাটকও নয়। বস্তুত, বৃহৎপরিসরের কাব্য বোধ হয় প্রাচীন বাঙালীর খুব রুচিকর ছিল না; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত গীতির পদ ও ছড়া, ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক,—গীতিকবিতার মূল রূপটি অর্থাৎ সংকীর্ণ পরিসরে হৃদয়ের গভীর আবেগ ও প্রাণস্পর্শটি যাহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এমন শ্লোক ও খণ্ডকবিতা। বস্তুত, এই ধরনের গীতিকবিতাসংগ্রহ বা চয়নিকার ধারার উদ্ভব এই বাংলাদেশেই। মহা-কাব্যের বিরাট প্রসার ও গভীর আবর্ত যেন তাহার তত রুচিকর নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর সাহিত্যে কোথাও মননের গভীর গাম্ভীর্য ও ভাবকল্পনার বিরাট প্রসার নাই; তাহার পরিবর্তে আছে প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ালু গভীরতা এই সীমিত ব্যাপ্তির মধ্যে ভাবানুভূতির তীব্রতা। ইহাই বাঙালীর সৃজনপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

দশ

বাঙালীর এই চরিত্র ও জীবনদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে বাঙালী জনের গঠন, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের সম্মিলিত ফলে। এই চরিত্র ও জীবনদর্শন একাধারে প্রাচীন বাঙালীর শক্তি ও দুর্বলতা। তাহার সমাজ- ও রাষ্ট্র -বিন্যাসে, জীবন ও সংস্কৃতিতে এই শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ই প্রতিফলিত।

আদিপর্বের বাঙালী যে উত্তরাধিকার তাহার মধ্যপর্বের বংশধরদের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল তাহার মধ্যে প্রধান ও প্রথম উত্তরাধিকার এই চরিত্র ও জীবনদর্শন, এই উত্তরাধিকার লইয়াই মধ্যপর্বের যাত্রারম্ভ। এই চরিত্র ও জীবনদর্শন ছাড়া আর যাহা

উত্তরাধিকার তাহা এক এক করিয়া তালিকাগত করা যাইতে পারে। ক্ষতির ও ক্ষয়ের অঙ্কের দিকটাই আগে বলি।

মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের সফল নবদ্বীপাভিযানের ফলে গৌড়ে ও রাঢ়ে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সন্দেহ নাই। তবে পূর্ববঙ্গে স্বাধীন সেনবংশ আরও প্রায় সার্ধ-শতাব্দী কালেরও বেশি রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন, এবং গৌড়ে-রাঢ়ে ও দেশের অন্যত্র প্রায়-স্বাধীন সামন্ত হিন্দু রাজবংশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আধিপত্য বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কেশবসেন বোধ হয় একাধিকবার যবন-রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বাঙালী ও বাংলাদেশ যে সর্বব্যাপী মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হইয়াছিল সেই পরাধীনতার ও বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচিতে হইলে যে চরিত্রবল, যে সমাজশক্তি এবং যে সুদৃঢ় প্রতিরোধকামনা থাকা প্রয়োজন, সমসাময়িক বাঙালীর তাহা ছিল না। কারণ, দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশ পরবর্তী দুই শতকের হাতে যে সমাজবিন্যাস উত্তরাধিকারস্বরূপ রাখিয়া গেল সেই সমাজ জাত্‌-বর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী উভয় দিক হইতেই স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত; এক স্তর অন্য স্তরের প্রতি অবিশ্বাসপরায়ণ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, সে সমাজের চরিত্র শিথিল। ব্যাপক সামাজিক দুর্নীতির কীট ভিতর হইতে সামাজিক জীবনের সমস্ত শাঁস ও রস শুষিয়া লইয়া তাহাকে ফাঁপা করিয়া দিয়াছিল। তখন রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌন অনাচার, নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলংকারবাহুল্যের বিস্তার।

তৃতীয়ত, সে সমাজ একান্তভাবে ভূমি- ও কৃষি -নির্ভর, এবং সেইহেতু উচ্চস্তরে ছাড়া বৃহত্তর বাঙালী সমাজ সাধারণভাবে দরিদ্র এবং সমাজের উদ্ভাবনীশক্তি দুর্বল, জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা শিথিল।

চতুর্থত, সে সমাজ, বিশেষত তাহার উচ্চতর স্তরগুলি, একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন। এই আচ্ছন্নতায় দোষ ছিল না যদি সেই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি প্রাগ্রসর সৃষ্টিপ্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইত। কিন্তু সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি ধর্মশাস্ত্রের সুদৃঢ় বিধিবিধানে অন্ধ করিয়া বাঁধা, সে দৃষ্টি রক্ষণশীল এবং চলচ্ছক্তিহীন, অর্থহীন আচারবিচারের মরুবালিরাশির মধ্যে তাহা পথ হারাইয়াছে।

পঞ্চমত, সে সমাজ একান্তই ভাগ্য- অর্থাৎ জ্যোতিষ নির্ভর; এবং সেইহেতু সেই সমাজে প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি অত্যন্ত শিথিল। রাজা ও রাজসভার, উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর ভাগ্যনির্ভর মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজদেহেও বিস্তারিত হইয়া দেশের সমস্ত সংগ্রাম ও প্রতিরোধকামনার মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিল। মুসলমানাধিপত্যের সূচনা ও বিস্তারকে দেশ ভাগ্যের অমোঘ লিখন বলিয়াই গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিল।

ষষ্ঠত, সে সমাজে অসংখ্য নরনারী ছিলেন যাঁহাদের ধর্ম- মত ও -পথ এবং ধর্মের আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সমাজদর্শের পরিপন্থী। এইসব নরনারী এমন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন যাহা হইয়াই যাঁহাদের জীবনযাত্রা ছিল গোপন। এই ধরনের গুহ্য গোপন গোষ্ঠী সকল দেশে সকল কালেই সমাজশক্তির

অন্যতম প্রধান দুর্বলতা। তাহা ছাড়া, গুহ্য রহস্যময় গোপনতার আড়ালে এইসব সম্প্রদায়ের ভিতরে ও বাহিরে নানাপ্রকারের অসামাজিক যৌন আচারানুষ্ঠান এবং ধর্মের নামে নানা ব্যভিচার বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তাহাও ভিতর হইতে সমাজকে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

সপ্তমত, সে সমাজের নিম্নতর কৃষিজীবী স্তরগুলি ছিল একান্ত অবজ্ঞাত। স্বভাবতই রাষ্ট্র- ও সমাজ -নায়কদের প্রতি তাহাদের কোন বিশ্বাস বা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না, সচেতন দায়িত্ববোধও ছিল না। গুহ্য রহস্যময় গোপন ধর্মসম্প্রদায়-গুলি সম্বন্ধেও এ কথা সমান প্রযোজ্য। কাজেই ইহাদের মধ্যে বিপ্লব-বিদ্রোহের একটা বীজ সুপ্ত থাকিবে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত, শ্রেণী হিসাবে শ্রেণীচেতনা ছিল না বলিয়া নেতৃত্ব দিবার শ্রেণীও গড়িয়া উঠে নাই। একটা বৃহৎ গভীর ও ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের ভূমি অনাবাদী পড়িয়া ছিল; কেহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। অনুকূল অবস্থায় যাহা একটা সামাজিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতে পারিত তাহাই মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার ফলে অন্যতর খাতে বহিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু ক্ষয় ও ক্ষতির কথা যদি বলিলাম, লাভের দিকটার কথাও বলি।

যে গুহ্য রহস্যময় গোপন ধর্মসম্প্রদায়গুলির কথা বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে সমাজের একটা শক্তিও প্রচ্ছন্ন ছিল। সে শক্তি মানবতার এবং সাম্যভাবনার শক্তি। সহজযানী প্রভৃতি বৌদ্ধ ও নাথ সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে মানুষে মানুষে বর্ণ- ও শ্রেণী -গত বিভেদভাবনা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া, মানবতার একটা উদার আদর্শও ছিল ইহাদের মধ্যে সক্রিয়। এই উদার সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শের স্থান সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ ও সংস্থার মধ্যে কোথাও ছিল না। অথচ এই সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শের উপরই মধ্যযুগীয় বাংলার বৃহত্তম ও গভীরতম ধর্ম- ও সমাজ -বিপ্লবের অর্থাৎ চৈতন্যদেবপ্রবর্তিত সমাজ ও ধর্মান্দোলনের প্রতিষ্ঠা। এই আদর্শই মধ্যপর্বের হাতে আদিপর্বের মহত্তম উত্তরাধিকার।

দ্বিতীয় উত্তরাধিকার, ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর সমাজ। ঐকান্তিক ভূমি- ও কৃষি -নির্ভরতার দুর্বলতা যেমন আছে, তেমনি তাহার একটা গভীর শক্তিও আছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজ প্রায় অনড়, অচল; তাহার জীবনের মূল মাটির গভীরে। এই শক্তির বলেই ভারতীয়, তথা বাংলার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ণ, এবং এই শক্তিই জনসাধারণকে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, রাজবংশের সৃষ্টি ও বিলয়, যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মের ও সমাজের সংঘাত প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া নিজের দৈনন্দিন জীবনযাপন করিবার ক্ষমতা ও বিশ্বাস যোগাইয়াছে।

তৃতীয় উত্তরাধিকার, শক্তিধর্মের দিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। এ তথ্য লক্ষণীয় যে, আদিপর্বের শেষের দিক হইতেই বাংলার ব্রাহ্মণ্য- ও বৌদ্ধ -সাধনায় তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার মতো যে, মুসলমানাধিকারের কিছুকাল পরই শক্তিসাধক বাঙালীর অন্যতম বেদ কালিকা-পুরাণ রচিত হয় এবং শক্তিময়ী কালী বাঙালীর অন্যতম প্রধান উপাস্যা দেবীবৃন্দে প্রতিষ্ঠিত হন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাংলার শ্মশানে কালীর উপাসনা করিয়াই বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠিতে চিত্তে একটু সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

চতুর্থ উত্তরাধিকার, সুজ্যমান বাংলাভাষা। ক্রমবর্ধমান এই ভাষাই একদিক

দিয়া ধীরে ধীরে জনসাধারণের মনকে মুক্তি দিতে আরম্ভ করিল। সংস্কৃতের সুদৃঢ় প্রাচীর যখন শিথিল হইল তখন জনসাধারণ আপন ভাষার মাধ্যমেই তাহাদের চিন্তা-ভাবনা স্বপ্নকল্পনাকে রূপদান করিবার একটা সুযোগ পাইল। বস্তুত, বাংলার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দেশের লোক দেশী ভাষায় আপন প্রকাশ খুঁজিয়া পাইল, ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মন ও হৃদয়ের কথা শোনা গেল।

মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের হিন্দুস্থানের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রসিদ্ধ উর্দুভাবী কবি হালি বলিয়াছিলেন, 'ইধর হিন্দুমে হরতরফ আন্ধেরা'—এদিকে হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার। এ কথার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলাদেশের পক্ষেও এ কথা সমান প্রযোজ্য। বস্তুত, এদেশে বৈদেশিক মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়; দৈবের অভিশাপও নয়; তাহা কার্যকারণসম্বন্ধের অনিবার্য শৃঙ্খলায় বাঁধা। তখন দেশের সমসাময়িক সমাজের যে অবস্থা তাহার মধ্যে একটা বিরাট ও গভীর বিপ্লবা-বর্তের নানা ইঙ্গিত নিহিতই ছিল। কিন্তু সজ্ঞান সচেতনতায় সেই ইঙ্গিতকে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহাকে সংহত করিয়া, বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিবার নেতৃত্ব সমাজের ভিতর হইতে উদ্ভূত হয় নাই।

সমাজদেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন ভিতর-বাহির হইতে যত আঘাতই লাগুক সমাজ আপন শক্তিতেই তাহাকে প্রতিরোধ করে। সমাজেতিহাসের এই যুক্তি প্রায় জৈব জীবনেরই বিবর্তনের যুক্তি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এই বিবর্তন যুক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, মানুষের ব্যক্তি, বর্ণ ও শ্রেণী স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় সমাজদেহ যখন ভিতর হইতে ক্রমশ পঙ্গু ও দুর্বল হইয়া পড়ে তখন ভিতরে ভিতরে জড়ের জঞ্জাল এবং মৃতের আবর্জনা ধীরে ধীরে জমিতে জমিতে পুঞ্জ পুঞ্জ স্তূপে পরিণত হয়। সমাজদেহে তখন আর ভিতর-বাহিরের কোন আঘাতই সহ্য করিবার মতন শক্তি বা বীর্য থাকে না। বিবর্তনের যুক্তিও তখন আর সক্রিয় থাকে না; বস্তুত, দান ও গ্রহণের সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের যে যুক্তি বিবর্তনের গোড়ায়, অর্থাৎ বিবর্তনের যাহা স্বাভাবিক জৈব নিয়ম তাহা পালন করিবার মতো শক্তিই তখন আর সমাজদেহে থাকে না।

সমাজের এই অবস্থাই বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে; কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই বিপ্লব ঘটে না; সেই ইঙ্গিত দেখিবার ও বুঝিবার মতো বুদ্ধি ও বোধ থাকা প্রয়োজন, ক্ষেত্রে ফসল ফলাইবার মতো প্রতিভা ও কর্মশক্তি, সংহতি ও সংঘশক্তি থাকা প্রয়োজন। নহিলে বাহির হইতে ঝড় আসিয়া যখন বুকের উপর ভাঙিয়া পড়ে তখন আর তাহাকে ঠেকানো যায় না, এক মুহূর্তে সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়া পড়ে; বিপ্লবের ইঙ্গিত অন্যতর, নূতনতর ইঙ্গিতে বিবর্তিত হইয়া যায়। আর, বাহির হইতে ঝড় না লাগিলে, যথাসময়ে বিপ্লব না ঘটিলে, ক্ষীয়মাণ সমাজদেহ আপনা হইতেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং একদিন জৈব নিয়মেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। তখন আবার ভ্রূণাবস্থা হইতে নূতন সমাজদেহের উদ্ভব ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই যুগের পর যুগ ধরিয়া পরবর্তী কালকে তাহার মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের গভীরে নানা দিক হইতে দেখিলে মনে হয়, বোধ হয় সেই মূল্যই আজও আমরা দিতেছি, এবং পূর্ণ মূল্য না দিয়া অগ্রসর হইবার উপায়ও বোধ হয় নাই।

লিপি-পঞ্জী

প্রাচীন বাংলার যে সব লিপি এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, তালিকাটি অসম্পূর্ণ। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে চন্দ্রবংশীয় কয়েকটি লিপি। এই লিপিগুলির সাহায্যে চন্দ্র-রাজাদের সম্পূর্ণ বংশতালিকা কালানুক্রমিক ভাবে নির্ণয় করা এখন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই লিপিগুলির একটিও এদেশীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। তাই নবাবিষ্কৃত এই লিপিগুলিকে বর্তমান তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইল না।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক (আনুমানিক)

মহাস্থান-শিলালিপি (খণ্ডিত)—Epigraphia Indica, vol. XXI. p. 83; Indian Historical Quarterly, vol. X. p. 58.

নোয়াখালি সিলুয়া-শিলালিপি—Annual Report of the Archaeological Survey of India.

খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতক (আনুমানিক)

চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া-শিলালিপি—Epigraphia Indica, vol. XIII. p. 133.

পঞ্চম শতক

(প্রথম) কুমারগুপ্তের ধনাইদহ-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১১৩=৪৩২-৩৩ খ্রী) —Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 345.

(প্রথম) কুমারগুপ্তের কলাইকুড়ি-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১২০=৪৩৯-৪০ খ্রী) —বঙ্গশ্রী মাসিক-পত্র, বৈশাখ, ১৩৫০, পৃ ৪১৫-২১।

(প্রথম) কুমারগুপ্তের ১নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১২৪=৪৪৩-৪৪ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 129;

(প্রথম) কুমারগুপ্তের ২নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১২৯=৪৪৮-৪৯ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 128; vol. XVII. p. 193.

(প্রথম) কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১২৮=৪৪৭-৪৮ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XXI. p. 78.

বুধগুপ্তের ৩নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (তারিখ অংশ ভগ্ন)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 134 ff.

বুধগুপ্তের ৪নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (তারিখ অংশ ভগ্ন)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 129.

বুধগুপ্তের পাহাড়পুর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১৫৯=৪৭৮-৭৯ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XX. p. 61 ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৯ খণ্ড, পৃ ১৪৩।

বুধগুপ্তের নালন্দা-শীলমোহর—Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 66. p. 64. pl. VIII a.

ষষ্ঠ শতক

গুণাইঘর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১৮৮=৫০৭-৮ খ্রী)—Indian Historical Quarterly, vol. VI. p. 40.

বৈন্যগুপ্তের নালন্দা-শীলমোহর—Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1930-34. p. 230.

·· গুপ্তের ৫নং দামোদরপুর-তাম্রশাসন (গুপ্ত সং ১৯৩=৫১২-১৩ খ্রী)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 141 ; vol. XVII. p. 193.

১নং ধর্মাদিত্যের কোটালিপাড়া-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Indian Antiquary, vol. XXXIX. p. 193.

২নং ধর্মাদিত্যের কোটালিপড়া তাম্রশাসন—Indian Antiquary, vol. XXXIX. p. 193.

গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Epigraphia Indica, vol. XXIII. p. 155.

গোপচন্দ্রের কোটালিপাড়া-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৮)—Indian Antiquary, vol. XXIII. p. 155.

সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি-তাম্রশাসন—Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. VI. p. 429 ; vol. VII. p. 289, 476 ; vol. X. p. 425 ; Epigraphia Indica, vol. XVIII. p. 74. Annual Report of the Arch-

aeological Survey of India, 1907-08. p. 256 ; Journal of the Royal Asiatic Society. 912. p. 710.

সমাচারদেবের কুর্পালা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৭)—অপ্রকাশিত।

সপ্তম শতক

শশাঙ্কের রোহ্‌টাসগড়-শীলমোহর—Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. III. p. 284.

শশাঙ্কের মহারাজা মহাসামন্ত (দ্বিতীয়) মাধবরাজের গঞ্জাম-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. VI. p. 143.

শশাঙ্কের ১নং মেদিনীপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৯)—মাধবী মাসিক-পত্র, আষাঢ়, ১৩৪৫, পৃ ৩-৬ ; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol. XI. 1945. p. 1.

শশাঙ্কের ২নং মেদিনীপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৮)—মাধবী মাসিক-পত্র, আষাঢ়, ১৩৪৫, পৃ ৩-৬ ; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol. XI. 1945. p. 1.

ভাস্করবর্মার নিধনপুর-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XII. p. 65 ; vol. XIX. p. 115 ; কামরূপ-শাসনাবলী, পৃ ১।

লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 301.

শ্রীধারণরাতের কৈলান-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৮০)—ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, বৈশাখ, ১৩৫৩, পৃ ৩৬৯-৭৪ ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩ খণ্ড, ৩-৪ সংখ্যা, পৃ ৪১-৫৪ ; Indian Historical Quarterly, p. 221.

জয়নাগের বপ্পঘোষবাট বা মল্লিয়-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XVIII, p. 60 ; Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute vol. XIX. p. 81.

সপ্তম-অষ্টম শতক

শৈলবংশীয় জয়বর্ধনের রঘোলি-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. IX. p. 41.

দেবখড়্গের ১নং আস্রফপুর-তাম্রশাসন—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. I. p. 85.

দেবখড়্গের ২নং আস্রফপুর তাম্রশাসন—

দেবখড়্গ-মহিষী প্রভাবতীর শর্বাণী-প্রতিমা-লিপি—Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 357.

অষ্টম শতক

ধর্মপালের বুদ্ধগয়া-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৬)—Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. IV. p. 101 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ২৯ ।

ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩২)—Epigraphia Indica, vol. p. 243 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ৯ ।

ধর্মপালের নালন্দা-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XXIII. p 290.

নবম শতক

দেবপালের কুর্কিহার মূর্তি-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৯)—Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XXVI. p. 251.

দেবপালের হিল্‌সা মূর্তি-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৫)—Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. X. p. 33 ; Indian Antiquary, 1928. p. 153 ; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vc . IV. p. 390.

দেবপালের মুঙ্গের-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩৩)—Epig·aphia Indica, vol. XVIII. p. 304 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ৩৫ .

দেবপালের নালন্দা-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩৫ বা ৩৯)—Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 318 ; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol. VII. p. 251 ; Varendra Research Society Monograph, no. 1.

দেবপালের ঘোষরাবা-প্রস্তরলিপি—Indian Antiquary, vol. XVII. p. 307 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ৪৫ ।

দেবপালের ধাতুপ্রতিমা-লিপি—Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1927-28. p. 139.

প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপালের দুইটি বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. IV. p. 108 ; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 57 ; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol. IV. p. 390.

জয়পালের সারনাথ-লিপি—Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1907-08. p. 75.

নারায়ণপালের গয়া মন্দির-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৭)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 60.

নারায়ণপালের ইণ্ডিয়ান মুাজিয়ম লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৭)— ঐ p. 61-62.

নারায়ণপালের ভাগলপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৭)—Indian Antiquary, vol. XV. p. 304 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ৫৫।

নারায়ণপালের বিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৫৪) Indian Antiquary, vol. XLVII. p. 110 ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৮, পৃ ১৩৯।

নারায়ণপালের বাদল গড়স্তম্ভ প্রতিমা-লিপি—Epigraphia Indica, vol. II. p. 100 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ৭০২।

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের ব্রিটিশ মুাজিয়ম-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 64.

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের বিহার বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৪)—Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1923-24 p. 102.

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের পাহাড়পুর-স্তম্ভলিপি (রাজ্যাঙ্ক ৫)—Memoirs of the Archaeological Survey of India, no. 55. p. 75.

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের রামগয়া দশাবতার-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৮)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 64.

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের ব্রিটিশ মুাজিয়ম-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ?)—

Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 64 ; Nach. Gottingen, 1904. p. 210-11.

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের গুণরিয়া-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৯)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 64 ; Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XVI. p. 278.

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের বিহার-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৯ বা ১৯ ; অধুনা নিখোঁজ) —Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 64.

দশম শতক

রাজ্যপালের নালন্দা স্তম্ভ-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৪)—Indian Antiquary, vol. XLVII. p. 111.

রাজ্যপালের কুর্কিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৮)—Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XXVI. p. 246.

রাজ্যপালের কুর্কিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩১)— ঐ p. 250.

রাজ্যপালের কুর্কিহার প্রতিমা লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩১ অথবা ৩২)— ঐ p. 247.

রাজ্যপালের কুর্কিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩২)— ঐ p. 248.

(দ্বিতীয়) গোপালের নালন্দা প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১)—Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. IV. p. 105; গৌড়লেখমালা, পৃ ৮৬২।

(দ্বিতীয়) গোপালের জাজিলপাড়া-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৬)—ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, ১ম খণ্ড, ১৩৪৪, পৃ ২৬৪।

বুদ্ধগয়া বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি—Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. IV. p. 105 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ৮৮।

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের কুর্কিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২ বা ৩)—Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XXVI. p. 37, 240.

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের মৃৎফলক-লিপি— ঐ p. 37.

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের দুইটি কুর্কিহার প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৯)—
ঐ p. 36-37, 239-40.

(প্রথম) মহীপালের সারনাথ-লিপি (বিক্রম সং ১০৮৩)—Indian Antiquary, vol. XIV. p. 139 ; Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4. p. 222 ; Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1906. p. 445 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ১০৪ ।

(প্রথম) মহীপালের বাঘাউরা প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 355.

(প্রথম) মহীপালের নারায়ণপুর প্রতিমা লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৪) ।

(প্রথম) মহীপালের বাণগড়-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৯)—Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. LXI. p. 77 ; Epigraphia Indica, vol. XIV. p. 324 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ৯১ ।

(প্রথম) মহীপালের নালন্দা-প্রস্তরলিপি (রাজ্যাঙ্ক ১১)—Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. IV. p. 106 ; গৌড়লেখমালা, পৃ ১০১ ।

(প্রথম) মহীপালের বুদ্ধগয়া-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ১১)—Memoirs the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 75.

(প্রথম) মহীপালের কুর্কিহার-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ২১ বা ৩১)—Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XXVI. p. 245.

(প্রথম) মহীপালের বেলওয়া তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২২)—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫৪ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৪১-৫৬ ।

(প্রথম) মহীপালের দুইটি ইমাদপুর প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ৪৮ ; ১৪৮ নেওয়ারী সংবৎ=১০২৮ খ্রীষ্টাব্দ) Indian Antiquary, vol. XIV . p. 165 ; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol. VII. p. 218.

(প্রথম) মহীপালের তেত্রবন বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি—Cunningham's Arch-

aeological Survey Reports, vol. VII. p. 39 ; vol. III. p. 123.

কুঞ্জরঘটাবর্ষের বাণগড়-স্তম্ভলিপি—Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. VII. p. 619 ; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 68 ; বঙ্গবাণী মাসিক-পত্র, ১৩৩০, পৃ ২৪৯।

কাম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দা-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৩)—Epigraphia Indica, vol. XXII. p. 150 ; vol. XXIV. p. 43.

লহরচন্দ্রের ভারেল্লা-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৮)—Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 349.

একাদশ শতক

শ্রীচন্দ্রের রামপাল-তাম্রশাসন—সাহিত্য মাসিক-পত্র, ১৩২০ ; Epigraphia Indica, vol. XII. p. 136 ; Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 1.

শ্রীচন্দ্রের কেদারপুর-তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. II. p. 188 ; Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 10.

শ্রীচন্দ্রের ধুল্লিয়া বা ধুল্লা-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩৫)—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 165.

শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর-তাম্রশাসন—Dacca Review, October, 1912 ; Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 189 ; Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 166.

শ্রীচন্দ্রের মদনপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৪৪)—ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩।

গোবিন্দচন্দ্রের কুলকুড়ি সূর্যমূর্তি-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১২)।

গোবিন্দচন্দ্রের বেতকা বাসুদেবমূর্তি-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৩)।

নয়পালের গয়া নরসিংহ-মন্দিরলিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৫)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 78.

নয়পালের গয়া কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরলিপি—Journal of the Asiatic Soc-

iety of Bengal, vol. LXIX. p. 190; গৌড়লেখমালা, পৃ ১১০।

(তৃতীয়) বিগ্রহপালের গয়া অক্ষয়বট মন্দির-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৫)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 81.

(তৃতীয়) বিগ্রহপালের আমগাছি-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১২)—Epigraphia Indica, vol. XV. p. 293; গৌড়লেখমালা, পৃ ১২১; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 80.

(তৃতীয়) বিগ্রহপালের বিহার বুদ্ধপ্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৩)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 112.

(তৃতীয়) বিগ্রহপালের বেলওয়া (বেল্লাবা) তাম্রশাসন—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৫।

রামপালের তেত্রবন প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. IV. p. 109; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 93; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol. IV. p. 390.

রামপালের চণ্ডীমৌ প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ৪২)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 93-94.

বৈদ্যদেবের কমৌলি-তাম্রশাসন (কুমারপালের রাজ্যাঙ্ক ৪)—Epigraphia Indica, vol. II. p. 350; গৌড়লেখমালা, পৃ ১২৭।

পরমসৌগত ভবদেবের (আনন্দদেবের পুত্র) ময়নামতী-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২)—অপ্রকাশিত।

ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, vol. XII. p. 37; Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 14.

সামলবর্মার (খণ্ডিত) বজ্রযোগিনী-তাম্রশাসন—ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, কার্ত্তিক, পৃ ৬৭৪।

হরিবর্মার সামন্তসার-তাম্রশাসন—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২১৫; ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, মাঘ, ১৩৪৪, পৃ ১৬৩।

ভবদেব-ভট্টের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিলিপি—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 25.

দ্বাদশ শতক

(তৃতীয়) গোপালের নিমদীঘি বা মান্দা-লিপি—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5 p. 102; Indian Historical Quarterly, vol. XVII. p. 207; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৯ খণ্ড, পৃ ১৫৫।

(তৃতীয়) গোপালের রাজীবপুর প্রতিমা-লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৪ ?)—Indian Historical Quarterly, vol. XVII. p. 217; Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1936-37. p. 130-33; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol.VII. p. 216

(তৃতীয়) গোপালের মন্দুক গণেশ-প্রতিমালিপি—অপ্রকাশিত।

মদনপালের বিহার-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩)—Cunningham's Archraeological Survey Reports, vol. III. p. 124.

মদনপালের মনহলি-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৮)—Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. LXXIX. Part I. p. 68; গৌড়লেখমালা, পৃ ১৪৭।

মদনপালের জয়নগর-প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৪)—Cunningham's Archaeological Survey Reports, vol. III. p. 125; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, vol. VII. p. 216.

গোবিন্দপালের গয়া-শিলালিপি (১২৩২ বিক্রম সং)—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. 5. p. 108.

গোবিন্দপালের দ্বিতীয় একটি প্রস্তরলিপি—অপ্রকাশিত। Cunningham's Archaeological Survey Reports, vol. XV. p. 155.

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিলিপি—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 42

বিজয়সেনের বারাকপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৬২)— ঐ p. 42

বল্লালসেনের নৈহাটি-তাম্রশাসন— ঐ p. 68

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২)— ঐ p. 92

লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২)— ঐ p. 99

লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন কুলতলা তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২ বা ৩) ঐ p. 169

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩)— ঐ p. 81

লক্ষ্মণসেনের ঢাকা প্রতিমা-লিপি তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩) ঐ p. 116

লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩ বা ৬)—Epigraphia Indica, vol. XXI. p. 211 ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৭ খণ্ড, পৃ ২১৬।.

ডোম্মনপালের সুন্দরবন-তাম্রশাসন (১১১৮ শক—১১৯৬ খ্রী)—Indian Historical Quarterly vol, X. p. 321.

ত্রয়োদশ শতক

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২৭)—Epigraphia Indica vol. XXVI. p. 1.

লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-তাম্রশাসন—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 106

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৪) ঐ p. 132

বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৪) ঐ p. 140

কেশবসেনের ইদিলপুর-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩) ঐ p. 118

কানাই বড়শীবোয়া-শিলালিপি—কামরূপ-শাসনাবলী, ভূমিকা।

দামোদর-দেবের মেহার-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৪ ; ১১৫৬ শক)—Epigraphia Indica, vol. XXVII.

দেব-বংশীয় অনৈক রাজার ত্রিপুরা-তাম্রশাসন (১১৫৮ শক)—অপ্রকাশিত।

দামোদর-দেবের চট্টগ্রাম-তাম্রশাসন (১১৬৫ শক)—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 158.

দশরথ-দেবের আদাবাড়ী-তাম্রশাসন—Inscriptions of Bengal, vol. III. p. 181 ; ভারতবর্ষ মাসিক-পত্র, পৌষ, ১৩৩২।

দশরথ-দেবের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন—অপ্রকাশিত।

কেশবদেবের ভাটেরা-তাম্রশাসন (তারিখ অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত)—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1880. p. 141 ; Epigraphia Indica, vol. XIX. p. 277.

ঈশানদেবের ভাটেরা-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৭)—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1880. p. 141.

রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেবের ময়নামতী-তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৭)—Indian Historical Quarterly, vol. IX. p. 282.

পীঠীপতি আচার্য জয়সেনের জানিবিঘা-লিপি (লক্ষ্মণসেনস্য অতীতরাজ্যে ৮৩)—Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. IV. p. 273, 266 ; Indian Antiquary, vol. XLVIII. p. 48.

পীঠীপতি আচার্য বুদ্ধসেনের নামোল্লিখিত বুদ্ধগয়া-লিপি—Indian Antiquary, vol. XLVIII. p. 44.

নির্ঘণ্ট

[একটি নাম বা বিষয় পর পর কয়েকটি পৃষ্ঠায় যখন বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তখন পৃষ্ঠাঙ্কের পরে 'বিঃ' সংকেত দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ নির্ঘণ্টের শেষে একটি প্রসঙ্গ-নির্দেশিকা সংযোগ করা হইয়াছে। সংকলক : শ্রীঅমল সরকার]

প্রসঙ্গনির্দেশ